



CUK-H 4889-10- 847593

10



১৯৬৩ ★ দ্বৈতীয়া-এপ্রিল-আমর্তলাল ★ বৈশাখ : ১৩৭০



৫০ বৎসর হইতে দ্বৈতীয়া সেরা

এ.জি. দ্বৈতীয়ালাল

..... গোষ্ঠীনাথ • ব্রীনাথ • মাদ্রাজ • সোলাপুর্ গোষ্ঠীনাথ •.....

প্রস্তুতকারক: মেসার্স, এ.জি. সাহিব

৬৬ মেসার্স: ১২৭৬ মাদ্রাজ-৬ | ৫০/৬ মাদ্রাজ-৬ | ৫০/৬ মাদ্রাজ-৬

অধ্যক্ষ মথুর বাবুর

শক্তি ঔষধালয় ঢাকা প্রাঃ লিঃ

১৩০৮ সালে স্থাপিত।

মায়ের দার্দী —
মৃতসঞ্জীবনী সূরা
মাতৃত্ব সার্থক করে তুলতে
সহায়তা করে

শক্তির —
মৃতসঞ্জীবনী সূরা




মোক্ষার্থে বৈশিষ্ট্য হিমালী স্নো

সকাল, সন্ধ্যায় ও রাত্রে ব্যবহার করুন
এতে আপনার মুখমণ্ডল কোমল,
কমনীয় ও উজ্জ্বল হবে।



হিমালী প্রাইভেট লিঃ • কলিকাতা-২



৪১-১৩৭০

সূচীপত্র

বৈশাখ : ১৩৭০

7563

০১/৭/৩০

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
জীবনের আলো	প্রশান্তি	১
ঋগ্বেদ	নিবন্ধ	২
বর্ষ-প্রশস্তি	কবিতা	৩
নববর্ষের বাণী	কবিতা	৪
ডাক দিলো বৈশাখ	কবিতা	৪
জয় ভারত !	গান	৫
বিবেক-বারতা	প্রবন্ধ	৫
ডাইনি	গল্প	৬
বঙ্কিমবান্ধব অক্ষয়চন্দ্র	জীবন-প্রসঙ্গ	১৩
মমি	কবিতা	১৫
পথ-নির্দেশ	পত্রসাহিত্য	১৬
কুলুপ আঁটা জগৎ	বিদেশী গল্প	১৮
রঙীন শাড়ী	আলোচনা	২১
চীনের ভারতাক্রমণ প্রসঙ্গে	প্রবন্ধ	২৪
আলোকদিশারী	জীবন-প্রসঙ্গ	২৬
শিল্পী মন	উপছাঙ্গ	২৭
শ্রীশ্রীসত্যসুন্দর পত্রাবলী	পত্রসাহিত্য	৩৩
গান্ধীবাদ ও বিনোবা ভাবে	প্রবন্ধ	৩৫
প্রবর্তক সত্য অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব	বিবরণী	৩৮
সম্পাদকীয়		৪১
ভারতীয় ফুটবল প্রসঙ্গ	খেলাধুলা	৪৩
সমালোচনা		৪৬
সাময়িকী		৪৭

10

আর মিত্রের

ময়ূর মার্কা

তিল তৈল



বিশুদ্ধ ও সুপরিষ্কৃত তিল তৈল হইতে প্রস্তুত
যাবতীয় শিরঃশ্রাবাগ অধিকারী

আদ্য শ্রীমতী সুনামের উপর প্রতিষ্ঠিত

রুচির রূপায়ণে

কিনন

- বিজ্ঞাপনের নমুনা
 - প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
 - তাবচিত্রণ ও ব্যঙ্গ চিত্র
 - হাতে আঁকা সায়েন্টফিক চার্ট
- ॥ বহুমুখী বিভাগ ও কলেজের জন্য ॥
এক রঙ ও বহু রঙের

রামরাজ্যাতলা গুপ্তন রোড,
ডাক : সাতরাগাছি, হাওড়া
কলিকাতার টিকানা :

C/o গীতাভারতী প্রেস
১১৭/১ বি, বি, গান্ধী স্ট্রিট, কলি-১২

জাতীয় শিল্পের সংগঠন প্রচেষ্টায় আমরা আপনার সহায়তা কামনা করি।

টেলি :
প্রবর্তক

প্রবর্তক লি:

ফোন :
৩৪-৩০৮৮

হেড অফিস : ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলিকাতা-১২

অগ্রান্ত শাখা : চট্টগ্রাম, চন্দননগর

Supply & Transport (P) Ltd.

8, Biplabi Rash Behari Bose Road, Calcutta-1 : 22-6704

Showroom and Godown : J-208 Paharpur Road, Calcutta-24 ; 45-4292

Pioneer firm of "EVEREST" Bigsix & Trafford Sheets, Building Board,
A. C. R. W. Pipes & Gutters etc.

Mg. Director's Residence : 45-2648.

গ্রন্থসম্ভার

আপনার মনের মত ডিজাইনের আসবাবপত্র,
আমাদের শো-রুমে পাইবেন

ফোন : ৩৪-৩০৮৮

টেলি : "প্রবর্তক"

প্রবর্তক ফার্নিশার্স লিমিটেড

৬১, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলিকাতা-১২

সম্বৎসর শ্রীমতিলাল || বেদান্তদর্শন (৬৫০ পৃঃ) ৭-৫০; গীতা (২ খণ্ডে প্রায় ৮০০ পৃঃ) প্রতি খণ্ড ৫০,
জীবনসঙ্গিনী (প্রায় ৬০০ পৃঃ) ৫০; আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী ২-৭৫ নঃ পঃ

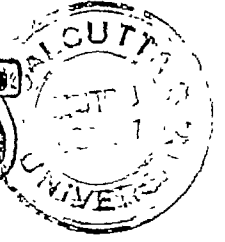
শ্রীরামমোহন নাথ তত্ত্বভূষণ || উপনিষদে সাধন রহস্য ৩-৫০, গোরক্ষবাণী ১ম ১-৫০, ২য় ৩-৫০ নঃ পঃ
মহেঞ্জোদাড়োর লিপি ও সভ্যতা ৩-০০, নাথযোগী তত্ত্ব-৭৫ নঃ পঃ

রবীন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের
অরবিন্দ-রবীন্দ্র
সচিত্র ৷ দাম : চার টাকা।

|| এই গ্রন্থে রবীন্দ্রের আলোকে অরবিন্দ দর্শনের গূঢ় রহস্যের অন্ধকার যবনিকা
উন্মোচিত হয়েছে। 'যুগান্তর'-এর অভিমত : "বইখানি শুধু পাঠযোগ্য নয়,
বিভিন্ন পাঠ্যক্রমে পাঠ করিয়া শুনাইবার উপযোগী।"

প্রবর্তক পাবলিশার্স : ৬১নং, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলিঃ-১২

প্রবন্ধ



বার্ষিক মূচীপত্র : বৈশাখ—চৈত্র : ১৩৭০

[লেখক-নামের বর্ণাহুক্রমিক সূচী ॥ প্রঃ=প্রবন্ধ; নিঃ=নিবন্ধ; গঃ=গল্প; নঃ=নন্দনা; উঃ=উপন্যাস
চিঃ=চিত্র; কঃ=কবিতা; জীঃ=জীবনী; জীঃ চিঃ=জীবন-চিত্র; কাঃ=কাব্য-কাহিনী; আঃ=আলাপ ও আলোচনা; আঃ=আলোচনা; ভঃ=ভ্রমণ; গীঃ=গীতি আলোচনা; নাঃ=নাটক;
গীঃ নাঃ=গীতিনাট্য; সমঃ=সমালোচনা; রঃ=রম্য রচনা; সঃ=সত্য ঘটনা]

শ্রীঅনিলবরণ তর্কবেদাস্ততীর্থ

ধ্বংস ২, ৫০, ২৪, ১৩০, ১৬৬, ২০২, ২২০,
৩২৬, ৩৬২, ৩৯৮, ৪৩৪

শ্রীঅক্ষরচন্দ্র সরকার

বন্ধিমবাস্তব অক্ষরচন্দ্র (প্রঃ) ১৩, ৬৪, ১০৬, ১৩২, ১৭৬
গীতা কি মহাভারতের মধ্যে প্রসিদ্ধি? (প্রঃ) ৩৬৩

শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পথনির্দেশ (প্রঃ) ১৬
ভক্তযোগী রসিকবিহারী (জীঃ) ৭৭, ১০৯, ১৫৩, ১৯০

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

জ্ঞানেশ্বরী (প্রঃ) ১২১

শ্রীঅনিলকুমার সমাজদার

নতুন বছরে (গঃ) ১৪২

শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত

বাণী মন্দিরে (প্রঃ সঃ) ১৪৮

শ্রীআশুতোষ শর্মা

স্বদেশচিন্তায় নজরুল (প্রঃ) ২০৩

শ্রীআরাধনা গুপ্তা

সম্বন্ধ (কঃ) ২১৯

রাহ (গঃ) ৩৪৭

শ্রীইন্দু গুপ্ত

বাইশে পৌষ (কঃ) ৩৫২

শ্রীউমাপদ নাথ

মায়ের কাছে আর্জি (কঃ) ২৮৫

ওখানে বিধাতা জাগিবে (কঃ) ৩৮৬

ভালবাসি বলিয়া বলিতেছি (পত্র) ৪৩০

শ্রীকালিদাস মুখোপাধ্যায়

গান্ধীবাদ ও বিনোবা ভাবে (প্রঃ) ৩৫, ৫১

এ কালের বঙ্গসংস্কৃতি (প্রঃ) ৩৯৯

শ্রীকরণাশঙ্কর ভট্টাচার্য

ভারতীয় স্কটবল প্রসঙ্গে (প্রঃ) ৪৩

বেলাধুলা প্রসঙ্গে : ৮৩, ১২২, ২২৫, ২৮১, ৩১৭,
৩৫৩, ৪৬২

শ্রীকালিদাস রায়

কবি যতীন্দ্রপ্রসাদের জন্মদিনে (কঃ) ৭৩

নীলাকাশের পাখী (কঃ) ২৫৩

ছা-পোষার হাল (কঃ) ৩৭৭

শ্রীকণা দেবী ভারতী

গোপেশ্বর স্মরণে (চঃ চিঃ) ১৫১

শ্রীকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বিজ্ঞাবিনোদ

অসার বুনিয়াদ (প্রঃ) ২২২

বাংলা সমাজ ধ্বংসের পথেই (প্রঃ) ৩৮০

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

সম্বন্ধ (কঃ) ২৫৩

শ্রীকুলরঞ্জন মজুমদার

বঞ্চনা (কঃ) ৩৫১

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর শাস্ত্রী

বৃহস্পতি (প্রঃ) ৩৮৪, ৪১২

শ্রীকেশব বাগচী

অনাগত দিন (কঃ) ৪১৫

শ্রীগোপেন্দ্রভূষণ সাংখ্যতীর্থ

পত্র পথনির্দেশ (পঃ) ১১৮

শ্রীগণেশচন্দ্র সামন্ত

স্বর্গদীপ (কঃ) ১৩৪

তুমি (কঃ) ৪৫৭

শ্রীগুরুদাস দত্ত

গান্ধীজী সন্দর্শনে (প্রঃ) ৪১৬

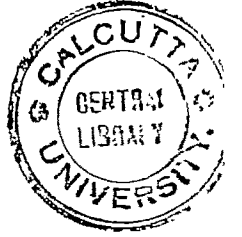
শ্রীচিশুরঞ্জন চক্রবর্তী		শ্রীনরেন্দ্র দেব	
দেবী বরণ (কঃ)	২৩৯	কবি যতীন্দ্রপ্রসাদের জন্মদিনে (কঃ)	৭৩
ভক্তের ভগবান (গঃ)	৩৮৭	স্বামী-স্ত্রী সংবাদ (কঃ)	২৫৩
শ্রীচুন্নীলাল গঙ্গোপাধ্যায়		শ্রীনীতীশ মজুমদার	
বাংলার ভবিষ্যৎ (নিঃ)	২৯৭	প্রশ্ন (কঃ)	৩৮৬
প্রাণের প্রস্তুতি (চিত্র)	৪০৪	ইরাবতী (কঃ)	৪৬৪
শ্রীজলধর বিশ্বাস		শ্রীনির্মল রায়	
সহজ কর প্রাণ (কঃ)	১১৯	ক্রমশঃ (গঃ)	৪৫২
শ্রীজগদ্বন্ধু দাস		শ্রীমৎ স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী	
প্রোত্তাপ্তা (অঃ গঃ)	১৮৪	বর্ষ-প্রশস্তি (কঃ)	৩
শ্রীজ্যোতির্ময়ী দেবী		শ্রীশঙ্কর প্রশস্তি	২৩৮
সাহিত্যজগতে নারী (প্রঃ)	২৪৩	হে পুরাণ কবি (কঃ)	৩২৭
মাতৃভাবময়ী সজ্জমাতা (প্রঃ)	৩৪৩	বিশ্বদোল (কঃ)	৪২৫
শ্রীতারাপ্রসন্ন সরকার		মহর্ষি প্রেমানন্দ	
শিশুসাহিত্যে দিকপাল উপেন্দ্রকিশোর (প্রঃ)	৬৯	নববর্ষের বাণী (কঃ)	৪
উনবিংশ শতাব্দীর শিশুসাহিত্য (প্রঃ)	১৩১	পত্রে পথনির্দেশ (পঃ)	১৫৬
শ্রীত্রিহর্গাপুঞ্জার ঐতিহ্য (প্রঃ)	২৫৯	শ্রীশ্রীচণ্ডী ও সত্যপ্রতিষ্ঠা : ধূলোলোচন বর্ষ	২৪০
শ্রীতারাক্ষক বন্দ্যোপাধ্যায়		বিজয়া (কঃ)	২৯১
শ্রীমতী স্নেহাতা রায় (গঃ)	২৭৫	শ্রীপ্রবীর বিশ্বাস	
শরীর যখন অশক্ত হয় (প্রঃ)	৩৭৪	মমি (কঃ)	১৫
তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী		জতুগৃহ (কঃ)	২৫৭
সবুজ সাথী (গঃ)	৩০১	শ্রীপঞ্চানন রায়, কাব্যতীর্থ	
শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন		বাংলার মন্দির : ঝাড়গ্রাম (প্রঃ)	১৬৭
পেটেন্ট ঔষধ (প্রঃ)	৩০৫	ডাঃ পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়	
শ্রীদিলীপকুমার রায়		একখানি পত্র (পঃ সাঃ)	৩৩৬
জয় ভারত (কঃ)	৫	স্বামী প্রণবানন্দজী	
সৈনিক স্মরণে (গাঃ)	১৫২	মানব-উজ্জীবনের মহামন্ত্র (প্রঃ)	৩৭৩
মিলন তৃষিতা (গাঃ)	২৫৩	শ্রীপ্রমথনাথ কুমার	
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ গুহচৌধুরী		পরাজয় (কঃ)	৩৮৩
খোকার মাতৃভাষা (আঃ)	৩৪০	শ্রীফণিভূষণ বিশ্বাস	
শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর		শান্তি (গঃ)	১১৩
শিল্পীমন (উঃ) ২৭, ৫৬, ৯৮, ১০৫, ১৭৩, ২০১, ২৬৯, ৩০৯, ৩৩১, ৩৬৬, ৪০৫, ৪৩৯		শেলীর কাব্যিক মতবাদ (প্রঃ)	৪৩৬
শ্রীধীরেন্দ্রকুমার সরকার		বিবিধ	
কবি-তুলিকা (কঃ)	১৭৫	সম্মেলনের পত্রাবলী	৩৩, ৮০, ১৪৪, ১৯৪
নেনু কো গুলুবারোদ		সম্পাদকীয়	৪১, ৮৮, ১২৬, ১৬১, ১৯৫, ২৩২, ২৮২, ৩১৯, ৩৫৬, ৩৯১, ৪২১, ৪৬৫
কুলুপ ঝাঁটা জগৎ (অঃ গঃ)	১৮	সমালোচনা	৪৬, ৮২, ১২৭, ২৩৪, ৩২২, ৩৯৫
শ্রীনিখিলকুমার সরকার		সাময়িকী	৪৭, ৯১, ১২৮, ১৬৪, ১৯৮, ২৩৫, ২৮৪, ৩২৪, ৩৬০, ৩৯৫, ৪৩১, ৪৭১
দয়াল রে (গাঃ)	৭১	সম্মেলন শ্রীমতীলাল জীবন-স্মৃতিসংরক্ষণ	২১৩
		পরিচিতি : শ্রী জি. ডি. খাণ্ডেলওয়াল	২৮৬
		সকল জীবন	২৮৭

শ্রীবীণাপাণি দত্ত		শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	
গোপাল মা অরণে (জীঃ)	১৪৫	কবি যতীন্দ্রপ্রসাদের জন্মদিনে (কঃ)	৭৩
শ্রীবরীন্দ্রকুমার ঘোষ		শ্রীযত্নগোপাল গোস্বামী	
যদিও জেনেছি (কঃ)	১৭৬	আয়ুর্কোদে নেত্ররোগ (প্রঃ)	৭৫
শক্তিদায়িনী জাগো (কঃ)	২৪২	শ্রীরাজমোহন নাথ, বি. ই. তত্ত্বভূষণ	
শিলিমুখ মন (কঃ)	৪২০	বিবেক বারতা (প্রঃ)	৫
স্বামী বিশ্বরূপানন্দ		বৈদিক সর্প (প্রঃ)	২৭৩
গুরুদক্ষিণা (প্রঃ)	২২০	শ্রীরমণ	
শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য্য		আলোকদিশারী (প্রঃ)	২৬
শ্রীঅরবিন্দের দিব্যজীবন দর্শন (প্রঃ)	২৪৮	শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী	
স্বামী বিবেকানন্দের বীরবাহী (প্রঃ)	৪৪৯	ধ্বনির শ্রেণীবিভাগ (প্রঃ)	৯৫, ১৮০
শ্রীবেলাল মহম্মদ		শ্রীরাজকুমার লাহিড়ী	
দুই তীর্থকথা (প্রঃ)	২৯৯	ছায়া মিছিল (কঃ)	২১২
শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত		শ্রীরবীন্দ্রনাথ দাস	
ভক্তি-ভারতী (কঃ)	৩৩৫	আবার এসো (কঃ)	২৪৫
শ্রীবনমালী রায় জ্যোতিষশাস্ত্রী		শ্রীমতী রমা চট্টোপাধ্যায়	
জ্যোতিষের দৃষ্টিতে দুর্গাপূজা (প্রঃ)	৩০৭	মহাপ্রাণ ষষ্ঠপাল (জীঃ)	২৬৬
শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন, ভক্তিতারতী		শ্রীরবিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	
বংশীগীতির পুষ্টি (প্রঃ)	৬৭০	সাহিত্যে দেশপ্রেম (প্রঃ)	২৯১
শ্রীবংশী মণ্ডল		শ্রীরাজেন্দ্রলাল শাস্ত্রী	
ভোরের বকুল (গঃ)	৩৭২	বেদপুরাণে প্রজাপতি ও উষা (প্রঃ)	৩০৩
শ্রীবিভা দেবী		শ্রীলক্ষ্মী মজুমদার	
বিষ্ণুপুরে কয়েকদিন (ভঃ)	৪৪৬	ডাক্তার পঞ্চানন চ্যাটার্জী (জীঃ)	২২৩
সম্ভবগুরু শ্রীমতিলাল রায়		স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী	
জীবনের আলো (প্রশস্তি) ১, ৪৯, ৯৩, ১২৯, ১৬৫, ২০১, ২৮৯, ৩২৫, ৩৬১, ৩৯৭, ৪৩৩		প্রবর্তক সঙ্ঘে অক্ষয় কৃতীয়া উৎসব (নিঃ)	৬৮
আগমনী সন্দেশ	২৩৭	জগদগুরু শঙ্করাচার্য্য	
সাধন সঙ্কেত (প্রঃ)	২২৮	পত্রিকা সংস্কার প্রসঙ্গে (আঃ আঃ)	৬২
শ্রীমনোজ দাস		শ্রীশান্তশীল দাশ	
ভূ-স্বর্গ ভারত (প্রঃ)	২৬০	একটি প্রার্থনা (কঃ)	১৪১
শ্রীমহীতোষ বিশ্বাস		কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ (কঃ)	৩৪১
বিচার (গঃ)	২৯৩	স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী	
শ্রীমনীষীমোহন রায়		বৈদিক প্রার্থনা মন্ত্র (প্রঃ)	২৫২
স্বামীজির সাহিত্যচিন্তা ও ভাষা-সমীক্ষা (প্রঃ)	৩২৭	ডাঃ শিশির জানা	
শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য		দীক্ষা : (ভঃ কাঃ)	২৬১
হৃদয়স্পন্দন (কঃ)	৭২	শ্রীশীতল বন্দ্যোপাধ্যায়	
বেওয়ারীশ মড়া (কঃ)	২৫৬	অষ্টাদশ শতকের পত্রিকা প্রসঙ্গে (প্রঃ)	৩১২
আত্মসমীক্ষা (কঃ)	৩৩২	শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ ঘোষ	
আবার জাগো (কঃ)	৪১৫	স্বভাষচন্দ্রের জীবনে সাহিত্যের মূল্য (প্রঃ)	৩৩৭
		শ্রীশচীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	
		একটি কাব্য (গঃ)	৪২৭

শ্রীশ্রীধীর গুপ্ত		সংগ্রাহক	
ডাক দিলো বৈশাখ (কঃ)	৪	পাশ্চাত্য ঠাকুরদের বাণী ও উপদেশ (উঃ)	২৬৮
জগদ্ধাত্রী (কঃ)	৩২১	স্বামী সদানন্দ	
পিয়ামা (কঃ)	৩৩৯	আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ (জীঃ)	৩১৩
ফাস্তনী পবন (কঃ)	৪১৪	শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার	
শ্রীশ্রীল চৌধুরী		ঋষি মতিলালের স্মৃতিরক্ষা (প্রঃ)	৩৪৯
ডাইনী (গঃ)	২	নমো নমো জন্মভূমি (কঃ)	৩৭৬
আন্তি (গঃ)	২৪৬	শ্রীসন্তোষকুমার দে	
শ্রীশ্রীলপ্রসাদ সর্বাধিকারী		অপপ্রচারের পাণ্ডা ব্যবস্থা (প্রঃ)	৪৫৮
চীনের ভারত আক্রমণ প্রসঙ্গে (প্রঃ)	২৪, ৬৭	ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস	
খেলাধুলায় বাঙালী (প্রঃ)	১২০	রঙীন শাড়ী (আঃ)	২১
কর্মযোগী সূর্য্যকুমার (জীঃ)	১৮৭	গ্রাম উন্নয়ন ও খাত্তের সংস্থান (প্রঃ)	২৯
আমাদের কালে শারদোৎসব (প্রঃ)	২৪১	ভাবার আত্মর ঘর (প্রঃ)	২৮০
স্মৃতি-আলেখ্য (জীঃ)	৩৫০, ৩৭৮, ৪০৯, ৪৪৩	হে মহামানব (কঃ)	৩৯০
স্বামী সমাধিপ্রকাশ আরণ্য		শ্রীহাসিরামি দেবী	
পত্রে পথনির্দেশ (গঃ)	৭৪	কয়েকটা ঘটায় (রঃ রঃ)	২৫৪
শ্রীশ্রীদর্শন চক্রবর্তী		শ্রীক্ষিতীশ দাশগুপ্ত	
সাহিত্যে সংস্কৃতি (প্রঃ)	১৬০	কবি নজরুল জন্মদিনে (কঃ)	৭২
		গান ও স্বরলিপি (স্বরলিপি)	২৫০

চিত্রসূচী

বৈশাখ :	ঋষিকাচার্য্য কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য	২৬	“কী এক আকর্ষণে হেথা আসি বার বার”	
	করুণাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য	৪৩	দীঘা রূপায়ণে ডাঃ বি. সি. রায়	২৬২
জ্যৈষ্ঠ :	মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন সহ ক্যালকাটা		আসামের চা-বাগানের দৃশ্য	২৬৩
	ও মোহনবাগানের প্রবীণ ও নবীন		হিমালয়ের তরাই অঞ্চলের দৃশ্য	২৬৪
	খেলায়াড়বুন্দ	৮৫	কাঁদীর রাণী লক্ষ্মীবাবুয়ের কেজা	২৬৫
	শ্রীমতী সুনন্দা বসু	৯১	কেদারবদরী পথে পাতালগঙ্গা	২৬৫
শ্রাবণ :	গোপাল মা	১৪৫	মার্কেল পাথরের ভিতর দিয়া প্রবাহিতা	
ভাদ্র :	সূর্য্যকুমার বসু	১৮৭	নর্মদা নদী : জব্বলপুর	২৬৫
আশ্বিন :	সজ্জগুরু মতিলাল (রেখাচিত্র)	২৪৩	দূর থেকে কেদারনাথের মন্দির	২৬৫
	ডাঃ পঞ্চানন চ্যাটার্জী	২২৩	ধর্মপাল	২৬৭
	লীগ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান দল	২২৭	ভারতের মুগল সম্রাট	২৬৭
কার্তিক :	ব্রজেশ্বরী মন্দির : কাংড়া চিত্র		জি. ডি. ঝাঙেলওয়াল	২৬৬
	“হে সমুদ্র শুক চিত্তে”...দীঘা		অগ্রহায়ণ : “কোথায় থাকিস্ রে” (রেখাচিত্র)	২৭৩
	অনন্তের পটভূমিকায় দেউদার শ্রেণী : দীঘা		ভগবতী গণেশকে	
	“এই ইন্টোভিউস্ করিয়ে...”		কোলে নিয়ে (ঐ)	২৭৩
	(রেখাচিত্র)	২৫৪	একটু বাদেই যম এসে	
	“তুমি কি”	২৫৫	হাজির (ঐ)	২৭৫
	জতুগৃহ—২ খানি রেখাচিত্র	৫৫৮	শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী	৩১৩
	জমগাধিগণের সরকারী আবাস : দীঘা	২৭৫	পৌষ : স্বামী বিবেকানন্দ	৩২৯
			সজ্জপিতা ও সজ্জমাতা	৩৪৩



৪৮ বর্ষ, ১ম সংখ্যা

জীবন

: বৈশাখ ১৩৭০ :

জীবনের আলো

ভারতবর্ষ এক মহাদেশ। ভারতের অধিবাসী ধর্মকে আশ্রয় করিয়া জীবনযাত্রা শুধু চাহে নাই, ধর্মের বিগ্রহ হইতে চাহিয়াছিল। এই অসাধারণ ইচ্ছা মানুষের স্বকপোল-কল্পিত নহে। নরদেহ আশ্রয় করিয়া ঈশ্বরেচ্ছাই প্রকাশ পাইয়াছিল, সে ইচ্ছা আজিও সফল হয় নাই। এই ইচ্ছা পূর্ণ না হইলে এ জাতির কোনও সাফল্য নাই। জাতির উৎপত্তি ও স্থিতি যে লক্ষ্যে, উহা হইতে ঐষ্ট হইলে ভারতবাসীর অস্তিত্বই অনাবশ্যক হইয়া পড়ে। নব বর্ষের প্রথম দিনে এই কথাটাই তোমাদের পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। জাতি গড়ে অস্ত্রবলে নয়, ধন ও ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যে নয়। জাতি গড়ে অস্ত্র:করণের অহুশীলনে। অহুশীলন-বিধি যদি পরস্পর-বিরোধী হয়, অস্ত্র:করণ ভেদে অবশ্যস্বাভাবী। জাতির সংহতি-শক্তিও বিনষ্ট হয়। এই হেতু ধর্ম ও কর্মের একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞা এ জাতি নির্ণয় করিয়াছে। ধর্ম হেতুই জীবনানাবিধ গতি প্রাপ্ত হয়। তাই জাতির পরম গতির জন্ত উৎকৃষ্ট কর্ম নির্বাচন এবং উহার মূলে ধর্মভাব আবিষ্কার করিয়া আদর্শমুখায়ী অস্ত্র:করণ গড়ার চেষ্টা হইয়াছিল। ঋক্-সামাদি চতুর্বেদ অপৌরুষেয় ও অনাদি। আর স্মৃতি বেদার্থ অমুধাবন করিয়া প্রাচীন পুরুষেরা কর্মে ও জ্ঞানে যে অহুত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাহার শাস্ত্রে ও সংহিতায় তাহা লিখিয়া গিয়াছেন। বশিষ্ঠ, হারীত, ব্যাস, ভরদ্বাজ, পরাশর, কশ্যপ প্রভৃতি স্মৃতিকার হিন্দুজাতির জীবন-নীতি সুপথে চালিত করার জন্ত কর্মবিধি দিয়া গিয়াছেন। কর্মের ফলাফল যুগামুখায়ী ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়, তাহার কারণ কালধর্মের পরিবর্তন হইয়া থাকে। কর্মের পরিবর্তন যতই হউক স্মৃতি, ক্ষমা, দয়, অন্তর্য, শৌচ, সংযম, ধী, বিত্তা, সত্য ও অক্রোধ ধর্মের এই মূল নীতিগুলি যথাবিধি পালিত হইলে আমরা ধর্মলক্ষণাক্রান্ত হইয়া পরম গতি পাইব। বেদ ও স্মৃতি এই উভয় শাস্ত্র হইতেই ঈশ্বর লাভের শীল ও আচার আমরা পাইয়া থাকি। মানবসমাজের এত বড় নীতি ও সংস্থিতি কোন দেশের মানুষ কল্পনা করিতে পারে নাই। যে জীবন ঈশ্বরপূত নহে, ঈশ্বর মহিমা মূর্ত না করে, সে জীবনধারণের প্রয়োজন কি? এই যে অস্থি-স্তম্ভে বিদ্যুত দেহ, রক্তমাংসে প্রলিপ্ত, চর্ম্মাচ্ছাদিত, মুত্র-বিস্তারপূর্ণ, ক্ষুণ্ণপিপাসাকাতর এই ব্যাধি-মন্দির, এ দেহ ধারণের সার্থকতা কি? ঐ আকাশের ভাস্বর বিবস্বতের দিকে চাহিয়া এ দেশের ঋষিই না বলিয়াছিলেন—“আকর্ষণ করিয়া লও তোমার জ্যোতি:চ্ছটা। ঐ, ঐ যে পুরুষ তোমার মধ্যে, সে আমিই।” সেই বীর্যবান মহাজাতির বংশধর এই কি আমরা? হে উদীয়মান তরুণ! নব বৎসরের প্রথম প্রভাতে উদাস্ত কর্তে তোমাদের ডাক দিয়া বলি—বড় আপংকাল আমাদের। আর একবার জীব বস্ত্রধও কটিতে জড়াও, আর আইন ভারতের সেই সনাতন ঋষ্টি ও সংস্কৃতি ফিরাইয়া আনি। ইহা কেবল পারলৌকিক অল্পম সুখ নহে, বিশ্বের উপর আধিপত্য এই পথেই। (১৩৪৬-এর প্রবর্তক হইতে)

সজ্ঞপ্তক শ্রীমতিলাল

ঋগ্বেদ

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ (প্রথমং অষ্টকং । ষট্‌ত্রিংশৎ স্তবঃ ।) সপ্তদশী ঋক্

(সজ্জগুরু শ্রীমতিলালের জীবন-ভাষ্য অনুসরণে)

শ্রীঅনিলবরণ তর্কবেদাস্ততীর্থ

অগ্নির্ববে স্ত্রীর্বাধ্যমগ্নিঃ কথায় সৌভগং ।

অগ্নিঃ প্রাবন্মিত্রোত মেধ্যাতিথিমগ্নিঃ সাতো উপস্তুতং ॥ ১৭ ॥

অর্থ—“অগ্নিঃ” (অগ্নি) “স্ত্রীর্বাধ্যমগ্নিঃ” (উত্তম বীৰ্য্য) “ববে” (প্রাণিত হইয়াছিলেন) “অগ্নিঃ” (অগ্নি) “কথায়” (কথ্য নামক ধর্মের জন্ত অথবা অকিঞ্চন ব্যক্তির জন্ত) “সৌভগং” (সৌভাগ্যপ্রদ) “অগ্নিঃ” (অগ্নি) “মিত্রাঃ” (মিত্রদের) “প্রাবৎ” (প্রকৃষ্টরূপে রক্ষা করিয়াছিলেন) “উত” (আরও) “মেধ্যাতিথিঃ” (মেধ্যাতিথি) “ঋষিঃ” (যিনি জ্ঞানাত্মশীলনতঃপর) “অগ্নিঃ” (অগ্নিদেব) “উপস্তুতং” (উপাসনাপরায়ণ জনকেও) “সাতো” (ধনাদি দান করিবার জন্ত) [প্রাবৎ—প্রকৃষ্টরূপে রক্ষা করিয়াছিলেন ।] ॥ ১৭ ॥

সরলার্থ—অগ্নি বীৰ্য্যপ্রদানকারী, অগ্নি সৌভাগ্য প্রদানকারী, অগ্নি মিত্ররক্ষাকারী এবং অগ্নির উপাসনা-কারীদের অগ্নি ধনপ্রদানকারী । এ হেন অগ্নির কাছে ধর্ম তাইতো উত্তম বীৰ্য্য, সৌভাগ্য, মিত্রের নিরাপত্তা এবং ধন প্রার্থনা করিতেছেন ॥ ১৭

বিশদার্থ—বিদ্‌ ধাতুর অর্থ জ্ঞান । বেদ তাই জ্ঞানময় । জ্ঞান নিত্য নবায়মান । ইহা ক্রমবর্দ্ধনশীল । যার অন্তর যত নিখিল, স্বচ্ছ, সুন্দর—জ্ঞানকিরণ তার অন্তরে তত স্পষ্টতরতাবে প্রতিভাত । জ্ঞান তাই আদি-অন্তহীন । এই ষট্‌ত্রিংশৎ মন্ত্রের উল্গাতা ঘোরপুত্র কথ্য ধর্ম—তিনি বলিতেছেন, অগ্নির আবিষ্কারক মেধ্যাতিথি কথ্যধর্ম । মেধ্যাতিথি কথ্যধর্ম আবার কাহাকে নির্দেশ করেন, তাহা এখনও জানা যায় নাই । এইভাবে দেখা যায় কোন ধর্মই জোর করিয়া বলেন না—“আমিই ইহা করিয়াছি, কিম্বা জানিয়াছি”—‘ইতি শুক্রম ধীরাণাম্’—এই তাঁদের বাণী । বেদ তাই অপৌরুষেয় । জ্ঞানও তাই সীমাহীন । এই ঋগ্বেদে আমরা তাহারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাইতেছি । ঘোরপুত্র কথ্যধর্ম অগ্নির নিকট ধনোদ্রোশে উত্তম বীৰ্য্যের প্রার্থী হইয়াছেন—অগ্নিঃ স্ত্রীর্বাধ্যম ববে, এই মন্ত্রে । কেন ? পরবর্তী অংশেই আছে—অগ্নিঃ কথায় সৌভগং । আচার্য্য সামগ্ন ইহার অর্থ করেন—‘সোহগ্নিঃ কথায় মহর্ষিষে সৌভগং শোভন ধনাদিরূপং ভাগ্যং প্রযচ্ছৎ । সেই অগ্নি কথ্য নামক মহর্ষিকে শোভন ধনাদিরূপ ভাগ্য দান করিয়াছিলেন । এই অগ্নিমন্ত্রের উল্গাতা স্বয়ং ঘোরপুত্র কথ্যধর্ম । তিনি অগ্নির নিত্য উপাসক । নৈষ্ঠিক কর্মে জীবন সংযত হয় । সংযমপূত জীবনই বীৰ্য্য ধারণের অধিকারী । উত্তম বীৰ্য্যের ধারণ-সামর্থ্য উত্তম আধারেই সম্ভব । আরও অগ্নির পূজা আরাধনায় অন্তরে যে বিমল আনন্দ অহুভূত হয়, তাহাকেই তিনি পরম ধন বলিয়া মনে করেন এবং বাহিরের উপদ্রব হইতেও নিষ্কৃতি পাওয়ায় নিজেকে অতীব সৌভাগ্যশালী বিবেচনা করেন । অগ্নির রূপান্তরেই তাঁর এই শৌর্ধ্য, বীৰ্য্য এবং সৌভাগ্য—তাই তিনি যেন কৃতজ্ঞ অন্তরে অগ্নির নিকট প্রার্থনা জানাইয়া বলিতেছেন—‘হে অগ্নিদেব, শুধু আমাকেই নহে—আমার মিত্রবর্গকেও তুমি প্রকৃষ্টরূপে বলবীৰ্য্য-সম্বিত করিবার রক্ষা কর । আর মেধ্যাতিথি যিনি মেধার দ্বারে অতিথি তিনিই তোমার আবিষ্কারক তাহাকেও এবং ‘উপস্তুতং’ তোমার উপাসনাপরায়ণ জনদেরও তুমি পরম ধন দান কর ।’ এক কথায়—এই মন্ত্রে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, ষাঁহারাই আচারনিষ্ঠ, সাধনপরায়ণ ও ভগবদ্বিশ্বাসী, উত্তমবীৰ্য্যের অধিকারী হন তাহারাই । হীনবীৰ্য্য মনুষ্য কখনও উত্তম স্বাস্থ্যের অধিকারী হয় না—তাই ঈশ্বরানুগ্রহরূপ পরম ধন হইতেও তাহার বঞ্চিত হয় । ঈশ্বরের করুণারাপি অহর্নিশ বর্ষিত হইতেছে—বীৰ্য্যহীন হইলে তাহা ধারণ করার সামর্থ্য থাকিবে না । ধর্ম তাই দৃষ্টকর্ত্তে বলিতেছেন, বীৰ্য্যশালী হও । ধর্ম কখনও মানুষকে বীৰ্য্যহীন করে না । ধর্ম বলহীনের লভ্য নহে—বলবানেরই প্রাপ্য ॥ ১৭

বর্ষ-প্রশান্তি

শ্রীমৎ স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী

রুদ্রপ্রশান্তিঃ

কো ধীরো ন বিচাল্যতে হিমগিরির্যদবৎ প্রচণ্ডানিলৈঃ
কঃ শাস্তো ন হি লিপ্যতে ঘনঘটালেপৈর্ঘথাস্বরম্ ।
মুক্তে ব্যোমি চ চন্দ্রিকেব রুচিরা কস্য প্রসন্নস্য ভা
বৈশাখেহসিতরুদ্র মেঘপটলে লাস্ত্রঞ্চ কস্ত্যদুতম্ ॥

প্রচণ্ড ঝঞ্ঝায় তুঙ্গ শুভ্র হিমগিরি যেন,
কেবা তুমি বীর, নও বিচলিত, হে বিরূপাক্ষ অঘোর চশমান !
প্রলয়ের ঘনঘটা ছায় যবে এ বিশ্বভুবন,
তার মাঝে কেবা শাস্ত তুমি, দিগম্বর, তৎপুরুষ,
অসঙ্গ মহান্ !

মুক্তব্যোমধ্রাবী চন্দ্রিকার লাবণি রুচিরা,
কার ছায়াভাতি ভালচন্দ্রমার, হে প্রসন্ন সোমার্দ্ধ
মৌলি বামদেব !
কালবৈশাখীর রুদ্রকৃষ্ণমেঘপুঞ্জ মথি,
কেবা তুমি, হে আনন্দী সদ্যোজাত নটরাজ !
দেখালে অদ্ভুত লাস্ত্র তব !

শান্তিবচনম্

শ্বসিতি যদপি ভূতং জীবতন্তস্য শান্তিঃ
শ্বসিতি ন কদা যদ ধূলিবৎ তস্য শান্তিঃ ।
উপরি বিচরতোহধঃ পাতিতস্যাস্ত শান্তিঃ
চিররুচি লসতো বা জীর্ঘ্যতো বাস্ত শান্তিঃ ॥
প্রবলপৃথুগতো বা দান্তিকে দন্তশান্তিঃ
শ্বলিতমৃদুগতো বা দুর্বলে ক্লেব্যশান্তিঃ ।
সুপথকুশলধাম্নে জীবিতস্যাবশান্তিঃ
সুদভিলষিতপুৰ্ত্ত্যে চাত্মনঃ পূর্ণশান্তিঃ ॥

যেখানে যে প্রাণী লইছে নিঃশ্বাস,
তারে দাও শান্তি, দাও শান্তিময় !
প'ড়ে রয় ধূলিরেণু প্রাণহীন,
তারে দাও শান্তি, চিরশান্তিময় !

যেবা উর্দ্ধগামী, যেবা পতিত ধূলায়,
যেবা দ্ব্যতিমান্, যেবা জীর্ণ বিমলিন,
সাবাকারে দাও শান্তি, দাও শান্তিময় !

দম্ভভরে কাঁপাষ যেদিনী—
বলদৃপ্তে দাও দম্ভ শান্তি, দাও শান্তিময় !
পদ্বু কার্ণণ্যকুণ্ঠায়
দুর্বলে রৈ ক্লেব্যপ্লানি শান্তি, দাও শান্তিময় !

উজ্জ্বল যে ধাম মহীরান্
তারি পাহ জীবনেরে, কুশলাধ্বশান্তি, দাও শান্তিময় !
আর, সর্কশান্তি পরিলীমা তোমা ইচ্ছার পূরণে,
পূর্ণ আত্মনিবেদনে, দাও পূর্ণ শান্তি, চির পূর্ণশান্তিময় ।

Peace be unto all beings that breathe,
Peace unto all that lie dead as dust,
Peace unto all that rise above or fall beneath,
Peace unto all that shine, all that rust !
Peace humble the mighty that stalk,
Peace raise the feeble that crawl,
Peace lay, pave, spread, life's worthy walk,
Peace with our own Being and
His will be the crowning all !

নববর্ষের বাণী

মহর্ষি প্রেমানন্দ

আলোর বন্দনা ফলে মরমীর মর্ম্মমূলে
জাগিল যে গভীর ক্রন্দন,
ভূগার অননে হাস, বেদনার তুলিকায়
অশ্রুধারে আঁকে আলিম্পন।
দিগন্তের অন্তরালে সুপর্ণের বিনীর্ণ আভাষ
প্রদোষের কালোছায়ে হতাশাস বিধ্বেরে জানায়,
কালের কল্যাণী সুরে জেগেছে যে মূহুর্ত স্পন্দন।

হিংসার বিবাক্ত বায় বিদম্বিল বিশ্বকায়
প্রজ্বলিত গেছে কাঁদে প্রাণ—
অগ্নির লেলিহ শিখা লিখি কত রক্ত-লিখা
মহাকাশ-তল কবে গ্লান।
অশান্ত ঝড়ার ব্যথা দহমান দীপকের পুরে—
কলুষম আনে বহি মল্লারের শ্রাগ স্নিগ্ধ সুরে।
প্রাণপ্রিয় পরিক্রমে বেদীতলে নিয়ে বলিদান।

শুদ্ধির নবীন সূর্য্যে জাগৃতির মহাতুর্য্যে
বলদৃপ্ত প্রদীপ্ত জীবন—
লজ্জিয়া বন্ধুর পথ চালায় জীবন-রথ
মরুস্থলে উপেক্ষি' মরণ।
ছতবহ কালকুণ্ডে তাওব চলিছে আজো হাস
বর্ষেরে বরণ করি, বান্ধবেরে খুঁজি' নিরালায়
দুঃখের দহন মাঝে প্রশান্তিব করি আবাহন।

ডাক্ দিলো বৈশাখ

শ্রীমুখীর গুণ

দূরে গেলো—উড়ে গেলো দিন মাস এক-বাঁক্ ।
নব-দিন নিয়ে ফের্ হাঁক দিলো বৈশাখ ।
পুরানো এ ধরাতল
হোলো কিরে প্রোজ্জল ;
চমকিত করে চিত পঙ্খার প্রতি-বাঁক্ ;
উদ্দাম বায়ু-রোলে দ্রিমি দ্রিমি বাজে ঢাক্ ;
—ডাক্ দিলো বৈশাখ ।

পঙ্খার যত পাক সবুজে তা ঢেকে যায় ;
শ্রাম-কিশলয়-সাজে শাখী ফিরে শোভা পায় ;
ঝরা পাতা—মরা ডাল—
পুঞ্জিত জঞ্জাল
ঘূর্ণিত-ঘূর্ণিতে খেতে-খেতে ঘুরপাক্
বৈশাখী বহ্নিতে জ্বলে-পুড়ে হোলো খাক্ ।
—ডাক্ দিলো বৈশাখ ।

জীর্ণ যা'—শীর্ণ যা'—দীর্ণ যা'—যতবৎ
উপ্‌ড়িয়ে দিয়ে সবই বৈশাখ গড়ে পথ ।
এক-বাঁক্ নব-দিন
উৎসাহে অমলিন
প্রত্যয়ে-প্রেরণায় ফুঁকারিয়া তোলে শাঁখ ;
ভ'রে তোলে সততায় যত ফাঁকি—যত ফাঁক ।
—ডাক্ দিলো বৈশাখ ।

নোভুনের নান্দীতে যোগ দিতে আয় সব ;
উল্লাসে নেচে চল, নাচে কাল-শৈব
ধ্বংসের—স্বপ্ননেব
ভাঙারী বিশ্বের ;
কাণ্ডারী জীবনের কর্ তা'রে ভুলে জাঁক ;
চলন্ত নৃত্যের তোড়ে রিপুলয় পাক ।
—ডাক্ দিলো বৈশাখ ।

জয় ভারত !

শ্রীদিলীপকুমার রায়

যার প্রসাদে পেলাম জীবন—সাধব জীবন নন্দনে

রক্তকঁটার কান্তারেও উচ্ছলি' তোর বন্দনে ।

কেমন সে-দেশপ্রেমিক যে মা, চায় না প্রেমের আশ্বদান ?

ধিক সে—যে হয় লক্ষ্যহারা, মৃত্যুভয়ে কম্পমান !

আশুন হবে ফাল আমাদের ছাইব গগন জয়রাগে :

প্রাণধরি তোর মস্তে, বরণ করব মরণ তোর ডাকে ।

নই কাপুরুষ, আমরা মাঘের দুঃসাহসী স্রসস্তান

গান গৌরব কীর্তি দেশের, আলাব বাণী দীপ্যমান্

উড়বে যেথাই মা তোর নিশান—বাসবে ভালো দুই নয়ন

“জয় মা ভারত” গাইব যখন—উঠবে কেঁপে তিন ভুবন ।

আশুন হবে……তোর ডাকে ॥

আমরা দেব সব আছতি মা তোর হোমশিখায় স্নেহ,

দৃষ্টি পরম লক্ষ্যে রেখে তোর ক'রে জপ নাম বৃকে ।

দিক্ না হানা সিদ্ধবাণী, লংঘিব এক নিশ্বাসে ;

নই নিয়তির দাস তো, বাঁধন কাটব অভয় উল্লাসে ।

আশুন হবে……তোর ডাকে ॥*

* ইন্দিরা দেবীর “জয় হিন্দ” গানের অনুবাদ—ঐ হবেই পের।

বিবেক-বারতা

শ্রীরাজমোহন নাথ, বি. ই., তত্ত্বভূষণ

বাংলাদেশের নাবী-চরিত্রের বিশেষত্ব বর্ণনায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের উক্তি—“বুক তরা মধু—বাংলার বধু”। খৃষ্টীয় পঞ্চদশশতিকায় বাংলাদেশের স্রবধুনী-তীরে অবতীর্ণ প্রেমাবতার ত্রীকক্ষ-চৈতন্তের স্বরূপ-বর্ণনায় কবি সত্যেন্দ্র . নন্দের উক্তি—“বাঙ্গালী-হৃদয় অগিষা ছানিয়া নিমাই লভেছে কাষা ।”

এখন প্রশ্ন—বাঙ্গালী-বধুর বৃকের মধুর এবং বাঙ্গালীর হৃদয়মৃতের স্বরূপটি কি ?

খৃষ্টীয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতিকায় বাংলাদেশের এক নারী—পাটকেরা রাজ্যের (কুমিল্লা-ত্রিপুরা অঞ্চল) রাজমহিষী—রাণী ময়নামতী বৃকের মধুময় স্তন্যধারা দিখা একমাত্র পুত্র গোপীচন্দ্রকে লালিত পালিত ও বর্ষিত করিয়াছিলেন। সেই গোপীচন্দ্র পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনাধিষ্ঠ মহীপালরূপে যখন যৌবনোচিত নারী ও ঐশ্বর্য-ভোগে মগ্ন মহীপাল, তখন মাতার মধুময় বৃক হইতে বস্ত্রসম ধারা নির্গত হইয়া পুত্রকে নিজহাতে সম্রাসী সাজাইয়া ঘোগী-পাল করিতে বদ্ধপরিকর। উদ্দেশ্য :

“মৃত্যু ত নিশ্চিত বংস ! হবে শাশান ছাই

পরম তত্ত্ব জেনে মাত্র পার হয়ে যাই ।

আমার গুরু গোরখনাথ, চপট গুরু-তাই

গোৰ্খনাথে দিলা শব্দ—বুঝায় ময়না মাই ।

রাজ্য ত্যজ—পাট ত্যজ—ত্যজ হস্তী-ঘোড়া

ময়নামতী বলে পুত্র !—কলির জীবন ধোড়া ॥”

পুত্রবধুগণ, মন্ত্রী-অমাত্য-সভাসদগণ—এমনকি “হয়-হস্তী সবে মিলি করে হা-হা-কার”, কিন্তু বুক তরা মধু—বাংলার জননীর হৃদয় টলিল না—

“যোগ ছাড়ি ভোগরত হৈলে মোর বাছা রে ।

সিদ্ধ নাহি হবে এই জলবিষ কাষা ।

সত্য সত্য বলে বাক্য—মাতা ময়নামতী রে !

মূল হারি লাভ হবে শুধু মাত্র মায়ী ॥”

ফলে মাতার পীড়াপীড়িতে বাধ্য হইয়া—

“রাজ্যপাট পত্নী ত্যজি—ত্যজি ভোগ-বিলাস

গোপীচন্দ্র শব্দ ধরি—গেলেন বনবাস ॥”

সারা বাংলাব গ্রামাঞ্চলের নরনারীরা খৃষ্টাব্দের পঞ্চদশ শতিকায়ও এই—

“ঘোগীপাল ভোগীপাল মহীপাল গীত ।

শুনিয়া সবার চিত্ত হয় আনন্দিত ॥”

—(চৈতন্য ভাগবত)

একই সময় বঙ্গদেশে ‘দম্ভ করি বিষ-হরি পুছে কোনজন’, এবং সেরূপ পূজা অতাপি সারা বঙ্গদেশময় প্রচলিত। অতি প্রাচীন যুগ হইতে বিষহরি মনসার পূজা ও ভাসান-গীত—বাস্তালী হৃদয়ের অমিয়া মন্থনকারী।

স্বর্গের দেবতা শিবের পুত্রী—স্বর্গের দেবী সর্পরাজ্ঞী মনসা মর্ত্যবাসীর দ্বারা পূজিতা হইবার বাসনায ধরার মাহুষ বাংলার বানিয়া শিবভক্ত চন্দ্রধরের দ্বারে তিথারিণী। মানব চন্দ্রধর দেবীর কাতর-প্রার্থনাযও কর্ণপাত করেন না, বরঞ্চ হেমন্তালের গদার আঘাতে “দেবীর ভাসেন কাকালি (কোমর)।” স্বর্গের দেবী প্রত্যাখ্যাতা ও অপমানিতা সাধারণ ধরার মানবীর চেয়েও অধিকতর প্রতিশোধপরায়ণা হইয়া চন্দ্রধরের সপ্ত-পুত্র বধ, চৌদ্দ ডিঙা ধ্বংস করিয়াও ক্ষান্ত হইলেন না। অতঃপর কনিষ্ঠ অষ্টম পুত্র লখিন্দরকে বিবাহের রাজ্যে বাসরশয্যা-ঘবে সর্পদংশনে হত্যা করিয়া নারীত্বের চূড়ান্ত অবমাননা করিলেন;—সদ্য-বিবাহিতা নিরপরাধা বালিকা-বধু বেহলার বুকে বৈধব্যের দারুণ শেল হানিলেন।—“কান্দে সনকাদেবী বধুর গলে ধরি” এবং “বেহলার কান্দনে ঐ যে বৃক্ষের পত্র ঝরে”, কিন্তু তথাপি মর্ত্যের পূজা-তিথারিণী স্বর্গের দেবীর মন টলে না।

বাংলার বধু—বুক ভরা গধু;—বড়ই কোমল, বড়ই স্নিগ্ধ; একটুতেই গলিয়া পড়ে। বাংলার বধু এমন কান্দা কান্দে, যার বেগে বৃক্ষের পত্রও ঝরিয়া পড়ে। কিন্তু উপরোক্ত ময়নামতীর দৃষ্টান্তে দেখা গেছে—বাংলার বধুর বুকে বজ্রও আছে। বাঙ্গালী যেমন কাঁদিতে জানে, তেমনি নাচিতে ও গাইতে জানে—যার বলে “সুফায় স্থানবেহপি শাখা জ্বাঘেরন—পলাশানি প্রেরোহেয়ুঃ” (ছান্দোগ্য ৫।২।৩)—নীরদ বৃক্ষকাণ্ডে শাখা উলগত হয় এবং পত্ররাশি আবিভূত হয়।—মরা গাঙ্গে বান ডাকে, —মরা-হাড়ও প্রাণবন্ত হইয়া উঠে।

তাই সদ্য-বিধবা বাংলার বালিকা-বধু বেহলার প্রতিজ্ঞা—স্বর্গের দেবতা যদি মাহুব হইতে পারে এবং মর্ত্যে নামিয়া মাহুষের মধ্যে ক্রীড়া করিতে পারে, মাহুষও উজ্জান বাহিয়া স্বর্গপুরে গিয়া দেবতার আসরে বসিয়া নিজের বক্তব্য নিবেদন করিয়া স্তুতিচার আদায়

করিতে পারে না কেন? তাই কলার তেলায় স্বামীর মৃতদেহ লইয়া একাকী—

“কান্দে বেহলা সতী রে—বৃক্ষের পত্র ঝরে।

তোমারে লইয়া প্রভো! তাসিতাম সাগরে।”

উদ্ভাল তরঙ্গ ও বহুবিধ বিপদসঙ্কুল খরপ্রোতা পদ্মানদীতে ছয়মাস উজ্জান বাহিয়া মর্ত্যবাসিনী মানবী বেহলা স্বর্গ-শিবপুরে উপস্থিত হন, এবং শিবের নিকট বিচার দিয়া, দেবগণকে সন্তুষ্ট করিয়া মৃত স্বামীর পচা হাড়ে প্রাণ-সংযোজন করিয়া, স্বামী-স্ত্রী যোগী-যোগিনী বেশে আবার মর্ত্যে ফিরিয়া আসেন।

ঋগ্বেদের ভাষায়—“মর্ত্যাসঃসন্ত অমৃতত্বমানন্তঃ” (ঋ. ১।১।১০।৪); বাঙ্গালী হৃদয়ের অমিয়া—‘দেবতা মাহুষ হয়—মাহুষ দেবতা’।

ঐ পঞ্চদশ শতিকাতে আবার বঙ্গদেশের গ্রামাঞ্চলের নরনারী আবাল-বৃদ্ধ সকলে—“মঙ্গলচণ্ডীর গানে করে নিশি জাগরণ।” সর্বমঙ্গলের মাহুল্য-স্বরূপিণী, সর্বার্থ-সাধিকা মঙ্গলচণ্ডী দুর্গার পূজা অতি প্রাচীন যুগ হইতে বাঙ্গালীর জাতীয় সাধন ও উৎসব। শাস্ত্রোক্ত সপ্তশতী চণ্ডীর পাঠ ও বিধিবৎ পূজায় দেবীর কাছে “রূপং দেহি ধনং দেহি যশো দেহি দিবো জহি” বিধান আছে। কিন্তু বাঙ্গালার গ্রাম্য গণ-সমাজ এত জাঁকজমকপূর্ণ পূজার পক্ষপাতী নয়, দেবীকে দূরে কল্পনা করিয়া—দেহি দেহি বলিয়া প্রার্থনা করার বিধানও ভালবাসে না। বাংলার নারী মঙ্গলচণ্ডী দুর্গাকে নিজের কস্তাকপে পালন করেন। বাংলার দরিদ্র গৃহস্থের কস্তার স্ত্রায় এই কস্তাটিকেও বিশ্বস্তর ভূতনাথ স্বামীর ঘরে অন্নবস্ত্রের অভাবে ক্লিষ্টা, সতীনের জ্বালায় জর্জরিতা হইতে স্বামীর রোজগারে অসামর্থ্য, পরন্তু নেশা করার অভ্যাস-বশতঃ সতত গৃহ-কন্দলে অস্থিরা—প্রাণের পুতুলী কস্তাকে বাংলার বধু—নাইওর আনিয়া আটক করিয়া রাখিতে চান—

“এবার আমার উমা এলে, আর উমায যেতে দিব না, বলে বলুক লোকে মন্দ কারো কথা শুনব না।

আসে যদি মৃত্যুঞ্জয়—উমা নেবার কথা কয়

মায়ে ঝিয়ে করব দ্বন্দ্ব জামাই বলে মানব না।”

কিন্তু তথাপি বিবাহের বয়োপ্রাপ্তা বাঙ্গালী কুমারীরা মা-ঠাকুরমা-দিদিমার নির্দেশে মনোমত বর-প্রাপ্তি-কামনায়—এ হেন শিবের পূজা করে—

শিবের মাথায় দিয়া পানী, আমি যেন হই রাজার রাণী
শিবের মাথায় দিয়া মৌ, আমি যেন হই রাজার বৌ।

সর্বগুণসম্পন্ন পুত্রলাভের আশায় বিবাহিতা বধুর প্রার্থনা :

শিবের মাথায় দিয়া-বিদ্বপত্র, আমি যেন পাই রাজপুত্র।

বাঙ্গালী-হৃদয়ের অটল-বিশ্বাস শিবের প্রতি; সর্বস্বাস্থ্য হইয়া চন্দ্রবরের অচলা ভক্তি শিবের প্রতি।—তিনি বিশ্ব-কারণ, বিশ্ব-তারণ, বিশ্বনাশন;—স্বয়ং বিশ্বস্তর। তাঁর এই অবস্থা দেখে বাঙ্গালী গৃহস্থ ভক্ত বলে—“ঠাকুর! তোমার ত বলদ একটি আছেই। কারো কাছ থেকে আর একটি পানে (পণে) এনে একটু চাষাবাদ করতে লেগে যাও। আমিও সাহায্য করিব। তাতে তোমার অন্ন কষ্ট যাবে। আমারও সুবিধা হবে—সমানে কাছে পেয়ে তোমাকে প্রণাম করে কৃতার্থ হতে পারব, আশুতোষ তোমার কাছ থেকে সহজে যথাভীষ্ট বর লাভ করতে পারব।” কি অভূত বাঙ্গালী-হৃদয়! বিশ্বস্তর দেবতাকে “ভিখারীর বেশে নিঃসর কাছে আনিয়া তাঁকে পূজা করে—তাঁর কাছ থেকে বর চায়।

এক যুগে শিব-পুত্র, শিব-বংশজ, শিব-যোগী গোরক্ষ-নাথের নাথযোগী সম্প্রদায়ের ধর্মের ও সাধন ধারার স্রোতে সারা বাংলাদেশ বিপ্লাবিত হইয়া গিয়াছিল; তাই গোরক্ষ-শিষ্য মহীপাল ও ভোগীপালের যোগীপাল হওয়ার গীত শ্রবণে সকলের চিত্তে আনন্দ হইত। “নাথ” শব্দটি নাথু-নাথু বাতু সমুৎপন্ন; অর্থ যাক্সা করা; যাক্সা = চাওয়া এবং দেওয়া—দদাতি-প্রতিগৃহীতি—হুই অর্থেই প্রযোজ্য। ধর্মের যুগেও “ব্রহ্মণো নাথমানস্ত কীরেঃ” (২।১২।৬) ঘরে ঘরে ব্রহ্মের গীত গাহিয়া ভিক্ষাকারী সম্প্রদায় ছিল। পরবর্তী বৈষ্ণবযুগেও সেই ধারার অন্তঃস্রোত রাধাকৃষ্ণের প্রেমাতিনয়ে জাগরুক “গোরখ জাগাই—শিদ্ধাধ্বনি শুনই—অটলা ভিখ আনি দিল”; “কাণে বীচ কুণ্ডল যোগী, গলে বীচ সেলী ঘর ঘর

অলক জাগাই”। সাধারণ পৌরাণিক বিশ্বাসমতে বিষ্ণু স্রষ্টি-পালনকর্তা বলিয়া তিনিই যুগে যুগে জীবরূপে ধরাধামে লোকশিক্ষার্থ অবতাররূপে অবতীর্ণ হন। কিন্তু শিবযোগী নাথ দর্শনমতে শিব একাই স্রজন-পালন ও সংহারকর্তা; এবং তিনি নররূপে প্রকটিত হইয়া যোগী-ভিখারীবেশে মানবকে পরমাত্মার সহিত একত্ব যোগের শিক্ষা দেন। গোরক্ষনাথ স্বয়ং শিবাবতার। যুগে যুগে তিনি নররূপে অবতীর্ণ হন।

বর্ষাগমে আকাশের দেবতা আকাশ উপুড় করিয়া নিজ ভাঙার উজাড় করিয়া বারিধারা বর্ষণ করেন এবং সারা বিশ্বকে তৃপ্ত ও পৃথিবীকে রসবতী ও আবাচা করেন। আবার সূর্যের রশ্মিযোগে সেই রসধারা আকর্ষণ করিয়া আকাশে বাষ্পাকারে তুলিয়া নেন। এইরূপ দেওয়া এবং নেওয়ার পর বিশ্বনাথের দান—ভাঙার হইতে যা অবশিষ্ট ত্যক্ত হইয়া রহিল—“তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা”। বিশ্বনাথের সেই ত্যক্তাংশটুকুই জীব নিজের প্রাপ্যধন ভাবিয়া ভোগ করে। বাঙ্গালী-হৃদয় বেদ-বেদান্তোক্ত এই সাধনধারাকে সহজভাবে জীবনবেদরূপে গ্রহণ করিয়াছে।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতিকায় যখন ইসলাম ধর্মের প্রভাবে বঙ্গদেশের ধর্ম ও সমাজজীবনে নানাপ্রকার বৈগুণ্য-স্রষ্টি হওয়ার ফলে উপরোক্ত সহজ সরল জীবনবেদের অমুঠানে শিথিলতা দেখা দিল, তখন শাস্তিপুরের শিবাবতার অদ্বৈত-তত্ত্বজ্ঞানী অদ্বৈত প্রভুর হস্তারে জগন্নাথ মিশ্রের ঔরসে ও শচীদেবীর গর্ভে বিশ্বস্তর নামক পুত্র উপজাত হন। এই বিশ্বস্তর বুঢ়া মাতা ও বালিকা স্ত্রীকে কাঁদাইয়া শিবপন্থী দশনামী গিরি-সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসীর নিকট সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত হন। তিনিই নিমাই সন্ন্যাসী, শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য, প্রেমাবতার গৌরঙ্গ প্রভু, শ্রীকৃষ্ণের অবতার। গৌরতত্ত্ব বিশ্লেষণে বলা হয় প্রকৃতিরানীর জ্যোতির্শ্রম্য বাহ্যিক গৌরবর্ণ দেহের মধ্যে লীলাকারী কৃষ্ণবর্ণ পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অবস্থিতি।—“দেবতা ভিখারী হষে ফিরে ঘারে ঘারে; কাতরে মিনতি করে কিনি লহ মোরে।” বাঙ্গালী-হৃদয়ের অমিয়া বাণীর প্রতি ভারতাত্মার চৈতন্য উদ্বন্ধ

করিয়া আচণ্ডাল-ব্রাহ্মণকে একই প্রেমের স্ত্রে বাঁধিবার
জন্ত তাঁর এই লীলাবতার।

খৃষ্টীয় উনবিংশ শতিকায় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে
আবার ভারতের ধর্ম ও সমাজজীবনের চিন্তা ও সাধন-
ধারার গ্লানি উপস্থিত হওয়ায় কলিকাতার সিমুলিয়া
অঞ্চলের এক ধনাঢ্য ও ইংরাজী-শিক্ষিত আইনব্যবসায়ী
ভূগোচরণ দত্ত যৌবনে পঁচিশ বৎসর বয়সে গোপা হেন
যুবতী পত্নী ও রাহুল হেন শিশুপুত্র বিশ্বনাথকে
কাদাইয়া গোপনে কাশীর বিশ্বনাথের মন্দিরে মন্তক
মুণ্ডাইয়া সন্ন্যাসী-যোগী হইলেন। বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র
বিশ্বনাথের পত্নী ভুবনেশ্বরী দেবী বাঙ্গালী বধূর চিরা-
চরিত প্রথামতে শিবের মাথায় বিদ্বপত্র দিয়া রাত্রিপুত্র
হেন সন্তান কামনা করায় স্বয়ং শিব আসিয়া তাঁহার
গর্ভে উপজাত হইলেন—পুত্রের নাম রাখা হইল
নরেন্দ্রনাথ।

হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামের ব্রাহ্মণপত্নী
চন্দ্রমণি দেবী গ্রামস্থ নাথ-যোগীপাড়া দিয়া যাইবার
সময় যোগী-গৃহস্থের বাড়ীর মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ
হইতে প্রত্যক্ষভাবে জ্যোতিঃ নির্গত হইয়া আসিয়া
তাঁহার উদরে প্রবেশ করিল; স্বপ্নে নয়, প্রত্যক্ষভাবে
—প্রদোষের স্তিমিত আলোতে। চন্দ্রমণি স্বচক্ষে
দেখিয়া চাৎকার করিয়া উঠিলেন।

যথাকালে চন্দ্রমণির গর্ভে জন্মিলেন হরিহর রূপে
গদাধর। জন্মরামবাটা গ্রামের এক ব্রাহ্মণকন্যা
সারদামণি বাঙ্গালী কুমারীর চিরাচরিত প্রথামত
শিবের মাথায় পানী ও মৌ দিয়া মনোমত বর প্রার্থনা

করার ফলে লাভ করিলেন শিবজ্যোতিঃসমুদ্ভূত
জগৎভোলা, আপনভোলা জামাই। বাঙ্গালী গৃহস্থ
রমণীর শারদীয় পূজার আগমনী সঙ্গীত “সোনার
ভগ্নী গোঁরা যে আমার, ধানডু পাগল জামাই তোমার”
—কথা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হইল। গদাধর
হরিহর রামকৃষ্ণ ও সারদেশ্বরীর দম্পতিজীবন অর্ধ-
নারীশ্বর-জীবন,—বাহ্যিক ভোগী-জীবনের মুখোশ, অন্তরে
উদাসীন-উন্মত্ত যোগী-তপস্বিনীর জীবন।

রামকৃষ্ণ-সারদেশ্বরীর মানসপুত্র তথা শিষ্যপুত্ররূপে
সমাগত হইলেন বিশ্বনাথ-ভুবনেশ্বরীর ঔরস-গর্ভজাত—
নরেন্দ্রনাথ। পরমহংসদেব বলিলেন “অরে! নরেনের
নিন্দা করো না, করলে শিব-নিন্দা করা হবে; সে
সাক্ষাৎ শিব।” নরেন্দ্রনাথ উত্তরকালে বিবেকানন্দ
= তাঁর রুদ্রবাণী = “হে ভারত। তুলিও না তোমার
আদর্শ সর্বভ্যাগী উমাপতি শঙ্কর”—সেই বাঙ্গালী-
হৃদয়ের অগিয়া এবং ভারতাত্মার চিরন্তন বিবেক-বাণী।
আবার সেই সর্বভ্যাগী উমাপতি শঙ্কর—বিশ্বনাথ—
বিশ্বস্তর—আধুনিক যুগের পাশ্চাত্য শিক্ষিত—নরবপু
ধারণ করিয়া ভিখারীর বেশে ফিরে ঘরে ঘরে, আর
রুদ্রবাণী ঘোষণা করে—

“বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি’ কোথা খুঁজিছ দৈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেই সেইজন সেবিছে দৈশ্বর।”

তাই ত বাঙ্গালীর দর্শন—

দেবতা মাহুব হয় মাহুব দেবতা,
দেবতা ভিখারী হয় ভিখারী দেবতা।
ভারত-আত্মার এই বিবেক-বারতা ॥



ডাইনী

শ্রীমতীল চৌধুরী

ঘুঁটকেউলা বুড়ি-ই.....

ছেটি ছোট ছেলেমেয়েগুলো দৌড়ে পালায়—ফুটপাথ থেকে রাস্তায়। একটা সরু গলির মুখে এসে লুকোষ—হাঁপায় জিব বার করে। ছোট ছোট বুকগুলো ওঠা-নামা করে।

সবচেয়ে ছোট মেয়েটা—কণু, ভয়ে শীর্ণ হয়ে গেছে। ফ্যাকাশে ছোট দেহ নীলবর্ণ।—আমার বড্ড ভয় করচে দিদি।

—ভয় কি রে? যথাসম্ভব নিজেকে সামলে বলে—আর তো ধরতে পাচ্ছে না।

বাচ্চাগুলো একটু দম নিয়ে আবার এগোয় গুটি গুটি। গলির মুখে লাল দোতলা বাড়ীর আড়াল থেকে উঁকি দেয় পাশের ফুটপাথে—যেখানে ঘুঁটকেউলী বুড়ি পুরাণ আন্তরখপা দেওয়াল থেকে ঘুঁটে ছড়াচ্ছে। বুড়ি নিজের মনে কি সব বিড়বিড় করছে। এতদূর থেকেও বাচ্চা-গুলোর নজর এড়ায় না।

—বুড়ি মস্তুর পড়চেরে! সাহু একটা লুপুট ছেলেকে চিম্টি কেটে বলে।

—এই, চিম্টি কাটলি কেন? মোটাসোটা ছেলেটা সাহুকে ধাক্কা দেয়।

লেগে যায় হুঁজনের লড়াই! কেউই ছেড়ে কথাবলার পাত্র নয়। হাতাহাতি করতে করতে হুঁজনে হুঁজনকে জড়িয়ে ধরে ধলতান্ডি স্তর করে, শেষে পপাত ধরনীতল। ঘুঁটকেউলী বুড়ির অস্তিত্ব ওরা ভুলে গেছে। লড়াই যখন বেশ জমে উঠেছে তখন মিসু হঠাৎ টেটিয়ে ওঠে—এই, ঘুঁটকেউলী বুড়ি আসচে রে!

মোশম ওয়ু! তড়িৎগতিতে ওরা হুঁজনে মারপিট ছেড়ে পালায় গলির মধ্যে। মিসু হাততালি দিয়ে শুঁটে। হেসে গড়িয়ে পড়ে।

বুড়ি ঘুঁটে ছাড়াতে ছাড়াতে ওদের হাততালি আর হাসির শব্দে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়। জীর্ণ খুস্তি হাতে কমজোরী বাঁকা কোমর সোজা করে দাঁড়ায়। তাকায় গলির দিকে। ঝাপসা চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে। খানিক সেদিকে তাকিয়ে থেকে বুঝতে পারে ছেলেমেয়েগুলো

ওকে দেখেই হাসছে, হাততালি দিচ্ছে। বুড়ির বলিরেখাকীর্ণ তোবড়ানো মুখে এক টুকরো হাসি ফুটে ওঠে। স্নেহভরা চোখে তাকিয়ে থাকে শিশু-গুলোর দিকে।

কণু বুড়িকে দেখে চমকে ওঠে! বুড়ি অমন করে তাকিয়ে আছে কেন? ফ্যাকাশে মুখ বিবর্ণ হয়ে ওঠে ভয়ে। গলা শুকিয়ে উঠছে, মুখ দিয়ে কথা সরছে না। —দিদি—বলে মিসুর কোমর জড়িয়ে কাঁপতে থাকে।

—কি হ'ল রে? মিসু তাকায় ঘুঁটকেউলী বুড়ির দিকে। বুড়ি ওদের দিকেই তাকিয়ে আছে। মুখটা কেমন বিকৃত! তাড়াতাড়ি কণুর বুকে থুথু দিয়ে দেয়। বুকে থুথু দিলে নাকি ডাইনীরা রক্তপান করতে পারে না। বুড়ির দিকে আর একবার তাকিয়ে কণুকে বুকে চেপে ধরে দৌড় দেয় বাড়ীর দিকে।

ছেলেমেয়েগুলোকে দৌড়তে দেখে আরও একটু হাসে বুড়ি। হাতের গোবরমাখা ভাঙ্গা খুস্তিটা দিয়ে শুকনো ঘুঁটে ছাড়াতে ছাড়াতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

ডাইনী! ঘুঁটকেউলী বুড়ির আড়ালের নাম। বাচ্চা থেকে বুড়োরা সবাই বলে ও নাকি ডাইনী! মেয়েমহল আর একটু বেশি। তারা বলে—বুড়ি ‘ডান বিছায়’ পারদর্শিনী। গোরু, মোষ, ছাগল তো আছেই, পেলো মানুষের রক্ত পর্যন্ত ও পান করে। ডাইনীর নজর থেকে বাঁচতে হলে বুকে থুথু দিয়ে ‘তুতু’ করতে হয়। তাহলে আর ভয় থাকে না। ছেলেমেয়েদেরও তাই শিখিয়েছে।

বুড়ির আড়ালে বললে কি হবে, এ কথা ওর অজানা নয়। কেমন করে কোথা দিয়ে যে কানে এসেছে কথাটা তা আর অরণ নেই। তবে ওর ছায়া যে বিঘাত আর উপস্থিতি যে নিদারুণ অমঙ্গল স্চিত করে তা বোঝে বুড়ি। তাই অধিকাংশ সময় লুকিয়ে থাকে। এমনকি যে বস্তিটায় আজ পঁচিশ বছর বাস করছে সেখানের অজানা ভাড়াটেরা ওকে কোন শুভ কাজে ডাকে না। সবাই ভয় করে—ঘৃণা করে। পাছে তাদের কোন অমঙ্গল হয় এই ভয়ে।

সেদিনের রাতে আজ ঘুঁটকেউলী বুড়ি—ডাইনী।

অবাক হয়ে ভাবে বুড়ি। এক যুগ ধরে ‘ঘুটকেউলী বুড়ি’ নামে পরিচিত হয়েছে সে। নিজের নাম যে একদিন রাখা ছিল ভাবতে কেমন অবাক লাগে। আরও অবাক লাগে—ডাইনী বলে কেন ওকে! কোন সহস্র পায় না।

ডাইনীরা তো শুনেছে জীব-জন্তুর রক্তপান করে। কিন্তু কৈ, ও তো সে রকম নয়, তবে কেন লোকে অমন বলে?

বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলোকে কত ভালবাসে বুড়ি তা কেউ বোঝে না। তাদের ধারণা, ও বুঝি কাউকে ভালবাসতে পারে না। ওর চোখের দৃষ্টিতে, বুকের নিঃশ্বাসে ছড়িয়ে পড়ে বিষ। এ যে কত বড় মিথ্যা তা বোঝাবে কি করে?

বাচ্চাগুলোর মধ্যে হারানো লখিয়াকে খুঁজে পায ও। মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে ওদের নিজের বুক জড়িয়ে ধরে। আদরে আদরে ভরিয়ে দেয়। কিন্তু সাহস পায না—যদি অন্য কিছু ভাবে?

লখিয়া। চোখের সামনে ভেসে ওঠে ছোট ছোট গোলাপী আভা নরম ছ’খানি হাত। গলা জড়িয়ে ফিক্ ক’রে হেসে আধো গলায় বলত—নানি। বুড়ি ওকে বুক চেপে ধরে অজ্ঞপ্ত চুমো একে দিত।

আজও স্পষ্ট মনে পড়ে লখিয়ার জন্মলগ্ন। এই বস্তিরই একটা ঘরে শকুন্তির পেট থেকে পড়ল ধবধবে একমাথা কালো চুল একটা শিশু। ধাই টেঁচিয়ে বলল—মেয়ে হয়েছে! চমকে উঠেছিল রাখা! শকুন্তির মা—শিশুটির নানি—দিদিমা।

চমকবারই কথা! মেয়ে হয়ে জন্মানো যে কতবড় অভিশাপ তা বুঝেছে রাখা হাড়ে হাড়ে।

অতীত উঁকি দেয়।

মঙ্গল সিং—একটা দুঢ়-মাংসপেশী ঝুঁ জোয়ান মরদ। সুদূর কোড়ারমার এক গ্রাম্যবধু রাখা, মঙ্গল সিংয়ের সাথে কলকাতায় ঘর করতে এলো। এই বস্তিটা তখন ছিল হোগলাবন। গঙ্গার যে দিকটায় এখন বড় বড় বাড়ী উঠেছে ওখানেই ছিল ওদের বস্তি। কুলিবস্তি। মাথা নীচু একটা অপরিচর নোংরা ঘরে এসে উঠল একদিন ছ’জনে।

মঙ্গল সিং কাজ করত পোর্ট কমিশনারে। খালাসীর কাজ। সময় কাটত না রাখার। দেখতে দেখতে বছর ঘুরে গেল। পরিবর্তন এলো ওদের সংসারে। রাখার আজকাল কাজ অনেক। অবশ্য সন্ধ্যা কোলে আসা ছেলেটাকে নিয়ে। তবে বেশি মায়া বাভায় নি। পরেরটা আসার ক’দিন পর বিদায় নিয়ে গেছে এই পৃথিবী থেকে। আবার এসেছে—আবার গেছে। একটার স্থতি মুছে যাবার আগে আর একটা। এভাবে পাঁচ-পাঁচটা ছেলে গিয়ে এলো শকুন্তি। শকুন্তি আসার আগে কালীঘাটের কালীমাই-এর কাছে মানত করে এসেছিল রাখা। মানত ফলেছিল।

কিন্তু মরা-হাজার সংসারে এই ব্যতিক্রম বুঝি যমরাজের মনঃপুত হয়নি। তাই বছর না ঘুরতে বজ্রাঘাত হল রাখার সংসারে। জাহাজে মাল খালাস হবার সময় বস্তাচাপা পড়ে মারা গেল মঙ্গল সিং।

অসহায় রাখা শিশুকন্ঠা শকুন্তিকে নিয়ে ভেসে বেড়ালো জীবন-সংগ্রামের অনেক চেউষের দোলায়। শেষে ঠেক খেল এই বস্তিতে।

দেখতে দেখতে অনেকগুলো বছর কেটে গেল। শকুন্তির দেহে নামল যৌবনের ঢল। পাঁচজনের কাছে হাত পেতে মেয়েকে পাক্স করল রাখা।

একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে নোতুন দিনের আশা বুঝি উঁকি দিয়েছিল। অবশ্য মেয়ের কাছে কোন প্রত্যাশা করেনি। গতর থাকলে ছ’মুঠো ভাতের অভাব হবে না। কর্তব্য সম্পাদনের আনন্দে আগামী দিনের নোতুন ছবি একেছিল কেবল। কিন্তু সে ছবি যে জলের নিছক আঁক তা কি জানত রাখা?

দিনের পর রাত রাতের পর দিন যেমন স্বাভাবিক; তেমনই স্বাভাবিক ভাবে মাতৃহৃদয়ে এলো শকুন্তি। তবু একবার বুক কেঁপে উঠল রাখার। ঘরপাড়া গল্প—সিঁড়রে যে ঘর দেখলে ভয় পায। রাখার ভয়ও তাই বুঝি অমূলক নয়! মানত করল আবার কালীমাই-এর কাছে।

কিন্তু লখিয়া যখন এই নোতুন পৃথিবীতে এলো

বিষয়ের নিঃশ্বাস ফেলল রাধা। চোখের সামনে একে একে দুর্যোগপূর্ণ দিনগুলো উঁকি দিবে গেল।

বিধিলিপি খণ্ডায় কার সাধ্য! শকুন্তি আঁতুরঘর থেকে বেকলো বাঁশের চার-পাইয়ে। অসহায় শিশু লখিয়া তখন ভেজা কাঁথায় অবহেলায় পড়ে ঘুমুচ্ছে নিশ্চিন্তে।

কঠিন দায়িত্ব রাধার। মা-মরা শিশুটাকে বাঁচিয়ে তুলতে হবে। কিন্তু বাঁচাবে কি করে? নিজের বুক তো দুধ নেই এক ফোঁটা। তবু বাঁচল লখিয়া—বাঁচল কালীমাষেব রূপায়।

এক সময় হামাগুড়ি ছেড়ে পাষে হাঁটতে শিখলো লখীয়া। রাধার কাজ বাড়ল। গরু দেখার ক্ষুদ্র রাখল একটি লোক। নাতনীকে নিষে ক্রোড়ে যায় দীর্ঘ দিনগুলো।

কাল মহামারী লেগেছিল কলকাতায়। বস্তিকে বস্তি উজোড় হয়ে যাচ্ছিল। ভীক হুক হুক বৃকে মহামারী বাঁচ থেকে সযত্নে লাখিবাকে আগলে রাখল রাধা। কিন্তু ক'দিন?

এক দারুণ দুর্যোগের বাস্তবে কঠিন প্রতিজ্ঞা করল রাধা। বিধিলিপির সাথে মোকাবিলা করতে হবে। ঘন ঘন বসি করে ভিজিয়ে দিচ্ছে রাধার কাপড়-চোপড়। চোখ দুটো ঘোলাটে হয়ে আসছে লখিয়ার। নিঃশ্বাস হাল্কা—স্থির।

স্থির হয়ে গেছে রাধা, জীবন সংগ্রামের কঠিন আঘাত খেতে খেতে। একে একে অনেক চেনা মুখ বিস্মৃতির ছায়ায় ম্লান হয়ে গেছে। স্পষ্ট কেবল লখিয়া। আজও ওর 'নানি' ডাক কানে বাজে।

ঘুটের ঝুড়ি কাঁখে গলির দিকে তাকায় রাধা। সন্ধ্যা ঘনিষে আসছে। ছেলেমেয়েগুলো ঘরে চল গেছে। হঠাৎ মনে হয়—বাচ্চাগুলো। ঘুটকেওলী বুড়ি না বলে যদি নানি বলে ডাকত—

চোখ ঝাপসা হয়ে আসে রাধার। একটা অলক্ষণে ছায়া নড়েচড়ে ওঠে।—না, না—ওবা ঘুটকেওলী বুড়িই বলুক। আহা! বড ভালবাসে বাচ্চাগুলো। মনে পড়ে হাসপাতাল থেকে বাড়ী ফিরল যখন রিক্সায় তখন

ফুটপাথে খেলা করছিল ওরা। বস্তির দরজায় রিক্সা থামার সাথে সাথে ছুটে এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। ওদের চোখের ভাষা রাধা পড়তে পেরেছিল। আনন্দে বৃকের রক্তে মাতন লেগেছিল। ওকে ভয় পেলেও ভালবাসে ওরা।

আজ ক'দিন কেন যেন রাধাব মনে উঁকি দিচ্ছে লখিয়া। এতদিন হয়ে গেল তবু মায়ী কাটাতে পারলো না। চোখ ফেটে জল আসতে চায়। কিন্তু পোড়া চোখে জল নেই। শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে সব অমুভূতি। কেবল একটা জালা অমুভব করে চোখের কোণ দুটোয়।

সকাল থেকে অনেকবার ঘর-বার করেছে রাধা। খুজছে শিশুগুলোকে। কিন্তু কাউকে দেখেনি। মন আনচান করে ওদের দেখার আশায়।

ঘর থেকে বেরিয়ে নজর পড়ে ও ফুটপাথে। মিহু আর রুণু স্টেশনারী দোকানে কি কিনতে এসেছে। বৃকের হাহাকার বেড়ে যায় রাধার। সন্তর্পণে এগিয়ে গিয়ে রুণুকে ধরে ফেলে। রুণু বুড়িকে দেখে হিম হয়ে যায়। রাধার ফোঁকলা দাঁত আর বলিরেখাজীর্ণ মুখে তৃপ্তির একটা হাসি ফুটে ওঠে। বলে—নানি বোল্।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় মিহু হাঁ করে তাকিয়ে থাকে বুড়ির চৌল খাওয়া কদর্য মুখের দিকে। রুণু হতবাক! বুড়ি ঝাঁকি দেয় রুণুকে—নানি বোল্ বচ্চা, নানি—নানি—নানি—রাধার কণ্ঠে করুণ আকুতি।

রক্তশূণ্য রুণুর চোখ দুটো ঘোলাটে হয়ে আসছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে।

—একবার নানি বোল্। হাঁ-হাঁ নানি—

চিংকার করে কেঁদে ওঠে রুণু। স্টেশনারী দোকানের লোকটা ছুটে আসে বুড়ির রকম-সকম দেখে। ধমক দিয়ে সরিয়ে দেয় ওকে। মিহুর সন্নিবেশে। রুণুর বৃকে খুঁ দিয়ে কোলে করে দৌড় দেয় গলির দিকে।

দোকানদার অকণ্ঠ্য ভাষায় গালমন্দ দেয় রাধাকে।

ওর কিন্তু নজর নেই সেদিকে। মিহুর গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকে একদৃষ্টে।

রুণু সেই রাত থেকে জ্বরে বেহ'স। ভুল বকছে—

মা ডাইনী আসছে। আমার বড় ভয় কছে। অচেতন হয়ে পড়ে।

ডাক্তার এসে মত দিয়েছেন—ভয়ে নার্ভাস হয়ে জবটা এসেছে। রুগ্ন মা-বাবার চোখে ঘুম নেই। রাতের পর রাত জেগে কাটাচ্ছেন মেয়ের শিয়রে।

খবরটা ডালপালা গজিয়ে ছড়িয়ে পড়লো পাড়ায়। সবাই কেপে উঠলো খুঁটকেউলী বুড়ির ওপর। তরুণ ছেলের দল আর এক কাঠি উপরে। ওরা বস্তি চড়াও হয়ে ধমক দিয়ে গেল। শেষে পুলিশের ভয়ও দেখিয়ে গেল।

রাধা হতবাক! কি অপরাধ তার বুঝতে পারছে না। মেয়েটার মধ্যে ওর হারানো লখিম্মার আদ পাখ। কতদিন লখিম্মাকে আদর করেনি—তাই আদর করতে গিয়েছিল। শেষে নিজেই অপরাধী হল! ভালবাসাও অপরাধ?

নিজের ওপর কেমন সন্দেহ হল। মেয়েটার জ্বরের সাথে ওর কি তবে কোন সম্পর্ক আছে? তা না হলে অমন ভুতুড়ে জ্বরইবা আসবে কেন? কোন জ্বাব খুঁজে পায় না রাধা। শিরায় উপশিরায় একটা হিম শ্রোত বধে গেল যেন হঠাৎ। তবে কি সত্যিই ও ডাইনী?

সারাদিন হটকট করছে রাধা। সন্ধ্যার অন্ধকারে এসে দাঁড়াল রুগ্নদের গলির মুখে। বাজীর সামনে আধ খোলা জানলা দিয়ে উঁকি দিল ভিতরে। রোগশয্যায় পড়ে আছে রুগ্ন। বাজীর ছেলেমেয়ে আর বড়রা বসে আছে চারপাশে। রাধা অপলক তাকিয়ে থাকে সেদিকে।

হঠাৎ কার নজরে পড়ে রাধা। চৌচিমে ওঠে একজন। রুগ্ন বাবা বেরিয়ে আসে। রাধাকে দেখে থমকে দাঁড়ায়।—তুমি?

সন্ধিৎ কেবে রাধার—দেখতে এলুম বাবু। খোকী আমার নাতনীর মত।

সমস্ত সংখ্যমের বাঁধ ভেঙ্গে যায় রুগ্ন বাবার। কাতর মিনতি করে, বুড়ি আমার মেয়েটাকে নিও না। তোমায় অনেক বকশিস করব। পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বুড়ির হাতে গুঁজে দেয়।

চমক ভালে রাখার। মাথার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করে ওঠে। পাখের তলার মাটি বুঝি সরে যাচ্ছে। প্রাণ-পাণে প্রতিবাদ করে বলে—না, না বাবুজী আমি ডাইনী নই, আমি নানি।

সারা গায়ে অসহ্য ব্যথা। মাথা তুলতে পারে না রাধা। মাথাটা ঘুরে পড়ে গিয়েছিল কাল। কারা যেন দিয়ে গেছে মনে নেই। রুগ্ন বাবার কথাগুলো কানে বিঁধছে।

স্বতির রোমন্থন করতে করতে ক্লান্ত রাখার চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। লখিম্মা হামাগুড়ি দিতে দিতে উঠে দাঁড়িয়েছে। টলমল পায়ে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসছে রাখার দিকে। মাঝে মাঝে কুকি দিয়ে উঠছে। হাতের নাগালে এসে লখিম্মার মধ্যে রুগ্নকেই স্পষ্ট দেখল রাধা। ছ' হাতে বুকে টেনে নিতে গিয়ে তল্লাভাবটা কেটে গেল।

লখিম্মা তবে পালায়নি! রুগ্ন রোগকাতর মুখটা মনে পড়লো। মেয়েটার জ্বর বড় চিহ্নিত হয়ে পড়েছে রাধা। মনে মনে ভাবে—কেউ যদি ওকে একবার কালীমাইয়েষ মন্দিরে নিয়ে যেত—মানত করে আসতো। কিন্তু উপায় নাই। দেওয়ালে ঝোলান বিবর্ণ কালীর মূর্তির দিকে চেয়ে প্রার্থনা করে—মা, ওকে ভাল কবে দাও—আমায় তুলে নাও।

রাধার মানত ফলেছে।

ক'দিনের বেঘোর-বেহুঁস তাবটা কেটে গেছে। চোখের দৃষ্টি স্বচ্ছ। রুগ্ন মা-বাবা হাঁপ ছাড়লেন। ডাক্তারের মুখে গর্বের হাসি। মিহু নাচতে নাচতে পথে বেরুল অনেকদিন বাদে।

ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী কখনও রুগ্ন বাবা, কখনও মিহু রুগ্নকে নিয়ে বেড়াতে বেবোয়। সেদিন সকালে মিহুর কোলে চেপে কণু বেড়াতে বেরিয়েছে। আগুরখলা ভাঙ্গা দেওয়ালটার পাশে অনেক লোক জমায়েত হতে দেখে মিহু এগোয়।

সাহুকে ভিড়ের মধ্য থেকে ছুটে আসতে দেখে মিহু জিগ্গেস করে—কি হয়েছে রে সাহু? অত ভিড় কেন?

বঙ্কিমবান্ধব অক্ষয়চন্দ্র

শ্রীঅক্ষরচন্দ্র সরকার

বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সৌহার্দ্য, প্রীতি, মৈত্র্য যথেষ্ট ছিল, যদিও উভয়ের বয়সের পার্থক্য আট বৎসর। বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৩৮ এবং অক্ষয়চন্দ্র ১৮৪৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ‘সমসাময়িক’ বা ইংরাজী ‘contemporary’ শব্দের অর্থ ঠিক বৃত্তিতে পারা যায় না; কবীন্দ্র রবীন্দ্র কি আমাদের সমসাময়িক? তিনি আগার অপেক্ষা ৩০।৩৫ বৎসরের বড় অথচ আমি তাঁহাকে বহুবার দেখিয়াছি। স্মৃতরাং রবীন্দ্রনাথ ও আমি সমসাময়িক ব্যক্তি বলিলে ভুলই বলা হইবে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ও অক্ষয়চন্দ্রকে অনান্যসে সমসাময়িক ব্যক্তি বলা যাইতে পারে—কেন-না তাঁহাদের বয়সের পার্থক্য মাত্র আট বৎসর। উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল, যেন তাঁহারা সমবয়সী বা সতীর্থ প্রতিবেশী। তাঁহাদের বয়োপার্থক্য থাকার সত্ত্বেও কিরূপে এতটা হৃদয়তার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহাই আমাদের আলোচনার বিষয়।

১৮৬৮ সালে বি. এল. পাশ করিয়া অক্ষয়চন্দ্র বহরমপুরে ওকালতী করিতে যান। তখন তাঁহার পিতা গঙ্গাচরণ সরকার মহাশয় বহরমপুরের সদর ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন।

অক্ষয়চন্দ্রের বহরমপুরে যাওয়ার কিছুদিন পরে বঙ্কিমচন্দ্র অন্ততর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া বহরমপুরে যান। বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত অক্ষয়চন্দ্রের প্রথম পরিচয় হয় এই বহরমপুরে। অবশ্য ইতিপূর্বে প্রেসিডেন্সী কলেজের আইনের তৃতীয় শ্রেণীতে বঙ্কিমচন্দ্র অক্ষয়চন্দ্রের সহাধ্যায়ী ছিলেন, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র কোন সহাধ্যায়ীর সঙ্গে বাক্যালাপ করিতেন না। একসঙ্গে আইনপড়া সম্বন্ধে অক্ষয়চন্দ্র তাঁহার ‘পিতাপুত্র’-এ লিখিয়াছেন :

বঙ্কিমচন্দ্রকে আমাদের সহাধ্যায়ী পাইয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিলাম। কিন্তু এই গৌরবে একটা কিছু পড়িল। এখন যেখানে সিটি কলেজ, তাহার পশ্চিমদ্বারের তেতলা বাড়ী হইতে অর্ধাং আপনার বাসাবাড়ী হইতে আরদালিকে দিয়া ছাতা ধরাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজের আইন শ্রেণীর গ্যালারিতে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। (এই গ্যালারি হিন্দু স্কুলের অন্তর্ভুক্ত পশ্চিমদ্বারে অবস্থিত কলেজ স্ট্রীটের ওপর একতলা ঘরে বহুদিন ছিল; আজ দুই বৎসর হইল এই ঘর ভাঙ্গিয়া সেই জায়গায়

—বুটকেউলী বুড়ি মরে গেচে রে। এই মাস্তর বার করল।

—এ্যা! সত্যি? মিছা বিস্মিত প্রশ্ন করে।

—হ্যারে সত্যি। ওদের ডেকে আমি গে—বলে শাহু গলির দিকে দৌড়ল।

মিছা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

—দিদি, আমি দেখবো বুড়িকে।

চমকে ওঠে মিছা!—না-না, তোমায় আর দেখতে হবে না। চল বাড়ী যাই।

—না, আমি দেখবো। বায়না ধরে রুণু।

—শেষেতো আবার ভয় পাবি, তখন আমায় বকুনি খেতে হবে।

—না দিদি, ভয় পাব না—চল।

মিছা গুটি গুটি এগোয় ভিড়ের দিকে। রুণু বলে—দিদি, বুকে থুথু দিবি না?

—মরে গেলে তো আর রক্ত খেতে পারে না—থুথু লাগবে না! বিজ্ঞের মত বলে মিছা ভিড় ঠেলে এগোয়।

খাটের কাছে পাড়ার প্রায় সব ক’টা ছেলেমেয়ে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। মিছা খাটের সামনে এসে দাঁড়াল।

বুড়ির ভয়ংকর মুখ যা পাড়ার ছেলেমেয়েদের কাছে ছিল ভয়ের, তা আজ কেমন যেন করুণ। কৃপিত কিছু স্পর্শ আছে হৃদয়ে।

মিছার কানের কাছে মুখ এনে রুণু বলল—দিদি, বুটকেউলী বুড়ি খুব ভাল, নয়? বুড়ির প্রাণহীন দেহের দিকে তাকিয়ে আবার বলে, আমার আর ভয় করচে না।

সুন্দর উচ্চ অট্টালিকা হইয়াছে, উহাও এখন হিন্দু স্কুলের সামিল। সুন্দর, সুশ্রী গঠন, পাতলা-পাতলা দেহ, উন্নত নাসিকা, উজ্জল চক্ষু, চোঁটের আশে-পাশে একটু একটু হাসি আছে। কিন্তু সেই হাসির সঙ্গে আছে প্রবল গরিমাস্তান। আসেন, এক পার্শ্বে বসেন, চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন—কাহারও সহিত কথা কহেন না। তাৎকালিক সংস্কৃতভাষ্যাপক (প্রেসিডেন্সী কলেজের) কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়। তিনিও ঐ তৃতীয় শ্রেণীতে আইন শিক্ষা করেন। অধ্যাপক বলিয়া সাহেব শিক্ষক উঠিয়া গেলে, তাঁহার অমুরোধে তিনি আমাদের রেজেষ্ট্রারী লইতেন। কৃষ্ণকমলবাবু প্রথম নামটি ধরিয়াছেন কি, বঙ্কিমচন্দ্র অমনি উঠিলেন,—তাঁহার কাণের কাছে গিয়া চুপি চুপি বলিলেন, “আমাকে উপস্থিত লিখিয়া লইবেন।” কৃষ্ণকমল বলিলেন, “আচ্ছা।” অমনি বঙ্কিমচন্দ্র গোলদিঘির ধার দিয়া ছাতা ধরাইয়া, সটানে সমানে চলিয়া গেলেন। আমাদের কাহার সহিত তখন বন্ধিমবাবুর আলাপ হয় নাই। সেইটুকুই বাহা কিছু কিছু। থাকুক “কিন্তু”। তখন বুঝিছিলাম। এখনও বুঝিতেছি বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের গৌরবান্বিত করিয়াছেন।

অক্ষয়চন্দ্র বহরমপুরে উকীল হইয়া যাইবার কিছু পূর্বেই জজ সাহেবের সেরেস্তাদার বৈকুণ্ঠনাথ নাগের ঘরে একটি নবরত্ন-সভা প্রতিষ্ঠিত ছিল। সাধারণতঃ এই সভার জীবন দিনে অর্ধঘণ্টা মাত্র, জজ সাহেব আসিলেই সভা ভঙ্গ হইত। বিরুদাদিত্য—বৈকুণ্ঠনাথ, বেতালভট্ট—প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীমাচরণ ভট্ট, ধ্বস্তরি—বৈকুণ্ঠনাথ সেন, ক্ষণপক—সরকারী উকীল দীননাথ গান্ধুলী, বরুণচি—উকীল ও আইনভাষ্যাপক গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিদাস—গঙ্গাচরণ সরকার। কোন ভেকান্সি ছিল না যে অক্ষয়চন্দ্র নবরত্ন সভার সভ্য হন। তাই তিনি হইলেন—রাফস। তিনি সমস্তা দিতেন—নবরত্ন পূরণ করিতেন। এই নবরত্ন সভা বিষয়ে অক্ষয়চন্দ্র বহু কথার উপাধন কবিতা লিখিয়াছেন :

তিনি (বঙ্কিমচন্দ্র) একরূপ সভায় কখন মিশিতেন না। কেন?—তাঁহার আভাস প্রেসিডেন্সী কলেজে তাঁহার যাওয়া-আসার পরিচয়ে একটু দিয়াছি। এখন আর একটু বলিতে হইতেছে। তাৎকালিক বঙ্কিম-চরিত্র চিত্রিত করিতে গিয়া, তাঁহার অহঙ্কারের কথা না বলা, ঘোরতর বিডম্বনা। বন্ধিমবাবু আমাদের সমাজে, সাহিত্যে গোলাপফুল। গোলাপের কেবল পাপড়ির রং দেখিবে, মিঠা মিঠা সৌরভ দেখিবে, চল চল রূপ

দেখিবে; গোলাপের বৃন্তে যে কাঁটা আছে, তাহা কি দেখিতে নাই? গোলাপে কাঁটা আছে বলিয়া কি গোলাপের মর্যাদা কম?

“দেবের তুলত নিধি, বিরলে বসিয়া বিধি
সমাদরে স্জজন করেছে,
নরের নির্ভর করে পাছে লণ্ডভণ্ড করে
এই ভয়ে কণ্টকে বিরছে।”

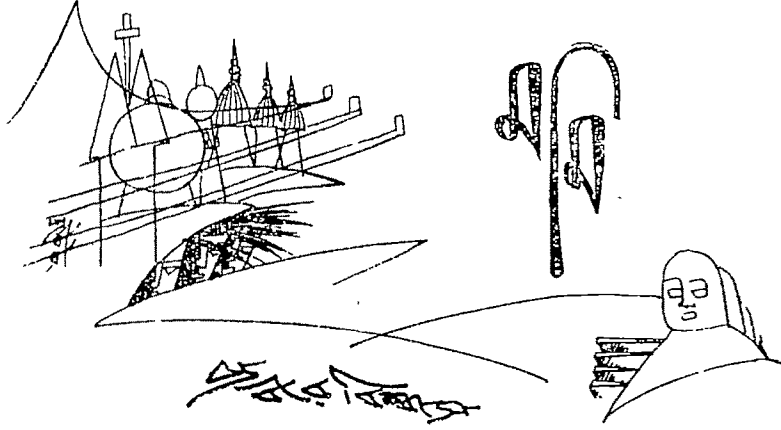
—এইরূপ বর্ণনা করিয়া পিতৃদেব “ঋতুবর্ণন”-এ গোলাপের মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন। বঙ্কিম-সম্বন্ধেও যদি তাহাই হয়? যদি সামাজিকদের হাতে “লণ্ডভণ্ড” হইবার ভয়ে, বঙ্কিমকে কেহ অহঙ্কারের আলোক-আবরণ দিয়া বিরিয়া রাখিয়া থাকেন?

অত কথা বুঝি, আর না বুঝি, এই বুঝি যে বঙ্কিমকে অহঙ্কারী বলিলে তাঁহার মর্যাদাহানি করা হয় না, বিশেষ বঙ্কিম অহঙ্কারী ছিলেন বলিয়া তিনি দান্তিক ছিলেন, এমন কথা বলিতেছি না। পিতৃদেব ও আমার সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের পবিচয় কাহিনী গোড়া হইতেই বলা ভাল।

কিন্তু এই গোড়ার কথা বলিবার পূর্বে অল্প একটি কথার উল্লেখ করা দরকার। স্বর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ সালে, ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস। তাঁহার দ্বিতীয় উপন্যাস “কুপালকুণ্ডলা” প্রকাশিত হয় ১৮৬৬। মৃণালিনী ১৮৬৯ এবং বিষবৃক্ষ ১৮৭২ সালে প্রকাশিত হয়। আর একটি বিষয় স্মরণ করিতে হইবে। বিষবৃক্ষ লিখিত হয় বহরমপুরে এবং বঙ্গদর্শনে খণ্ডঃ প্রকাশিত হইতে থাকে।

অক্ষয়চন্দ্র লিখিয়াছেন—‘আমাদের কলিকাতার কলেজ-জীবনের শেষাবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা প্রকাশিত হইল। এমন অচ্ছিন্ন, উজ্জল, বাচালতাপূর্ণ অথচ রসপরিপূর্ণ, হিন্দুভাবে অস্থিমজ্জায় গঠিত, অদৃষ্টবাদের স্ফুটাস্থায় রেখায় ওতঃপ্রোত কাব্যগ্রন্থ বাঙ্গালায় আর নাই। কেবলমাত্র কপালকুণ্ডলা লিখিলেই তিনি কপালকুণ্ডলার কবি বলিয়া পরিচিত হইতেন, অল্প গ্রন্থ লিখিবার প্রয়োজন ছিল না। আমরা যৌবনের সেই ভাবোদ্বেল অবস্থায় (তখন অক্ষয়চন্দ্র বয়স ২০ বৎসর), সংসার-প্রবেশের সেই প্রথম উত্তম্বে এই অপূর্ব কাব্যগ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায়, বাঙ্গালির লেখায় পাইয়া একেবারে চরিতার্থ হইলাম।’

(ক্রমশঃ)



কালের কবর খুঁড়ে—কফিনের গভীর অতলে
দেখি শুধু 'মমি'র পাহাড়।
চামড়ার থলি ঢাকা মামুষের হাড়ের বাহার !
সৌন্দর্যের পিরামিডে—
টুরিষ্টের ভিড় জমে বছরে বছরে ;
শিল্পের প্রশস্তি চলে সোনালী অক্ষরে।
বিমুক্ত অবাক মন
অবাক টুরিষ্ট।

আমি শুধু তুঁট নই শিল্পের ছোঁয়ায়,
কুঁট মন।
ক্ষেপে উঠি শুনে শুনে হাওয়ার কাহিনী
বিলুপ্ত ইতিহাস পাঠে।
মৃত্যুর শয্যতানী ঢেকে শিল্পের প্রসার।
পাহাড়ের বুক কেটে কেটে
বয়ে আনা পাথরের স্তর ওঠে জমে ;
অমিকের ঘামে আর রক্তের পলস্তুরা
রেখে গেছে শিল্পের স্বাক্ষর।
তারপর—
স্তরে স্তরে মাটির অভ্যন্তরে নামি,
দেখি শুধু প্রাণের ফসিল,
হেথা হোথা মডেলের ছাঁচ।
তার পাশে থরে থরে জীবনের 'মমি'
সুখে আছে হাজার বছর।
শিল্পের শিল্পীর দেশ
সভ্যতায় অবাক মিশর ?
হাজার শতাব্দী পরে

আকাশের পিরামিডে
মামুষের 'মমি' চলে ফেরে।
ওরা তবু 'মমি' নয়
'মমি' নয় কথা কয় বলে,
মৃত্তিকার 'পরে
কথা কয় 'মমি'র ভাষায়,
কথা কয় বাঁচার আশায়
উচ্ছ্বাসী মামুষের 'মমি' চলে ফেরে।
মামুষের মতই যদিও, তবু বলো
তুমি আমি, মামুষ কখনো ?
আমাদের ছবি আর
ইতিহাসের 'মমি'র ব্লকের
অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখ হবেছে ঘটানো।
আমাদের ওপরে চলে সভ্যতার মিনার রচনা
শিল্পের মন্দির-গীর্জা, সৌন্দর্যের নতুন পিরামিড।
শিল্পের সাধনা কোথা ? দেখি শুধু
মৃত্যু গোপনকারী শয্যতানের বিরাট কারখানা।
শুধু তো মিশর নয়, পৃথিবীর ঘরে ঘরে
গড়ে ওঠে লাখো পিরামিড
'মমি'র সমাধি মন্দির !
'মমি' আজ ভাঙ পিরামিড,
ভাঙ তুমি সভ্যতার ভিত্তি
চূর্ণ কর শয্যতানের কুটির পাহাড় ;
রক্তে মাংসে পূর্ণ হোক চামড়ার থলি
তারপর—
আমরাও মামুষ !

পথ-নির্দেশ

[প্রবর্তক-সম্পাদক শ্রীরাধারমণ চৌধুরীর লিখিত পত্রের উত্তরে মহাযোগী গভীরনাথজীর সাক্ষাৎ শিষ্য পরম ভাগবত মনীষী দার্শনিক ও শিক্ষাসাধক শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্রখানি এখানে প্রকাশিত হইল। পত্রের নির্দেশে জিজ্ঞাস্যমাত্রেই দিকদর্শন মিলিবে, ইহা সুনিশ্চিত। প্র: স:]

প্রেমাস্পদেষু,

আপনার অন্তর্জীবনের কথা যাহা নিখিয়াছেন, তাহা আমার ভালোই লাগিল। আপনি ঠিক পথেই অগ্রসর হইতেছেন বলিয়া আমার ধারণা। বিচারশীল ব্যক্তিকে কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ,—অর্থাৎ কোন mechanical process বলিয়া দেওয়া চলে না। যার প্রকৃতি বিচার প্রধান, তাহাকে বিচার করিতে করিতেই অন্তর্জীবনের নির্দেশ লাভ করিতে হয় এবং সেই পথে চলিতে হয়। আমার গুরুদেবের উপদেশ প্রণালীও তদ্রূপই ছিল। ষাঁদের বিচার উন্নত স্তরে উঠিয়াছে, তাঁরা কথঞ্চিৎ বিচারে সাহায্য করিতে পারেন মাত্র। সম্যক্ সার্থকতার পথে এই জীবনেই কতটা কোন্ সাধক অগ্রসর হইবেন, তাহা ভগবানের কৃপা এবং নিজের ঐকান্তিক আগ্রহ ও প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করে। জীবনধারা ত এই দেহের জন্মের সঙ্গেই আরম্ভ হয় নাই এবং এই দেহের সঙ্গেই শেষ হইবে না। সাধনার সিদ্ধির কথা বেশী চিন্তা না করিয়া সাধনার পথে যথাসম্ভব নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সঙ্গে চলিতে হইবে।

আমার বিচারে অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রে কোন formula বা technique মুখ্য জিনিষ নয়, যদিও প্রত্যেক সাধককেই নিজের বিচার অনুসারে বা কোন বিশ্বাসভাজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির উপদেশ অনুসারে কোন একটা formula বা technique অবলম্বন করিয়াই সাধন পথে নিষ্ঠার সহিত চলিতে হয়। আসল কথা, মনের স্বভাবটিকে বদলাতে হবে। জীবনের আদর্শ নিরূপণ করিয়া সেই আদর্শকে বাস্তব জীবনে বাস্তব করিয়া তুলিতে হইবে। স্বাভাবিক কামক্রোধলোভাদি, হিংসা ম্রগাসংকীর্ণতা ভেদবুদ্ধি প্রভৃতি, প্রেমদালম্ভজড়তা প্রভৃতি তামস ও রাজস মনোবৃত্তিগুলিকে দৃঢ় সংকল্প ও অদম্য অধ্যবসায় দ্বারা দমন করিয়া মনকে শুদ্ধ সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন করিতে হইবে, বাহাতে শুদ্ধ সত্ত্বই মনের স্বভাবে

পরিণত হয়। সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন দৃঢ় সংকল্পবিশিষ্ট মনই পার্থিব বাসনা কামনা ও অভিমান মমতার স্তর হইতে ভাগবত ভূমিতে নিজেকে উন্নীত করিতে পারে। অধ্যাত্ম সাধনার মূল কথা এই যে, প্রাকৃত মনকে অপ্রাকৃত মন করিতে হইবে, আমিত্বকে সূত্র দেহেন্দ্রিয়ের ভূমি হইতে তুলিয়া আত্ম-ভক্তের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, দৃষ্টিকে শোধন করিয়া অহং মমতাকেন্দ্রিক বিচার হইতে মুক্ত করিয়া ভগবৎকেন্দ্রিক দৃষ্টিতে পরিণত করিতে হইবে, পৃথিবীর দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ দেহাবচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র আমিত্বকে দেহাভিমানমুক্ত দাসত্বমুক্ত ভেদবুদ্ধিমুক্ত করিয়া অসীম অনন্ত নিরতিমান সচ্চিদ্রশিবানন্দধন অমর স্বরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। এই আদর্শের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই সাধনায় অগ্রসর হওয়া চাই। যার সংস্কার, স্বচি, বুদ্ধি ও প্রকৃতির পক্ষে যে সাধনা অসম্ভব, তাহা অবলম্বনেই মনকে মুক্তি রাজ্যে নেবার চেষ্টা করিতে হইবে।

ঠিক ঠিক ভগবদ্ বিশ্বাসের অনুশীলন হইলেই অনেক বন্ধন কমিয়া যায়। আমি ভগবানের, এই জগৎ ভগবানের, এবং ভগবান্ সত্যশিবস্বম্বর প্রেমামনন্দময়,— এই বিশ্বাস যদি মনের স্বভাবে পরিণত হয়, তবে কি আর কোন অকল্যাণের ভয় থাকে? কোন চিন্তা ভাবনা বা দোষ দর্শন থাকে? চরিত্রের কোন দুর্বলতা মলিনতা থাকে? মহাপুরুষদের কাছে শুনিয়াই হউক, আর শাস্ত্র আলোচনা করিয়াই হউক, পুনঃ পুনঃ একাগ্র চিত্তে বিচার করিয়াই হউক, ভগবানে এই বিশ্বাসটা বাস্তব জীবনে কার্যক্ষেত্রে মনের স্বভাবে পরিণত করিতে পারিলেই ক্ষুদ্র আমিত্বের বন্ধন হইতে মুক্তি। আমি সচ্চিদ্র-প্রেমানন্দ সমুদ্রের একটি বৃদবৃদ মাত্র—তঁার সত্তা হইতেই আমার সত্তা, তঁার বুদ্ধিই আমার স্থিতি-গতি, তঁার বিচিত্র লীলাতরঙ্গের তালে তালেই আমার যা কিছু জ্ঞান কর্ম গতিবিধি ভাববিলাস স্নেহাগ-হর্ষোগ। আবার আমার

চারিদিকে যেসব ব্যাপারপরম্পরা দেখি, যে বিশ্বপ্রপঞ্চ আমার জ্ঞানে প্রতিবিম্বিত হইতেছে, আমার কর্মের ক্ষেত্র রচনা করিতেছে, আমাকে সুখদুঃখাদি প্রদান করিতেছে, আমার অন্তরে নানাবিধ ভাবের উদ্ভেক করিতেছে, এই বিশ্বপ্রপঞ্চও সেই ভগবানেরই, সেই সত্যশিবসুন্দর প্রেমানন্দেরই বিচিত্র অতিব্যক্তি, বিচিত্র লীলাতরঙ্গ। তিতরে বাহিরে সব ভগবানেরই খেলা—একরূপ বিশ্বাস হইলেই ত ভগবানে ঠিক ঠিক বিশ্বাস হইল। নিত্য নিরন্তর বিচার, ধারণা, ধ্যান দ্বারা এই বিশ্বাসকে আমিহের চেতনার স্বভাবগত করিয়া লওয়ার প্রচেষ্টার নামই ত সাধনা।

‘ওম্’—অথও ভগবানেরই নাম। ভগবানের এই সার্বজনীন মহানাম নিয়ত স্মরণ করার সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে বাহিরে ভগবানকে অমুভব করার প্রচেষ্টাই ষথার্থ নাম-জপ। নাম-অবলম্বনে নামীরই চিন্তন হয়, চিন্তন প্রগাঢ় হইলেই অমুভব। আমাদের হৃদয়ক্ষেত্রে ও বিশ্বপ্রপঞ্চের হৃদয়ক্ষেত্রে অনবরত এই ওম্ নিনাদিত হইতেছে। যোগীরা বলেন, মনকে নিজের হৃদয়ে ডুবাইতে পারিলেই বিশ্বের হৃদয়েও অমুপ্রবেশ হয়, ওম্ মন্ত্রের সাক্ষাৎকার হয়, তৎসহ নামী ভগবানেরও অমুভব হয়। স্বাসে স্বাসে ওম্-স্বনি শ্রুত হইয়া। মনকে তার সঙ্গে যুক্ত করিয়া দিতে পারিলেই অজপা-জপ হয়। সাধনার সৌন্দর্য্য ও ভক্তির অমুশীলনের জন্তে ও-কারের সহিত যে কোন চিন্তাকর্ষক বিশেষ ভগবদ্-নাম যুক্ত করিয়া জপ করিলেও বেশ ফল হয়। কিন্তু লক্ষ্য থাক। চাই তিতরে বাহিরে ভগবৎ সত্তার অমুভব। তজ্জন্ত একাগ্রতার অমুশীলন অত্যন্ত আবশ্যক। মনের স্বাভাবিক চঞ্চলতা, মলিনতা ও ঘূর্ণলতা দূর করিবার জন্তে আসন প্রাণায়াম স্নিগ্ধচিত্তভাবে অভ্যাস করিতে পারিলে সহায়তা হয়। বিশ্বাসের অমুশীলনের সহিত অমুরাগের অমুশীলন হইলে চিত্ত সহজেই একাগ্র হয়, সাধনায় রসাস্বাদও নিবিড় হয়।

ভগবান শুধু সত্তা নহেন, তিনি পরম প্রেমাস্পদও। ভালবাসিয়া সাধন করিলেই পদে পদে সাধনার আনন্দ সন্তোগ হয়।

কর্মময় ও ভোগময় জীবনের মধ্যে থাকিয়া বাহাদের সাধন করিতে হয়, তাহাদের পক্ষে সকল কর্মই ভগবানের কর্ম মনে করিয়া ভগবৎ সেবা বুদ্ধিতে পবিত্রভাবে ও প্রসন্নচিত্তে কর্মসম্পাদনের অভ্যাস এবং সকল ভোগই ভগবানের কল্যাণাশীর্ষাদ বোধ করিয়া প্রেমের সহিত নতশিরে গ্রহণ করিবার অভ্যাস বিশেষ আবশ্যক। এক তাত্ত্বিক আদর্শে অধ্যাত্ম সাধনা এবং অল্প জাগতিক আদর্শে ব্যবহারিক জীবনের কর্ম সম্পাদিত হইলে, মনের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন (psychological transformation) সাধিত হয় না, সমগ্র জীবন ভাগবত জীবনের স্তরে উন্নীত হয় না, আমিহের পরিশোধন হয় না, তিতরে বাহিরে ভগবানের অমুভূতি সূদূরপরাহত হয়। ভগবানের উপদেশ—সকল কর্ম আমারই কর্ম বলিয়া মদ্যভাবতাবিত হইয়া মদর্থে কর্ম সম্পাদন কর, সকল কর্মের ফল আমাকেই সমর্পণ কর, আমার প্রতি ভক্তিযুক্ত হইয়া আমারই প্রীতির মানসে সপ্রেমে অথচ অনাসক্তভাবে আমারই আদর্শে ও উদ্দেশ্যে আমার দেওয়া সব কর্তব্য কর্ম সংসারক্ষেত্রে করিতে থাক, কাহারও প্রতি বৈর ভাব রাখিও না, তাহা হইলেই কর্ম করিয়াও তোমার চিত্ত কলুষিত হইবে না, কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হইবে না, কর্মযোগের তিতর দিয়াই আমাকেই জীবনে ও জগতে অমুভব করিবে।’

আজ এই পর্য্যন্ত। আমার সুতাশাষ গ্রহণ করুন। প্রেমাস্পদ ব্রহ্মচারী গদানন্দ ও ব্রহ্মচারী শিশিরকুমারকে আমার সপ্রেম শুভেচ্ছা জানাইবেন। ইতি—

গোরক্ষনাথ টেম্পল,

গোরক্ষপুর।

১৭. ৫. ৬৩

শুভাঙ্কুরাধী

শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়



কুলুপ আঁটা জগৎ

(বুলগেরিয়ার ছোট গল্প)

নেনকো গুলুবোরোড্

গত শতাব্দী থেকে বাবা-মাকে গ্রাম থেকে এনে
সহরে নিজেদের কাছে রেখেছি। ওঁরা ছুঁজনেই বেশ
বুড়ো হয়ে পড়েছেন, নিজেদেরকে দেশাশোনার ক্ষমতাও
আর বিশেষ নেই কারো। আমার চিরদিনের বিশ্বাস
যে মা-বাপের বৃদ্ধ বয়সে তাঁদের জন্য একটু নিষ্কণ্টক
আরামদায়ক জীবনযাত্রার ব্যবস্থা করে দিয়েই সন্তানের
জন্ম তাঁরা যে সমস্ত দুঃখ ও ত্যাগস্বীকার করেছেন
তার কিছুটা পরিশোধ করতে পারি। বাবা-মা যখন
সহরে আমার কাছে থাকতে এলেন তখন আমার স্ত্রী
তাঁদেরকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। আমার স্বস্তর-
শাওড়ী উত্তমের বহুদিন যাবৎ পরলোকগত, তাই আমার
বাবা-মাকে তাঁদের স্থলাভিষিক্ত করে নিতে তিনি সহজেই
পেরেছিলেন। তাছাড়া আমার ছেলেমেয়েরা একেবারে
কচি শিশু বলে ওদের লালন-পালনের ব্যাপারে আমার
মা যতটুকু সাহায্য করতে পারতেন আমার স্ত্রীর কাছে
ততটুকুই অমূল্য বলে বোধ হত।

গ্রাম ছেড়ে সহরে আসতে ওঁরা কিছু সহজে রাজী
হননি। ওঁরা ভেবেছিলেন যে, সারা জীবনের অশুভ
ছোটোখাটো সুখদুঃখ সাফল্য ও ব্যর্থতার স্মৃতিবিজড়িত
গ্রামের সেই পুরানো বাড়ীটা প্রাণ থাকতে ছেড়ে আসা
সম্ভব হবে না। সেখানকার ছোটোখাটো প্রতিটি জিনিষ
ছিলো তাঁদের কাছে প্রাণাধিক প্রিয়, গ্রামের প্রতিটি
গাছপালার অদৃষ্ট স্নেহবন্ধনও ছিলো অচ্ছেদ্য। দীর্ঘ
বয়সের জীবনপথ কষ্টে স্টে প্যার হবার পর সেই অতিক্রান্ত
পায়ের ক্ষুদ্রতম স্মৃতিটুকুও তাঁদের কাছে পরম সুখবহ
হয়ে উঠেছিলো। আর অতীত জীবনের স্মৃতিবিজড়িত
সেই ক্ষুদ্র জগৎটিই তাঁদেরকে আঁকড়ে ধরে রেখেছিলো।

ওঁদেরকে সহরে নিয়ে আসার প্রস্তাবটা শুনেই বাবা
ফুলে-উঠা চোখ দুটো মেলে কিছুক্ষণ উদাসভাবে
তাকিয়ে থেকে বলেছিলেন: “কী করে যাবো?
এখানকার জীবন কী করে ছেড়ে চলে যাবো? বৃ-
ক্কেটেই মরে যাবো যে তাহ’লে! সহরে না গিয়ে এখানেই
পড়ে থাকটা কি আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না?”

মা বুধাই চোখের জল লুকোবার চেষ্টা করেছিলেন।

তাঁদের দুঃখ এবং পূর্বস্মৃতিবিজড়িত সেই ক্ষুদ্র জগতের
প্রতি তাঁদের দ্বার আকর্ষণের কথা সম্পূর্ণ উপলব্ধি
করেও তাঁদেরকে সহরে নিয়ে আসা ছাড়া অন্য কোন
উপায় আমি খুঁজে পাইনি। তাই অবশেষে সম্পূর্ণ শাস্ত
আত্মসমর্পিতভাবে তাঁরা প্রস্তাবটা মেনে নিয়েছিলেন।
তারপর বাড়ীটা ও বড়ো বড়ো মালপত্র বিক্রী ক’রে
বাদবাকী ছোটোখাটো জিনিষগুলো একটা স্তম্ভর খোদাই-
করা পুরানো কাঠের সিন্দুকে জড়ো করা ছিলো। এই
কাঠের সিন্দুকটা নিয়ে তাঁদের ব্যস্ততার সীমা ছিলো না।
সারাদিন দুই বুড়োবুড়ীতে মিলে ফিস্ ফিস্ করে
আলোচনা হ’ত আর সিন্দুকের জিনিষপত্র নতুন করে
সাজানো হ’ত। ভাবটা এই যে, যেন এই সিন্দুকের মধ্যে
তাঁদের এমন সব হৃদয়ের ধনকে সযত্নে কবর দিয়ে রাখা
হচ্ছে যে ততদিন পর্যন্ত তাদের গায়ে যেন আঁচড়টি
না লাগে যতদিন সিন্দুকের ডালা খুলে তাদের দিকে
আবার দৃষ্টিপাত করা হয়। খোদাই করা সিন্দুকটা
গ্রামীণ আসবাবপত্রের একটা চমৎকার নিদর্শন ছিলো
বলে সেটাকে আমার সহরের বাড়ীর বসবার ঘরেই
রেখেছিলাম।

সন্ধ্যাবেলা সেই ঘরটাকেই আমার লেখাপড়ার ঘর
হিসাবে ব্যবহার করা হত। ঘণ্টাখানেক বা ঘণ্টা দু’য়ের
মধ্যে দিনের বকেয়া কাজের বোকা সেরে ফেলে পরের
দিনের কাজ তৈরী করতাম সে ঘরে বসে। আমার
জীবনে এটা ছিলো একটা দৈনন্দিন অভ্যাস এবং আমার
স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা এ অভ্যাসটার সঙ্গে সুপরিচিত ছিলো
বলে তারা এ সময়টা কোনরকম গোলমাল করতো না।
তাই, বাবা-মাকে সহরে নিয়ে আসার পর প্রথম দিনই
তাঁদেরকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলাম, তাঁরাও সহজভাবে
ব্যাপারটা মেনে নিলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই বাবা মা সহরের জীবনে অভ্যস্ত
হয়ে গেলেন—এমন অভ্যস্ত হয়ে গেলেন যে, মনে হত
তাঁরা যেন চিরদিনই আমাদের সঙ্গে সহরে আছেন। মা

সংসারের কিছু-কিছু সহজ খুঁটিনাটি কাজ ও বাচ্চাগুলোকে দেখাশোনার কাজ হাতে নিলেন। অতি সহজেই তিনি নিজেকে আমাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলিয়ে নিলেন। বাবা বেশীক্ষণ বাড়ী থাকতেন না। সকালবেলাটা তিনি কাছাকাছি একটা কাফেতে কাটাতেন, ছপুর বেলা খাবার সময়ের একটু আগে তিনি পার্কে বেড়াতেন, আর অপরাহ্নটা ট্রামে চড়ে সহরতলীতে ঘুরে ঘুরে কাটিয়ে দিতেন। এক কথায় বলতে গেলে যে কোন একজন সরল নিরীহ প্রকৃতির লোক নিজের অস্তিত্বকে যেভাবে সম্বন্ধে সকলের অলক্ষ্যে রেখে চলে বাবাও সেভাবেই চলতে লাগলেন। তিনি সর্বদা সম্মত মতো বাড়ী ফিরতেন। রাত্রিবেলার খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকে বাবার পর কিছুক্ষণ বেডিঙ শুনতেন, তারপর ধবরের কাগজটা একটু চোখ বুলিয়ে আমাকে ছুঁটো একটা প্রশ্ন করে যখনই বুঝতে পারতেন যে, আগি ব্যস্ত আছি তখনই শুতে চলে যেতেন।

প্রথম কয়েকদিন তিনি যখন রাত্রিবেলা খেয়ে উঠে বগবার ঘরে এসে সিন্দুকটা খুলে এটাওটা নাড়াচাড়া করতেন তখন আমি তাঁকে প্রায় লক্ষ্যই করিনি। লেখা নিয়ে আমি তখন এতো ব্যস্ত থাকতাম যে, সেই কণিক সময়টার জন্ত সে ঘরে তাঁর উপস্থিতি আমার অহুত্বতির গোচরেই আসতো না। তিনি যখন সিন্দুকের ডালাটা বন্ধ করে, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে পা ছুঁটো একটু টেনে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেন শুধু সেই সময়টুকুর জন্ত তাঁর উপস্থিতি অহুত্বত করতাম।

কিন্তু রোজই ব্যাপারটার পুনরাবৃত্তি ঘটতে লাগলো। সিন্দুকের ডালা খোলা ও বন্ধ করার বিরক্তিকর আওয়াজে আমার কাজকর্মের ব্যাঘাত হতে লাগলো। তখন বিরক্তভাবে মনে মনে ভাবতাম রাজ্যের আজ্ঞাবাজে জিনিষ দিয়ে ভরা পুরানো সিন্দুকটার মধ্যে কী অমূল্য বস্তু সন্ধান করছেন বাবা। ওটা থেকে কিছুইতো তাঁকে বের করে নিতে দেখি না। ওটার মধ্যে যদি তাঁর কোন প্রয়োজনীয় বস্তু থাকে তবে সেটাকে বের করে নিজের ঘবে নিয়ে রাখলেই তো হয়। ক্রমেই অত্যন্ত অস্বস্তিকর বোধ হতে লাগলো সমস্ত ব্যাপারটা। উনি

কি সিন্দুকটার মধ্যে কোন মহামূল্য ধনবস্তু লুকিয়ে রেখেছেন যা গল্পের বইয়ের রূপণ বুড়োর মতো তাঁকে রোজই একবার খুলে দেখতে হবে? উনি এ কথা কেন বোঝেন না যে, কাজকর্মের সময় আমাকে বিরক্ত না করে একটু একা থাকতে দেওয়া উচিত!

একবার ভাবলাম বাবাকে বলেই ফেলি কথাটা, কিন্তু কেমন একটা সঙ্কোচের বাধা কাটিয়ে উঠতে পারলাম না। ভয় হ'ল পাছে তিনি মনে করেন যে, আমি তাঁদের ভার বহন করতে ইতিমধ্যেই হাঁপিয়ে পড়েছি। সত্যি কথা বলতে গেলে এমনধারা ভাবনা আদপে আমার মনে আসেনি।

একদিন কিন্তু হঠাৎ ধৈর্য্যচ্যুতি হ'য়ে গেল। সেদিন তিনি খোলা সিন্দুকটার ধারে অনেকক্ষণ ধরে খুঁকে পড়ে কি যেন দেখছিলেন। তাঁর দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দগুলো যেন মাটির ভেলার মতো আমার কানে এসে ঘা দিচ্ছিলো। আমি এতো অস্বস্তি বোধ করছিলাম যে, আমার পক্ষে কাজ করা সম্ভব হচ্ছিলো না। আমি আশ্বে আশ্বে চেয়ার ছেড়ে উঠে পা টিপে টিপে এসে বাবার পিছনে দাঁড়লাম।

খোলা সিন্দুকটার মধ্যে যে জিনিষগুলো আমার দৃষ্টিগোচর হ'ল সেগুলো আমাকে কেমন যেন হতবুদ্ধি করে ফেললো। সিন্দুকটার মধ্যে ছিলো পুরানো বহু ব্যবহৃত একটা ব্যাগপাইপ বাজনা যেটা তিনি কিছুক্ষণ আগে একটা রঙীন পুঁতির মালা আর রেশমের ঝালর দিয়ে সাজানো একটা থলে থেকে বের করেছেন। থলেটার নীচে একটা নতুন মোটা পশমী কাপড়ের পোষাক, একটি সোনার মোহরের মালা, একখানা বড়ো রেশমী রুমাল—যা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নাচের দলের নেতাদেরকে নাচতে দেখা যায়—আর একটা সরু চামড়ার বিহুনি দিয়ে তৈরী চাবুক। বাবা জিনিষগুলো আশ্বে আশ্বে নেড়েচেড়ে দেখে কিছুক্ষণ ব্যাগপাইপটার দিকে একাধ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তারপর কম্পমান আঙুলগুলো বুলিয়ে বুলিয়ে ব্যাগপাইপটার ভাঁজগুলোকে মেলে মেলে দিলেন। সে সময় তিনি এমনভাবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছিলেন যে, মনে হচ্ছিল যেন তিনি তাঁর কোন অতি-প্রিয় পরিজনের মৃতদেহের উপর সম্মেহে

হাত বুলোচ্ছিলেন। আমি তাঁর মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না, কিন্তু যেভাবে তাঁর দেহ ধরধর করে কাঁপছিলো তাতে আমার বুঝতে বাকী ছিলো না যে, অশ্রুহীন ক্রন্দনে তাঁর শরীর ভেঙে পড়তে চাইছিলো। তিনি ব্যাগপাইপটা থেকে তাঁর হাত সরিয়ে আনতে চাইছিলেন কিন্তু চুষকের মতো সেটা তাঁর হাতকে টেনে ধরেছিলো। মনে পড়লো যে শুনেছি তিনি তাঁর ছেলেবেলা থেকেই ব্যাগপাইপটা বাজিয়ে এসেছেন। এটা তাঁকে গ্রামের বহু নাচের আসরে ও উৎসবে খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সাহায্য করেছে এবং তাঁর জীবনের বহু আনন্দময় স্মৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। আজ দেখছি তিনি সেটাকে নিজের অস্ত্রোষ্টিক্রিয়ার স্তম্ভ আগে থেকেই তৈরী করে রাখা পোষাকটার সাথে সম্বন্ধ রেখে দিয়েছেন। কুলুপ-জাঁটা সিন্দুকটার মধ্যে লুকোনো এই স্মৃতির জগৎ থেকে নিজেকে বিমুক্ত করে নিতে পারছেন না বলেই তিনি রোজ সন্ধ্যায় একবার করে সিন্দুকটা খুলে খুলে দেখেন। সেই হারানো দিনের স্মৃতিই তাঁর বৃদ্ধবয়সের আনন্দের একমাত্র উপাদান।

আমার নিজের চোখ দুটো জলে ভরে আসে। বুঝতে পারি যে মাসের পর মাস প্রতিদিন তিনি তাঁর আগের অভ্যাসমতো ব্যাগপাইপটাকে ফুঁ দেবার চেষ্টা না করে শুধু একটু আঙুল বুলিয়ে আবার রেখে দিয়েছেন। নতুন বাসস্থান, নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেবার ব্যস্ততার স্রোতের শেষ ক্ষীণ শিখাটিকেও নিজের হাতেই নির্বাপিত করেছেন। বাবার দিকে ভালো করে তাকিয়ে এই প্রথমবার আমার চোখে পড়লো তাঁর গলাটা কতো সরু হ'য়ে গেছে, কতো বেশী কঁকড়ে গেছে তাঁর শরীরের চামড়া, আর কৃষকদের টিলেঢালা পোষাকের আড়ালে কী রকম অসহায় শিশুর মতো ক্ষীণ দুর্বল হ'য়ে গেছে তাঁর শরীর।

আমি যখন হাত দিয়ে তাঁর কাঁধ স্পর্শ করলাম তখন আমার হাত কাঁপছিলো। তিনি চমকে উঠে ভীত সন্ত্রস্তভাবে ফিরে তাকালেন যেন। তাঁর চোখদুটো যেন বলতে চাইছিলো: “আমার সরলতায় বিক্রপ কোরো না। এই ব্যাগপাইপটা সারা জীবন ধরে আমাকে

আনন্দদান করেছে। আমি এটাকে ভুলতে চেষ্টা করছি কিন্তু কোনক্রমেই এটাকে তাড়াতাড়ি পারছি না মন থেকে। তোমার কাজের ব্যাঘাত করতে চাইনা বলেই এখানে এসে অবধি ব্যাগপাইপটা একবারও বাজাবার চেষ্টা করিনি।”

আমি তাঁকে আলিঙ্গন করে আমার উদ্গত অশ্রু গোপন করার চেষ্টা করলাম, তিনি অসহায় শিশুর মতো আমাকে জড়িয়ে ধরলেন।

“তুমি কেন আমাদেরকে বাজনাটা শোওনা না?” আমি বলি, “বিকেলবেলা বাজনা শুনতে সবাইয়ের ভাল লাগবে। কাজ আব আমোদ—দুটোরই প্রয়োজন আছে, আর যথেষ্ট সময়ও আছে দু'টার জন্তেই।”

বাবা সিঁথে হয়ে দাঁড়ান, তাঁর চোখ দুটো উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে, মনে হয় যেন ভেতরে কোথাও আগুন জ্বলে উঠেছে।

“নিশ্চয় বাজাবো! নিশ্চয় তোদের সবাইকে বাজিয়ে শোনাবো। এতোদিন না বাজিয়ে আঙুলগুলোতে জড ধরে গেলো”—আকুল আগ্রহে সিন্দুক থেকে ব্যাগপাইপটা তুলে নিয়ে তিনি অসংলগ্নভাবে বলতে থাকেন, “যদি কিছু মনে না করিস তবে এখনই একটু দেখি চেষ্টা করে...”।

ব্যাগপাইপের আনন্দোচ্ছল সুরে শান্ত বসবার ঘরটার সবকিছুই যেন একঝলকে জীবন্ত হয়ে উঠে। বাবা ব্যাগপাইপটা বগলে চেপে মাথাটা একদিকে একটু হেলিয়ে বাজনাটায় ফুঁ দিতে থাকেন। গুর গাল দুটো লাল হ'য়ে উঠে, আর মুখের চার পাশের বলিরেখাগুলো বালকের মতো সরল হাসিতে মিলিয়ে যায়। মনে হয় যেন একটা সন্তুষ্ট জগৎ তাঁর বুকের ভিতর থেকে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলছে।

সেদিন থেকে রোজই বিকেলবেলা বাবা আমাদেরকে তাঁর প্রিয় সুরগুলো বাজিয়ে শোনান। তাঁর ঠোঁট দুটো যখন বাজনাটায় ফুঁ দিতে থাকে তখন তাঁর চোখ দুটো দূরের পাহাড়ের বেগুনী লাল রেখাগুলোকে অহসরণ করতে থাকে। খোলা জানালার মধ্য দিয়ে চবা ক্ষেতের গন্ধ আসে, তাতে মিশে থাকে কচি পাতার গন্ধ এবং হয়তো আরও কিছুর যা শুধু তিনিই বুঝতে পারেন আব যা তিনি মনেপ্রাণে ভালোবাসেন।

রঙিন শাড়ী

ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস

[রচনাটি বহুকাল পূর্বে অন্ত্র প্রকাশিত হয়েছিল। এতকাল পরেও আমার বক্তব্যের গুরুত্ব উপলব্ধ হয় নি। সুতরাং স্বাধীন সরকার ও দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য রচনাটি পুনর্মুদ্রিত হইল। —লেখক]

প্রবন্ধের নাম ‘রঙিন শাড়ী’ দেখে অনেকেই ভাববেন রাসায়নিক ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাসের শেষে নভেল লেখার বাতিকে পেয়ে বসল নাকি? প্রারম্ভেই বলে রাখি যে, সেক্ষেপ কোনও উচ্চাভিলাষ আমার নেই। রঙিন শাড়ীর মধ্যেও আমি রাসায়নিক শিল্পের কথাই ভাবছি। পথে-ঘাটে, ট্রামে বাসে, ট্রেনে-অ্যারোপ্লেনে সর্বত্রই ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে আজকাল আমাদের স্ত্রী-জাতিব পরিধেয়ে রামধনুর বর্ণচ্ছটা খেলে যাচ্ছে দেখতে পাই। এতে নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যেও সাধারণ লোক আমাদের মনে খুসীর আমেজ উঁকি দিয়ে যায়; কিন্তু প্রকৃত চিন্তাশীল ব্যক্তি এতে মনে মনে ব্যথিত না হয়ে থাকতে পারেন না। সত্যসত্যি রমণীর রঙিন বসনাকল থেকে যে বারিবিন্দু বিগলিত হয় উহা দেশমাতৃকার অশ্রুবিন্দু ভিন্ন আর কিছুই নয়।

বৈষ্ণব-কবি যখন—“চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ি’ নিঙাড়ি’ পরাণ সহিত মোর” বলে ভাবোচ্ছাস প্রকাশ করেছিলেন তখন তাতে কারো এরূপ বিস্কন্ধ হবার কারণ খটেনি; যেহেতু তৎকালে নীল শাড়ীর ঐ নীল রং প্রস্তুত হত আমাদের দেশেরই উদ্ভিজ্জ থেকে। সে যুগে মঞ্জিষ্ঠা ও লাক্ষা থেকে প্রস্তুত হত লাল রং, কুসুম ও শিউলীফুল এবং কাঁঠাল প্রভৃতি কাঠ থেকে তৈরি হত পীত রং আর গৈরিকের জন্ত গিরিমাটির ত অপ্রতুলতা ছিল না কোন স্থানেই। কিন্তু আজ যে ‘রামধনু আঁকা’ বাস-বিআসে ভারতীয় কামিনীকুল ভূষিতা হচ্ছেন তার জন্ত প্রাণে অপরিণীম ক্ষোভ ও দুঃখের সঞ্চার হয়; যেহেতু ঐ রামধনু রঙের পেছনে গরীব ভারতের কোটি কোটি টাকা প্রতি বৎসর সাগরপারে চলে যাচ্ছে। অনেকেই জানেন ১৮২০—২৫ সালেও প্রতি বৎসর পাঁচ কোটি টাকার ওপর নীল ভারতবর্ষ থেকে ইউরোপে চালান যেত। কিন্তু জার্মান রাসায়নিকগণ বহু বৎসরের গবেষণায় সিদ্ধমন্তের হ’য়ে

যখন কারখানাতে ভূরি পরিমাণে বিস্কন্ধ নীল উৎপাদন আরম্ভ করলেন তখন ভারতের এই নীলের চাষ গেল উঠে এবং ইংরেজ ব্যবসায়ীদেরও একটি মস্ত বড় লাভজনক ব্যবসায় গেল মাটি হয়ে। অবশ্য এর বিশ পঁচিশ বছর আগেই জার্মান রাসায়নিকগণের সাধনায় ফরাসীদেশের মঞ্জিষ্ঠার চাষ নষ্ট হয়ে যায়। ফ্রান্স মঞ্জিষ্ঠার চাষে প্রতি বৎসর প্রায় এক কোটি টাকা লাভ করত। প্রথিতযশা জার্মান অধ্যাপক বেয়ারের গবেষণাগারে ১৮৬৮ সালে তাঁর কৃত্তী ছাত্রদ্বয় গ্রোবে ও লিবেরমল অ্যালিজারিন বিশ্লেষণ করে তার মধ্যে অ্যানথ্রাসিন নামক পদার্থের সম্মান পান। অ্যানথ্রাসিন পাওয়া যায় আলকাতরা থেকে—এবং ইতিপূর্বে ইহা নিত্য অকেজো বলেই পরিগণিত ছিল। অধ্যাপক বেয়ার অ্যানথ্রাসিন থেকে শীঘ্রই রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অ্যালিজারিন প্রস্তুত করলেন। এই অনামধস্ত গবেষণা লিবেরমানের সঙ্গে আমাদের খুব ঘনিষ্ঠতা আছে। কারণ ইনি বার্লিনের অধ্যাপক থাকাকালে আমাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র মহোদর ১৯১২—১৩ সালে এঁর ছাত্র ছিলেন। যাক এখন অ্যালিজারিনের কথায় আসা যাক। অধ্যাপক বেয়ার গবেষণাগারে আলকাতরা থেকে প্রাপ্ত অ্যানথ্রাসিন থেকে অ্যালিজারিন তৈরির সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর বন্ধু হাইনরিখ কারো রাইন নদীতীরে অবস্থিত লুডভিগ মহাফেনের বাড়িশে আনিলিন উণ্ড সোডা ফ্যাব্রিক নামক কারখানায় উহা প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করবার জন্ত উঠেপড়ে লেগে গেলেন।

জার্মানির বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও তথ্যাহুসন্ধানী রসায়নবিদগণের গবেষণা-অন্তরাগ ও জ্ঞানের গভীরতা ছিল যেক্ষেপ অনন্তসাধারণ, ওদের কারখানার রাসায়নিক ও ইঞ্জিনীয়ারদের কর্মতৎপরতা এবং দক্ষতাও ছিল সমভাবে অপরিণীম। অ্যালিজারিন প্রস্তুত ব্যপদেশে

তার অলঙ্ঘন্য প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৮৬৮ সালে অ্যালি-জারিনের রাসায়নিক প্রকৃতি উদ্ঘাটিত হয় আর তার দুই বৎসরের মধ্যেই অর্থাৎ ১৮৭০ সালের মে মাসেই রসায়নাগারে প্রস্তুত কৃত্রিম অ্যালিজারিনের উৎপাদন ক্রিয়াক্রমে বুদ্ধি পেয়েছিল নিজের তালিকা থেকেই তা স্পষ্ট বুঝা যাবে—

সন	অ্যালিজারিন উৎপাদন
১৮৭১	১৫ হাজার কিলোগ্রাম (১ কিলোগ্রাম = ১ সের)
১৮৭২	৫০ হাজার " "
১৮৭৩	১ লক্ষ " "
১৮৭৭	৭ লক্ষ ৫০ হাজার কিলোগ্রাম
১৯০২	২০ লক্ষ কিলোগ্রাম

উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অ্যালিজারিনের দাম ক্রিয়াক্রমে গিয়েছিল তাহাও বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়—

১৮৭০	২০০ মার্ক প্রতি কিলোগ্রামের মূল্য
১৮৭২	১২০ " "
১৮৭৮	২৩ " "

অনেকেই জানেন ১ মার্ক সচরাচর আমাদের এক টাকার সমান। জানা যায় ১৮৮১ সালে মাত্র এক বৎসরেই বাড়িশে কোম্পানী একমাত্র অ্যালিজারিন বিক্রী করেই দেড় কোটি টাকা খোকলাত করেন। ফলতঃ কেমিক্যাল কারখানা কাকে বলে এবং ‘বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্যী’ কথাটির অর্থ কি তা আমরা এ থেকেই স্পষ্ট বুঝতে পারি। অ্যালিজারিনের সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক রকমের মূল্যবান রজনপদার্থ এবং পরিশেষে নীলও ঐ কারখানা থেকে কত কোটি টাকার যে উৎপন্ন হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। জার্মানির আরও দুইটি এইরূপ বিরাট আয়তনের রাসায়নিক কারখানায় অবিরাম গতিতে রজন-পদার্থ উৎপাদনের ব্যবস্থা ছিল—মহাকবি গ্যেটের জন্মস্থান ফ্রাঙ্কফোর্টের অদূরবর্তী মাইন নদীতীরস্থ হোয়েকস্টেট মাইনট্রার লুসিয়াস ক্রুয়েনিং কোম্পানীতে এবং কোলনের সন্নিকটস্থ লিডারকুজেনে অবস্থিত বেয়ার কারখানায়। তিন বৎসর আগে অস্ত্রাত্মক বহু কারখানার সঙ্গে এ তিনটি কারখানাও দেখবার সৌভাগ্য আমার

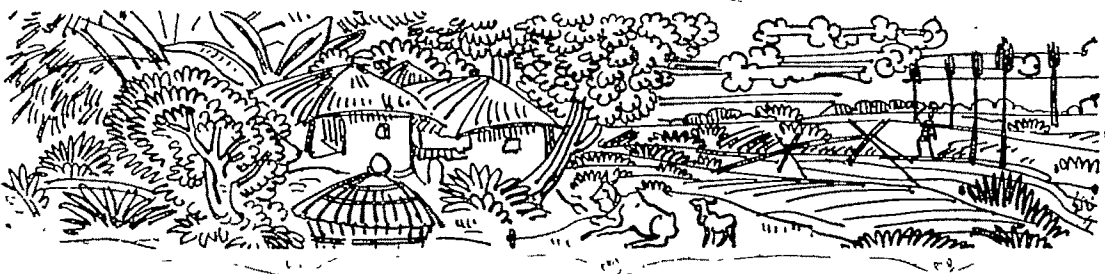
হয়েছিল। জার্মানির এইসব কারখানার বিরাট আয়তন ও বিশাল উৎপাদনশক্তি দেখে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ইংরেজেরা সারা পৃথিবী দোহন করে যত অর্থ ঘরে নিয়ে যেতে না পারত, জার্মানি ঘরে বসে কেবলমাত্র মাথার জোরেই তুচ্ছ পাথুরে কষলা থেকে তার চেয়ে অনেক বেশী অর্থ উৎপাদন করে দেশের সচ্ছলতা সম্পাদন করত। ১৯১৪ সাল পর্যন্ত ইংরেজেরাও তাদের প্রয়োজনের শতকরা ৯০ ভাগ রজন পদার্থই জার্মানি থেকে আমদানি করত। ফলতঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্ততম প্রধান কারণই ছিল জার্মানির এই বিশ্বব্যাপী রাসায়নিক শিল্পজাত সামগ্রীর একচেটিয়া ব্যবসায়ের মূলে কুঠারাঘাত করা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ইংরেজ ও মার্কিনগণ পূর্ণ উদ্যমে রজন-শিল্প স্থাপন ও প্রসারের প্রতি মনোযোগ দেয়। এ সময় ইংলণ্ডের অনেকগুলি রাসায়নিক শিল্প-প্রতিষ্ঠান একত্র মিলিত হয়ে ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রিজ নামক বিরাট শিল্প সমবায় গড়ে তোলে। জার্মানিও যুদ্ধের তাল সামলিয়ে নিয়েই ১৯২৪ সালে ‘ই. গে-ফারবেন ইনডুস্ট্রি’ নামে শিল্প সংঘ স্থাপন করে। পূর্বোক্ত কারখানাগুলি ছাড়া আরও অনেকগুলি বৃহৎ রাসায়নিক কারখানা এই সঙ্গে যোগ দেয়। বলা বাহুল্য, জার্মানির এই নব গঠিত সুবিশাল শিল্প সমবায়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ইংরেজ ও মার্কিন রাসায়নিক শিল্প-পতিগণ চোখে সর্ষের ফুল দেখতে আরম্ভ করল। স্তুরাং সত্য কথা বলতে গেলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মূলেও জার্মানির অসামান্য শিল্পোন্নতির প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করাই মিত্রপক্ষের অন্ততম প্রধান লক্ষ্য ছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে ইংরেজ-মার্কিন-রুশ-ফরাসীর তাঁবেদারিতে শক্তিহীন জার্মানি আজ আর বিশ্বের বাজারে তাদের রাসায়নিক অব্যসন্তার সরাসরি আনতে পারছে না। তাই ইংলণ্ড ও আমেরিকার রাসায়নিক শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। স্বাধীন ভারতে পাছে তাদের ব্যবসায়ের ব্যাঘাত ঘটে তাই আগে থেকেই তারা সাবধানতা অবলম্বন করছে। গবেষণাগার ও কারখানা নূতন করে ভারতভূমিতে স্থাপনের জন্য তারা যারপরনাই তৎপর

হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি তাদের একটি বৃহৎ গবেষণাগার উদ্বোধনের খবর সকলেই পেয়েছেন। ভারতবর্ষে রঞ্জন-পদার্থ প্রস্তুত করবার কাঁচা মাল পাথুরে কয়লাব অফুরন্ত ভাণ্ডার বিদ্যমান, দেশে মাথাওয়ালা বিজ্ঞানী এবং কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারেরও অভাব নেই—বিস্তৃশালী শিল্প-পতির সংখ্যাও আমাদের নিতান্ত নগণ্য নয়—কিন্তু এতৎ-সত্ত্বেও দেশে এই অশেষ কল্যাণপ্রসূ রাসায়নিক শিল্প কেন যে গড়ে উঠছে না তা ভেবে পাই না। দেশে রঞ্জন-শিল্প প্রতিষ্ঠার আর একটি উল্লেখযোগ্য উপযোগিতা এই যে, যুদ্ধোপকরণ বিস্ফোরক পদার্থ তৈরিরও ইহা মস্তবড় সহায়। কামারশালে কাণ্ডে কোদালি তৈরী হলেও প্রয়োজনমত তাতে যেমন বর্ণা, বল্লম, এমন কি তরবারি পর্যন্ত তৈরি করা যেতে পারে, রঞ্জনশিল্পের কারখানাতেও সেইরূপ স্বল্পমাসেই নানা প্রকারের বিস্ফোরক জাতীয় মারণাস্ত্র তৈরি করা সম্ভবপর। আর রঞ্জন-শিল্পের সঙ্গে আধুনিক ঔষধপত্র, গন্ধ দ্রব্যাদির প্রস্তুতিও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কিন্তু আজ দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের ক'জন এ কথা ভেবে দেখেছেন বা এর প্রতিষ্ঠার জন্ত সচেষ্ট হচ্ছেন? তাই বিদেশী কারখানাগুলি আজ এদেশে জেঁকে বসবারি আয়োজন করছে। এরা গবর্ণমেন্ট ও দেশবাসীর চক্ষে ধূলি নিক্ষেপের চেষ্টাই বেশী করবে। এদেশে কারখানা স্থাপনের ঠাঁওতায় তাদের দেশের উৎপন্ন রঞ্জনপদার্থ এবং ঔষধাদি এনেই তারা এদেশ ছেয়ে ফেলবে, ফলে তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দেশীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান দাঁড়াতে পারবে না। কেহ নতুন করে এই জাতীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের সাহসও আর পাবে না। গরীব দেশের অল্পস্ব অর্থব্যয়ে যেসব ছাত্র উচ্চতর বিজ্ঞান বা ইঞ্জিনীয়ারিং অধিগত

করবে তারা তাদের অর্জিত জ্ঞান দ্বারা দেশের গঠন-মূলক কাজ করবার সুযোগও পাবে না। বিদেশী কোম্পানীগুলির দালালি করে বা তাদের বিক্রয় ও প্রচার বিভাগের বড়বাবুর পদ নিষে মোটা মাহিনায় তাদের দিন গুজরান করতে হবে। ভবিষ্যতে রাজ্য পরিবর্তনের ফলে আমাদের চোখ ফুটলেও বিদেশী কোম্পানীগুলিকে আর স্থানচ্যুত করা সহজ হবে না—এখন মিশর ও পারস্যে যা ঘটছে তারই পুনরতিনিয় হবে মাত্র।

তাই বলি, রঙিন শাড়ীর পেছনে যে আশুপন আজ ধুমায়িত হয়ে উঠছে সময়ে সাবধান না হলে সারা ভারতের সুখস্বাচ্ছন্দ্য, আশা-আকাঙ্ক্ষা সেই আশুপনে ভস্মীভূত হয়ে যাবে। ভারতকে নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদির জন্ত চিরদিন পরমুখাপেক্ষী হয়েই থাকতে হবে। শিল্পবাণিজ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা ব্যতিরেকে সত্যি-কারের স্বাধীনতা লাভ হয় না। অনেক প্রকার 'বর্জন'ই ত আমরা সফল করে তুলেছি, আর মেয়েরাই এতে বেগী অংশ গ্রহণ করেছেন। বাদে স্বামী পুত্র সহোদর এক ছটাক রংও তৈরি করতে পারেন না—সেই না লক্ষ্মীদের রঙিন শাড়ীর প্রতি এত মোহ কেন? আজ তাঁরা সম্মিলিতভাবে রঙিন বস্ত্র বর্জন আন্দোলন আরম্ভ করুন। পুণ্যলোকা পাঞ্চালীর ছায় তাঁরা পণ করুন, ভারত যতদিন নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে রঞ্জন-শিল্প প্রতিষ্ঠিত করতে না পারছে ততদিন তাঁরা পদ্মিনী নারীর আদর্শে শুদ্ধ ধবল বস্ত্র পরিধান করেই ছুপ্ত থাকবেন। বিবেকানন্দ, প্রফুল্লচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্রের পুণ্য আদর্শে অমুপ্রাণিত বাংলার মা বোনেরা বিবহটির গুরুত্ব উপলব্ধি করবেন বলেই আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস।



চীনের ভারতাক্রমণ প্রসঙ্গে

শ্রীমূলপ্রসাদ সর্বাধিকারী, বার-এ্যাট-ল

চীনের নির্লক্ষ্য ভারতাক্রমণ তথা চীন-ভারত সংঘর্ষ ভারতের পক্ষে শাপে বর মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক। শিখ, মহারাষ্ট্র, গুর্খা প্রভৃতির রণদক্ষতার কথা ইতিহাসে জাঙ্জল্যমান। 'লাল কোর্ডা'র পলাশী-অভিযান অবিস্মরণীয়। বারোভূঁইয়ার চাঞ্চল্যকর ঘটনাদিও স্মৃতিকে নাড়া দেয় সজোরে।

বঙ্গ তথা ভারতের গৌরবময় এ সকল যুগের ইতি-কথা কালক্রমে ইতিকথাতেই বিলীন হইয়াছে। ইহা ঘটবার সঙ্গে সমগ্র ভারত গা ভাসাইয়া দেয় আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের জোয়ারে। আত্মবক্ষার ক্ষণও মুখ চাহিয়া থাকিতে অভ্যস্ত হয় পরের উপর। বিদেশী শাসনের এই বিষময় ফল ভারতের অস্থিহুম্মা ভেদ করিয়া তাহার সাধারণ কর্তব্যসাধনেও পঙ্গু বৎ করিয়া রাখে।

অবশ্য বিদেশী কর্তার প্রয়োজনে ভারতীয় সশস্ত্র শক্তির সাহায্য গ্রহণে কখনই কালবিলম্ব ঘটে নাই। তবে সেই সশস্ত্র শক্তির সাহচর্য, ভারতীয়ের কোনও প্রকারে না ঘটে, সেদিকে স্তেনদৃষ্টি রাখিয়া।

ব্যাপার সে কারণে এগন হয় যে, ভারতীয় সশস্ত্র শক্তি ও সাধারণ ভারতীয়ের মধ্যে সম্পর্ক পাকে-প্রকারে শাসক ও শাসিতের সম্পর্কই দাঁড়ায়। বিদেশী স্বার্থাঙ্ক শাসননীতির ফলে সশস্ত্র ও নিরস্ত্র ভারতীয়ের মধ্যে একতাবোধেও তাঁটা পড়ে।

ভারতীয় রাজনীতিকদের ক্রমবর্ধমান প্রচেষ্টায় স্বদেশের অধীনতা-নাগপাশ ছিন্ন করাইবার কাহিনী শুনিতে সাধ থাকে, সাময়িক ইতিহাস অক্ষরে অক্ষরে তাহা বলিয়া দিবে। ইহাও চ'খে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিবে, নিরস্ত্র বাঙালীই 'Quit India' অভিযান পট-ভূমিকার পরিবর্তন ঘটায় আকস্মিকভাবে। অবাক-বিস্ময়ে নিরস্ত্র ভারত চাহিয়া দেখে এই অভাবনীয় অভিযান ও অভিযানকর্তার দিকে।

ইহার বহু বহুকাল পূর্বে সর্বদেশ সর্বজাতিবরণ্য স্বামী বিবেকানন্দ সুস্পষ্টভাবে ইঁাকিয়া ইঁাকিয়া ভারতের জনমনকে উদ্দীপ্ত করিতে অমুজ্জ্বল করেন—ভায়ে ভায়ে

এক হও, উত্তীর্ণত জাগ্রত। দেহ-মন নির্মল, সবল কর। ইহা করা খুবই সহজ। ফুটবল খেল। মাতা, জায়া, ভগিনী, কন্ডার সম্যক্ সমাদর কর। জাতিবর্ণ ভেদ মনের কোণেও স্থান দিও না। কর এইসব। করিলেই গাম্ভ্য হইবে। গাম্ভ্যকে গাম্ভ্য মাধায় তুলিয়া লইবে। অগাম্ভ্য কাছে ঘেঁষিতে পারিবে না।

খেলার মাঠে খেলোয়াড়েরা স্বামী বিবেকানন্দকে ঘনিষ্ঠভাবে পাইবার সৌভাগ্য লাভ করে দুইদিন মাত্র। স্বামীজীর দৃষ্টি এড়ায় না, খেলুড়দের স্বাস্থ্য, একাগ্রতা ও একতাভাবের। দেহ-মন স্তম্ভ ও সবল রাখিবার এই সহজ উপায় জনে জনে জানাইতে তাই কালবিলম্ব করেন নাই তিনি।

'Quit India'-র মূল গায়ন সুভাষচন্দ্র ও কালবিলম্ব করেন নাই স্বামী বিবেকানন্দকে মনে-প্রাণে বরণ করিয়া লইতে। বালক সুভাষ, কিশোর সুভাষ, যুবক সুভাষ বিবেকানন্দময় হইয়া থাকে। 'আজাদ হিন্দ ফৌজ'এর সংগঠকরূপেও বিবেকানন্দের বিবেক অনুসরণ করিয়া মহান ত্রুতে আপনাকে নিযুক্ত করেন। ফৌজ গঠিত হয় সকলকে লইয়া জাতিধর্মনির্বিচারে। বাঙ্গালী রাণী বাহিনী গঠন করাইয়া সুভাষচন্দ্র শক্তিরূপিণী নারীর মর্যাদা-পুঙ্খার অপরূপ ডালি সাজাইয়া আপনাকে ধন্ত বোধ করেন।

'Quit India'-র বীরাগ্রগণ্যের বীৰ্য্যে দেশবাসী চমকিত হয়, আশু বিপদের আশঙ্কায়ও অতিষ্ঠ বোধ করে। দেশবাসীর এ অতিষ্ঠ ভাব নিমেষে দূর করে বীরবর স্বদেশ ছাড়িয়া, অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে আপনাকে ফেলিয়া। পৃথিবী জ্বরিত তাঁহাকে দেখিতে পায় 'নেতাজী'রূপে। 'নেতাজী'-পরিচয় সম্যক্ভাবে নরলোকে পায়, আজাদ হিন্দ ফৌজের শ্রেষ্ঠাংশ 'গান্ধী বাহিনী' নামকরণ হেতু। ধন্ত নেতাজী, ধন্ত তাঁহার স্বয়ংসিদ্ধতা এই এক আচরণে সপ্রমাণিত হয়। শৌর্য্য বীৰ্য্যের আকর পাঠস্থান ভারতবর্ষের মাটি জল নিশ্চয়ই! দুইশত বৎসরের নগ্ন

অধীনতা যাহার শক্তি তিলমাত্র হ্রাস করাইতে পারে নাই।
হায় হায় কি মোহনিদ্রাই ভারতকে পাইয়া বসিয়াছিল।
তাহার অবসানে! সেই কথাই বলিবার চেষ্টা করি।

ভারতের মহামুত্তবতার ফলেই বিশ্বসভ্যতার
আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া দিকে দিকে জ্যোতিঃ
বিকীরণের সুযোগ পাইয়াছে। ইহাতে 'না' যে বলিধে
সে মিথ্যাবাদী। আধুনিক Court এর ইহা বিচার
করিবার সামর্থ্য আছে কি? শক্তি আছে মাত্র বিশ্ব-
ব্যাপী আঙ্গিক আদালতের। নবগ্রহের সার্থক সম্মেলনে
হয়ত যথাসময়ে ইহার আবির্ভাব ঘটিতে পারে। তখন
আর কেহ থাকুক আর না থাকুক ভারত থাকিবে।
ভারত থাকিবার মত ছিল, যখন অসভ্যতা ও বর্বরতায়
বিশ্ব ভরিয়াছিল। আবার থাকিবে, বিশ্বজীলার ধ্বংস
হইতে হুর্ভাগ্যদের টানিয়া তুলিতে। তাণ্ডবলীলার নিরোধ
অনাদিকালের সত্যাপ্রিত ভিন্ন আর কাহার দ্বারা সম্ভব?

হতভাগ্য বৌদ্ধ চীন ইহার মর্ষ বুঝিয়াও বুঝিল না।

২ অহিংস-দীক্ষার দীক্ষিত হইয়াও হিংসা হইল তাহার
আন্তরণ। নালন্দার মর্যাদা সে দূরে পরিহার করিল।
পুরাতনী ইতিবৃত্ত থাকুক। অগ্রগতির যুগে হালের
কথাই এই চীন মহাচীন হইলেও যখন সভ্যজগতের চক্ষে
অস্পৃশ্য, তাহার হাত স্নেহভরে ধরিয়া পাশে দাঁড়াইয়াছে
ভারত, তাহার ইচ্ছা রক্ষা করাইতে।

নালন্দার পক্ষপৃষ্টিত বুদ্ধের প্রচারণাশোভিত
হইলেও, চীনকে এক আঁচড়ে কবিকুল মহর্ষি হেমচন্দ্র
'অসত্য' পর্যায়ে ফেলিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন
নাই। ইহা বলিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন নাই তিনি, যে
ভারতের চক্ষু মুদ্রিত। কে বলিবে যে তিনি এ কথা
বলিয়া ইঙ্গিত করেন নাই যে, ভারত এই অসত্য চীনের
পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া নিজের সমূহ বিপদ টানিয়া
আনিতেছে। এই অসত্যের সুযোগ গ্রহণ করিতে চীন
অহরহঃ চেষ্টিত থাকে, স্বদেশকে দৃঢ় পদক্ষেপে বর্বরতার
চূড়ায় অধিষ্ঠান করাইতে।

অন্ধের কিবা রাজি কিবা দিন! সেই সুযোগে
তথাকথিত সভ্যতা ফলাও করাইবার চক্রান্তে "সভ্য
চীন" আকাশ বাতাস কাঁপাইয়া রব তুলিল, "হিন্দি চিনি

ভাই ভাই"। বান্দুং-এর বন্দনায় 'ঘাড় মুড়' গুঞ্জিয়া
পড়িল। চাণক্যকে ছাপাইয়া মহা চাণক্যের আসনে
আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করাইবার পারদর্শিতা দেখাইল।

বিদেশী শাসন ও শোষণের মহাজাল ভেদ করিয়া
ভারত স্বচ্ছ আকাশতলে যখন নিজ স্বখনীড় গড়িবার
চেষ্টায় তন্ময়, পশুবলে নীড় রক্ষা করাইবার চিন্তা তখন
তাহার মনে উদ্ভিত হয় নাই। বহুধৈব কুটুখকম্ বোধ
যাহার শিরায় শিরায় প্রবাহিত, তাহার প্রয়োজন কি
পশুবলের? অনাদিকালের ঐতিহ্যে প্রাচ্য গৌরবাস্থিত।
সে ঐতিহ্যের গৌরবই ভারতের বরগীষ। পশুবলে কে
কোথায় কবে চিরস্থায়ী হইয়াছে! আর প্রাচ্যের আদর্শ
ক্ষুণ্ণ করাইয়া কবে কোন শক্তিদ্বারা তার অস্তিত্ব বিলোপ-
সাধনে সক্ষম হইয়াছে? ভারতের এই মহাসাগর তীরে
আসিয়াছে, আসিয়া মিলিয়াছে সকলে, আবার মিলিবেও
সকলে। ভারতনীতির অবসান ঘটায় সাধ্য কার?

ভারতের এই স্মহান ভাবের অন্তর্ভেদ করিতেই রব
উঠিল, "হিন্দি চিনি ভাই ভাই"। ভারত সে রবে উজ্জ্বলিত
হইল। হুর্ভেদ্য গিরিশৃঙ্গ পারের চৈনিকের এই অন্তরঙ্গতা
দেবতার মহান শুভেচ্ছার ইঙ্গিত বলিয়াই ভারতের
প্রতীয়মান হইল। ভারতের পক্ষে ইহা নবতম চৈনিক
প্রাচীর বলিয়া অস্বীকৃত হইল। চৈনিককে 'কুটুখকম্'
রূপে লাভে হর্ষাশ্বিত হইল। হর্ষের আবেগে চীনের
শুভসাধনে দিকে দিকে, এমনকি ইউ. এন. ও.-তেও
ভারতের চেষ্টার অবধি রহিল না। প্রাচ্যের ঐতিহ্যো-
পযোগী ইহা নিশ্চয়ই। প্রাচ্যের সেই গৌরবময় ঐতিহ্যের
অশেষ অবমাননা অকস্মাৎ করিল কিন্তু চীন, মিথ্যা
ছলা-কলা করিয়া। কৃতঘ্নতারও চরম উদাহরণ ইহা।

চীনের মনে হয় নাই, ঐতিহ্যবোধের পাশাপাশি
থাকিতে বাধ্য আত্মসম্মান, অবিচ্ছিন্নতা ও স্বাধীনতা-
বোধ। প্রাচ্যের সহস্র সহস্র নারীও কখনও কুণ্ঠিতা
হয় নাই আত্মবলি দিয়া ইহা রক্ষা করিতে। ভারত-
বীর্ষের আভাষ চীনের জ্ঞান! নাই, ইহা হইতেই
পারে না। থাকুক আর নাই থাকুক, শীঘ্রই তার
আত্মদান দানে ভারত কপণতা করিবে না। বারান্তরে
প্রসঙ্গটিকে আরও পরিষ্কট করার ইচ্ছা রহিল।

আলোকদিশারী

শ্রীরমণ



ঋষিকাচার্য কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

অপ্রত্যাশিত দুঃসংবাদ! একটা অব্যক্ত বেদনার অমুভব। এত দূরে! কত দীর্ঘদিনের অদর্শন! তবুও! মৃত্যু বিশ্বতপ্রায় অতীত এক আত্মিক পরিচয়ের সন্কেত দিয়ে গেল। স্মৃতি বুঝিবা অমর।

সংবাদপত্রে দেখলাম কেঁটদা নাই! কেঁটদা—সংস্কৃতির সত্যাপতি ও ঋষিকাচার্য শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য। গত ৭ই এপ্রিল তিনি অপরাহ্নে ৬২ বৎসর বয়সে দেওঘর সংসদে পরলোকগমন করেছেন। সংবাদ-পরিবেশনের ভঙ্গীতে সমীহর অভাব মনে হল। যুগের গতি ও প্রকৃতিরই ইহা স্বাক্ষর। রাষ্ট্রীয় বা রাজনৈতিক নেতা যদি তিনি হতেন তা হলে তাঁর মৃত্যু-সংবাদটি অনেক ফলাও করে দেশের ও দেশের সামনে বিজ্ঞাপিত হ'ত নিশ্চয়ই।

একটা স্মৃতিহীন স্মৃতিপ্রসারী আদর্শের বেদীমূলে আত্মনিবেদিত এই মহাজীবনের মৌন মহত্ব আজিকার শূন্যগর্ভ আফালনসর্ব্ব্ব যুগের উপরিচর মানদের নিকট শ্রদ্ধেয় হবে, এমনটি আশা অবশ্য করি না। তথাপি ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এই বিবাহ প্রতিভাধর পুরুষ-প্রবর জীবন-বিকাশের যে কোন দিকের নেতৃত্বের জন্মগত অধিকার নিয়েই জন্মেছিলেন। পদার্থ-বিদ্যার সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার তিনি করেন

এবং বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডঃ সি. ভি. রমণের সহকারীরূপে গবেষণায় রত হন। আজকের দিনের বহু বিদিত বৈজ্ঞানিক ডাঃ মেঘনাদ সাহা, সত্যেন বসু জ্ঞান ঘোষ প্রমুখের তিনি দমসাময়িক, সমকক্ষ ও বন্ধু-স্থানীয় ছিলেন। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও কৃষ্ণপ্রসন্ন নিশ্চয়ই অসামান্য হতে পারতেন, ইহা অনিশ্চিত। কিন্তু তিনি অসামান্যদের মধ্যেও অসামান্য ছিলেন—যার জন্ম সমস্ত যশঃ, মান, মর্যাদা তুচ্ছ করে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে পেরেছিলেন সামগ্রিক পরম কল্যাণের বেদীমূলে।

কৃষ্ণপ্রসন্নের জীবনের মোড় পরিবর্তন অপরিহার্য ছিল। তিনি ছিলেন যুগ-চিহ্নিত—যুগের ঠাকুরের পায়ে মাথা নত করাটা তাঁর জীবনের অনিবার্য ঘটনা। ধর্ম-ভারতাস্রার মূর্ত্ত বিগ্রহ শ্রীশ্রীঠাকুর অমুকুলচন্দ্রের অমুগত শিষ্য ও অন্তরঙ্গ সহচর—এই-ই ছিল কৃষ্ণপ্রসন্নের বড় পরিচয়—তাঁর স্বরূপ সত্তার সহজ স্বাভাবিক প্রকাশ। যুগ-প্রবৃত্তির প্রতিকূল দিক পরিবর্তন করে ঋষিবাদের যুগোপযোগী পুনঃপ্রতিষ্ঠা—যা-ই ঠাকুর অমুকুলচন্দ্রের দিব্যজীবনের পরম অভিসন্ধি—তারই সার্থক বাহন হিসাবে কৃষ্ণপ্রসন্নের জন্ম ও জীবনের চরম চরিতার্থতা। এই আলোকে দেখলে তাঁর দেহান্তর ঘটলেও লোকান্তর নেই। পরমপুরুষ শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্যলোকের নিত্য-সেবক তিনি। যুগে যুগে কৃষ্ণপ্রসন্নের আসা-যাওয়া এই পরমের ইচ্ছা পরিপূরণার্থেই।

বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভ।

পাবনা হিমায়েতপুরের সেদিনের অশান্ত উদ্দাম পদ্মার পাড়ে পারিজাত পুষ্প স্ফুটোন্মুখ মাত্র। তখনও সৌরত দিকদিগন্ত ছড়িয়ে পড়েনি। অমুরাগে ডগমগ অমুকুলচন্দ্র। প্রেমবিগলিত পুষ্পকোমল অঙ্গরাগের মাধুরীর অব্যক্ত আকর্ষণ। উচ্ছল বোঁবন। উদ্বেলিত মনোপ্রাণ। ব্রাহ্মণ্য ভারতের নবজন্মের গর্ভবেদনা সুরু হয়েছে। আঁখি তাঁর আপনজনের সন্ধানরত। মহাভাববিভোর ঠাকুরকে কেন্দ্র করে মহাকীর্তনের রোল আকাশ-বাতাসে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলেছে। এই ভাবতরঙ্গ পদ্মা-গড়াইয়ের সঙ্গমপারে বৃষ্টিয়ায় প্লাবন এনেছে। শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের কথা। ঠাকুরের লীলাভূমি কুষ্টিয়া। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা-ডাক্তার-উবিল অধ্যাপক, কত ভোগী উন্মত্ত হুরাচারী তাঁর স্মৃতিতল বক্ষে ঠাঁই পেয়ে ধস্ত হয়েছে। ভগীরথের মতই মুষ্টিমেয় ধারা সেই যুগে এই ভাববজ্রকে বাংলার প্রতি প্রত্যন্তে বহন



শিল্পীঘন

— শ্রী ব্রজ লাল ঘোষ —

সুবর্ণযুগের ভারতবর্ষ। হিন্দু দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, শিল্প ও সস্ত্রীতির চরম বিকাশ এই যুগে। এদেশে দীর্ঘ দেহ সুদর্শন নরনারীরা দেবতার আশীর্বাদে তখন বুঝি আপন চরিত্র গৌরবে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। ছোটবড় শ্রোতাস্থিনীর তটে শ্রামল পল্লবিত জনপদ, পিছনে দিগন্ত-করে নিয়ে গেছেন তাঁরাও চিহ্নিত, তাঁরাও সংসদের ইতিহাসে অরণীয়।

বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকের সূচনায় কৃষ্ণপ্রসন্ন তাঁর আপন মানুষের আবির্ভাব অম্লভব করেন। উদীয়মান জীবনের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও সফল প্রতিশ্রুতির মোহ কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত এই প্রাণের ঠাকুরের কাছেই সর্কিতোত্তাবে উৎসর্গ করলেন। ধূজটির মতই ঋষি-লোকচ্যুত জীবন জাহ্নবীধারার পতনবেগ শিরে ধারণ করলেন কৃষ্ণপ্রসন্ন।

তখনও সংসদ দানা বাঁধেন।

কৃষ্ণপ্রসন্নের আগমন গভীর তাৎপর্যগর্ভ। ঠাকুর পেলেন তাঁর চিহ্নিত মানুষকে। দেখেই চিনলেন। বৃকে ধরলেন। কৃষ্ণপ্রসন্নও মজলেন, মরলেন। নবজন্ম হ'ল তাঁর সার্কজনীন কেউদায়।

ঠাকুরের বিরাই হিয়া যেন আশ্রয় পেল।

বিস্তারী বনভূমি, কোথাও বা টেউ খেলানো পাহাড় আকাশের মেঘের সীমানায় মাথা তুলেছে। জনপদের ছোটবড় গৃহগুলির শীর্ষে মন্দির ও মঠের উচ্চ শীর্ষ চোখে পড়ে। দেবভূমি ভারতবর্ষ, অমৃতের পুত্র ভারতবাসী দেবতার মহিমা নিয়ে নিজেকে মহৎ করে তুলেছে। হিমাচলের তুঙ্গ শৃঙ্গ কেদারনাথ থেকে দক্ষিণে সাগর-প্রান্তে রামেশ্বরম্, পূর্বের চন্দ্রনাথ থেকে পশ্চিমে সোমনাথ দ্বারকাধাম অবধি মন্দির ও মঠের শেষ নেই। যেখানে ধরিত্রীর রূপ অপরূপ হয়ে ধরা দিয়েছে সেখানেই হিন্দু জগৎ-প্রপাণ কাছে প্রাণের অর্ঘ্য নিবেদন করেছে সুউচ্চ মন্দিরে সুদৃশ্য বিগ্রহ স্থাপনা করে। দেবতাকে হিন্দু নিজের মনের মত করে গড়েছে—কখনো নারী, কখনো পুরুষ, কখনো-বা অর্ধনারীশ্বর, কখনো সৌম্য, কখনো মহান, কখনো রুদ্র, কখনো-বা প্রলয়ঙ্কর। হিন্দুর দেবতা হিন্দুর অন্তরের সৃষ্টি, তাই ঘরে ঘরে বিগ্রহ, মন্দিরের পর মন্দির, নিজ নিজ ইষ্টসাধনা। দেবতা ছাড়া হিন্দুগৃহ নেই, মন্দির ছাড়া হিন্দু জনপদ নেই। যে জনপদের যত সমৃদ্ধি, সেখানে ততো মন্দির।

মধ্য ভারতের এমনি এক মন্দিরবহুল জনপদ যোগিনীঘাট।

নর্মদা নদীর তীরে একটি ছোট পাহাড়। পাহাড়ের উপর প্রশস্ত চত্বর, সেখানে এক মন্দির, মন্দিরে হরপার্বতীর যুগল বিগ্রহ। আর সেই মন্দির-চত্বর ঘিরে

সর্কাস্ত্রঃকরণের অপার্থিব প্রসাদ ও প্রসন্নতায় কৃষ্ণ-প্রসন্নও মায়ের মতই স্নেহাঙ্কল বিছিয়ে কোলে তুলে নিলেন সংখ্যাহীন সমাগতদের। সংসদ সংস্থাও ক্রমশঃ দানা বেঁধে উঠতে লাগলো, বিস্তৃত হতে লাগলো ঠাকুরের বিচিত্র ভাবস্বপ্ন কর্মপ্রতিষ্ঠানে।

আজকের ব্যাপক সংসদ আন্দোলনের গোড়ার মুষ্টিমেয়দের মধ্যে সম্ভবতঃ সর্কাগ্রগণ্য কৃষ্ণপ্রসন্ন। শ্রীশ্রীঠাকুর অমুকুলচন্দ্রের কল্পস্বপ্নের রূপকার তিনি। ঠাকুর ভাববিগ্রহ, আর কৃষ্ণপ্রসন্ন সেই ভাবের রূপায়ণ। ঠাকুর তত্ত্ব—কৃষ্ণপ্রসন্ন সেই তত্ত্বের জীবনভাষ্য। স্বীয় জীবনে আচরণ করে তিনি সংসদীদের সামনে রেখে গেছেন জীবন্ত দৃষ্টান্ত। তাঁর জলন্ত জীবনদাপ্পর্শে অগণিত দীপ জ্বলেছে। আজ বিদেহী তিনি। কিন্তু কৃষ্ণপ্রসন্ন সংসদের চিত্তগগনে অনির্বাক্য আকাশ-প্রদীপের মতই আলোকদিশারী হয়ে থাকবেন আগামীকালেও।

অধঃক্ষাণকারে চৌষটি যোগিনী মন্দির। জনশ্রুতি আছে এই দেবীর কাছে কিছু মানসিক করলে মনস্বামনা সফল হয়। প্রতিষ্ঠান থেকে খজুরপুরী হয়ে বিদিশা ও উজ্জয়িনী যাবার পথে স্বার্থবাহ ও তীর্থকামীরা যোগিনী-ঘাটে হরপার্বতীর পূজা না দিয়ে যায় না। পাহাড়ের নীচে অতিথিশালায় দু-চার দিন তারা অবস্থান করে। তাদের কাছ থেকে এখানকার জনপদবাসীরা বহু দেশের সংবাদ পায়, তাদের কাছেই বেচাকেনা করে এখানকার বিপণিগুলি সমৃদ্ধ।

যোগিনীঘাটের বিশেষত্ব তার প্রস্তর-শিল্প। খেত-পাথরের বাসনকোসন ও সৌখীন কাজে জয়পুরের পরেই এই যোগিনীঘাট। এখান থেকে যোজনখানেক গেলেই নর্মদা প্রপাত ও তার দু'পাশে দুধপাহাড়ের সারি। সূর্যের আলোয় এই প্রপাতের জলে রামধনুর খেলা চলে, দুধপাহাড়ের গায় রঙীন ছবি আঁকা হয়। যাত্রীরা মুগ্ধবিস্ময়ে দেখে, যতো দেখে ততোই তাকিয়ে থাকে।

এই দুধপাহাড়ের পাথরের চাকলা কেটে এনে এখানকার শিল্পীরা কাজ করে, বহিরাগতেরা এই দুধ-পাথরের কাজই খোজে। এই কাজের জন্তই তারা পয়সা দেয়। যোগিনীঘাটে তাই ভাস্কর-শিল্পীর সংখ্যাই বেশি। বংশপরম্পরায় তাদের পাথরের কাজ, বনেদী যত ভাস্কর-গোষ্ঠী। জন্ম থেকে ওরা পাথরকে ভালবাসে, শাদা পাথরের উপর পালিশ তুলে, তার উপর সম্মুখে হাত বুলায়, আনন্দে দু'চোখ উজ্জল হয়ে ওঠে। কোন কাজের খুঁৎ দেখলে ওদের বুকের মাঝে খচ্ খচ্ করে ওঠে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ওদের সমস্ত মনকে ঘিরে থাকে শাদা পাথর। ওদের জীবনে পাথর ছাড়া আর কিছু নেই। পাথর ওদের মনের সঙ্গে কথা কয়, ওদের অন্তরকে স্পষ্ট করে।

দেবকুমার এই ভাস্কর-গোষ্ঠীরই একজন। জন্ম থেকেই সে পাথরকে ভালবাসতে শিখেছে। জ্ঞান হওয়া থেকেই সে দেখেছে, পিতা ও পাথর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

ভাস্কর-গোষ্ঠীর সমাজপতি জনার্দন। দুধপাথরের বাসনকোসন তৈরী করতে জনার্দনের সমকক্ষ ভাস্কর যোগিনীঘাটে আর কেউ ছিল না। পাথরের গায়

পালিশ তুলতে পারতো আন্ননার মত। খালা ও বাটির চক্রাকার গড়ন ছিল নিখুঁৎ, তার কিনারায় সূক্ষ্ম শিল্পকর্ম ছিল দেখবার মত। পাথর কাটতে কাটতে পাথরের কণা লেগে চোখ ঝাপসা হয়ে গেছে, হাতের আঙ্গুলেই সে কাজ করে। ভাস্করজীবনের শেষ বয়সে এইটাই স্বাভাবিক পরিণতি। পিতা যখন চোখে ঝাপসা দেখেন, পুত্র তখন পিতার কাজ সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব নেয়। দেবকুমারও পিতার কাজ হাতে নিয়েছিল। অস্পষ্ট দৃষ্টি পিতার বাসনকোসনে কারুকাজ ফুটিয়ে তুলতো দেবকুমার।

দেবকুমার পিতার কাছেই ছেদনী ধরতে শিখেছিল। পাঁচ বছর বয়সে ব্রাহ্মণকুমারের হাতেখড়ি হয়, ক্ষত্রিয়-পুত্র তলোয়ার ধরতে শেখে, বৈশ্যপুত্র ভাত্র মাসের সংক্রান্তির দিনে বিশ্বকর্মার পূজা করে যজ্ঞে হাত দেয়। পুরো দশটি বছর গোষ্ঠীগত কারিগরিতে হাত পাকিয়ে পনেরো বছর বয়সে দেবকুমার পুরোপুরি ভাস্কর হয়ে ওঠে। তার হাতের কাজ জনার্দনের চেয়েও এতটুকু নিরেশ হয় না। প্রতিবেশীরা বলে—জনার্দনের ছেলেটি একটা সহজাত সংস্কার নিয়ে জন্মেছে।

কিন্তু দেবকুমারের সংস্কার ভিন্ন পথ ধরলো। এক সময় লুকিয়ে লুকিয়ে পাথর কেটে সে এক নটরাজ মূর্তি খোদাই করে বসলো। এক বিশ্বকর্মা পূজার দিনে শ্রেষ্ঠীদের গোষ্ঠীপতি কুশধ্বজ শ্রেষ্ঠীর পুত্র নীলধ্বজকে সে উপহার দিল সেই শিল্পকর্ম। নীলধ্বজ সেই মূর্তি এনে দেখালো পিতাকে। কুশধ্বজ বললেন—কাজ ভালই হয়েছে, কিন্তু এই সৌখীন কাজের খরিদার কোথায়?

তারপর দেবকুমারকে ডেকে একদিন বলেছিলেন—সিংহমূর্তি খোদাই করতে পারবে? আমার অনেকদিনের ইচ্ছা আমার তোরণের দু'পাশে দুটি সিংহমূর্তি রাখি।

দেবকুমারের পুরো দু'টি মাস লেগেছিল দুটি সিংহ-মূর্তি করে দিতে। কুশধ্বজ খুসি হয়ে পাঁচ টাকা পুরস্কার দিয়েছিল। জনার্দন সব দেখে শুনে বলেছিল—এটা ভাস্করবংশের দোষ। সৌখীন শিল্পের নেশা এক একবার এক একজনের মাথায় ভর করে, তাতে দেশজোড়া নাম হয় সত্যি, কিন্তু অমের সংস্থান হয় না। খালাবাটি যত

সহজে মানুষ কেনে, সৌখীন কারুশিল্প ততো সহজে তো বিক্রী হয় না। দূরদূরান্তের মানুষ কিনে নিয়ে যেতে ভয় পায়, পাথরের সৌখীন জিনিষ, একটু চোট খেলেই গেল, সৌখীন কাজে তাই কোনদিনই শিল্পীর মজুরী পোষায় না।

—কিন্তু এই কাজ করতে আমার বড় ভাল লাগে—
দেবকুমার বলেছিল।

—ভাল কাজ করতে সবাইকারই ভাল লাগে, কিন্তু খোরাকির জোগাড় হয় না বলে কেউ ভরসা পায় না। তুই এসব করতে চাচ্ছিস্ কন, কিন্তু ঘটি-বাটি-খালা করা ছাড়িসনে, সৌখীন কাজ সাজানো থাকবে কিন্তু আটপোরে কাজ অন্ন জোগাবে। আর পেটে অন্ন না থাকলে কোন কাজই হবে না।

মাতৃহারা পুত্রটিকে পিতা স্নেহ করতেন, পুত্রকে তাই নিরুৎসাহ করেননি। দেবকুমারও পিতার স্নেহের অমর্যাদা করেনি, সারা সকালটী বসে বসে সে খালা-বাটির গাব নকসা আঁকতো, আর বিকালে বসে পাথর খোদাই করতো নিজের মনোমত। হৃদপাথরের ছোট ছোট চাকলার উপর কখনো ফুটিয়ে তুলতো দেব-দেবীর মূর্তি, কখনোবা হস্তীমূৰ্খ, কি হংসবলাকা, নয়তো ফুলপাতার রকমারী নকসা। জনার্দন সেগুলি সাজিয়ে রাখতেন দোকানের বাসনকোসনের পাশে। নকসা একখানিও বিক্রী হতো না, তবে দেবদেবীর মূর্তি মাঝে মাঝে তীর্থযাত্রীরা কিনতো, দাম যা দিত তাতে মজুরী পোষাতো না। জনার্দন ভাবতেন, এইসব কাজের মজুরীর মূল্য দেখে হয়তো একদিন ছেলের মন ফিরবে, সেদিন বাসনকোসন ছাড়া আর কোন কাজে সে হাত দেবে না।

দেবকুমার কিন্তু তখন রূপসৃষ্টির আনন্দে মশগুল, পয়সার দিকে তার নজর ছিল না।

কিন্তু জীবনের এই স্বাচ্ছন্দ্য বেশিদিন রইল না। এলো ঝড়—জীবনের কালবৈশাখী। কয়েকদিনের সান্নিধ্যপাশিক জ্বরে জনার্দন মারা গেলেন। বিশ বছর বয়সে দেবকুমার নিঃসঙ্গ হলো। বড় বড় চোখের উদাসী দৃষ্টি নিয়ে নিঃসীম আকাশের পানে সে তাকালো, মর্মদার

তীরে বসে সর্বপ্রথম সে শুনতে পেল ঝোড়ো হাওয়ায় একটা অশ্রুট কান্নার স্বর আছে।

আনন্দের স্বর্ষ শোকের মেঘে ঢাকা পড়ল। পিতৃ-বিয়োগ দেবকুমারের জীবনকে বিশৃঙ্খল করে দিল। দোকান খুলে সে প্রতিদিন বসে থাকে সত্য, কিন্তু খরিকারের দিকে তার নজর থাকে না। কেউ দোকানের সামনে দাঁড়ালে কথা বলে কোন সাদা পায় না। দেব-কুমার আনমনা হয়ে পথের পানে তাকিয়ে বসে থাকে।

দেবকুমারের এই ভাবটা চোখে পড়ে নিরালার। জনার্দনের দূর সম্পর্কের পিসতুতো ভাই সোমনাথ, প্রতিবেশীও বটে, তারই একমাত্র কন্ঠা এই নিরাল। নিরাল। অল্পদিন আগে মাকে হারিয়েছে, দেবকুমার মন তাই সে ভালো করেই বুঝতে পারে। একদিন দেবকুমারকে ভিজ্ঞাসা করলো—রামা তো করো না একদিনও, খাও কি?

জীবিয়োগের পর থেকে জনার্দন অহস্তেই পাক করতেন।

দেবকুমার জবাব দিল—না, রাঁধতে ভালো লাগে না।

—রাঁধতে জানো?

—বাবার কাছে শিখেছিলাম।

—রামা না করে এই ক’দিন খাচ্ছ কি?

—ছাতু, চিঁড়ে।

—এভাবে ক’দিন চলবে?

—চলুক, যে ক’দিন চলে।

—ঘরে ছ’খানা চাপাটি বানিয়ে নেওয়া যায় না?

—কি দরকার অতো হাস্যমায়?

—তার মানে তুমি রাঁধতে জানো না।

—জানি না তো জানি না।

নিরাল। উদাসী মানুষটির মুখের পানে তাকিয়ে কি যেন ভাবলো, তারপর বললো—আজ রাতে আমাদের বাড়ী এসো, আমি তোমার খাবার করে রাখবো।

—আমার খাবার কথা মনে থাকবে না।

—মনে রাখার দরকার নেই, আমি তোমাকে ভেঁকে যাবো'ধন।

—রোজ তোমার বাড়ী খেতে যাবো কেন ?

—তুমি না যাও, আমি পৌঁছে দিয়ে যাবো।

—আমি খাবো না।

—না খাও ফেলে দিও, তবু আমি দিয়ে যাবো।

—ক'দিন দেবে ?

—যতদিন পারি।

দেবকুমার তাকালো নিরালার মুখের পানে। নিরালা চোখে চোখ রেখে মুহু হাসলো শুধু।

সন্ধ্যার পর গণেশমূর্তির নীচে একটি দীপ জ্বলে দিয়ে প্রায়-অন্ধকার ঘরের দরজায় হেলান দিয়ে পথের পানে তাকিয়ে দেবকুমার বসেছিল। নিরালা এসে পড়লো, বললো—যেতে বলে গেলে যাবে কি না ঠিক নেই তো; তাই আমিই নিয়ে এলাম।

ভিতরে এসে হাতের থালাখানি নামিয়ে রাখলো, বললো—ঘরে আলো জ্বালানি কেন ?

পিদমটা সে একটু উজ্জ্বল করে দিল। তারপর বললো—কি, এখনও চুপ করে বসে রইলে ? হাতমুখ ধুয়ে এসে খেতে বসো।

—রেখে দাও।

—রেখে কি দোব ? আমাকে তো আবার বাসন-কোসনগুলো নিয়ে যেতে হবে। নাও, গুঠো।

দেবকুমারকে উঠতে হোল।

নিরালা শালপাতায় চাপাটি ও ভাজি সাজিয়ে দিল, উঠে গিয়ে মাটির কলসী থেকে এক ঘটি জল গড়িয়ে আনলো। তারপর সামনে পিঁড়ি পেতে দিল। দেবকুমার এসে খেতে বসলো।

নিরালা বললো—সারাদিন না খেয়ে থাকো কেমন করে ?

দেবকুমার কোন সাড়া দিল না।

নিরালা আবার বললো—সারাদিন তোমার এতো কিসের তারনা ? বাপমা কি সবাইকার চিরদিন থাকে ?

এবার দেবকুমার সাড়া দেয়, বললো—বাবার কথা তো আমি ভাবি না।

—তবে কি ভাবো সারাদিন ?

—দোকানটা কাউকে দিয়ে দিতে হবে। এ দোকান আমি চালাতে পারবো না।

—ভাস্করের ছেলে পাথরের দোকান চালাতে পারবে না তো করবে কি ? খাবে কি ?

—তা-ই তো ভাবছি কি করবো।

—এ পাগলের ভাবনা, যা করছ তাই করবে, দু'দিন মন খারাপ হয়েছে, আবার কাজে বসলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

—খালা বাটি ঘটি কাটা আমার পোষাবে না। আমার যা ভাল লাগে আমি তাই করবো, আমি বসে বসে মূর্তি খোদাই করবো।

—তাতে ক'পরমা পাবে ? কালেভদ্রে একটা মূর্তি বিক্রী হবে কি হবে না।

—সে যা হয় হবে, একটা মাসুকের দিন ঠিক কেটে যাবে।

—চিরকালই কি একু থাকবে নাকি ?—নিরালার চোখে একটা প্রত্যাশা ফুটে ওঠে। তার সঙ্গে দেবকুমারের বিয়ের কথাটা অনেকদিনের পুরানো। জনার্দন না মারা গেলে তার সম্ভাবনা স্বাধীন হতো, এখন একবছর কালার্দীচ পড়ে গেছে। তা যাক, তবু সেই প্রত্যাশার কথাটাই সে দেবকুমারের মুখ থেকে শুনতে চেয়েছিল।

দেবকুমার কিন্তু প্রশ্নটার উত্তর দিল অস্বভাবে। বললো—শিল্পী হ'তে হলে আগে শিল্পের কথা ভাবতে হয়, নিষ্কের ভাবনা তার পরে।

নিরালা ঠোঁট উল্টে বললো—খালি শিল্প নিয়ে জীবন চলে ?

দেবকুমার বললো—সে তখন দেখা যাবে, চলে কি না চলে।

নিরালা যেদিকে কথার মোড় ফেরাতে চেয়েছিল, সেদিকে কথা গেল না। দেবকুমারের আহ্বার শেষ হয়েছিল, নিরালা জায়গাটুকু পরিষ্কার করে বাসনকোসনগুলো

নিষে চলে গেল। দেবকুমার আবার এসে বসলো দরজার সামনে, পথের ধারে।

সোমনাথ দেবকুমারকে বিশেষ চোখে দেখেন। সে দৃষ্টি শুধু স্নেহের দৃষ্টি নয়—তার সঙ্গে কিছুটা স্বার্থও জড়িয়ে আছে। মনের অনেক দিনের আশা, এই ছেলেটির হাতেই একদিন নিরালাকে সে সম্প্রদান করবে। শৈশব থেকে অবাধ মেলামেশার স্মৃতি দিয়েছে, আবাণ্যের সখ্য আশ্রয় সাহচর্যে যুক্ত করা চাই। নিরালার মা তো মুখে কতবার বলেছেন—
ছ'শনে মানায় বেশ!

জনার্দনেরও অমত ছিল না, তবে সে বলেছিল—
ছেলেটা একটু মাছুষের মত হোক, বড় খেলালী, কদিন যাক।

সেই 'কদিন' যাবার আগেই নিরালার মা চলে গেল। জনার্দনও বিদায় নিল, এখন যা-কিছু করার সোমনাথকেই করতে হবে। কিন্তু পিতৃবিয়োগের পর ছেলেটা কেমন যেন উদাসী হয়ে গেছে।

সোমনাথ একদিন কথায় কথায় বললো—
দোকানটা এবার ভালো করে জমিয়ে তোলো।

দেবকুমার বললো—খরিদারের সঙ্গে ছ'একপয়সা নিয়ে অতো বাকুচাতুরি আমার ভালো লাগে না।

—কিন্তু এই করেই তো খেতে হবে।

—আমি দোকানদারি করতে পারবো না।

—নতুন কাজকর্ম কিছু ধরেছ নাকি?

—ভাবছি মূর্তি গড়বো।

—কি মূর্তি, দেবদেবীর?

—না, দেবদেবীর মূর্তি আকবো না, ও তো অনেক হয়ে গেছে।

—তবে আর কিসের মূর্তি খোদাই করবে?

—তাই তো ক'দিন ধরে ভাবছি।

দেবকুমারের কথা শুনে সোমনাথ ভাবিত হলো। ভাস্করের ছেলে পাথরের ব্যবসা করবে না। মূর্তি খোদাই করবে? দেবদেবীর মূর্তি হলে অনেক সময়

তীর্থযাত্রীরা কেনে, তা-ও নয়। নতুন মূর্তি সে খোদাই করবে। কি হবে সে মূর্তি দিয়ে? জীবিকার সমস্যা মিটবে কি করে?

সোমনাথ বললেন—বাঁচতে হলে ছ'পয়সা রোজগারও তো চাই? জাত-ব্যবসাটাও কর, অবসর মত মূর্তি খোদাই করো।

—ছ'দিক বজায় রেখে সাধনা হয় না, সাধনা করতে হলে সব ছেড়ে একটাকে নিয়েই লাগতে হয়। শিল্প সারাজীবনের সাধনার জিনিষ।

—ছ'মুঠো অন্নও তো চাই?

—সেজ্ঞা ভাবি না, একা মাছুষ চলে যাবে।

—বিয়ে-খা করবে না?

—যে সব দূরের কথা, এখন ভাবি না।

সোমনাথ শংকিত হয়ে উঠলেন। কিন্তু তিনি পাকা ব্যবসায়ী মাছুষ, কথার মোড় যেদিকে ফিরেছে, তাকে আর বাড়াতে তিনি চাইলেন না। বাড়ী এসে মেয়েকে বললেন—দেবকুমার বড় মুষ্ড়ে পড়েছে দেখলাম। ওর কাছে মাঝে মাঝে যাস, কথাবার্তা বললে মনটা তবু হালকা হবে। ও তো কারও সঙ্গে মেলামেশা করে না।

নিরালা বললো—যাই তো ছ'বেলা, খাবার করে দিয়ে আসছি।

—কথাবার্তা বলে ভাল করে?

—ভালোমন্দ আর কি, গুন্স হয়ে বসে আছে—বলে, 'ব্যবসা তুলে দোকান'।

—আমাকেও আজ সেই কথাই বললো। ব্যবসা তুলে দিয়ে থাকে কি?

—ভগবান জানেন।

—তুই বুঝিয়ে বলেছিলি?

—কাকে কি বোঝাবে? তুমি তো জানো ও চিরকালই খেলালে চলে। মামাবাবু তো কোনদিন শাসন করেননি, যা করছে করছে। এখন ও কার কথা শুনবে?

—তাহলে তো বড় ভাবনার কথা হলো মা!

পিতার কোন্‌খানে ভাবনা তা নিরালা জানতো। সে চুপ করে রইল।

দেবকুমার পাথর তালবাসে। নর্মদার তীরে হুধ-পাহাড়ের পাথরগুলো তার অন্তরের আত্মীয়। অতি প্রত্যুষেই ঘুম থেকে উঠে আসে নর্মদার তীরে মর্মর শৈলশ্রেণীর সামনে। সাদা পাথরের উপর রাজি শেষের আলো-আঁধারের খেলা দেখে। উষাগমের পীতাম্বা পূর্বাকাশের প্রান্ত থেকে সাদা পাথরের বুকে প্রতিফলন তোলে। হুধ কুশাশার মত অন্ধকার যেন গলে পড়তে থাকে নিচে নর্মদার জলে। কালো জল পালিশ-করা তলোয়ারের মত নীলাভ হয়ে ওঠে। শিশিরভেজা পাহাড়ের গায় প্রথম সূর্যের আলো বিন্দু বিন্দু হীরের মত চিক্ চিক্ করে ওঠে। তারপর হলুদের আভা। হলুদের পর লাল। লালের পর পাহাড়ের মাথায় মাথায় নীলকান্ত মণির ঝিলিক। নীল, রূপালী, লাল, হলুদ—রঙের ছড়াছড়ি। শাদা পাহাড় আর শাদা থাকে না। সূর্যের আলো গায় মেখে ক্ষণে ক্ষণে রূপ পালটায়। সকাল বেলায় রোদের মাঝে এতো রং কোথায় লুকানো থাকে, কে জানে। দিনের পর দিন সারা আকাশে সারা পৃথিবীতে সেই রং ছড়িয়েও সে-রং তো ফুরায় না। দেবকুমার এই রঙের খেলা দেখতে ভালবাসে, যত দেখে ততই তার মনে হয় সূর্যদেবই বোধহয় সবার বড় শিল্পী, দেবতাদের মধ্যে তিনিই বোধ হয় চিত্রকর।

পাথীর ডাক শোনা যায়। হলুদ রঙের পাথী উড়ে যায় মাথার উপর দিয়ে। এক একটি প্রাণবান রঙের বিন্দু। সুর ছাড়া ওদের ডাক নেই, নৌকার হৈ থেকে পাহাড়ের মাথায় ধনুকের মত রেখা টেনে উড়ে যায়, একটি আরেকটিকে সুর করে ডাকে। হলুদ পালকের প্রান্তে লাল টুকটুকে ঠোঁটগুলো কেমন কেঁপে কেঁপে ওঠে। নদীর বুকে লাল রঙের নৌকোগুলো ওই ডাকে যেন ছলতে থাকে। দেবকুমার পায় পায় এগিয়ে চলে, হুধ-পাহাড়ের গায় পথ ফুরিয়ে যায়। একটি পাথরের উপর দেবকুমার বসে পড়লো। কোথাও মানুষের সাদা নেই, শাস্ত স্নিগ্ধ নির্মল প্রশান্তি। নীল আকাশ, নীল জল, শাদা পাহাড়, সবুজ গাছপালা। মৌন গান্ধীর্থ, নিঃসীম গভীরতা।

দেবকুমার বসে থাকে, একা একা বসে থাকাই তার অভ্যাস। ফিকে আলোয় নদীর জলের পানে তাকিয়ে তার মনে হয় যেন ছোট ছেলের চোখ, কঁাদতে কঁাদতে এইমাত্র হেসে উঠলো।

কয়েকটা শালিক কোথা থেকে এসে নামলো আশে-পাশে। হলুদ পাথীর মত অমন মিষ্টি করে ওরা ডাকতে পারে না। ওদের ডাকের সঙ্গে পোকা ধরে খাওয়ার মিল আছে, হিংসা করে যারা খায় তাদের কণ্ঠে সুর আসবে কি করে। ওদের ডানার নীচে রঙের খেলা। ওদের লাফিয়ে লাফিয়ে চলার মধ্যে নাচের ছন্দ।

এতক্ষণে মানুষের চলাফেরা চোখে পড়লো নৌকার উপর লোক নড়ছে। ঘাটে রঙীন শাড়ী চোখে পড়ছে। এবার এদিকেও বোধ হয় হুঁচকারজন আসবে। সকালে বেড়ানোর অভ্যাস তো আছে কারও কারও। বুড়ো সত্য আচার্যি তো এখনি এসে এখানে মালা জপতে বসবে, মাথায় রোদ না লাগা অবধি সে উঠবে না। যত্নর পর বৈকুণ্ঠে না গিয়ে সে ছাড়বে না।

ঘাটের পাশ থেকে একখানি লাল শাড়ী টুক টুক করে এগিয়ে আসছে। মেয়েরা তো এ পথে আসে না। দেবকুমার ভালো করে ন্যাহর করে। আরেকটু কাছে এলে, শাড়ী-পরী মানুষটিকে সে চিনতে পারে। শাড়ী আরো কাছে এসে সাদা তোলে—জানি, এখানে তোমায় পাব।

দেবকুমার কোনো সাদা দিল না, তার চোখে বিশ্বাস ফুটে উঠলো।

নিরালা সামনে এসে দাঁড়ালো, বললো—এতো সকালে ওঠো কি করে, রাতে ঘুমোও না বুঝি? ডাকতে গিয়ে দেখি ঘর বন্ধ। তখনই বুঝেছি বাবু এইখানে এসেছেন। চলে এলাম।

এবার দেবকুমার বললো—বসো।

—বসার সময় নেই, মন্দিরে যাচ্ছি, পূজো করতে। যাবে?

—এখানে তো বেশ বসে আছি, নিরিবিগি।

—পূজোর কথায় না বলতে নেই, পাপ হয়। চলো—দেবকুমারকে উঠতে হলো। (ক্রমশঃ)

সম্মুখের পত্রাবলী

[প্রবর্তক সম্মুখের প্রতিষ্ঠাতা ও গুরু শ্রীমৎ শ্রীশ্রীমতিলাল রায়ের জীবন ও কর্ম গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর জীবনে একটি বিশিষ্ট 'মিশন' ছিল। তিনি শুধু শিবময় সদগুরুই ছিলেন না, তাঁর কল্পক্ষেত্রে তিনি ছিলেন রূপকারও। সম্মুখের সুদীর্ঘ বহুমুখী কর্মময় জীবন ও সাধনা এই দিব্য ত্রতকে কেন্দ্র করিয়াই আবর্তিত। সমসাময়িক কালে সম্মুখের জীবন-মিশনের নিগূঢ় তাৎপর্যটি ঠিক ঠিক ধরা পড়ে নাই। যেহেতু এই অসামান্য বিদ্যুৎগর্ভ জীবনের ভাব ও কর্মের প্রকাশ যতটুকু ছিল দেশগত, তার চেয়েও বেশী ছিল কালগত। দেশ ও কালকে অতিক্রম করিয়া অনাগতকালে তাঁর জীবনের অভিসন্ধিটির স্বরূপ সুপরিষ্কৃত যখন হইবে তখনই তাঁর স্ব-স্বরূপের সত্য পরিচয় মিলিবে। ইহারই ভূমিকাস্বরূপ সম্মুখের লিপি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের এই প্রয়াস। বস্তুতঃ এই মহাজীবনের অন্তরঙ্গ সহজ পরিচয় পাওয়া যাইবে তাঁর পত্রাবলী হইতেই। তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে বিচিত্র সম্বন্ধস্থলে তিনি বহু পত্র লিখিয়া গিয়াছেন। এই পত্রের সংখ্যা অগণ্য। তাঁর অল্পতম পত্র আমাদের জানা-অজানা বহু জনের নিকট ছড়াইয়া আছে। হয়তো বা অনেক পত্র ইতিমধ্যে বিনষ্টও হইয়া গিয়াছে। ইহার নিকট যেকোন পত্রই হোক তাহা অথবা উহার অবিকল নকল আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিলে বাধিত হইবে। পত্রগুলি ক্রমশঃ আমরা নির্বিচারে পত্রস্থ করিব। —প্রঃ সঃ]

গৌহাটী

১৭. ৪. ১৯৪২ ইং

স্নেহের ইন্দু,

নববর্ষের শুভদিনে তোমাদের প্রগতি হৃদয়ে নবানুভূতির সাড়া দেয়। যুগচিহ্নিত একদল মানুষ নিষে একটা অভিনব যুগ-প্রবর্তনের পথে চলেছি আমরা। আজিকার সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হওয়ার উপরই সেই দিব্যস্থল সফল করার সুদিন উপনীত হবে। তার স্মৃতিমেষ সম্মুখতাদের আমি আশীর্বাদ করি।

হস্তের এক একটি অঙ্গুলী সহজেই পর-পীড়নে নিপীড়িত হয়। কিন্তু পাঁচটি অঙ্গুলী সমবেতরূপে যখন মুষ্টিবদ্ধ হয়, তখন তাহা বজ্রশক্তি ধরে। সম্মুখের বরণীয় সম্মানগণকে আমি ভূয়ঃ ভূয়ঃ আশীর্বাদ করি। ইতি—

দেওঘর

১০. ১০. ১৯৪২ ইং

স্নেহের ফণি ও ইন্দু,

পুণ্য মহালয়ায় তোমাদের পরমারাধ্যা জননীর পরলোকগমনের সংবাদ পেয়ে একটু স্থির হবে তাঁর সহিত আমার প্রত্যক্ষ পরিচয়ের কথা ভাবলুম। ১৯৪২

ধুটাকে অন্তর-জগৎ থেকেও তোমাদের প্রতি ভিন্ন অল্প আকর্ষণের সমাপ্তি হলো। আমি সম্মুখের উৎসর্গীকৃত নারী পুরুষদের উৎপত্তি ক্ষেত্রের প্রতি যে শ্রদ্ধা নতি রাখি, তা তোমাদের অবদিত নাই। আজ সর্বতোভাবে মুক্ত উলঙ্গ শিশুর মত আমারই হৃদয়ে তোমাদের সর্বতোভাবে স্থান। গর্ভধারণের অধিকার অপেক্ষা অধ্যাত্ম-জন্মদানের অধিকার শুধু বৃহত্তর নয়, কি যে তপোসাধ্য তা ক্রমে বুঝছি। এখানে আছে জীবের সহিত ইষ্টের অনন্ত সম্বন্ধের অমৃত বন্ধন। তোমাদের জন্য সার্থক হোক—এ আকুতি আমার অক্লান্ত।

ঈশ্বর বস্তু—বস্তু। ঈশ্বর কর্ম—কর্ম। হে নবযুগের পুরোহিত, আমার নবযুগে তোমাদের মুক্তিস্নান। আজিকার প্রাতঃ-প্রেরণায় আমার অন্তরে এই বাণী পেলুম। কাল সারা রাজি এই চিন্তায় ছিলাম। প্রকরণের হৃদ নিয়ে আজ স্পষ্টানুভূতি—তোমরা ২৪শে আশ্বিন রবিবার রাত্রির গাড়ীতে চলে আসবে। দেবধামে পরলোকগত আত্মার উদ্ধগতির প্রার্থনা এবং আমার সান্নিধ্যে—ইহাই ভাগবত বাণী। আশীর্বাদ। ইতি—

চন্দননগর

৩. ৭. ১৯৪৩ হং

স্নেহের ইন্দু

আজ আমার কথা বুঝবার নয়। যে মন সংশয়ান্বিত-তা থেকে সজ্জকে উপরে তোলার শক্তিপূর্ণ। এখন আমার movement-ও সমালোচনার বিষয় অনেক ক্ষেত্রে।

.....কেবল মিটিং এ নয়, যে কোন প্রশ্ন পরিষ্কার করার জন্য তাগিদ দিতে পার। ভগবান অপূর্ণ জ্ঞান প্রকাশ করেছেন এ মস্তিষ্কে। সজ্জকে ইহা গ্রহণ করতে হবে।...শেষ কথা প্রবর্তক। ইহাই সজ্জের প্রাণ। আমি অতি ক্লান্ত হইলেও ভাবপ্রবাহ রক্ষায় দৃঢ়ত্বী। প্রবর্তকের খ্যাতিপত্রও কেবল রমণ নয়, আমিও পাচ্ছি। প্রবর্তক পড়ো, তোমরাও প্রমাণ পাবে। এ পুরাতন প্রবর্তক নয়, একটা 'shool of thought' পরিষ্কার হয়ে উঠছে। ইতি

প্রবর্তক জুট মিলস্, বেলঘরিয়া

৭. ৪. ১৯৪৩

স্নেহের ইন্দু

এ বছরটা আমাদের Brain-এর adjustment সবদিক দিয়ে চাই। যে অসাধারণ কর্মে আমাদের জীবন উদ্ভূক্ত, সেটা প্রত্যেকের কাছে সুস্পষ্ট থাকা দরকার। এইজন্য আমি চন্দননগরে কাজ শুরু করেছি।

সজ্জের পুষ্টি—ভগবান সহায়। ব্যক্তির পুষ্টি ইহার মধ্যে সঙ্কট আনবেই নানাভাবে। তাই অতি সতর্ক চরণে এগোতে হবে।

“প্রবর্তক”—সজ্জের মুখপত্র। আমি এইজন্য ইহার সর্বকন্দের মস্তিষ্ক নিয়ে শ্রম শুরু করেছি। ট্রাষ্টের মিটিং না হওয়া পর্যন্ত ইহার গতি রুদ্ধের প্রয়োজন নাই। ইহাতে প্রবর্তকের প্রকাশ বিলম্বিত হবে। Matter প্রেসে দেওয়া হউক। আমাদের বিবেচনা বিচার পরে হবে। প্রবর্তক বন্ধ হবে না, ইহা আমি দেখছি। তাই এই ব্যবস্থা। বিলম্বিত কাগজে প্রাণ থাকে না, freshness-ও থাকে না।

ট্রাষ্টের মিটিং সম্বন্ধে কথা। কলিকাতায় যাওয়া

আসা—পেট্রল ও আলোর অভাবে* মটরের ছুটাছুটি সম্ভব নয়। কালও কলিকাতায় যেতে হবে।...শনিবারে ট্রাষ্টের মিটিং এখানে অর্থাৎ বেলঘরিয়ায় করা প্রের্য: মনে করি। কথা অনেক আছে। চন্দননগরে সময় পাওয়া যায় না। তা ছাড়া অবকাশের হাওয়া থাকে। সামনে অক্ষয় তৃতীয়া। কাজের কথা এই বেলা সেরে নেওয়া উচিত। তাই এই ব্যবস্থা প্রের্য: মনে করি। সকলের সঙ্গে কথা করে এইরূপ নোটিশ দিও। আশীর্বাদ।

* যুদ্ধের সময় পেট্রোল নিয়ন্ত্রণজরিত।

চন্দননগর

২৩. ৪. ১৯৪৩

স্নেহের কনি,

তোমার পত্র পেয়েছি। খুব দুর্বৎসর। কিন্তু খুব উত্তম এই বছর থাকতে হবে। ক্ষতির অঙ্ক বড় নয়। প্রাণে চাই অদম্য উৎসাহ।

তুমি নির্ভয়ে আমার অমুসরণ কর। Printing & Publishing (প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং) লিমিটেড গঠনের পথে অগ্রসর হও।* মাহুষের ভরসা নয়, ভগবান সহায়। 'প্রবর্তক' বাধা হবে না, সহায় হবেই।

এই পথে অনেক কিছু করণীয় আছে। শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হও। রমণের সহযোগিতা অবশ্যই পাবে। আমিও সঙ্গে আছি। এমন দিন আসছে—প্রবর্তক প্রিন্টিং ও পাবলিশিং থেকে একটা ভাল ইংরাজী সাপ্তাহিক বেরুবে—Illustrated London News এর মত। আজ লোক হাসবে। কিন্তু ইহা সত্য হবে যদি তোমাদের উদ্বুদ্ধতা পাই। আশীর্বাদ। ইতি

বিঃ, দ্রঃ—এই সকল পত্রে উল্লিখিত নাম : ইন্দু—ইন্দুভবণ রায়, সজ্জের অন্তরঙ্গ সভ্য ও প্রবর্তক ট্রাষ্টের সেক্রেটারী। কনি—কনিভূষণ রায়, প্রবর্তক প্রেসের আধিকর্তা ও সজ্জের অন্তরঙ্গ সভ্য।

রমণ—রাধারমণ চৌধুরী, সজ্জের অন্তরঙ্গ সভ্য, প্রবর্তক পত্রিকার পরিচালক ও বর্তমান সম্পাদক।

গান্ধীবাদ ও বিনোব ভাবে

শ্রীকালিদাস মুখোপাধ্যায়

মহাত্মা গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮) সারাজীবন ধরে লড়াই করেছেন হিংসা, অসত্য ও অসাম্যের বিরুদ্ধে। তিনি সত্য ও অহিংসার মাধ্যমে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন শ্রেণীহীন, শোষণহীন ও শাসনহীন এক নূতন সমাজ-ব্যবস্থা। তিনি বিশ্বাস করতেন মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মহান পন্থা অপরিহার্য। তাই তিনি অহিংস পন্থায় স্বাধীনতালাভের জন্য ছিলেন ব্রতবদ্ধ—হিংসাকে তিনি মনে করতেন স্বাধীনতার পরিপন্থী।

কম্যুনিজমের হিংসাবাদ

লক্ষ্যের দিক হ'তে বিচার করলে কম্যুনিজম এবং গান্ধীবাদের ভিতর মৌলিক ঐক্য অসতর্ক মানুষকেও বিস্মিত করে। নিবিড় সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও গান্ধীবাদ ছিলেন কম্যুনিজমের প্রচণ্ড বিরোধী, কারণ মার্ক্সবাদ শ্রেণী-সংগ্রাম ও হিংসাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি বলেছিলেন কম্যুনিষ্টরা ভুলে যায়, তারা রোগ নিরাময়ের জন্য যে পন্থা গ্রহণ করতে চায়, সেই পন্থা রোগের চেয়েও তীব্রতর। তিনি কম্যুনিজমের হিংসাবাদ সম্বন্ধে বলেছিলেন, “এই নির্ভরতা একদিন এমন এক অরাজকতার সৃষ্টি করবে, যা আমরা কখনো দেখিনি।” ১৯৩০ সনে রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ায় গিয়ে মুক্ত, বিস্মিত ও বিমোহিত হয়েছিলেন, বলেছিলেন, “আপাততঃ রাশিয়ায় এসেছি—না এলে এ জন্মের তীর্থ-দর্শন অভ্যস্ত অসমাপ্ত থাকত।” রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিকে বলশেভিক নীতির সমর্থন বলে যেন আমরা ভুল না করি। তিনি রাশিয়ার সমষ্টিগত কল্যাণ প্রচেষ্টাকে, অবমানিত মানবাত্মার শক্তিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন, কিন্তু তাদের হিংসানীতির করেছেন বিরোধিতা। কবি লিখেছেন, “ইউরোপ আজ সাধনাকে বাদ দিয়ে সংগ্রামকেই যখন একান্ত করতে চায় তখন তার চেষ্টা হয়, শক্তিকে বিনাশ করে অশক্তকে সাম্য দেওয়া। যদি অভিলাষ সফল হয় তবে যে হিংসার সাহায্যে সফল হবে সেই রক্তবীজকেই জয়ডঙ্কা বাজিয়ে সেই সফলতার কাঁধের উপর চড়িয়ে দেবে। কেবলি চলতে থাকবে রক্তপাতের চক্রাবর্তন। শক্তির দোহাই পেড়ে এরা লড়াই করে এবং সেই

লড়াইয়ের ধাক্কাতেই সেই শক্তিকে মারে; আজকের দিনের শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'রে কালকের দিনের যে শক্তিকে জাগিয়ে তোলে আবার তারই বিরুদ্ধে পরদিন থেকে যুদ্ধের আয়োজন করতে থাকে। অবশেষে চরমশাস্তি কি বিশ্বব্যাপী শ্রমশক্তিকে?”

হিংসার আশ্রমে গান্ধীবাদের জীবনাবসান

অথও ভারতের স্বাধীনতায়ুদ্ধের অহিংস সেনাপতি গান্ধীবাদী শ্রমশক্তি চাননি, তিনি চেয়েছিলেন সম্ভ্রমদীপ্ত মানবতাবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত বীরের শাস্তি ও স্বাধীনতা। রবীন্দ্রনাথ জীবনের অন্তিম পর্বে এসে বলেছিলেন, “ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে? কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে? একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে, তখন একী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিসহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে?” রবীন্দ্রনাথের এই ভবিষ্যদ্বাণী মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই সত্যে পরিণত হ'ল—ইংরেজ ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করল, কিন্তু পিছনে রেখে গেছে হুংসহ নিষ্ফলতার হাহাকার। ভারতসাম্রাজ্যের উপর অধিকার ত্যাগ করার পূর্বেই সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের পরিকল্পনা অনুসারে ভারতের দিকে দিকে স্তব্ধ হ'ল ভ্রাতৃঘাতী বুদ্ধ, উন্মত্ত হিংসার দাবানল হয়ে উঠল অশ্রুভেদী। আশঙ্কা হ'ল গান্ধীবাদের স্বপ্ন ও সাধনা বুঝি ব্যর্থ হয়ে যায়। অহিংসা ও মৈত্রীর পূজারী ছুটে গেলেন জনতার মাঝে। তাঁর অনুগামী ও তাঁর সংগ্রামী নেতৃবৃন্দের অবিসংবাদী উত্তরাধিকারী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ও সর্দার প্যাটেল ঝড়ের দ্রাবনে হলেন ভীত ও বিচলিত, তাঁদের ভীতি তাঁদের নিয়ে গেল অনিবার্যভাবে খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতা স্বীকৃতির পথে। ন' বছর পূর্বে নেতাজী হরিপুরা অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে (১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮) দেশবাসীকে সতর্ক করে বলেছিলেন, “An internal partition is necessary in order to neutralise the transference of power.” নেতাজীর আশংকাই

সত্যে পরিণত হ'ল। গান্ধীজী সেদিন আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলেছিলেন, “আমাকে বিচ্ছিন্ন কর, ভারতকে নয়।” ভারতমাতাকে বিখণ্ডিত করবার পরিকল্পনাকে তিনি বলতেন পাপ। কিন্তু এই মহাপাপকে তিনি বাধা দিতে পারলেন না। তীব্র নেহেরু-প্যাটেলের নেতৃত্বে কংগ্রেস মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা গ্রহণ করল। তবুও হিংসাকে ব্যাহত করা গেল না, আগুন আবার জ্বলে উঠল। গান্ধীজী ঝাঁপিয়ে পড়লেন আগুনের মধ্যে, অহিংসার একনিষ্ঠ পুজারী আততায়ীর গুলিতে প্রাণ দিলেন—হিংসা অহিংসার উপর হ'ল বিজয়ী। গান্ধীজী দীর্ঘদিন ধরে অহিংসা ও মৈত্রীর যে আলো জ্বলে রেখেছিলেন তা হঠাৎ নিভে গেল।

নেহেরু সরকার অহিংসা পালনে প্রতবদ্ধ নয়

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ আপোষের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা লাভ করল। গান্ধীজীর বিখ্যাত অহুগামী নেহেরু, প্যাটেল, রাজেন্দ্র প্রসাদ, মৌলানা আজাদ, রাজাগোপাল আচারি প্রমুখ নেতৃবৃন্দ রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। এই গুরুদায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাঁরা গান্ধীজীর অহিংসবাদ গ্রহণ করা সম্ভবপর বলে কল্পনা করতে পারলেন না। ১৯৪৯ সালের ২২শে মার্চ নেহেরু এক বক্তৃতা বললেন যে, রাষ্ট্র পরিচালনা করতে গিয়ে তিনি হিংসা বর্জনের গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করতে সক্ষম নন, মহাত্মা গান্ধীর মতো মহামানবই শুধু একটা এতবড় ঝুঁকি নিতে পারতেন। আচার্য কপালিনী নেহেরুকে প্রস্তাব করেছিলেন, ভারত সরকার অহিংসাপালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কিনা। ১৯৫৫ সনের ২৬শে জুলাই লোকসভায় নেহেরু বক্তৃতা প্রসঙ্গে কপালিনীর প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বলেছিলেন যে, তাঁর সরকার অহিংসাপালনে প্রতবদ্ধ নয়, “As far as I can conceive, under the existing circumstances, no Government can be pledged to non-violence. If we were pledged to non-violence, surely we would not keep any Army, Navy or Air-force—and possibly not even a police-force. One may have an ideal. One may adhere to a

policy leading in a certain direction and yet, because of existing circumstances, one can not give affect to that ideal. We have to wait for sometimes.” অর্থাৎ নেহেরু বর্তমান অবস্থায় যদিও হিংসাকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন, তবুও তিনি গান্ধীজীর অহিংসাকেই আদর্শ বলে মনে করেন। দেখা গেল যে অহিংসা ছিল গান্ধীজীর জীবনের পরীক্ষিত সত্য, স্বাধীন ভারতে সেই অহিংসা সীমিত হল আদর্শের ভাবলোকে।

গান্ধীজীর স্বপ্নের স্বরাজ

গান্ধীজী অহিংসপন্থায় ভারতের স্বাধীনতা চেয়েছিলেন, কারণ তিনি অহিংসার মাধ্যমে চেয়েছিলেন আর্থিক ও সামাজিক বিপ্লব সম্ভব করে তুলতে, তিনি চেয়েছিলেন বিকেন্দ্রিত গণতান্ত্রিক স্বরাজশীল গ্রাম্য শাসন গড়ে তুলতে। তিনি অহুগামীদের বলতেন, নয়া-দিল্লীর বড় বড় প্রাসাদের পাশেই গরীবদের জীর্ণ কুটারের বৈষম্য স্বাধীন ভারতে একদিনও থাকতে পারবে না, কারণ স্বাধীন ভারতে শ্রেষ্ঠ ধনীদেরই মত গরীবদেরও ক্ষমতা থাকবে। হিংসার কাছে নতজাহ্নু হয়ে মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা অহুসারে ভারতবর্ষ যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেল, গান্ধীজী সেই স্বাধীনতার ভিতর তাঁর পরিকল্পিত স্বরাজের ভূমিকা দেখতে পেলেন না। তাই তিনি স্বাধীনতার বিজয় উৎসবের সমারোহ হতে রইলেন দূরে, ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগস্ট তিনি উদ্‌যাপন করলেন অনশন, প্রার্থনা ও সত্যকে। খণ্ডিত ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে তিনি যথার্থ স্বরাজ বলে মনে করতে পারলেন না। তিনি বললেন, “The freedom we have won is not true Swaraj. It is not for you to run after power. Go and spread out into the villages and prepare the people there so that Swaraj that has come to Delhi may reach the remotest hut, unless this is done Swaraj in the real sense will remain unachieved.”

আমরা যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেলাম গান্ধীজী তাকে যথার্থ স্বাধীনতা বলে গ্রহণ করতে পারলেন না। তিনি দেখলেন ইংরেজ আমলের সব কায়দা স্বার্থেই

অটুট রয়েছে—জনগণের সীমাহীন অভাব ও অভিযোগের কিছুমাত্র লাঘব হয়নি। তাঁর মতে আমরা যে স্বাধীনতা পেয়েছি তা হল “ইংরেজকে বাদ দিয়ে ইংরেজি শাসন”—যাকে তিনি বলতেন বাঘকে বাদ দিয়ে বাঘের স্বভাব গ্রহণ। তাঁর পরিকল্পিত স্বরাজ নিশ্চয়ই এর চেয়ে অনেক বেশী প্রত্যাশা করেছিল। তিনি দেখলেন কংগ্রেসের ভিতর দুর্নীতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। লুই ফিসারকে তিনি বলেছিলেন যে, যদি কংগ্রেসকে দুর্নীতি-মুক্ত করা না যায় তা’ হ’লে সেই কংগ্রেসের মধ্য দিয়ে তাঁর স্বপ্নের সমাজ গড়ে তোলা হবে অসম্ভব। তিনি বেদনাহত কণ্ঠে বলেছিলেন, “এত দারিদ্র্য যেখানে, সেখানে স্বাধীনতা কোথায়? আমি যদি বেঁচে থাকি, আমার কাজ হবে রাজনীতির সংস্কার সাধন।” তিনি আরও বলেছিলেন, “স্বাধীনতার জ্ঞাত সংগ্রামের পরেও যদি আমি বেঁচে থাকি, আমাকে হয়ত আমার দেশবাসীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে।” স্বাধীনতালাভের মাত্র চারমাস পরে গান্ধীজী যে আমৃত্যু অনশন সত্যাগ্রহ শুরু করেন তা পরিচালিত হয়েছিল প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁরই প্রিয়তম অহুগামীদের বিরুদ্ধে। কিন্তু এই সকল সত্যাগ্রহের মাত্র দশদিন পরেই তিনি আততায়ীর গুলিতে নিহত হলেন (৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৯৪৮)।

গান্ধীজীর পরিকল্পনা হঠাৎ খণ্ডিত হ’ল—পরিপূর্ণ অহিংস গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রয়াস হ’ল ব্যর্থ।

স্বাধীন ভারতে গান্ধীবাদ

১৯৪২ সনের ২৬শে জুলাই তারিখের “হরিজন” পত্রিকায় গান্ধীজী গ্রাম্য-স্বরাজের যে চিত্র তুলে ধরেছিলেন তাতে দেখা যায়, গ্রাম হবে স্বরাজশীল—অহিংসা বা সত্যাগ্রহের মাধ্যমে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হবে জনগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। প্রাপ্তবয়স্ক জীপুরুষের দ্বারা নির্বাচিত পঞ্চায়েতই হবে আইন প্রণেতা, শাসক ও বিচারক। স্বরাজশীল গ্রামের উপর সরকারী কর্তৃত্ব থাকবে যতদূর সম্ভব সীমাবদ্ধ। গান্ধীজীর পরিকল্পিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপর প্রতিষ্ঠিত স্বরাজশীল গ্রাম, “সমগ্র জগতের পশুশক্তিকে অবজ্ঞা করে চলতে সমর্থ হবে। কারণ গ্রাম স্বরাজের

নিয়ম এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের ও তার গ্রামের সম্মানস্বার্থে মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করবে।”

রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করবার পরে গান্ধীজী চেয়েছিলেন শাসনব্যবস্থা ও অর্থনীতিকে বিকেন্দ্রিত করে অহিংসার মাধ্যমে নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে। তিনি তাই অহুগামীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন কংগ্রেসকে লোক-সেবক সংঘে রূপান্তরিত করবার জন্ত। গান্ধীজীর অহুগামী দ্বারা রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা গান্ধীজীর পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর বলে মনে করলেন না। তাঁরা গান্ধীজীর মহান আদর্শকে বর্জন করলেন না বটে, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তাঁরা প্রচলিত পশ্চিমা গণতন্ত্রকেই গ্রহণ করলেন। নৈষ্ঠিক গান্ধীবাদীরা বললেন, “নেহেরু তাঁর সব মহৎ গুণ সত্ত্বেও ভারতবর্ষকে মাঝপথে রেখে দিয়েছেন।” গান্ধীজীর তিরোভাবে মনে হ’ল রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের সঙ্গে সঙ্গেই বোধ হয় ভারতে গান্ধীবাদের অবসান হ’তে চলেছে। গান্ধীজীর অহিংস সংগ্রামের উত্তরাধিকারী নেহেরু যখন স্বাধীন ভারতে গান্ধীবাদকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলেন না, গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরাধীন ভারতে যে এক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চেতনার জোয়ার এসেছিল, স্বাধীন ভারতে ক্ষমতালাভের সংগ্রাম, ব্যক্তিগত এবং দলগত হীন স্বার্থের সংঘর্ষে সেই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চেতনা স্তিমিত হয়ে এল। ঠিক এই সময়েই পদযাত্রী মহাপুরুষ আচার্য বিনোবা ভাবে (১১ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫—) এগিয়ে এলেন—স্বাধীনভারতে গান্ধীবাদকে জয়ী করবার জ্ঞাত হলেন ব্রতবদ্ধ। বিনোবার মতো দ্বারা বিশ্বাস করেন যে, ভারতবর্ষ গান্ধীজীর নেতৃত্বে অভিনব অহিংস পন্থায় স্বাধীনতালাভ করেছে, তারা স্বভাবতঃই মনে করেন, অহিংস পন্থাতেই সামাজিক ও আর্থিক বিপ্লব ঘটানো সম্ভবপর। এই দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে যেসব মানুষ এতদিন ক্ষমতামূলক রাজনীতি হ’তে দূরে থেকে নীরবে গান্ধীজী-প্রবর্তিত গঠনমূলক কাজ করে চলেছিলেন তারা গান্ধীজীর দেহাবসানের তিনমাস পরে সেবাগ্রামে মিলিত হলেন (মার্চ, ১৯৪৮)। বিনোবার নেতৃত্বে তাঁরা গড়ে তুললেন সর্ব-সেবাসংঘ এবং গ্রহণ করলেন সর্বোদয় সমাজ রচনার আদর্শ। [আগামীবারে সমাপ্য]

প্রবর্তক-সভ্য অক্ষয়তৃতীয়া উৎসব

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

ভারতের অতি বড় পুণ্য দিবস—অক্ষয়তৃতীয়া। সত্যযুগের আরম্ভ হইয়াছিল অক্ষয়তৃতীয়ায়। গঙ্গাধরের জটাঙ্কাল বিদীর্ণ করিয়া পুণ্যভূমি ভারতে অবতরণ করিয়াছিলেন পুতসলিলা ভাগীরথী অক্ষয়তৃতীয়ায়। অত্যাচারীর শমনরূপী ভৃগুনন্দন পরশুরাম জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—এই অক্ষয়তৃতীয়া তিথিতেই। আর মানবের খাদ্যশস্ত্রের বীজ প্রথম যেদিন রোপিত হইয়াছিল—সেদিনও ছিল অক্ষয়তৃতীয়া তিথি। আজও ভারতের প্রতি ঘরে অক্ষয়তৃতীয়া তিথিটি অতীব নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সহিত প্রতিপালিত হইয়া থাকে।

॥ পূর্ব কথা ॥

৪০ বৎসর পূর্বে ১৩৩০ সালে শুভ অক্ষয়তৃতীয়া তিথিতে ওড়ার সংযুক্ত একটি রক্ততষট্ প্রতিষ্ঠা করা হয় পুণ্য-সলিলা ভাগীরথী তীরবর্তী অর্ধচন্দ্রাকৃতি সুপ্রাচীন চন্দন-নগরের উত্তরাঞ্চলে গোস্বামীবাটি পল্লীতে প্রবর্তক-সভ্যের শ্রীমন্দিরে। চৌদ্দ বৎসর পর ১৩৪৪ সালে আষাঢ় মাসের ১১ই তারিখে স্নবর্ণ ওড়ারযুক্ত এই রৌপ্য তষট্টি অপহৃত হওয়ায়, ১৩৪৫ সালে অক্ষয়তৃতীয়া তিথিতে মন্দির-গর্ভ গাত্রে ষটাক্ষিত একটি বৃহৎ মর্ম্মরফলক প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৩৫০ সালে অক্ষয়তৃতীয়ার পূর্বদিবসে শ্রীমন্দিরে দ্বিস্তর বেদীর উপর শিবলিঙ্গসহ ওড়ার প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১২৩০ সাল হইতে প্রতিবৎসর শ্রীবিগ্রহের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে অক্ষয়তৃতীয়া হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত উৎসবাহুষ্ঠান, ভারতীয় সংস্কৃতিমূলক প্রদর্শনী ও স্বদেশী মেলা অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে।

॥ উদ্দেশ্য ॥

এই উৎসব, মেলা ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে গত চল্লিশ বৎসর যাবৎ ভারতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতি এবং সর্বাঙ্গীন জাতি সংগঠনের নীতি প্রচারিত হইতেছে। ভারতীয় ভাব ও আদর্শের প্রচার, স্বদেশী শিল্পের প্রচলন এবং ধর্ম্ম, সমাজ, শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ের প্রচার দ্বারা সমাজকল্যাণ বিধান করা এই উৎসবের প্রধান উদ্দেশ্য।

॥ ৪০ বর্ষীয় উৎসব সূচনা ॥

গত ২৫-এ চৈত্র, ১৩৬২ সোমবার চৈত্র পূর্ণিমায় প্রবর্তক সভ্য ব্রহ্মবিদ্যা মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া উৎসবের সূচনা হয়। প্রাতঃ ৫ টায় সমবেত উপাসনা ও পূর্ণিমা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তৎপরে শ্রীমন্দির-দেবতা প্রণব বিগ্রহের পূজাস্তে শ্রীমন্দির চূড়ায় উৎসব-পতাকা স্থাপন করা হয়। ২৬-এ চৈত্র হইতে ৭ই বৈশাখ পর্য্যন্ত প্রতি-দিন সাঙ্কেয়্যোপাসনার পর পণ্ডিত শ্রীস্বর্ঘ্যনারায়ণ তর্কতীর্থ মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবৎ পাঠ করেন। ৮ই বৈশাখ হইতে ১১ই বৈশাখ পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রভাতে “ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম” মন্ত্রের প্রসারণ, সন্ধ্যায় অপরাজিতা স্তোত্র পাঠ করা হয়।

॥ উৎসব বিবরণী ॥

গত ১২ই বৈশাখ হইতে ২৪-এ বৈশাখ এই ত্রয়োদশ দিন ব্যাপী এবারকার উৎসব-প্রবাহ চলে। ১২ই বৈশাখ শুক্রবার প্রাতঃ ৪।০ টায় প্রভাত ফেরীর দলসহ শোভাযাত্রা সহকারে নগর পরিক্রমণ করা হয়। অতঃপর সমবেত উপাসনাস্তে সাংস্কৃতিক পতাকার উন্মোচন করা হয়। তৎপরে বৈদিক মন্ত্রে শ্রীবিগ্রহের মহাস্তান, ঘোড়শোপচারে শ্রীবিগ্রহের পূজা ও হোম, পরে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্ন ৬টায় সমবেত উপাসনাস্তে সাড়ে ছ'টায় বেলাড় মঠের শ্রীমৎ স্বামী জ্ঞানানন্দজীর পৌরোহিত্যে উদ্বোধন সভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রবর্তক নারীমন্দিরের বালিকাগণ কর্তৃক উদ্বোধন সঙ্গীতের পর স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী সভ্য প্রশস্তির উদগানে মঙ্গলাচরণ করেন। সভাপতি বরণ করেন সন্তোষ সহ-সভাপতি শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত। তিনি তাহার দীর্ঘ ভাষণে এবারকার প্রদর্শনীর পরিচয় প্রদান করেন এবং স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবর্ষ পূর্ত্তি উপলক্ষে স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করিয়া জাতিগঠনে তাঁহার বিরাট অবদানের বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার সুললিত ভাষণে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের মর্ম্মকথা সুন্দররূপে

পরিব্যক্ত করেন। সভাস্থে তিনি প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। এই প্রদর্শনীতে ১০টি দৃশ্যে যুগাচার্য বিবেকানন্দের জীবন, বাণী ও ভারতের নবজন্ম লিপি, চিত্র ও মূর্তিযোগে প্রদর্শিত হইয়াছিল। পরের দিন শনিবার সন্ধ্যা ৬।০ টায় শ্রীমৎ স্বামী অন্নদানন্দ গিরি মহারাজের পৌরোহিত্যে সভা অহুষ্ঠিত হয়। স্বামীজী সনাতন বোগদর্শন সম্বন্ধে একটা নাতিদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। সভাপতি সহজ কথায় ধর্মসম্মত সাধারণ জীবনযাপনের কথাই বলেন। এই সভায় হিন্দু মিশনের একজন সম্মানীও উপস্থিত ছিলেন।

১৪ই ও ১৫ই বৈশাখ সন্ধ্যা ৬।০ টায় বিজ্ঞান পরিষদের শ্রীশঙ্কর চক্রবর্তী ছায়াচিত্রযোগে “মহাকাশে মানুষের জয়যাত্রা” ও “মানবজাতির উৎপত্তি ও আত্মবিকাশের ধারা” সম্বন্ধে অতি সহজ প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা করেন। বিষয় দুটি বিশেষ শিক্ষাপ্রদ ও রোমাঞ্চকর। এই বক্তৃতা সকলেই উপভোগ করেন। সর্বশ্রেণীর, বিশেষ ছাত্র শ্রোতার সমাগম হয় প্রচুর।

পরের দিন মঙ্গলবার “শিশু দিবস”। সাহিত্যিক শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধরের পরিচালনায় শিশুদের আসর অহুষ্ঠিত হয়। প্রবর্তক বালিকা বিদ্যালয়ের, ছাত্রাবাসের, মহিলা সদনের, বেসিক স্কুলের ও ছাত্রাবাসের বালক বালকবালিকাগণ আবৃত্তি, গান, নৃত্য, হাস্যকৌতুক ইত্যাদি পরিবেশন করে। সভাপতি মহাশয় তাঁহার স্বভাবমূলক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গল্পময় ভাষণের দ্বারা শিশু মনকে জয় করিয়া বালকোলাহলময় সভাক্ষেত্রটিকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া দেন। তাঁহার স্কৌতুক ভাষণে বালকবালিকারা বিশেষ সম্বোধ ও আনন্দ লাভ করে।

১৭ই বৈশাখ, সন্ধ্যা ৬।০ টায় ডক্টর শ্রীনিবাস ভট্টাচার্যের পৌরোহিত্যে ‘শিক্ষা দিবস’ পালিত হয়। সন্ত বিলাত-প্রত্যাগত ডক্টর ভট্টাচার্য বর্তমান যুগের শিক্ষা সমস্যা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটিগুলির নানাভাবে বিশ্লেষণ করিয়া বিলাতে আজিকার শিক্ষার অভিজ্ঞতার আলোতে গঠন-মূলক পথ-নির্দেশ দেন।

পরের দিন সন্ধ্যায় ‘বিবেকানন্দ দিবস’-এর অহুষ্ঠান অধ্যাপক হরিন্দাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌরোহিত্যে উদ্ঘাটিত হয়। সভাপতি মহাশয় “ব্রহ্মবাদব ও বিবেকানন্দ” বিষয়ে গবেষণাময় গভীর জ্ঞানপূর্ণ একটা বিস্তৃত ভাষণ দেন। এই ভাষণে অনেক নূতন তত্ত্ব ও তথ্য উদ্ঘাটিত হয়।

১৯শে বৈশাখ, শুক্রবার, “সজ্জগুরু দিবস”। প্রচণ্ড ঝড় ও প্রবল বর্ষণ বশতঃ কিঞ্চিৎ বিলম্বে সভাটি নাট-মন্দিরে অহুষ্ঠিত হয়। রায়সাহেব মহেন্দ্রনাথ ঘটক মহাশয় সভাপতিত্ব করেন। প্রখ্যাত সাহিত্যিক অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের পুত্র চুঁচুদার শ্রীঅজরচন্দ্র সরকার মহাশয় সজ্জগুরুর জীবনের বিবিধ ঘটনা একটা মনোজ্ঞ রচনায় ব্যক্ত করেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয় সজ্জগুরুর জীবনবাণী পর্যালোচনা করিয়া তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

পরদিন সন্ধ্যায় শিক্ষাত্রী শ্রীমতী কনক মিত্র মহোদয়ার সভানেত্রীত্বে ‘মহিলা সভা’ অহুষ্ঠিত হয়। প্রবর্তক বালিকা বিদ্যালয়ের ও বেসিক স্কুলের ছাত্রীগণ সঙ্গীত, নৃত্য, আবৃত্তি ইত্যাদি পরিবেশন করেন। সভানেত্রী মহোদয়া একটা সুন্দর ভাষণ প্রদান করেন। ছাত্রছাত্রী ও মহিলা সমাগমে সভাস্থলটি পরিপূর্ণ হইয়া উঠে।

২১-এ বৈশাখ রবিবার সন্ধ্যা ৬।০ টায় সিঁথির রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সন্ত্যগণ ‘শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ’ সম্বন্ধে বিচিত্র বাদ্যসহকারে গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন। সুনিষ্ঠ ভাব-গান্ধীর্য্য, মধুকর্ষ ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশন উপস্থিত তন্ময় শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তে গভীর আবেদন সৃষ্টি করে।

২২-এ বৈশাখ সন্ধ্যায় মনীষী শ্রীকালিদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌরোহিত্যে সভাহুষ্ঠান হয়। সভাপতি মহাশয় ‘একালের বঙ্গ সংস্কৃতি’ বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি প্রাচীন বাংলার ও বর্তমান বাংলার ভাব, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেন।

পরের দিন মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ‘রবীন্দ্র দিবস’-এর অহুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন ডক্টর তারকনাথ ঘোষ।

উক্ত ঘোষ রবীন্দ্রনাথের ধর্ম চিন্তা সম্বন্ধে নূতন আলোক-পাত করেন। তাঁর বিষদ আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের জীবনে ধর্ম কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা সুন্দর সুপরিষ্কৃত হয়।

২৪-এ বৈশাখ (৮ই মে) বুধবার সমাপ্তি দিবস ও পূর্ণিমা সম্মেলন। প্রাতঃ ৫টায় সমবেত উপাসনাস্থে কামাখ্যার উমাচল যোগাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী মহারাজকে পুরোগ করিয়া সঙ্ঘবাসিগণ শ্রীমন্দির হইতে শোভাযাত্রা সহকারে বোড়াইচণ্ডীতলা স্থিত আশ্রম ঘাটে গমন করেন ও পূণ্য গঙ্গা বারিতে অবত্থান সম্পন্ন করেন।

সন্ধ্যায় স্বামীজী মহারাজের পোরোহিত্যে পূর্ণিমা

সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তাবগন্তীর পরিবেশে স্বামীজী ধর্মসাধনাভিত্তিক বলিষ্ঠ জীবনগঠনের বাণী দেন। প্রসঙ্গক্রমে বিনা ঔষধে যোগবলে রোগারোগ্য বিষয়েও তিনি উল্লেখ করেন। জাতির ভবিষ্যৎ উন্নয়মান তরুণ-তরুণীর নিরাময় স্বাস্থ্যোচ্ছল জীবন গঠনের দৃষ্টদর্শন তিনি দেন। তাঁর আলোচনা ও উপদেশ যেমনি হৃদয়গ্রাহী তেমনি উপভোগ্য হয়।

অতঃপর স্বামী শিবানন্দজীর পোরোহিত্যে যে সমাপ্তি সভা হয় তাহাতে উৎসব-সম্পাদক এবারকার উৎসবের বিবরণী পাঠ করেন এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করেন। উপাসনা ও পূর্ণিমায় মন্ত্রে ত্রয়োদশব্যাপী উৎসবের পরিসমাপ্তি হয়। ও শান্তি।



যে কোন উৎসবে

সুগন্ধি

বাসমতী চাউলের

‘পোলাও’

অমর উপভোগ্য

পশুপতি দাস এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড

“ভারতের সর্বান্বিত চাউলের শ্রেষ্ঠতম জাতীয় প্রতিষ্ঠান”

৪৩/২ ও ৩৭ এ, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড, কলিকাতা-১৪

টেলিফোন: ২৪-৪৩৮১/৮২

টেলিগ্রাম: বাইসাকিন

সম্পাদকীয়

নব বর্ষ :

আগন্তুহীন কালশ্রোতে মাহুঘের গণনার হিসাবে একটি বছর বিলীন হইল। বর্তমান বৈশাখে ‘প্রবর্তক’-এর এই কালের পঞ্চাষাড়া ৪৮-তম বর্ষ শুরু হইল। আগামী অনাগত কালগর্ভে কি উজ্জ্বল সম্ভাবনা সংগুপ্ত আছে তাহা আমরা জানি না এবং তাহা অহুমান করিয়া উপরিচর অজ্ঞানীর মত উচ্ছসিতও হইব না। এই অর্থহীন আশ্ফালন, কবীন্দ্রের ভাষায়, “বর্ষে বর্ষে ‘মিলি মিলি যাওব সাগর লহরী সমানা’—তাহাতে নিপুত্র সনাতন ভারতের ক্ষতি হইবে না।” এই সনাতন ভারতের “নগ্ন চরণের ধূলিপাতে পৃথিবীর বড়ো বড়ো রাজমুকুট পবিজ হইবে।” এই সনাতন ভারতবর্ষ আমাদের জন্ত অপেক্ষা করিয়া আছে। আমরা বিদেশীর দ্বারস্থ হইব না। জীবন-সমস্তার জন্ত কোন আমদানী ‘বাদের’ আশ্রয় লইব না। আমরা এই সনাতন ধর্ম ভারতের নিকট হইতেই আমাদের ব্যষ্টি ও জাতীয় জীবনযাত্রার শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করিব। সমিধপাণি হইয়া এই ভারতের কাছেই আমরা মন্ত্র চাহিব।

“তিনি কহিবেন—‘ও ইতি ব্রহ্ম’।”

“তিনি কহিবেন—‘ভূমৈব স্তব্ধং নাগ্নে স্তবমস্তি’।”

“তিনি কহিবেন—‘আনন্দং ব্রহ্মনোবিদ্যান

ন বিভেতি কদাচন’।”

প্রবর্তক বিশ্বাস করে “আজিকার এই নব বর্ষের মধ্যে ভারতের বহু সহস্র পুরাতন বর্ষকে উপলব্ধি করিতে পারিলে তবেই আমাদের দুর্বলতা, আমাদের লজ্জা, আমাদের লাজনা, আমাদের বিধা দূর হইয়া যাইবে।” কেন দূর হইবে তাহার কারণও ঋষিকবি রবীন্দ্রের ভাষায় “যাহার পশ্চাতে স্মৃতিরকালের ইতিহাস নাই তাহা অসংলগ্ন, অসঙ্গত, তাহার শিকড় ছিন্ন।...যে ভারত প্রাচীন, যাহা প্রচ্ছন্ন, যাহা বৃহৎ, উদার, যাহা নির্দীপ্ত তাহারই জয় হইবে।” এই বিশ্বাস হৃদয়ে ধরিয়াই ‘প্রবর্তক’-এর বর্ষ-সূচনায় তার গ্রাহক, অহুগ্রাহক ও

অহুদুমগুলীর নিকট নিবেদন জানাইব যেন আমাদের সম্মিলিত সংকল্প ও সাধনা এই অমিশ্র অনাবিল শাশ্বত ভারতবর্ষকেই আমাদের ব্যষ্টি, সমাজ ও জাতীয় জীবনে জয়শ্রীমণ্ডিত করিয়া তুলিতে পারি।

যুগ-প্রাবৃত্তি ও পত্র-পত্রিকা :

আজ হইতে প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে প্রবর্তক পত্রিকার পথযাত্রা শুরু হয়। পত্রিকা প্রকাশের হেতু-স্বরূপে প্রথম সংখ্যা প্রবর্তকের অহুষ্ঠান-পত্রে উক্ত হয় : “সাহিত্যই জাতীয় জীবন গঠনের সর্বোৎকৃষ্ট উপাদান।... দেশের অধিকাংশ মাসিক পত্রিকা দেশের এই দারুণ সঙ্কটকালে মনোহারী দোকানের নয়নরঞ্জন দ্রব্য-সম্ভারের মত চিত্তাকর্ষক গল্পগুজবেই পরিপূর্ণ। মাসিক পত্রের সম্পাদকগণ দেশের রুচি অহুসারেই চলিয়া থাকেন। যে কয়খানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র আছে সেগুলি প্রাণহীন প্রস্তাবনা ও মন্তব্যে পরিপূর্ণ; ব্যবসা করাই ইহাদের ধর্ম। অতএব সুরূহৎ কাগজগুলি বিজ্ঞাপন প্রচার জন্তই যেন অহুষ্ঠিত।”

আজকের দিনে প্রায় জাগে, সমসাময়িক কালের যে চিত্র প্রবর্তকের প্রথম অহুষ্ঠান-পত্রে উদ্ঘাটিত পঞ্চাশ বৎসর পরে তাহার কি কোন পরিবর্তন হইয়াছে? এই দীর্ঘকালে শিক্ষা, সমাজ, অর্থ, রাষ্ট্রক্ষেত্রে বহু বিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু সাধারণভাবে মাহুঘের রুচি-প্রকৃতির কোনরূপ রূপান্তর তো হয়ই নাই, বরং অধোগামীই হইয়াছে। এই রুচি যে কোন্ নিম্নতম পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে তাহা যে কোন পুস্তক-পত্রিকার ষ্টল দেখিলেই বুঝা যায়। তথাকথিত জনপ্রিয় পত্রিকাগুলির নগ্ন প্রচ্ছদপট ও নির্লজ্জ বিষয়বস্তু বর্তমান বিকৃত জন-মানসের প্রতিচ্ছবি বলা চলে। সে-যুগেও যে সাহিত্যে যৌন আবেদন ছিল না তা নয়, কিন্তু তা ছিল ভদ্র ভাবে-ভঙ্গীতে, কিছুটা শিল্পসম্মত সঙ্কোচের সহিত। বিবেক ও সমাজ-চেতনার কিছুটা কশাঘাত ছিল। বর্তমান বৈশ্বযুগে সিনেমা-সাহিত্যের দোহাই দিয়া যে ধরণের নগ্ন নোংরা নির্লজ্জ অশ্লীল পত্রিকার প্রাচুর্য্য ঘটয়াছে তাহাতে এ জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আতঙ্কিত নৈরাশ্যে মন পীড়িতই হয়। সাহিত্যে এই গণিকাবৃত্তি অর্থোপার্জননের পথ সূচয় করায় নির্বিশ্বাসের বৃহত্তর সামাজিক হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া শিক্ষিত ভদ্রবরের

সন্তানেরাই নিঃসঙ্কোচে এই কালোবাজীর চেয়েও ঘৃণ্য বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছে।

এই যুগ-প্রবৃত্তির বিবর্তনধারার অন্ততম কারণ দেখানো হইয়াছে ‘শনিবারের চিঠি’র (ফাল্গুন ’৬৯) সংবাদ-সাহিত্যের ‘সাহিত্যে ভূগোল’ শীর্ষকে। সিনেমা পত্রিকার জনপ্রিয়তার হেতু সম্বন্ধে বলা হইয়াছে: “যুগের হাওয়া বদলাইয়াছে। নয়া সভ্যতার প্রবল ধাক্কা পুরাতন সব ভাসিয়া গেল। গণিকালয়ে যাওয়া অথবা মদ্য পান আর প্রকাশ্যে করা চলে না।... সামাজিক এবং আর্থিক নানা অসুবিধার জন্ত যাহারা উপরোক্ত দুইটি আনন্দ হইতে নিজেদের বঞ্চিত রাখিতে বাধ্য হইতেছেন তাহারা যে অবৈধ উপায়ে আনন্ডপ্তির পথ খুঁজিবেন তাহাতে আর বিচিত্র কী! এই অবৈধ পন্থাগুলির মধ্যে সিনেমা পত্রিকার রূপ লইয়া একটি বিকৃত প্রণালী তাহাদের পরিচাণের জন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে। ছেলে বুড়ো, যুবতী বৃদ্ধা তরুণী সকলেই এই পর্দার আড়ালে মুখ লুকাইয়া আশ্বর্য্যভিত্তে মাতিয়াছেন।”

যুগের এই অর্থ-প্রলোভনের কাছে খ্যাত-অখ্যাত অনেক সাহিত্যিক ও লেখককেই আত্মবিক্রয় করিতে দেখা যায়। এমনকি এই জ্ঞানপাপীদের চক্রান্তে পড়িয়া সাহিত্য ও সংস্কৃতির সংজ্ঞা ও ধারণা ক্রমশঃ বিকৃত রূপ ধারণ করিতেছে। ইহাও এ যুগের মধ্যম্নস্তিক ট্রেজেন্ডি। নামকরা লেখকদের পাসপোর্ট কপালে আঁটিয়া বর্তমানের শতধা-বিচ্ছিন্ন সমাজের মেরুদণ্ড ধ্বংসের কার্য্য এইরূপ পত্রিকা-ব্যবসায়ীরা অবাধে এবং সম্মানে চালাইতেছে। এ যুগে নীতি-হীনতা সম্পর্কে কোনরূপ সামাজিক বিবেক আছে বলিয়া আর ধারণাই করা যায় না। বাংলা সাহিত্যের এই বর্তমান হীনতা ও হ্রবস্থা আজকের বাঙালীর মনোবৃত্তিহীনতারই পরিচয় বহন করে। অবৈধ উপায়ে অর্থোপার্জন করা ছাড়াও যে উদীয়মান সমাজ-মামুষের রুচি-পরিবর্তন ও চরিত্র গঠনের পবিত্র দায়িত্ব পত্রিকা পরিচালনের মূলে আছে, অন্ততঃ থাকা উচিত, এ কথাটা পত্রিকা-পরিচালন ত্রুটি বা ‘মিশন’ হিসাবে গৃহীত না হইলে, বিশ্বস্ত হবারই সম্ভাবনা। আশার কথা, বাংলাদেশে এ ধরনের পত্রিকারও অপ্রভুলতা নাই। ইহারা যুগ-প্রবৃত্তির স্রোতে গা না ভাসাইয়া, এই প্রবৃত্তির রূপান্তর সাধনেরই তপস্বী করিয়া চলিয়াছে।

বর্তমান বাংলা সাহিত্য ও জাতীয় আদর্শ:

আমরা এখানে বর্তমান বাংলা সাহিত্যের শোচনীয় হ্রবস্থা সম্পর্কে যে বেদনার কথা বলিয়াছি তাহা মরমী দরদী বাঙালীমাত্রেয়ই প্রাণের কথা। সম্প্রতি কৃষ্ণনগরে অল্পকিছু বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের মূল সভাপতিরূপে ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার আজকের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা বাঙালীমাত্রেয়ই অনুধাবনীয়। বর্তমান শ্রদ্ধাহীন অহংস্কীত যুগে এই দরদী জ্ঞানবুদ্ধির হিতবচন যে লোক সাহিত্যব্যবসায়ীদের বিবেক জাগ্রত করিবে এমনটি মনে হয় না। তথাপি তাঁর স্ফুটিত ভাষণের কিয়দংশ এখানে প্রদত্ত হইল আমাদের অগ্রিয় বক্তব্যের সমর্থনে। ডক্টর মজুমদার আক্ষেপ করিয়াছেন:

“বর্তমান বাংলা সাহিত্যের অসম্পূর্ণতা ও অল্পমত অবস্থা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেয়ই উদ্বেগের কারণ হইয়াছে। অথচ ইহার প্রতিকার সম্বন্ধে আমরা উদাসীন। আস্ত কোন প্রতিকার সম্ভব কিনা তাহাতেও অনেক সন্দেহ আছে। বাঙ্গালী আজ অবসাদগ্রস্ত, তাহার গৌরব ও মর্যাদা অন্তর্মিত, বঙ্গবিভাগের ফলে যে অর্থনীতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হইয়াছে—তাহার গভীর আঘাতে বাঙ্গালীর মন আজও মুহমান। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাঙালীর জীবনযাত্রা নির্বাহ করাই এতবড় গুরুতর সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে যে, সাহিত্য শিল্প প্রভৃতির চর্চা অথবা গভীর চিন্তাশীলতার অনুশীলন জীবনের গোণ উদ্দেশ্য অথবা মনের বিলম্বসিতা রূপেই তাহার নিকট প্রতিভাত হইতেছে। কোন বিষয়েই চিন্তার বা দৃষ্টির গভীরতা নাই। ক্ষণিক ও স্থলভ আনন্দ, তরল ভাববিলাস, গতানুগতিক আচরণ, আপাতোমনোহরের প্রতি তীব্র আকর্ষণ, ইহাই জাতীয় জীবনের আদর্শ হইয়া উঠিতেছে। উচ্চ আদর্শ, জীবনের মর্যাদাবোধ, উন্নতির আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি আর তাহার জীবনকে অনুপ্রাণিত করে না। এই প্রকার অবসাদগ্রস্ত মন উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সৃষ্টির অক্ষুণ্ণ নহে। বর্তমান বাংলা সাহিত্যের অবস্থা যে এই প্রকার জাতীয় জীবনেরই প্রতিক্রিয়া মাত্র এরূপ মনে করিবার কারণ আছে। বাঙ্গালীর মধ্যে মনোবৃত্তি অথবা বলিষ্ঠ মানসিক শক্তির যেরূপ অভাব তাহাই সাহিত্যে প্রতিফলিত হইতেছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরাই উৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টির প্রধান সহায়। স্মরণীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাঙ্গালীর উন্নতি না হইলে বাংলা সাহিত্যের খুব বেশী উন্নতি হইবার আশা কম।”



ভারতীয় ফুটবল প্রসঙ্গে

শ্রীকরণাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য



লেখক

[একদা প্রবর্তকের খেলাধুলা বিভাগটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যে ক্রীড়ামোদীদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্বনামধন্য ক্রীড়াবিদ শ্রীমুণীলপ্রসাদ সর্কাধিকারী এই বিভাগটির প্রবর্তক, পরিচালক ও লেখক ছিলেন। খেলাধুলার বাংলা পরিভাষা স্থিতির প্রবর্তকও তাঁকে বলা চলে। প্রবর্তকের এই প্রবীণতম শুভাহুধ্যায়ী শ্রীসর্কাধিকারীর সমর্থন ও শুভেচ্ছামণ্ডিত হইয়া এই বিভাগটি পুনঃ প্রবর্তিত হইল। প্রবর্তকের বর্তমান বৈশাখ সংখ্যা হইতে মোহনবাগান এ্যাথলেটিক ক্লাবের সেক্রেটারী (ফুটবল বিভাগ) শ্রীকরণাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য খেলাধুলা প্রসঙ্গে লিখিতে সানন্দে স্বীকৃত হইয়াছেন। শ্রীভট্টাচার্য্য আত্মজ্ঞাতিক ধ্যাতিসম্পন্ন বহু অভিজ্ঞ ক্রীড়াবিদই শুধু নহেন, নিজেও সুদক্ষ খেলোয়াড় এবং খেলাধুলা সংস্থার সংস্থাপক। এমন বিনয়নম্র, স্বভাবসুন্দর অমাবিক ব্যক্তিত্বোজ্জ্বল ক্রীড়াবিদের সুযোগ্য হস্তে প্রবর্তকের ঐতিহ্য উজ্জলতরই হইবে বলিয়া আমাদের সর্কান্তঃকরণের বিশ্বাস। —প্রঃ সঃ]

ভারতের ফুটবল খেলার মান কোন্ পর্যায়ের এই ব্যাপারে কোনও নিশ্চিত মতামত দেওয়া প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি যে কথটা বলতে চেষ্টা করছি সেটা পরিষ্কার হবে আমাদের ফুটবলের গত কয়েক বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই। ফুটবলের মান নিরূপণ করতে হলে নিজেদের দেশের গুণী ছাড়িয়ে আমাদের যেতে হবে। দেশের বাইরে আমাদের ফুটবল খেলার ইতিহাস খুঁজলে দেখি ১৯২০।২২ সাল থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত কলিকাতার ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশনের উদ্যোগে কতকগুলি ভারতীয় ফুটবল নামধারী দলের দূর প্রাচ্য, বর্মা, সিংহল, দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় সফরের ইতিহাস। বলা বাহুল্য, তখন বাংলাদেশের ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশনই এইসব ব্যাপারে অগ্রণী ছিল এবং বাংলার ফুটবলের মানই ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল। এইসব খেলাতে খালি পায়ে খেলে যতদূর সম্ভব সুনামও অর্জন করেছিল আমাদের খেলোয়াড়রা। আমরা যে এই খেলায় খানিকটা পারদর্শিতা লাভ করেছি, এ কথাও ভারতের বাইরে অন্তান্ত দেশে খানিকটা জানাজানি হয়েছিল।

এরপর দেখি সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন গঠনের সঙ্গে-সঙ্গে এবং দেশের স্বাধীনতা অর্জনের পরে পরেই :১৯৪৮ সালে বিশ্ব অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় সর্বপ্রথম ভারতীয় দলকে অংশ গ্রহণ করতে। এই প্রতিযোগিতায় প্রথমেই ফ্রান্সের সঙ্গে আমাদের দল পরাজিত হয় এক গোলে, কিন্তু কিছু প্রশংসাও অর্জন করে খেলায় পারদর্শিতা দেখিয়ে। এখন থেকে আমাদের দেশে পুরোদমে বুট পায়ে ফুটবল খেলার অমুশীলন শুরু হয়। ঠাণ্ডা দেশের মাঠে খেলা, বর্ষায় পিচ্ছিল মাঠে খেলা ও শক্ত মাটিতে খেলার অভ্যুবিধা খানিকটা দূর হয় বুট পায়ে দেওয়ার পর। এই সময়ে বিদেশী অনেক দল আমন্ত্রিত হয়ে আসে আমাদের দেশে। এরা প্রায় বেশীর ভাগই ইউরোপীয় দল। তাদের সঙ্গে খেলায় আমাদের দলের একমাত্র প্রচেষ্টা দেখি কত কম সংখ্যক গোলে পরাজিত হওয়া যায়। জয়ের আশা তখনও সুদূর-পর্যাহত—এত উন্নত পর্যায়ের খেলা তাদের। ইং ১৯৪৮ সালের পর আমাদের দলের একমাত্র সাফল্য বলা যেতে পারে ১৯৫১ সালের এশিয়ান গেমস্-এ—জিতের খেলা। কিন্তু এর পরের এশিয়ান গেমসের খেলায়, ১৯৫৪ সালে,

ইন্ডোনেশিয়ার কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় ভারতীয় দল। ১৯৫১ সালের এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন দল ১৯৫৪ সালে মাথা নীচু করে ঘরে ফিরল টোকিও থেকে। আবার ১৯৫৬ সালে দেরি মেলবোর্ণ বিশ্ব অলিম্পিক খেলায় ভারতীয় দলকে চতুর্থ স্থান অধিকার করে প্রচুর ক্ষুধাতি অর্জন করতে। বহু বিশেষজ্ঞ আমাদের খেলার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও অনেক কিছু বললেন। কিন্তু এই ভবিষ্যৎবাণী ভুল প্রতিপন্ন করল আমাদের খেলোয়াড়রা। ১৯৫৯ সালে এরুনাকুলামে এশিয়ান কাপ প্রতিযোগিতায় একেবারে সর্বনিম্ন স্থান পেয়ে। এই দলই আবার পরের বছর অর্থাৎ ১৯৬০ সালে রোমের বিশ্ব অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় দুর্দর্শ দল হাঙ্গেরী, পেরু, ফ্রান্স-এর সঙ্গে চমকপ্রদ খেলা খেলে প্রতিপন্ন করল তাদের উন্নত ক্রীড়ার মান। এর পর আবার অধোগতি। তার সাক্ষী রইল পরের বছরের অসুস্থিত কুয়ালালামপুরের মারডেকা প্রতিযোগিতায়। সেখানে অস্তান্ত সব এশিয়া-দেশীয় দলের নিম্নে স্থান হলো আমাদের। তারপরেই ১৯৬২ সালে বিজয় পতাকা ওড়াল আমাদের ভারতীয় দল জাকার্তাতে অসুস্থিত এশিয়ান গেম্‌সের খেলায়। সর্বশ্রেষ্ঠ এশিয়ার দল সাবাস্ত হল তারা।

এইটুকু আলোচনা থেকেই আমাদের ফুটবল দলের মানের অনিশ্চয়তা সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ থাকে না। কিন্তু কেন এই অনিশ্চয়তা? যে দল হাঙ্গেরীর মত দুর্দর্শ দলের সঙ্গে সমানে সমানে যুঝে আসে, সেই দলই আবার ইন্ডোনেশিয়া, মালয় প্রভৃতি দলের সঙ্গে পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে ঘরে ফিরে আসে। এর একমাত্র কারণ হতে পারে যে, ফুটবল খেলায় যে পরিমাণ শক্তিসামর্থ্য খেলোয়াড়দের থাকলে খেলার কৌশল নিজেদের আয়ত্তে রেখে এবং অস্তান্ত কুশলী দলের খেলা থেকে শিক্ষালাভ করে সেই নিপুণতা ও কৌশলের আরও উন্নতিসাধন করা যায়, সেই পরিমাণ শক্তি ও সামর্থ্য আমাদের খেলোয়াড়দের এখনও হয়নি। অথবা খেলার মান উত্তরোত্তর বাড়ার জন্ত যে সাধনার প্রয়োজন সেই সাধনা আমাদের খেলোয়াড়রা করেন না। একটা উদাহরণ দিলেই একথাটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। গোলে কি প্রকারে স্নট মারতে হয় প্রায় সব ফরওয়ার্ডরাই জানে, কিন্তু খেলার মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় গোলের সামনে গিয়েও গোল করতে না পারার হাস্তাকর দৃশ্য। একটু জোরে মারলে বা একটু স্থির মস্তিষ্কে গোলরক্ষকে এড়িয়ে মারলেই গোলটি অনিবার্য, কিন্তু সেটুকু করার ক্ষমতা নেই। শারীরিক ক্ষমতা যেটুকু ছিল তা হয়ত দৌড়ে

বলটা নিয়ে এগোবার সময়েই নিঃশেষে শেষ হয়ে যায়, তাই যখন গোলের সামনে গিয়ে ঐ শেষ কাণ্ডটুকু করার প্রয়োজন হয় তখন আর ইচ্ছামত হাত, পা বা মস্তিষ্ক-চালনা করার ক্ষমতা তাদের থাকে না। এই ক্ষমতাটুকু না থাকার জন্ত ভাল একটি 'পাশ' পেয়েও অস্ত আর একটি খেলোয়াড়ের হয়তো বলের কাছে সময়মত পৌঁছানোর ক্ষমতা থাকলো না, কিম্বা ঠিকভাবে নিজেদের খেলোয়াড়কে বলটি দিতে পারলো না। তাতে সমস্ত খেলাটাই বান্চাল হয়ে গেলো।

বিদেশীয় ভাল দলগুলির খেলা থেকে আমরা জেনেছি যে, বর্তমান ফুটবল খেলায় খেলোয়াড়দের ক্রিপ্ৰতা ও সম্ভবত্বভাবে খেলার উপর খুবই জোর দেওয়া হয়। এই দুই ব্যাপারে আজ পর্যন্ত ১৯৫৫ সালের সোভিয়েট রাশিয়ার ফুটবল দল বোধহয় সর্বাপেক্ষা নিপুণতা দেখিয়ে গিয়েছে। ক্রিপ্ৰগতিতে একে ওকে বল দিয়ে ও নিয়ে বিদ্যুৎগতিতে দরকার মত জায়গা বদল করে সম্ভবত্বভাবে এগিয়ে গিয়ে গোলের পর গোল এরা করে গিয়েছে। যেন একটা অতি সুপরিকল্পিত সম্ভবত্বভাবে খেলার একমাত্র পরিণতি এই গোলগুলি। দলের যে-কোনও খেলোয়াড়কে যে-কোনও সময়ে যে-কোনও জায়গায় উপস্থিত হয়ে এই প্রচেষ্টায় অংশ গ্রহণ করতে দেখে অবাক মনেছি। সমস্ত খেলোয়াড়রাই যেন একটি বিরাট যন্ত্রের অতি আবশ্যকীয় ছোট ছোট অংশ। দৈহিক ও মানসিক শক্তির সমন্বয়ের একটি চরম উৎকর্ষতা। এই রকম সম্ভবত্ব প্রচেষ্টা আমাদের দলগুলির ভিতর নেই বললেই চলে। এর প্রয়োজনীয়তা আমরা জানি। কিন্তু নিজেদের সাধনা ও নিয়মিত অশুশীলনের অভাবে এই অত্যাবশ্যকীয় শিক্ষা আমাদের খেলোয়াড়দের এখনও হয়নি। এর জন্ত দায়ী কে, আমাদের ভাববার সময় হয়েছে। আমরা প্রায়ই দেখে থাকি একটি বিদেশী দলকে আমন্ত্রণ করে তাদের এখানে পৌঁছানোর ছ'এক সপ্তাহ আগে একটি ভারতীয় দল গঠন করে তাদের সঙ্গে খেলতে দেওয়া হয়। এরা ভারতের বিভিন্ন দেশ থেকে এসে একটা জায়গায় জড় হয খেলার অল্প কয়েকদিন আগে। তারপর সকালে বা সন্ধ্যায় মাঠে একটু দৌড়োদৌড়ি, একটু শারীরিক ব্যায়াম করার পরই খেলতে নেমে যায় মাঠে ঐ বিদেশী দলের সঙ্গে। আবার দেরি কোনও ভারতীয় দলকে বিদেশে পাঠানোর পূর্বে হয়তো খুব বেশী হলে মাসখানেকের অশুশীলন ও শারীরিক চর্চা করিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। সুখের বিষয় এর একটু অদল-বদল হতে স্তর হয়েছে সম্প্রতি কিছুদিন

ধরে এবং তার সুফলও আমরা পেয়েছি। কিছু-কাল ধরে সুদক্ষ কোচ মহম্মদ রহিম-এর শিক্ষাধীনে ভারতীয় দলকে রেখে তাদের আমরা গত এশিয়ান গেমসে জিততে দেখেছি। এই প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত আমাদের কর্তৃপক্ষেরা সব সময়ে করতে পারেন না বলে অনেকে এই মত প্রকাশ করেন যে, উপযুক্ত ভাবে তৈয়ারী না করে কোনও দলকে আন্তর্জাতিক খেলা-ধুলায় অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া একেবারেই সমীচীন নয়। কেননা, এতে জাতীয় সম্মানহানির সম্ভাবনা থাকে। আমাদের দেশের খেলোয়াড়রা পেশাদার খেলোয়াড় নয়, সকলকে অস্ত্র কাজ করে নিজেদের পেটের ভাত যোগাড় করতে হয়। কাজেই কর্তৃপক্ষদের ইচ্ছা থাকলেও বেশীদিন ধরে তাদের কোনও শিক্ষাশিবিরে আটকিয়ে রাখার বাধাও আছে। তাহলে কি আমরা স্তম্ভ এবং উপযুক্তভাবে শিক্ষা দিয়ে দল গঠন করা থেকে এবং আন্তর্জাতিক খেলাধুলার অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকব? এই শেথোক্ত মতের আমি সমর্থন করি না। আমাদের ভাববার সময় হয়েছে যে, আজকের এই পরিবেশে কি করলে আধুনিক যুগের উপযুক্ত দল গঠন করতে পারি। এত অধিক সংখ্যক ফুটবল খেলোয়াড় আমাদের বিভিন্ন গ্রামে ও সহরে খেলাধুলো করে যে, সেই সব খেলোয়াড়দের মধ্য থেকে বিভিন্ন সহরে এক একটি দল গঠন করা চলে এবং তাদের উপযুক্ত শিক্ষকের শিক্ষাধীনে সারা বৎসর রেখে এইসব শিক্ষাপ্রাপ্ত খেলোয়াড়দের মধ্য থেকে একটা কেন ১২টা ভাল ভাল জাতীয় দল গড়ে তোলা সম্ভবপর। এতে প্রয়োজন দেশের গভর্নমেন্টের সহযোগিতা এবং সূচিস্তি নির্দেশ।

ভারতবর্ষ বিরাট দেশ। বিভিন্ন সহরে ফুটবলের এক একটি নির্বাচিত দলকে সুদক্ষ শিক্ষকের অধীনে রেখে তাকে শক্তিশালী করে তুলতে পারি। দশ বারোটি এই রকম দলকে বিদেশীয় শক্তিশালী দলগুলির বিরুদ্ধে খেলাতে পারি। এক জায়গায় সম্ভবত্বভাবে অমুশীলন-রত দলটি হঠাৎ গড়ে-ওঠা দলের চেয়ে যে ভাল খেলবে ইহা সুনিশ্চিত। তারপর জাতীয় দল গঠনের সময় এই দশ বা বারোটি দলের থেকে বাছাই করে যে মিলিত শক্তিকে একত্র করতে পারব তার মান বিভিন্ন বারোটি দলের থেকে অনেক উন্নত পর্যায়ে হবে, এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই।

অপেশাদারী খেলোয়াড় নিয়ে এই উপায় ছাড়া উপযুক্ত দল গড়ে তোলার আর কোনও উপায় নেই। কেননা, তারা নিজেদের জায়গায় থেকে যার যার নিজের জীবিকার্জন করেও, উপযুক্ত শিক্ষালভ করতে পারবে এবং প্রয়োজনমত অল্প কয়েকদিনের সম্ভবত্ব অমুশীলনের ফলেই জাতীয় দল গঠনে সহায়তা করতে পারবে। একবার এই রকম দশ বারোটি দল গঠন হয়ে গেলে সেই সব দলের খেলোয়াড়দের কড়া নজরে রেখে তাদের খেলাধুলা পরিচালনা করবারও বন্দোবস্ত করতে হবে। ফুটবল খেলা খুবই শ্রমসাধ্য খেলা। এই খেলায় পারদর্শিতা লাভ করতে হলে শরীর ও মনকে সেইভাবে তৈয়ারী করার প্রয়োজন হয় উপযুক্ত ব্যায়াম ও অমুশীলনের দ্বারা। এইসব খেলোয়াড়দের সম্ভাহে দু'টির বেশী প্রতিযোগিতামূলক খেলা খেলতে না দেওয়া, উপযুক্ত খাতি দেওয়া, উপযুক্ত শারীরিক ব্যায়াম করানো ইত্যাদির ব্যবস্থা করার ভার নিতে হবে আমাদের বিভিন্ন রাজ্যের খেলাধুলার কর্তৃপক্ষদের। গভর্নমেন্টকে দেখতে হবে যে, এই সংস্থাগুলি সেইভাবে তাদের কার্যপ্রণালী নির্ধারণ করছে এবং তারা যদি অপারগ হয় তা হলে অস্ত্রান্ত যোগ্য লোককে সেই কাজে নিযুক্ত করতে হবে। এদের দৈনন্দিন খেলাধুলার পরিচালনার উপর একটু কড়া নজর, খেলোয়াড়দের উপযুক্ত শিক্ষা ও স্বাস্থ্যকর খাতির ব্যবস্থা, সুযোগ্য লোকের তত্ত্বাবধানে পরিকল্পনা করা এবং সেই পরিকল্পনাকে স্তম্ভভাবে কার্যকরী করার বন্দোবস্ত হলেই অল্প সময়েই আমরা এর সুফল পাবো। ফুটবল খেলা বিদেশী খেলা হলেও, আমাদের দেশে জনপ্রিয়তার মাপে এর আদর সবচেয়ে বেশী। এশিয়ার ১৯৬২ সালের সর্বশ্রেষ্ঠ দল বলে আমরা গণ্য হয়েছি। আমাদের খেলোয়াড়রা মেলবোর্ণ অলিম্পিকে এবং রোম অলিম্পিকে সুনাম অর্জন করে এসেছে। ইউরোপের যশস্বী দলগুলির খেলোয়াড়দের তুলনায় আমাদের খেলোয়াড়দের খেলার কৌশল ও নৈপুণ্য নিম্ন মানের নয়। কিন্তু শারীরিক সামর্থ্য ও সম্ভবত্ব খেলার মান তাদের তুলনায় অনেক কম আমাদের। এই দু'টি জিনিষের উন্নতি-সাধন করতে পারলেই আমরা অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বের একটা সেরা দল হয়ে দাঁড়াতে পারব, এই আমার বিশ্বাস।



সংগীতময়

ঠাকুর-মা-স্বামিজী—লেখক স্বামী সোমানন্দ।
প্রকাশক—বি. দত্তশর্মা, ১৪ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-২। মূল্য এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

যুগান্তর শ্রীমদ্ভক্ত পরমহংসদেবের আবির্ভাব ধর্মের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। তাঁর আবির্ভাব আমাদের অরণ্য করিয়ে দেয় ঐক্যের উক্তি 'সম্ভবামি যুগে যুগে'। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর লীলাসহচর—তাঁর উত্তরসারথী, শ্রীমীমা তাঁর সাগনসঙ্গিনী। এই ত্রয়ী জীবন এমনভাবে জড়িত যে, একজনকে বাদ দিলে আরেকজনের কথা বলা যায় না। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে এঁরা তিনজনে মিলে এক। এই 'পরম এক'-এর আবির্ভাব একদা সমগ্র পৃথিবীতে তীব্র আলোড়ন এনেছিল। এক নতুন ভাববারার বস্তুর সমগ্র জগৎ হরেছিল দ্বাভিত। আত্মকের পৃথিবী এমন একটা জায়গায় এনে পৌঁছেছে—যেখানে ঘটেছে আদর্শ-চ্যুতি। আজ মানুষের জীবনের অস্তুতম প্রয়োজন—আদর্শ। কেননা আত্মিক মৃত্যুর হাত হতে বাঁচবার পথ এই একটাই। তাই আজ আমাদের নতুন করে গ্রহণ করতে হবে এই 'পুণ্য জীবনত্রয়ের আদর্শ'। স্বামী সোমানন্দ সহজ সরল ভাষায় এই ত্রয়ীর পুণ্য জীবনকাহিনী তুলে ধরেছেন কিশোরমনের কাছে। উৎকৃষ্ট আখ্যানভাগ, স্বচ্ছন্দ ভাষা, রমণীয় প্রচ্ছদ আর মূল্যের হুলস্ততা গ্রন্থাণিকের সকলের আকর্ষণীয় করে তুলবে। বিভাগের দ্রুতপাঠা পুস্তকরূপে পরিগণিত হবার গুণ পুস্তকখানির আছে।

পর্বতের বাগী—লেখক ডাঃ উপেন্দ্রনাথ গুহ।
প্রকাশক—শ্রীপবিত্রানন্দ ঘোষ। একাল প্রকাশনী। ৫৮,
কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য—দেড় টাকা।

বর্তমানে কবিতার জগতে অস্পষ্টতার বিকেই স্বাক্ষরটা বেশি। মনের ভাবকে সাংকেতিকতার মাধ্যমে প্রকাশের প্রবণতাটা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। গীতিকবিতার স্বাক্ষরটা আজকাল আর তেমন গুনতে পাই না। শব্দ আর ছন্দের মিল গভীরতর কবিতার কাছে হার মেনেছে। কথার আড়ালে মনের কোন ভাব গুমে মরছে তাকে বুঁজে পেতে রীতিমত বেগ পেতে হয় অনেক কবিতাতেই। 'পর্বতের বাগী'র কবিতাগুলি সে বস্তু হতে রেহাই দিচ্ছে। সহজ ভাব আর ভাষা ছুইয়েই সংক্ষিপ্ত ঘটেছে 'পর্বতের বাগী'তে। কবিতাগুলি রচিত হয়েছে নাগা পাহাড়ের। সম্ভবতঃ নাগা পাহাড়ের সারল্য, উদারতা আর সৌন্দর্য লেখকমনকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছে—তাঁর দৃষ্টিকে সমদর্শী করেছে। 'পর্বতের বাগী'তে আমরা তারই প্রকাশ দেখি।

ছোট বনফুল, নিঃশব্দ রিক্ত বাস্তব—কেউ তাঁর কাছে নগ্ন নয়। 'পর্বতের বাগী'র সবচেয়ে বড় গুণ এর আন্তরিকতা আর মানবিকতা। লেখকের গভীর মানবতাবোধ অধিকাংশ কবিতাতেই পরিস্ফুট। খেটে-খাওয়া মানুষগুলির প্রতি তাঁর সমবেদনার শেষ নেই। এই সমবেদনা যথার্থই আন্তরিক। 'পর্বতের বাগী'র কবি পেশার চিকিৎসক। এই বিশেষ পেশাটিকে তাঁকে বিশেষভাবে পরিচিত করেছে অগণ্য অবহেলিতের মাঝে। কবির দরদী মনে এরা সহজেই অনুপ্রাণিত তুগেছে। 'মানুষ', 'গরীবের ছেলে', 'এক আতি', 'ভগবান', 'দেবতা'—এই কবিতাগুলি বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। এই চিকিৎসক-কবির কবি-স্বাভাব আরও অংগান আমরা আশা করবো।

লক্ষ্মী মজুমদার

পদাতিকের প্রাণকাব্য (দ্বিতীয় সংস্করণ)—
চুনীলাল গঙ্গোপাধ্যায়। মূল্য পঞ্চাশ নয়া পয়সা।
প্রকাশক : শ্রীমুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। যুগসাহিত্য
মন্দির, ৬নং বেনিয়াপুকুর সেন, কলিকাতা-১৪।

স্বভাবকবির নীতি হচ্ছে নিজ পথ অনুসরণ করে চলা। গীতার 'স্বধর্ম নিধনঃ শ্রেয়ঃ, পরোধ্যমঃ ভয়াবহঃ' মন্ত্র তাঁর আদর্শ। এই মহাত্ম্য নিয়েই কবি-পদাতিক মাতৃভূমি বাঙালকে ভালবেসেছেন। তাই বিধবস্ত বঙ্গসমাজের বেদনা চুনীলালের লেখনীকে যেমন স্পর্শ করেছে, একালে তেমন করে অল্প কোনো সাহিত্যিকের কলমকে ছুঁয়েছে বলে আমার জানা নেই। তিনি সেই অনাগত সূর্যোদয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন সেদিন আত্মকের দুঃখবাত্তি কেটে গিয়ে বঙ্গদেশ আবার আনন্দময়ীরূপে অখণ্ড সভা নিয়ে ফুটে উঠবে। বঙ্গকন্যার যুগপূজারী শ্রীচুনীলালকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

শ্রীরাজকুমার সেন

Homœopathic Dietary—By Dr. Sachindra
Mohan Choudhury, Hahnemanian Homœo
Clinic. 3, Sambhu Chatterjee Street,
Calcutta-12, Price Rupee one and fifty nP.

আলোচ্য পুস্তকখানি লেখকের ইতিপূর্বে প্রকাশিত "চিকিৎসা ও পথ্য বিজ্ঞান" শীর্ষক গ্রন্থেরই পরিপূরক। মহাত্মা হানিম্যান প্রদর্শিত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-পদ্ধতিতে যেমন ভেষজ সঞ্চয় তথ্য (Drug relationship) একান্ত প্রয়োজন; তেমন ভেষজের সঙ্গে পথ্যের সঞ্চয় তথ্যটিও (Drug relationship with food) জানা দরকার। এই তথ্যটি জানা না থাকিলে চিকিৎসা ক্ষেত্রে সমস্ত সময় বিপর্যয় দেখা দেয়। গ্রন্থকার সেই বিষয়ে সজ্ঞান দৃষ্টি রাখিয়া এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন। যদিও গ্রন্থখানি সম্বলিত কিন্তু এই সম্বলনের নৈশিষ্ট্য অখণ্ড পরিলক্ষিত হয়। আশা করি চিকিৎসকসমাজে গ্রন্থখানি সমাদর লাভ করিবে।

ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার

সাহিত্যিক

প্রবর্তক সাহিত্যচক্র :

বিগত ১২ই মে রবিবার ব্যাঙেলে রেলওয়ে হাই স্কুল-হলে প্রবর্তক সাহিত্যচক্রের মাসান্তিক ২২তম অধিবেশন মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীহরিশ্রী রায় এম. এ., বি. এল. প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। কুমারী কৃষ্ণা চক্রবর্তী তাঁহারের মালাভূষিত করেন। সন্মেলনের বাহিরে বিশেষ করিয়া ব্যাঙেলে আমবাগানে এরূপ প্রাণবন্ত অধিবেশন এই প্রথম। সন্মেলন ও সন্মেলন পূর্বেই বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাহিত্যসুপ্রসিদ্ধ এই সভায় যোগদান করেন।

শ্রীআরাধনা গুপ্তের উদ্বোধন-সঙ্গীতের পর সাহিত্যচক্রের অন্ততম সম্পাদক শ্রীহরিশ্রী চক্রবর্তী সকলকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জ্ঞাপন প্রসঙ্গে 'সাহিত্যে স্বাধীন চিন্তা' সম্বন্ধে আলোচনা করেন। অন্তঃপর আত্মীয় ভাবসম্বন্ধিতে প্রবর্তক সাহিত্যচক্রের যে একটা বিশিষ্ট ভূমিকা আছে, তাহা সম্বন্ধে শ্রীমতিজালালের সাহিত্য সাধনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করেন সাহিত্যচক্রের অন্ততম সম্পাদক শ্রীইন্দু স্তম্ভ।

প্রবণ বিপ্লবী শ্রীমণীন্দ্রনাথ নায়েক, 'ভাষাবিশী' সম্পাদক শ্রীজগদীশ রায় ও শ্রীবিনয় মুখোপাধ্যায় বর্তমান সাহিত্য সম্বন্ধে বিভিন্ন দিক হইতে আলোচনা করেন। অত্যন্ত বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণও প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচনার অংশ গ্রহণ করেন। কবিতা ও গল্প পাঠ করেন সুধমা মৈত্র, পৌরমোহন নন্দী, সরোজপ্রভা কর, প্রভাত ঘোষাল, নির্মল সরকার, আরাধনা গুপ্ত, সমীরণ কর প্রভৃতি। স্থানীয় মহিলা সমিতির সম্পাদিকা শ্রীমতী বেলা বাগ্‌চী, শ্রীমানস বিশ্বাস সঙ্গীত পরিবেশন করেন। কবি শ্রীনির্মলকুমার সরকারের কণ্ঠসঙ্গীত, শ্রীশিশির দাশগুপ্ত ও তাঁর সঙ্গীতায় কণ্ঠক সঙ্গীত পরিবেশন ও বিখ্যাত বাঁহুকের

শ্রী কে. এন্. সেনগুপ্তের বাঁহুপ্রদর্শন সকলকে আপ্যায়িত করে। অন্তরালে থাকিয়া শ্রীমতী শ্রীমতী চক্রবর্তীর নীরব সেবা অনুষ্ঠানটিকে সাধারণীভূত করে।

পশ্চিম বাংলা 'ছদ্ম' কমিটি :

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে প্রধানতঃ বিপ্লবীদের লইয়া এই 'ছদ্ম' কমিটি গঠিত হইয়াছে। কমিটির কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে পশ্চিমবঙ্গ এসেম্বরী হাউসের ভিতরে। এই সংস্থার প্রাথমিক লক্ষ্য হইল স্বাধীনতা-যুদ্ধে বাংলার রাজনৈতিক কর্মী ও শহীদদের সংক্ষিপ্ত জীবন-পরিচয় লিপিবদ্ধ করা। ভাষাতত্ত্বের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্বন্ধে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক তথ্যাবলী সংগ্রহ ও সংগ্রহিত করিয়া তাহাতে বাংলার ভূমিকা বিষয়ে একখানি প্রামাণিক ইতিহাস রচনা করাও এই সংস্থার অন্যতম লক্ষ্য। সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীহরিশ্রী মুখোপাধ্যায় এই কমিটির গবেষক ও সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন। এই কমিটির মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হউক, ইহা বাঙালী মাঝেরই কাম্য।

সংস্কৃত ও সংস্কৃতি-সংরক্ষণ :

সম্প্রতি হুগলী সংস্কৃত পরিষদের একাদশ বর্ষীয় চতুর্দশবর্ষীয় অধিবেশন পণ্ডিতপ্রবর শ্রীজীব দ্বাবতীর্থের মূলপোয়োহিত্যে হইয়া গিয়াছে। বিভিন্ন মনীষীর সভাপতিত্বে এই পঞ্চকালব্যাপী সম্মেলনে বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হয়। এই মহাসম্মেলনে সংস্কৃত ও সংস্কৃতি রক্ষার যে-সব প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহা লক্ষ্যী দেশবাসীর অগুণাবনযোগ্য। প্রস্তাবগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে : ভারতের রাষ্ট্রভাষারূপে সংস্কৃতভাষার স্বীকৃতিকরণ, স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত ভারতীয় সংস্কৃতি-ভিত্তিক শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন, সংস্কৃতদেশী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্বমোচন, ভারতের গ্রাম্যশিক্ষার শিক্ষার সংস্কৃত দর্শনের জ্ঞান বাধাতামূলককরণ প্রভৃতি। এই প্রস্তাবগুলিকে কার্যকরী করার জন্য ব্যাপক আন্দোলনের মধ্যে দেশবাসীর অমূল্য আগ্রহ স্থাপিত করার দিকে সংস্কৃত পরিষদের কর্তৃকর্তাদের উদ্যত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বিপ্লবী অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য স্মৃতিসভা :

বিগত ২০শে মার্চ সন্ধ্যা সাতটার রিভিউ প্রেমমন্দিরস্থিত সংস্কৃত শিক্ষায়তন প্রাঙ্গণে আগ্নেয়গের বিপ্লবী ও বিজ্ঞানী ডাঃ অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের স্মৃতিতে প্রজ্ঞাপন উদ্দেশ্যে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় পোয়োহিত্য করেন বিষড়ার পৌরপতি ডাঃ নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীমৎ তারানন্দ ব্রহ্মচারী গীতা ও উপনিষৎ হইতে কিয়দংশ আবৃত্তি ও শোকসভার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিলে সভার কার্য আরম্ভ হয়। সভাপতি মহোদয় লোকান্তরিত ডাঃ ভট্টাচার্য্যের প্রতিকৃতিতে মালাদান করিলে উপস্থিত সকলে ঝাঁড়াইয়া নীরবতা পালন করিয়া মৃত-আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও তাঁহার উদ্ধৃতি কামনা করেন। স্থানীয় বংগেস সভাপতি শ্রীরাঘবনাথ পাণ্ডা বিপ্লবী অবিনাশচন্দ্রের বৈদগ্ধিক কার্যাবলী ও তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করেন। উপস্থিত গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ স্ব স্ব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দ্বারা অবিনাশচন্দ্রের সততা, দৃঢ়তা ও দেশস্বাভাবের আলোচনা করেন। এই সভায় ডাঃ ভট্টাচার্য্যের প্রতিকৃতি

For your Spectacles :

Proper adjustment : Correct refitting

Better vision : Comfortable wear

Prompt service at moderate charge.

Time : 5 to 8-30 P. M.

DEY'S OPTICS

48, Dharmatala Street, (First Floor)

CALCUTTA-13

হানীর পৌরভবনের সাধারণ পাঠাগারে ও সংযুক্ত শিক্ষায়তন প্রেসমন্ডিরে রক্ষা এবং রিফ্রা পৌর এলাকার একটি রাস্তা ডাঃ ভট্টাচার্যের নামে নামকরণ করার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ডক্টর শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য :

ডেভিড হোয়ার ট্রেনিং কলেজের ব্যাতিমান অধ্যাপক ডক্টর শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য সম্প্রতি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শিক্ষা বিষয়ে পি.এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করিয়াছেন। তাঁহার গবেষণা বুটেনের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণের উচ্চ সিত প্রশংসা লাভ করিয়াছে। ডক্টর ভট্টাচার্য শিক্ষাক্ষেত্রে সুপরিচিত ও শিক্ষাবিদগণক বিভিন্ন গ্রন্থের লেখক। বুটেনে তিনি নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট শাক্তিক বিচিত্র অভিজ্ঞতা আহরণ করিয়াছেন। প্রবর্তক পত্রিকার তিনি অমুদ্রাণী, শুভাকাঙ্ক্ষী

ও অত্যন্ত লেখক। আমরা অধ্যাপক ভট্টাচার্যকে বিশেষ অভিনন্দন জানাইতেছি ও তাঁহার গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করিতেছি।

শিক্ষাব্রতী নরেশচন্দ্র চৌধুরী :

গত ২৮-এ-১৯১১ খ্রী নবম্বরের বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী শ্রী নরেশচন্দ্র চৌধুরী হঠাৎ প্রমোদিস রোগাক্রান্ত হইয়া পরলোকগমন করেন। তাঁর এই অপ্রত্যাশিত আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁর অগণিত ছাত্রছাত্রী, বন্ধু-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও নবম্বরবাসিনীর একাত্ম একটা অবাক্ত শোকাভিভূত হন। ১৯০০ সালে কুষ্টিয়া সহরে (বর্তমান পূর্ব পাকিস্তান) তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং কৃতিত্বের সহিত বি.এল, পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া দীর্ঘ বাইশ বৎসর নড়াইল রাজ ষ্টেটের আইন-পরামর্শক পদে দক্ষতার সহিত বৃত্ত ছিলেন। বঙ্গ বিভাগের পর শ্রীধাম নবম্বরে আসিয়া স্থায়ীভাবে শিক্ষাব্রতী হিমায়ে সং ও সাধু জীবন বাপন করেন। ব্যক্তিগত জীবনে নরেশচন্দ্রের মত এমন স্বপ্ননিষ্ঠ, অমায়িক, কর্তব্যপরায়ণ, মৃদু স্বভাবের মানুষ এ যুগে বিরল। প্রবর্তক পত্রিকার তিনি ছিলেন দীর্ঘকালের গ্রাহক এবং পত্রিকাধানিকে তিনি প্রগাঢ় ঐতি ও অমুরাগের চক্ষে দেখিতেন। তাঁর সুযোগ্য পুত্র শ্রীনির্মল চৌধুরী বর্তমানে সরকারী এ্যাগার আন্ডোলনের একজন বিশিষ্ট কর্মী।

সর্বোদয় বনাম সর্বনাশ :

গত ১লা এপ্রিল চন্দননগর-গোমলপাড়ার এক বৈঠকে বিশিষ্ট সর্বোদয় কর্মী শ্রীদীনেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সর্বোদয় বিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে সর্বোদয়ের এক সহজবোধ্য সংজ্ঞা দেন। তিনি বলেন বিজ্ঞান + আত্মদর্শন = সর্বোদয় আর • বিজ্ঞান - আত্মজ্ঞান = সর্বনাশ। এই সংজ্ঞাটির মধ্যে বিশেষ তাৎপর্য আছে। জ্ঞান-প্রগতি সম্বন্ধে প্রকাশ পায় যে, এই পর্যন্ত সর্বোদয় গ্রামদান সংখ্যা ৫,৫০০ এবং জ্ঞান ৪৩ লক্ষ একর। পশ্চিমবঙ্গে গ্রামদান সংখ্যা ১৭৫ ও জ্ঞান ১৪০০০ একর। ইংলান্ডে বিলিকৃত জমির পরিমাণ ১০ লক্ষ একর। ১৯৫১ সালে তেলেঙ্গানার পঞ্চমপল্লী প্রথম গ্রামদানের পৌরবে স্মরণীয়।

দীঘায় বিধান-স্মৃতি :

মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের প্রস্তাব অনুসারে দীঘায় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আবক্ষ ব্রোঞ্জ মূর্তি স্থাপনের সিদ্ধান্ত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে সেচমন্ত্রী শ্রী অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে একটি কমিটিও গঠিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন সমস্ত সমস্যার সমিতির নিকট অর্থের অল্প আবেদন জানাইয়াছেন। আগামী জুলাই মাসে এই মূর্তি প্রতিষ্ঠার কথা। দীঘা ডাঃ রায়ের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত। এখানে ডাঃ রায়ের স্মৃতিরক্ষার এই উদ্ভোগ খুবই বাঞ্ছনীয়।

শ্রীলক্ষী মজুমদার

দিলীপকুমার রায়ের

অনামী ২য় সং—৬.৫০ দ্বিজেন্দ্র কাব্যসঞ্চয়ন—৮

উপস্থাপন : ছায়ার আলো ১ম খণ্ড—৩.৫০, ২য়—৩.৫০

দোলা (২য় সংস্করণ)—৮

নাটক : তিথারিণী রাজকন্তা—(মীরা) ২-১০ শাদা-

কালো—২, আপদ ও জলাতক ২, শ্রীচৈতন্য—৩

কবিতা : ভাগবতী-কথা (ভাগবতের কাব্যমুদ্রা)—৫

মহাভারতী-কথা (মহাভারতের কাব্যমুদ্রা)—৩

ভাগবতী-গীতি (গান)—৪

স্মরণলিপি : স্মরণবিহার ১ম খণ্ড—৪, ২য় খণ্ড—৪

ভ্রমণ : দেশে দেশে চলি উড়ে (৩য় সং)—৬

স্মৃতিচারণ (আত্মজীবনী) ১ম—১২, ২য়—৬.৫০

তীর্থংকর—৮ অষ্টম আঙ্কো ঘটে (৪র্থ সং) ৫

ইন্দ্রিরা দেবীর সহযোগিতায়

প্রমোদজলি (মীরাভজন—বাংলা অনুবাদ সমেত) ৪

দীপাঞ্জলি—৩.৫০ সুধাঞ্জলি—৩.৫০

শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র সেন ভক্তিভারতী প্রণীত

গীতামাধুরী—১২-৫০

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মতামুসারী গীতার বিশদ ব্যাখ্যা এই সর্বপ্রথম। মৌলিক বৈশিষ্ট্যে অদ্বিতীয়। আলো অমৃত ছত্রে-ছত্রে। ডিমাই সাইজ, রূপ বাইণ্ডিং, প্রায় ৬৫০ পৃঃ।

জন্মমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে—৩

প্রবর্তক পাবলিশার্স ও প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্য

সম্পাদক : শ্রী অরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি.এ. কর্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত।

প্রবর্তক প্রিন্টিং এণ্ড হাক্সটোন লিমিটেড, ৫২৭, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীমণিভূষণ রায় কর্তৃক মুদ্রিত।



৪৮ বর্ষ, ২য় সংখ্যা

জীবন

: জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭০ :

জীবনের আলো

জীব ও ঈশ্বর এই দুইয়ের একে যে জীবন, ভারতবাসী সেই জীবনেরই প্রার্থী। সে জীবনের প্রকাশ জড়বাদে নয়, অধ্যাত্মবাদেও নয়, উহার পরিচ্ছন্ন অভিব্যক্তি জীবনবাদে। জীবনের পর্কে পর্কে শাস্তি, স্বাস্থ্য ও আনন্দের উৎস লীলায়ত করাই ভারতের কাম্য। এই কামনাই দৃঢ়সঙ্কল্পরূপে আর্য্য ঋষির কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিয়াছে। বেদ, উপনিষদ, গীতা, চণ্ডীর ছত্রে ছত্রে তাহাই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। আমাদের হৃদয়ও এই সঙ্কল্পেই উদ্ভূত। আমরা বাঁচিতে চাই, মানুষের মত মানুষ হইয়াই বাঁচার আকাঙ্ক্ষা রাখি। প্রশ্ন উঠিতে পারে—সে বাঁচার লক্ষণ কি? জীবনকে আনন্দময় করিয়া তোলার সুপথ কি এবং কোথা? উত্তরে বলিব—জীবনকে শাস্তির পথে, আনন্দের পথে, শাস্ত অথবা পথের পথে পরিচালিত করার একমাত্র পথ কর্ম। জীবনবাদীর কর্ম তিন অন্ম কোন ধর্ম নাই। এই কর্মের বিজ্ঞান আছে, শাস্ত্র ও ইতিহাস আছে। ভারতের বেদশাস্ত্র হইতেই ইহার সন্ধান মিলিবে। ঋষি বেদব্যাস বেদ-সমুদ্র মন্থন করিয়া চারি ভাগে চারি শাখায় উহা বিভক্ত করিয়া চারিজন সুদক্ষ শিষ্যের দ্বারা এই সুবিশাল বৈদিক সত্যতা প্রচারের যে ব্যবস্থা করেন, তাহা হইতেই আমরা প্রকৃত কর্মের সন্ধান পাই। ব্যাস শিষ্য আচার্য্য জৈমিনী তাঁহার প্রসিদ্ধ কর্মমীমাংসা শাস্ত্র প্রণয়ন দ্বারা কর্মকে ব্রহ্মে অধিত করিয়া যে দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই ভারতবাসীর একমাত্র অমুসরণীয় পথ। জীবন বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়—কর্তার পরেই কর্মের স্থান, তারপর করণ। কর্মই সৃষ্টির বীর্ষ। এই কর্ম হইতেই সৃষ্টির উৎপত্তি এবং সৃষ্টি হইতে সৃষ্টিধার-দ্রব্য এই বিশ্ব প্রপঞ্চের সৃষ্টি। কর্তার সহিত কর্ম ও করণের নিত্য সম্বন্ধ। কর্তা যদি হয় নিত্য, কর্মও নিত্য হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে করণের নিত্যতাও স্বীকার করিতে হইবে। সৃষ্টি প্রপঞ্চের এই বিধান অকাট্য। এই বিধানের অমুসরণই জীবনের ধর্ম। হিন্দুধর্ম কর্মবাদী। করণ যতটা স্থূল, কর্ম তদপেক্ষা স্থূল। তাই কর্মের গতি নির্ণয় করণ-নির্ণয় অপেক্ষা কঠিন। তথাপি কর্মস্থল ধরিয়াই ঈশ্বর-তত্ত্ব অনুভূত হয়। কর্মের গতি দ্বিবিধ। প্রথমে অধিরোহণ। যে কর্ম করিতে করিতে কর্তার অনুভূতি, তাহাই অধিরোহণস্থচক কর্ম। আর কর্তাকে লাভ করিয়া যে কর্ম, তাহাই গঙ্গাবতরণের ছায়া ঈশ্বর-কর্ম। গীতায় উহাই ব্রহ্মকর্ম নামে অভিহিত। এই ব্রহ্মকর্মই আজ প্রতি মানুষের সাধ্য হউক—ইহাই জীবনপ্রদ ও জীবনের ধর্ম। (১৩৪৬-এর প্রবর্তক হইতে)

সজ্জনগুরু শ্রীমতিলাল

ঋগ্বেদ

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ (প্রথমং অষ্টকং । ষট্‌ত্রিংশং সূক্তং ।) অষ্টাদশী ঋক্

(সম্বৎসর শ্রীমতিলালের জীবন-ভাষ্য অনুসরণে)

শ্রীঅনিলবরণ তর্কবেদান্ততীর্থ

অগ্নিনা তুর্কশং যদ্বং পরাবত উগ্রাদেব হবামহে ।

অগ্নিম্নয়নবাস্ত্বং বৃহদ্রথং তুর্কীতিং দন্তবে সহঃ ॥ ১৮ ॥

অর্থ—“অগ্নিনা” (অগ্নিদেবের সহিত) “পরাবত” (দূর দেশ হইতে) “তুর্কশং” (ক্ষিপ্ত আশ্রয় প্রাপ্ত জনকে) “যদ্বং” (অমিত সাধনসাপেক্ষকে) “উগ্রাদেবং” (কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনকে) “হবামহে” (আহ্বান করিতেছি) । “অগ্নিঃ” (হে অগ্নিদেব) “তুর্কীতিং” (ক্ষিপ্ত জাগকারী) “বৃহদ্রথং” (বৃহৎ রথখানিকে) “দন্তবে সহঃ” (দন্তকে পরাবত নিমিত্ত) এবং “নববাস্ত্বং” (নূতন আবাসস্থান প্রদানের নিমিত্ত) “নয়ন” (আনয়ন) করুন ॥ ১৮ ॥

সরলার্থ—অগ্নির সহিত দূর দেশাগত শত্রুর হিংসাকারী অমিত সাধনপরায়ণ এবং কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনকে আহ্বান করিতেছি । হে অগ্নিদেব ! শত্রুকে পরাভব করিবার নিমিত্ত এবং নব বাসস্থান প্রদানের নিমিত্ত আপনি আপনার ক্ষিপ্ত জাগকারী বৃহৎ রথখানিকে শীঘ্র আনয়ন করুন ॥ ১৮ ॥

বিশদার্থ—এই ঋগ্বেদে তুর্কশং, যদ্বং, উগ্রাদেবং, নববাস্ত্বং, বৃহদ্রথং পদগুলি একটু সমস্তামূলক । আচার্য্য সায়েন এই পদগুলিতে বিভিন্ন রাজর্ষির নামোল্লেখ করিয়াছেন । তিনি বলেন—“অগ্নিনা সহাবস্থিতাস্তুর্কশনামকং যদ্বনামকং উগ্রাদেবনামকং চ রাজর্ষীন্ পরারতো দূরদেশাঙ্কবামহে । আহবায়ামঃ । স চাগ্নি নববাস্ত্বনামকং বৃহদ্রথনামকং তুর্কীতি নামকং চ রাজর্ষীন্ ৷ ইহানয়তু । কীদৃশোহগ্নিঃ । দন্তবে সহঃ । অশ্বদ্বপদ্রবহেতো-শ্চোরগ্যাভিতবিতা ।” অগ্নির সহিত অবস্থিত তুর্কশ নামক, যদ্ব নামক ও উগ্রাদেব নামক রাজর্ষিগণকে আমরা দূরদেশ হইতে আহ্বান করিতেছি । সেই অগ্নি নববাস্ত্ব নামক, বৃহদ্রথ নামক ও তুর্কীতি নামক রাজর্ষিগণকে এই স্থানে আনয়ন করুন । কি প্রকার অগ্নি ? আমাদের উপদ্রবকারী চোরগণের অভিতবকারী । আচার্য্যদেবের সাহায্য ব্যতিরেকে বেদার্থ হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হইত না । তিনি তাই সর্বজন-প্রণয় । আমরাও এই প্রণয় পুরুষকে যথোচিত শ্রদ্ধা দান করিয়াই এই মন্তব্য-মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করিব ।

অগ্নির সহিত ঋষি তুর্কশং যদ্বং এবং উগ্রাদেবং-কে আহ্বান করিতেছেন । তুর্কশং পদে তুর্ক্যং ক্ষিপ্তং বশতে আশ্রয়ং লভতে ইতি তুর্কশং—যে জন সম্বৎসর আশ্রয়প্রাপ্ত হন, তাঁহাকেই বোঝায় । যজ্ঞ-ধাতু হইতেই যদ্ব পদের উৎপত্তি । অর্থ হয় অমিতসাধন এবং উগ্রাদেব পদে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধ্য ভাবকেই বুঝাইয়া থাকে । ইহা হইতে ইহাই বুঝায় নাকি যে, অগ্নির উপাসনায় মানুষ শীঘ্র ভগবদ আশ্রয়লাভ করিতে পারে ! কারণ ইহা অতীব তপঃসাধ্য । ‘তপসা চীয়েতে ব্রহ্ম’—তপস্যার দ্বারাই ঈশ্বরকে লাভ করিতে হয় । নিত্য নিয়মিতভাবে আত্মস্থানিক ক্রিয়া সম্পন্ন করা যে কতখানি কঠোর কৃচ্ছ্রসাধ্য তাহা অনায়াসেই বুঝা যায় । এই মন্ত্রের প্রথমার্শে সাধনার কঠোরতা প্রদর্শন করিয়া দ্বিতীয়াংশে ঋষি অগ্নির নিকট প্রার্থনা জানাইয়া বলিতেছেন, হে অগ্নিদেব ! আমরা যেন আয়াসী না হই, তপস্তাই যেন আমাদের ধর্ম্ম হয় । তপস্তার প্রভাবেই আমাদের অন্তর যেন সর্বদা অগ্নিরই মত চিরপ্রদীপ্ত তাস্বর থাকে । যে অগ্নিশিখা বাহিরে প্রজ্জ্বলিত করিয়া আমরা নিয়ত সংযমপূত পবিত্র জীবন যাপন করি—সেই অগ্নিশিখায় স্নাত হইয়া আমাদের অন্তরের মলিনতা, জড়তা, শঠতা, খলতা প্রভৃতি অসত্তাবগুলি যেন চিরতরে দূরীভূত হয় । আমাদের অন্তর যেন নিত্য নব নব ঈশ্বরীয়ভাবে পরিপূর্ণ থাকে—আমাদের অন্তঃশত্রু এবং বহিঃশত্রু দুইকে পরাভব করিবার জন্ত এবং আমাদের নব বাসস্থান—অর্থাৎ যে স্থানে বর্তমান মন লইয়া আমরা বসবাস করিতেছি, সে স্থানকে আরও নিরাপত্তা প্রদানের জন্ত আপনি আপনার ক্ষিপ্ত জাগকারী বৃহৎ রথখানি লইয়া আগমন করুন—আমাদের প্রাণগুলিকে সম্বৎসর জাগ্রত করুন, প্রজ্জ্বলিত রাখুন, ইহাই প্রার্থনা ॥ ওঁ শান্তি ॥

গান্ধীবাদ ও বিনোবা ভাবে

শ্রীকালিদাস মুখোপাধ্যায়

২

গান্ধীবাদের উত্তরাধিকারী—বিনোবা ভাবে

নেহেরুকে যদি বলি গান্ধীজীর অহিংস সংগ্রামের উত্তরাধিকারী, তা হলে আচার্য বিনোবা ভাবেকে বলতে হবে গান্ধীবাদের উত্তরাধিকারী। মহাত্মা গান্ধীই স্বয়ং তাঁকে এ গৌরব দান করেছেন। ১৯৪০ সনে গান্ধীজী যখন অহিংসার সহিত সামঞ্জস্য রেখে ব্যক্তিগত সত্যগ্রহণ শুরু করা প্রয়োজন অনুভব করলেন তখন তিনি প্রথম সত্যগ্রহণী হিসেবে মনোনীত করলেন বিনোবাকে, পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু পেয়েছিলেন দ্বিতীয় সত্যগ্রহণী মর্যাদা। ১৯৪০ সনের ১৭ই অক্টোবর প্রথম সত্যগ্রহণী রূপে বিনোবা কারারুদ্ধ হলেন। গান্ধীজী স্বয়ং 'হরিজন' পত্রিকার মাধ্যমে বিনোবাকে সমগ্র জগতের কাছে পরিচিত করিয়ে দিলেন, গান্ধীজীর মারফৎ সমগ্র পৃথিবী জানলো "শ্রীভাবে যুদ্ধ যাত্রেরই বিরোধী।" গান্ধীজীর সেক্রেটারি মহাদেব দেশাই বিনোবাকে গান্ধীজীর জীবন-সাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি বলে ঘোষণা করলেন।

শুধু তত্ত্ব বা চিন্তার রাজ্যে নয়, প্রতিদিনের জীবন-সাধনার মধ্য দিয়ে বিনোবা গান্ধীবাদকে জীবনের সত্য করে তুলেছেন। আচার্য ব্যবহার, পোষাক পরিচ্ছদ, ভাব ভাষা এবং চালচলনে তিনি গান্ধীবাদের জীবন্ত মূর্ত প্রতীক। গান্ধীজীর মতো তিনি ধর্মীয় পরিভাষায় আলাপ করেন, জনতাকে তিনি আহ্বান না করে পদযাত্রা করে তাদের মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হন, জনতার সঙ্গে একান্ত হবার জন্য তিনি অর্থনৈতিক কষ্টের বেশে ঘুরে বেড়ান। গান্ধীজীরই মতো তিনি রাত্রি সাড়ে তিনটায় কাজ শুরু করেন, প্রার্থনা সভায় অংশগ্রহণ করেন, আশ্বস্তিক্রিয় জন্তু উপবাস করেন। বিনোবার এই জীবন-সাধনার মধ্যে আমরা নতুন করে খুঁজে পাই মহাত্মা গান্ধীকে—তাঁর জীবনাদর্শকে।

'সর্বোদয়' শব্দটির সঙ্গে বিনোবার নাম ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। আচার্য ভাবেকে বলা হয় সর্বোদয়ের সাধক। কিন্তু সর্বোদয় শব্দটি বিনোবার স্বষ্টি নয়—

গান্ধীজীই সর্বোদয় শব্দটি প্রথম প্রয়োগ করেন। রাস্কিনের "অ্যান্টু-দিস-ল্যান্ড" নামক গ্রন্থটি গান্ধীজীর জীবনে যে আমূল পরিবর্তন এনেছিল সে-কথা সকলেরই জানা আছে। গান্ধীজী এই গ্রন্থের ভাবানুবাদ করেছিলেন এবং সেই অনুবাদ গ্রন্থের নামকরণ করেছিলেন সর্বোদয়। গান্ধীজীর জীবনদশায় সর্বোদয় শব্দটি প্রচলিত হয় নি, কিন্তু এই শব্দটির মধ্যেই তাঁর সমস্ত জীবন-সাধনা বিদ্যুত হয়েছে। তাই আচার্য ভাবে স্বাধীন ভারতে গান্ধীবাদকে পরিণতির পথে নিয়ে যাবার জন্য সর্বোদয় শব্দটি গ্রহণ করেছেন। সর্বোদয়ের অর্থ সকলের উদয়। পশ্চিমী গণতন্ত্রের মূলকথা হ'ল প্রচুরতম মানুষের প্রভুতম হিতসাধন। স্বাধীন ভারতে এই গণতন্ত্রের পরীক্ষা চলেছে। গান্ধীজীর মতো বিনোবা এই গণতন্ত্রকে ভারতের পক্ষে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করলেন না। গান্ধীজীর মতো তিনি বললেন, ভারতবর্ষকে গ্রহণ করতে হবে অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত সমস্ত মানুষের কল্যাণের পথ, গড়ে তুলতে হবে সর্বোদয় সমাজ। সর্বোদয় সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন পরিপূর্ণ অহিংস-বিপ্লব। বিপ্লবকে ঠেকিয়ে রাখা বিনোবার উদ্দেশ্য নয়। বিনোবা লিখেছেন : "My mission is not to stave off a revolution. I want to prevent a violent revolution. The future peace and prosperity of the country depend upon the peaceful solution of the land problem."

ভূমি সমস্যা ভারতের প্রধান সমস্যা

বিনোবার মতে স্বাধীন ভারতের সর্বপ্রধান সমস্যা হ'ল ভূমি সমস্যা। তিনি বলেন, ভূমি সমস্যার স্পষ্ট সমাধানের উপরই নির্ভর করছে ভারতের শান্তি, স্বাধীনতা। তিনি গান্ধীজীর পথে অহিংসপন্থায় ভূমি সমস্যার সমাধান করতে চান। ভারতবর্ষ যে পশ্চিমী গণতন্ত্রকে গ্রহণ করেছে সেই গণতন্ত্র পুঁজিবাদ ও হিংসার

উপর প্রতিষ্ঠিত। সেইজন্য এই গণতন্ত্রের উপর তিনি আস্থা রাখতে পারেন নি। সাম্রাজ্যবাদী পন্থায়, পুঁজি-বাদকে বাঁচিয়ে রেখে যুগের দাবী মেটানো যাবে না। দেশে দেশে অগণিত মানুষ সংঘবদ্ধভাবে এগিয়ে চলেছে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী নিয়ে। মেহনতী মানুষকে বাঁচবার অধিকার, কৃষকদের জমির অধিকার দিতেই হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কোন পথে আসবে রূপান্তর। কম্যুনিষ্টরা সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চায় শ্রেণী-সংগ্রামের পথে—বলপ্রয়োগের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। বিনোবার বিশ্বাস বলপ্রয়োগের পথে অগ্রসর হ'লে সর্বাত্মক যুদ্ধ হবে অপরিহার্য এবং সেই সর্বাত্মক যুদ্ধের পরিণাম হবে সর্বাত্মক প্রত্নয়। একমাত্র বিকল্প পন্থা হ'ল গান্ধীজীর অহিংসপন্থা। বিনোবার ভাষায়: "The choice is either to prepare for total war, or abandon violence altogether, and accept non-violence."

সর্বোদয় ও কম্যুনিজম

সর্বোদয় সমাজের যে আদর্শ বিনোবা ভাবে উপস্থিত করেছেন তার সঙ্গে কম্যুনিষ্টদের প্রচারিত সমাজব্যবস্থার সাদৃশ্য নিবিড়। লক্ষ্য এক হলেও উভয়ের পন্থা একেবারে বিপরীতধর্মী। গান্ধীজীর মতো বিনোবা বলেন, উদ্দেশ্য অপেক্ষা উপায়ের গুরুত্ব ঢের বেশী। এইজন্য বিনোবা কম্যুনিষ্টদের উদ্দেশ্যকে বলেছেন মহান, কিন্তু তাদের হিসাবশ্রমী পন্থাকে বলেছেন ভ্রান্ত। বিনোবা লিখেছেন, "বাইরে থেকে মনে হতে পারে, যে দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে—তাদের একটি রাশিয়ার নেতৃত্বাধীনে কম্যুনিষ্টরা এবং আর একটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন ধনিক সম্প্রদায়। কিন্তু ভাবাদর্শের দিক দিয়ে আমেরিকা তার সব জীবনীশক্তি হারিয়ে ফেলেছে, যদিও সামরিক শক্তির দিক দিয়ে তাকে শক্তিশালী মনে হতে পারে, আমার মনে হয় না আমেরিকা সত্য সত্যই এখন কম্যুনিষ্টদের প্রতিদ্বন্দ্বী স্বরূপ। আমার বিশ্বাস, শেষ পর্যন্ত কম্যুনিষ্টবাদকে গান্ধীবাদের সঙ্গে শক্তির পরীক্ষা করতে হবে।" বিনোবার

ধারণা কম্যুনিজম এবং গান্ধীবাদ মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—একটি ভাবাদর্শ আর একটি ভাবাদর্শকে গ্রাস করতে উদ্ভত।

কম্যুনিজমের স্পর্ষিত আবহান বিনোবা গ্রহণ করেছেন, গান্ধীজীর অহিংসপন্থায় তিনি কম্যুনিজমের সহিত মোকাবেলা করতে দৃঢ়সংকল্প। তিনি কম্যুনিজমের উপর গান্ধীবাদকে ভারতে জয়ী করে পৃথিবীকে নতুন পথ দেখাতে পারবেন বলে বিশ্বাস করেন। এই বিশ্বাস তাঁকে নেহেরু-পরিচালিত কংগ্রেস হতে নিয়ে গেছে ভিন্নতর পথে, নতুন কর্মপন্থা গড়ে তুলতে করেছে সচেষ্ট। বিনোবা লিখেছেন: "অহিংস সমাজ অর্থাৎ শোষণহীন এবং শাসনমুক্ত সমাজ রচনা করতে হ'লেও বর্তমান অবস্থায় সমাজে দণ্ডশক্তি অর্থাৎ শাসন ব্যবস্থার অবকাশ রয়েছে। তবে অহিংস সমাজ রচনার সমাজে সব চাইতে বড় সংস্থা হবে সেবা-সংস্থা। শাসন সংস্থা যদিও এখন থাকবে, তবে তা গোঁণ হয়ে থাকবে। সেই বৃহত্তম সেবা-সংস্থা ক্ষমতায় আলিপ্ত থেকে শাসন-সংস্থার উপর তার প্রভাব বিস্তার করবে এবং শাসন-সংস্থা তার পরামর্শমতো চলবে। সেবা হবে সার্বভৌম আর ক্ষমতা হবে তার সেবিকা। সেবা-সংস্থা অহিংস সমাজেও থাকবে। তবে তা হয়ে থাকবে গোঁণ। কংগ্রেস দেশের সবচাইতে বড় প্রতিষ্ঠান। তাই অহিংস সমাজ রচনার দিকে লক্ষ্য রেখে মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসকে সেবা প্রতিষ্ঠান করে রাখতে চেয়েছিলেন। তা হলো না। কংগ্রেস আজ দেশের সব চাইতে বড় সংস্থা হয়েছে সেবা-সংস্থা নয়। এ নির্বাচন প্রধান। নির্বাচনের মাধ্যমে শাসন ক্ষমতা হস্তগত করা—এই হচ্ছে কংগ্রেসের কাম্য। এই অবস্থায় অহিংস সমাজ রচনা করার জন্ত এদেশে নতুন করে এক নিছক সেবা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে যাকে কংগ্রেসের চাইতে বৃহত্তর প্রতিষ্ঠান হতে হবে ও যার নৈতিক প্রভাব এতদূর হবে যে, ক্ষমতায় আলিপ্ত থাকলেও শাসন সংস্থা তার কথা মেনে চলবে। দেশের সব চেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস আজ শাসনান্ধিমুখী। তাই অহিংস অর্থাৎ শাসনমুক্ত সমাজগঠনে কংগ্রেস সব চেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হবে।" স্মরণীয় বিনোবাকে গড়ে তুলতে

হ'ল সর্বসেবা-সংঘ এবং গ্রহণ করতে হ'ল সর্বোদয় সমাজের পরিকল্পনা।

মহাত্মা গান্ধী যে অহিংস সমাজের নাম দিবেছিলেন রামরাজ্য, বিনোবা তাকে বলেছেন সর্বোদয়। সর্বোদয় বা রামরাজ্য রচনার জন্য বিনোবা চান ত্রিবিধ পরিবর্তন। প্রথমতঃ ছদ্মের পরিবর্তন, দ্বিতীয়তঃ জীবন-ধারার পরিবর্তন এবং তৃতীয়তঃ সমাজের পরিবর্তন। বিনোবার বিশ্বাস এই ত্রিবিধ পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে গড়ে উঠবে সর্বোদয় বা সাম্য যোগের প্রতিষ্ঠা। সর্বোদয় বা সাম্য যোগের জন্তই তিনি দ্বাদশ বর্ষেরও অধিক কাল গ্রাম হ'তে গ্রামান্তরে করে চলেছেন পদ-পরিক্রম। বিনোবার পরিকল্পিত সর্বোদয়ের ভিত্তি হ'ল ভূদান-যজ্ঞ। বিনোবা বলেন : “ভূদান-যজ্ঞ গান্ধীজীর সর্বোদয়বাদ তথা সাম্য যোগের যুগোপযোগী পরিণত রূপ।” গান্ধীজীর পরে বিনোবা ভূদান যজ্ঞের মাধ্যমে এমন এক কর্মপন্থা তুলে ধরলেন যার দ্বারা শান্তির পথে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহের সমাধান করা সম্ভব বলে তিনি মনে করেন।

কম্যুনিজমকে ব্যাহত করতে পারে সমাজতন্ত্র

ভারতবর্ষ এশিয়ার অন্তর্গত দেশের মতো কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষিসমস্তা ভারতের প্রধানতম সমস্যা। এ দেশের বেশীর ভাগ মানুষই ভূমিহীন। যারা ভূমিহীন তারাই অন্নহীন। এই অন্নহীনদের বিনোবা বলেছেন, ‘রুদ্রাবতার’। একদিকে সম্পদের প্রাচুর্য, অন্যদিকে অস্ত্রহীন দারিদ্র্য। ভূমিসমস্তার স্তূর্ষ সমাধান করে যদি বৈষম্য দূর করা না যায় তা’ হলে রক্তশোভের মধ্য দিয়ে একদিন তার সমাধান হবে, অত্যাচারিত ভূমিহীন মানুষ জোর করে কেড়ে নেবে জমি—যেমন ঘটেছে রাশিয়া, চীন ও ইন্দোচীনে। অস্ত্রের সাহায্যে অত্যাচার ও নির্যাতন চালিয়ে ক্ষুধাতুর জনতাকে যে অবদমিত করা যায় না তা সপ্রমাণ হয়ে গেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী ইতিহাস তার সাক্ষ্য।

এশিয়া এবং আফ্রিকায় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে স্বার্থোদ্ধত অবিচার মানুষের মর্যাদাসিক বেদনাকে করেছে

পরিহাস, শ্রীতকায় অপমান অক্ষমের বক্ষ হতে রক্ত প'ন করেছে পরম নির্ভয়ে এবং সেদিন ভীত ও যন্ত্রুচিত মানুষের মানমুখে লেখা শত শতাব্দীর বেদনান করুণ কাহিনী শুধু নিষ্ফলতাই বহন করেছে। একদিন ছিল যখন অত্যাচারিত জনতা নীরবে নিঃশব্দে গর্বাঙ্ক মানুষের নির্ভুর অবিচার ও অবমাননা সহ্য করেছে, প্রতিবাদ করতে পারে নি, বিচারের দাবী পারে নি জানাতে। পালা বদল হয়েছে, জনতা হাজার বছরের ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে। তারা আর সহ্য করবে না অবিচার ও অত্যাচার—তারা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

জাতীয়তাবাদী চীনের অধিনায়ক চিয়াং-কাইশেক কমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন অসংখ্য চাষীর সমর্থনে, কিন্তু তিনি সেই কৃষকদের জন্য প্রায় কিছুই করেন নি না করতে পারেন নি। তাই তাঁকে শেষ পর্যন্ত হারাতে হ'ল চাষীদের সমর্থন। এই সমর্থনের অভাবে আমেরিকার অভাবিত আর্থিক ও সামরিক সাহায্য পেয়েও তিনি আত্মরক্ষা করতে পারলেন না, মাওসে তুং-এর নেতৃত্বে তাঁকে করল শোচনীয়ভাবে পরাজিত। ইন্দোচীনে কম্যুনিষ্টরা ফরাসীরা যে আমেরিকার বিপুল সাহায্য লাভ করেও হোচিমিনের নেতৃত্বে পরিচালিত কম্যুনিষ্টদের দমন করতে পারলো না তার কারণ কম্যুনিষ্টদের পিছনে ছিল অসংখ্য চাষীদের ব্যাপক সমর্থন। ভারতবর্ষে যদি কোনদিন কম্যুনিজম বিজয়ী হয় তবে তা হবে রাশিয় অথবা চীনের সহযোগিতায় নয়। মস্তো অথবা পিকিং হতে এদেশে কম্যুনিজম আসবে না, আসতে পারে না যদি কম্যুনিজম এ দেশে বিজয়ী হয় তবে তা হবে অসহনীয়, দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে, কোটি কোটি আদর্শবাদী হতাশ ও বঞ্চিত বেকারের মধ্য দিয়ে—অগণিত গৃহহীন অন্নহীন মানুষের অধিকারে বঞ্চিত মানুষের মধ্য দিয়ে। কম্যুনিজমকে প্রতিরোধ করতে হবে অন্নহীন সমস্তার সমাধান—ভূমি সমস্তার স্তূর্ষ সমাধান। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পরাজিত জাপানে কম্যুনিজমের প্রভাব দ্রুত বেড়ে গিয়েছিল। জেনারেল ম্যাক আর্থার অ-ইনে- সাহায্যে জমি বন্টন করে দেন জমিহীনদের মধ্যে—

মুঠিময় মানুষের হাত থেকে জমির মালিকানা চলে এল অসংখ্য মানুষের হাতে। এইভাবে ম্যাক আর্থার জাপানে কম্যুনিজমের অগ্রগতি শুরু করে দিতে হন সক্ষম।

ভারতবর্ষ যদি কম্যুনিজমকে বাধা দিতে চায়, তাকে অতি দ্রুত অগ্রসর হতে হবে সমাজতন্ত্রের পথে। ভারত সরকার জমিদারি উচ্ছেদ করেছেন। কিন্তু জমিহীন মানুষ জমি পায়নি। ভূমি সমস্যার সমাধান হয়নি। নীতির দিক থেকে ভারত সরকার সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষতিপূরণ না দিয়ে জমিদারের জমি অধিকার করতে রাজি নয়। সুতরাং একমাত্র বিকল্প পথ হল ভূদান যজ্ঞ। নৈতিক আবেদনের উপর নির্ভর করে আচার্য বিনোবা ভাবে যখন এই আন্দোলন শুরু করেন, তখন তিনি সমর্থন পেয়েছিলেন খুব কম মানুষেরই—বেদিন কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ ও কংগ্রেস সরকার এই আন্দোলনের প্রতি ছিলেন বিরূপ বা উদাসীন।

ভূমি বিপ্লব চাই কেন

১৯৪৩ সনে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কম্যুনিষ্ট আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠে; বার্মা, ফিলিপাইন এবং ইন্দোনেশিয়ায় কম্যুনিষ্টরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই সময়েই তেলেঙ্গানায় বিজ্ঞীর্ণ অঞ্চল জুড়ে স্তর হয় কম্যুনিষ্টদের সশস্ত্র আন্দোলন। তেলেঙ্গানায় সমস্ত জমি ছিল মাত্র কয়েকজন হাতে এবং বেশীর ভাগ মানুষই ছিল ভূমিহীন। এই ভূমিহীন অসংখ্য মানুষ ছিল অসহনীয় দারিদ্র্যের পঙ্কজ-নিমজ্জিত। এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করল কম্যুনিষ্টরা, তারা সশস্ত্র পন্থায় জমিদারদের উৎখাত করে জমি ভাগ করে দিল ভূমিহীনদের মধ্যে। সংঘবদ্ধভাবে কম্যুনিষ্টরা যখন জমিদারদের উপর আক্রমণ শুরু করল, তখন তারা স্বভাবতই ভূমিহীন জনতার সমর্থন পেয়েছিল। জমিদারদের উচ্ছেদ করতে গিয়ে অস্তুতঃ কয়েক হাজার মানুষকে হত্যা করা হয় এবং অত্যধিক হিংস্র আক্রমণ ও ধ্বংসের ভয়াল ছায়া বিস্তৃত হয় তেলেঙ্গানার এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত পর্যন্ত। এই বিদ্রোহ দমন করার জন্য ভারত সরকারকে পুরো দুই ডিভিসন সৈন্য

এবং ত্রিশ হাজার প্রাদেশিক পুলিশ নিযুক্ত করতে হয়েছিল, আড়াল থেকে হঠাৎ আক্রমণ বন্ধ করার জন্য কোন কোন জায়গায় পথের দুধারের জঙ্গল পাঁচ গজ পর্যন্ত কেটে ফেলা প্রয়োজন হয়েছিল।

তেলেঙ্গানায় কম্যুনিষ্ট আন্দোলন যে সশস্ত্র বিদ্রোহের আকার ধারণ করেছিল এবং ভারতের অত্যন্ত অংশে সেই বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়বার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল, তার প্রধান কারণ জমিদারদের হৃদয়হীন নির্ভরতা, ধনিক ও বণিকদের সীমাহীন মুনাফার লোভ, শাসন বিভাগে ব্যাপক দুর্নীতি এবং আশাহত আদর্শবাদী শিক্ষিত বেকারের ভয়াবহ পরিস্থিতি। এইসব সমস্ত সমাধানের জন্য তখনও ভারত সরকার কার্যকরী কিছু করতে পারেন নি। সর্বোপরি কম্যুনিজমের আদর্শবাদে বিমুগ্ধ মানুষ সমস্ত সমাধানের বিকল্প কোন আদর্শের সন্ধান পায়নি—ভারত সরকার বা কংগ্রেস জনতার কাছে কোন বিকল্প আদর্শবাদ তুলে ধরতে পারেন নি। মনে রাখা দরকার একটা আদর্শবাদকে প্রতিরোধ করা যায় শুধু আর একটা আদর্শবাদের দ্বারা। সংশয় ও সংকটের মুখে বিনোবা এগিয়ে এলেন হাযদ্রাবাদে গান্ধীবাদের মশাল হাতে নিয়ে। তিনি ঘোষণা করলেন, তিনি গান্ধীজীর অহিংস পন্থায় ভূমি সমস্যার সমাধান করবেন। ১৯৪১ সনের ১৮ই এপ্রিল তিনি শুরু করলেন ভূদান যজ্ঞ—শুরু হ'ল তাঁর পদ-পরিক্রমা। তিনি বললেন, গ্রামে ভূমির মালিক কেউ থাকবে না। তিনি চাইলেন সমগ্র গ্রামকে এক পরিবারে পরিণত করতে। তিনি জমির মালিকদের বললেন, “ভারত পরিবারের ষষ্ঠ সন্তান জ্ঞানে ভূমিহীন চাষীদের আপনারা জমি দিন।”

১৯৩১ সনের ডিসেম্বর মাসে লণ্ডনে যে ‘গোলটেবিল বৈঠক’ আয়োজন করা হয়, সেই বৈঠকে গান্ধীজী যোগ দিয়েছিলেন। এই বৈঠকে তিনি ব্রিটিশ শাসকদের বলেন, তিনি সম্ভাব্যদের সমর্থক নন। সেখানে তিনি এ কথাও বলেন যে, ঐতিহাসিকগণ কিন্তু সম্ভাব্যবাদীদের কর্মপদ্ধতির নিন্দা করে না। তিনি ইংরেজ শাসকদের বললেন, যদি তারা তাঁর পরামর্শ গ্রহণ না করে, সম্ভাব্য-

বাদীরা তাদের কর্মপ্রণালী অল্পসরণ করেই চলবে। গান্ধীজীর নিজের ভাষায়, “আপনারা কি চোখ খুলে দেখবেন না, সম্ভ্রাসবাদীরা তাদের রক্ত দিয়ে কী লিখে চলেছে? আপনারা কি দেখছেন না, আমরা গমের রুটি চাই না, আমরা চাই স্বাধীনতার রুটি। স্বাধীনতার রুটি না পেলে আমাদের মধ্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এমন হাজার হাজার মানুষ রয়েছে যারা নিজেদের শাস্তি দেবে না এবং দেশকেও শাস্তি দেবে না।” গান্ধীজীর এই উক্তির সোজা অর্থ হ’ল, ইংরেজ শাসক যদি অহিংস কংগ্রেসের দাবী স্বীকার না করে, তা’ হ’লে দেশ এগিয়ে যাবে হিংসার পথে—সশস্ত্র পন্থাতেই দেশবাসী ইংরেজের হাত থেকে ছিনিয়ে দেবে স্বাধীনতা। বিনোবা গান্ধীজীর মতোই জমিদারদের বলেছেন, “আপনারা যদি অহিংসা এবং প্রেমের পন্থা গ্রহণ করেন তা’ হ’লে আপনারা জমির মমতা ত্যাগ করতে হবে। নতুবা যে হিংসার যুগ এগিয়ে আসছে তা শুধু জমিই ধ্বংস করবে না, যারা জমি অধিকার করে রয়েছে তাদেরও ধ্বংস করবে।”

বিপ্লবের ভীতি যেমন ইংরেজ শাসককে গান্ধীজীর সঙ্গে আপোষ করতে প্রণোদিত করেছিল, মনে হয় বিনোবার আস্থানে জমিদারগণ অনেকটা অল্পরূপ কারণেই সাড়া দিয়েছে। স্বীকার করতেই হবে, বিনোবার ভূমি আন্দোলনের গতিবেগ আশাশূরূপ হয় নি—সাফল্যের পথ এখনও দূর দিগন্তে বিলীন। ভূদান আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতের ভূমি সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হবে, এ কথা পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর মতো অনেকেই বিশ্বাস করতে রাজি নন। কিন্তু বিনোবার আশা অপরিমেয়, তিনি নিরাশ হন নি। তিনি বৈধের সঙ্গে অপেক্ষা করতে রাজি আছেন। ভূদানকে তিনি উপলক্ষ্য বলে মনে করেন। তাঁর আসল লক্ষ্য মানুষের মধ্যে অহিংসার উদ্বোধন—বৃহত্তর সমাজ-জীবনে অহিংসাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। স্বল্প সময়ের ভিতর এ আদর্শকে রূপায়িত করা যে সম্ভব নয় তা যে কোন মানুষই বুঝতে পারে। কাজেই বিনোবার পক্ষে অপেক্ষা করা সম্ভব, কিন্তু নিরস্ত্র ভূমিহীন মানুষ কি দীর্ঘকাল বৈধরক্ষা করতে পারবে?

সর্বোদয় না সর্বনাশ

স্বাধীন ভারতে গান্ধীবাদকে সফল করে তোলবার অমিত আশা নিয়ে বিনোবা গান্ধীজীর দেহাবসানের তিন মাস পরে সর্বোদয় সমাজের আদর্শ দেশবাসীর কাছ তুলে ধরলেন। এর পর তিন বছর কেটে গেল আশা ও নিরাশায়। গান্ধীবাদকে সাফল্যের সঙ্গে বাস্তবজীবনে প্রয়োগ করা সম্ভব হল না। তেলেছানায় (১৮ই এপ্রিল, ১৯১১) বিনোবার চোখ খুলে গেল, তিনি পেলেন পথের সন্ধান। ভূদান-যজ্ঞের মধ্যে অবস্থিত হ’ল অহিংসার মাধ্যমে সামাজিক ও আর্থিক বিপ্লবসাধনের পথ। বিনোবা পদযাত্রা শুরু করলেন, তাঁর আস্থানে বিভিন্ন কেন্দ্রে বিচ্ছিন্ন গান্ধীবাদীরা মিলিত হলেন, তাঁরা ভূদানের মাধ্যমে ভূমি-বিপ্লব আনবার জন্ত হলেন ব্রতবদ্ধ। আদর্শবাদের আস্থানে এগিয়ে এলেন ত্যাগব্রতী চারুচন্দ্র ভাণ্ডারীর মতো মানুষ, এগিয়ে এলেন জয়প্রকাশ নারায়ণের মতো অসামান্য কর্মী। বিনোবার নেতৃত্বে গান্ধীযুগের হারানো আশাবাদ হ’ল উজ্জীবিত। জাতীয় জীবনে এলো একটা নতুন নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চেতনা—স্বাধীনতার পরে ভারতের দিকে দিকে যে প্রলয় শিখা জ্বলে উঠেছিল তা হ’ল সীমিত। ১৯৫৭ সনের কাছাকাছি বিনোবার ভূদান আন্দোলন অবিস্থাসীরও দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ভারতসরকার এবং কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের মধ্যে অনেকেই এই সময় হ’তে ভূদান যজ্ঞের প্রতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন জানাতে শুরু করলেন। কারণ তাঁর দেখলেন, বিনোবার ভূদান আন্দোলন যদিও সরকার এবং কংগ্রেসের কর্মপন্থার বিপরীত, তবুও এই আন্দোলন তাঁদের কর্মপন্থার বিরোধী নয়, বরং সহায়ক। কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ দেখলেন, বিনোবার ব্যক্তিগত প্রভাব এবং তাঁর ভূদান আন্দোলনকে কংগ্রেসের স্বার্থে বিশেষতঃ পল্লী অঞ্চলে নির্বাচনের সময়, কাজে লাগানো সম্ভব।

বিনোবার ধ্রুব বিশ্বাস তিনি যে ভূদান-যজ্ঞ শুরু করেছেন তার পিছনে রয়েছে মহাকাালের দাবী—ইতিহাসের অমোঘ আস্থান। তিনি মনে করেন আমেরিকা যুগ-সংকট উত্তীর্ণ হবার মতো নেতৃত্ব দিতে পারবে না। আবার কম্যুনিষ্টদের হিংসাত্মক পন্থাকে



মিস্টার

— শ্রীধর লাল ধর

(পূর্বসূচী : বৈশাখ সংখ্যার পর)

পাহাড়ের সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে দেবকুমার বললো—
আমাকে মিছামিছি টেনে আনলে, আমি তো এখনও
স্বাভাবিক নই।

—তাতে কি?—নিরলা বললো—আমি পূজা
করবে তুমি দেখবে। সকালে দেবদর্শনে পুণ্য হয়।

পাপপুণ্যে দেবকুমারের বিশ্বাস ছিল না, জনার্দনের

সঙ্গে এ নিয়ে সে তর্ক করেছে, কিন্তু আজ আর সে তর্ক
ভুললো না।

শতাধিক সিঁড়ি ভেঙে হরপার্বতী মন্দিরের চত্বরে
তারা উঠে এলো। সামনের উঁচু মন্দিরটার পিছনে
গোলাকার স্বর্ষ্য দেখা যাচ্ছে,—এখনও তাম্র পানে
তাকানো যায়। নিরলা বললো—দেখেছ, কী বাহার!

নিরলার লাল শাড়ীখানা ঝলমল করে ওঠে, দেব-
কুমার সেই দিকে তাকিয়ে বলে—চমৎকার!

পুরোহিত মন্দিরের দ্বার খুলে ফুল সংগ্রহ করতে
গিয়েছিল। নিরলা হাতে সাজী নিয়ে ভিতরে ঢুকলো,
বললো—তুমি বাইরে দাঁড়াও, বাসি কাপড়ে আর
ভিতরে এসো না।

দেবকুমার থমকে দাঁড়ালো। বললো—পূজা
দেখবো না?

—না। বাইরে থেকেই প্রণাম কর।

নিরলা মন্দিরের মধ্যে ঢুকে গেল।

দেবকুমার একবার ভিতর পানে তাকালো, অন্ধকারে
হরপার্বতীর মূর্তি ঠাহর করা যায় না, সে সরে এলো
ধ্বজস্তম্ভের সামনে। কয়েক বছর আগে এই স্তম্ভের
কাজ শেষ হয়েছে। ধামটির গায়ে আগাগোড়া
হরপার্বতীর মূর্তি খোদাই করা। শিল্পী ধনঞ্জয় পুরো
পাঁচটি বছর কাটিয়েছে এই ধামটি খোদাই করতে। একক
ভাস্করের এমন সৌখীন কাজ এখানে আর কোথাও নেই।
চারিপাশের চৌবটি যোগিনী মন্দিরেও অনেক কারুকাজ

তিনি মানব কল্যাণের নিত্যপন্থা বলে মনে করতে
পারেন না। স্তত্রাং তাঁর মতে একমাত্র বিকল্প পন্থা
হ'ল গান্ধীজীর অহিংস পন্থা। তিনি ধ্যান-দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ
করেছেন, অহিংস পন্থায় ভারতে ভূমি-বিপ্লব ঘটতে
চলেছে। বিনোবা লিখেছেন, “আমি বিশ্বাস করি যে,
আমরা যদি শান্তির পথে ভূমি-সমস্যার সমাধান করতে
পারি, তবে আমাদের দেশে তো শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবেই,
অধিকন্তু তা হ'তে পৃথিবী পাবে শান্তিময় বিপ্লবের
সন্ধান।” বিনোবার নেতৃত্বে গান্ধীবাদ যদি ভারতে
কম্যুনিষ্টদের বিপরীত পন্থায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক

বিপ্লব ঘটাতে পারে, তা'হলে শুধু ভারতবর্ষেরই নবজন্ম
হবে তা নয়, সমগ্র পৃথিবী পাবে নতুন আলো, খুঁজে পাবে
অহিংস ও শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের কার্যকরী পন্থা—কম্যুনিজ-
মের উপর গান্ধীবাদ হবে বিজয়ী। বিনোবা বলেন,
স্বাধীন ভারতে যদি গান্ধীবাদ ব্যর্থ হয় তবে গান্ধীজীর
পরিকল্পিত সমস্ত গঠনমূলক কাজই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে
অর্থাৎ গান্ধীবাদ কম্যুনিজমের কাছে হবে পরাজিত।
বিনোবার মতে এই জয় পরাজয়ের উপর নির্ভর করছে
সমগ্র পৃথিবীর শান্তি ও স্বাধীনতা—নির্ভর করছে
সর্বোদয় অথবা সর্বনাশ। (সমাপ্ত)।

আছে, কিন্তু সে তো কোন শিল্পীর একার কাজ নয়। কতদিন ধরে কতজন মিলে কাজ করেছে। সেই তুলনায় ধনঞ্জয় কতী ভাস্কর। দেবদেবীর মূর্তি আঁকতে হলে এই ধনঞ্জয়কে ছাড়িয়ে যেতে হবে। সে প্রতিভা যদিবা দেবকুমারের মধ্যে থাকে, কিন্তু যে ভক্তিপূত মন নিয়ে এই মূর্তি খোদাই করা যায় তেমন ভক্তি তো তার অন্তরে নেই। মন না থাকলে হাতের কাজ তো খুলবে না। দেবকুমারের মন চায় আর কিছু খোদাই করতে, কিন্তু তা কা ?

পূজা শেষ করে নিরালো বেরিয়ে এলো। কাছে এসে বললো—কি দেখছ, ধনঞ্জয় শিল্পীর হাতের কাজ ? তুমি পার এমন একটা থাম খোদাই করতে ?

—না। আমার ইচ্ছে হয় না।

—শক্ত কাজে হাত দিতে কারও ইচ্ছা হয় না। তা কি কাজ করতে তোমার ইচ্ছা হয় শুনি ?

—মাহুঘের মূর্তি আঁকবো।

—রাজা-মহারাজার মূর্তি ?

—না। সাধারণ মাহুঘের মূর্তি।

—সে আবার কেমন ? খাচ্ছে, ঘুমুচ্ছে, তেল মাখছে, স্নান করছে—এই সব ?

—হ্যাঁ, তাই।

—কি হবে সেই সব মূর্তি খোদাই করে ? কোন কাজে লাগবে ?

—মন্দিরের দেয়ালে বসিয়ে দোব। এখনও তো চৌষট্টি যোগিনী মন্দিরের দেয়ালে অনেক জায়গা রয়েছে।

—দেবমন্দিরের গায় মাহুঘের মূর্তি বসবে ?

—কেন দোষ কি ? সিংহ রয়েছে, হাতী রয়েছে, হরিণ রয়েছে, ময়ূর রয়েছে, হাঁস রয়েছে আর মাহুঘ থাকলেই দোষ হবে ?

—দোষ নিশ্চয়ই আছে, না হলে এতদিন কেউ আঁকেনি কেন ?

—কেউ হয়তো ভাবেনি এই কথা।

—ওঃ, তুমিই বুঝি সবার আগে ভাবছ ? নিজের সম্পর্কে অহঙ্কার তো খুব।

নিরালার বিজপ দেবকুমারকে ধামিয়ে দিল। মুহূর্ত মধ্যে মুখখানি আবার থম্‌থমে হয়ে ওঠলো। নিরালার সজাগ দৃষ্টিতে তা ধরা পড়ে।

কয়েক পা এগিয়ে এসে চক্করের শেষে একটি হরিতকী গাছের নীচে দেবকুমার থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো, বললো—আমি এখানে একটু বসি।

—কেন, রাগ হয়ে গেল বুঝি ?

—না, আমার যাবার তো কোন তাড়া নেই, খানিক পরে গেলেও হবে।

—দোকান খুলবে না ?

—আমার দোকান না খুললেও আর পাঁচখানা দোকান তো খুলবে, খন্দের ঠিকই জিনিষ পাবে।

দেবকুমার গাছের নীচে বসে পড়লো।

নিরালো তার মুখের পানে তাকিয়ে, হাত ধরে কি যেন বলতে যাচ্ছিল, সামনের সিঁড়ি দিয়ে কথেকজন পূজার্থীকে উঠে আসতে দেখা গেল। তাদের চোখের উপর দেবকুমারের হাত ধরতে নিরালার সন্মোচ হলো, সে কিছু না বলে সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করলো।

দেবকুমার বসে রইল গাছতলায়। পূজার্থীরা উঠে এলো, পূজা করে ঘণ্টা বাজিয়ে চলে গেল, আবার আরো ক'জন এলো। এলোমেলা মাহুঘের আনাগোনা। আশেপাশে কয়েকটা মৌমাছিও অমনি এলোমেলা উড়ছে। মাথার উপর একটা প্রকাণ্ড মৌচাক। পাহাড়ের কোলে ঘাটের সামনেই অমনি থোকা থোকা বাড়ীঘর। মাহুঘও তার চারি পাশে ঝাঁকে ঝাঁকে ঘুরছে। মৌমাছি সঞ্চয় করে মধু, আর মাহুঘ সঞ্চয় করে টাকা। সঞ্চয়ের চারিপাশে বৃত্তাকারে এদের আত্মবিন ঘোরাফেরা।

দেবকুমার তাকিয়ে থাকে, নীচে নর্দদা, সামনে হুধ-পাহাড়, পাশে আদিগন্ত স্ত্রামল গাছপালা ও ধূসর মাঠের মেলামেশা। ধীরে ধীরে বোদ তীব্র হয়, হরিতকী গাছের নীচে আর ছায়া থাকে না, দেবকুমারকে উঠতে হয়। নেমে যাবার আগে ধ্বজস্তম্ভের গায় খোদাইয়ের কাজগুলো প্রথমে সূর্যালোকে একবার ঘুরে-ফিরে দেখে যায়। হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দেখে আর তাই শিল্পী

ধনঞ্জয়ের মত এই রকম কাজেই হাত দেবে নাকি ? কিন্তু মন তো সাড়া দেয় না।

ধীর পদক্ষেপে পাহাড়ের সিঁড়ি বেয়ে দেবকুমার নেমে আসে।

দেবকুমার বসেছিল, নিরালা খাবার নিয়ে এলো। হলুদ রঙের শাড়ী, চুলে কয়েকটা চাঁপা ফুল গাঁজা, হাতে গামছায় বাঁধা খাবারের পাত্র। ওর পানে তাকিয়ে সহসা নরনারী ঘাটে দেখা হলুদ পাখীর কথা মনে ওঠে, সেই হলুদে এই হলুদে বেশ মিল আছে।

নিরালা হাসিতে মুখখানি উজ্জ্বল করে বললো—
রাগ পড়েছে ?

দেবকুমার সে কথার কোন জবাব দিল না, সহসা প্রশ্ন করে বললো—নিরালা, তুমি গান গাইতে পার ?

—তুমি কি পাগল নাকি, গান তো নটীতে গায়।

—অনেকে তো আপন মনেও গান গায়।

—খুশির গান ? সে তো ছ'চার কলি সবাই জানে, তুমিওতো জানো।

—সেই খুশির গানই তুমি একথানা শোনাবে আমাকে ?

—এ পাগলামি আবার কেন ? ভাস্কর থেকে কি সুরকার হবে নাকি ?

—না, গান না হলে ওই হলুদ পাখীর সঙ্গে তোমার টিক মিল হয় না।

—হলুদ পাখীর সঙ্গে আমার মিলের দরকার ?

—কি দরকার জানি না, তবে হঠাৎ ওই মিলের কথাটা মনে উঠলো কিনা, তাই বলছি।

—আর বাজে কথায় দরকার নেই, খেতে বসো। তোমায় খাওয়া হলে তারপর আমি গিয়ে খাব। বেলা হয়েছে।

নিরালা খাবার গোছাতে বসলো।

দেবকুমার খেতে বসে। নিরালা বললো—হলুদ পাখীগুলোকে দেখতে বেশ লাগে, না ? গাঢ় হলুদ বরণ, লাল ঠোঁট, লাল চোখ, ডাকেও ভারী মিষ্টি। শাদা পাখরগুলোর উপর টুকটুক করে উড়ে বেড়ায়, আমার

দেখতে খুব ভাল লাগে। তুমি ওই পাখীর একটা ছবি ছুধপাথরে খোদাই কর দেখি। খোদাই করার পর পাখীগুলোর গায় একটু হলুদ রং বুলিয়ে দিলে চমৎকার দেখতে হবে। খোদাই কর না, সারি সারি হলুদ পাখী,—একটা বসে আছে, একটা সবে ডানা মেলেছে, একটা উড়ছে।

—পাখীর সারি।—দেবকুমার বললো—যেমন হাঁসের সারি, ময়ূরের সারি, সবাই এঁকেছে। না, আমি ওই পুরানো ধরনের কিছু করবো না। আমার যা-কিছু খোদাই হবে, তা হবে নতুন, যা কেউ কোনদিন আঁকেনি।

—নতুন কি হবে ? মানুষের ছবি ? তাই খোদাই কর, দেখি ছ-একখানা।

—আঁকো বললেই আঁকা হয় না। এমন কিছু খোদাই করতে হবে যা সহজেই মানুষের চোখে পড়ে। সেই ভঙ্গিটা কি হবে তাইতো ভাবছি।

—মানুষের ভঙ্গি ? সেতো একটা মানুষকে নানা-ভাবে দাঁড় করিয়ে দেখালেই হয়।

—অতো সহজ নয়, দেহের সৌষ্ঠব না থাকলে যত ভালো করেই আঁকা হোক ভালো খুলবে না। আগে চাই অঙ্গসৌষ্ঠব, তারপর ভঙ্গি।

—পথে এতো মানুষ দেখছ, তার মধ্যে সুন্দর মানুষ একটাও খুঁজে পাচ্ছ না ?

—না, মনের মত মানুষ পাচ্ছি না। পেলো তাকেই দেখে পাথরে ছবি তুলতাম।

—কেমন মানুষ তুমি চাও শুনি ?

—পুরুষের চেয়ে রমণীর অঙ্গসৌষ্ঠব ভালো। রূপ রমণীর দেহে। সাধারণ মানুষের চোখের সামনে কোন সৌন্দর্য তুলে ধরতে হলে, রমণী মূর্তি খোদাই করতে হবে। কিন্তু তেমন রমণী আমি কোথায় পাই যাকে সামনে রেখে আঁকবো ?

—ওঃ, তাই এতো ভাবনা ? এতদিনে বুঝলাম—নিরালায় মুখে হাসি ফুটলো, বললো—তা কেমন মেয়ে তোমার পছন্দ বল। দেখি খুঁজে পাই কিনা ?

জলের ঘটিটা এক নিঃশ্বাসে শেষ করে দেবকুমার

বললো—কেমন হবে সেই মেসে? বয়সে তরুণী, উজ্জ্বল শ্যাম, মাথাভরা কোঁকড়া চুল, বড় বড় চোখ, টিকালো নাক, পাতলা ঠোঁট, একহারা গড়ন। হাসলে সামনের দুটি দাঁত অল্প দেখা যায়, চলাফেরায় একটা সুন্দরী কমণীয়তার আভাস আছে।

নিরালার মুখের পানে তাকিয়ে দেবকুমার কথাগুলো বলছিল, নিরালা বলে উঠলো—আমি তোমার নমুনা হলে চলবে?

—তুমি?

—হ্যাঁ আমি। বাইরে কাকে বলতে যাবো, আমি যদি তোমার নমুনা হলে চলে তো আমি হতে পারি।

—তুমি নমুনা হবে?—সমালোচকের ধারালো নজর দিয়ে দেবকুমার নিরালার পানে তাকালো, নতুন দৃষ্টিতে সে নিরালার দেহের প্রতিটি রেখাকে বিচার করে নিতে চাইল। শাড়ীর আবরণে ঢাকা দেহখানির প্রতিটি রেখাকে নগ্নরূপে সে যেন বিশ্লেষণ করে নিতে চাইল।

সেই অপলক তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে নিরালার মুখ লাল হয়ে উঠলো। সে চোখ নামিয়ে নিল, তাড়াতাড়ি বাসনগুলি গুছিয়ে নিয়ে বললো—ছুপুরে আসবো, আজ থেকেই শুরু করে দাও তাহলে।

—তোমার বাবাকে একবার বলবো না?

—বাবাকে আবার কি বলবে? তুমি আমাকে দেখে ছ-একখানা ছবি পাথরে খোদাই করবে, চুকে গেল। এ নিয়ে বাবাকে বলতে গেলে তিনি সেকেলে মাহুষ, নানা কথা বলবেন, তোমার মনের কথা বুঝবেন না, কাজ হবে না।

—তবু একবার বলে রাখা ভাল, নাহলে পরে যখন জানবেন তখন তিনি কি ভাববেন বলত?

—কিছুই ভাববেন না, মূর্তি দেখে কিছুই চিনতে পারবেন না, চিনতে পারেন সে তখন আমি বুঝবো'খন।

খাবার জায়গাটা নিকিয়ে দিয়ে নিরালা নিচে চলে গেল। বাগানের বেড়া পার হয়ে বট গাছটার পাশ দিয়ে নিরালা চোখের আড়ালে চলে গেল, দেবকুমার তাকিয়ে রইল তার পানে। এই মেয়েটিকে সে আবাল্য দেখছে, কিন্তু আজকের মত এমনভাবে কোনদিন

দেখেনি। নবযৌবনের লাভণ্য এসেছে দেহে, পথ চলার গতিতে দেখা দিয়েছে যুগ্ম মরাল ছন্দ। কিশোরীর দেহের উপর যৌবনের গাঙ্গীর্ষ এসেছে। এ মেয়েকে নিয়ে প্রথম কাজ শুরু করা চলে। ওর দেহের ভঙ্গিমাটুকু ধরতে হবে, বাকিটা কল্পনা দিয়ে ভরিয়ে তুলতে হবে।

কিন্তু কি হবে সে নমুনা? কোন্ ভঙ্গিমা দেহের কমণীয়তা অপরূপ হয়ে ধরা পড়ে? কোন্ ভঙ্গিমা অতি সহজেই রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে? কোন্ রূপের প্রকাশে শিল্পীর রচি ও শিল্পের সৌন্দর্য স্বীকৃতি পাবে?

দেবকুমার আবার ভাবতে বসে। বেলা যায়।

প্রয়াগ থেকে বরাবর পথ এসেছে খজুরপুরী, সেখান থেকে মণ্ডলেশ্বর তারপর এই যোগিনীঘাট। যোগিনীঘাট থেকে বরাবর পশ্চিমমুখী চলে গেছে সঞ্চয়ী ও বিদিশা হয়ে উজ্জয়িনী। যোগিনী পাহাড়ের পাশ দিয়ে এই পথেরই একটা বাহ উত্তরমুখী চলে গেছে নর্মদা-প্রপাতে। যারা এই পথে আসে, যোগীশ্বর হরপার্বতীর পূজা দিয়ে নর্মদা প্রপাতও তারা দেখে যায়। এই নর্মদা প্রপাত না দেখলে যোগিনীঘাট দেখা সম্পূর্ণ হয় না। কালো পাষাণের বুক জলের এই প্রচণ্ড গতি, চলচঞ্চল জলধারার ছল-ছল ধ্বনির গাঙ্গীর্ষ, পুঞ্জীভূত শীকড়-কণার রৌদ্রদীপ্ত বর্ণালি, মহাকালের জটা-বন্ধনের মধ্যে গঙ্গার নৃত্যচঞ্চল রূপ যেন চোখের সামনে তুলে ধরে।

এই পথে যোগিনীঘাটের দিক থেকে কিছুটা এলেই ভাস্করপল্লী। পর পর কুড়ি-বাইশখানি বাড়ী। বাড়ীর সামনে রোয়াক। রোয়াকের উপরেই দোকান, দুধ-পাথরের বাসনকোসন ও খেলনা সাজানো। ছুঁচারটে দেবমূর্তিও আছে। কালো পাথরের জিনিষও যে একেবারে নেই তা নয়, তবে এখানে যারা কেনা-কাটা করে তারা দুধপাথরের জিনিষই খোঁজে। পুঙ্কর ছাড়া দুধপাথর তো আর কোথাও মেলে না। আর গয়া কানী প্রয়াগ মথুরা—কালো পাথরের তো ছড়াছড়ি।

প্রতিদিন সকালে ভাস্করেরা জিনিষ সাজায় আবার সন্ধ্যাবেলা ঘরে তোলে। সারা রাত বাইরে থাকলেও

চুরি হবার ভয় নেই, তবে গরু কি বিড়াল এসে উৎপাত করে পাথরের দ্রব্য ভেঙে দিতে পারে, এই শঙ্কা।

পিতার মৃত্যুর পর থেকে দেবকুমার আর দোকান সাজায় না। সেই যে জিনিষগুলো ঘরে তুলেছে, আর সাজানো হয়নি। দরজার সামনে কখনো ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে, কখনো-বা সারাদিন তাকে দেখাই যায় না।

সোমনাথ একদিন জিজ্ঞাসা করলো— জিনিষগুলো কি হলো?

—ঘরে আছে।

—ঘরে রেখে কি হবে, সাজিয়ে বসো, তবু দু'একটা বিক্রী হবে তো?

—সারাদিন বসে বসে পাহারা দিতে হবে তো— সে আমি পারবো না। ওগুলো বরং আপনাকে দিয়ে দিই, আপনার দোকানে রাখুন, বিক্রী হলে আমাকে দাম দেবেন।

কথাটা সোমনাথের ভালো লাগে না, বলে—ও কোন কাজের কথা নয়, ভাস্করের ছেলেকে পাথর বেচতেই হবে—না হলে অন্ন জুটবে না। তোমার জিনিষপত্র সাজিয়ে তুমিই বসো। এই বুড়ো বয়সে আমারই বা এতো পোষাবে কেন! আমি এই বয়সে যা পারি তুমি সমর্থ জোয়ান ছেলে তা পারবে না, বসে বসে দিন গুজরাণ করবে।

বিরজিত্তরের সোমনাথ চলে যায়। দেবকুমারের দিক থেকে কোন চাঞ্চল্যই প্রকাশ পায় না।

পিছনের দরজা দিয়ে নিরালো ঘবে এলো দেবকুমারকে চমকে দিয়ে ডাকলো—কি গো দেবুদা, ঘুমুলে নাকি?

দেবকুমার পিছন পানে তাকালো।

—কিসের নমুনা চাই? কি করতে হবে বল?— তরল কণ্ঠে নিরালো প্রশ্ন করলো।

দেবকুমার বললো—তাইতো ভাবছি।

—এখনও ভেবে কিছু ঠিক হলো না?

—কোন ভদ্রিমাটা খোদাই করবো তাই ভাবছি।

—নাচের ভদ্রিমা নাও, মেয়েদের নাচের ভদ্রিমাই ভালো হয়।

—না না, যে কাজ তোমাদের প্রতিদিন করতে হয় আমি তারই চিত্র খোদাই করবো।

—তবে ঝাঁট দেওয়ার ভদ্রি নাও,—আমি ঝাঁটা হাতে উঠান ঝাঁট দিচ্ছি।

বিক্রপের কণ্ঠে কথাটা বললেও দেবকুমার সেটুকু উপেক্ষা করলো, বললো—ঝাঁট দেওয়া, বেশ, আর কি?

—ঝাঁট দেওয়া, বাসন মাজা, রান্না করা, কাপড় কাচা, ঘর নিকানো, বাঁতা পেশানো,...

নিরালার কণ্ঠে তখনও বিক্রপের তারল্য।

দেবকুমার নিরালার উচ্চারিত প্রতিটি শব্দের যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করে, তারপর বললো—আর কিছু করো না?

—আবার কি করবো? স্নান করি, চুল বাঁধি, মা হলে ছেলে মানুষ করি...

সহসা দেবকুমারের চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, বললো—হয়েছে। আমি চুল বাঁধার চিত্রটাই প্রথম খোদাই করবো। তুমি কেমনভাবে বসে চুল বাঁধো আমায় দেখাও তো।

—এই ব্যাপারে এতো ভাবনা, ভাগ্যিস তগবান আমায় শিল্পী করেননি, খুব বেঁচে গেছি।

নিরালো হাঁটু মুড়ে একপাশে হেলে বসলো, বললো—চুল এলিয়ে দিতে হবে?

—হ্যাঁ।

—তাহলে একখানা চিরুণী দাও।

দেবকুমার চিরুণী দিল। নিরালো মাথার এলো খোঁপা খুলে, ডেউখেলানো চুলের রাশি মেলে দিল হাঁটুর উপর দিয়ে। বাঁ হাতে এক গোছা চুল ধরে, ডান হাতে নিল চিরুণী। হেসে বললো—এই দেখো আমাদের চুল বাঁধা।

দেবকুমার ভালো করে দেখলো। পাশ থেকে এলো সামনে, তারপর ঘুরে গেল ডান দিকে, তারপর বললো—শাড়ির আঁচলটা একটু মেয়ের উপর ছড়িয়ে

দাও, বাঁ পা-খানা একটু বাড়িয়ে দাও সামনে, চুলের একটা গোছা থাক পিঠের উপর।

নিরালা সেইমত করলো।

দেবকুমার উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠলো—হ্যাঁ, এইবার ঠিক হয়েছে।

ঘরের একপাশে সারি সারি সাজানো ছিল ছু-পাথরের চাকলা। এই চাকলা থেকেই ভাস্করেরা থালা তৈরী করে। জনার্দনও এইগুলি থালা করার জুয়াই বেখেছিল। সেই চাকলা একখানা তুলে নিয়ে দেবকুমার বসে পড়লো নিরালার সামনে। সূচালো একটি কাঠ-কয়লা দিয়ে সেই পাথরখানির উপর রেখা টানতে লাগলো। সাদা পাথরের উপর সরু কালো বেখায় এক নারীমূর্তি ফুটে লাগলো। এক ভরুণী বসে চুল বাঁধছে। মুখখানি সবটুকু দেখা যায় না। কেশম্বত সরু সরু আঙ্গুলগুলিতে একটা ছন্দ। একপাশে কঞ্চলিকার বন্ধনে উন্নত বন্ধের কোরক-বস্ত্রটি পরিস্ফুট। খড়্গের মত নিতম্ব রেখাটি পায়ের গুল্ফে এসে নেমেছে গুল্ফের উপর দিয়ে নেমে গেছে ঢেউখেলানো চুল, পাশে ছড়িয়ে পড়েছে শাড়ীর আঁচল।

ছ'দণ্ডের মধ্যে শিল্পী রেখা সম্পূর্ণ করলো, বললো—হবে গেছে।

নিরালা স্বরিতে উঠে দাঁড়ালো, বললো—কই, কি হলো দেখি ?

দেবকুমার পাথরখানি তার হাতে দিল।

নিরালা বললো—ভুল হয়েছে, আমার হাতের কঁকন কই ? এমন বড় বড় কঁকন নজরে পড়েনি, এই বুদ্ধি শিল্পীর চোখ।

—সত্যি, এ ভুল হওয়া তো উচিত নয়—দেবকুমার পাথরখানি টেনে নিল নিরালার হাত থেকে। দুই মণিবন্ধে কঙ্কনের দুটি রেখা টেনে দিল কাঠ-কয়লা দিয়ে।

নিরালা আড়চোখে একবার দেখে নিয়ে বললো—এখন যাই, ঘরের সব কাজ ফেলে এসেছি। এই রইল তোমার চিরঞ্জী।

নিরালা বেরিয়ে গেল। সে ভেবেছিল দেবকুমার

হয়তো তাকে ডাকবে, কিন্তু দেবকুমার তখন পাথরের কালো রেখার মধ্যে তন্ময় হয়ে গেছে।

সন্ধ্যাবেলা নরমদার ঘাটে এসে দেবকুমার বসে থাকে। আকাশ লাল করে দিয়ে সূর্য অস্ত যায়। সন্ধ্যার আঁধার ঘনিষে আসে। একে একে মাথার উপর তারা ফুটে ওঠে। ঘাটের পাশের দোকানগুলিতে আলো জ্বলে, দূর থেকে মনে হয় ওরা বুদ্ধি মাটির তারা, আকাশের মতই একে একে অন্ধকারে ফুটে উঠছে।

নিরিবিলিতে দেবকুমার একা বসে থাকে। আজ মন বড় উচ্ছল। পিতার একটা কথা আজ বারবার মনে পড়ছে। ‘কারশিল্প বড় কঠিন সোমনাথ, শিল্পীর ভান কবে অনেকে কিন্তু খাঁটি শিল্পী দুর্লভ। সত্যকারের শিল্পসৃষ্টি যোগসাধনার মত আয়াসসাধ্য। ঈশ্বরের আশীর্বাদেই সেই স্বজনীশক্তি পাওয়া যায়। বিশ্বকর্মা ক্ষণে ক্ষণে সৌন্দর্য সৃষ্টি করেন, এই পৃথিবীতে কত রূপ, কত রঙ, সেই রূপ ও রঙকে ধরে রাখতেই শিল্পীর জন্ম। কিন্তু সাধনা না থাকলে সত্যিকারের শিল্পী জন্মায় না। শিল্পী আগে তৈরী হয় মনে, তারপর তা প্রকাশ পায় কাজে।’

দেবকুমার সেই সাধনায় নেমেছে। রূপকে সে ধরে রাখবে পাথরের গায়। যদি এই সাধনায় সে সিদ্ধিলাভ করতে পারে তাহলে তার সৃষ্টি দর্শকের চিত্তে আনন্দ দেবে বহুকাল। মৃত্যু-দিগন্তে একদিন সে হারিয়ে যাবে, কিন্তু তার সৃষ্টি কালকে উপেক্ষা করবে যুগ থেকে যুগান্তরে। শিল্পী থাকবে না, শিল্প থাকবে। স্রষ্টা অদৃশ্য কিন্তু সৃষ্টি দৃশ্যমান। ভগবান ও শিল্পী তো সমগোত্রীয়। দেবকুমার নিজেকে শিল্পীর পর্যায়ে উন্নীত করতে চায়।

কোন এক সময় পাহাড়ের উপর থেকে সন্ধ্যারতির ঢাক ও ঘন্টাধ্বনি ভেসে আসে। দেবকুমার উঠে দাঁড়ায়। একে একে পাহাড়ের সিঁড়ি উঠতে শুরু করে।

মন্দিরের সামনে আরতি দর্শনের জুতা আরো কতজন এসেছে। প্রকৃতির ব্যাপক এই অন্ধকারের মধ্যে এই মানুষগুলিকে নেহাৎ নগণ্য বলে মনে হয়। তুচ্ছ এক একটি জীবন-বিন্দু। রাজিশেষের নক্ষত্রের মত এই বিন্দুগুলি একদিন কোথায় হারিয়ে যাবে। এদের মনের

পঞ্জিকা সংস্কার প্রসঙ্গে

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য জগদগুরু শঙ্করাচার্য অনন্তশ্রী শ্রীমদন্তিস্বামী জগন্নাথাত্মমপাদ

বর্তমান সময়ে পঞ্জিকা বিঘাট চরম সীমায় দাঁড়াইয়াছে। হিন্দুর যা কিছু ধর্ম্মাঙ্গঠান সব নির্ভর করে পঞ্জিকাশুদ্ধির উপর। যখন আমি তারকেশ্বরে মোহান্তপদে ছিলাম সেই সময় বাংলার সমুদয় পঞ্জিকার গণক রাধাবল্লভ জ্যোতিষীর্থ প্রভৃতির সমাবেশ হয়। মহামহোপাধ্যায় দ্বর্গাচরণ পণ্ডিত প্রভৃতি অনেকেই ছিলেন, অনেক আলোচনা অন্তে সকলেই স্বীকার করিলেন প্রচলিত পঞ্জিকা অন্তর্ক, ইহার সংশোধন অতি আবশ্যক। চিত্রা বা মধা কোন্ পক্ষ লওয়া হইবে তাহা মীমাংসা না হওয়ায় কলিকাতায় ২ নং বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীটে পুনরায় সভা আহত হয়। সভায় শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র লাহিড়ী প্রভৃতি ছিলেন। তথায় বিষ্ণু সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ রহিল যে, উহা নাটক্যাল আলমাসাক অনুসরণ করে, অতএব শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র লাহিড়ী এবং অল্প কয়জনকে লইয়া সারঙ্গী তৈয়ারী হইবে, তদনুসারে পঞ্জিকা তৈয়ারী হইবে। তখন মহামহোপাধ্যায় আমাকে বলিলেন যে, সব ঠিক কিন্তু অন্ততঃ ১০ হাজার টাকা খরচ না করিলে পণ্ডিতদের অন্তর্কুল মত পাইবেন না, কারণ তাঁরা সকলের নিকট বিদায় পান। আমি বলিলাম, যে দেশে ধর্ম্মের এই নিদর্শন তথায় যা হবে বুঝিতেছি। তারপর ২য় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া সব কল্পনা নষ্ট হইয়া গেল—নানা কারণে আমিও স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম। আমার কথা অত্যন্ত তিতো লাগিবে, এখনও সে প্রশ্ন মিটে নাই, তাই পঞ্জিকা সংস্কার হইতেছে না এবং

হইবেও না। আমি বাল্যকাল হইতে সংসারত্যাগী, আমি অতিরঞ্জিত বা কল্পিত কথা কখনই বলি না। কেহ কেহ বলেন, বিষ্ণু-পঞ্জিকাতেও ভুল আছে। সেটা কোন্ বিষয়ে কি প্রকার ভুল তাহা দেখাইবার যদি কারও ক্ষমতা থাকে—তাহা হইলে আমার সিদ্ধান্ত তখনই বদলাইবে। আমাদের নাকি কোন কথা বলিবার অধিকার নাই। পরকাল নষ্ট হউক, ধর্ম্ম ধ্বংস হউক, আমরা কিছু বলি না কারণ অপ্রিয় সত্য হইবে, কিন্তু মহাভারতে বিহ্বরনীতিতে ইহা অস্বীকৃত হইয়াছে। শ্রুতিশাস্ত্রে আমার জ্ঞান নাই, কিছু বলিব না। আমার জিজ্ঞাস্ত গণিতের দ্বারা কাল নির্ণীত হইলে তাহার মুখ্য, গৌণ, প্রশস্ত প্রভৃতি কোন্ কালে কি হইবে তাহা স্মার্ত্ত-গণ নির্ণয় করিবেন বা মিথ্যার ভিত্তির উপর সেটা রচিত হইবে? কাল অখণ্ড দণ্ডায়মান, তাহাকে আমাদের ব্যবহারের অন্ত নানা ভাগ করিয়া থাকি। গ্রহণকালে সকলেরই ধারণা হয় যে, পঞ্জিকাতে যাহা লিখিয়াছে তাহা সত্য। যদি পাশ্চাত্য পঞ্জিকার সাহায্যে গণনা না হইত তবে বাগচী বা গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা এতদিন নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইত। যদি তাহা না হয় তবে তাঁদের রবি, চন্দ্র, রাহুর স্মৃতি আছে—বাণ-বুদ্ধি রসকন্মের দোহাই দিয়া তাঁহারা গণিতের নিয়মানুসারে গ্রহণ গণনা করিয়া নিজেদের মতের সার্থকতা করুন। সমস্ত বৎসরের তিথ্যাদি অন্তর্ক থাকিল, তাহাই শুদ্ধ মানিয়া ধর্ম্মকার্য্য অমুষ্ঠিত হইবে। অর্থাৎ অন্তর্কই শুদ্ধ ইহা কোন্ শাস্ত্রের

কত ভাব. কত রূপ, তার কোন পরিচয় কেউ জানবে না। দেবকুমার কিন্তু হারাবে না, তার মনের পরিচয় সে রেখে যাবে পাথরের গায়।

আরতির শেষে পঞ্চপ্রদীপের তাপ নিয়ে সে বৃকে হাতখানি চেপে ধরে, মনে মনে বলে—দেবতা, আমার হৃদয়ে সামর্থ্য দাও, আমি যেন সত্যিকারের রূপ সৃষ্টি করতে পারি, শিল্পের সাধনায় আমি যেন সিদ্ধিলাভ করি।

সবাই যখন ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে সে তখন তীক্ষ্ণ চোখে দীপের আলোয় হরপার্বতীর মুখ ধ্বানি দেখে, সে মুখে আশীর্বাদের প্রসন্নতা দেখা দিল কী ?

দেবকুমারকে পুরোহিত চেনে, বললো—প্রণাম করা।
দেবকুমার অপ্রতিভ হলো, তাড়াতাড়ি চৌকাঠের উপর মাথা নত করলো।

(ক্রমশঃ)

কাকি তাহা বুদ্ধির বাহিরে। $২+২=৪$ কখনও কোনও দেশে কোন যুক্তিতে ৫ হয় না। আমরা চাই গণিতশুদ্ধ পঞ্জিকা—যাঁরা টাকার লোভে পিতৃপুরুষের দোহাই দিতে সাহস পান তাঁরাই প্রকৃত ধর্মঘাতক। ফলিত জ্যোতিষের অনেক কথাই বলিতে পারি তাহা বলা নিরর্থক। নবাত্ম এবং ষষ্ঠ্যংশ, পরাশর এবং জৈমিনি মতে খুব বেশী মূল্যবান। উহার উপরে বহু বিচার করা হইয়াছে। সহস্র আয়ু, অযুত আয়ু, যুগান্ত আয়ু প্রভৃতি অনেক গণনা সর্কার্চিস্ত্রামণিকার দেখাইয়াছেন তাহা কি বর্তমান পঞ্জিকার স্মৃতি মিলিবে? ৩০ কলাতে ষষ্ঠ্যংশ বদলে যায়। বর্তমান পঞ্জিকায় তার কোনটার বিচার চলিলে, আমি তাহা শিখিবার জন্ত উন্মুখ। এই গণনার ভিত্তিতে কোন বিশিষ্ট জ্যোতিষী একজন সাধুর ২টা বিবাহ লিখেন, অথচ তাঁর বিবাহ হয় নাই। সুপ্রীম কোর্টের ভূতপূর্ব বিচারক ৮বিজন মুখার্জী মহোদয় আজ জীবিত নাই—থাকিলে বলিতাম আমার কিছু জ্ঞান আছে কি না?

“একোহপি বেদবিদ্ ধর্ম্যং যং ব্যবশেদ্ দ্বিজোত্তমঃ।

স বিজ্ঞেয়ঃ পরো ধর্মো নাজ্ঞানামুদিতোহয়ুতৈঃ॥

এ সিদ্ধান্ত অচল। তাঁরা নানা অপকথা প্রচার করিতেছেন কোন্ গণিতের উপর নির্ভর করিয়া? সত্যের খাতিরে কিছু লিখিতেছেন, অথবা রাজনীতি ক্ষেত্রের মত ভোটের জোরে সব করিতে চান? তাহা হইলে এসব বিচার প্রহসনের সার্থকতা কি? যারা স্মার্ত ব্যবস্থাদাতা তাঁরা গণিতের বিষয় কয়জন কতটুকু জানেন? তাহা জানিলে বুলিতাম আমরা কোন্ নোকায় যাত্রা করি। পরকালের উপর বিশ্বাস আছে বলিয়াই বার মাসে তের পার্কণ অনুষ্ঠিত হয়। পুত্রের পিণ্ডের আশায় পিতা পরপারে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকেন। ভোটের জোরে সে পিণ্ড লুপ্ত হইয়া গেল।

একটা কথা মনে পড়িল। কোন কারণে একজনের শরীরে বিষ্ঠা লাগিয়া যায়, তার বন্ধু একজন বলিল, জল এখন কোথায় পাইবে—মুত্তিয়া ধুইয়া ফেল। বন্ধুর বাক্যে তাহাই করা হইল। ধর্মকার্যেও সেইরূপ শুদ্ধি ক্রমশঃ সর্ববিষয়ে চুকিতেছে। অল্প দেশে সগোত্র বিবাহ

হয়। সর্বজাতির ১০ দিনে অশৌচান্ত হয়। বাংলাদেশ স্মার্ত রঘুনন্দনের মতে চলিয়া ডুবিয়া যাইতেছে। স্মার্ত পণ্ডিতমহোদয়গণ অধিকাংশ ঐ মতে মত দিতেছেন, কারণ স্বার্থবিজ্ঞিত কণ্ঠের মূলে আছে অর্থ। না বলিলে চাকরী নষ্ট হইবে। এই বুদ্ধিতে চলিলে অল্পদিনেই পূর্ববঙ্গের মত পশ্চিমবাংলাও একটা অস্থান, কুস্থানে পরিণত হইবে। এইসব ব্যবস্থা প্রস্তাব দ্বারা মল ধুইবার মত, ইহাতে কোন সংশয় নাই। রাজশক্তি কলিগ্রস্ত। পণ্ডিতমহাশয়গণ তার বাহিরে যাবেন কি উপায়ে? তপশ্চিন্তা নাই, মঠ-মন্দিরাদি যা আছে কলিতে তার মূলোৎপাটন করিয়াছে। ঋষিদের মত অল্পসারে বর্ষাসিদ্ধান্ত অল্পসারে কিছু চলিতেছে না। পরবর্তী রাঘবানন্দের সারণী প্রভৃতি চালক, তার ভ্রমপ্রমাদ বুদ্ধিবার মত পাণ্ডিত্য খুব কম পণ্ডিতের আছে। সুতরাং যারা আছেন ভোটের জোরে অন্তর্ভুক্ত হইয়া এই মত চালাইবেন নিশ্চিত। আমাদের পূর্বপুরুষগণ সংস্কৃত বিদ্যা ধারণ করিয়া জীবনপাত করেন, নতুবা মুসলমান আমলে কিছুই থাকিত না। সংস্কৃত ভাষাতেই জ্যোতিষ শাস্ত্রের সমুদয় গ্রন্থ—যদি এই ভাষার একান্ত উচ্ছেদ হয় তাহা হইলে সমুদয় লুপ্ত হইবে। আজ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলেরা যেভাবে বিলাতে যাইতেছে এবং সাহেব সাজিতেছে তাহাতে মনে হয় ভারতবর্ষ বুদ্ধিবাহু য়েচ্ছ দেশে পরিণত হইয়া যায়। গণিত জ্যোতিষ শাস্ত্রের শুদ্ধির উপর ফলিত নিয়ম বিচারের ফলাফল অপেক্ষ করে। অনেকে এই বিচারগুলিকে একেবারে উড়াইয় দেয়। চিরদিনই বিরোধ এবং আত্মকুল্য আছে এবং থাকিবে। ইহ-পরকালের সমুদয় কার্য গণিত জ্যোতিষের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। দশবিধ সংস্কার বিষয়ে জ্যোতিষই একমাত্র প্রমাণ। পরকাল আছে এই বিশ্বাসে কালে পূজা উপাসনাদি সমুদয় হইয়া থাকে। সুতরাং চিন্তাশীল মনীষীগণের একমাত্র কর্তব্য ইহার প্রকৃত শুদ্ধি যেন ভোটের জোরে না হয়। পিতৃপুরুষের পরকাল বিষয়ে বাহা বলিয়াছেন সে বিষয়ে আমাদের প্রকৃত জ্ঞান নাই, ভোগধর্মী শিক্ষায়, বিশ্বাসের মূলে প্রচণ্ড আবাত লাগিয়াছে। জ্যোতিষের মতে—

বন্ধিম-বান্ধব অক্ষয়চন্দ্র

শ্রী অক্ষয়চন্দ্র সরকার

॥ দুই ॥

বন্ধিমচন্দ্র ও অক্ষয়চন্দ্রের প্রথম পরিচয়ের স্বত্রপাত উপলক্ষে অক্ষয়চন্দ্রের লেখা উদ্ধৃত করিতেছি :

৩০।৩১ সালে পিতা যখন জাহানাবাদে মুনসেফ, বন্ধিমবাবুর মেজদাদা সঞ্জীবচন্দ্র তখন জাহানাবাদে সব রেজিস্ট্রার হইয়া গেলেন। সেই অবধি তাঁহাদের দুইজনে বন্ধুত্ব হয়। বন্ধিমবাবু বহরমপুর যাইতেছেন বলিয়া সঞ্জীববাবু পিতাকে পত্র লেখেন, আমাদের বাসাঘ উঠিবেন বলিয়া জানাইয়া রাখেন এবং কাছারীর নিকট বন্ধিমবাবুর জন্ত একটি বাটী ভাড়া করিবার জন্ত অহরোধ করেন। আমি অবশু পাঁচটা বাড়ী দেখিয়া-শুনিয়া একটি বাড়ী ঠিকা করিয়া ঝাড়াইয়া ঝুড়াইয়া রাখিলাম; জল তুলাইয়া রাখিলাম; একটি ঠিকা চাকরও রাখিয়া দিলাম। পূর্বেই বলিয়াছি, বন্ধিমবাবুর কপালকুণ্ডলা পড়িয়া আমি কাব্যের গুণপণায় মুগ্ধ হইয়াছিলাম, স্তবরাং কেবল আতিথ্যের খাতিরে নহে, প্রকৃত ভক্তিভরে, আনন্দ-সহকারে এই সকল কার্য্য করিয়াছিলাম।

যথাকালে বন্ধিমবাবু আসিলেন, আহালাদি করিলেন, শুনিলেন যে আমি গৃহস্থামী গঙ্গাচরণবাবুর পুত্র বি. এল. পাস করিয়া বহরমপুরে ওকালতি করিতে আসিয়াছি।

আহারের পর বিশ্রাম করিলেন; বিশ্রামের পর বৈকালে আমরা পিতাপুত্রে গাড়ী করিয়া তাঁহার বাড়ী দেখাইতে লইয়া গেলাম। তিনি বাড়ী দেখিলেন, পছন্দ করিলেন, ঠিকা চাকর তিনখানা কেদারা বাহির করিয়া দিল, আমরা তিনজনে ক্ষণেক বসিয়া রহিলাম, বাসায় ফিরিয়া আসিলাম, বন্ধিমবাবু সে রাত্রি আমাদের বাসাতেই যাপন করিলেন। পিতার সহিত কথাবার্তা চলিল। পরদিন প্রাতে তাঁহার জিনিসপত্র, চাকর-ব্রাহ্মণ লইয়া গাড়ী করিয়া তিনি নিজ বাসায় গেলেন, আমি গাড়ী করিয়া দিলাম, গাড়ীতে তুলিয়া দিলাম। হায় রে হায়! তখনকার কথা মনে পড়িলে, এখনও বুক ফাটে। এ পর্য্যন্ত বন্ধিমবাবু আমার সহিত একটি কথাও কহিলেন না; অধীনের প্রতি কপালকুণ্ডলাকারের করুণা-কটাক্ষ হইল না। বাবা সব বুঝেন, সব জ্ঞাসেন, সব দেখিতে-হিলেন; আমি ফিরিয়া গেলে বলিলেন, “বন্ধিম গেল হে?” আমি বলিলাম, “হাঁ”। “তোমার সহিত দু’দিনে একটিও কথা হয় নাই?” আমি বলিলাম, “কথা কি, আমি যে একই জীব, এই বাসায় থাকি, সে খবর হয়ত তাঁহাতে এখনও পৌঁছে নাই।” পিতা বলিলেন,

“চক্ষুযা দর্শনং রাহোয়ভদ্রগ্রহণমুচ্যতে।

তত্র কৰ্ম্মাণি কুর্মান্ত গণনামাত্রতো নতু ॥”

শুধু গণনার দ্বারা নির্ণীত গ্রহণ, ধর্ম্মকার্য্যে গ্রাহ্য নহে, চক্ষুদ্বারা যখন দেখা যাইবে তখনই শ্রদ্ধা, দান, পুরস্চরণ প্রভৃতি ধর্ম্মকর্ম্ম অমুঠেয়, শাস্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য। ইহা দ্বারা এটা বোঝা যায় না যে, অল্প সময় শুদ্ধাশুদ্ধির বিচারের কোন আবশ্যকতা নাই। যদি শাস্ত্রের আদেশ তাহাই হইত স্বর্ষ্যসিদ্ধান্ত গ্রহের এই দুইটা বচন থাকিত না।

কালসংসাধনার্থ্য তথা যজ্ঞাণি কারয়েৎ।

শঙ্কুযষ্টিধমুশ্চক্রেহ্মায়াযন্ত্রৈরনেকধা ॥

তোষযন্ত্রকপালাঠৈর্ম্ময়ুরনরবানরৈঃ।

সম্ভ্রুত্রেণুগর্ভৈশ্চ সম্যক্ কালং প্রসাধয়েৎ ॥

যাঁরা স্বর্ষ্যসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ, মানি না বলেন, তাঁরা সেই গ্রন্থসূত্রে কিছু করেন না—তাঁহাতেও কালের সম্যক্ নির্ণয়ের জন্ত এতগুলি যন্ত্রের অবতারণা করা হইয়াছে। দুঃখের বিষয় বর্তমানে এই সব পড়িবার অবকাশও কারও আছে, দেখিতে পাইতেছি না। আমাদের বিশ্বাস শুদ্ধ কালের উপর ভিত্তি করিয়া স্মার্ত পণ্ডিতমহাশয়গণ ধর্ম্মকর্ম্ম নিরূপণ করিবেন। আর্ধ্যসিদ্ধান্ত অমুসারে সাময়িক পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া কাল নিরূপিত হইবে। বেশী বাগাড়ম্বরের প্রয়োজনীয়তা দেখি না, তাই নিরন্ত হইলাম। এটাও জানিতে হইবে, স্বর্ষ্যসিদ্ধান্ত অমুসারে গণনা করিয়াও বর্তমানে গ্রহণ মিলে না। তজ্জন্তই তাঁরা যজ্ঞাদির কথা বলিয়াছেন।

“তাই বটে!” বলিয়া উচ্চ হাস্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার হাসির ফোয়ারায় আমার মনের ময়লা ধুইয়া গেল; পিতৃগৌরবে আমি গৌরাবান্বিত, আমিও হাসিতে লাগিলাম।

কাছারীর ফেরত পিতাপুত্র দুইজনে বঙ্কিমবাবুর স্ত্রীবিধা, অসুবিধা কতদূর হইতেছে দেখিবার জ্ঞান তাঁহার বাসায় তাঁহাকে দেখিতে গেলাম। বঙ্কিমবাবু “আসুন” বলিয়া পিতাকে সংবর্ধনা করিলেন। এবার মনে হইল, পিতাকে আসনের সম্বোধনে ব্রাকটের মধ্যে আমিও যেন আছি। আমার নিযুক্ত সেই চাকর সেইরূপ তিনখানি কেদারা বাহির করিয়া দিল; বঙ্কিমবাবুর আদেশমত পিতাকে তামাক দিল, আমরা তিনজনে বসিয়া রহিলাম। পিতার সহিত বঙ্কিমবাবুর কথোপকথন হইতে লাগিল। আমি জনান্তিকে দুই-এক কথার টোপ ফেলিতে লাগিলাম। বঙ্কিমবাবু কিন্তু টোপ ধরিলেন না। তবে আমি এবার বুক বাঁধিয়া গিয়াছি, বঙ্কিমবাবুর এই ভাব গায়ে কিন্তু মাখিলাম না; তবে মনে মনে এমন ভাবটা হইয়া থাকিবে যে—কাদামাখা সার হ’ল মোর, মাছ ধরা হ’ল না।

এইরূপে দিন যায়। বঙ্কিমবাবু নিজেই বলিয়াছেন, দিন কাহারও জন্ত বসিয়া থাকে না। আমারও দিন আটকাইয়া রহিল না। যতদিন পিতা বহরমপুরে ছিলেন। ততদিন বঙ্কিমবাবু মাঝে মাঝে এক একবার আসিতেন, পিতার সহিত গল্পগুজব করিয়া চলিয়া যাইতেন। তাহার পর পিতৃদেব চলিয়া গেলেন, আমি একা বাসায় রহিলাম। বঙ্কিমবাবু আর আসেন না। আমিও অবশ্য যাই না।

কিসের একটা ৪৫ দিনের ছুটি ছিল। বঙ্কিমবাবুও বাড়ী আসিবেন, আমিও বাড়ী আসিব। নলহাটীতে আসিয়া দুইজনে দেখা সাক্ষাৎ। সাত সাত ঘণ্টাকাল নলহাটীতে বিশ্রাম ও কষ্টভোগ করিতে হইবে, তাহার পর হয়ত ইষ্ট ইণ্ডিয়ান গাড়া আসিবে, নয়ত দুই ঘণ্টা বিলম্বেও আসিতে পারে। সেকেও ক্লাসের বিশ্রাম-ঘরে বসিয়া বঙ্কিমবাবু ও আমি। দিন যায় ত ক্ষণ যায় না। বহুদিন গিয়াছে, কিন্তু এবার বঙ্কিমবাবু ক্ষণ কাটাইতে

পারিলেন না। শুভক্ষণে, অতি শুভক্ষণে বঙ্কিমবাবু কথা কহিতে লাগিলেন। এ কথা, সে কথা, ও কথা—কোথা হইতে কিরূপ করিয়া পড়িল রহস্যকার রেনেগের কথা। তখন দুইজনে অসিধারে রেনেগের মুণ্ডপাত করিয়া, বসিয়া-বসিয়া তৃপ্তিপূর্বক দুইজনে সেই মুড়ি চিবাইতে লাগিলাম। চর্চণের সেই রসগ্রহে দুইজনের ভিতরে সহৃদয়তা জন্মিল, দিন-দিন সেই সহৃদয়তা ক্রমে-ক্রমে অবিচ্ছেদে বিশেষ বন্ধুতায় পরিণত হইয়াছিল। তিনি বড়, আমি ছোট। তিনি বয়সে বড়, জাতিতে বড়, বিদ্যায় বড়, কৃতিত্বে বড়, কিন্তু ছোট বড় বলিয়া বন্ধুত্বে কোন ব্যাঘাত হয় নাই। “বঙ্কিমবাবুর বন্ধুবাৎসল্যতা”র পরিচয় চন্দ্রনাথ দাদা যথেষ্ট দিয়াছেন। আমি আর চন্দ্রনে সুগন্ধি প্রক্ষেপ করিব কেন?

বঙ্কিমচন্দ্র প্যারীচাঁদ মিত্র বা টেকচাঁদ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী সম্পাদন করেন বা ‘লুপ্তরত্নোদ্ধার’ করেন, তাঁহার শেষ বয়সে ১৮৯২ সালে। তাঁহার মৃত্যু হয় ১৮৯৪ সালে। এই লুপ্তরত্নোদ্ধারের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—

‘বাঙ্গালা ভাষার এক সীমায় তারাস্বরের কাদছরীর অম্লবাদ, আর এক সীমায় প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরের দুলাল। ইহার কেহই আদর্শ ভাষায় রচিত নয়। কিন্তু আলালের ঘরের দুলালের পর হইতে বাঙ্গালী লেখক জামিতে পারিল যে, এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ-দ্বারা এবং বিষয়ভেদে একের প্রবলতা ও অপরের অল্পতা দ্বারা আদর্শ বাঙ্গালা গড়ে উপস্থিত হওয়া যায়।’

বঙ্কিমচন্দ্রের এই বিধানামুযায়ী ‘আদর্শ’ গদ্যই তাঁহার নিজের গদ্য রচনা। তিনি সর্বপ্রথম তাঁহারই নির্দেশিত উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ তাঁহারই রচনায় অম্লমুগ্ধিত করিয়াছেন এবং বিষয়ভেদে, বিষয়ের গুরুত্ব হিসাবে—একের প্রবলতা ও অপরের অল্পতা তিনিই তাঁহার বিভিন্ন রচনা-মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

অক্ষয়চন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার আলোচনা-প্রসঙ্গে লুপ্তরত্নোদ্ধারের পূর্বলিখিত উক্তিটি উদ্ধৃত করিয়া “পিতাপুত্রে” লিখিয়াছেন—

‘দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা’ লিখিবার সময়ে বঙ্কিমবাবু যে সম্যক প্রকারে এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন এমন আমার বোধ হয় না। তাঁহার ভাষার “লক্ষ্যত্যাগ” “নিদ্রাহাসন” প্রভৃতি সমস্ত পদ লইয়া কায়স্থকুলভূষণ রাজেন্দ্রলাল মিত্র বিবিধার্থ-সংগ্রহে বিক্রপাশ্রিকা সমালোচনা করিয়াছিলেন আর কায়স্থ-কুলাধম আমি ভাষার একান্ত সংস্কৃতাকারিণী ভদ্রী লইয়া বঙ্কিমবাবুর সহিত বিচার বিতর্ক করিয়াছি।...যে কবিতা বুকের ভিতর দিয়া হৃদয়ে বসিয়া যায় তাহা বাঙ্গালির পক্ষে বাঙ্গালাভেই হওয়া সম্ভব। সাধারণ বর্ণনায়, সাধারণ কথায় যেমন ভাব পরিস্ফুট হয় ভাষা সংস্কৃতাকারিণী হইলে তেমন হয় না। এইরূপ কথার বিচার-বিতর্ক অনেকদিন চলিল। বঙ্কিমবাবু বিষবৃক্ষে “গোকু ঠেঙ্গাইতে” লাগিলেন। বিষবৃক্ষে উভয়রূপ ভাষার সমাবেশ হইল। তখন বিষবৃক্ষ হাতের লেখায়— ছাপানো হয় নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনা সম্বন্ধে ১৯১২ সালে বঙ্গদর্শনে (নবপরিচয়) অক্ষয়চন্দ্র লিখিয়াছেন—

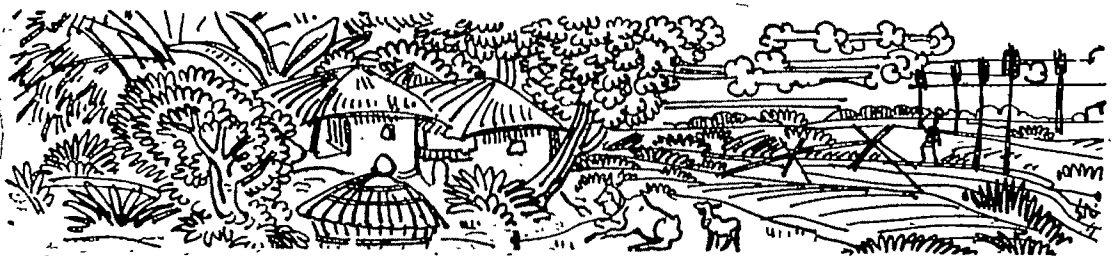
‘কিন্তু বঙ্কিমবাবুর সাধনা—প্রাণ মনের সাধনা। মস্তকের সাধন কিংবা শরীর পাতন। সাহিত্য-সাধনায় তাঁহার একটু বিরতি বা ক্লাস্তি ছিল না; আহার-নিদ্রা সম্বন্ধে জ্ঞান নাই, পারিপাট্যবোধ নাই, ছুটি লইয়াছেন আর দিবারাত্রি সাহিত্য সাধনায় নিমগ্ন আছেন। নিজের লেখা নিজে নষ্ট করিতে প্রাণ ধরিয়া মাহুষ যে সেরূপ পারে, বঙ্কিমবাবুর সাধনা দেখিবার পূর্বে আমার জ্ঞানাই ছিল না। বিষবৃক্ষের এবং আনন্দ-মঠের স্থতিকা-সমাচার আমি কিছু কিছু জানি। বিষবৃক্ষ বহরমপুরে হয়। প্রথম নাম হইয়াছিল “উভয়েরই দোষ”, নগেন্দ্রে ও

দেবেন্দ্রে বিপুল একটা মোকদ্দমা ‘হাইকোর্ট’ পর্য্যন্ত হইয়াছিল। আমার সাক্ষাতে সেই খণ্ড খণ্ডীকৃত হইয়া অতলে গিয়াছে। সমগ্র উভয়ের দোষ পাঠাইয়া দেখা হইয়াছে “বিষবৃক্ষ”। সমীচীন পাঠক বুঝিতে পারিবেন, উভয়েরই দোষ সাব্যস্ত হইলে স্বর্ধ্যমুখীর নিভাস্তই হৃদশা হইত। এখন যে ভাল হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহার সাধনার কথা ভাবিলে এখনও সন্দেহ হইতে হয়। সেই সাধনাই একরূপ প্রতিভা—এই প্রতিভাতেই বঙ্কিমবাবু আমাদের মধ্যে মহিমাষিত হইয়াছেন।’

এইবার বিষবৃক্ষের আদর্শ-ভাষা হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের “গোকু ঠেঙ্গানো” দেখাইতেছি।

‘নগেন্দ্রে দেখিতে দেখিতে গেলেন, নদীর জল অবিরল চলুচল চলিতেছে—ছুটিতেছে—বাতাসে নাচিতেছে—রৌদ্রে হাসিতেছে—আবর্ষে ডাকিতেছে। জল অশ্রাস্ত—অনন্ত—জীড়াময়। জলের ধারে, তীরে তীরে, মাঠে মাঠে রাখালেরা গোকু চরাইতেছে, কেহবা বৃক্ষের তলায় বসিয়া গান করিতেছে, কেহ বা তামাকু খাইতেছে, কেহবা মারামারি করিতেছে, কেহ কেহ ভুজা খাইতেছে। কৃষক লাঙ্গল চষিতেছে, গোকু ঠেঙ্গাইতেছে, গোকুকে মাছের অধিক করিয়া গালি দিতেছে।’

এখন আমরা বুঝিতে পারিতেছি, বঙ্কিমচন্দ্রের ও অক্ষয়চন্দ্রের বজ্র দানা বাধিতেছে, খোলাখুলিভাবে উভয়ে বিচার-বিতর্ক করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু যতক্ষণ না ছইজনে বঙ্গদর্শনরূপ সেতু একত্রে পার হইলেন ততক্ষণ তাঁহাদের বয়ঃপার্বক্য একেবারে বিলীন হইয়া গেল, বজ্রের দানা পুরোপুরি জমাট বাঁধিল না। পরে সেই কথাই বলিতেছি।



চীনের ভারতাক্রমণ প্রসঙ্গে

শ্রীশুশীলপ্রসাদ সর্বাধিকারী, বার-এ্যাট্-ল

২

চাণক্য গুপ্তীর অল্পমান, ভারতের স্বাধীনতা লাভের পরে, মোক্ষম মুহূর্তে ভারতের উপর, চৈনিক হানার চক্রান্ত পোষণ বহুকালের। ভারতের অপরাধ—সময়ে সে চক্রান্ত ভেদ করিতে সমর্থ হয় নাই। ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে ভারত দৃঢ়সঙ্কল্প।

ভারত আক্রমণ করিয়া এবং তাহার ফলাফল সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা করিয়া নেপথ্যে বহু খেল খেলিবার তোড়জোড় চীন করিয়াছে ও করিতেছে। চীনের কপাল সব খেলই সমগ্র বিশ্বের চক্ষে হেয় হইয়াছে। এই সব খেল খেলিতেই আক্রমণ শুরু করিয়া চীন একতরফা ‘যুদ্ধ বিবতি’ ঘোষণা করে। শাদা বাংলায় যাহাকে বলে ‘ভাঙ্গে ত মচকায় নাই’। ভারত সে ঘোষণার আন্তরিকতা সম্বন্ধে সন্দেহান্বিত হইলেও সে ঘোষণার অপমান ভারত করে নাই। প্রকাশ্যভাবে সারা জগতকে কিন্তু জানাইয়া দিয়াছে, যুদ্ধপ্রস্তুতি চালাইয়া যাইবে। আপামর ভারতের সকলে কায়মনোবাক্যে এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়াছে। প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে আসমুদ্র হিমাচলের উদ্ভেজনার সীমা নাই। ঘুমন্ত ভারতের এই ত্বরিত জাগরণে সমগ্র বিশ্ব সচকিত হইয়াছে। চীনের অবস্থা চীনই জানাক। হেরফের করিয়া যাহাই বলুক চীন, শ্রীমতী বন্দরনাথকে নেতৃত্বে শাস্তি আলোচনা প্রস্তাব বিশেষজ্ঞদের অতিমতে এই সঙ্গীত অবস্থায় চীনের শাপে বর। কৌতুকের কথা এই যে, এ আলোচনা প্রস্তাব সম্বন্ধেও চীনের খেল খেলিবার বিরাম নাই। সারা বিশ্বের কমিউনিষ্ট মুখ টিপিয়া হাসিতেছে। চীনকে বলিতে কষ্ট করিতেছে না—‘সেই ত’ মল খসালি তবে কেন লোক হাসালি’।

যা মজ্জি চীনের তাই করবে সে। আমাদের কথা এই, বন্ধু নির্বাচনে ভারত যেন মহর্ষি ভীষ্মের উপদেশাবলী সম্বন্ধে সচেতন থাকে। সুপ্ত ভারতের অভূতপূর্ব জাগরণ (চীনার খোঁচায়) জয়যুক্ত হইবেই হইবে। আত্মসম্মান রক্ষা কি করিয়া করিতে হয় চক্ষু থাকে যদি চীনের, ভারতের পানে তাকাইয়া দেখুক।

এই স্বত্রে একটি প্রস্তাব ভারত গভর্নমেন্টের বিবেচনাদীন রহিয়াছে। প্রস্তাবটি সরল ও আন্তরিক—বাঙালী-রেজিমেন্ট গঠিত হউক। পলাসীর ‘লাল-কোর্ভা’ ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধে, ১৩ নং বাঙালী রেজিমেন্টের কথা সর্বজনবিদিত। লালকোর্ভা ও বাঙালী রেজিমেন্টের বীরত্ব ও কার্য্যদক্ষতার কথাও সর্বজনবিদিত।

গুর্খা, পাঞ্জাবী, শিখ ও মহারাষ্ট্র রেজিমেন্ট প্রভৃতির পাশে, হাতে হাত মিলাইয়া বাঙালী রেজিমেন্টও দেশের গৌরব বৃদ্ধি করিবে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে জোর করিয়া এ কথা আমি বলিব।

বাল্যকালে চীনা পটকা পুড়াইয়াছি, চীনা লঠন ঝুলাইয়া ‘বড়দিন’ করিয়াছি। আর ‘লুপি’ মোজীদার দোকানে ‘লুপি’ দেওয়াইয়া পূজার সময়ে জেলে-মালাদের জুতার যোগাড় করাইয়া দিয়াছি। সেই চীনা ‘রে রে’ করিয়া মাথাষ বাড়ি মারিয়া বসিল আমাদের বংশধরদের, পুরাতন যাত্রার হবহ অহুকরণ করিয়া। বাড়ি মারিতে মারিতে ওই যাত্রারই ধরণে হুক টানিতে বসিল। অর্থাৎ কবি হেমচন্দ্রের দাগা, ‘অসত্য’ চীন সভ্য কথায় বলিল, ‘Cease Fire’—বরাং ছাড়া ইহা আর কি বলিব! ‘পঞ্চনীলা’ ভেদ করিয়া কাঁপাইয়া পড়িল সে ভারতের উপর।

আসমুদ্র হিমাচলবাসী আমরা এই বিশাল দেশের সামান্য কিছু জমিতে দাঁত বসাইলে মালিকের তাহা গ্রাহ্যের মধ্যেই আসিবে না, আন্দাজ করে একদা ‘মুগী’ জুতাওয়ালা সেই চীন। কিন্তু একি। বজ্র নিখোঁষে ভারতের ডাক শুনা গেল, ‘খবরদার! স্বচ্যগ্র ভূমিও স্পর্শ করিলে...আত্মিক ভারতের এ তাব অভাবনীয়। চমকিতের হুক লইয়া বসা ছাড়া তখন আর উপায় কি!

তাহা যেন হইল। কিন্তু যে দেশে চাণক্যাদির আবির্ভাব, সে দেশে চীনা পটকা আওয়াজ তোলে কেমন কথা। নীচ যদি উচ্চভাবে, স্রবুন্ধি উড়ায়ে হাসে। নিশ্চয়ই। হাসি কিন্তু এ নয় ত! এ যে সারমেয়-স্বভাবী

দংশন। এ দংশনের সুযোগ সারমেয় লইতে পারিয়াছে অপাত্রে করুণা করায়। শরশয্যায় শুইয়াও ভীষ্মদেবের এ জাতীয় জীবকে প্রশ্রয় দান সম্বন্ধে নিবেদনবানী বিশ্ব্রত হওয়ারও ফল। রামকৃষ্ণদেব হাসিয়া বলিতেন, ‘যা বলছ মানব কি ক’রে, কাগজে (সংবাদপত্রে) ছাপা হয়েছে! পটকাওয়ালা চীনের কথাও পূর্বে বৃষ্টি ছাপা হয় নাই; তাই আমরা কোনও সন্দেহ না করিয়া পরম-হংসী হইয়া বসিয়াছিলাম।

মানিলাম না হয় এ কথা। বিবেকানন্দজী পর পর যে কথা বলিয়া গলা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন তাহাও ত’ গ্রাহ্যের মধ্যে আনি নাই। চীনকে ‘পঞ্চশীলা’ভুক্ত করাইল ভারত, পাঁচ ভূতের হাত হইতে তাহাকে রক্ষা করাইতে। কৃতজ্ঞতায় গদগদ হইয়া চীন ফুকারিল “হিন্দি-চীন ভাই ভাই”। ভারত জুপ্তি বোধ করিল। অপরের চাপা হাসি লক্ষ্য করিল ভারত, কিন্তু তাহা গায়ে মাখিল না। এশিয়া ভূখণ্ডে চীনের বাড়বাড়ন্তর শুভেচ্ছা ভারত সদাসর্বদা করিয়াছে। নালন্দার পক্ষপুটে আশ্রয়দান হইতে, ইউ.এন.এ-তে চীনের প্রবেশাধিকারের ওকালতি করা ইহার জনস্ব প্রমাণ। Yellow Peril-এর অমূল্য রব বহু বহু পূর্বকাল হইতে অসম্ভিকরই শুনায় ভারতের কর্ণে। প্রথম মহাযুদ্ধকালে যুদ্ধে জাপানের জড়াইয়া পড়া সুবুদ্ধির পরিচায়ক হয না, বলিতে দ্বিধাবোধ করে নাই ভারত। রাশো-জাপানিয যুদ্ধের চমকপ্রদ ঘোঁসা জাপান-এর জয়জয়কারে ভারত, আর চীন হিংসায় ফাটিয়া মরে, মুখে কিন্তু তার বাক সরে না। সেই জাপানের প্রথম মহাযুদ্ধের অন্ধ শেষে পাকৈ পড়ার কারণে, হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে চীন। মর্মান্তিক আঘাতে ভারত মুক হইয়া পড়ে। Yellow Perilist-দের আতঙ্কও অনেকাংশে হ্রাস পায়। চীনের ঘরোয়া বিবাদে মার্কিন মুলুক অংশ গ্রহণ করে কি উদ্দেশ্যে বিশেষজ্ঞগণ তাহা বিশ্লেষণ করুন। রাশিয়া চীনকে সব চিন করাইতে পৌঁ ধরে চীনের অপক্ষে। তাহাতে ‘ওস্তাদ’ বিষয় বিমূঢ়।

‘অপরাধী’ ভারতের কাছেও ‘ওস্তাদ’ চীনের মার্জনা ভিক্ষা করিতেই হইবে যথাসময়ে। চীন জ্ঞানিয়াও

জানে না অতীতে ভারতের সশস্ত্র শক্তির। এই সবে সেদিন তিলক, লক্ষপত, সাতারকর চলিয়া গিয়াছে, কর্জ্জনী বঙ্গবিভাগের শোণ লইয়া শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি কত আসিয়াছে গিয়াছে। ভূমিকম্পে উদ্ধাপাতে নেতাজী ‘ধরহরি’ কাঁপাইয়াছে ব্রিটিশসিংহকে। ভাগ্য তোমার চীন, অহিংস ভারত এত বীর ও বীর্য সম্পন্ন হইলেও, নিবীৰ্য্য প্রেম ও ঔদার্য্যে দিনাতিপাত শ্রেয়ঃ জ্ঞান করে।

‘কলসীর কানা’ কিন্তু তুমি মার নাই। মারিয়াছে শেল, শূল, আগ্নেয়াস্ত্র আর মাতৃ অঙ্গে হাত দিয়াছ। হায় রে হতভাগ্য কি করিলি! আনিস না মাতৃ অবমাননার কারণে ‘এক লক্ষ পুত্র, সওয়া লক্ষ নাতি’র মধ্যে কেহ বাতি দিতে থাকে নাই, কংস ধ্বংস হইয়াছে! চীন-জাপান মৈত্রী আকাঙ্ক্ষা করিয়াছে ভারতের সর্বসাধারণ আবহমানকাল। ঝড়-ঝাপটা কাটাইয়া জাপান খিত-বিত হইয়া বসিলে ভারত আনন্দোৎসুক হয়। চীন উত্তরোত্তর বলশালী হওয়াতে এ দেশকে ইউ. এন. এ-র বাহিরে রাখা সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে— ভারতের এ পক্ষপাতিত্বের একমাত্র কারণ এশিয়া ও পৃথিবীর মঙ্গলসাধনের একাগ্রতা।

‘বসুধৈব কুটুম্বকং’ জ্ঞানী ভারতের বক্ষে শেল হানিতে অগ্রসর হইল কে? না, নালন্দা হইতে গতকল্য পর্য্যন্ত পক্ষপুট আচ্ছাদনে যাহাকে অপার স্নেহ করিয়াছে, সেই চীন! মনে জ্ঞানে সে জানে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত নিরস্ত্রীকরণ প্রয়াসী ভারত, যুদ্ধ বা যুদ্ধ আয়োজন সম্বন্ধে একেবারে নির্বিকার। এত বড় অপরাধী, দিনের পর দিন সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছে, পৃথিবীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছে! অসহ।

ত্রেরতা ঘাপরে বাহা ঘটয়াছে, কলিতেও তাহাই ঘটবে। কঙ্কিরূপেই সম্মুখে দেখিবে কোটি কোটি মাতৃ-সন্তানদের। পূর্বাভাস ইহার যে না পাইয়াছ তাহা নহে। ‘মেওয়া’ পাইতে বিলম্ব ঘটবে না।

প্রাচ্যের সহৃদয়তার কারণে কলঙ্কো-নীতি প্রচারের আয়োজন হইয়াছিল। কবিকুলশ্রেষ্ঠ হেমচন্দ্র কয় যুগ মাত্র পূর্বে বলিয়াছিলেন ‘অসত্য’ চীন। সে কান দিবে

শিশুসাহিত্যের দিক্‌পাল উপেন্দ্রকিশোর

ডাঃ তারাশ্রম সরকার

বিগত শতাব্দীর প্রতিভা-উজ্জ্বল বাংলার বুঝিবা
বিশ্বে তুলনা নাই। এই শতাব্দীর সপ্তম দশকটি বিশেষ-
ভাবে বরণীয় মনীষার সমাবেশে অরণীয়। উপেন্দ্রকিশোর
রায়চৌধুরী তাঁহাদেরই অত্যন্তম।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মে ময়মনসিংহ কিশোরগঞ্জের
অন্তর্গত ময়ূয়া গ্রামে উপেন্দ্রকিশোরের জন্ম। প্রকৃতির
লীলানিকেতন এই পল্লীতেই তাঁর শৈশবকাল অতি-
বাহিত হয়। শৈশবেই সঙ্গীতের প্রতি উপেন্দ্রকিশোরের
প্রগাঢ় অমুরাগ দৃষ্ট হয়।

কিশোরমু্যন চারিশত বৎসর পূর্বে উপেন্দ্রকিশোরের
পূর্বপুরুষ রামজন্দের দেব পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জিলার
অন্তর্গত চাকদহ গ্রাম হইতে ভাগ্যান্বেষণে সেরপুরে গমন
করেন। তৎকালে বারভূঞার অত্যন্তম ভূঞা ঈশাখার
অধীনে ইনি মুঘল শক্তির বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করিয়া-
ছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে। রামজন্দেরের সংসাহস
ও স্মৃতাঁম গঠন দেখিয়া যশোদলের জমিদার গুণরাম রায়
তাঁহাকে স্বীয় কন্যা দান করেন। এই রামজন্দেরের
অধস্তন তৃতীয় পুরুষ রাধাকান্ত প্রথমে ময়ূয়ায় বসবাস
আরম্ভ করেন। রামকান্তের দ্বিতীয় পুত্র লোকনাথ।
লোকনাথের একমাত্র পুত্র শ্রীমজন্দেরের দ্বিতীয় পুত্র
কামদারজ্ঞন। পঁচ বৎসর বয়সের সময় ময়মনসিংহের
প্রসিদ্ধ উকীল ও জমিদার হরিকিশোর রায়চৌধুরী
কামদারজ্ঞনকে দত্তকরূপে গ্রহণ করেন। সেই অবধি
কামদারজ্ঞনই উপেন্দ্রকিশোর নামে পরিচিত হন।

অতি অল্প বয়স হইতেই উপেন্দ্রকিশোরের বহুমুখী
প্রতিভার সুরণ হইতে আরম্ভ করে। ময়মনসিংহ জিলা
স্কুলে অধ্যয়নকালে অঙ্কে, বিজ্ঞানে, গানে, চিত্রাঙ্কে সর্ব
বিষয়ে তাঁহার মেধার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সময়
হইতে তাঁহার বাঁশী ও বেহালা বাজাইবার ঝাঁক খুব
দেখা যায়। ময়মনসিংহ জিলা স্কুল হইতে ১৫ টাকা বৃত্তি
পাইয়া প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া উপেন্দ্রকিশোর
প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। পরে মেট্রোপলিটন
কলেজ হইতে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বি. এ. পাশ করেন।

কলিকাতায় অবস্থানকালে উপেন্দ্রকিশোর ঘারিকা-
নাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সংস্পর্শে আসেন। তাঁহারই
প্রেরণায় তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। উপেন্দ্রকিশোর
সেই সময়ে ব্রাহ্ম হওয়ায় তাঁহার পরিবারের মধ্যে যে
অশান্তির সৃষ্টি হয়, তার ফলে তাঁহার লেখাপড়া বেশীদূর
অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় নাই। কিন্তু তাঁহার মহামুত্তম
পালক পিতা তাঁহাকে সম্পত্তিচ্যুত করেন নাই।

উপেন্দ্রকিশোরের বাল্যকাল হইতেই সাহিত্যাস-
্রাণের পরিচয় পাওয়া যায়। বরাবরই তাঁহার মনটি
ছিল শিশুর মত সরল ও আনন্দময়। সেইজন্যই তাহার
সমৃদ্ধ সৃজনশীলতা ও প্রতিভা শিশুদের কল্যাণে নিয়োগ
করিয়াছিলেন।

সতের বৎসর বয়সে শিশুদের জন্ত বিজ্ঞান বিষয়ক
একখানা বই লিখিবার আকাঙ্ক্ষা উপেন্দ্রকিশোরের
মনে জাগিয়াছিল। এই কথা তাঁহার লিখিত দিনলিপি

কলম্বো নীতিতে? কলির ছঃশাসনাদি লইয়া যে সে
ঘর করে!

চীন-ফিন্ কত আসিয়াছে, গিয়াছে। ভারত সেই
যে আসিয়াছে, আছে এখনও, থাকিবেও অনন্তকাল।
হালফিলই তাহার পরিচয় পাইবে আশ্বখাতী ঐ চীন।
রাশিয়ার Winter General চিচিং কঁাক করিয়া
দিয়াছিল জার্মানীর। হিয়াচল আগভাগেই অচল

করিয়া দিয়াছে চীন fire cease করাইয়া। চৈতন্ত
ইহাতেও হইল না। দাদ তুলিবার ফিকির চলিয়াছে
পাক-চীন মৈত্রী বন্ধনে! বড় আশা ছিল ভারতের
একদিন এশিয়ার পতাকা সর্গোরবে উড়াইয়া জগতের
চক্ষে সম্মানার্থ হইবে। তাহার মূলে কুঠারাঘাত
করিল অসত্য বর্বর চীন। কলির দক্ষযজ্ঞের এ সূচনা।
আগামী কাল তা প্রমাণ করবে। জয় ভারত!

হইতে জানিতে পারা যায়। এই সময়েই তিনি প্রগদাচরণ সেন পরিচালিত 'সখা' পত্রিকায় শিশুদের জ্ঞাত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিতেন। সখার নানা প্রসঙ্গ ও ঠাকুরদাদার আসরটি উপেন্দ্রকিশোরই পরিচালনায় সাহায্য করিয়াছিলেন।

শিশু-সাহিত্যের তখন শৈশব অবস্থা। বিদ্যামাগরের আমল হইতে শিশু-সাহিত্যের যে ধারা চলিয়া আসিতেছিল এই সময়ে হঠাৎ তাহার মোড় পরিবর্তন হইল। শিশু-সাহিত্যের ভাষা ও রচনায় শিশুস্বভাব সারল্য ও আনন্দবৈচিত্র্য দেখা দিল। উপেন্দ্রকিশোর, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, বোগীন্দ্রনাথ সরকারের নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উপেন্দ্রকিশোর বহু এবং বিচিত্র অনবদ্য শাস্ত্র শিশু-সাহিত্য রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার ভাষা ও রচনাইলী শিশু-সাহিত্যের এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

উনিশ শতকে উপেন্দ্রকিশোর সখা, সাধী, সখা ও সাধী, মুকুল, ভারত মহিলা প্রভৃতি পত্রিকায় বহু শিশুদের উপযোগী বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিয়া শিশু-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন।

১৮৮৩ সালে ১লা জাহুয়ারী 'সখা' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। উপেন্দ্রকিশোর তখন বি. এ. ক্লাসের ছাত্র। সখার ২য় সংখ্যা হইতে তিনি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার প্রথম রচনা 'মাছি' ১৮৮৩ সালে ফেব্রুয়ারী মাসের সখায় প্রকাশিত হয়। 'ধূমপান', 'মাকড়সা' গিলকয় সাহেবের অভূত সমুদ্রে যাত্রা 'বানর', 'নিয়ম এবং অনিয়ম' 'বাধ্যতা এবং অবাধ্যতা' 'মশা', 'মূলবর্ণ' 'দীপশিখা' প্রভৃতি রচনা সখায় প্রকাশিত হয়।

১৮৯৩ সালে প্রকাশিত সাধী পত্রিকার ৭ম সংখ্যায় 'বেচারাম ও কেনারাম' শীর্ষক উপেন্দ্রকিশোরের রচিত একখানি সচিত্র নাটিকা প্রকাশিত হয়। এই নাটিকার চিত্রগুলিও উপেন্দ্রকিশোরের অঙ্কিত।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে উপেন্দ্রকিশোরের বহু প্রশংসিত জনপ্রিয় বই 'ছেলেদের রামায়ণ' প্রকাশিত হয়। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে 'সেকালের কথা' প্রকাশিত হয়। সেকালের কথার প্রায় প্রবন্ধই মুকুল পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে 'ছেলেদের মহাভারত', 'মহাভারতের গল্প', 'ছোট রামায়ণ' এবং ১৯১০ খৃষ্টাব্দে টুনটুনির বই প্রকাশিত হয়। নানাদিক হইতে টুনটুনির বইখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেই যুগে উপেন্দ্রকিশোর স্বন্দর চলতি ভাষায় কৌতুহলী ভঙ্গীতে এই বইখানি লিখিয়াছিলেন। এই বইখানি বাঙ্গালার শিশু-সাহিত্যে এখনও অনতি-ক্রমণীয় হইয়া আছে বলিলেও অত্যাুক্তি করা হবে না।

উপেন্দ্রকিশোরের মধ্যমা কন্যা পুণ্যলতা চক্রবর্তীর "ছেলেবেলার দিনগুলি" গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, উপেন্দ্রকিশোরের প্রথম ছেলেদের বই "ছেলেদের রামায়ণ" ছাপা হইলে দেখা গেল উড্ এনগ্লেটারদের হাতে পড়িয়া তাঁহার নিজের হাতে আঁকা ছবিগুলির নিতান্ত দুর্বল হইয়াছে। এরই ফলে এই দেশে ভাল ছবি ছাপাইবার জ্ঞাত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি উদ্ভাবনের জ্ঞাত সচেতন হন উপেন্দ্রকিশোর। 'এদেশে ব্রক তৈয়ার করিবার পদ্ধতির যুগান্তর আনিতে তিনি সমর্থ হন। এজন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমও করেন। হাফটোন ব্রক তৈয়ারির প্রবর্তক তাঁকে বলা যায়।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ছোটদের মাসিক পত্রিকা "সন্দেশ" উপেন্দ্রকিশোরের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। গল্পে, প্রবন্ধে, কবিতায় এবং উপেন্দ্রকিশোরের আঁকা একবর্ণ ও বহুবর্ণের ছবিতে পত্রিকাখানি ছিল ঝলমল। দামী কাগজে চমৎকার ছাপা, সরস ও বহু বিচিত্র রচনাসম্ভারে সমৃদ্ধ হইয়া সন্দেশ কিশোরকিশোরীর মন আকর্ষণ করে। 'সন্দেশ' ছোটদের পত্রিকা জগতেও যুগান্তর আনে। সন্দেশের মাধ্যমে একটি পরিবারের যৌথ সাহিত্য সাধনা গড়িয়া উঠিতে দেখা যায়। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবারে "বালক" পত্রিকাকে কেন্দ্র করিয়া অল্পরূপ সাহিত্য সাধনা দানা বাঁধিয়া উঠে। সন্দেশ পত্রিকাকে কেন্দ্র করিয়া উপেন্দ্রকিশোর, কুলদারঞ্জন, প্রমদারঞ্জন, স্কুমার, স্ববিনয়, স্ববিমল, দেবব্রত রায়-চৌধুরী, সুরলতা, পুণ্যলতা, শান্তিলতা, লীলা মজুমদার প্রভৃতির সমাবেশে এক জ্যোতির্মণ্ডল সৃষ্টি হয় ও আলো বিতরণ করে। তৎকালে সন্দেশের পৃষ্ঠায় বাংলার শিশু-সাহিত্যের অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ স্থান লাভ করিয়াছিল।

স্বীয় চেষ্টায় গান বাজনাতেও উপেক্ষাকিশোর বিশেষ দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন। বাঁশী, হারমোনিয়াম, বেহালা, সেতার, পাখোয়াজ প্রভৃতি সবই তিনি ভাল বাজাইতে পারিতেন। বেহালা বাদনে তাঁহার অসাধারণ পরাদর্শিতা ছিল। তাঁহার রচিত অধুনালুপ্ত “হারমোনিয়াম শিক্ষা” ও “বেহালা শিক্ষা” গ্রন্থ দুইখানি তৎকালে বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল।

উপেক্ষাকিশোর বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী হইলেও, শিশু-সাহিত্য ক্ষেত্রের অন্ততম দিকপাল হিসাবে তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। বস্তুতঃ বাংলার শিশু-সাহিত্যের প্রবর্তকদের মধ্যে উপেক্ষাকিশোরের স্থান বিশিষ্ট বলা চলে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ইউ. রায় এণ্ড সন্স প্রতিষ্ঠান হইতে প্রকাশিত প্রত্যেকটি শিশু-সাহিত্যই অমূল্য সম্পদ। আজও এই সব গ্রন্থের উপযোগিতা নিঃশেষ হয় নাই। উপেক্ষাকিশোরের বহু প্রবন্ধ উনিশ শতকের পত্রিকার কবলেই লুপ্ত হইয়া আছে। এই শতবার্ষিকী উপলক্ষে এ সকল প্রবন্ধ সংকলন ও অধুনালুপ্ত গ্রন্থরাজি প্রকাশিত

হইলে শিশুসাহিত্যের অমূল্য সংযোজন হইবে, ইহা নিঃসন্দেহ।

বড়ই পরিচাপের বিষয় উপেক্ষাকিশোরের মৃত্যুর এক দশকের মধ্যেই তাঁহার সারা জীবনের সাধনা ও জাতীয় সম্পদস্বরূপ ইউ. রায় এণ্ড কোম্পানীর হস্তান্তর ঘটে। তিনি তাঁহার তিন পুত্রকেই ইউ. রায় এণ্ড সন্স পরিচালনার উপযোগী শিক্ষা দান করিয়া গিয়াছিলেন। ১৯১৫ সালে ২০শে ডিসেম্বর উপেক্ষাকিশোর দেহত্যাগ করেন। ১৯২৩ সালে উপেক্ষাকিশোরের স্মরণ্য পুত্র সুরেন্দ্রনাথ রায় ৩৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করার পর রায়চৌধুরী পরিবার বহু বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে এবং ইউ. রায় এণ্ড সন্স-এর গৌরব অবলুপ্ত ও ক্রমবিস্তৃতির অতলে তলাইয়া যায়। কিন্তু আবার আলো দেখা যাইতেছে। এই বংশেরই স্মরণ্য বংশধর সত্যজিৎ রায় আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করিয়া লুপ্ত বংশগৌরব আবার উদ্ধার করিবেন, ইহা অনিশ্চিত। বর্তমান সনের ১৪ই মে উপেক্ষাকিশোরের জন্ম-শতবর্ষ পূর্ণ হইল। আশার কথা, বহুকাল বিস্মৃতির পর বাংলার এই কৃতী সন্তানের স্মৃতি আবার অরিত হইতে দেখা যাইতেছে।

দয়াল রে

(গান)

শ্রীনির্মলকুমার সরকার

দয়াল রে, তুমি আর কত কাল
কাঁদাবে আমারে।
এবার ভবলীলা সাজ করে
নাও গো তেমার সংসারে।
কঠিন হেথায় ভুলের মেল
কি যে যাত্রা যায়ার খেলা।
হেথায় পলে পলে মায়ার ছলে
হারাই শুধু তোমারে।

আমার হাত পা বেঁধে চোখ বেঁধে কি
খেলছ কাণা মাছি,—
তুমি আড়াল থেকে দেখছ মজা
আমি, কেমন করে নাচি।
বাজাও তোমার মোহন বাঁশী
সেই সুরে মন হক উদাসী
কবে, তোমার কুঞ্জে নাচব আমি
তোমার বাঁশীর ঝংকারে।

ছন্দ-স্পন্দন

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

(আরবী রসল্ ছন্দানুকরণে)

বিশ্বসংসার চল্ছে ছন্দে,
সৃষ্টি ভরপুর ছন্দস্পন্দে !
সূর্য্য ইন্দু সপ্তসিদ্ধি
ধায় আনন্দে ছন্দোবন্ধে !

ছন্দে পক্ষী ঝাপ্টে পক্ষ,
উঠ্ছে পড়্ছে ছন্দে বক্ষ ;
স্বর-তরঙ্গে, নৃত্যভঙ্গে
ছন্দ সঙ্গে রাখ্ছে সখ্য ।

স্কুল পুত্র ওই ঘুমন্ত,
খাচ্ছে দোলনায় দোল অনন্ত !
হাস্ছে খিলখিল, হয় না গার্মিল,
ছন্দোবস্ত রূপ শ্রীমন্ত !

ঝরছে ঝমঝম বর্ষা-বর্ষণ,
হচ্ছে ছন্দে বজ্রগর্জ্জন,
কাঁপ্ছে অম্বর, বিশ্ব-অস্তর ;
ছন্দে দিক্দেশ কর্ছে নর্তন !

ঝঙ্কা-ঝঙ্কার ছন্দে সোর্-সাড়,
ছন্দে শির তার কুট্ছে বাঁশঝাড় ;
নদ ভয়ঙ্কর হয় শুভঙ্কর,
চল্ছে ছন্দে ; যুদ্ধ সংসার !

বৃক্ষপত্রে ছন্দ স্বন্ স্বন্,
ছন্দোনির্ভর ছুট্ছে পল্টন,
হাস্ত ক্রন্দন লাস্ত বন্দন
খাস্ প্রাশাসে ছন্দস্পন্দন !

জড় জীবন্তে ছন্দ হিলোল,
ঝর্ণা-উৎসে ছন্দকল্লোল,
ছন্দে মঞ্জুল ছল্ছে ফল ফুল,
ছন্দে সাত্‌রায় হংস খেত্‌কোল !

ছন্দে উদ্ভব, ছন্দে লয় সব,
ছন্দোময় প্রাণ বিশ্বে দুর্লভ !
ছন্দে যৌবন আজ্‌কে উন্নয়ন,
স্বপ্ন হয় মোর ছন্দে বাস্তব !

ছন্দোময় বাক্ উঠ্ছে দিনরাত,
চিন্তাপীপড়ি খুললো দৈবাৎ !
ছন্দে নন্দি' নিত্য বন্দি ;
চট্‌কা সব শেষ ! দাও মা সাক্ষাৎ !

কংসেতাজ্ঞ শুভ্র • নির্মল !
বস্, মা বিদ্যাবর্ণা উজ্জ্বল !
বাঙ্কা পূর্ণ কর্ মা তুর্ণ !
লুক্ চিত্ত হচ্ছে চঞ্চল !

কবি নজরুল : জন্মদিনে

শ্রীক্ষিতীশ দাশগুপ্ত

হে কবি ! হে মহাপ্রাণ,
আজি জন্মের দিনে শান্তির বাণী
উড়াক জয় নিশান ।
কাব্যে ও গানে যা পেয়েছি তব কাছে
চিরদিন যেন অমলিন হয়ে আছে,
আমাদের মাঝে তোমার আশীষ
গেয়ে যাক্ জয়গান ।

যা পেয়েছি মোরা তুলনা নাহি যে তার
কি দিব তোমায় মিছে পূজা উপহার ।
শুধু মিনতি জানাই দেবতার পায়ে
এই শুভদিন দাওগো ফিরিয়ে,
জীবনে মরণে তোমরা অমর
যুগে যুগে অন্নান ।

কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ : জন্মদিনে

[বিগত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ প্রবর্তক-এর সাহুরাগী স্বহৃদ সরল-প্রাণ প্রবীণ হান্দ্‌স্‌ কবি শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের ৭৪ বৎসর বয়সে পদার্পণ উপলক্ষে তাঁরই সমসাময়িক আঙ্গিকার স্বনামধন্য শ্রীকালিদাস রায়, শ্রীনরেন্দ্র দেব ও শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত কবিত্বের কাব্যে প্রেমার্ধ্য এখানে সাদরে প্রকাশিত হইল এবং তাঁরই সঙ্গে প্রবর্তকের প্রীতিভরা শুভাকাঙ্ক্ষীও অর্পিত হইল। প্রঃ নঃ]

যৌবনের মধুময় দিনগুলি আজি বন্ধু অরি !
কত না উদ্যমে আর কত আশা করি
যাত্রা করি দৌড়ে এক পথে
দীক্ষিত হইয়া চিরসারস্বত ত্রিতে ।

তুমি ছিলে ব্রহ্মপুত্র হতে কিছু দূরে,
প্রবাসী ছিলাম বন্ধু পরপারে আমি রঙ্গপুরে ।
থাকিলে উডার পাখা—দূর বেশী নয় ।

এই নগরেই শেষে হ'ল পরিচয় ।
তারো মৈত্রী স্বত্বপাত হলো সেই হতে ।

তারপর ভেসে এসে ঘটনার স্রোতে
সেই মহানগরেই মিলেছি হু'জনে,
শাস্ত্র দেহে অস্তিম জীবনে ।

দূরে দূরে ছিহ্ন মোরা দেখা হ'ত কখনো দৈবাৎ
সাহিত্যের পথে কিন্তু প্রতিদিনই হইত সাক্ষাৎ ।

দৌড়ে এবে জরাজীর্ণ দ্বিক্ত জীবন ।
এসো করি হুইজনে যৌবনের স্মৃতি রোমন্থন ।
বহু সাধ মিটে নাই, প্রত্যাশার হয়নি পূরণ,
তবু ব্যর্থ হয় নাই মোদের যৌবন ।

দেশকাল অহুকুল, স্বচ্ছ ছিল ভাষা,
দেশের না পাই যশ, দেশের পেয়েছি ভালোবাসা ।

বেশী কিছু করি নাই লোভ
তাই নেই ক্ষোভ ।

সংসার-জীবন-পথ নহে বন্ধু কুস্থমে আত্মত,
হুস্তর দুর্গম তাহা বহু কণ্টকিত ।
হাসিমুখে সগৌরবে তাহাও করিলে অতিক্রম ।
লভিয়াছ বিজয়ীর উল্লাস পরম ।
বন্ধু তব ব্যর্থ নয় জীবনের অক্লান্ত সাধনা ।

সাধনাষ পরম সাধুনা,—
নিমগ্ন হওনি তুমি জনতার প্রবাহের তলে,
ক'জনের ভাগ্যে তাহা ঘটে বিধাবুদ্ধি ধনবলে ?
আজি জন্মদিনে তব করি এ প্রত্যাশা
তব স্রষ্টি মিটাইবে সন্ধানীর রমের পিপাসা ।

শ্রীকালিদাস রায়

জন্ম তব কবে বন্ধু, নাহি ছিল জানা ;
কেবল এসেছে কানে ছন্দের ঠিকানা ।
অনেক দিনের পরে পেয়ে স্নলগন,
দর্শনে আলাপে প্রেমে হয়েছি মগন ।
অটুট আজিও সেই প্রীতির শিকল,
যদিও উভয়ে তাই বার্ক্যে বিকল,
তবু তা' পারেনি ছুঁতে আমাদের মন,
সেখায় প্রসন্ন আজও শাস্ত যৌবন ।

কাব্যের লহরে তব অবগাহি প্রিয়,
লভেছি আনন্দ কত নহে বর্ণনীয় ;
রূপে রসে ছন্দে গানে ভরিয়ান প্রাণ ;
বাণীর মন্দিরে তব অজস্র সে দান—
চলগান কলস্রোতে-থাকুক অক্ষয় ;
শুভ জন্মদিনে বন্ধু, গাহি তব জয় ।

শ্রীনরেন্দ্র দেব

তোমায় আমাষ দেখা সে যে বহুদিন ।
কৈশোরে, যৌবনে, প্রৌঢ়ে, বার্ক্যে বিলীন ।

তোমার সে যৌবনের উচ্ছাসতরঙ্গ,
আজিকে হয়েছে বন্ধু, গতি রঙ্গভঙ্গ ॥

তুমি কবি পাণিনিয়াছ, কবিতার মালা,
সৌরভে বিভোর প্রাণ, সেকি যায বলা ।

কবিতার মালঞ্চে, প্রফুল্ল মঞ্জরী ;
নানারূপে নানা ছন্দে দিক আলো করি ।

দিশে দিশে করিতেছ নাম, যশ, খ্যাতি,
অশ্রান্ত লেখনী তব হৃদয়তরা গীতি ।

নিত্য রচিতোছ কবি কবিতার মালা,
সকলের কণ্ঠে জাগে নিয়ত উজলা ।

তব নব জন্মদিনে আজ চুয়াস্তরে,
মঙ্গল আশীষ মাগে বিধাতার বরে ।

হয় যেন শতবর্ষ পুরতি তোমার,
পুত্র-কন্যা, পৌত্র-পৌত্রী প্রণমে তোমায় ।

বাণীর পরম তত্ত্ব স্বদেশসেবক,
হৃদয়ে জ্বলিছে তব জলন্ত পাবক ।

আজি বিধাতার পায়ে মাগি এই বর ।
তোমায় কবিতা গানে করুক অমর ।

তোমার জীবন্ত মূর্তি বরে দেবতায় ।
হউক তাই সুখে-স্বাস্থ্যে-শান্তিতে ভরা

তোমার জীবন,

উজ্জ্বল স্নন্দর নিত্য ফুলের মতন ।
দেবতার শুভাশীষ লও শিরে তুলি,

আমার এ আশীর্বাদ প্রেমের অঞ্জলি ॥

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

পত্রে পথ-নির্দেশ

[প্রবর্তক সম্পাদক শ্রীরাধারমণ চৌধুরীকে লিখিত পরমহংস পরিব্রাজকচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী সমাধিপ্রকাশ আরণ্যঙ্গী মহারাজের পত্র। প্রবর্তক সঙ্ঘে শ্রীগুরুমন্দির নির্মাণকল্পে প্রস্তাবিত আবেদনপত্র সম্পর্কে লিখিত পত্রের পত্রোত্তর ইহা। ব্যক্তিগত হইলেও, এই সমাধিসিদ্ধ অক্লান্ত মহাকর্ম্মীর চিন্তা ও প্রাণের আকৃতি প্রসঙ্গতঃ যতটুকু প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতেই ভারতাস্থার মর্ম্মবেদনা ও চাওয়ার খানিকটা আভাস মিলিবে। —প্রঃ সঃ]

স্নেহের ভাই রাধারমণ,

আমার প্রাণভরা স্নেহভরা নারায়ণ জানিবে ও সকলকে জানাবে। তোমার একখানা অন্তর্দেহীয় খাম সহ আবেদন পত্র ও ২২/৩/৬৩ তাং পত্র পেয়ে খুবই আনন্দিত হয়েছি। অত্যধিক কাজের চাপে নানা স্থানে থাকায় পত্রের উত্তর দিতে দেরী হ'ল বলে মনে যেন দুঃখ না পাও। আজ একাদশী; সকালে খাওয়ার হাদ্যমা নাই। পত্রের মাঝে কৃষ্ণনগর হ'তে তাই অবসর পেয়ে এই পত্র লিখবার অবসর পাচ্ছি। সোমবার এদিকের দীক্ষাদি দিয়ে মঙ্গলবার বা বুধবার কলিকাতায় যাবো। যেয়ে তোমাদের ৬১, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীটে দেখাশুনাদি করবার খুবই ইচ্ছা রইল।

তুমি তোমাদের 'প্রবর্তক' আমাদের ভাবধারার প্রচার ও সমর্থন করে যে সব লেখা বের করো তা খুবই আমাদেরিগকে বল দেয়। আমার অনেক সাহিত্যিক রচনা প্রকাশ করেও তুমি ভারতের সনাতন আদর্শের সঙ্গে আমাদের ভাবধারার প্রচার করে আমাদেরিগকে অনেক সহায়তা করেছো। তোমার মহাপ্রাণতা, দিব্যতম আদর্শ এবং প্রবর্তক সঙ্ঘের ঐকান্তিক সেবায় আশ্চর্যসর্গ ভারতের সর্বাদীন শ্রীবুদ্ধি ও মঙ্গল রচনা করুক এবং জগতেরও মহা কল্যাণ সাধন করুক যথার্থ ধর্ম্মের পাদপীঠে। ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের মারাত্মক ভ্রম ও প্রসঙ্গ তোমরা দেখাইতেছ। সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, কল্যাণ তন্ত্র, শ্রমিক তন্ত্র একদেশ দর্শনে ভ্রান্ত, সনাতন দর্শনে অন্ধ। কাহার সমাজ, কাহার 'গণ', কাহার 'কল্যাণ'—এ চিন্তা সেক্ষেপ কেহ করে না। বাঘ, ভালুক, সিংহের রক্তলোলুপ হিংস্র পশুপ্রকৃতির মানবসমাজ, জনগণ বা কল্যাণ সমষ্টি স্বয়ং রাষ্ট্রের, সমাজের, গোষ্ঠির বা পরিবারের এবং সমগ্র পৃথিবীর যথার্থ কল্যাণসাধন করতে পারে নাই এবং পারবেও না। শুধু মানবের সমাজ, মানবের গণ, বা মানবের কল্যাণ বললেও

একদেশদর্শনে ভ্রান্তি ও প্রমাদ ছাড়া আর কিছু হবে না।

ভারতীয় সনাতন দর্শন বলছেন—মামুষ ছাড়া আরও বহু জীব, জন্তু, কীট, পতঙ্গ, তরু, গুল্ম, লতা প্রভৃতি অসংখ্য জীবন এই পৃথিবীতে থেকে নানাতাবে সকলের জীবনযাত্রার সহায়তা করছে তাদের অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক হিংস্রপ্রবৃত্তির উদ্দাম গতি সত্ত্বেও। বিশ্বের সমস্ত প্রতিটি জীবে যে চৈতন্য বর্তমান তাহা সকল কাজের নিয়ামক প্রভু, কর্তা তা বর্তমান যুগের বিজ্ঞানের সহায়তায় পুনরায় স্থপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই চৈতন্যই আত্মা, ব্রহ্ম, পুরুষ—সনাতন ভারতের সনাতন ধর্ম্মের মর্ম্ম বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই ব্রহ্মতন্ত্র বা আত্মতন্ত্র, Brahmacracy বা autocracy দিয়েই সমস্ত রাষ্ট্র, সমাজ, গোষ্ঠী, পরিবার, ব্যক্তির সমস্ত সমস্তা বৃদ্ধিতে হবে এবং সেই ভিত্তিতেই সমস্ত জাগতিক সমস্তার সমাধান করতে হবে। এইরূপ যথার্থ বার্ম্মিক রাষ্ট্রই জগতের যথার্থ কল্যাণ-সাধক হবে। ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ধর্ম্মহীন ভোগবাদ বা দেহবাদ দিয়ে তা হবে না এবং হ'চ্ছেও না। 'Auto' মানে যে 'self' সে 'self'-এ আমাদের সনাতন ধর্ম্ম দর্শনের মনোবৈজ্ঞানিক ব্রহ্মকল্পনা ও ব্রহ্মভূতি। 'Autocracy' মানে অহংতান্ত্রিক, মদগর্ব বা যথেষ্টাচার নহে। কাজেই autocracy শব্দের চেয়ে আমাদের coin করা Brahmacracy'র Connotation ও denotation আরও সমৃদ্ধ ও সনাতন। এই ব্রহ্মতন্ত্র বা Brahmacracyর 'Kratos' বা strength বা শক্তি দিয়েই বর্তমান পৃথিবীর এবং সমগ্র বিশ্বের সর্ব পরিকল্পনা পরিচালিত ও জীবন-সাধনায় স্থপ্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই জগতের মহা মঙ্গল সাধিত হবে। তোমাদের প্রবর্তক সঙ্ঘের ও ভারতের সনাতন আদর্শের এই psycho synthesis বা মনের সমন্বয়ই নবযুগের নবীকৃত সাধনা। তেদবুদ্ধিতে কেবল-মাত্র psycho analysis বা মনের বিশ্লেষণ। যদি এই

আয়ুর্বেদে নেত্ররোগ

নেত্রাচার্য্য শ্রীযুগোপাল গোস্বামী

[বক্ষ্যমান নিবন্ধেব লেখক বহু অভিজ্ঞ গবেষক—বিশেষ নেত্ররোগের ক্ষেত্রে । দিল্লীর আয়ুর্বেদিক রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ও কলিকাতার অষ্টম আয়ুর্বেদ কলেজের প্রাক্তন সার্জন-অধ্যাপক হিসাবে শ্রীগোস্বামী নেত্ররোগ-ক্ষেত্রে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়া সুনাম অর্জন করিয়াছেন । বর্তমানে তিনি বৈদ্যশাস্ত্র-পীঠের শালাক্য বিভাগের অধ্যাপক ও চিকিৎসক এবং স্বতন্ত্রভাবে গবেষণারত । আয়ুর্বেদে অস্ত্রোপচারের প্রবর্তন করার কৃতিত্ব দেখাইয়াও শ্রীগোস্বামী আয়ুর্বেদের নূতন দিক উন্মুক্ত করিয়াছেন । —প্রঃ সঃ]

আয়ুর্বেদ বেদেরই অংশ । বেদ যেমন সনাতন এবং অজ্ঞাত, আয়ুর্বেদ অর্থাৎ আমাদের ভারতীয় চিকিৎসা-বিদ্যাও তেমনই সনাতন ও অজ্ঞাত ।

আয়ুর্বেদশাস্ত্র অতি বিশাল ও জটিল । ইহা মূলতঃ আটটি ভাগে বিভক্ত । কিন্তু বর্তমানে কার্য্যতঃ একটিমাত্র অঙ্গ অর্থাৎ কায়চিকিৎসাকেই অবলম্বন করিয়া আয়ুর্বেদ কোনওরূপে বাঁচিয়া আছে । অঙ্গপ্রত্যঙ্গহীন হইলে মানুষ যেমন অপূর্ণ থাকিয়া যায় সেইরূপ বর্তমানে আয়ুর্বেদ অঙ্গাদিহীন হইয়া সম্পূর্ণই থাকিয়া যাইতেছে ।

সুতরাং আয়ুর্বেদকে জগতের সমক্ষে উপযুক্ত সম্মানের সহিত দাঁড় করাইতে হইলে উহার শল্য-শালাক্য প্রভৃতি আটটি অঙ্গেরই বাহাতে দ্রুত উন্নতি হয় তৎপ্রতি প্রত্যেক আয়ুর্বেদসেবী ও আয়ুর্বেদহিতৈষীর যত্নবান্ কায়মনোবাক্যে হইতে হইবে ।

Psychosynthesis বা মনের সমন্বয় সাধনের দিকে সমস্ত শিক্ষা, জীবনযাত্রা ও কর্ম্মধারা প্রচলিত না হয় তবে ইতিহাসের আসবে “মহতী বিনষ্টি”, যেমন আসছে প্রাচ্য অভ্যন্তরীণ সমস্ত রাষ্ট্রে এবং মানবসমাজে ।

সম্বৎসর শ্রীমতিলাল মহোদয়ের নেতৃত্বে প্রবর্তক সম্বৎসর ব্রহ্মভট্টের দিব্যালোকে যে কর্ম্মপন্থার সন্ধান দিচ্ছেন তার উপর আরো সাধনপন্থার সন্ধান ও জীবন ধারণ করিয়া বিপুল বিশাল উত্তম বেগ থাকলে ভারতের এবং জগতের কল্যাণ হবে । তাই মর্ম্মর স্মৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠা ও নির্মাণে এই ব্রহ্মস্মৃতির, ব্রহ্মসংস্কৃতির স্বজনী ও পালনীশক্তিই প্রতিষ্ঠিত হ'ক—এটা সনাতন ধর্ম্মের সাধক ও সন্ন্যাসী হিসাবে আমার অন্তরতম আকুতি । আমার শক্তি ও সামর্থ্য সজ্জের সহায়তা করতে

আজকাল সাধারণের মধ্যে অনেককেই বলিতে শুনা যায় যে, আয়ুর্বেদে চক্ষুর্কর্ণাদির তেমন কিছু চিকিৎসা নাই । আয়ুর্বেদে চক্ষুর্কর্ণাদির চিকিৎসা উহার নিজস্ব ধারায় হইলেও, ইহাতে বহু ক্ষেত্রেই রক্তমোক্ষণ ও শস্ত্র-কর্ম্মাদি প্রয়োগপূর্বক চিকিৎসা করার নির্দেশ থাকায় এবং রাজাহুকুল্য না থাকায় কবিরাজগণ শস্ত্রকর্ম্মাদি প্রয়োগপূর্বক শল্য-শালাক্য প্রভৃতি শ্রমসাধ্য ও অধিক দায়িত্বমূলক বিষয়ের চিকিৎসা স্বরিতে ক্রমে ক্রমে নারাজ হন এবং অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য কায়-চিকিৎসার দিকেই ঝুঁকিয়া পড়েন । এইরূপে চক্ষুর্কর্ণাদির চিকিৎসা ক্রমে অনালোচিত ও পরিত্যক্ত হওয়ায় এবং বর্তমানে ঐসব চিকিৎসার সম্যক প্রচলন না থাকাতেই লোকের মনে এইরূপ ধারণা হইয়াছে । ত্রিশ বৎসরারিককাল ধরিয়া বহুসংখ্য রোগীর চিকিৎসা ও সবিশেষ অমুসন্ধান করিয়া

সর্বদাই উন্মুখ । ব্রহ্মবিভার প্রয়োগ রাষ্ট্রে, সমাজে, পরিবারে, গোষ্ঠীতে এবং ব্যক্তিক জীবনে বর্তমান পৃথিবীর অন্ততঃ তিনশত কোটি মানবজীবনে কবে তোমাদের সজ্জবস্তুর স্মৃতিমন্দিরের মাধ্যমে রূপায়ণ হবে, সেই আশায় উন্মুখ হ'য়ে আমি রইলাম ।

আমার রচিত ‘সমাধি গ্রন্থাবলী’ সমস্তই পুনরায় প্রকাশিত হ'লে তোমাদিগকে তো দিবই এবং অল্প ভাবেও যদি তোমাদের এই মহৎ কাজে সহায়তা করতে পারি তবে তা করবারও আশা আঁকাজ্জা রইল ।

পুনঃ প্রাপ্তরা স্নেহভরা নারাষণ । ওম্ ।

‘সমাধিমঠ’ ; পোঃ ভূপালপুর ; আঃ—সমাধি ।

ডাঃ রায়গঞ্জ ; পশ্চিম দিনাজপুর ।

১৪, বৈশাখ, ১৮৮৫ ; ৪।৫।৬৩ ।

দেখা গিয়াছে যে, আয়ুর্বেদে অশ্রান্ত বিষয়ের ভ্রায় চক্ষু-কর্ণাদি বিষয়েও উত্তম চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।

আজকাল নেত্ররোগীর সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধির দিকেই দেখা যাইতেছে। নেত্র রোগের অনেক কারণ থাকিলেও বর্তমানে নানা প্রকার স্বাস্থ্যহীনতা এবং আলোচক পিত্তের পরিপোষক ও পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবই নেত্ররোগসমূহের এত দ্রুত বৃদ্ধির প্রধানতম কারণ বলা যায়। সিনেমা হলের এবং বহু দোকানে ব্যবহৃত বিভিন্ন রংয়ের অত্যুজ্জ্বল আলোকসমূহও নেত্রবোগ বৃদ্ধির অগ্রতম আসল কারণ।

দৃষ্টিশক্তি যাহাতে সুস্থ ও সবল থাকে তৎপ্রতি সকলেরই যত্ন লওয়া অবশ্য কর্তব্য। কারণ—

চক্ষু রক্ষায়াঃ সর্বকালং মনুষ্যৈ-

যত্ন কর্তব্যোজীবিতে যাবদিচ্ছা।

বার্থা লোকোহয়ং তুল্য রাত্রিন্দিবানাং

পুংসামন্ধানাং বিদ্যামানেহপি বিস্তে ॥

অর্থাৎ মনুষ্যের যাবজ্জীবন সকল কালেই চক্ষু রক্ষা বিষয়ে যত্ন করা কর্তব্য। অন্ধদিগের রাত্রি ও দিন উভয়ই সমান এবং প্রচুর অর্থ থাকিলেও তাহাদিগের পক্ষে ইহলোক বার্থ।

সকলের দৃষ্টিশক্তি যাহাতে ভাল থাকে তজ্জন্ত সুদীর্ঘ-কালের অভিজ্ঞতানুসারে, বহু পরীক্ষিত ও বিশেষ ফলপ্রদ নিয়মাদির মধ্যে সহজসাধ্য কয়েকটি বিশেষ নিয়মাদির বিষয় এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে। এই নিয়মগুলি যথাযথ পালন করিলে নেত্র সুস্থ ও সবল থাকিবে এবং সহসা কোন নেত্ররোগ হইতে পারিবে না।

(১) প্রত্যহ প্রভাতে শয্যা হইতে উঠিয়া সর্বাপ্রাণে মুখের ভিতর যতটা জল ধরে, ততটা জল ধারণ করিয়া অল্প জল দ্বারা চক্ষুদ্বয়ে ১৫/২০ বার ঝাপটা দিয়া চক্ষু ধুইয়া ফেলিবে।

(২) প্রত্যহ আহারান্তে আচমনের সময়ে অন্ততঃ ৮/৯ বার চক্ষুতে শীতল জলের ঝাপটা দিবে।

(৩) যতবার জল পান করিবে ও মুখ ধুইবে ততবার চক্ষু ও কপাল ধুইয়া ফেলিবে।

(৪) পূর্বোক্ত প্রকার চক্ষু ও কপাল ধুইবার পর সেই তেজা-হাত দিয়া দুইটি কান ও কানের উপর দিয়া

ঐবাদের পৰ্য্যন্ত মুছিয়া ফেলিবে। ইহাতে অধিকতর ফল লাভ হইয়া থাকে।

(৫) পাদদ্বয় হইতে মস্তক পর্য্যন্ত স্থল শিরাদ্বয় ও স্বল্প শিরাসমূহ ব্যাপ্ত থাকাতে, পাদদ্বয় ধুলি কর্দমাদিতে অপরিষ্কার থাকিলে এবং অগ্নি প্রভৃতির অনাবশ্যক উত্তাপ লাগিলে নেত্র রোগ হইয়া থাকে। এ কারণ পাদদ্বয় প্রক্ষালণ করিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিলে এবং যথাবশ্যক পাণ্ডুকা ব্যবহারে সহসা নেত্ররোগ হইতে পারে না।

(৬) প্রত্যহ স্নানকালীন তৈল মর্দনের সময়ে অগ্রে দুই পায়ের বুজাঙ্গুলীর নখ তৈল দ্বারা পূর্ণ করিয়া পরে সর্বদেহে তৈল মাখিলে সহসা নেত্র রোগ হইতে পারে না।

(৭) প্রত্যহ রাত্রে শয়নকালে পরিতৃপ্ত পায়ের তৈল মর্দন করিলে চক্ষু সুস্থ ও সবল থাকে এবং সুনিদ্রা হয়।

(৮) প্রত্যহ ২/১ বার তৈলের নম্র গ্রহণ করিলে চক্ষু স্নিগ্ধ ও সতেজ থাকে এবং দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

(৯) ২/১ দিন পর পর পুনর্নবার রসে নাগার্জুন বাটী ঘসিয়া নেত্রে প্রয়োগ করিলে সহসা নেত্র রোগ হয় না এবং দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায়, বহু ক্ষেত্রে চশমার দোষও কাটিয়া যায়।

(১০) সপ্তাহে ২/১ দিন বিশুদ্ধ মধু বা ঐ মধুর বা পদ্ম মধুর সহিত ভীমসেনী কপূর চূর্ণ (১ রতি) মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলে নেত্রের দূষিত জল শোষিত হয় ও দৃষ্টিশক্তি ভাল থাকে।

বহু পরীক্ষিত ও বিশেষ ফলপ্রদ কতকগুলি নিয়মের মধ্যে এখানে মাত্র সহজসাধ্য কয়েকটি নিয়মের কথা বলা হইল। নিয়মগুলি যথাযথ পালন করিলে সকলেই দৃষ্টিশক্তি ভাল রাখিতে সক্ষম হইবেন।

সুদীর্ঘকাল চক্ষু কর্ণাদির চিকিৎসা করিয়া প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিয়াছি যে, যেমন শারীরিক ব্যায়াম দ্বারা শরীর সুস্থ ও সবল থাকে সেইরূপ নেত্রকেও সুস্থ, সবল ও কার্যক্ষম রাখিবার এবং সহজে নেত্ররোগ আরোগ্যের নিমিত্ত নেত্রাদিরও কয়েক প্রকার বিশেষ ধরনের ব্যায়াম অত্যাৱশ্যক। স্থানাভাবে উহাদের বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব হইল না। সুযোগ ও সুবিধা পাইলে পরে আলোচনা করার ইচ্ছা রহিল।

ভক্তযোগী রসিকবিহারী

আচার্য্য শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

[অসাধারণ যোগী ও ভক্ত রসিকবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণতঃ ভেদে পরিচিত নহেন। তিনি নিজে কখনও প্রচার করেন নাই, একান্তে নীরবে সাধাবণ জীবন বাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁর তাঁর ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ সম্পর্কে আসিয়াছেন তাঁরাই এই সিদ্ধ মহাজীবনের পবিত্র পাইবার দৌলভাগ্য লাভ করিয়াছেন। বিক্রমপুর পশ্চিমপাড়া গ্রামে ১২৭৩ বঙ্গাব্দে ১২ই অগ্রহায়ণ তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং তিরোধান হয় বালিকাতার টালার বাসভবনে ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ ২২শে কার্তিক। ২০ বৎসর বয়স হইতে জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি কলিকাতাতেই স্থায়ীভাবে থাকিতেন। স্কুলে মাষ্টারী করিতেন। লোকে তাঁহাকে মাষ্টারমহাশয় বলিয়াই জানিত। যোগিবাদ গভীরনাথের গৃহী শিষ্যপুত্রের মধ্যে তিনি বয়সেও প্রবীণ ছিলেন, সাধনা ও সিদ্ধিতেও অন্তঃসাধারণ ছিলেন। মুহূর্ত্ত ভাবসম্বাদির কথা জানা যায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনীতে, কিন্তু রসিকবিহারীর জীবনে তাহা বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, এমন অনেকে আশ্রয় জীবিত এবং বক্ষ্যমান প্রবন্ধে লেখক তাঁদের অস্মৃত্য। কোন ব্রহ্মা বা লীলাপ্রসঙ্গ বা ভক্তন কীর্তনাদি শুনি-জই তিনি সমাধিতে ডুবিয়া যাইতেন, আসনে উপাসনার বা ধ্যানে বসিলে ত কথাই নাই। ভগবত ব্যাখ্যান ও ভক্তন কীর্তন শুনিতে তাঁর মগ্ন ছিল, কিন্তু শোনা প্রায়ই তাঁর হইত না, উপক্রমেই সমাধি, অনেক সময় পাঠ কীর্তন সমাপ্ত হইলেও তাঁর সমাধি ভাঙিত না। সাধু মহাত্মাদের কাছে বসিলেও চিত্ত সমাহিত হইয়া যাইত। মহাপুরুষ ভোলানন্দ গিরি মহারাজ “টালার কবি” বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিতেন। তিনি প্রথম জীবনে মুখ্যতঃ শ্রীকৃষ্ণভক্ত ছিলেন। পরে মাতৃভাবের সাধনার সিদ্ধিলাভ করেন। যোগিরাজ গভীরানন্দজীর নিকট দীক্ষা লাভের পরে তিনি অবৈত জ্ঞানে ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করেন। সকল মত ও সকল পথের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। শেষ কয়েক বৎসর তিনি বিশেষ আগ্রহীণী ধর্ম্মপিপাসুদ্বিগে মত্তদীক্ষা প্রদান করিয়া মুক্তির পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। সাংসারিক জীবন তাঁহার দারিদ্র্যের নিষ্পেষের স্তির বিয়াই চলিয়াছে। অশচি সর্বাধার্য্য তিনি ছিলেন সর্বাসন্নময় পুরুষ। তাঁহাকে দীর্ঘকাল শিল্পকের বৃত্তি কবিত্তে হইয়াছে। সাধারণতঃ সাধকদের চিত্তকে ধীর স্থির একাগ্র সমাহিত কবাই মহা সমস্তা। কিন্তু তাঁহার পক্ষে কষ্টজীবনের প্রয়োজনে চিত্তকে যে কতকটা বহিমুখ ও চঞ্চল রাখা আবশ্যক হইত, ইহাই মহানমস্তা ছিল। ভক্তজ্ঞ তাঁহাকে অনেক কৌশল করিতে হইত। ভক্তযোগী রসিকবিহারীর জীবন তথ্যবহুল নহে। তাঁর সাধনজীবন ও সিদ্ধিলাভের নিগূঢ়তা উপরিচয় মানদের নিকট সহজে প্রতিকলিত হইবারও চিন না। বক্ষ্যমান রচনার এই স্থগভীর মহাজীবনের অন্তরঙ্গ সাধন ও সিদ্ধি বর্ণিত পরিচয় ও দিগ্‌দর্শন দিয়াছেন যোগীরাজ গভীরানন্দজীবন ও ব্যাখ্যা উত্তরাধিকারী মনীষী বার্ষনিক ও সিদ্ধাচার্য্য শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্বিজাশু পাঠক পাঠিকা ইহাতে সাধনায় আশ্রয় ও তত্ত্বজ্ঞানসার দীপিকা পাইবেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।—প্রঃ স:]

রসিকবিহারী অসামান্য অধ্যাত্মসম্পদ লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। “অমানিত্বম্ অদম্বিত্বম্ অহিংসা ক্ষান্তিঃ আর্জ্জবম্”—তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। বাল্যকাল হইতেই তিনি ছিলেন,—“অদ্বৈতা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।” সত্য ছিল তাঁহার জীবন-ব্রত। জীবনের সকল ব্যবহারকে সত্যময় করিবার নিমিত্ত প্রথম হইতেই ছিল তাঁহার আশ্রয় চেষ্টা এবং তদুদ্দেশ্যে তিনি সর্বপ্রকার ক্লেশ ও ত্যাগ বরণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। “নিত্যং চ সমচিন্ত্যম্ ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু”—স্বভাবের প্রেরণাতেই তিনি তাঁহার ব্যবহারিক জীবনের আদর্শ করিয়া লইয়াছিলেন। “দেব-দ্বিজ-গুরু-প্রাজ্ঞ পূজনম্”, “অনুদ্বৈগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয় হিতং চ যৎ”, “দয়া ভূতেষু অলৌকিকং মার্দবং হ্রীঃ অচাপনম্”,—এসব নীতি তাঁহাকে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক হয় নাই, এ সকল যেন তাঁর স্বভাবেরই

অঙ্গীভূত ছিল। জন্মাবধি তাঁহার পার্থিব দেহটিও যেমন সুন্দর ছিল, তাঁহার মানস দেহটিও তেমনি সুন্দর ছিল; তাঁহার আকৃতিও যেমন কমলীয় ও সর্বজনপ্রিয় ছিল, তাঁহার প্রকৃতিও তেমনি আবালবৃদ্ধবনিতার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা এবং প্রশংসা আকর্ষণ করিত। সকলেরই ধারণা হইত, ছেলেটি বাচিলে একটা ‘মামুষ’ হইবে। তাঁহার জন্মকুণ্ডলী বিচার করিয়া একাধিক জ্যোতিষী বলিয়াছিলেন, এই বালক কালক্রমে হয় ‘রাজা’ হইবে কিংবা ‘রাজার চেয়েও বড় ভাগ্যবান একজন ‘সিদ্ধ মহাপুরুষ’ হইবে। সুস্মদর্শীরা দেখিতেন যে, এই বালক ভাবীজীবনে যে ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইবে, তাহার তুলনায় রাজা মহারাজার ঐশ্বর্য্য নিতান্তই তুচ্ছ। প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী রসিকবিহারীর ৪৫ বৎসরের সময় জীড়ারত বহু বালকের মধ্য হইতে তাঁহাকে

ডাকিয়া নিয়া আলাপ করিয়াছিলেন এবং কালে তিনি একজন অসাধারণ মহাপুরুষ হইবেন বলিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন।

জীবন বিকাশের প্রারম্ভ হইতেই ভাগবৎপ্রসঙ্গ তাঁহাকে আকর্ষণ করিত; যাত্রা, কীর্তন, কথকতা প্রভৃতিতে তর্গবানের বিচিত্র লীলাকথা শুনিতে শুনিতে ও লীলাতিনয় দেখিতে দেখিতে তিনি তন্ময় ও আত্মহারা হইয়া যাইতেন। বালকের এই অবস্থা দেখিয়া বয়োবৃদ্ধেরা বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইতেন। এই বালক যে অত্যন্ত সব বালক হইতে পৃথক্ শ্রেণীর, তাহা তাঁহার হাবভাবে চাল-চলনে, চরিত্র ও আচরণে নানাক্রমেই প্রকাশ পাইত। সকলের মধ্যে থাকিলেও, সকলের সহিত স্বাভাবিক ভাবে খেলাধুলা করিলেও, তাঁহার অন্তরাত্মা যে কোন অসাধারণ আদর্শের অহুপ্রাপনা অল্পভব করিতেছে, তাঁহার অন্তর্হৃদয় যে কোন স্নহের বানী শুনিয়া সব ছাড়িয়া সেদিকে ধাবিত হইতে চাহিতেছে, ইহার পরিচয় তাঁহার বাল্য-জীবনে প্রায়ই পাওয়া যাইত।

তাঁহার বাল্য ও কৈশোরের অসাধারণ আধ্যাত্মিক ভাবপ্রবণতা দেখিয়া অনেকেরই ধারণা হইত যে, পূর্ব-জন্মেই তিনি সাধনার উন্নত স্তরে আরোহণ করিয়াছিলেন, হয়ত বা সিদ্ধির দ্বারদেশ পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ পূর্বসিদ্ধিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই তাঁহার দেহত্যাগ হইয়াছিল বলিয়া তাঁহাকে পুনরায় দেহধারণ করিতে হইয়াছে, এবং পূর্বজন্মের সংস্কার তাঁহাকে বল-পূর্বক মোক্ষের দিকে আকর্ষণ করিতেছে। গীতার ষাঁহাদের বলা হইয়াছে ‘যোগব্রত’ মহাপুরুষ অথবা ভাগবত ষাঁহাদের ‘আরুচ্যুত’ আখ্যাপ্রদান করিয়াছে, তিনি যে সেই শ্রেণীর একজন মহাযোগী মহাভক্ত ছিলেন, তাহার পরিচয় তাঁহার জীবনানুষ্ঠ হইতেই পদে পদে পাওয়া যাইত। কি কারণে চ্যুতি ঘটিয়াছিল, কে বলিবে?

তাঁহার নিজের উক্তি হইতেই প্রকাশ পাইয়াছে যে, তাঁহার ৫৬ বৎসর বয়স কালেই তিনি মুরলীধর শ্রামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভ করেন এবং তখন হইতেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার অসাধারণ অহুরাগ হয়। তিনি তদবধি প্রেমের সহিত শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করিতেন এবং

চিন্তা করিলেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইতেন বলিয়া তাঁহার অহুতব হইত। ইহা তাঁহার জন্মান্তরীণ সংস্কারই বলিতে হইবে। যাত্রা, কীর্তন, কথকতা প্রভৃতি শ্রবণকালেও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করিতেন। সম্ভবতঃ পূর্বজন্মে বহুকাল তিনি কৃষ্ণোপাসক ছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের ভাবে ভাবিত ছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি অপরাপর দেবদেবীরও অলৌকিক দর্শন পাইতেন। এই হেতু কোন দেবদেবীকেই তিনি অশ্রদ্ধা করিতে পারিতেন না। কলিকাতায় ব্রাহ্মসমাজে ব্রহ্মোপাসনায় যোগদান করিয়া এবং ব্রাহ্ম আচার্য্যদের প্রবচন শুনিয়া তাঁহার চিন্তে বিকারের ভাব জাগ্রত হয় এবং মঙ্গল ব্রহ্মকেই তিনি পরম তত্ত্ব ও পরম আরাধ্য বলিয়া চিন্তা করিতে অভ্যস্ত হন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে বা অত্যন্ত দেবদেবীকে তিনি মিথ্যা ভাবিতে পারিতেন না, মূর্ত্তি পূজাকে তিনি অগ্রাহ্য ভাবিতে পারিতেন না। তাঁহার বিচারে প্রতিভাত হইত যে, এক নিরাকারই সব আকারে আত্মপ্রকাশ করেন, সব দেবদেবী রূপে এক ব্রহ্মেরই প্রকাশ, সব রূপের মধ্যে এক অরূপেরই খেলা; ব্রহ্মোপাসনায় নিষ্ঠাবান্ হওয়ার জন্তে ব্রহ্মের বিচিত্র প্রকাশের প্রতি,—দেবদেবীর প্রতি,—শ্রীকৃষ্ণ, রাম প্রভৃতি—অবতারগণের প্রতি,—অশ্রদ্ধা পোষণ করার কোন কারণ নাই। বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রভৃতিতে তাঁহার যে ভাব হইত, যে আনন্দ হইত, যে ভক্তিপ্রেমের উৎসেক হইত, তাহার মূল্য ত তিনি কোনক্রমেই অস্বীকার করিতে পারিতেন না। তাঁহার নিজের বিচার ও অহুভূতির সহিত ব্রহ্মবাদী সম্ভ্রান্ত আচার্য্যগণের উপদেশের সামঞ্জস্য করিয়া, তিনি যেমন ব্রহ্মোপাসনায় যোগ দিতেন তেমনি নিয়মিত গঙ্গাস্নানও করিতেন, কীর্তনাদিতেও যাইতেন, দেবমূর্ত্তির সম্মুখেও প্রণত হইতেন, তুলসীভজার মাটিও খাইতেন, শ্রীকৃষ্ণখ্যানাদিও করিতেন। এইভাবে তাঁহার তত্ত্ববিচার ও ভক্তিপ্রবণতা দুইই উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। তাঁহার জন্মান্তরীণ সংস্কারই নানা-প্রকার প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও তাঁহাকে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে টানিয়া লইয়া চলিতে লাগিল।

অতঃপর তাঁহার ভক্তিপ্রবণ হৃদয় মা-কালীর দিকে

বেশী কুঁকিয়া পড়িতে লাগিল। তাঁহার কৃষ্ণভক্তি শিখিল হইল না; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যেন ক্রমশঃ তাঁহাকে মায়ের কোলে তুলিয়া দিতে লাগিলেন। মাতৃভাবের চিন্তায় তাঁহার হৃদয় যেন বেশী বিগলিত হয়। রামপ্রসাদ ও কমলা-কান্তের গানে তিনি বেশী রস পান, অনেক সময় ভাবে বিভোর হইয়া যান। তিনি মায়ের কোলের শিশু, এই ভাবনাতে তিনি সহজে তুলিয়া যান। সবকিছু মা'ই করিতেছেন, এ সংসার মায়ের খেলা, তাঁহার যখন যাহা আবশ্যক, মা'ই তার ব্যবস্থা করিতেছেন, তাঁহার দারিদ্র্যের নিষ্পেষণও তাঁহারই কল্যাণের জন্তে স্নেহমयी মায়েরই বিধান, আপাত-কঠোর দারিদ্র্য ও পারিবারিক জটিলতার মধ্যে মা'ই তাঁহাকে স্থায়ী মাধুর্য্যসিক্ত রসের অমৃত পান করাইয়া এবং তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে স্নেহকোমল হস্ত বুলাইয়া তাঁহাকে আদরে লালন পালন করিতেছেন, —এই প্রকার ভাবনা ও অমুভূতিতে তিনি সব দুঃখ কষ্ট তুলিয়া যাইতেন এবং তাঁহার চিত্ত অমৃতময় হইয়া যাইত। জাগতিক সব ব্যাপারে তিনি মায়ের খেলা অমুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার যখন এই ভাবধারা চলিতেছে, তখনই শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত প্রথম প্রকাশিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনন্তস্বাধারণ জীবন ও অমৃতমयी বাণীর প্রচার তখন কেবলমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া মাতৃময়প্রাণ রসিকবিহারী মুগ্ধ হইলেন, ইহার মধ্যে তিনি যেন আপনার প্রাণের কথাগুলি স্পষ্টভাবে পাইলেন। তিনি দিনরাত্রি কঠোর জীবন সংগ্রামের মধ্যে অবিরাম মায়েরই চিন্তা করেন, মায়ের স্নেহশীতল স্পর্শ অমুভব করেন, এবং তাতেই তাঁর সব গ্লানি ও অবসাদ দূর হইয়া যায়, তিনি সর্ব্বাবস্থায় নির্বিকার থাকিতে সমর্থ হন।

তাঁহার বহির্জীবনে চলিতেছে নিদারুণ জীবিকা-সমস্যা এবং অন্তর্জীবনে তিনি আত্মদান করিতেছেন বিশ্বজননীর মধুময় স্নেহস্পর্শ; এই সময়েই তাঁহার সাধন-জীবনের এবং মাহাত্ম্যপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়। তাঁহার নিদ্রাবস্থায় বহু মহাপুরুষ তাঁহার ক্ষুদ্র কুটারখানিতে আবির্ভূত হন, তাঁহাকে নিদ্রা হইতে জাগাইয়া তোলেন, তাঁহার পূর্ব্বজন্মের তপস্তার স্মৃতি উদ্বুদ্ধ করিয়া দেন,

আত্মবিস্মৃতির জন্তে মৃদু ভৎসনা করেন, ভবিষ্যতের জন্তে সাবধান হইতে উপদেশ দেন, এবং প্রাণায়াম সহ একান্তর প্রণব মন্ত্রে দীক্ষা দান করেন। এই অভূতপূর্ব্ব ঘটনা হইতে তিনি যেন নবজীবন লাভ করেন এবং সবেগে তাঁহার সাধনা অগ্রসর হইতে থাকে। কিছুকাল তিনি সাংসারিক কর্ম্মের অযোগ্য হইয়া ভাববিহীন অবস্থাতে নিয়ত আত্মস্মরণী প্রাণায়াম সহ প্রণবমন্ত্র সাধনই নিরত থাকেন। বাহিরে তাঁহার সংসার আকাশবস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া অতি কষ্টে চলিতে লাগিল, ভিতরে তিনি মায়ের কৃপায় অপরিসীম আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। অনেকে তাঁহাকে মৃগী-রোগগ্রস্ত মনে করিতে লাগিল; ঋষাদের কিছু অধ্যাদৃষ্টি ছিল, তাঁহারা তাঁহার এই মৃগী-রোগের মধ্যে যোগের অতি উচ্চ অবস্থা দেখিয়া ভক্তিশ্রদ্ধায় আগ্রহ হইলেন। স্বাভাবিক অবস্থায় কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনিও ইহা তাঁহার মৃগী-রোগ বলিয়াই প্রায়শঃ আত্মগোপন করিতে চেষ্টা করিতেন; পক্ষান্তরে তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে ও আত্মীয়-স্বজনকে কোনরূপ চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিতে নিষেধ করিতেন। ধীরে ধীরে এই ভাবের উচ্ছ্বাস ও সাধনার তীব্রতা তাঁহার আয়ত্তের মধ্যে আসিতে লাগিল। কয়েক বৎসর পরে ১৯১০ সাল হইতে আবার তিনি স্বাভাবিক ভাবে কাজকর্ম্ম করিতে সমর্থ হন এবং তখন হইতে পুনরায় স্কুলের শিক্ষকতা ও গৃহশিক্ষকতা করিতে থাকেন।

এই সময়ে মাঝে মাঝে এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটত, যাহা তাঁহার অলৌকিক শক্তি বা যোগবিভূতি বলিয়া গণ্য হইতে পারে, অথচ তাঁহার কখন কোন বিভূতির প্রতি আকাঙ্ক্ষা বা আসক্তি ছিল না। এইসব ঘটনার কথা তিনি পরবর্ত্তীকালে কথাপ্রসঙ্গে কখন কখন উল্লেখ করিতেন।

তিনি ব্রাহ্মমূর্ত্ত্তে উঠিয়া গঙ্গাস্নানে যাইতেন। গঙ্গা-মৃত্তিকা গায়ে লেপন করিয়া গঙ্গাজল মস্তকে সিঞ্জন করিয়া এবং মা-গঙ্গাকে ভক্তিপূত হৃদয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া, তারপর তিনি অবগাহন করিতেন। প্রথমেই পা-দিয়া গঙ্গাজল তিনি কখন স্পর্শ করিতেন না। ইহা তাঁহার চিরন্তন অভ্যাগ ছিল। এই সময়ে গঙ্গাস্নানে যাতায়াতের



শ্রী শ্রী গুরুগুর দাবলী



স্নেহের মধুসূদন,

প্রবর্তক সঙ্ঘ ২৫. ৬. ৫৪.

তোমার ৯৬ তারিখের পত্র পাইলাম। তুমি আমার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে চাও জানাইয়াছ। আমার বিশ্বাস তুমি একবার দীক্ষিত হইয়াছ, সেই বীজের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইও, মুক্তি আসিবে। তুমি লিখিয়াছ জীবন তোমার একমুখী হইতেছে না—তাহার জন্ত আমি তোমাকেই দায়ী করি। যদিও গুরুশক্তি ভিন্ন কিছুই কাজ হয় না, তবুও আমি প্রত্যয় করি গুরুর সহপদেশ পালন করিলে, মন্ড্রে নির্ভা রাখিলে সব হইবে। আমার আশীর্বাদ তোমায় চিরজয়ী করুক। তোমার আত্মা মুক্তিতে করিয়া ব্রহ্মানন্দে বিলীন হউক। আশা করি ভাল আছ, আমার আশীর্বাদ নিও। ইতি—

স্নেহের মধু,

প্রবর্তক সঙ্ঘ

বিজয়ার প্রণাম গ্রহণ করিলাম। বাড়ী হইতে কলিকাতা আসিয়াছ শুক্রবার রাত্রে তাহা অবগত

হইলাম। আজ মণীনের হাতে ৫ টাকা পাইলাম। আসিবার ইচ্ছা—অনায়াসেই আসিতে পার। পারুল ও সৌবীরকে সঙ্গে আনিবে লিখিয়াছ, ভালই। আমার আশীর্বাদ নিও। ইতি—

স্নেহের মধুসূদন,

চন্দননগর ২৬. ৫. ৫৫.

তোমার পত্র পেলাম। দিব্যরাত্রি যে সংবাদ রাখ, তাহা আমার ক্রতিগোচর হয়। নীচের তলায় প্রেস আছে। সেটি সরিয়ে নেবার যুক্তি কি বুঝি না। প্রেসটিকে যদি পার রক্ষা করিও। রমণ প্রবর্তক সাধন-চক্রের অমুঠানে যাহাতে যোগদান করিতে পারে—তাহারও ব্যবস্থা করো। চিন্তা আকুল করে, কিন্তু ইহাতে বিচলিত হওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। আগামী শনিবার বৈকালে আমার নিকট উপস্থিত হইবে বলিয়া যে বাণী পাঠাইয়াছ, তাহা শুনিয়া খুবই খুসী হইলাম। আশীর্বাদ করি যত শীঘ্র পার এই দায় হইতে উদ্ধার পাব। ইতি—

সময় প্রায়ই তিনি অমৃতব করিতেন, মা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছেন এবং তাঁহাকে সকল আপদ বিপদ হইতে রক্ষা করিতেছেন। কোন কোনদিন তিনি শুক বস্ত্র ভীরে রাখিয়া স্নানে নামিয়াছেন, তন্ময় হইয়া গন্ধার স্তব ও প্রণামাদি করিতেছেন, অল্প অল্প বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে; তিনি ভীরে উঠিয়া দেখেন, মা একটি তরুণীর বেশে তাঁহার কাপড় হাতে করিয়া তাঁহার জুতে প্রতীক্ষা করিতেছেন। অবাক হইয়া হাত হইতে কাপড় নেওয়া মাত্রই মা অস্তহিতা হইলেন! আর তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। মা এইরূপ নানা মুষ্টিতে আত্মপ্রকট করিয়া তাঁহার অনেক কাজ করিয়া দিতেন এবং অনেক কাজে তাঁহাকে সাহায্য করিতেন। বলা বাহুল্য, এত রূপা সম্ভেও মা তাঁহার দারিদ্র্যের লাঘব করিতেন না, জীবনসংগ্রাম হইতে তাঁহাকে অব্যাহতি দিতেন না।

তাঁহার জীর্ণ গৃহের একটি জীর্ণ ছাদ ছিল। চলিবার

সময় বোধ হইত ছাদটি ছলিতেছে। আগন্তুকদের ইহার উপর দিয়া চলিতে ভয়ই হইত। অথচ প্রবল ভূমিকম্পের সময়ও ছাদটি বা এই জীর্ণ বাড়ীর কোন অংশ ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। গৃহে স্থানান্তর হেতু এই ছাদেরই এক কোণে বসিয়া তিনি ভজন ধ্যান গীতাপাঠাদি করিতেন। সেখানে একটি তুলসী গাছ ছিল, গরমে শুকাইয়া যাইত। একদিন শুক তুলসী তরুর নিকট বসিয়া ধ্যান করার সময় তাঁহার মনে হইল,—তুলসী কাননের মাহাত্ম্য সব শাস্ত্রে আছে, একটি তুলসীকানন পাইলে তাহার মধ্যে বসিয়া তিনি সাধন করিতেন। পরদিন দেখা গেল, শুক তরু সজীবিত হইয়া উঠিয়াছে; এবং কয়েকদিনের মধ্যেই তাহা হইতে ছাদের উপর মঞ্জরী পড়িয়া সেখানে এই পুরাতন ছাদের উপরই একটি তুলসী কাননের সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি যতদিন এই বাড়ীতে ছিলেন, এই তুলসী কাননও সেখানে ছিল। (ক্রমশঃ)

স্নেহের মধু,

চন্দননগর : ১৭. ৭. ৫৫

কিছুদিন হইল একখানা পত্র দিয়েছি সেই পত্রে
তাগিদ ছিল—যে জন্তু তুমি চটিয়া গিয়াছ। মনে রাখিও—
আমি এরূপ পত্র দিতে থাকিব, অন্ত্যস্ত সংবাদ পরে দিব।

আমার টাকার তাগিদে তুমি দুঃখিত হইও না।
আমার আশীর্বাদ নিও, ইতি—

প্রবর্তক সঙ্ঘ : চন্দননগর ;

২. ৭. ৫৫

অশেষ প্রীতিভাজনেমু,

তোমাদের নিকট আমার এই শেষ দাবী। আমি
১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই পণ করিয়াছি,
যাহারা আমার পরিচিত বন্ধু তাঁহাদের কাছেই হাত
পাতিব—অস্ত্রের কাছে নহে।

তোমাদের দুই চারি টাকা যাহা সাধো কুল্যায় তাহাই
আমায় দিয়া বাধিত করিবে। যত শীঘ্র পার অর্থ
পাঠাইলে কৃতার্থ হইব।

ভগবানের নিকট প্রের্য : কামনা করি। ভগবান
সুখী করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা। ইতি—

স্নেহের মধুসুন্দন,

চন্দননগর : ১৯. ৭. ৫৫

তোমার পত্র পড়িয়া বুঝিলাম “সদৃশ সঙ্গ” পড়িয়াছ।
ইহা খুব ভাল কথা। ভূত গুরুমূর্তি ধারণ করিতে
কোনদিন পারে না—স্বয়ং ভগবানই গুরু মূর্তি ধারণ
করিতে পারেন। গোপস্বামীগণ সাধনবিষয়ক যাহা
উপদেশ দিয়াছেন তাহা তাঁদের শিষ্যদের জন্তই, এ কথা
অস্ত্রের স্তনিতে নাই। তবে খালে প্রাণে মন্ত্রজপ
কি প্রকার হয়, তাহা আমার জানা আছে। ইহা
আমি তোমায় বলিতে পারি। গুরুবস্তুটা স্থির হইলে
সাধনপথে অগ্রসর হইতে পারিবে।

গুরু ব্রহ্মচর্য সাধন দিলে তবে সিদ্ধ হয়। গুরুর
প্রতি একনিষ্ঠ বিশ্বাসই সাধনায় বিশ্বাস আনে জানিবে।
কামারহাটি আশ্রমে (প্রবর্তক জুট মিলস্-এ) একদিন
বলিয়াছিলাম observe celebrity সত্যকথা, কারণ

ব্রহ্মচর্য রক্ষা করা দরকার। মুখে এক, মনে অন্য জিনিষ
থাকিলে এ ব্রত রক্ষা হয় না। ব্রহ্মচর্য ব্রত রক্ষা করিতে
হইলে নিশ্চয়ই তোমার মন-মুখ এক করিতে হইবে।
ইহা না হইলে আনন্দময় ব্রহ্মে বিচরণ সম্ভব নয়।

কিছুদিন পূর্বে জগদীশ সেন যাহা বলিয়াছেন, তাহা
সত্য, কিন্তু তিনি তোমার গুরু নহেন। মনকে দেহের
কোন একটা স্থানে নিবিষ্ট করিয়া রাখার উপদেশ শুনিতে
পার, কিন্তু জপ করিতে হইলে গুরুর আদেশ অলঙ্ঘ্য।
কালীঘাটে গিয়াছ, এ সকলই ভাল কথা।

শীঘ্রই আসিবার ইচ্ছা করিয়াছ। গুরুর উপর নির্ভর
যদি থাকে, তোমার সাধনা সিদ্ধ হইবে। তোমার প্রণাম
পাইলাম। আমি ভাল আছি। ইতি—

প্রবর্তক সঙ্ঘ : চন্দননগর ;

২৯. ৭. ৫৫

স্নেহের মধুসুন্দন,

তুমি আমায় ছাড়িবে না দেখিতেছি। জয় গুরু জয়
গুরু বলিয়া আমায় স্মরণ কর বুঝিলাম। প্রকাশভাবে
তুমি গৃহীত হও নাই—যদিও আমার গোপন মন্ত্র তোমার
কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে, তত্রাচ বলিব প্রকাশ্য ক্ষেত্রে
আমার সহিত তুমি যুক্ত হও। আমি বুঝিতেছি আমিই
তোমার গুরু—অন্ত নহে। ব্রহ্মচর্যব্রত পালিত না হইলে
ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করা অসম্ভব হয়। মনে মনে ইহা
পালনীয় বটে ; কিন্তু এতে খুবই বাধা আছে। তোমার
জীর সঙ্গে কথা কহিয়া বুঝিব তিনি ইহার জন্ত প্রস্তুত
আছেন কিনা। চাতুর্মাস্ত্রের মধ্যে ব্রহ্মচর্যব্রত পালন
করিও, ইহাতে তোমার শুভই হইবে। তোমার সহিত
একবার দেখা করার ইচ্ছা আছে। এই বিষয়ে অনেক কথা
আছে। ডিসেম্বর মাসের মধ্যে যেদিন হোক আসিও
কথা হইবে। কথা কহিবার প্রয়োজন আছে।

আশীর্বাদ নিও এবং যোগ্যজনদের দিও। ইতি—

পত্রগুলি প্রবর্তক সঙ্ঘের সহযোগী সভ্য ও সঙ্ঘগুরু শ্রিয় দীক্ষিত
সন্তান শ্রীমধুসুন্দন ভট্টাচার্যকে প্রাকদীক্ষাকালে লিখিত। পত্রোদ্ধৃতি
'রমণ' প্রবর্তক-সম্পাদক শ্রীরাধারমণ চৌধুরী।

স্বপ্নে জন্ম

- বাঙ্গালী জীবনে স্বামী বিবেকানন্দ
- রাণী স্বামী বাহিনীর কথা
- যাত্রা-অপেরার নাট্যরঙ্গ
- জাতীয় নাট্য আন্দোলন
- রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ চিন্তা

লেখক ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম. বি. বি. এস.
আয়ুর্বেদাচার্য, পোঃ সাধনা ঔষধালয় রোড, কোলকাতা-
৪৮ হতে আলোক তট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত।

আলোচ্য পুস্তিকাগুলি লেখক ডাঃ ঘোষ সর্বজনপরিচিত আয়ুর্বেদপ্রতিষ্ঠান সাধনা ঔষধালয়ের অধ্যক্ষ। বাংলার অগ্নিযুগের স্বদেশসাধনার ভাঙ্গনের হিড়িকের মধ্যে সংগঠনে উৎসাহ মন্ত্রিময়ের অল্পতম অগ্রণী সাধনা ঔষধালয়। তাই সাধনা ঔষধালয় শুধুমাত্র ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান নয়, ইহার মূলে স্বাধীনতার প্রেরণাও বিদ্যমান। ডাঃ ঘোষ এই উত্তরাধিকার বহন করিয়া যে চলিয়াছেন তার স্বাক্ষর তাঁর লিখিত পুস্তিকাগুলির মধ্যে মিলে। বিভিন্ন উপলক্ষে প্রদত্ত ডাঃ ঘোষের বক্তৃতাগুলি আলোচ্য পুস্তিকাগুলিতে সংকলিত।

“বাঙ্গালী জীবনে স্বামী বিবেকানন্দ” পুস্তিকায় স্বামী বিবেকানন্দের অগ্নিগর্ভ উদ্ভিসমূহ গভীর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। “দুর্বলতাই পাপ, দুর্বলতাই মৃত্যু” স্বামীজীর এই দীপ্ত বোধা প্রথমই উদ্ধৃত করে বইটি শুরু হয়েছে। তারপর আরো কয়েকটি সারগর্ভ উদ্ধৃতি দিয়ে বাঙ্গালীর জীবনে স্বামীজীর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করে তাঁকে নবীন বাংলার প্রভা, প্রবর্তক ও স্বদেশপ্রেমের বিরাট ঐতিহ্যের অধিকারী বাঙ্গালী জাতির গৌরবময় ইতিহাসের অগ্রপথিক হিসাবে স্বীকার করা হয়েছে।

নেতাজী কিশোর বরসেই শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই শক্তি-মন্ত্রই পরবর্তীকালে জীবনাধর্মে রূপান্তরিত হয়। তিনি ভারতীয় নারীর মধ্যেও এই শক্তির বিকাশ দেখতে পান। এই শক্তিময়ী রূপের বাস্তব প্রয়োগ হয় আজাদ হিন্দ ফৌজের রাণী স্বামী বাহিনীর মধ্যে। এই পুস্তিকায় রাণী স্বামী বাহিনীর উদ্বোধনের সময় নেতাজীর বক্তৃতাটি উদ্ধৃত করে ভারতীয় নারীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

বাংলার গণজীবনে যাত্রা অপেরার যে একটি বিশেষ স্থান রয়েছে তা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। বাস্তবিক পক্ষে অতীতে যাত্রা অপেরা শুধুমাত্র আনন্দ রসই বিতরণ করেনি, সেই আনন্দের সঙ্গে লোক-শিক্ষার তরু দাখিতও পালন করেছে। কিন্তু ইংরাজ আমলে যাত্রা অপেরার প্রভাব দ্বান হতে থাকে এবং ধীরে ধীরে জাতীয় জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। “যাত্রা অপেরার নাট্যরঙ্গ” পুস্তিকায় যাত্রা অপেরাকে জাতীয় জীবনের মানসিক আত্মবিকাশের অবলম্বন বলে স্বীকৃত।

ইতিহাসের পটভূমিকায় নাট্য আন্দোলনের সার্থকতার কথাই তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে জাতীয় নাট্য আন্দোলন পুস্তিকায়। বিশেষ করে জাতীয় চাপরণে বাংলার নাট্যমঞ্চের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, অভিনয়ের মাধ্যমে স্বাধীনতা গান ও দেশপ্রেমের নূতন রাগিণী জনচিন্তকে আকর্ষিত করে। জাতীয় সংস্কৃতি, জাতীয় অতীত গৌরব, জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষাসম্বিত নাটকের ভাববস্তু অভিনয়ের দ্বারা প্রাণবন্ত হয়ে উঠে বলেই জীবন্ত আদর্শ হিসাবে এর সার্থকতা।

“রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ চিন্তা” পুস্তিকায় একটি সত্য কথাকে স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে কবি-শুভ্রর অবদানকে আজকাল আর বিশেষভাবে আলোচনা করা হচ্ছে না। বাস্তবিকপক্ষে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের প্রেরণার মানস-উৎস রবীন্দ্রনাথকে দেশবাসী যেন ভুলেই বসে আছে। লেখক এই ভুল-যাওয়ার সত্যটি বলিষ্ঠভাবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি কবির স্বদেশ-প্রেমের কথা মোটামুটিভাবে আলোচনা করেছেন। জাতিগঠনে এই ধরনের আলোচনা যে খুবই মূল্যবান তা স্বীকার না করে উপায় নেই।

শ্রীস্ববোধ চক্রবর্তী

হাওড়া গাল'স কলেজ পত্রিকা (১৩৬২-৬৩) —
অধ্যাপক শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত।
প্রকাশক—অধ্যক্ষ বিজয়কৃষ্ণ তট্টাচার্য। ৫১৩ মহাত্মা
গান্ধী রোড, হাওড়া।

কলেজ পত্রিকার সঙ্গে অন্ত্য পত্রিকার একটি মৌলিক তুলনা
আছে। কলেজ পত্রিকা মূলতঃ কলেজের ছাত্রছাত্রীদেরই রচনাসমূহের
পরিপুষ্ট। পরিণত সাহিত্যকর্ম এখানে অনুপস্থিত—এ শুধু সম্ভাবনাকে
প্রকাশ করে।

আলোচ্য পত্রিকাটিও কয়েকটি সম্ভাবনাময় তরুণ প্রাণকে আত্ম-
প্রকাশের সুযোগ দিয়েছে। অধিকাংশ রচনাই ছলিখিত। আলোক-
চিত্রের বিভাগটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিভিন্নরসী রচনার সমাবেশ
ঘটেছে পত্রিকাটিতে। প্রচ্ছদটি মনোরম। সম্পাদক তাঁর কর্তব্য নিষ্ঠার
সঙ্গেই পালন করেছেন।

লক্ষ্মী মজুমদার



“କରୋନାଭୂଷଣ ଓହ୍ଲାଇ”

A black and white portrait of a man with a beard and mustache, wearing a light-colored shirt. The image is grainy and has a high-contrast, almost halftone appearance. The man is looking directly at the camera with a neutral expression. The background is dark and indistinct.

টেনিসের সবচেয়ে বড় প্রতিযোগিতা উইম্বল্ডন আগতপ্রায়। আজ কয়েক বৎসর থেকে দেখতে পাচ্ছি যে, এই খেলায় জয়ী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিজয়ী খেলোয়াড় পেশাদারী খেলোয়াড়দের দলে যোগদান করছে। এতে অপেশাদারী খেলোয়াড়দের মান খুব একটা উঠে থাকছে না। দীর্ঘকালের জুস্ত এবং Tilden, Cochet (কোসে) Borotra, Perry, Austin-এর মত দীর্ঘকাল ধরে কারও প্রাধান্য থাকছে না। কাজেই প্রায় প্রতি বৎসর নূতন নূতন খেলোয়াড় এই অপেশাদারী উইম্বল্ডন প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করছে। গত বৎসরের বিজয়ী অষ্ট্রেলিয়ার Emerson এ বৎসরও আছে, কিন্তু তার পূর্বের বৎসরের Rod Laver নেই। আমাদের প্রধান ঔৎসুক্য ও আশা এই খেলার রামানাদান কৃষ্ণাপকে

নিম্নে। এশিয়ার অপ্রতিদ্বন্দ্বী এই খেলোয়াড় এই গৌরবের অধিকারী এখনও হতে পারে নি। কিন্তু দেশের ভিতরে এবং বাইরে তার কয়েক বৎসরের খেলা দেখে আমাদের মনের কোণে এখনও আশা আছে যে, হয়ত এই গৌরবের অধিকারী সে এবার হতে পারবে। এক বৎসর বিশ্বের চতুর্থ টেনিস খেলোয়াড়ের সম্মানও অর্জন করেছে কৃষ্ণাণ, কিন্তু এখনও পারেনি উইম্বলডন-এ জিততে। এ বৎসর এই প্রতিযোগিতার প্রথম আটজনের ভিতরও স্থান হয়নি। গত বৎসর প্রতিযোগিতার মধ্যেই আহত হয়ে যাওয়ায় তার প্রতিদ্বন্দ্বী অষ্ট্রেলিয়ার Mulligan ফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছেছিলো অপ্রত্যাশিত-ভাবে। Mulligan শেষ খেলায় অংশ গ্রহণ করবে, এ কথা কেউ আশাই করে নি। এ বৎসর কৃষ্ণাণ আমাদের নিরাশ করবে না এ আশা করি। এই প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ দুই খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছে অষ্ট্রেলিয়ার Emerson এবং স্পেন-এর Mnnel Santana। গোড়ার কয়েকটি খেল জিতলে সেমি ফাইনালে কৃষ্ণাণকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে Emerson-এর সঙ্গে। এই প্রতিযোগিতায় আরও আছে জয়দীপ মুখার্জি, প্রেমজিৎলান ও নরেশকুমার। ডবলস খেলায় প্রেমজিৎ, ও জয়দীপ-এর জুটি খেলবে।

হকি খেলায় ১৯২৮ সাল থেকে অজিত ভারতের প্রাধান্য আর নেই। গত ১৯৬০ সালের রোম অলিম্পিক্‌স্-এ পাকিস্তান এই সম্মানের অধিকারী হয়েছে। ব্রত সম্মান উদ্ধারের জন্ত আমাদের মনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তারপর ১৯৬২ সালেও জাকর্তায় অস্বস্তিত এশিয়ান গেম্‌সে আবার পরাজিত হয়েছে আমাদের ভারতীয় দল পাকিস্তানের কাছে। সকল ক্রীড়ামোদীর মনে একই প্রশ্ন—এত খেলোয়াড়ের সমাবেশ যে দেশে সে দেশ কেন এই পরাজয়ের গ্লানি স্বীকার করেছে। দল গঠন ও নির্বাচন ব্যাপারে সকলে সন্তুষ্ট নয়। সকলের কথা ছেড়ে দিলেও একজনের কথা এ বিষয়ে খুবই সুস্পষ্ট। ইনি হলেন অতীতের প্রখ্যাত হকি খেলোয়াড় ধীমানচাঁদ। তিনি সম্প্রতি এই মত প্রকাশ করেছেন যে, খেলোয়াড় নির্বাচন মোটেই সন্তোষ-

জনকভাবে হয় না এবং নির্বাচিত খেলোয়াড়দের উপযুক্ত প্রণয় অনুশীলন করানো হয় না। কাজেই প্রচুর পরিমাণ অর্থব্যয় হওয়া সত্ত্বেও কোনও সুফলই লাভ হয়নি ১৯৫৮ সাল থেকে। এ কথাও তিনি জোর করে এবং স্বতঃ-প্রণোদিত হবে বলেছেন যে, তিনি এই নির্বাচনের তার নিতে চান এবং সুনিশ্চিতভাবে এর দায়িত্বও নিতে পিছপাও নন। হকির যাদুকার ধীমানচাঁদের নিকট থেকে এই challenge-ও এসেছে যে, তাঁর হাতে এই নির্বাচনের কাজ ছেড়ে দিলে তিনি ভারতের হকির হত গৌরব নিশ্চয়ভাবে পুনরুদ্ধার করবেন। তিনি আরও বলেছেন, পাকিস্তানের দল আমাদের দল অপেক্ষা সর্ব বিভাগে উন্নত নয় এবং তাদের রক্ষণভাগ আমাদের রক্ষণভাগ অপেক্ষা দুর্বল, কিন্তু তাদের দলগত সংহতি আমাদের অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ এবং এই দলগত সংহতির অভাবই আমাদের প্রধান দৌর্বল্য। আমাদের প্রশ্ন, কেন আমরা ধীমানচাঁদ প্রমুখ প্রখ্যাত খেলোয়াড়দের হাতে এই ভার অর্পণ করতে পারবো না। টোকিও অলিম্পিক্‌স্ আগতগ্রায। ভারতীয় হকি ফেডারেশন কিছু কিছু প্রস্তুতির তোড়জোড়ও আরম্ভ করেছে। তার মধ্যে আছে ফ্রান্সের Lyons সহরের ইন্টারন্যাশনাল হকি প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ (সেপ্টেম্বর মাসে), পূর্ব আফ্রিকার কেনিয়া কলোনি সফর (অক্টোবর মাসে) দেশে ফিরিবার পথে এবং পরে ইংলণ্ড ও জাপানের হকি দলের ভারতে আমন্ত্রিত হওয়ার কথা। বিদেশী দলের সঙ্গে খেলায় জ্ঞান সঞ্চয় হয় যথার্থই, কিন্তু এটাও সর্ববাদী-সম্মত যে, পাকিস্তান ও ভারতবর্ষ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ হকিদল এবং ইংল্যান্ড ও অস্ট্রাল দলের কাছে হকি খেলার ‘টেকনিক্’ সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষালভ করার বিশেষ কিছুই নেই। আমাদের এর চেয়েও প্রয়োজন যোগ্য খেলোয়াড় নির্বাচন এবং ধীমানচাঁদ, বাবু প্রমুখ বিখ্যাত খেলোয়াড়দের তত্ত্বাবধানে তাদের অনুশীলন করানো এবং এই ব্যাপারে অল্প কারও হস্তক্ষেপ না করা।

ফুটবল বাদ দিয়ে আর দুটি বড় খবর: ভারতীয় তলিবল দলের রাশিয়া সফর জুলাই মাসে এবং ডিসেম্বর মাসে Bargol-এ প্রথম Asian Amateur Boxing

Association-এর প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দলের অংশগ্রহণ। আমরা জানি সোভিয়েট রাশিয়ার ভলিবল দল পৃথিবীর সেরা দল। কয়েক বৎসর পূর্বে এদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আমাদের ভারতীয় দল সুনামও অর্জন করেছিল। আমাদের আশা আছে, এই রাশিয়া সফরের সফল আমরা পাবো যদি প্রকৃত শিক্ষার্থীভাবে আমরা রাশিয়ায় যাই। দল নির্বাচনের কাজ শেষ হয়েছে এবং ১৫ জন খেলোয়াড় এখন পাতিয়ালায় National Institute of sports-এ অস্থলীন করছে। মুষ্টিযুদ্ধে গত এশিয়ান গেমস্‌ এ আমাদের মুষ্টিযোদ্ধারা কৃতিত্ব দেখিয়েছে এবং আমাদের পদম্ বাহাদুর লাল এশিয়ার শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধার সম্মানলাভ করে স্বর্ণপদক পেয়েছে।

ফুটবলের মরশুম পড়েছে কলকাতায়। বিকালে গড়ের মাঠে অগণিত জনশ্রোত, সন্ধ্যায় ট্রাম বা বাসে জায়গা পাওয়ার বিপত্তি কলকাতায় একটা দৈনন্দিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। টেডিয়াম এখনও নেই, কিন্তু ঝড়, জল, রৌদ্রকে সমানভাবে উপেক্ষা করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়াতে দেখা যাচ্ছে দর্শকদের ঘেরা-মাঠের আশেপাশে। সেই আক্ষেপ, সেই সোরগোল, সেই উল্লাস এবং বিলাপ চলছে ফুটবল খেলা নিয়ে। এ বৎসরের ফুটবলের প্রধান অদল-বদল হল ঘেরা-মাঠে খেলার তত্ত্বাবধান বহুপুরাতন কন্ট্রাক্টর হেডওয়ার্ড কোম্পানীর হাত থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাতে চলে যাওয়া। পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি ক্যাবিনেট সাব কমিটি গঠন করেছে এই



গত এপ্রিল মাসে মোহনবাগান-এর ক্যালকাটা ফুটবল মাঠে স্থানান্তর উপলক্ষে অস্থলিত ক্যালকাটা ও মোহনবাগানের প্রবীণ এবং নবীন খেলোয়াড়দের মধ্যে ঐতিহ্য ফুটবল মাঠ খেলার পূর্বাঙ্কে দুই দলের খেলোয়াড়বৃন্দ পরিবেষ্টিত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন।

এখন আমাদের উচিত আরও অনেক তরুণদের হাতে নেওয়া এবং তাদের উপযুক্ত শিক্ষার্থীর অধীনে রেখে আরও অনেক পদম্ বাহাদুর তৈরী করা। আমরা আশা করছি আগামী ১৯৬৪ সালে ফেব্রুয়ারী মাসের জাতীয় খেলাধুলায় বড়দের মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতার সঙ্গে তরুণদেরও একটি জাতীয় প্রতিযোগিতা হবে এবং তাতে অনেক উদীয়মান তরুণ মুষ্টিযোদ্ধাদের আমরা দেখতে পাব। এ সম্বন্ধে একটি পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে সম্প্রতি কলকাতায় Indian Amateur Boxing Federation-এর জৈ-বার্ষিক সভায়।

এখন ফুটবল খেলায় আসা যাক। আগেই বলেছি

কার্য পরিচালন করার জ্ঞান। সকলেই জানে, ফুটবল খেলার বহু দর্শক খেলা দেখে এবং নির্ধারিত দর্শনী থেকে প্রচুর টাকা পয়সা সংগৃহীত হয়। টিকিট বিক্রয়লব্ধ, এই টাকা পয়সা এখন গভর্নমেন্টের হাতে পড়ায় এই আশা আমরা পোষণ করিব খেলাধুলা ব্যাপারে এর সম্ভাবহার হবে। মুখ্য মন্ত্রী কিছুদিন পূর্বে ময়দানে একটি সম্ভাষণে এই আশ্বাসই দিয়েছেন। পূর্বেকার মাঠের অধিকার এবং অধিকারীর ব্যাপারে কিছু অদল বদলও হয়েছে। এ বৎসর মোহনবাগান ক্লাব তাদের প্রুতান মাঠ ছেড়ে গিয়েছে ক্যালকাটা ফুটবল মাঠে। মোহনবাগানের জায়গায় গিয়েছে এরিয়াল ও স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাব।

এরিয়ানের পুরোনো জায়গা দখল করেছে হাওড়া ইউনিয়ন ও রাজস্থান দল। এই রদবদলে হাওড়া ইউনিয়ন, রাজস্থান ও স্পোর্টিং ইউনিয়ন ঘেরা মাঠে স্থান পেয়েছে। সর্বসম্মত কিন্তু এখনও ৮টি প্রথম বিভাগের দল ঘেরা মাঠের বাইরেই আছে। এ সম্বন্ধে আর কোনও কিছু করা হয়েছে বলে জানা যায়নি, তবে শুভব এই যে, আরও একটি মাঠ অর্থাৎ ডালহাউসি/রেঞ্জার্স মাঠটিও ঘেরা হবে। কিন্তু তা এখনও কার্য্যকরী হয়নি। অবশ্য মাঠ ঘেরাটাই সমস্তার সমাধান নয়। প্রয়োজন হচ্ছে একটি বড় স্টেডিয়াম করা। এই স্টেডিয়াম তৈরীর ব্যাপার বোধহয় ১৯৩০ সাল থেকে আমরা শুনে আসছি। মহারাজা সম্ভোষ তখন I. F. A.-এর প্রেসিডেন্ট। পরলোকগত লোকপ্রিয় মুখ্য মন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় স্টেডিয়াম তৈরীর ব্যাপারটা ষানিকটা এগিয়ে দিয়েছেন ইউরোপ থেকে বিলাতী architect এনে তাকে দিয়ে স্টেডিয়ামের plan তৈরী এবং স্থান নির্ধারণ করে। তারপর চীনের ভারত আক্রমণের casualty হয়ে পড়ে আছে আমাদের অগণিত ক্রীড়ামোদীদের আশা-আকাঙ্ক্ষার বস্তু এই স্টেডিয়াম। ইতিমধ্যে গড়ে উঠেছে রবীন্দ্র সরোবর ষ্টেডিয়াম ক্যালকাটা ইমপ্ৰুভমেন্ট ট্রাস্টের একক চেষ্টায়, কিন্তু আমাদের ক্রীড়া-সংস্থাগুলি যে অগণিত ক্রীড়ামোদীদের কল্যাণে আজও টিকে আছেন, তাদের বহুআকাঙ্ক্ষিত এই মাথা গোঁজার জায়গা আজও দিতে পারা যায় নি। সরকারের কর্তৃত্বাধীনে এই বৎসর থেকে আবার আশার আলোক একটু দেখা দিয়েছে। আমরা আশা করছি, সরকারের প্রস্তাবিত West Bengal Council of Sports-এর গঠনের সঙ্গে সঙ্গে ষ্টেডিয়াম তৈরীর ব্যাপার প্রধান এবং প্রথম স্থান পাবে তাদের কার্য্যতালিকায়। সহস্র সহস্র দর্শকের উৎসাহ ও স্তোত্রচ্ছায় তাদের কার্য্য নিশ্চয়ই জয়যুক্ত হবে।

এ বৎসরের ফুটবল খেলা সুরু হয়েছে অন্ত্যন্ত বৎসরের তুলনায় কিছু দেরীতে। তাহলেও বিনা বাধায় এখনও পর্য্যন্ত ঝর্ঝুভাবে চলছে এই খেলাধুলা। ১৫টি দল নিয়ে গঠিত হয়েছে প্রথম ডিভিসন লীগ, দ্বিতীয় ও তৃতীয়

ডিভিসনে ১৭টি করে এবং চতুর্থ ডিভিসনে ১৬টি দল। অন্ত্যন্ত বৎসরের জায় এ বৎসরও খেলায় নামা ও ওঠা বহু রাখার একটা প্রস্তাব পেশ করে কতকগুলি দল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে প্রস্তাবটি নাকচ হয়ে যাওয়ার দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ডিভিসনের শীর্ষস্থানীয় দলের ওপরের বিভাগে ওঠা এবং সর্বনিম্নদলের নীচের বিভাগে নেমে যাওয়ার আইন বলবৎ রইলো। সমস্ত বিভাগের খেলায় এই ওঠা ও নামা অর্থাৎ শীর্ষস্থান অধিকার করা এবং সর্বনিম্ন স্থান অধিকার করা, এই দুই ব্যাপার নিয়েই যত ঝুঁকুকা দেখা যায়, কিন্তু মাঠের দলগুলি সম্বন্ধে বেশী মাথা ঘামাবার সময় কারও নেই। আবার এই ওঠা এবং নামা কেবল এই দুই ব্যাপারেই দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বিভাগের খেলার তালিকা কেবল খবরের কাগজের পাতায়ই দেখে থাকে এখনকার দর্শকেরা। খুব কম সংখ্যক ক্রীড়ামোদীই তাদের বেলতে দেখে মাঠে। বহুকাল পূর্বের কথা মনে পড়ে। তখন দেখতাম, বিভিন্ন ক্লাবের কর্তৃপক্ষেরা ঘেরা মাঠের বাইরে অস্থিতি ছোট ছোট খেলা দেখতেন নিয়মিতভাবে সেখান থেকে কোনও ভাল খেলোয়াড়ের খোঁজ পাওয়া যায় কিনা এই কারণে। এখন সব উৎসাহ সীমাবদ্ধ হয়েছে প্রথম বিভাগের দলগুলির খেলায় এবং বিশেষ বিশেষ কতকগুলি দলের খেলায়। কলকাতায় উত্তরোত্তর জনসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার দরুণ মাঠের ভিড়ও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং শীর্ষস্থানীয় যে কোনও দলের যে কোনও খেলায় খেলা আরম্ভের বহু পূর্বে মাঠের দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এত ভীড় হওয়ার দরুণ অপেক্ষাকৃত হীনস্থাস্থ্যের লোকেরা ক্রমশঃ মাঠে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে এবং তরুণ দর্শকের সমাবেশে মাঠে গোলমাল এবং উত্তেজনার স্রষ্টি বেড়েই যাচ্ছে। এদের তিতরে নিয়মাহুর্বর্তিতা আনার জন্ত পুলিশের সমাবেশও সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কোনও খেলাই পুলিশ ছাড়া নির্বিকল্পে সম্পন্ন হয় না। এটা লজ্জার কথা—কেননা খেলার প্রধান কথা নিয়মাহুর্বর্তিতা, সখ্যতাবদ্ধন দৃঢ় করা, দলগত সংহতি স্রষ্টি করা, সুদক্ষ খেলোয়াড়ের কাছে আনন্ডিত হয়ে পরাজয় স্বীকার করা এবং বিজয়ী হয়ে অস্ত্রকে নীচু না করা। এই সবের অভাবে পুলিশের

প্রয়োজন হয় খেলার মাঠে। সেই রকম খেলার সার্থকতাই বা কি? যাই হোক এত অসুবিধা, বাধা, বিপত্তি এবং অখেলোয়াড়োচিত মনোভাবের প্রাবল্য সত্ত্বেও, খেলাধুলার সেই নির্মল আকর্ষণ এখনও আছে দর্শকদের মনে এবং তারাই খেলার মাঠে এখনও আগ্রহের করে যাচ্ছে।

প্রথম বিভাগের ফুটবল খেলায় শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে মোহনবাগান, ইষ্ট বেঙ্গল ও বি. এন. আর.। তার নীচেই আছে ইষ্টার্ন রেল, জর্জ টেলিগ্রাফ, স্পোর্টিং ইউনিয়ন, পোর্ট কমিশনারস। ওপরের তিনটি দলই এ বৎসবে শক্তিশালী বলে মনে হয়। আজ পর্যন্ত খেলায় প্রায় সমান সমান হারজিৎ হয়েছে এদের। হঠাৎ এবং অপ্রত্যাশিতভাবে জিতেছে এ পর্যন্ত জর্জ টেলিগ্রাফ ইষ্ট বেঙ্গলকে হারিয়ে এবং বাটা বি. এন. আর-কে হারিয়ে আর পোর্ট কমিশনার মোহনবাগানের সঙ্গে ড্র করে। স্পোর্টিং ইউনিয়ন ও পোর্ট কমিশনারস দল তরুণ খেলোয়াড় নিয়ে ভাল খেলে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে। এ বৎসরের প্রমোশন-পাওয়া দল পোর্ট কমিশনারকে বাহাদুরি দিই তাদের উৎসাহপূর্ণ খেলা দেখে। মহমেডান স্পোর্টিং-এর খেলা আর যেন চোখে পড়ে না। একমাত্র ইষ্ট বেঙ্গল-এর বিরুদ্ধে তারা খালি খানিকটা উৎসাহ নিয়ে খেলেছে এ পর্যন্ত। বাকী সব খেলাই মামুলি। ইষ্টবেঙ্গলের দুই বিখ্যাত খেলোয়াড় অরুণ ঘোষ ও বলরাম বি. এন. আর. দলে যোগ দেওয়ায় তারা অপেক্ষাকৃত দুর্বল, কিন্তু এদের দু'জন ছাড়াও এরা

নূতন দল গঠন করে খুবই দৃঢ়তার সঙ্গেই খেলে যাচ্ছে। বি. এন. আর. এবার ইষ্টবেঙ্গল দলের এই দুই অলিম্পিক খেলোয়াড়কে নিয়ে খুবই উৎসাহের সঙ্গে খেলেছে। লীগের প্রথমার্ধের খেলায় মোহনবাগানকে ২-১ গোলে পরাজয় করে তাদের উৎসাহ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। মোহনবাগানের প্রায় সব পুরাণো খেলোয়াড়রাই বর্তমান দলে আছে। গোলরক্ষক খঙ্গরাজ এই দলে যোগদান করায় রক্ষণভাগের শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে বলে মনে হয়। বিখ্যাত স্টপার জার্নাল সিং এলে এই দলের রক্ষণভাগের শক্তি আরও বাড়বে। আক্রমণভাগ এই দলের সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়। এখনও পর্যন্ত এরাই অধিক সংখ্যক গোল দিয়েছে। ইষ্টার্ন রেল আজ কয়েক বৎসর ধরেই লীগ তালিকায় একটা মাঝামাঝি জায়গা অধিকার করে আসছে। গোলরক্ষক বর্মণ, হাফব্যাক পি. সিংহ ও করওয়ার্ড প্রদীপ ব্যানার্জি এখনও তাদের উচ্চাঙ্গের খেলা দেখিয়ে সকলের প্রশংসাতাজন হয়ে আছে। অন্যান্য দলের মধ্যে আগেই বলেছি সদ্য উন্নীত দল পোর্ট কমিশনার ও তরুণ খেলোয়াড় দ্বারা গঠিত স্পোর্টিং ইউনিয়ন দলের উৎসাহপূর্ণ খেলার কথা। এরিয়াল দলও তাদের ঐতিহ্য বজায় রেখেছে নূতন খেলোয়াড় দিয়ে দল গঠন করে এবং লীগ তালিকার মাঝামাঝি জায়গা অধিকার করে। বাকী দলগুলির মধ্যে বাটা ও উয়াড়ীর খেলায় মাঝে মাঝে দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া গেছে। পুলিশ, রাজস্থান, বালি প্রতিভা ও হাওড়া ইউনিয়ন লীগের তালিকার নিম্নে প্রায় এক জায়গায় জড় হয়ে আছে।

ফোন :

৩৪-৪৩৬৯, ৬২

প্রায়
সাইসকিৎস

পশুপতি দ্রাম এও সন্স
প্রাইভেট লিঃ

ভারতের সর্ববৃহৎ চাইলার ভেটেরিনারী প্রতিষ্ঠান

৪৩/২ ও ৩৭এ, সুব্রহ্মনাথ স্যানার্কু রোড, কলিকাতা-১৪।

বাড়িতে চাইলার পৌছাইয়া দিবার ব্যবস্থা আছে।

সম্মাদকায়

ভারতবর্ষ : গান্ধীজী তথা নেহেরু ও বিনোবাজী :

বর্তমান বিংশ শতাব্দীতে গান্ধীজীর অত্যাশ্চর্য ইতিহাসের পথেই, এ কথা নিশ্চয়ই স্বীকার্য। কিন্তু ভারত-জাতীয়তার জন্মক তিনি, ইহা অত্যাশ্চর্য উচ্চাস-মাত্র। ভারত-জাতীয়তার স্বরূপটি আজকের মানুষের কাছে তেমন স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন নহে বলিয়াই শিখানো শ্লোগানের মতই ইহা অর্থহীনভাবে উক্ত হইয়া থাকে। অবশ্য গান্ধী-যুগে ইহাই স্বাভাবিক। এই বিশিষ্ট গান্ধী যুগধারার ক্রমশঃ নেহেরু ও বিনোবাজীর বিকাশ।

ভারতবর্ষ আর ভারত-জাতীয়তা অবিভাজ্য। ভারত-জাতীয়তা বলিতে যাহা বুঝায় তাহা শ্রীমদ্রবিন্দ্রের ভাষায় সনাতন ধর্ম। এই সনাতন ধর্ম সর্বকালে সর্ব মানুষের মহৎ উচ্ছ্রাবনের প্রকৃষ্ট রাজপথ। ইহা অন্ধ গোড়ামী নহে। আগামীকালে বহু বিস্মিত বিপক্ষে চলিয়া, প্রকৃত রক্তস্নানের পর শ্রান্ত মানুষ একদিন এই সত্য উপলব্ধি করিবে।

১৯৩০ সালের জাম্মুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রবর্তক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতৃ-সম্পাদক ও প্রবর্তক-সম্পাদক শ্রীমতি-লাল ভারত-তীর্থে ভ্রমণে বহির্গত হন। ৩রা জাম্মুয়ারী মথুরার যমুনাতীরে তাঁর চোখের সামনে যে ভারতবর্ষের রূপ ভাসিয়া উঠে তাহা তিনি তাঁর দিনলিপিতে লিপিবদ্ধ করেন। তিনি লক্ষ্য করেন, তীর্থে তীর্থে সেই মহামহিমাময় অতীত ভারতেরই প্রদীপণ। সম্ভ্রান্ত লিখিয়াছেন : “ক্ষীণকায় যমুনার বুকে যেটুকু কালো জল থিৎ থিৎ করছে তা ভারতের কৃষ্ণচন্দ্রকে স্মরণ করিয়ে দেয়।” সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, ভারতীয় প্রতীক কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর চোখের সামনে জীবন্ত মূর্তি হইয়া উঠেন। ভারতবর্ষ কৃষ্ণচন্দ্রের মাধ্যমে বিগ্রহাঙ্কিত। ভারতবাসী ভারতবর্ষকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে কৃষ্ণচন্দ্রের মধ্যে। সম্ভ্রান্ত আক্ষেপ করিয়াছেন, মহাত্মাজী এই কৃষ্ণচন্দ্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়াছেন।

ভারতের ঐতিহ্য ও জীবনদর্শনের মূল ভিত্তিস্বরূপ গীতার গান্ধীজী মনগড়া রূপক ভাষ্য করিয়াছেন। গান্ধীভাষ্য গীতায় ভারতের সেই বীৰ্য্য-বিক্রমের অভাবই দৃষ্ট হয়। সত্য কথা বলিতে গেলে টলস্টয়, রাস্কিন, জৈন দর্শনকে তিনি যেমনভাবে বুঝিয়াছিলেন ঠিক তেমনভাবে ধর্মি ভারতের মর্মসত্যকে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তাঁর জীবনদর্শনের ভিত্তি তাই নীতিবাদের

উপর—খাঁটি অধ্যাত্মভিত্তিক নহে। ভারত-ইতিহাসের একটি পর্য্যায়ের গান্ধীবাদের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু সে-বাদ চিরন্তনের ক্ষমতা গ্রহণীয় নহে এবং গৃহীত হইবেও না। মহাত্মাজীর বৈরাগ্যদীপ্ত জীবন অনিশ্চিত ছিল যুগ-প্রবৃত্তির প্রতিবাদ। সম্ভ্রান্তরূপী বিষয়টির একটা চমৎকার চিত্র দিয়াছেন। ৫ই জাম্মুয়ারী, ১৯৩০, তিনি আগ্রা দর্শন করিয়া তাঁর দিনলিপিতে লিখিয়াছেন : “আগ্রায় ইসলাম সভ্যতার নিদর্শন দেখে স্তম্ভিত হতে হয়। এত ভোগ মানুষের প্রাণে কেমন করে সম্ভ হয়, হিন্দু জাতি বোধহয় আজ তা কল্পনাও করতে পারে না। ইংরাজের শিক্ষা-সভ্যতার আদর্শ আজ উদীয়মান পৃথিবীর জায় ক্রমপ্রকাশমান। ইহা পরিণামে হয়তো মোঘলের ভোগবিলাসের সীমা অতিক্রম করে চলবে। এই প্রবাহের মুখে মহাত্মার ত্যাগের আদর্শ প্রকাশ্য শক্তি ও বীৰ্য্যেরই পরিচয়—তাঁর নগ্নমুষ্টি ইহার প্রকট প্রতিবাদ।” আশ্চর্য্য, এতদিন আগে গান্ধীবাদের সেই উদীয়মান যুগে সম্ভ্রান্তরূপী ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, “মহাত্মাজীর এই প্রতিবাদ ভারতের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবে না।” বস্তুতঃ ভবিষ্যৎ তো গড়িয়া তোলেইনি, আরও অন্ধকারাচ্ছন্নই করিতেছে। ভোগ-বিলাসের প্রবৃত্তির দিক দিয়া স্বাধীনতার পরে মহাত্মাজীর রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী পণ্ডিত নেহেরু-সরকার ইতিমধ্যেই মুঘল-ইংরাজের সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, ইহা প্রত্যক্ষ সত্য এবং তাহাও গান্ধীবাদের উত্তরাধিকারী কটিবাস পরিহিত সম্ভ্রান্ত বিনোবাজীর প্রত্যক্ষ জীবনপ্রতিবাদের মুখোমুখী দাঁড়াইয়াই। ভাবেজীর গীতা, উপনিষদের প্রবচন, তাঁর সমস্ত নীতিবচন যে উপেক্ষিত অনাদৃত হইতেছে তা আজকের ক্রমবর্ধমান দুর্নীতি, কালোবাজারী, অরাজক উচ্ছ্রালতার অবাধ ব্যাপকতাই সাক্ষ্য দিবে। বস্তুতঃ গান্ধীবাদের ব্যর্থতারই ইহা লক্ষণ। ইহার মূলগত জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় দর্শনের মধ্যে নিশ্চয়ই কোথাও ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে।

আসল কথা, অবিমিশ্র ভারতবর্ষ কোনদিনই গান্ধীবাদকে সর্বাস্তঃকরণ দিয়া গ্রহণ করেনি। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জনের খাতিরে রাষ্ট্রীয় নেতা হিসাবে তাঁকে গ্রহণ করিয়াছে এবং এ দিক দিয়া মহাত্মাজী চিরদিনই শ্রদ্ধেয় ও স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। এই খাঁটি ভারতবর্ষের প্রকাশ্য আমরা নেতাজী সুভাষচন্দ্রের দর্শন ও কর্মে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অকপট শ্রদ্ধা পোষণ করিয়াও, গান্ধীজী সম্বন্ধে নেতাজী মন্তব্য করিয়াছেন (Indian struggle গ্রন্থে) :

“In Gandhi there are two aspects—Gandhi as a political leader and Gandhi as

a philosopher. We have been following him in his Capacity as a Political leader, but we have not accepted his philosophy.” এই ‘we’

বলিতে নেতাজী ভারতবাসীর কথাই বলিয়াছেন। নেতাজী প্রশ্ন করিয়াছেন, “What is India in reality?” তাঁরই উত্তর “We Indians of to-day think the same thought, fundamentally the same thought, and have the same feelings, the same ideas of life as our forefathers who lived 2000 or 3000 thousand years ago.”

নেতাজী তার কারণও দেখাইয়াছেন: “unlike other ancient civilisation such as Egypt or Babylon, Phoenicia or even Greece, the ancient civilisation or culture of India is not dead. It still lives in the present.” প্রকৃতপক্ষে ভারতবাসীর নিকট গান্ধীজী বা বিনোবাজীর যে আবেদন তা যতটুকু তাঁদের জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্রীয়-দর্শনের জন্ম নয়, তার চেয়ে বেশী তাঁর ত্যাগ-বৈরাগ্য মূর্ত প্রতীকতার জন্ম। তাঁদের আবির্ভাব আপদ্ধর্মের মত—খাঁটি ভারতীয় ধারার ক্রম বাহিয়া নহে। এই হেতুই ভারতের মাটিতে ইহা স্থায়ী স্থান পাইবারও নহে।

*

গান্ধীবাদের এক প্রান্তে নেহেরু, অপর প্রান্তে বিনোবাজী। নেতাজী-উক্ত গান্ধী-জীবনের দুইটি দিকের প্রতীক তাঁরা। স্বাধীনতার পরে রাষ্ট্রকর্ণধাররূপে নেহেরু অহিংসাতান্ত্রিক মহাত্মাজীর রাষ্ট্রীয় দর্শনের প্রয়োগ ক্ষেত্রে ব্যর্থই শুধু হন নাই, বর্তমান জাগতিক অবস্থায় ইহার কার্যকারিতা সম্বন্ধেও সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। এ সম্পর্কে ত্রীকালিদাস মুখোপাধ্যায়ের ‘গান্ধীবাদ ও বিনোবা ভাবে’ প্রবন্ধ (প্রবর্তক বৈশাখ ’৭০) দ্রষ্টব্য। রাষ্ট্রীয় আদর্শের ক্ষেত্রে নেহেরুর এই দৃষ্টি ও দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব বিগত পনের বৎসরে ভারত-রাষ্ট্রকে দুর্বল ও অসহায়ী করিয়াছে তাহা দূরদর্শীর কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল না। প্রকৃতপক্ষে গান্ধীবাদকে মৃত্যুর হাত হইতে এখনও রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন তাঁরই সুরোগ্য উত্তরাধিকারী আচার্য্য বিনোবা ভাবে। গান্ধীজীর জীবন-সাধনার সার্থক প্রতিনিধিই তিনি শুধু নহেন, আচার-আচরণে, ভাব ও ভাবনায় মহাত্মাজীর মূর্ত প্রতীক হিসাবে ভারতের এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্তে এখনও জনগণের মধ্যে তিনি ভ্রাম্যমাণ। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে সারা ভারতে যে সহিংস কম্যুনিজম অভ্যুত্থানের সূচনা দেখা দিয়াছিল তাহা শুধু প্রতিরোধ নয়, ব্যর্থ করে বিনোবাজীর

অহিংস সর্বোদয়। চরম সাধ্য হিসাবে ‘সাম্যবাদ’ ও ‘সর্বোদয়’ সমধর্মী; কিন্তু পন্থার বৈপরীত্য বর্তমান। সহিংস ও অহিংস পন্থায় উভয় বাদই আমূল বিপ্লবপন্থী। ভারতের মূলগত সত্য ও স্ব ভাবপ্রতিষ্ঠ হইবার ক্রমপর্যায়ের অভাবাদী সহিংস সাম্যবাদের বিকল্প হিসাবে বিনোবাজীর নৈতিক সর্বোদয় আন্দোলন অবশুই অতিনন্দনীয়।

লক্ষ্যনীয় যে, গান্ধীবাদের উত্তরাধিকারী নেহেরু ও বিনোবাজীর কর্মপন্থার বৈপরীত্য পারম্পরিক সংঘাতের সম্মুখীন হইয়া গান্ধীবাদেরই সমাধি রচনা করিয়া চলিয়াছে। আজিকে এমন এক পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে, যদি গান্ধীবাদের স্বপ্ন ও প্রতিষ্ঠা বাস্তব করিয়া তুলিতে হয় অর্থাৎ বিনোবাজীর ‘মিশন’কে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হয়, তবে বিনোবাজীকে গান্ধীবাদের ধারক নেহেরু-নীতির বিরুদ্ধেই সংগ্রাম ঘোষণা করিতে হইবে। বিনোবাজী তাঁর আদর্শ রূপায়ণের পথে ক্রমশঃই ইহা উপলব্ধি করিতেছেন। গান্ধীজী তথা বিনোবাজীর কল্পিত গ্রামস্বরাজ অর্থাৎ ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ-নীতি নেহেরু-সরকারের নয়। দিল্লী-কেন্দ্রিক বাহুবল শক্তির পাষণপ্রাচীরে ধাক্কা খাইয়া আজ স্বপ্নের মতই শূন্যে মিলাইতেছে। বস্তুতঃ, বর্তমান কংগ্রেস সরকারের বিনোবাজীর বিকেন্দ্রীকরণমূলক আন্দোলনের সমর্থন যতটুকু আদর্শনিষ্ঠা ও কর্মধারার সাম্যের জন্ম নয়, তার চেয়ে বেশী গ্রামে-গ্রামে নির্বাচনী স্বার্থ ও সুরবিধার খাতিরে। আদর্শের এই স্ব-বিরোধিতা ভারতভূমিতে গান্ধীবাদের বনিয়াদ টলটলায়মান করিয়া তুলিতেছে, ইহা অনিশ্চিত। এই হেতুই সাম্প্রতিক কলিকাতা পদযাত্রা-কালে বিনোবাজীর প্রাধিকারিক ভাষণগুলি কংগ্রেস সরকারের সমালোচনায় মুখর।

*

গান্ধীচরিত্রের নেতৃত্বস্থলত বলিষ্ঠতা ও অড়িষ্ঠতার পরিমণ্ডলে অহিংসা নীতির যে সমুজ্জল মহিমা তার একান্ত অভাব দৃষ্ট হয় নেহেরু-বিনোবাজীর মধ্যে। ভারতের রাষ্ট্র-কর্ণধার পণ্ডিত নেহেরুর ভাবলোকে অহিংসা ও শান্তির ধোঁয়াটে ধারণা তাঁর সমস্ত নীতিকে দুর্বল ও দ্বিধাগ্রস্ত করিয়াছে যার ফলে ভারতই শুধু দ্বিধাগ্রস্ত হয় নাই, পাকিস্তান-চীন সম্পর্কিত সমস্তাও জটিলতরই হইয়াছে, মাহুষের স্বভাব-প্রকৃতি ও নৈতিক অবনতিও তেমনি ব্যাপকতর হইয়াছে। একটা জাতির উন্নয়ন বলিতে যদি চরিত্রের উন্নয়ন বোঝায় এবং সুগঠিত মনুষ্যসমুজ্জল জাতীয়তাবোধসম্পন্ন চরিত্র যদি বলিষ্ঠ জাতির বনিয়াদ হয়, তবে বিগত পনের বৎসরে ধর্মনিরপেক্ষ কংগ্রেস রাষ্ট্র ব্যর্থই হইয়াছে, ইহা প্রত্যক্ষ সত্য।

বিনোবাজী সাধু সন্ত মহাপুরুষ—গান্ধীবাদ ও জীবন-দর্শনের যোগ্য উত্তরাধিকারী এবং সর্বজনশ্রদ্ধেয়। কিন্তু তথাপি তাঁর শাস্ত্রবচন ও অহিংসার বাণী ভারতের মাটিতে কখনও শিকড় গাড়িতে যে পারিবে না তাহা ভারতের সত্তার সঙ্গে যার এতটুকু পরিচয় আছে সেই বলিবে। কলিকাতায় তাঁর পদপর্যটনের দ্বিতীয় পর্য্যয়ে চীন অথবা লোলজিহ্বা মুণ্ডমালাশোভিতা রক্তলিপ্ত ঝঞ্জাৎহতা মা কালী সন্মুখে যেসব উক্তি তিনি করিয়াছেন তাহা খৃষ্টীয় অহিংসবাদ—এক গালে চড় মারিলে আর এক গাল পতিয়া দাও—ছাড়াইবা গিয়াছে। নীতিভিত্তিক অহিংসবাদের এই বীৰ্য্যহীনতা লক্ষ্য করিয়াই ভারতের ভগবান অর্জুনকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন, ‘ক্ৰৈবং মাংস গমঃ’। যুদ্ধ ও লোকহত্যায় বিনোবাজীর আর্জুনাদকে সন্তানব্রতী গীতা-চণ্ডীর পূজারী বাঙালীর মানসে বিনোবাজীর এই কাভরোক্তি লখুই ঠেকিবে। ভারতাত্মা কৃষ্ণচন্দ্রের দর্শনে ইহা “কুদ্রং হৃদয়দৌর্জল্যম্”।

অধ্যাত্ম ভারতের জগৎ ও জীবন-দর্শনে হিংসা অহিংসা, ধর্ম-অধর্ম, নীতি-অনীতির উপরে পূর্ণ-যোগের স্থান। বিশ্বরচনার মর্ম্মমূলে মর্ম্মীর সর্বধর্ম্ম সমর্পণ। এই অমৃতপুত্রী সত্যপ্রতিষ্ঠা ব্যাপ্তি ও সমষ্টি জীবনের বিকাশ ও ব্যঞ্জনা ই ভারত-জাতীয়তা ও অধ্যাত্ম-সংস্কৃতির শুদ্ধ ও সিদ্ধ অতিসন্ধি। আইনের বলে অথবা হিংস্র বিপ্লবের মাধ্যমে ধন-সম্পদ-সমাজ সাম্য নহে। ভারতের দার্শনিক রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণ জুপ্রাচীন ভারতীয় মহাজনের পদাঙ্ক অনুসরণের ইঙ্গিত দিতে গিয়াই বলিয়াছেন, “Adhere to the central principle of the great faith which has enabled you to survive for fifty centuries; which will enable you to survive for an equal time, if not longer.” আজিকার ভারতে জড়বাদী সত্যতা ও সমাজ জীবন সংগঠনের যে নির্বিস্তার অন্ধ অনুকরণ চলিয়াছে তাহাতে যে বিকৃত ভারতবর্ষ মাথা তুলিতেছে তার আবু: অর্ধ শতাব্দীও হইবে কিনা, সন্দেহ আছে। বহির্ভারতীয় ইতিহাসের দিক্‌দর্শন ইহাই। ডঃ রাধাকৃষ্ণ “The central principle of the great faith” বলিতে

যাহা বুঝাইতে চাহিয়াছেন তাহাই ভারতীয় বিশিষ্ট জীবনধারার মৌল নীতি—তাহাই ভারতবর্ষ।

ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীওয়াই. বি. চ্যবন সম্প্রতি প্রকাশিত প্রভুপাদ শ্রীপ্রাণকিশোর গোস্বামী কর্তৃক বঙ্গোদিত জ্ঞানেশ্বরী গীতা মহাগ্রন্থের অবতরণিকায় মন্তব্য করিয়াছেন, “Let these two lands remind the country which waits to be redeemed that national integration is possible only through spiritual resuscitation.” সমস্ত শাস্ত্র সমুদ্রমহনোদ্ভূত রত্নসার শ্রীগীতার ইঙ্গিতই শ্রীচ্যবন করিয়াছেন। ‘These two lands’ বলিতে তিনি মহারাষ্ট্র ও বাংলার কথা বলিয়াছেন। একমাত্র অধ্যাত্ম জাগরণের মধ্যে ভারতের প্রেমৈক্য সম্ভবপর বলিয়াও শ্রীচ্যবন প্রত্যয় করেন। অথচ তিনি অহিংসবাদী নেহেরু ক্যাবিনেটের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। শ্রীচ্যবনের মুখ দিয়া ভারতের বাণীই বাহির হইয়াছে। যুগপ্রভাবে এমন বহু নেতৃস্থানীয় ভারতবিশ্বাসীর চিন্তা আচ্ছন্ন বা মুচ্ছিত। গান্ধী-যুগোত্তর ভারতে সত্যকার অধ্যাত্ম প্রাবন আসয়। অনতিদূর আগামীকালে ভগীরথের মতই এই ভারতীয় ভাবগোষ্ঠী দ্বারা খাত খনন করিয়া আনিবে বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-অরবিন্দ-রবীন্দ্রের বাংলা। ভারতীয় ইতিহাসের পথেই নেহেরু-নেতৃত্বের অভ্যুত্থান, প্রতিষ্ঠা ও অবসান। এই অধ্যাত্ম-ভাবপ্রাবনে অবগাহন করিয়াই বিশ্বের আলোকবর্তিকাস্বরূপ চিরন্তনের অথও ভারত আবার মাথা তুলিবে।

বহু বৎসর পূর্বে গান্ধী-যুগের স্বচনাপর্কেই শ্রীঅরবিন্দ প্রবর্তক-সজ্জগৎ শ্রীমতিলালকে ইঙ্গিত দিয়াছিলেন ‘T. S. M. (True spiritual movement)’ আর ‘Revolutions the brain of the nation.’ প্রবর্তক সত্যের ভাবী কর্ষপন্থা সন্মুখেও নির্দেশ দেন তিনি: “To reconstitute the cultural, social and economic life of the nation on the spiritual basis and in larger lines than in the past.” পরবর্তীকালে সজ্জগৎর মধ্যে এই অবিশিষ্ট সনাতন ভারতবর্ষকে মুর্ত্ত হইতে দেখি। প্রবর্তক পত্রিকা এই ভারতবর্ষের জাগরণ লক্ষ্যেই পরিচালিত।



ভ্রম সংশোধন—গত বৈশাখ সংখ্যায় ৩য় পৃষ্ঠায় ‘বর্ষ-প্রশান্তি’ শীর্ষকে ‘কুদ্রঃ প্রশান্তিঃ’ শ্লোকের দ্বিতীয় চরণে ‘যথাস্বরম্’ স্থানে ‘যথাপ্যস্বরম্’ হইবে। এই মুদ্রণ ভুলের জন্য ছন্দোভঙ্গ হওয়ায় ক্ষমিত।

সাময়িক

শুভ সূচনা :

বিগত ২৫শে বৈশাখ হইতে সরকারী কাজে বাংলাভাষার ব্যবহার শুরু হইয়াছে। ১৯৬১ সালে কবিগুরু জগদীশচন্দ্র বসুর উপলক্ষে পশ্চিম বাংলার তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গে সরকারী কাজে বাংলা ভাষা প্রয়োগের আশ্বাস দেন। এই বিবৃতিতে সরকারী কাজে বাংলা ভাষার প্রবর্তন ত্বরান্বিত করার প্রতিশ্রুতিও ছিল। বর্তমান বৎসরের ২৫শে বৈশাখ সেই প্রতিশ্রুতি কার্যকরী হইল। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমেন এই ঘটনাকে ঐতিহাসিক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বর্তমানে চতুর্দিক হইতে বাংলা ও বাঙ্গালীকে কোণঠাসা করার যে প্রচেষ্টা চলিতেছে তার মধ্যে মাতৃভাষার গৌরব প্রত্যেক বাঙ্গালীকে উৎসাহিত করিবে, ইহা সুনিশ্চিত।

যুক্তরাষ্ট্রের গৌরবান্বিত :

স্বাধীনতার পর ভারতে নানাদিক দ্বিধা উন্নতির চেষ্টা চলিয়াছে। উন্নতশ্রেণীর গৌরব ও চূড়োংগাদান স্বর্ধির ক্ষমতা বিদেশ হইতে সুনির্বাচিত গৌরব আদায় করা হইয়া থাকে। ১৯৬২ সালের শেষ তিনমাসে ইন্ডিগানার নর্থ ম্যাক্লেট্টারের হাইকার প্রজেক্ট ইনকর্পোরেশন নামক প্রতিষ্ঠান মোট ৪২টি গৌরব বিমানযোগে দান হিসাবে পাঠাইয়াছেন। ইহার মধ্যে বহুখাত জার্মি বণ্ড ও হাইকার জেলীর গাভী আছে। ইহার পূর্বেও এই একই প্রতিষ্ঠান বিগত সেপ্টেম্বর মাসে ৫০টি ও ১৯৬১ সালের ডিসেম্বরে ৫০টি গৌরব ভারতে দানস্বরূপ প্রেরণ করে। নয়া দিল্লীর ভারতীয় কৃষি-পরিষদ এই দান গ্রহণ করিয়া বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করিয়া থাকে। এ যুগে এই আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য স্রবণী।

কবি যতীন্দ্রপ্রসাদের জন্মোৎসব :

বিগত ১৫ই জ্যৈষ্ঠ প্রখ্যাত প্রবীণ ছান্দস-কবি শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্যের জন্মোৎসবের রোডস্থ বাসভবনে তাঁর ৭৪তম জন্মদিবস উপলক্ষে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন হইয়াছিল। এই উপলক্ষে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন বঙ্গাধিকারী শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও কবিশেষর কালিদাস রায়। স্বয়ং লাহিড়ীর বৈদিক মন্ত্রপাঠের সাথে সভার উদ্বোধন হয়। কবিবর স্বরচিত একটি গানে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। সঙ্গীতগোষ্ঠী অংশ গ্রহণ করেন কবির সৌহিত্রী স্বয়ং, কন্যা পুতুল ও বন্দনা। কবি কালিদাস রায় যতীন্দ্রপ্রসাদকে লক্ষ্য করিয়া লেখা স্বরচিত কবিতাটি পাঠ করিলে পর যতীন্দ্রপ্রসাদের একটি কবিতা আবৃত্তি করেন বন্দনা মিত্র। অধ্যাপক জিগুয়াশঙ্কর সেন-শাহী, ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, শ্রীধারমণ চৌধুরী, অধ্যাপিকা উমা দেবী, শ্রীমতী রাধারানী দেবী, কবিপুত্র শ্রীপূর্ণেন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য তাঁদের ভাষণে কবির সাহিত্যজীবনের পর্যালোচনা করিয়া তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা

প্রদান করেন। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, কবি নরেন্দ্র দেব, কবিশেষর কালিদাস রায় স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। কবি তাঁর প্রতিভাবশে সমাগত অধ্যাপকদের সাদর সম্ভাষণ প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও অধ্যাপকের সমাবেশ ঘটে। আমরা এই আন্তর্জাতিক কবিবরের শতাব্দী কামনা করি।

আমেরিকায় বাঙালী ছাত্রীর কৃতিত্ব :

গত ৫ই জুন বোষ্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে কলিকাতার শ্রীমতী হুনন্দা বহু জ্যোতিষ শাস্ত্রে (Inospheric Astronomy) স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করিয়াছেন। পরীক্ষকগণ তাঁর বিশেষ উচ্চ



শ্রীমতী হুনন্দা বহু

প্রশংসা করেন। শ্রীমতী বহু ১৯৬০ সালে পদার্থ বিজ্ঞান অনার্স সহ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। শ্রীমতী হুনন্দার স্বামী শ্রীশান্তিময় বহুও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ও বর্তমানে আমেরিকায় আর্মি রিসার্চ স্টেশনে রিসার্চ কার্যে ব্যাপৃত। হুনন্দা বহু স্বর্গত ডাঃ সি. এল. গাঙ্গুলীর কন্যা ও খ্যাতনামা দেশসেবক শ্রীএন. সি. চাট্টাঙ্গি বার-এন্ট-ল-এর নাতনী।

কন্যাকুমারিকায় স্বামীজীর মূর্তি :

বিবেকানন্দ শতবার্ষিক জন্মজয়ন্তীতে স্বামীজীর মূর্তি প্রতিষ্ঠার বেসব উদ্যম হইয়াছে তার মধ্যে কন্যাকুমারিকায় 'বিবেকানন্দ রক' স্বামীজীর বাহিন ছুট উচ্চ ব্রোঞ্জ মূর্তি প্রতিষ্ঠার আয়োজনটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার ভিত্তিহাপন ইতিমধ্যেই হইয়া গিয়াছে। এই মূর্তি নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা এবং আনুষ্ঠানিক ব্যয় প্রায় ছয় লক্ষ টাকা হইবে। মন্দির সংলগ্ন একটি প্রাঙ্গণ, পার্ক, বিরামগৃহও স্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছে। এই জম্ম যে কমিটি গঠিত হইয়াছে তার চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারী হইতেছেন যথাক্রমে কেরালার মধ্য পদ্মনাভন ও মাজাজের

অধ্যাপক পি. মহাদেবন। আগামী বর্ষের ১৭ই জানুয়ারী এই প্রতিষ্ঠা কার্যটি সম্পূর্ণ হইবার কথা।

কর্মযোগী সূর্যকুমার বসু :

ঢাকেশ্বরী কটন মিলের প্রতিষ্ঠাতা প্রখ্যাত শিল্পপতি শ্রীসূর্যকুমার বসু বিগত ১৪ই জুন পরলোক গমন করেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন-কালে যখন জাতির সংকল্প ছিল স্বদেশী গ্রহণ ও বিলাতী বর্জন, তখন বাংলাদেশে বাঙালীদের কোন কাপড়ের কল ছিল না। এই আন্দোলনের চেষ্টা ঢাকা কলেজের ছাত্র সূর্যকুমারের তরুণ মনকে অনুপ্রাণিত করে বস্ত্রশিল্পে বাংলাদেশকে স্বয়ং-সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে। এরই কলে পরবর্তী কালে তাঁকে আমরা দেখিতে পাই আমেরিকাবাদে বয়ন-শিল্পের ছাত্ররূপে। বঙ্গলক্ষ্মী মিলেব কর্মসূত্রে ও পরিশেষে ঢাকেশ্বরী ও আরও কয়েকটি মিলের প্রতিষ্ঠাতারূপে। জাতীয়ন সমাজসেবী এই মানবদরদীকে আজ্ঞার করিয়া বহু দুর্ভাগ্য ঠাঁড়াইবার স্থান পাইরাছে। উদ্ভাস্ত পুনর্বাসন ব্যাপারে তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টা দেশবাসী শ্রমিকের সাথে স্মরণ রাখিবে। বাংলার এই সুযোগ্য সম্মানের লোকান্তরে বাংলার শিল্পজগতের অপূরণীয় ক্ষতি হইল। শুভিচ্ছন্দশী সূর্যকুমার ভাঙার যুগে গড়ার স্বপ্ন দেখেন এবং তাহা সাফল্যমণ্ডিত করেন। বাংলার বস্ত্রশিল্পের প্রবর্তক হিসেবে সূর্যকুমার চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

বিশ্বের প্রথমা :

সম্প্রতি সোভিয়েৎ রাশিয়া মহাকাশে একজন নারীকে প্রেরণ করিয়াছেন। ২৬ বৎসর বয়স্ক এই মহিলার নাম ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কাভা। ইনি মহাকাশে তিনদিন অবস্থান করিয়াছেন। মহাকাশ-বিচরণের তেরেস্কাভার প্রথম স্থান বিশ্বের মহিলাব্রহ্মসাহসিক অভিযানের ক্ষেত্রে মানুষের ইতিহাসে অনতিক্রমণীয় হইয়া থাকিবে। বিশ্বের এই প্রথমাকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি।

এভারেট্টে বিজয়ে মার্কিন সফলতা :

ইতিপূর্বে এভারেট্টে বিজিত হইলেও, দুই দিক হইতে এবারকার যুগপৎ মার্কিনের এভারেট্টে বিজয় নূতন রেকর্ড স্থাপন করিয়াছে। মার্কিন এভারেট্টে অভিযাত্রী দলের দুইজন সঙ্গী বিগত ১লা মৈ বেলা একটার এভারেট্টে শূদ্র আকোষণ করেন। এভারেট্টে বিজয়ের প্রথম মার্কিন প্রচেষ্টা প্রথমবারেই সফল হইল। এভারেট্টের পরাগর ও বিজ্ঞানের বিজয় সম্প্রদায় যুগপৎ বেদনা-বিপ্লবেরই হেতু ঘটিয়াছে।

অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবিশ :

গত ২ই জুন সন্ধ্যায় ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের আসপালীতে মনোরম পরিবেশে অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবিশের ৭০তম জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় অধ্যাপক শ্রীমতোজ্জনাধীর্ষ। শ্রীবহু অধ্যাপক মহলানবিশের দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া বলেন যে, তিনি জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে অভূতপূর্ব সাফল্য দেখাইয়াছেন তা সত্যি দুর্লভ দৃষ্টান্ত। ডঃ কে. আর. নারায়ণ, অধ্যাপক ডি. এম. বহু ও শ্রীহিবনকুমার সামন্তাল শ্রীমহলানবিশের কৃতিত্ব বিষয়ক বিভিন্ন দিকের সমীক্ষণ আলোচনা করেন। প্রধান মন্ত্রী নেহেরু এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ, সংস্থা এই উপলক্ষে শুভেচ্ছা বাণী প্রেরণ করেন। বহু বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ ও বিদ্বৎজন্যের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত হয়। আমরা দেশসাত্কার এই সুযোগ্য সম্মানের নিরাময় দীর্ঘজীবন কামনা করি। শ্রীমহলানবিশ প্রচ্যে পরিসংখ্যান ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক হিসাবে স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

শ্রীলক্ষ্মী মজুমদার

অভিজাত কোম-তৈল
নাগেন্দ্রনাথের

হিমকল্যাণ

বড়-মামারী-ছোট
তিন সাইজে
সর্বত্র পাওয়া যায়



হিমকল্যাণ ওয়ার্কস্
প্রা: সি: ৮ কলি-৪

UPCO

সম্পাদক : শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৩১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি. এ. কর্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত।

প্রবর্তক প্রিন্টিং এণ্ড হাফটোন লিমিটেড, ৩৩ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীকনিষ্মণ রায় কর্তৃক মুদ্রিত।



জীবনের আলো

কর্ম কর। নৈর্দর্শ্য ভারতের ধর্ম নহে। নিকামকর্মই ভারতের কাম্য। অরণ কর গীতার বাণী—
নহি কশিৎ কণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ। সূতরাং তুমি কেন অলস হইবে? কেন তুমি মিথ্যাচারী
হইবে? গীতা কি মিথ্যাচারীর সংজ্ঞা নিরূপণ করেন নাই? তুমিও কি তাই হইবে? সবল স্মৃ
কর্মেজিরগুলিকে বাহ্যতঃ নিরুদ্ধ রাখিয়া মনে মনে মন-কলা খাইবে? ধিক তোমাকে। ঋষি বঙ্কিমের বাণী অরণ
কর—“বাহতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি—তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।” তুমি কি
তোমার বলে বলীয়ান? তোমার নিয়ন্তৃশক্তি কি তুমি নিজে? না—ঐ দশভূজা দশপ্রহরণধারিণী মাতৃমূর্তি?
তোমার দশ ইজিরকে মাতৃ নামে অভিষিক্ত করিয়া দশদিকে প্রধাবিত কর। দশভূজা মায়ের স্বর্ণপ্রতিমা ঘরে
ঘরে প্রতিষ্ঠা কর। সাগর ছেঁচিয়া ধনরত্ন সংগ্রহ কর। সবল স্মৃ বাহ দুটা দিয়া মাটি কর্ণণ করিয়া স্বর্ণপ্রস
অননীর নাম সার্থক কর। তবে তো তোমরা মাতৃভক্ত জাতি। ‘কর্ম বন্ধনের হেতু’ ‘কর্ম জ্ঞানের পরিপন্থী’—
এই চিরন্তনী ধারণাকে সমূলে নির্মূল কর। মনে রেখ, কর্ম বাসনাকে মূল করিয়াই শুধু প্রকাশ পায় না,
ভগবদ্ভিষ্কারও ইহা অভিব্যক্তি হইতে পারে। ভগবানের সেই ইচ্ছার অনুসরণ কর—যে ইচ্ছাশক্তিবশে তিনি
জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। জগৎ তাই ভগবানেরই হাতের যন্ত্র—গতিই তাহার ধর্ম। জগতে যতদিন তোমরা
অবস্থান করিবে ততদিন কর্মবিহীন হইয়া থাকিতেই পারিবে না। এই কারণেই কর্মসম্মাস বা কর্মত্যাগ
ভারতের উদ্দেশ্য নহে—অনাসক্ত চিন্তে কর্ম করাই তাহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। “আমি” ও “আমার” বোধই
তোমার সর্বনাশ করে। “কৃষা ঋষিকেশ হৃদিস্থিতেন, যথানিযুক্তোহস্মি”—এই চেতনায় নিয়ত অবস্থান করিয়া
কর্ম করিয়া যাও। মনে রাখিও, কর্মই ব্রহ্ম-সায়ুজ্যের একমাত্র পথ। কর্ম করিতে করিতে স্বথ দুঃখ যাহা
কিছু আসিবে—নির্ভীকার চিন্তে সহ্য করিয়া যাও। কারণ স্বথ দুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্বে নির্ভীকার পুরুষই আপনাকে
জানিতে পারেন; আপনার সত্য পরিচয় পান। তুমিও তাহাই হও। তুমি জান যে, তুমি অমৃতের পুত্র।
তোমার ক্ষয় নাই, অশচয় নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই। তুমি নিত্য পূর্ণ—অমৃতময়। (পুরাতন ‘প্রবর্তক’ হইতে) ॥

সঙ্কটমুক্ত শ্রীমতিলাল

ঋগ্বেদ

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ (প্রথমঃ অষ্টকং । ষট্‌ত্রিংশৎ সূক্তং ।) ঊনবিংশতি ঋক্

(সজ্জবগুরু শ্রীমতিলালের জীবন-ভাষ্য অম্বসরণে)

শ্রীঅনিলবরণ তর্কবেদান্ততীর্থ

নি দ্বামগ্নে মনুর্দধে জ্যোতির্জনায শশ্বতে ।

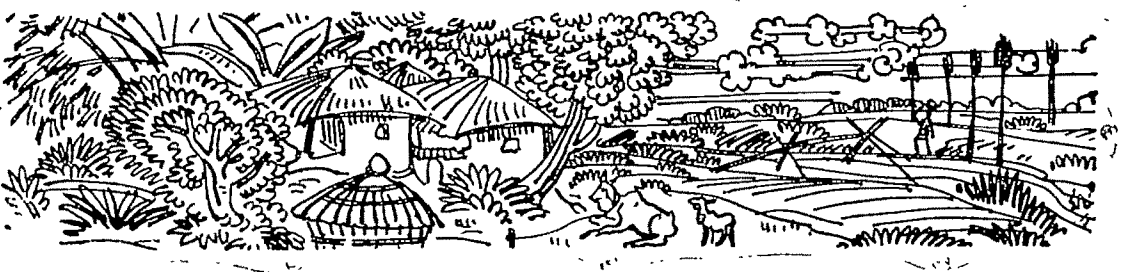
দীদেথ কথ ঋতজাত উক্ষিতো যং নমস্তুস্তি কুষ্ঠয়ঃ ॥ ১৯ ॥

অর্থ—“হে অগ্নি” (হে অগ্নিদেব) “জ্যোতিঃ” (জ্যোতিঃ প্রকাশক) “দ্বাম্” (আপনাকে) “শশ্বতে” (বহু প্রকার অথবা সকল) “জনায” (লোকের জন্ত) “মনুঃ” (প্রজাপতি) “নিদধে” (দেব যজ্ঞ স্থানে স্থাপিত করেন) “ঋতজাতঃ” (অমৃতজাত অর্থাৎ নিমিত্তভূত যজ্ঞোৎপন্ন) “উক্ষিতঃ” (হবির দ্বারা তর্পিত হইয়া) “যং” (যে অগ্নিকে) “কুষ্ঠয়ঃ” (আত্মোৎকর্ষ সাধন সম্পন্ন মনুষ্যগণ) “নমস্তুস্তি” (নমস্কার করেন) [তং—সেই অগ্নি] “কথ” (কথ নামক মহর্ষিঋষকে) “দীদেথ” (দীপ্তিদান করুন) ॥ ১৯ ॥

সরলার্থ—হে অগ্নিদেব ! জ্যোতিঃ প্রকাশক আপনাকে সকল লোকের জন্ত প্রজাপতি মনু দেবযজ্ঞ স্থানে স্থাপন করিয়াছেন । ঋতজাত অর্থাৎ নিমিত্তভূত যজ্ঞোৎপন্ন এবং হবির দ্বারা তর্পিতবান যে অগ্নিকে আত্মোৎকর্ষ সাধনসম্পন্ন মনুষ্যগণ নিয়ত নমস্কার করিয়া থাকেন—সেই অগ্নি কথ নামক মহর্ষিঋষকে দীপ্তি দান করুন ॥ ১৯ ॥

বিশদার্থ—এই যজ্ঞের মন্ত্যার্থ সরল ও সুস্পষ্ট হইলেও “মনুঃ” এবং “কথ” এই পদ দুইটির অর্থ লইয়া মতান্তর দেখা যায় । আচার্য্য সায়ন “মনুঃ” শব্দের অর্থ করিয়াছেন “প্রজাপতি” । অত্রান্ত ভাষ্যকারের মতে “মনুঃ” অর্থে মনু জ্ঞানে এই অর্থে জ্ঞানী মনুষ্যই মনু শব্দের বাচ্যার্থ ।

প্রজাপতি সৃষ্টিকর্তা । তিনি সকল কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন । শুধু সৃষ্টি করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই—প্রত্যেকের কর্মও নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন । সেই হিসাবে আচার্য্য সায়নের অর্থই যুক্তিসঙ্গত । আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার দিক দিয়া মনু অর্থে জ্ঞানী মনুষ্য যে না হইতে পারে, তাহা নহে । কিন্তু যজ্ঞ যখন ক্রিয়ামূলক তখন তাহার স্থল অর্থ অসঙ্গত কেন হইবে ? এই মত্রেই অগ্নিকে “ঋতজাতঃ” বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে । যজ্ঞেন যজ্ঞেন জাত উৎপন্ন যাহা এবং “উক্ষিত” হবিত্তিত্তপিতঃ হবিসমূহ দ্বারা যাহা উৎপন্ন—তাহা বাস্তব । আধ্যাত্মিক জ্ঞান বা অমৃতভূতি এই বাস্তবতার ভিতর দিয়াই লাভ হয় । বাহিরের যজ্ঞাগ্নি অন্তরের সত্যকেই উদ্ভাসিত করিয়া তোলে । তাই যজ্ঞের আরম্ভ কর্ণে এবং পরিণমাপ্তি জ্ঞানে । “কথ” শব্দে দুইজন কথ নামক ঋষিকেই বুঝাইতেছে । একজন মেধ্যাতিথি কথ ঋষি—যিনিই অগ্নির আবিষ্কারক, সূর্য্য রশ্মি হইতে অগ্নিকে মাটির বৃকে তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন । আর একজন এই ষট্‌ত্রিংশৎ সূক্তের উদগাতা ঘোর পুত্র কথ ঋষি । অগ্নি উভয়কেই সমভাবে দীপ্তি দান করুন—ঋষির ইহাই প্রার্থনা ॥ ১৯ ॥



ধ্বনির শ্রেণী বিভাগ

(আনন্দবর্দ্ধনের মতে)

শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী

ধ্বনির স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা ইতঃপূর্বে আলোচনা করিয়াছি।* বর্তমান প্রবন্ধে ধ্বনির বিভাগ প্রদর্শন করিব। কাস্মীর-প্রদেশীয় আচার্য্য আনন্দবর্দ্ধন ধ্বনি-মার্গের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে পরিচিত। তাঁহার পূর্বেও ভারতবর্ষে ধ্বনিতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হইত বটে; কিন্তু তখন সম্ভবতঃ এই বিষয়ে কোন নির্দিষ্ট পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ ছিল না। আচার্য্য আনন্দবর্দ্ধন খ্রীষ্টীয় অষ্টম অথবা নবম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন।

আনন্দবর্দ্ধনের মত

আচার্য্য আনন্দবর্দ্ধন তাঁহার ধ্বন্যালোক গ্রন্থে বলিয়াছেন—ধ্বনির মধ্যে মূলতঃ তিনটি মাত্র শ্রেণী আছে; যথা—(১) বস্তু, (২) অলঙ্কার এবং (৩) রসাদি। তবে তিনি এ কথাও স্বীকার করিয়াছেন যে, উল্লিখিত তিনটি শ্রেণীর প্রত্যেকটি আবার অসংখ্য অবাস্তব শ্রেণীতে বিভক্ত (ক)। রসাদি পদে তিনি যে আদি শব্দটি গ্রহণ করিয়াছেন তাহা দ্বারা ভাব, ভাবান্তর এবং রসান্তর এই তিনটিকেও রস পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহিয়াছেন।

বস্তুধ্বনি—আনন্দবর্দ্ধন বলেন—বস্তুধ্বনিসম্বন্ধেও বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। তবে তিনি নিজে ইহাদের ৫টি মাত্র পৃথক শ্রেণী প্রদর্শন করিয়াছেন; যথা—(১) বিধিক্রম বাচ্যার্থ হইতে নিবেদনরূপ অর্থের প্রতীতি, (২) নিবেদনরূপ বাচ্যার্থ হইতে বিধিক্রম অর্থের প্রকাশ, (৩) বিধিক্রম বাচ্যার্থ হইতে না বিধি না নিবেদন, এইরূপ একটা অর্থের প্রতীতি, (৪) নিবেদনরূপ বাচ্যার্থ হইতে না বিধি না নিবেদন, এইরূপ একটা অর্থের প্রকাশ, এবং (৫) একই বাচ্যার্থ বিভিন্নপ্রকার ব্যাক্যার্থের প্রতীতি।

উপরে যে পাঁচ প্রকার বস্তুধ্বনির কথা বলা হইল, তাহাদের প্রত্যেকের এক একটি উদাহরণও আচার্য্য আনন্দবর্দ্ধন প্রাকৃত-ভাষাময় এক একটি শ্লোকদ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন। পাঠকগণের সুবিধার জন্য আমরা ঐ সকল শ্লোক বা শ্লোকাংশের বঙ্গানুবাদ প্রদর্শন করিতেছি।

(১) বিধিক্রম বাচ্যার্থ হইতে নিবেদনরূপ ধ্বন্যর্থের প্রতীতি; যথা—

“নির্ভয়ে চল হে পাছু, নাহি ভয় আজ;
গোদাবরী তটবাসী দৃষ্ট পশুরাজ
তোমার পথের বিষয় ঘূর্ব্বস্ত বুকুরে
পাঠিয়ে দিবেছে এবে শমনের ঘরে ॥” (খ)

এখানে ‘নির্ভয়ে চল’ এই বিধিবাক্যদ্বারা বস্তুতঃ ‘এদিকে যাইও না’ এইরূপ নিবেদনার্থের প্রতীতি হইতেছে। সিংহের উপস্থিতির উল্লেখই এইরূপ অর্থান্তর-বোধের হেতু।

(২) নিবেদনরূপ বাচ্যার্থ হইতে বিধিক্রম ধ্বন্যর্থের প্রতীতি; যথা—

“শান্তভী ঘুমান হেথা মরার মতন
দিবান্তাগে দেখে রেখো করিয়া যতন।
আমার বিছানা জেনো থাকে এই ভিত্তে,
রাতকানা হে পথিক, পড়ো না ইহাতে ॥” (গ)

এ ক্ষেত্রে বাচ্যার্থ ‘আমার বিছানায় আসিও না’ এইরূপ নিবেদনমূলক; কিন্তু ইহা হইতে “শান্তভীর মরার মত দিবাভাগে না গিয়া আমার বিছানায় আসিও” এইরূপ একটি বিধি ধ্বনিত হইতেছে। শান্তভীর মরার মত ঘুমাইয়া থাকেন—এই অংশটুকু দ্বারা নারিকাতাহার উপপত্যকে সাহস দিতেছে, এবং পথিককে ‘রাতকানা’ বিশেষণে বিশেষিত করিয়া ইঙ্গিতে জানাইতেছে যে,

* প্রবর্তক : চৈত্র ১৩৩৫।

(ক) স হুর্থে বাচ্যসামর্থ্যকিপ্তং বস্তুভাষ্যমলঙ্কারা রসাদিরন্যেত্যেনেক-
প্রভেদ-প্রভিন্নে বর্ণনবিধিতে।—প্রথম উদ্যোত।
তথাঃ দ্বিখ্যাতমেতৎ প্রদর্শিতম্।—ঐ

(খ) ভস্ম ধম্মিষ বীসখো সো হুন ও অজ্ঞ মারিও পেশ
গোলানই-কঙ্ক-কুড়লবাসিণী দরিসরীহেণ ॥

(গ) অস্তা এথ নিমজ্জই এথ অহং দিসসঅং পলোএহি।
মা-পহিঅ রত্তিঅসসস দেজ্জাএ মইন সম্মহিসি ॥

দৈবাৎ ধরা পড়িলে নিজেকে রাতকানা বলিয়া সে রেহাই পাইতে পারিবে।

(৩) বিধিরূপ বাচ্যার্থ হইতে অন্তর্ভুক্তরূপ (না বিধি না নিষেধ এইরূপ) ধ্বংসের প্রতীতি ; যথা—

“যাবে ? যাও ; তার সনে থেকে তুমি সুখে ।

আমিই কেবল হেথা মরি মনোহুঃখে ॥” (ঘ)

স্বামী বিদেশে যাইবেন শুনিয়া নায়িকা ধরিয়া লইয়াছে যে, অল্প কোন প্রণয়িনীর সহিত নির্ঝিল্লি বাস করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি যাইতেছেন। এই অবস্থায় স্বামীর বিদেশগমন তাহার অভিপ্রেত হইতে পারে না ; সুতরাং বিধিরূপ অর্থটি যথাযথরূপে গৃহীত হইতেছে বলিয়া মনে করা চলে না। আবার নিষেধ করিলেও স্বামী শুনিবেন না ইহাও জানা কথা ; সুতরাং বিধার্থ হইতে নিষেধরূপ অর্থের প্রতীতি ও কল্পনা করা যায় না। এইরূপে একটা শৃঙ্গারাত্মক ধ্বনি ‘না বিধি না নিষেধ’ রূপ অর্থে এখানে গৃহীত হইতেছে।

(৪) নিষেধরূপ বাচ্যার্থ হইতে অন্তর্ভুক্তরূপ অর্থের প্রতীতি ; যথা—

“আমার প্রার্থনা এই—যেওনা এখন ।

অভিসারে যাবে এবে প্রণয়িনীগণ ॥

তোমার বদনশশী নাশিয়া আধার,

স্বজিবে তাদের বিয় পথে বার বার ॥” (ঙ)

গৃহাগত নায়িকা যখন অভিমানবশতঃ ফিরিয়া যাইতে চাহিতেছে, তখন তাহাকে আটকাইয়া রাখিবার জন্ত নায়ককর্তৃক উল্লিখিত চাটুবাচ্যটি বলা হইয়াছে। নায়ক-নায়িকার দীর্ঘকাল অবস্থিতিই কামনা করে ; সুতরাং ‘এখন না গিয়া কিছুক্ষণ পরে যাও’ এইরূপ অর্থ এখানে নায়কের অভিপ্রেত হইতে পারে না। আবার, তুমিই একমাত্র অভিসারিকা নও ; তোমার মত আরও বহু অভিসারিকা এখন রাস্তায় আছে ; সুতরাং ফিরিবার সময় তাহারা তোমাকে দেখিয়া ফেলিবে—এইরূপ ইঙ্গিত দ্বারা

নায়িকাকে না পাওয়ার ক্ষম্ভই জীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে। অতএব, এখানে ‘যাও’ এবং ‘এখন যাইও না’ এইরূপ দুইটি অর্থের কোনটিই ধ্বনিত না হইয়া ‘আজ সারারাত্রি আমার এখানেই থাক’ এইরূপ একটা তৃতীয় প্রকার অর্থ ধ্বনিত হইতেছে।

(৫) একই বাচ্যার্থ হইতে বিভিন্ন প্রকার ধ্বনির প্রতীতি ; যথা—

“দেখে যদি ক্ষতচিহ্ন প্রিয়ার অধরে,

কোন্ বুঝা ধরাতলে ক্রোধ নাহি করে ?

তু কেছো যখন পদ না দেখি ভ্রমর,

না শুনি’ নিষেধ মোর, লভ তার ফল ॥” (চ)

কোন নায়িকার অধরে দৃষ্টক্ষত দেখিয়া তাহার স্বামী ক্রুদ্ধ হইলে, উক্ত নায়িকাকে রক্ষা করিবার জন্ত তাহার সখী উল্লিখিত পঙ্ক্তিশুলি বলিয়াছে। কথাগুলি যদিও নায়িকাকে সম্বোধন করিয়াই বলা হইয়াছে ; তথাপি তাহা হইতে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকার ধ্বংসার্থ গ্রহণ করিবে—ইহাই বক্তার অভিপ্রায়।

নায়িকাকর্তৃক গ্রাহ্য ধ্বংসার্থ যথা :—উপপত্তির কৃত দৃষ্টক্ষতটিকে ভ্রমরযুক্ত পদ আঘাত করার ফলে ভ্রমরের দংশনজনিত ক্ষত বলিয়া চালাইতে হইবে।

নায়িকার স্বামী কর্তৃক গ্রাহ্য ধ্বংসার্থ যথা :—নায়িকা কোনরূপ ব্যভিচারে লিপ্ত হয় নাই।

সমীপস্থ উপপত্তিকর্তৃক গ্রাহ্য ধ্বংসার্থ যথা :—এবার তোমার প্রণয়িনীটিকে কোন প্রকারে রক্ষা করা গেল বটে ; কিন্তু ভবিষ্যতের জন্ত সাবধান থাকিও।

অলঙ্কার-ধ্বনি—অলঙ্কারগুলি সংখ্যায় খুব বেশী ; অতএব অলঙ্কাররূপ ধ্বনির মধ্যে পৃথক পৃথক শ্রেণী কল্পনা করিতে গেলে, তাদৃশ শ্রেণীর সংখ্যাও অত্যধিক হইবে—এই কথা ভাবিয়া আনন্দবর্দ্ধন অলঙ্কারধ্বনিগুলির মধ্যে আর পৃথক শ্রেণী-প্রদর্শনে যত্নবান হন নাই। যদিও তিনি অলঙ্কারের সংখ্যা অল্পসারে অলঙ্কার ধ্বনিগুলির শ্রেণীবিভাগ করেন নাই ; তথাপি দ্বিতীয় উদ্যোতে

(ঘ) বচন সহ ক্রিয় একত্রেই হোত নীতিসংগত।

মা তুজ বি ভীষ বিনা দক্ষিণহস্তসু জ্ঞানসু ।

(ঙ) দে আ পসিঅ নিবত্তহ মুহসমিঅোহা বিলুপ্ততমনিবহে ।

অহিসারিঅাং বিপ্লং করাসি অদান বি হ আসে ॥

(চ) কাসন্ ব ন হোই রোসো দট্টুণ পিঅাএ সকাং অহরম্ ।

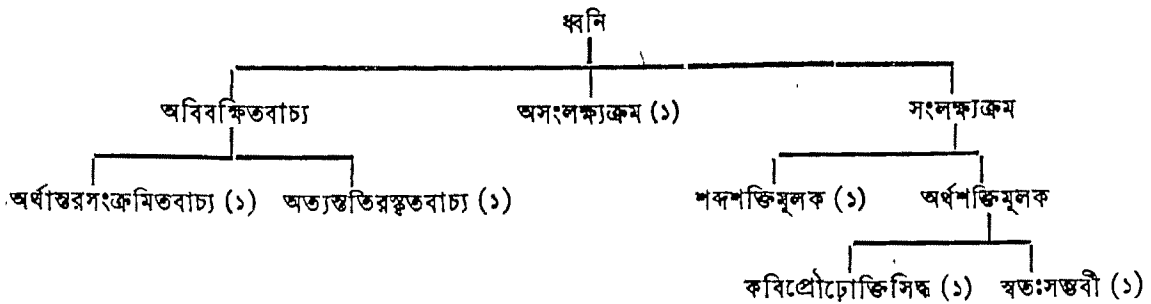
সভমর—পউঙ্গং ঘাইনি বারিঅাসে সহহ এন্নিম্ ॥

বিবক্ষিত বাচ্যধ্বনিগুলির বর্ণনাপ্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রকার অলঙ্কারধ্বনি প্রদর্শন করিয়াছেন।

রসাদি ধ্বনি—রসের সংখ্যা কাহারও মতে ৮, কাহারও মতে ৯ এবং কাহারও বা মতে ১০; সুতরাং উক্ত প্রকার সংখ্যা অনুসারে রসধ্বনিগুলি ৮, ৯ অথবা ১০টি পৃথক্ শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। অবশ্য আনন্দবর্দ্ধন নিজে স্পষ্ট ভাষায় এইরূপ শ্রেণীবিভাগের কথা বলেন নাই। তিনি সমুদয় রসাদিধ্বনিগুলিকে ‘অসংলক্ষ্যক্রম’ নামক একটিমাত্র শ্রেণীতে স্থাপন করিয়াছেন। ভাবধ্বনি, রসাতাসধ্বনি এবং ভাবাতাস-ধ্বনিগুলির উপর কোন গ্রন্থকারই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। তবে এ ক্ষেত্রে বলিয়া রাখা আবশ্যিক যে, ইহারাও বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে।

দ্বিতীয় প্রকার শ্রেণীবিভাগ—ধ্বন্যালোক গ্রন্থের দ্বিতীয় উদ্যোতে আবার অন্ততাবে ধ্বনির বিভাগ প্রদর্শনে গ্রন্থকার প্রয়াসী হইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন—ধ্বনিগুলিকে প্রথমতঃ দুইটি পৃথক্ শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; যথা—(১) অবিবক্ষিত বাচ্য এবং (২) বিবক্ষিত বাচ্য। যেস্থলে কেবলমাত্র ধ্বন্যর্থই আদৃত হয়, বাচ্যার্থ আদৃত হয় না; তাদৃশ ধ্বনির নাম ‘অবিবক্ষিত বাচ্য ধ্বনি’; এবং যে ক্ষেত্রে ধ্বন্যর্থ ও বাচ্যার্থ উভয়েই আদৃত হয়, সেই ধ্বনিকে বলা হয় বিবক্ষিত বাচ্যধ্বনি।

অবিবক্ষিত বাচ্যধ্বনিগুলি আবার দুইটি পৃথক্ শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা—(১) অর্থান্তর সংক্রমিতবাচ্য এবং (২) অত্যন্ততিরস্কৃত বাচ্য। বিবক্ষিত বাচ্য শ্রেণীর ধ্বনি-



গুলিকেও প্রথমতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়; যথা—(১) অসংলক্ষ্যক্রম এবং (২) সংলক্ষ্যক্রম। রস, ভাব, রসাতাস এবং ভাবাতাস ধ্বনিগুলিতে এক একটি ব্যঙ্গার্থ ক্রমরহিতভাবে (সামগ্রিকভাবে) গৃহীত হয় বলিয়া ইহাদিগকে অসংলক্ষ্যক্রম ধ্বনি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতিরিক্ত ধ্বনিগুলির অর্থ প্রতীতির সময় ক্রমে ক্রমে এক একটি অর্থের বোধ হওয়ায় তাহার সংলক্ষ্যক্রম-ধ্বনি নামে কথিত হয়।

সংলক্ষ্যক্রম ধ্বনিগুলিকেও আচার্য্য আনন্দবর্দ্ধন প্রথমতঃ দুইটি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন; যথা—(১) শব্দশক্তিমূলক এবং (২) অর্থশক্তিমূলক, যে স্থলে বাক্যস্থিত শব্দগুলিই নিজেদের সামর্থ্যবশতঃ ধ্বন্যর্থটিকে আকর্ষণ করিয়া আনে, সেই ধ্বনির নাম শব্দশক্তিমূলক ধ্বনি। যে ক্ষেত্রে বাক্যের অর্থ প্রতীতির পর উক্ত অর্থের সাহায্যে ধ্বন্যর্থ আকৃষ্ট হয়, তাহার অর্থ শক্তিমূলক ধ্বনি স্বীকৃত হইয়া থাকে। আনন্দবর্দ্ধনের মতে অলঙ্কারধ্বনি-গুলি শব্দশক্তিমূলক এবং অর্থশক্তিমূলক ভেদে দুই প্রকার হইতে পারে (ছ)।

অর্থশক্তিমূলক ধ্বনিগুলিকেও আচার্য্য আনন্দবর্দ্ধন দুইটি পৃথক্ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন; যথা—(১) কবি-প্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধ এবং (২) স্বতঃসম্ভবী। কবিগণ সকলকেই কতকগুলি অবাস্তব বস্তু বা বিষয়কে বাস্তবরূপে চালাইয়া দিয়াছেন। আমরা সকলেই জানি—প্রোতোজলে পদ্ম থাকে না এবং আকাশের অথবা পাপ, পুণ্য, যশঃ, হাস্ত প্রভৃতির কোন বর্ণ থাকারও সম্ভবপর নহে। কবি-প্রৌঢ়োক্তি অনুসারে নদীতেও পদ্ম থাকিতে পারে, এবং আকাশ ও পাপের বর্ণ কাল; পুণ্য, যশঃ ও হাস্যের রং শাদা। এইভাবে আরও বহু অবাস্তব বিষয় কিস্তি কবি-প্রৌঢ়োক্তিবশতঃ স্বীকৃত হইয়া থাকে। এইরূপ কবি-প্রৌঢ়োক্তির সাহায্যে যে ধ্বন্যর্থ আকৃষ্ট হয়, তাহাই কবিপ্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধ ধ্বনি।

উপরের আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে যে, আনন্দবর্দ্ধনের মতে, শেষোক্ত প্রকারের ধ্বনিগুলি মোট

৬টি পৃথক্ শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—অবিবক্ষিত বাচ্য দুই প্রকার এবং বিবক্ষিত বাচ্য মোট চারি প্রকার।

(ছ) স চাক্ষিকপ্রোহলঙ্কারো বজ্র পুনঃ শব্দান্তরেণাভিহিত স্বরশব্দজ শব্দশক্ত্যুত্তবাহুরনগরূপ ব্যাঙ্গধ্বনি ব্যবহারঃ।—ধ্বন্যালোক, দ্বিতীয় উদ্যোত (২২শ কারিকাব্যাখ্যা)।

ব্যচালঙ্কারব্যতিরিক্তে বহ্নানোহলঙ্কারোহর্থনামার্থাৎ প্রতীয়ারমানোহব-ভাসতে, সৌহর্ষণজ্যুস্তবো নামানুস্থানরূপব্যাঙ্গাদন্যো ধ্বনিঃ।—ঐ, ঐ (২৬তম কারিকাব্যাখ্যা)।



শিল্পীঘন

—শ্রী ব্রজলাল ঘোষ—

(পূর্বাহ্নস্মৃতি : দ্বৈত সংখ্যার পর)

সকাল থেকেই ঠুক ঠুক করে দেবকুমারকে পাথর কাটতে দেখা যায়।

সোমনাথ সকালে গিয়েছিল মণ্ডলেশ্বর, বেলা দ্বিতীয় প্রহরে যখন ফিরলো তখনও দেখে দেবকুমার সেই একই-ভাবে পাথর কাটছে। ছেলেটা তাহলে কাজে মন দিয়েছে।

ঘরের সামনে এসে সোমনাথ থামলো, বললো—কি কাজ হচ্ছে ?

দেবকুমার মুখ না তুলেই জবাব দিল—মূর্তি খোদাই করছি।

—কিসের মূর্তি ?

—শেষ করি তারপর দেখাবো।

কিছু না করার চেয়ে কিছু করা ভালো। কাজ করতে করতেই কাজে মন বসবে। ছেলেটা কাজের হলে মেয়েটার একটা সুরাহা হয়। অনেক দিনের সম্বন্ধ, মেয়েটাকে এখন ওর হাতে সমর্পণ করতে পারলে নিশ্চিন্ত হতে পারে। মাঝে তো দেবকুমারের হাবভাব দেখে সে হতাশ হয়ে পড়েছিল, এবার বৃষ্টি ভগবান মুখ তুলে চাইলেন।

এই ছপ্পর বেলা মণ্ডলেশ্বর থেকে দুইকোশ পথ তেড়ে আসার যে ক্লান্তি সোমনাথের মন থেকে সেই অবসাদ বেন অনেকটা হাল্কা হয়ে গেল। ঘরে ফিরেই সোমনাথ বললো—নিরালো—নিরু, আজ সন্ধ্যাবেলা হরপার্বতীর মন্দিরে আরতির কর্পূর দিয়ে আসিস্।

নিরালো উৎসুক হলো, জিজ্ঞাসা করলো—কেন, কি হলো বাবা, আজ কি ?

—অনেকদিন পূজো দেওয়া হয়নি, আজ মনে উঠলো। দিয়ে আসিস্।

নিরালো বুঝলো কারণ কিছু ঘটেছে, বাবার এই ভক্তি অহেতুক নয়, তবে ছেতুটা পিতা প্রকাশ করতে চান না। নিরালোও আর জ্ঞানতে চাইল না।

পুরো ছুটি দিন দেবকুমারের অবসর ছিল না।

ছপ্পরে নিরালো খাবার এনেছিল, দেবকুমার বলেছে—
রেখে যাও।

নিরালো জিদ করে তাকে খাইয়ে গেছে। দেবকুমার বিশেষ কথা কয়নি, নিজের চিন্তের চিন্তাতেই সে তখন মগ্ন। নিরালো জিজ্ঞাসা করেছিল—আবার কবে নমুনা দিতে হবে ?

—এইটা আগে শেষ করি।

—এবার কি ভজি হবে ?

—সে তখন বলবো।

তাড়াতাড়ি আহার শেষ করে দেবকুমার আবার ছেদনি ও হাতুড়ি নিয়ে বসেছিল। নিরালোও আর কথা বাড়ায় নি।

তৃতীয় দিনে দেবকুমারের কাজ শেষ হলো, বললো—
আজ নতুন নমুনা নোব।

—খোদাই কেমন হলো দেখি ?

—আগে মেজে-ঘষে নিই, তারপর দেখাবো—
ছপ্পরেই দেখবে।

—এখনই একবার দেখি না ?

—না, শিল্পীর কাঁচা কাজ দেখতে নেই। আর ছ-দণ্ডের মধ্যে পাথরখানাকে মেজে ঝুঝুকে করে তুলবো তখন পাকা কাজ দেখাবো।

নিরালাকে তাড়াতাড়ি বিদায় করে দিয়ে দেবকুমার

পাথরখানিকে কাপড় দিয়ে ঘসতে বসলো। তখনকার দিনে জ্বাকড়া জ্বলে ভিজিয়ে পাথরের গায় ঘষে পালিশ তোলা হতো। মেহনত অনেক হতো সত্যি, কিন্তু এইটাই ছিল ভাস্করদের সবচেয়ে সহজ উপায়।

পাথরখানিকে ঝক্‌মকে করে তুলতে দেবকুমারের একটি বেলা কেটে গেল। তা যাক, কিন্তু জিনিসটা এতক্ষণে লোককে দেখাবার মত হলো, এতেই দেবকুমারের সার্থকতা।

নিরালা এসেই বললো—কই, দেখি কেমন চিত্র হলো ?

দেবকুমার সঘন্থে তুলে ধরলো পাথরখানি।

নিরালা নিরীক্ষণ করে দেখলো, তারপর বললো—
বাঃ, বেশ হয়েছে।

—খারাপ হবে কেন ?—দেবকুমার বললো—আমি
পাঁচ বছর বয়স থেকে এই কাজে হাত পাকাছি।

—ওঃ, শুধু তোমার হাতেরই জয়জয়কার, আর
আমি কিছু নই ? আমি না থাকলে ওই ভঙ্গি কোথায়
পেতেন মশাই ?

দেবকুমার আজ বেজায় খুশি, হেসে বললো—সে কথা
একশোবার মানতে হবে।

লাল সামুতে পাথরখানি সঘন্থে জড়িয়ে দেবকুমার
ঘরের কোণে একটি কাঠের তোরঙ্গের মধ্যে রেখে দিল।
তারপর নিরালার পানে তাকিয়ে বললো—সত্যি তোমার
ভাল লেগেছে ?

—কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না ?

—তোমার কোন্‌ কথাটা সত্যি আর কোনটে ব্যঙ্গ,
তা সব সময় বুঝতে পারি না।

—কেন, নিজের উপর বিশ্বাস নেই ?

—বিশ্বাস আছে বলেই তো এ কাজে হাত দিয়েছি,
তবু তোমার ব্যঙ্গ-বিজ্ঞপকে বড় ভয় করে।

—তুমি চাও, সবাই তোমার কাজ দেখবে আর
বাহবা দেবে ?

—ভাল কাজ হলে কেন দেবে না ?

—তা দেয় না গো মশাই। ভালো কাজও সবাই

মুখ ফুটে ভালো বলতে পারে না, ভালোে ঈর্ষা বলে
কোন কথা থাকতো না। শিল্পী নিজেকে যা ভালো মনে
করবে তাই করবে, পরের কথা শুনে চললে তুমি কোন-
দিন শিল্পী হতে পারবে না।

—লোকে মন্দ বললে মনে কষ্ট হয়।

—শিল্পীর জীবন কষ্টেরই জীবন, কষ্ট যদি না সহ্যে
পার তো শিল্পী হতে চেও না। যা দেখে লোকে পছন্দ
করবে, পয়সা দেবে, তাই কর। বাবার মুখে শুনেছি,
অনেক শিল্পী সারাজীবন ভালো করে খেতে পায়নি, শেষ
বয়সে তার দেশজোড়া নাম হয়েছে, রাজার দরবারে তার
ডাক পড়েছে।

এই ধরনের কথা নিরালার মুখ থেকে শোনার
প্রত্যাশা দেবকুমার কোনদিন করেনি ; তার চোখে
বিস্ময় ফুটে ওঠে।

নিরালা হেসে বললো—ওসব বড় বড় কথা এখন
থাক, আজ কোন্‌ ভঙ্গিমার নমুনা দিতে হবে বল ? বাঁট
দেওয়া, বাসন মাজা, রান্না করা, না ঘর নিকানো ?

দেবকুমার হেসে বললো—না, ওর একটাও না।

—তবে ?

—চুল বাঁধার পরে কি আসতে পারে বল দিকি ?

—কী ? আমিতো কিছু ভেবে পাচ্ছি না।

—পারলে না তো, তবে শোনো। চুল বাঁধা হলো
মেয়েদের রূপ-চর্চার একটা দিক। পরপর এই দিকটাই
আমি খোদাই করবো। চুল বাঁধার পর চোখে কাজল
দেওয়া, পায়ে আলতা পরা, হাতে কাঁকন পরা, পায়ে
নুপুর বাঁধা, মুখে শঙ্খচূর্ণ প্রলেপ দেওয়া ইত্যাদি। পরপর
একসারি মূর্তি সাজিয়ে দোব—লোকে দেখবে।

—দেখেই যাবে, দাম দিয়ে কেউ কিনবে না।

—এই তো তুমি বললে, শিল্পী তার নিজের ভাবনা
মত কাজ করবে, পয়সার কথা ভাববে না, এখন আবার
উন্টো সুর গাইছ ?

—ও ভুলে গেছি—বলে নিরালা হাসলো, বললো—
যাক, কথায় কথায় সময় চলে যাচ্ছে, এখন বল আমায়
কি করতে হবে ?

—আজ চোখে কাজল দেওয়ার ভঙ্গি নোব। একটি

মেয়ে চোখে কাজল পড়ছে, এক হাতে দর্পণ আর এক হাতে কাজল-কাঠি।

—একটি মেয়ে, তাহলে আমি নই?—ঠোট উল্টে নিরালা বিরাগের অভিনয় করলো।

প্রতিদিনের দেখা মেয়েটির আজ এই এক নতুন রূপ দেবকুমারের চোখে পড়লো। মেয়েটির মাধুর্য আছে। বললো—নাও, তৈরী হয়ে নাও, আর কথায় কথায় কথা বাড়িও না।

দেবকুমার দর্পণ এগিয়ে দিল।

নিরালা বললো—কাঠি?

একটি কাঠি দেবকুমার হুড়িয়ে রেখেছিল, সেটি দিল। বললো—এবার ঠিকমত দাঁড়াও দিকি?

—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজল পরে নাকি কেউ?

—তাহলে বসো।

—তুমি মেয়েদের সম্পর্কে কিছু জানো না।

—মেয়েদের সঙ্গে তো কখনো ঘর করিনি, কি করে জানবো বল?

—সে তো নিজের দোষ, তোমার বয়সী ক'টা ছেলে এই পল্লীতে আইবুড়ো আছে বলত?

—আজই সন্ধ্যাবেলা খোঁজ নিয়ে এসে বলবো'খন, এখন যা করতে এসেছ তাই কর।

নিরালা বসলো; ডান পা ছড়ালো, বাঁ পায়ের হাঁটু মুড়ে তার উপর বাঁ হাতে ধরলো দর্পণখানি। আর কাঠিটি ডান হাতে ধরলো চোখের সামনে। দেবকুমার একবার দেখে নিয়েই বললো—বাঃ, বেশ হয়েছে।

দেবকুমার পাথরের চক্লার উপর কাঠকয়লার রেখা টানতে বসলো।

পক্ষকালের মধ্যেই কয়েকখানি মূর্তি খোদাই করা সম্পূর্ণ হলো। চুলবাঁধা, কাজলপরা, আনুতাপরা, কাকনপরা ও নুপুরবাঁধা। মূর্তিগুলিতে পালিশ তুলে, পরপর সাজিয়ে রেখে বার বার দেখে আর খুসিতে মন ভরে উঠে। ভাবে জানা-চেনা সবাইকে এনে দেখায়। কিন্তু তখনই আবার সঙ্কোচ জাগে, কে হয়তো দেখে হাসবে, কত বিজ্ঞপ করবে। থাক, দেখিয়ে দরকার

নেই। দেবকুমার নিজেই ছ'চোখ তরে দেখে। যত দেখে, ততো দেখতে ভাল লাগে।

নিরালা সোমনাথকে বলেছিল এই মূর্তির কথা,— কাজটা সত্যি সৌখিন হবে, তুমি দেখে এসো বাবা, তোমার ভাল লাগবে।

সেদিন সোমনাথ দরজায় এসে দাঁড়ালো, বললো—কই, শুনলাম কি সব মূর্তি খোদাই করেছে, দেখি।

দেবকুমার বুকি কৃতার্থ হলো, সাদরে আহ্বান জানালো—আমুন—আমুন। ভিতরে আমুন।

সোমনাথ ঘরে ঢুকলো।

মূর্তিগুলি পরপর দেয়ালের গায় সাজানো ছিল। চুকেই চোখ পড়লো। সোমনাথ উবু হয়ে বসে একখানির পর একখানি পাথরের চকলা হাতে তুলে নিয়ে দেখতে স্তব্ধ করলো। নিরীক্ষণ করে দেখলো। নাঃ, কাজের কোথাও গলদ নেই। প্রতিটি খোদাইয়ে নিপুণ কারু-কৌশলের পরিচয় রয়েছে। মন প্রশস্ত হলো, বললো—বেশ, স্বস্তি সৌখিন কাজ হয়েছে, পাকা হাতের—পরিচয়।

—আপনার ভালো লেগেছে?—দেবকুমার প্রশ্ন করলো।

—ভালো কাজ ভালো লাগবে না? তবে এ কাজের দাম দেবে কে? তুমি এগুলি নিয়ে কাল একবার যেও না মণ্ডলেশ্বরে, নরোত্তমদেবকে দেখিয়ে এসো, কি বলেন দেখে। এসব জিনিষের কদর তো ওরাই করবে, এ জিনিষ তো আর সাধারণ যাত্রীদের জন্ত নয়। কালই যেও, নজরে পড়লে কপাল ফিরে যেতে পারে।

সোমনাথের কাছ থেকে এতটা উৎসাহ পাবার আসা দেবকুমার করেনি, মাথাটা এক পাশে অনেকখানি হেলিয়ে বললো—আপনি যখন বলছেন, অবশ্যই যাবো। কাল তোরেই বেরিয়ে পড়বো।

যোগিনীঘাট থেকে মণ্ডলেশ্বর মাজ ছ'কোশ পথ। আজকের দিনে এই ছ'কোশ পথ পল্লীবহুল হলেও তেরোশো বছর আগে সপ্তম শতকে এই অঞ্চল বৃক্ষবহুল বনভূমি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তবে সেই বনভূমির

ভিতর দিবে প্রশস্ত পথ ছিল। এরং এই হ' ফ্রোশের মধ্যে বারোটি বড় ইঁদারা ছিল। এরং সেই ইঁদারা থেকে বিনা আরাসে জল তোলার জন্ত পাশে রজ্জুসহ টেকিময় লাগানো ছিল। আর ইঁদারার পাশেই ছিল এক একটি প্রশস্ত হাউনি। শতাব্দিক পথিক সেই হাউনির নীচে রোদ ও বৃষ্টি থেকে আশ্রয়লা করতে পারতো। এ কীর্তি সম্রাট প্রিয়দর্শী অশোকের। মৌর্যদের পরে কুষাণরাজ কণিক, তারপর গুপ্তরাজারা এই পথকে সুশৃঙ্খল করেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্য বছরে একবার এই পথে মগধ থেকে উজ্জয়িনী যেতেন, মণ্ডলেশ্বর মহানায়কের তখন একটা প্রধান কর্ম ছিল এই পথের তদারক করা। গুপ্ত রাজাদের সে প্রতাপ হুণ আক্রমণে লুপ্ত হলে। মগধ থেকে হ'মাসের জন্ত উজ্জয়িনীতে গিয়ে দয়্যবার বমানোর আর প্রয়োজন বৈল না। মহানায়করাও পথের যত্ন নেওয়া ছেড়ে দিলেন। কিন্তু পথের প্রতীকায় তো পথিক বসে থাকে না, হিন্দুরা আসে চৌর্যদ্রি যোগিনী দেখতে, বৌদ্ধরা যায় লঙ্কায়ী (সাঁচী) দেখতে আর শ্রেষ্ঠরা ছোটো টাকা কুড়াতে। এইটাই সোজা পথ। এই পথ তাই সংস্কারের অপেক্ষা রাখে না, অবিরত মাহুষের যাওয়া আসায় এই পথ সজ্জ হইয়া আছে।

মধ্য ভারতের এই অঞ্চল পাথুরে জায়গা। এমন বিস্তীর্ণ সমতল পাথুরে জায়গা উত্তরাপথে আর কোথাও নেই। প্রয়াগের দিকে যদি বা মাঝে মাঝে হ' একটি টিলা দেখা যায়, বিদিশার দিকে তাও নেই। যোগিনীঘাট থেকে হ' ফ্রোশ পশ্চিমে পরপর কয়েকটি টিলা পার হলে ছোট একটি পাহাড়, এই পাহাড়ের উপরেই মণ্ডলগড়। পাহাড় দিয়ে ঘেরা খানিকটা সমতল মাঠ। একপাশে একটি ছোট পুষ্করিণী আর তারই পাড়ে কয়েকখানি ছোট বাড়ী ও একটি দোতলা পাথুরে প্রাসাদ। এই প্রাসাদেই এই অঞ্চলের শাসনকর্তা উপারিক থাকেন। মৌর্যদের শাসনে এই শাসকদের বসতো 'রাজক', গুপ্তরাজারা নতুন নামকরণ করেছেন 'উপারিক'। মণ্ডলগড়ের উপারিক বর্তমানে রাজা নরোত্তমদের মণ্ডলেশ্বর। দিখিজয়ী সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত উত্তর ও দক্ষিণ

ভারতের সাতাশ জন রাজা ও উপজাতি নায়ককে জয় করে বারাগনীতে অশমেধ যজ্ঞের অহুষ্ঠান করেছিলেন। যজ্ঞশেষে যাজকদের তিনি কিছু কিছু ভূমি দান করেন। প্রয়াগের পশ্চিমে এই আটরিক অঞ্চল তখন অরাজক ছিল, এই অঞ্চলই তিনি সেইসব যাজক গোষ্ঠীকে প্রতিষ্ঠিত করে দেন, মাঝে মাঝে পথের পাশে কয়েকটি গড়ও তিনি নির্মাণ করিয়ে দিয়েছিলেন। পরে সেই সব অঞ্চলে ছোট ছোট জনপদ পড়ে ওঠে। সাধারণ পথিকদের গমনাগমনের সুবিধা হয়। দীর্ঘ বনভূমির বিস্তার আর শঙ্কার কারণ থাকে না। সেই থেকে এই অঞ্চলের সামগ্রিক নাম হয় যাজকভূমি। নবোত্তমদেব সেই যাজক গোষ্ঠীরই এক বংশধর। তাঁর পূর্বপুরুষ একসময় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু কয়েক পুরুষ শাসন কার্যে নিযুক্ত থাকার ফলে, এরা এখন শাস্ত্র ছেড়ে শাস্ত্রবিদ্যাই বেশি রোবেন। যাজক ভূমির উপারিকগণ জাতিতে ব্রাহ্মণ হলেও মানস ও আচরণে ক্ষত্রিয়। সকাল সন্ধ্যা তাঁরা সভায় বসেন, পণ্ডিত-পারিদদের সঙ্গে কূটনীতির চর্চা করেন, এবং মগধ সম্রাটের প্রয়োজনে হ' চারশো সেনা নিয়ে পাটলিপুত্রের রাজদরবারে উপস্থিত হন। যুদ্ধ জয় হলে উপটৌকন নিয়ে ফিরে আসেন, আর যুদ্ধে নিহত হলে মগধের ভয়দূত সংবাদ নিয়ে আসে আর নিয়ে আসে জ্যেষ্ঠপুত্রের উপারিক হবার অমুজ্জা। এইভাবেই দীর্ঘকাল চলেছে। এখন সম্রাটের সে গৌরব নেই, হুণরা রাজশক্তিকে রিপূর্বক করে দিয়েছে, তাই যুদ্ধ-বিগ্রহের সংবাদ আর থাকে না। বহুস্তর ক্ষেত্রে শৌর্যচর্চার সুযোগ না থাকায় এই অঞ্চলে উপারিকগণ এখন পরস্পরের মধ্যে কূটনীতির চর্চায় তৎপর হয়ে উঠেছেন। প্রত্যেকে নিজেকে অপরের আদর্শ বলে মনে করছেন, আর পার্শ্বদরাতাতে ইচ্ছা যুগিয়ে যাচ্ছে। মণ্ডলগড়ের প্রারম্ভিক অবস্থা চলছে এই অঞ্চলে। এতদিন হস্তো হুদশটা যুদ্ধবিগ্রহ ঘটে যেতো, কিন্তু সকলেই এক গোষ্ঠীভুক্ত হওয়ায় ও অনেক ক্ষেত্রে বৈবাহিক সম্পর্ক বর্তমান থাকায় বাহ্যিক হুতা পরিহার করে কেউ কারও প্রত্যক্ষ শত্রু হুমিকায় নামতে রাজী হননি।

তাই অন্তরে যত বিরাগই থাক্ যাজ্ঞকভুক্তিতে শান্তি
ক্ষুধ হয়নি।

ইতিমধ্যে গুপ্তবংশের উপরাজা মালবের রাজপ্রমুখ
দেবগুপ্ত যাজ্ঞকভুক্তির দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। যাজ্ঞকভুক্তির
উপারিকদের কাছে তিনি দূত পাঠিয়েছেন, দূত এসে
আজ্ঞান জানিয়েছে—মগধের গুপ্ত সম্রাট বংশের বর্তমান
কুলতিলক মালবরাজ দেবগুপ্ত স্বীয় পরাক্রমে গুপ্তবংশের
পূর্বগৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছেন।
আপনারা সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের যাজ্ঞকগোষ্ঠী, আপনাদের
পূর্বপুরুষ দশাশ্বমেধ যজ্ঞের হোতা ছিলেন, সেই কথা
স্মরণ করে মালবরাজ জয়যাত্রার পূর্বাঙ্কে আপনাদের
আশীর্বাদ ভিক্ষা করেছেন। আপনারা মালবের রাজসভায়
গিয়ে মহারাজকে শুভাশীষ দান করবেন—মহারাজ সেই
আশা করছেন। আপনাদের নিজ নিজ বাহিনীও সঙ্গে
নেবেন। জয়যাত্রায় আপনাদের বাহিনী মালবরাজের
সহযোগী হলে, তিনি নিজেই কৃতার্থ গণ্য করবেন এবং
সাক্ষ্যল্যাভে কৃতনিশ্চয় হবেন।

মালবের উপারিক সমগ্র যাজ্ঞকভুক্তির অধিকর্তা।
তার নিজের অধীনে দশহাজার অশ্বারোহী ও দশহাজার
তীরন্দাজ আছে। সম্ভ্রতি গুপ্তসম্রাটদের প্রাধান্ত থেকে
মুক্ত হয়ে দেবগুপ্ত সৈন্যসংখ্যা আরো বৃদ্ধি করেছেন।
এই শক্তিমান রাজপ্রমুখের আমন্ত্রণ উপেক্ষা করার স্পর্ধা
যাজ্ঞকভুক্তির কোন নায়কেরই ছিল না। নরোত্তম-
দেবও যাত্রার জন্ত প্রস্তুত হলেন। অনেক কাল যুদ্ধ
করেননি, হুণদের আক্রমণ সম্ভাবনায় একবার যুদ্ধের
তোড়জোর হয়েছিল বটে, কিন্তু হুণরা এদিকে আসেনি।
দীর্ঘ জীবন আরামে কাটাবার পর এখন যুদ্ধের কথা
ভাবলে মনে বিরক্তি জাগে, কিন্তু নিরুপায়। দেবগুপ্তের
আমন্ত্রণ উপেক্ষা করলে, বিপদ ডেকে আনা হবে। কবে
একদল ঘোড়-সওয়ার এসে হুকুম জারী করবে—রাজ্য
ছাড়ো! সে অপমানের চেয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করা অনেক
ভালো। দেবগুপ্ত তাই বরকন্দাজদের তৈরী হবার
জন্ত নির্দেশ দিয়েছিলেন।

কতদিন বাইরে থাকতে হবে ঠিক নেই, অস্থদেহে
আর কিরতে পারবেন কিনা তাও অনিশ্চিত। আর

যত্ন ঘটলে তো ক্ষুরিয়েই গেল। বৈষয়িক ব্যাপারের
সব ঠিকমত বন্দোবস্ত করে যেতে হবে। বিশ্বস্ত
কয়েকজনকে এমন সব কর্মভার দিয়ে যেতে হবে যারা
তার অনভিজ্ঞ স্ত্রীপুত্রকে কোন সময়েই বঞ্চনা করবে না।
কয়েকজন প্রবীণ শুভাকাজক্ষীর সঙ্গে নরোত্তমদেব সেই
পরামর্শই করছেন। সভারস্ত্রেই অস্থিততার অজুহাতে
সাধারণ পার্শ্ব ও বয়স্কদের আজ তিনি বিদায় করে
দিয়েছেন। গস্তীরভাবে বিষয়গত আলোচনা চলছে।

সভার মাঝে দেবকুমার এসে প্রণাম করলো।

নরোত্তম বিরক্ত হলেন, কিন্তু সকালের সভায়
সকলেরই প্রবেশ অব্যাহত।

গড়গড়ার নলটায় একটা স্মৃতিচিহ্ন দিয়ে একমুখ ধোঁয়া
ছেড়ে নরোত্তমদেব বললেন—কে তুমি? কি চাও?

—আমি যোগিনীবাটের জনার্দন ভাস্করের পুত্র
দেবকুমার ভাস্কর। আপনাকে কিছু শিল্পকর্ম দেখাতে
এনেছি।

—যোগিনীবাটের ভাস্কর?—নরোত্তমদেব পাশে
উপবিষ্ট শ্রেষ্ঠী কুশধ্বজের পানে তাকালেন।

কুশধ্বজ মাথা নেড়ে বললেন—হ্যাঁ, একে আমি চিনি,
আমার পুত্র নীলধ্বজের বন্ধু।

দেবকুমার কুশধ্বজকে প্রণাম করলো।

কুশধ্বজ হেসে বললেন—কই, কি এনেছ দেখি?

নরোত্তম বললেন—পরে দেখলে হতো না?

কুশধ্বজ বললেন—দেখাতে এসেছে, দেখুন না।
আবার তো আপনি দু'দিন পরে চলে যাচ্ছেন। বেচারী
অনেক আশা নিয়ে কতদূর থেকে এসেছে, নিরাশ
করি কেন?

নরোত্তমের আসরে কুশধ্বজের বিশেষ প্রতিপত্তি
ছিল। পয়সাওয়ালা সদাগর কুশধ্বজ সময়-অসময়ে
নরোত্তমদেবকে ধন দিয়ে সাহায্য করতেন, এবং সেই ধন
পরিশোধের প্রত্যাশা রাখতেন না। টাকা দিয়ে নরোত্তম-
দেবকে তিনি কিনে রেখেছিলেন বলা চলে।

দেবকুমার জাজিমের উপর বসে পড়লো, তারপর
লাল সালুর আবরণ খুলে পর পর কয়েকখানি
দ্ব্যপাথরের চকলা বের করে সামনে রাখলো।

তারপর পাঁচখানি পাথর একই সারিতে সাজিয়ে দিল
মণ্ডলেশ্বরের সামনে।

নরোত্তমদেব পাথরগুলির উপর একবার চোখ বুলিয়ে
গেলেন, শিল্পকর্ম তিনি বুঝতেন না, বললেন—শেঠজী
আপনিই দেখুন।

কুশধ্বজ এক একখানি পাথর হাতে তুলে দেখতে
লাগলেন।

কুশধ্বজ দেখেন আর দেবকুমার তার পরিচয় বলে
দেয়—কেশচর্চা, কঙ্কল-রঞ্জন, কঙ্কণ-ধারণ, নৃপুর-বন্ধন,
অলঙ্ক-অঙ্কন।

শেঠী বললেন—ভালই হয়েছে। তরুণ শিল্পীর পক্ষে
প্রসংসার্য।

পাশেই ছিলেন পঞ্চক আচার্য—বিদূষক বলে তাঁর
খ্যাতি ছিল। তিনিও দেখছিলেন। দেখা শেষ করে
বললেন—দেবদেবীর মূর্তি কিছু করনি?

—না।

—যে বয়সের যা, এ-ই এখন তোমার কাছে দেবী-
মূর্তি। এই বয়সেই তো শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার পদসেবা
করেছিলেন।

নরোত্তমদেব ও অত্মেরা হেসে উঠলো।

পঞ্চক বললেন—একজন প্রবীণ শিল্পী হলে একটা
নটরাজ কি সরস্বতী মূর্তি দেখাতে আনতো, নবীন শিল্পী
এনেছে তরুণীর চুলবাঁধা, কাজলপরা, নৃপুর বাঁধা, কঁকন
হাতে, আলতা পরা—তা এই মেয়েটি কে?

সে যুগের মানুষ সহজে মিথ্যা বলতো না। দেবকুমার
ঘুরিয়ে বললো—বিশেষ কেউ নয়।

—ওঃ কল্পনা!—পঞ্চক বললো—এই বয়সেই কল্পনায়
মেয়েরা এমনই স্নানরী হয় বটে। বিয়ে-থা করার
কিছুদিন পরে যখন ওদের রসনার ধার কান ঝালাপালা
করে দেবে, তখন আর এই কল্পনা থাকবে না, তখন
ভাস্করের ছেলে পাথরের থালা বাটি কুঁদতে বসবে।
আর এই সব চিত্র মাথায় আসবে না।

কুশধ্বজ বললেন—যাই হোক, মূর্তিগুলি কিন্তু হয়েছে
নিখুঁত।

পঞ্চক বললো—এই বয়সে মেয়েদের মূর্তি নিখুঁতই

হয়। খুঁৎ দেখার মত নজর তো এখনও হয়নি। এর
খুঁৎ যে কোথায় তা আমরা জানি। এই যে মেয়েটিকে
চুল বাঁধার জন্ত বসিয়েছে ঠিক এভাবে বসে মেয়েরা চুল
বাঁধে না। এমনভাবে চুলের নীচে আঁচল ছড়ানো থাকে
না। তাছাড়া ভালোভাবে চুল বাঁধতে হলেই আরেক-
জন বেঁধে দেয়, নিজের চুল মেয়েরা ভালভাবে বাঁধতেই
পারে না। তারপর এই কাজলপরা, হাতের কাঠিটা
দেখ, যেন দাঁতন-কাঠি। কঁকনের ব্যাপারটাও তাই,
কঁকন কেউ নিজে পরে না, পরিয়ে দেওয়া হয়? নৃপুর
বাঁধার সময় মেয়েরা কি হাঁটু অবধি কাপড় গুটায় নাকি?
আর আলতা পরার সময় পায়ের গোছ অবধি যদি কাপড়
থাকে তাহলে কাপড়ে আলতা লাগবে না? এসব
কল্পনার মানুষ, ভাবরাজ্যের ভঙ্গিমা বাস্তবের সঙ্গে মেলে
না। এইগুলোই তো সবচেয়ে বড় খুঁৎ। তেমনভাবে
দেখলে আরো অনেক খুঁৎ বের করা যায়।

দেবকুমার আর চুপ করে থাকতে পারলো না,
মৃদুকণ্ঠে বললো—বাবা বলতেন শিল্পকর্মে কিছুটা
কল্পনার স্থান থাকে। স্বয়ং প্রকাশ করাই শিল্পের প্রধান
বস্তু। কারুকাজ স্নিগ্ধ হয়েছে কিনা সেইটুকুই বিচার
করতে হয়।

পঞ্চক তখনই বললেন—যখন বাস্তব জীবনকে ফুটিয়ে
তুলতে চেষ্টা তখন বাস্তবতার দিক থেকেই তা বিচার
করবো। কল্পিত দেবদেবীর মূর্তি হলে কল্পনার সৌকার্য
বিবেচনা করতাম। তুমি একটা নটরাজ মূর্তি খোদাই
করে আনো, তখন নটরাজ ভান পায়ে দাঁড়িয়ে আছেন
কি বা পায়ে দাঁড়িয়ে আছেন, সে কথা আর উঠবে না।

—আর পাঁচজন যা করে গেছেন, আমি তা করতে
চাই না, তাই নতুন কিছু রূপ দেবার চেষ্টা করেছি।

—নতুনটা কি? এই নারীমূর্তি? সেই কালিদাসের
কাল থেকে কবি আর শিল্পীরা নারীর রূপ নিয়ে
মাতামাতি করে আসছেন, তুমি আর একবার তাই
তোমার শিল্পকর্মে ফুটিয়েছ মাত্র।

দেবকুমার ক্ষুব্ধ হলো, অনেক কঠিন কথা তার মুখে
এলো, কিন্তু মণ্ডলেশ্বরের সত্যার মাঝে কোন রূঢ় কথা
বলা শোভন নয় বলে সে চুপ করে রইল।

দেবকুমারকে চুপ করে থাকতে দেখে পঞ্চক আবার বললেন—মুকুন্দস্বামীর সুরে বললেন—এই সব মূর্তি যে খোদাই করেছে বাপু, এ শুধু খেরাল চরিতার্থ করা ছাড়া আর কিছুই নয়। এসব চিত্র কোন কৰ্মে লাগবে? এর চেয়ে যদি দুটো ফুলপাতার আল্পনা খোদাই করতে তাঁও কাজে লাগতো। হরপার্বতীর মন্দিরের নাটমণ্ডপ করার কথার কথা হচ্ছে তাতে। নাহয় তোমার ছুঁচাখানা পিঠিরের স্থান দেওয়া যেতো।

তার কাঙ্ক্ষিত বৌ শুধু খেরাল নয়, এই কথাটা বুঝিয়ে বলার জন্য দেবকুমার আবার মুহুর্তে বললো—চৌষটি বৌগিনী মন্দির আমি আগাগোড়া দেখেছি, দিনের পর দিন ধরে খুব ভালো করে দেখেছি। তার দেয়ালে দেয়ালে বহু ভাবের বহু মূর্তি আছে। কিন্তু দেবদেবীর পরেই আছে পশুপাখীর চিত্র, নয়তো ফুলপাতার আল্পনা, মানুষের মূর্তি কোথাও নেই। দেবতার পরেই কি জানোয়ার, পাখী আর ফুলপাতা? মানুষ কোথায় গেল? মন্দিরের গায় কি মানুষের মূর্তি থাকবে না কি? কেন থাকবে না? কিরকম মূর্তি থাকবে শুনি?

—মানুষের জীবনযাত্রার চিত্র।

আচার্য্য হেসে বললেন—যেমন এই সর এঁকেছে? পবিত্র হাট গায়ে পান। মেখে দেবকুমার বললো—জানোয়ারের চিত্র যদি মন্দিরের গায় থাকতে পারে তাহলে মানুষের গড়া মন্দিরে মানুষের চিত্র থাকবে না কেন? এষড়ী হুবোধ্য। —মানুষের মত মানুষ হলে নিশ্চয়ই থাকবে। রামাষণ মহাভারতের চিত্র তো রয়েছে।

—সেইকারণ মানুষ তো দেবতার মত। ত্রিকাক্ষী রামচন্দ্রকে তো অমুরাণের ত্যাগ বলা পুজো করি। আমি সাধারণ মানুষের কথা বলছি। ঠিক সাধারণ মানুষের কথা বলছি না, ফুলি বুলি হুন্দরী মেয়ে মানুষের কথা। তোমরা চাও এই সব চিত্র মন্দিরের দেয়ালে খোদাই করা থাকবে। পঞ্চকের কথার সুরে সবাই কারাঠোটের কোণে ঝাঁক হাসি ফুটলো।

দেবকুমার বললো—মেয়ে কেন? পুরুষের ছবিও আমরা খোদাই করতে পারি।

পঞ্চক বললেন—যথার্থ। —চাষী লাঙল ঠেলেছে, কাঠুরী কাঠ কাটছে, বাতাওয়ালা মকাই ভাঙছে, সৈনিক লড়াই করছে, এই ধরনের অনেক বস্তু আছে।

—এসব তো সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি ঘাটে ঘাটে সন্ধ্যা চোখে পড়ছে, এজ্ঞ কষ্ট করে আর পাথর খোদাই করার দরকার কি?

—চোখ মেললে কি হাতী, হরিণ, বরাহ, বুঘ, হাঁস, ময়ূর দেখা যায় না? তাহলে সেসব চিত্র মন্দিরের গায় খোদাই করা থাকে কেন?

—তার কারণ পশুও পাখীর মধ্যে পাপ নেই, তারা সরল ও সহজ। তাছাড়া বুঘ শিবের বাহন, সিংহ পার্বতীর বাহন, হস্তী ইন্দ্রের বাহন, হংস সরস্বতীর, পৈচালক্ষ্মীর, ময়ূর কার্তিকের। এই সব পশুপাখী এক একটি দৈবতাবের প্রতীক। বিড়াল ও কুকুর কেউ এঁকেছে? কাক কি শূন্য কোথাও দেখেছে? কিন্তু পাপ ছাড়া মানুষ নেই, তাই পাপীর চিত্র দেবস্থানে থাকতে পারে না।

দেবকুমার বললো—পাপ পুণ্যের হিসাব আমি জানি না। তবে সবার উপরেই দেবতার কৃপা আছে বলে আমি মনে করি। এজগতের যা কিছু সুন্দর তা দেবতারই দান, তাই শিব, তাই সত্য। বা কুৎসিত তাই পাপ। পশুপাখীর মধ্যে যদি সৌন্দর্য থাকে তাহলে মানুষের মধ্যেও সৌন্দর্য আছে। সেই সৌন্দর্য যদি ফুটিয়ে তোলা না হয় তাহলে শিল্পকর্মে একটা মন্ত ফাঁক থেকে যায়। তোমাদের বোঝানো কঠিন—পঞ্চক বললেন—

আমি সেটা চেষ্টা করবো না। শুধু বলবো পূর্বপুরুষেরা যা করেছেন, আমরা তা করতে পারি না। করবোও না। মণ্ডলেশ্বর নরোত্তমদেব মাথা ফুলিয়ে সেই কথার সমর্থন জানানালেন।

সভার আবহাওয়া উষ্ণ হয়ে উঠছে দেখে, শ্রেষ্ঠ কৃশধ্বজ বললেন—বৌগিনীঘাটের হরপার্বতী মন্দিরে এক নাটমণ্ডপ করার ইচ্ছা আছে। তুমি ইতিমধ্যে কয়েকটা দেবদেবীর মূর্তি খোদাই করে আমাদের দেখিও তো।

নাটমণ্ডপের তিতের গায় আমি দেবদেবীর মূর্তি সাজাবো। এই নারীমূর্তি এখন কিছুদিনের মত স্থগিত রাখো, সকলে তো এসব আবার পছন্দ করে না।

পুত্রের খেলার সাথী স্নদর্শন এই তরুণ শিল্পীর প্রতি কৃষ্ণবজ্রের স্নেহজাত দুর্বলতা একটু ছিল, তিনি তাই দেবকুমারকে একটু সাহায্য দিতে চাইলেন।

নরোত্তমদেব এবার গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—সেই ভালো, শেঠজী যখন ঘরের পাশেই আছেন, দেবদেবীর মূর্তি খোদাই করে ওঁকেই দেখিও। আমার বর্তমানে এসবের কোন প্রয়োজন নেই। 'বৃথা হু' ক্রোশ পথ কেন অতিক্রম করে আসবে। তার পর শেঠজী, আমরা যে কথা বলছিলাম—

নরোত্তমদেব কৃষ্ণবজ্রের মুখের পানে তাকালেন।

দেবকুমার লাল মানুষে পাথরগুলি জড়িয়ে নিয়ে, প্রণাম করে বেরিয়ে এলো।

পঞ্চক বললো—গোষ্ঠীপতি জনার্দন ভাস্করের ছেলেটা শেষ অবধি মেয়েমানুষের চিত্র খোদাই করে দেখাতে আনলো এখানে? ছেলেটা এবার অধঃপাতে গেল। জনার্দনের কর্তব্য ছিল অনেক আগেই এই ছেলের বিয়ে দিয়ে যাওয়া।

—বিবাহ ত ঠিক করাই আছে—কৃষ্ণবজ্র বললো—জনার্দন পাত্রী পছন্দ করে গেছে—সোমনাথ ভাস্করের কন্যা নিরাল।। এতদিনে তো বিয়ে হয়ে যাবার কথা, শুধু ছেলেটার এই ধরনের মতিগতি দেখে সোমনাথ দিন পিছিয়েছে। সোমনাথের ভয়, এই ধরনের কাজ করে ছোকরা কি করে অন্ন-সংস্থান করবে।

—এতো স্বাভাবিক।

নরোত্তমদেব এবার অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন, বললেন—আচার্য কি পূজাপাঠ ছেড়ে ঘটকালি করবেন বলে মনস্থ করেছেন? কোথায় কার বিয়ে হোক বা না-হোক তাতে আপনার কী?

পঞ্চক আচার্য অপ্রতিভ হলো।

কৃষ্ণবজ্র এবার দেবমণ্ডপের আমন্ত্রণের কথা তুললেন, বললেন—মণ্ডলেশ্বর তো রাজদর্শনে উজ্জয়িনী যাচ্ছেন, কি ভেট দেবেন? বৃক্ষযাত্রার ব্যাপার—অথ, রথ, অস্ত্র ভেট দিতে পারলেই ভালো হয়। বিকল্পে অর্থ দেওয়া চলে।

মণ্ডলেশ্বর বললেন আমি অর্থই দেব। আর কিছু দেবার সুবিধা তো আমার হবে না।

কৃষ্ণবজ্র বললেন—অস্তুতঃ সহস্র মুদ্রা তো দিতে হবে। এই ভেটের উপরেই সেখানে মর্যাদা।

—সে ব্যবস্থা তুমি করবে।

—সে অস্ত্র আপনার চিন্তার কোন কারণ নেই। কিন্তু এবার আমি আপনার কাছ থেকে কিছু অমূল্যের প্রত্যাশা করি।

—কি চান?

—যোগিনীঘাটের সদাগরী পথ-করটা আদায়ের ভার আপনি আমার উপর দিন।

—তাতে কি লাভ করবেন? খাজনাটা তো আমাকে দিতে হবে। সামান্য কিছু উদ্বৃত্ত থাকবে মাত্র।

—কিন্তু মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি পাবে।

—বেশ, তাই নেবেন।

(ক্রেমশঃ)



বঙ্কিম-বান্ধব অক্ষয়চন্দ্র

শ্রী অক্ষয়চন্দ্র সরকার

। ভিন ।

অক্ষয়চন্দ্র ১৮৬৮ সালে বহরমপুরে ওকালতী করিতে যান। তখন বহরমপুর বিশ্বম্ভরনগরী দ্বারা পূর্ণ ছিল। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডক্টর রামদাস সেনের বাড়ী বহরমপুর। তখন বঙ্গভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব-প্রণেতা পণ্ডিত রামগতি স্মায়রত্ন বহরমপুর কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক, বাঙ্গালার ইতিহাস-লেখক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় উকীল, প্রসিদ্ধ ব্যাকরণকার লোহারাম শিরোমণি নর্মাল স্কুলের অধ্যক্ষ, সুসাহিত্যিক গঙ্গাচরণ সরকার মুন্সেফ, দীনবন্ধু মিত্র পোষ্টাল ইন্সপেক্টর এবং বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট।

অক্ষয়চন্দ্র লিখিতেছেন :

‘মধ্যবর্তিনী ভাষা-প্রচারের সূচনা হইতেই বঙ্গদর্শন-প্রচারের সূচনা আরম্ভ হইল। কতদিন কত জল্পনা চলিতে লাগিল। শেষে কয়েকজন লেখকের নাম দিয়া ভবানীপুরের ষ্ট্যান ব্রজমোহন বসু প্রকাশকরূপে বঙ্কিম-বাবু “বঙ্গদর্শন”-এর বিজ্ঞাপন প্রচারিত করিলেন। লেখক-গণের নাম বাহির হইল—“সম্পাদক—শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, লেখকগণ—শ্রীদীনবন্ধু মিত্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশনাথ রায়, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, রামদাস সেন এবং অক্ষয়চন্দ্র সরকার। আর সকলে নামজাদা, আমিই কেবল নামহীন, অথচ আমার নাম ছাপা হইল। ইংরেজি, সংস্কৃত, বাঙ্গালা—নানা পুস্তক খাটিয়া আমি “উদ্দীপনা” প্রবন্ধ প্রণয়ন করিলাম। বঙ্কিমবাবু বড় খুসি।”

এই ‘উদ্দীপনা’-শীর্ষক সমাজ-সমালোচনা-বিষয়ক অক্ষয়চন্দ্রের প্রথম প্রবন্ধ বক্ষে ধারণ করিয়া বঙ্গে বঙ্গদর্শন-এর প্রথম প্রকাশ ১২৭২ সালের ১লা বৈশাখ (১৮৭২।৪।১২)। কিন্তু লেখকরূপে সাতজন খ্যাতনামা ব্যক্তির সহিত অখ্যাত, তরুণ অক্ষয়চন্দ্রের নাম কেন প্রকাশিত হইল আর কেনই বা উদ্দীপনা প্রবন্ধ পাইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দ—ইহার যে পূর্ব ইতিহাসটুকু আমরা জানি, তাহাও প্রকাশ করিতেছি।

বঙ্গদর্শন প্রকাশের অব্যবহিত পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র

তাহার বিশিষ্ট বন্ধু সুপণ্ডিত জগদীশনাথ রায়কে লিখিয়াছিলেন :

‘I have got a lot of contributors who have promised to write and can write. Dinabandhu, Hemchandra, Krishnakamal Bhattacharjya, Taraprasad Chatterjee and a young man, whom you don't know, but whose intellectual life, I think, I have greatly influenced, for good or for evil and whose inherent gifts presage something great for him in the future. His name is Akkhay Sarkar.’

রবীন্দ্রনাথের যখন চব্বিশ বৎসর বয়স তখন অক্ষয়চন্দ্র ‘ভাই হাততালি’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন,.....ভগবানের এরূপ অতুল সৃষ্টি কখন বৃথা হইবার নহে। না, এখনও রবীন্দ্রনাথ আমাদের আশার স্থল, তরসার সম্বল, তুমি না লাগিলে তিনি এখনও আমাদের দেশের গোবব বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন।.....’ আর অক্ষয়চন্দ্রের যখন ছাব্বিশ বৎসর বয়স তখন বঙ্কিমচন্দ্র উপরি উদ্ধৃত ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া-ছিলেন। বলিতে ইচ্ছা করে, বঙ্কিমচন্দ্র ও অক্ষয়চন্দ্র উভয়েই জহুরী ছিলেন—রতনে রতন চিনে।

সুসাহিত্যিক মদ্রথনাথ ঘোষ ভারতবর্ষে ১২৪৫ সালে (১৩৫২) লিখিয়াছিলেন : ‘বঙ্কিমযুগ বাঙ্গালা সাহিত্যের সুবর্ণযুগ। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র যে সকল প্রতিভাশালী লেখককে লইয়া এই নবযুগের সূচনা ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে সাহিত্যাচার্য অক্ষয়চন্দ্র সরকারের স্থান অতি উচ্চে.....।’ উপরি উদ্ধৃত চিঠিখানি উদ্ধৃত করিয়া তিনি লিখিয়াছেন :

‘বঙ্কিমচন্দ্রের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল, বঙ্গদর্শনের চিন্তাশীল লেখক ও সূক্ষ্মদর্শী-সমালোচক “সাধারণী”র নির্ভীক ও নিরপেক্ষ সম্পাদক জাতির “নবজীবন”-এর শ্রুতি অক্ষয়চন্দ্রের কৃতকার্য বিশ্বস্ত হইবার নহে। তবুও আমরা বিশ্বস্ত হইতেছি। নবীন যুগের তরুণগণ তাহার যথার্থ পরিচয় জানেন না। ইহার অন্ততম কারণ এই

যে, তাঁহার প্রতিভা-প্রদীপ্ত রচনাবলী, রসসমুচ্ছল বক্তৃতাসমূহ সহজপ্রাপ্য নহে।’

অক্ষয়চন্দ্রের ভবিষ্য সাহিত্য জীবন সম্বন্ধে বঙ্কিম-চন্দ্রের এই মন্তব্য প্রকাশ করা কিরূপে সম্ভবপর হইয়াছিল? তখন পর্যন্ত অক্ষয়চন্দ্রের কোন লেখা প্রকাশিত হয় নাই, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সাহিত্য-সেবার কোন গুণপণা তখন পর্যন্ত দেখেন নাই। দেখেন নাই বটে কিন্তু অক্ষয়চন্দ্রের সহিত একান্তভাবে মেলামেশা করিয়া তাঁহার শিক্ষা, দীক্ষা, বিভা, বুদ্ধি, জ্ঞান ও চিন্তার পরিচয় ইতিমধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্র যথেষ্ট পাইয়াছিলেন; তিনি শুধু অক্ষয়চন্দ্রের লেখাই দেখেন নাই, কিন্তু তিনি ভালভাবেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, অক্ষয়চন্দ্রের জ্ঞানশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তার ধারা, ভালই হউক আর মন্দই হউক, তাঁহারই প্রভাবে উদ্ভূত হইতেছে। তাই তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিতে পারিয়াছিলেন যে, অক্ষয়চন্দ্রের এই আয়ত্তীকৃত গুণাবলী তাঁহার ভবিষ্য মহত্ত্বের সূচনা করিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষয়চন্দ্রের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার এবং নিজের দূরদর্শিতা ও বিচারবুদ্ধির ফল।

বঙ্গদর্শনের ১ম খণ্ডে বৈশাখে অক্ষয়চন্দ্রের ‘উদ্দীপনা’, আবার ‘গ্রাবু’ এবং আশ্বিনে ‘দশমহাবিদ্যা’ প্রকাশিত হয়। পূর্বেই বলিয়াছি, বঙ্গদর্শন ছাপা হইতেছিল ভবানীপুরে; ১৮৭০ সালে সঙ্গীতচন্দ্র কাঁটালপাড়ায় তাঁহাদের পৈত্রিক বাড়ীতে ছাপাখানা স্থাপিত করিলেন। বঙ্গদর্শনের ২য় খণ্ড হইতে এই প্রেসে ছাপা হইয়া প্রকাশিত হইতে লাগিল। এই ১৮৭০ সালেই চুঁচুড়া হইতে অক্ষয়চন্দ্র তাঁহার ‘সাধারণী’ প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করেন। সাধারণী কিন্তু কাঁটালপাড়ায় বঙ্গদর্শন প্রেসে ছাপা হইতে লাগিল। পরে ১৮৭৪ সালে অক্ষয়চন্দ্রের পৈত্রিক বাটীর সংলগ্ন স্বতন্ত্র বাড়ীতে সাধারণী যন্ত্রালয় স্থাপিত হইলে ২য় ভাগ ১৫ সংখ্যা হইতে সাধারণী নিজের প্রেসে মুদ্রিত হইতে থাকে। ১৮৭০ সালের কার্তিক মাসে সাধারণীর ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয়, আর সেই কার্তিক মাস হইতেই অর্থাৎ বঙ্গদর্শনের ২য় খণ্ড ৭ম সংখ্যা হইতেই অক্ষয়চন্দ্র বঙ্গদর্শনে ‘প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা’ করিতে

আরম্ভ করেন আর বঙ্কিমচন্দ্রও সাধারণীর প্রারম্ভ হইতে উহাতে লিখিতে থাকেন। এমনকি ১৮৭৪ সালে সাধারণীর সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ইংরাজীতে লিখিত হইতে আরম্ভ হইলে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র উহার প্রথম চারটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সাধারণীর প্রকাশ সম্বন্ধে অক্ষয়চন্দ্র লিখিতেছেন—‘সাধারণী সাহিত্য এবং রাজনীতি সমস্যাকে সমানে সেবা করিবার নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, করিতও তাহাই।...বঙ্কিমবাবুর বঙ্গদর্শনের গুণে বাঙ্গালী বাবু সখ করিয়া বাঙ্গালা পড়িতে শিক্ষা করেন আর রাজনীতি জড়িত সাহিত্যের সখ মিটাইবার জন্ত সাধারণীর জন্ম।’

‘উদ্দীপনা’ প্রবন্ধ হাতে লইয়াই বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মাদের কথা বলিয়াছি। ‘গ্রাবু’ প্রকাশিত হইলে বঙ্গসাহিত্য-সমাজে বিশেষ আলোড়ন লক্ষিত হইয়াছিল। ইহা কাহার লেখনীপ্রসূত? নিশ্চয়ই বঙ্কিমচন্দ্রের নতুবা বঙ্গসমাজের সহিত তাস খেলার এমন স্মৃতিস্মৃদ্ধ তুলনা-মূলক অথচ সরস রচনা আর কে লিখিবেন? রসরসিক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ‘পঞ্চানন্দ’-এ আর কি লিখিবেন? রসরসিক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ‘পঞ্চানন্দ’-এ ‘ভ্রমিকা’ নামে এক দীর্ঘ রস-রচনা লিখিয়াছিলেন। রচনার প্রথম দিকেই লিখিলেন :

‘অক্ষয়চন্দ্র সরকার, সাকিন চুঁচুড়া, ভারি একজন স্নলেখক। তাঁহার কবিত্বে যেমন কল্পনা, গাঁথুনিতে ততোধিক গুণপণা। কিন্তু তাঁহার প্রতিভার প্রথম পরিচয় কিসে পাওয়া গেল? তোমরা কেহ তাহা জান কি?...ফল কথা, কেহই জানে না যে, অক্ষয়চন্দ্রের এত যশ কোথা হইতে আসিল। কেহই জানে না যে, অক্ষয়-চন্দ্রের অক্ষয় কীর্তি কোথায় প্রথম স্মৃতি পাব। সেদব তত্ত্ববর্তী, সে শুধু কথা তোমরা কেহ জান না। আমি জানি। আর জানেন পঞ্চানন্দের পাঁচ ইয়ার; চরাচর যাহাদের চিরদিনের চলতি, তাঁহারা ভিন্ন সকল সমাচার রাখা সকলকার সঙ্গতিতে কুলাইবে কেন? যাহা হউক, আমি বলিতেছি, অক্ষয়চন্দ্রের গৌরব গ্রাবুতে।’

বঙ্কিমবাবুর তখন বাড়ন্ত দশা, বঙ্গদর্শন বুক ফুলাইয়া বঙ্গে বিচরণ করিতেছে। শুধু বাহবা-বাহবা বলিতেই

কত বাবুর গলা বসিয়া গিয়াছিল। সেই সময়ের বঙ্গ-দর্শনে অক্ষয়চন্দ্রের গ্রাবুতে মঙ্গলিস সন্মগন হইয়া উঠিয়াছিল। সে কি কম কথা। আজও মনে হইলে গাটা কেমন করিয়া উঠে। অক্ষয়ের গ্রাবু; অথচ গ্রাবু হইতেই অক্ষয়। যশ এক প্রকার কাঁচা বিঠা; লক্ষ্য স্থির করিয়া লোষ্ট্রনিষ্ক্ষেপ করিতে পারিলে, যিনি লক্ষ্য করেন, তাঁহার গায়ে লাগিবেই লাগিবে। গায়ে একবার লাগিলে সহজে ছাড়াইবার যো নাই; ছাড়াইতে গেলে মাথিতে হয়, তাহাতে গৌরভের গৌরব কেবল বৃদ্ধি পায়। অক্ষয়চন্দ্র গ্রাবুতে যশবী হইয়াছেন, সে কথা “গোচারণ”-এ গাঢ় হইয়াছে, নহিলে গোড়া সেই গ্রাবু। গ্রাবুতে অক্ষয়চন্দ্র গৃহস্থালী বুঝাইয়া দিলেন।”

দুই মাস পরে অক্ষয়চন্দ্রের ‘দশমহাবিদ্যা’ প্রকাশিত হইল। এই দশমহাবিদ্যায় অক্ষয়চন্দ্রের প্রতিভা ইতিহাস ও পুরাণপ্রসঙ্গে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি লিখিলেন,—“আমার বোধ হয় যে, এই ভারতবর্ষের দশ দশাই দশ-মহাবিদ্যা। এক্ষণে সপ্তমী দশা চলিতেছে, সেই দশার প্রতিমূর্তিই ধুমাবতী মূর্তি। প্রথম দুই দশায় কালী ও ও তারা মূর্তি। আর্য-দ্রব্য বিবাদ লইয়া যখন ভারতবর্ষ প্রত্যহ রক্তে স্নান করিত।...তাহার পর বোড়শী। ভুবনেশ্বরী দুই মূর্তি।...এখন রাজরাজেশ্বরী মূর্তিতে রাজ্ঞী অভয় দানে সকলকে তুষ্ট করিতেছেন। এক্ষণে ভারত—রাজ্ঞী, এক্ষণে ভারত—শান্তি। তাহার পর তন্ত্র-শাস্ত্রের প্রাচুর্য্যব...ভারত যোগিনী, ভারত ভৈরবী।...ষষ্ঠী দশায় তন্ত্র প্রাবন। ছিন্নমস্তা মূর্তি।...ভারতমাতার এক্ষণে ধুমাবতী দশা।...বিধবা ভারতের পেটে অন্ন নাই, গায়ে বস্ত্র নাই; রক্ষকেশা, রক্ষাক্ষা; দস্তবিরল হইয়াছে; শোকে তাপে দৃষ্টি কুটিল হইয়াছে, যেন সকল আশ্রয় পরিচ্যুতা হইয়া পুরাতন ভগ্নযান রথে গিয়া আশ্রয় লইয়াছেন, হায! সেই রথের উপরি কাক বসিতেছে।...”

মাতা আব্বার বগলা মূর্তিতে দেখা দিবে।...বগলা সিদ্ধবিদ্যার মন্ত্রে সকলে সিদ্ধ হইবার উপায় অবলম্বন কর।...ইহার পরেই ভারতে মাতঙ্গী মূর্তি। ভারতমাতা

আপনার চিরপরিচিত দয়ার বশবর্তিনী হইয়া সেই কবলিত শত্রুকে বিমুক্ত করিয়াছেন; আত্মরক্ষার্থে খড়্গাচর্য ধারণ করিয়াছেন; শাসনাজ্ঞ পাশাকুর পুনর্ব্বার গ্রহণ করিয়াছেন। রত্নপদ্মাসনে রক্ত-বস্ত্র পরিধান করিয়া বিরাজ করিয়াছেন। ভারতমাতা বহুকাল এভাবে গ্রহণ করিয়া থাকিতে পারিবেন না। তিনি ইহার পরেই মহালক্ষ্মীরূপে ভবে দেখা দিবে।...ভারতমাতার যুগ যুগান্তরের মল-রাশি শ্বেতহস্তিগণ অমৃতবারি সেচনে বিধৌত করিয়া দিতেছে। ভারতমাতা অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছেন; পদ্মাসনে পদ্মাসনা পদ্মহস্তে জগতে অভয় দান করিতেছেন। আহা কি শুভদিন! শরীরে রোমাঞ্চ হয়। সকলে একবার আনন্দ জয়ধ্বনি কর। ভারত-মাতার অভিব্যক্তি হইতেছে। মাতা—যোগিনীমূর্তি, বারাতী মূর্তি, এমন যে ভুবনে অতলা ভুবনেশ্বরী মূর্তি। মাতা তাহা গ্রহণ করেন নাই; যা এখন মহালক্ষ্মীভাবে শোভা পাইতেছেন; সকলে জয়ধ্বনি কর।”

কিন্তু দশমহাবিদ্যার শেষে অক্ষয়চন্দ্র লিখিলেন—“সম্মুখে কি দেখ দেখি—এ দেখ মাতার সেই ভগ্নযান রথোপরি কাক বসিয়া আছে। ডাকিতেছে ক-অ-অ-অ, ক-অ-অ-অ; দেবীর ক্ষুণ্ণিপাসাধিত জরুটিপাতে অন্তর্দাহ হয়, আর সহিতে পারি না।

মাতবর্গলে আবিরাবী।

স্মরণ রাখিতে হইবে—সেই ‘ধ্বত-মুকুর-বৈরিম্বিস্বাম্’, সেই ‘শত্রুন্ নিপীড়য়ন্তীম্’ বগলাদেবীরই আবির্ভাব অক্ষয়চন্দ্র প্রার্থনা করিতেছেন।

অক্ষয়চন্দ্রের এই লেখা ১৮৭৩ সালের, আর বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ লেখেন ১৮৮১—আট বৎসর পরে। আনন্দ-মঠের মাতৃমূর্তি-মা ছিলেন,—‘সর্বাসঙ্গসম্পাদা—সর্বভূষণ-ভূষিতা—জগদ্ধাত্রী’। আর আজ মা—‘কালী—অন্ধকার-সমাচ্ছাদা—কালিময়ী। হতসর্বস্বা, সেইজন্ম নম্রিকা।’ তাহার পর মা বা হইবেন—‘দশ ভূজ, দশদিকে প্রসারিত,—তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রুবিমর্দিত, পদাশ্রিত বীরকেশরী শত্রুনিপাতে নিযুক্ত। দিগ্ভূজা—নানা প্রহরণধারিণী, শত্রুবিমর্দিনী বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যা-

ভক্তযোগী রসিকবিহারী

আচার্য্য শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

(ছুই : জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার অমুভূতি)

একদিন ঘরে বসিয়া ধ্যান করিবার সময় যোগীরাষ্ট্র রসিকবিহারীর স্মরণ হইল যে, বুদ্ধদেব এক অশ্বখ বৃক্ষের নীচে বসিয়া ধ্যান করিতে করিতে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার চিন্তেও অশ্বখ বৃক্ষের নীচে বসিয়া ধ্যান করিবার বাসনা জাগ্রত হইল। আশ্চর্য্যের বিষয়, কয়েকদিনের মধ্যেই দেখা গেল যে, তাঁহার ঘরের জীর্ণ দেওয়াল ভেদ করিয়া একটি অশ্বখ বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে। এই বৃক্ষটি অল্পদিনের মধ্যেই ডালপালা বিস্তার করিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু দেওয়ালটির বিশেষ কোন ক্ষতি করিল না। তিনি উহার নীচে বসিয়া সাধনা করিতে বিশেষ আনন্দ পাইতেন। ঘর ভাঙ্গিয়া পড়িবার আশঙ্কায় কবেকবার তাঁহার অমুভূতিতে উহার ডালপালা কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আবার সে পূর্ববৎ হইয়াছে। কিন্তু ঘর তাঙ্গে নাই, দেওয়াল নষ্ট করে নাই। তিনি বলিতেন, করুণাময়ী মা করুণা করিয়া এইরূপে ভক্তের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকাজক্ষা পূরণ করিয়া থাকেন, ইহার মধ্যে ভক্তের কোন কৃতিত্ব নাই। কোন প্রকার বিভূতিতে ভক্তের অতিমান হইলেই মা তা চূর্ণ করেন, তার উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়।

অহিংসা তাঁহার এমন স্বভাবসিদ্ধ হইয়াছিল যে, তিনি মশা, মাছি, বিছানার ছারপোকা, মাথার উকুন,—এসবও মারিতে পারিতেন না, এবং ইহারাও তাঁহার কোন উদ্বেগ জন্মাইতে পারিত না। তাঁহার চুল দাড়িতে অনেক সময় উকুনেরা স্বচ্ছন্দে বিহার করিত, তাঁহার কোন উদ্বেগ ছিল না। বিছানায় অসংখ্য ছারপোকা হইত এবং তাহারা তাঁহার বৃক্ষের উপর দিয়া গুর-গুর করিয়া হাটিয়া বেড়াইত; তিনি যেন তাহা সম্ভোগ করিতেন।

রূপিনী—বামে বাণীবিন্ধ্যবিজ্ঞানদায়িনী—সঙ্গে বলরূপী কান্তিকেশ, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ।’ মনে রাখিতে হইবে, ছব্ব এই মাতৃমূর্তিই বঙ্গদর্শনে কমলাকান্তের দণ্ডের ১১শ সংখ্যায় (১৮৭৪) ‘আমার ভূর্গোৎসব’

তিনি বলিতেন, ইহারা তাঁহাকে কামড়ায় না। তাঁহার পুত্র শচীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—“পিতৃদেবের বিছানায় ভয়ানক ছারপোকা ছিল, তিনি কখনও মারিতেন না। এত ছারপোকা দেখিয়া মা’র কখন কখন অসহ্য বোধ হইত। পাছে বাবার নিদ্রার ব্যাঘাত হয়, এই আশঙ্কায় এক-একদিন মা ছারপোকা মারিয়া বিছানা ঠিক করিয়া রাখিতেন। সেইদিন বিছানায় শুইয়াই বাবা বলিতেন, ‘আজ আমাকে ভয়ানক ছারপোকা কামড়াইতেছে, নিশ্চয়ই তোমরা ছারপোকা মারিয়াছ, অল্পদিন ত ওরা আমাকে কামড়ায় না, আমার গায়ে গুর-গুর করিয়া চলিয়া বেড়ায়, কখনও কামড়ায় না, হিংসা করিলেই উহারা হিংসা করে।’ মশা মাছি তাড়াইবার জন্য তাঁহাকে হস্ত সঞ্চালন করিতেও প্রায় দেখা যাইত না। কেহ স্নেহের আবদারে জোর করিয়া ধরিয়া তাঁহার চুল দাড়ি আঁচড়াইয়া উকুন মারিয়া দিলেই যেন তাঁহার অস্বস্তি বোধ হইত। ছোট ছোট পাখীরা উড়িয়া আসিয়া তাঁহার মাথায় গায় বসিত, তাঁহার হাত হইতে খাবার লইত, অল্প লোক কাছে আসিলে ভয়ে উড়িয়া পলাইত। ইহুরেরা তাঁহার ঘবে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিত, কখন কখন তিনি খাইতে বসিলে তাঁহার থালা হইতেও খাদ্যবস্তু লইয়া খাইতে থাকিত। মাঝে মাঝে এমন হইত যে, তিনি রাত্রি ১০টা বা ১১টার সারাদিন খাটিয়া বাড়ী ফিরিয়াছেন, খাইতে বসিয়াই দেখেন যে ইহুরেরা তাঁহার সব খাদ্য খাইয়া ফেলিয়াছে। একদিন তাঁহার মনে হঠাৎ বিক্ষোভ হইল, তিনি ভাবিলেন, ইহুরগুলি এত জ্বালাতন করে, এগুলি মরে না কেন? পরদিন সকালে দেখিল, বাড়ীর এখানে সেখানে অনেক ইহুর মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তাঁহার

প্রবন্ধে চিত্রিত হইয়াছিল। স্মরণ্যঃ মাতৃমূর্তি-স্বরূপ ভূর্গাপ্রতিমাই বঙ্কিমচন্দ্রের আরাধ্যা দেবী;—তিনি ‘বন্দে মাতরম্’ মন্ত্রের ঋষি।

(ক্রমশঃ)

অসম্মত ইচ্ছার ফলেই এতগুলি জীবের মৃত্যু হইয়াছে মনে করিয়া তিনি বড়ই অমৃতপ্ত হইলেন, এবং আর কখন এরূপ না হয়, তজ্জন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

যখনই তাঁহার কোনরূপ যোগশক্তির প্রকাশ হইত কিংবা তাঁহার ইচ্ছামুসারে অলৌকিক কোন ঘটনা ঘটিত, তখনই তিনি মায়ের নিকট কাতরভাবে প্রার্থনা করিতেন, মা! আমাকে এসব কিছু দিস্ না, আমি এ সব সহ্য করিতে পারিব না, আমায় রক্ষা কর, আমায় এ সব দিলে ভুলাস্ না, ইত্যাদি। যাহা কিছু ঘটিত, সবই তিনি মায়ের কৃপা বলিয়া অমৃতভব করিতেন; মা তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া অলৌকিক কোন ব্যাপার ঘটাইয়া তাঁহার অভিমান সৃষ্টি না কবেন, তজ্জন্ত তিনি মায়ের চরণে আকুল প্রার্থনা জানাইতেন।

শ্রীমান্ শচীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—“এই সময়ে একবার পিতৃদেবের তপঃসিদ্ধা মাসীমা গঙ্গাস্নান ও কালীঘাটের কালী দর্শন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। পিতৃদেব তাঁহাকে গ্রাম হইতে কলিকাতায় আনাইলেন এবং স্নান দর্শনাদির সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তখন আমাদের জ্যেষ্ঠামহাশয়ও সপরিবারে আমাদের সংসারেই ছিলেন। তিনি ত পিতৃদেবের আধ্যাত্মিক অবস্থা কিছুই বুঝিতেন না, তাঁহার সাধনভজন ও ভাববিষয়তাকে তিনি সহৃদয়তার সহিত দেখিতে পারিতেন না; পিতৃদেব যে সাংসারিক কাজকর্মে মন দেন না, পরিবারবর্গের সুখ-স্বচ্ছন্দ্যের অমৃত যথোচিত চেষ্টা করেন না, এই কারণেই তাঁহার উপর ঋণভাব ছিল। কিন্তু অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন মাসীমার প্রতি তাঁহারও যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি ছিল। একদিন তিনি এই মাসীমার নিকট পিতৃদেবের বিরুদ্ধে অনেক প্রকার অভিযোগ করেন,—কাজকর্মে মন নাই, পাগলের মত হাসে কাঁদে, ইহাতে সংসারের উন্নতি কি প্রকারে হইতে পারে, ইত্যাদি। মাসীমা সব শুনিয়া বলিলেন,—‘দেখ্, ওকে এ রকম বলিস্ না; ওর যা হয়েছে, আমার এখনো তা হয় নাই, ওর খুব উচ্চ অবস্থা, এসব তুই বুঝবি না।’

“ইহার কিছুকাল পরে জ্যেষ্ঠামহাশয় একটা চাকরী পান, এবং তিনি সপরিবারে কর্মস্থলে চলিয়া যান।

পিতৃদেব যেন তখন একটু স্বস্তি বোধ করিলেন। অভাব অভিযোগের মাত্রা কিছু হ্রাস পাইল। ঘর আর পূর্বের মত কোলাহলপূর্ণ রহিল না। পিতৃদেব অবসরমত নিরিবিলা একটু বসিবার স্থান পাইলেন।

“এই সময়ে তিনি স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন বটে, কিন্তু একটু নিরিবিলা বসিলেই প্রায়ই তাঁহার ভাবসমাধি হইত। কোথাও শাস্ত্রপাঠ, কীর্তন বা সাধুসন্ন্যাসীর আগমন হইবে, শুনিলে তিনি উপস্থিত হইতেন সত্য; কিন্তু পাঠ কীর্তনাদি আরম্ভ হইলে অল্পক্ষণের মধ্যেই এমন হাসি কান্নার রোল তুলিয়া দিতেন এবং তাঁহার দেহে এমন সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইত যে, তাহাতে কখন কখন অমৃষ্ঠানের বিঘ্ন হইত। অনেকে এসব দেখিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধায় আপ্রমুত হইত বটে; আবার অনেকে বিরক্তিও বোধ করিত, এবং কেহ কেহ তাঁহাকে উদ্ভাদ বা বিকৃত মস্তিষ্ক মনে করিয়া বিজ্ঞপায়ক বাক্য বলিতেও কুণ্ঠিত হইত না। এই সকল কারণে তিনি বাহিরে কোন সদমৃষ্ঠানে যোগদানই বন্ধ করিয়া দিলেন। অবসর পাইলে ঘরেই বসিয়া ধ্যানমগ্ন হইতেন।”

• • ২

এই প্রকার উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা লাভ করিয়াও রসিকবিহারীর অন্তরাঙ্গা সম্যক্ তৃপ্তি অমৃতভব করিতে পারিতেছিল না। ভাবসমাধিতে তিনি অনির্বচনীয় আনন্দ সম্ভোগ করিতেন, উচ্চৈঃস্বরে ‘মা, মা’ বলিয়া হাসিয়া কাঁদিয়া তিনি প্রেমামানন্দে বিভোর হইতেন, সাংসারিক জীবনের সব বিভীষিকার মধ্যেও মায়ের খেলা দেখিয়া ও মায়ের স্নেহময় স্পর্শ অমৃতভব করিয়া তিনি ভাবে বিগলিত হইতেন, ভগবৎপ্রসঙ্গ শুনিতেই তিনি আল্লাহারা হইয়া যাইতেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহার অন্তরে কী যেন একটা অভাব বোধ থাকিয়া যাইত। তাঁহার সম্যক্ আত্মোপলব্ধি হইয়াছে বলিয়া তিনি বোধ করিতেন না। মুহম্মদ ‘ভাবস্থ’ হওয়া আর নিত্য নিরন্তর সর্বাবস্থায় ‘আত্মস্থ’ থাকা যে এক জিনিষ নয়, এবং পূর্ণরূপে আত্মস্থ হইতে না পারিলে যে জীবনের চরম ও পরম কল্যাণ সাধিত হইল না, এরূপ একটা অস্পষ্ট বোধ

তাঁহাকে ভিত্তর হইতে প্রেরণা দিতেছিল। পরমাত্মাকে তিনি 'মা' বলিয়া অহুভব করিয়াছেন, তাঁহার সহিত ভাবরাজ্যে তাঁহার ভাবের আদান প্রদান চলিতেছে, তাঁহাকে পরমারাধ্য জানিয়া তিনি তাঁহার চরণে আশ্রম-সমর্পণ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাকে এখনো নিজের 'আত্মা' বলিয়া ঠিক ঠিক অহুভব করেন নাই; তিনিই যে একমাত্র 'তব',—'একমেবাদ্বিতীয়ম্',—'শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্'—এই অহুভূতিতে তিনি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন নাই। তন্নিমিত্তই তাঁহার চিত্তে ব্যাকুলতা ছিল।

যখন তিনি ভাবের রাজ্যে এক্রূপ উন্নত অবস্থা লাভ করিয়াছেন, অথচ পরম তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া সম্পূর্ণ অহমিকাশূন্য হইয়া তাহাতে ডুবিয়া যাইবার সামর্থ্য অর্জন করেন নাই, যখন তিনি অসাধারণ ভক্তিসম্পদ লাভ করিয়াও চরম জ্ঞানে স্থিতিলাভ করিতে সমর্থ হন নাই, সেই সময়ই সঙ্গুর শ্রীশ্রীযোগিরাজ গম্ভীরনাথ তাঁহার চিত্তকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেন। যোগিরাজের নাম ও মহিমা তিনি অবশ্য পূর্বেই শুনিয়াছিলেন; কিন্তু এক্রূপ আকর্ষণ পূর্বে কখনো অহুভব করেন নাই।

প্রভূপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ব্রাহ্মসমাজের বিচার ও সাধনপদ্ধতি অনুসারে বিশ্বপ্রপঞ্চস্রষ্টা সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্ করুণাময় নিরাকার সত্ত্ব ব্রহ্মের নিবিড় উপাসনা করিতে করিতে তত্ত্বপ্রেমে অত্যন্ত আধ্যাত্মিক অবস্থা লাভ করিয়াও, যখন অন্তরে সম্যক তৃপ্তি অহুভব করিতে না পারিয়া ব্রহ্মভাব ভাবিত সঙ্গুর রূপালাভের নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রে ও তপঃক্ষেত্রে ঘুরিতে-ছিলেন, সেই সময়েই গয়ার এক পার্কত্যাগুহায় তিনি যোগিরাজ গম্ভীরনাথের দর্শন ও উপদেশ লাভ করেন। যোগিরাজের নিকট হইতেই তিনি ইঙ্গিতলাভ করিয়া-ছিলেন যে, তাঁহার জন্মে নির্দিষ্ট সঙ্গুর অহুকুল সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছেন এবং শীঘ্রই সেই সঙ্গুর আবিভূত হইয়া তাঁহাকে রূপা করিবেন ও তাঁহার সব সংশয় নিরসন করিবেন। ইহার অল্পকাল পরেই যোগিরাজের সাধনক্ষেত্র কপিলধারার সন্নিকটবর্তী আকাশগঙ্গা পাহাড়ে মানস-সরোবরের পরমহংস ব্রহ্মানন্দজী অলৌকিকভাবে অকস্মাৎ আবিভূত হইয়া গোস্বামী মহাশয়কে দীক্ষা প্রদান

করেন। গোস্বামী মহাশয় নবজীবন লাভ করিয়া গম্ভীর যোগসাধনায় ডুবিয়া গেলেন এবং অল্পদিনেই পরম তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। অতঃপর শ্রীগুরুর আদেশেই তিনি সঙ্গুরর আসন গ্রহণপূর্বক বহু ধর্মার্থীকে দীক্ষা প্রদান করিয়া সাধনপথে পরিচালিত করেন। তত্ত্বোপলব্ধি নিমিত্ত তত্ত্বজ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত সঙ্গুরর রূপালাভের ঐকান্তিক আবশ্যকতা গোস্বামী মহাশয়ই আধুনিক বাংলায় নবীন শিক্ষিত সমাজে স্বীয় অভিজ্ঞতালব্ধ দৃঢ়তার সহিত প্রচার করেন।

যোগিরাজ গম্ভীরনাথের প্রথম দর্শনের সময় হইতেই গোস্বামী প্রভু তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি-প্রেমে বিশেষভাবে আকৃষ্ট ছিলেন। সিদ্ধাবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াও এবং বহু শিষ্যের স্তর হইয়াও তিনি যোগিরাজের নিকট অনেক সময় গমন করিতেন। তিনি আপনার শিষ্যদের নিকট বলিতেন—নাথজীর মত এত বড় মহাত্মা হিমালয়ের নীচে দেখা যায় না, তিনি পলকে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করিতে সমর্থ, তাঁহার অপরিণীম ঘোঁরেগর্ষ্য, কিন্তু তিনি ঐশ্বর্য প্রদর্শন করেন না, ঐশ্বর্যে সম্যক সিদ্ধিলাভ করিয়া তিনি এখন মাধুর্যে ডুবিয়া আছেন, তাঁহার অহিংসা ও প্রেমের প্রভাবে বনের ব্যাঘ্রসর্পাদি হিংস্র জন্তুগুলিও হিংসা ভুলিয়া যায়, ইত্যাদি। তিনি তাঁহার শিষ্যগণকে লইয়াও কখন কখন যোগিরাজের দর্শনার্থে যাইতেন এবং শিষ্যদিগকে তাঁহার সঙ্গ করিবার জন্মে উপদেশ দিতেন। গোস্বামী প্রভু স্বয়ং তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষ ছিলেন, এবং বাংলায় ও ভারতে তিনি বহুসংখ্যক সর্বোচ্চ কোটী মহাপুরুষের সঙ্গ করিয়াছিলেন; কিন্তু নাথজীকে তিনি অনন্তসাধারণ স্থান দিতেন।

যোগিরাজ গম্ভীরনাথ অতিশয় নিরাদম্বরভাবে আত্মগোপন করিয়া থাকিলেও, উচ্চকোটার সাধুসমাজে তিনি অপরিচিত ছিলেন না। সারা ভারতের শ্রেষ্ঠতম সাধু মহাত্মাগণ তাঁহাকে মাতাভীত ত্রিগুণরহিত যুক্তযোগী জীবন্ত মহাপুরুষ বলিয়া নিরতিশয় শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন এবং তাঁহার অনীম ঘোঁরেগর্ষ্য ও ভাবগাম্ভীর্যের মহিমা-কীর্তন করিতেন। বাংলাদেশে গোস্বামীপ্রভুর তিরো-ধানের পরেও তাঁহার বিশিষ্ট শিষ্যসেবকগণ দ্বারা

যোগিরাজের অনন্তসাধারণ মাহাত্ম্য বিপুলভাবে প্রচারিত হয়। উক্ত শিষ্যগণের ধর্মপিপাসু আত্মীয়স্বজনবর্গ যোগিরাজের নিকট দীক্ষালাভের নিমিত্ত লালায়িত হন। কিন্তু যোগিরাজ তখনো কাহাকেও দীক্ষা দান করিতেন না। বিধাতৃবিধানে ঘটনাচক্রে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যোগিরাজকে স্বীয় গুরুদাম গোরক্ষপুরে ও গোরক্ষনাথ মন্দিরে আসিতে হয় এবং মন্দিরের তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করিতে হয়। তখন হইতে গোরক্ষনাথ মন্দিরেই তাঁহার স্থায়ী আসন ছিল। ১৯১০ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি সদৃগুরুরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। গোস্বামী প্রভুর বিশিষ্ট শিষ্যগণের একান্ত প্রার্থনাতেই তিনি দীক্ষাদানে স্বীকৃত হন। গোস্বামী-শিষ্যদের ধর্মপিপাসু আত্মীয়বর্গের ভিতরেই প্রথম দীক্ষাকার্য্য আরম্ভ হয়।

আবাল্য সাধক রসিকবিহারীর এসব বিষয় অবিদিত ছিল না। গোস্বামী মহাশয়কে তিনি বাল্যকাল হইতেই দেখিয়া আসিতেছিলেন, ব্রাহ্মসমাজে তাঁহার উপদেশও অনেক শুনিয়াছেন এবং তাঁহার নিকট হইতে অনেক উদ্দীপনাও লাভ করিয়াছেন। তাঁহার সাধনজীবনের ও সিদ্ধজীবনের ইতিহাস তিনি বিশেষভাবেই জানিতেন। তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর সঙ্গেও তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। কিন্তু গোস্বামীপ্রভুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে তিনি অন্তরে কোন প্রেরণা অনুভব করেন নাই। ত্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্যগণের সহিতও তাঁহার পরিচয় ছিল, এবং ত্রীরামকৃষ্ণ কথায়ূত পাঠ করিয়া তিনি বিশেষভাবে উপকৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু সেখানেও তাঁহাকে দীক্ষা-গ্রহণের প্রবৃত্তি হয় নাই। কলিকাতায় তখন মহাত্মা রামদাস কাঠিয়া বাবা, মহাত্মা বালানন্দ ব্রহ্মচারী, মহাত্মা ভোলানন্দ গিরি প্রভৃতি আরো কতিপয় সিদ্ধ মহাপুরুষের নাম ও মাহাত্ম্য প্রচারিত হইতেছিল এবং তাঁহাদের রূপভাষন অনেকের সহিত রসিকবিহারীর পরিচয় ছিল। তাঁহারা সকলেই তখন স্থূলদেহে বিদ্যমান। সাধক রসিকবিহারী সকল মহাপুরুষকেই অকপটভাবে প্রস্ফাভক্তি করিতেন। কিন্তু কাহাকেও সদৃগুরুপদে বরণ করিতে তাঁহার ইচ্ছা জন্মে নাই। যোগিরাজ গম্ভীরনাথের নাম ও মহিমাও তিনি যথেষ্ট শুনিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার

নিকটেও দীক্ষাগ্রহণের আগ্রহ তিনি এতদিন বোধ করেন নাই। যখন তাঁহার দীক্ষাগ্রহণের প্রয়োজনবোধ হইয়াছিল, তখন তিনি কুলগুরুর নিকটই শক্তিমত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মবিদ সদৃগুরুর সাক্ষাৎ রূপা ব্যতীত যে ব্রহ্মজ্ঞান ও মোক্ষলাভ সম্ভব নয়, এ কথা বহুবার শুনিলেও এবং বহু শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিলেও তিনি ইহা পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। সাধনার অনেক উন্নত অবস্থায় উপনীত হইয়া তিনি এ বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয় লাভ করেন।

গোস্বামী প্রভুর শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে একটি বিশিষ্ট পরিবারের সহিত রসিকবিহারীর আজন্ম ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। এই পরিবারটিও পশ্চিমপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ, এবং রসিকবিহারীর নিকট জ্ঞাতি। এই পরিবারের পাঁচটি ভাই—হরকান্ত, বরদাকান্ত, সারদাকান্ত, কুলদাকান্ত ও রোহিণীকান্ত—সকলেই সুশিক্ষিত এবং সকলেই গোস্বামী প্রভুর শিষ্য ছিলেন। তন্মধ্যে কুলদানন্দ রসিকবিহারীর প্রায় সমবয়স্ক এবং আবাল্য বন্ধু ছিলেন। উভয়ে বাল্যকালে যেমন একসঙ্গে খেলা করিতেন, যৌবনে তেমনি একসঙ্গে ব্রাহ্মসমাজে ব্রহ্মোপাসনায যোগ দিতেন এবং ধর্মচর্চা করিতেন। হরকান্ত, বরদাকান্ত এবং সারদাকান্ত সকলকেই রসিক-বিহারী ‘দাদা’ সম্বোধন করিতেন এবং অগ্রজের স্থায় প্রজ্ঞা করিতেন। রোহিণীকান্ত তাঁহাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ও সর্বকনিষ্ঠ। সকলেই ধর্মপ্রাণ ছিলেন। হরকান্ত সিভিল সার্জেন ছিলেন এবং সকলের অতিভাবক ছিলেন। গোস্বামী মহাশয় যখন ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক ছিলেন, তখনই সকলে তাঁহার অমুরাগী ভক্ত হন এবং তিনি ব্রাহ্ম-সমাজ ছাড়িয়া সদৃগুরুর আসন গ্রহণ করিলে সকলেই তাঁহার নিকট দীক্ষালাভ করিয়া তাঁহার চরণে আত্ম-সমর্পণ করেন। কুলদাকান্ত তাঁহার নিকট হইতে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে দীক্ষিত হইয়া কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী নামে পরিচিত হন। গোস্বামীপ্রভুর তিরোধানের পরে তিনিও সদৃগুরুর আসন গ্রহণ করেন এবং গোস্বামীপ্রভুর প্রবর্তিত সাধনধারায় বহু ধর্মার্থী নরনারীকে দীক্ষাদান করেন। তিনিও অলৌকিক যোগৈশ্বর্য্যের অধিকারী

শান্তি

শ্রীকণিভূষণ বিশ্বাস

বসিয়ার বিল। হ্যাঁ, একটা বিলের মত বিল বটে... বর্ষার প্রাবনে সমুদ্রের আকার ধারণ করে। সীমাহীন জলোচ্ছ্বাসের ছরস্র ঢেউ দিকচক্রবালে মিশে যায়। এর বিপুল বিস্তার বিশ্বের সৃষ্টি করে।

এমন প্রকাণ্ড বিল সচরাচর চোখে পড়ে না। একটু ঝড় উঠলেই মাঝিদের প্রাণে আতংক জাগে। কল্যাণ-গঞ্জের গোড়া থেকে শুরু করে সিংগাড়ের পাশ কাটিয়ে ন'গাঁ পেরিয়ে বরাবর চলে গেছে মুর্শিদাবাদের শেষ সীমা পাঁচগাঁ অবধি।

এমনি বিরাট এর পরিধি...দিগন্ত জোড়া এর অনন্ত প্রসার। তরা বর্ষার দিনে বসিয়ার এক তীরে দাঁড়িয়ে চারিদিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেই পুরাণের সেই কথা মনে পড়ে : পৃথিবীর তিন ভাগ জল আর এক ভাগ স্থল ছিল।...আজো তার পুনরাবৃত্তি চলেছে...বসিয়ার বিলই তার সাক্ষী।

কিন্তু গ্রীষ্মের দিনে এর চেহারা দেখলে কান্না পায়... চোত বোশেখ মাসের সে অবস্থা চোখে না দেখলে কল্পনা করা যায় না! বাগেরীপাড়ার নীচে তলানি জলের মত এতটুকু জল থাকে...তাতে না থাকে স্রোত, না থাকে কলোচ্ছ্বাস।

ছ'দিকের চর ফুটিফাটা হয়ে স্বর্ষালোকে অগ্নি বিকীর্ণ করে... দিগন্তজোড়া চর জেগে উঠে। উলুখড়ের বনে

হইয়াছিলেন এবং সাধকসমাজে অসামান্য প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারী কুলদানন্দের সহিত রসিক-বিহারীর অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব চিরদিনই অক্ষুণ্ণ ছিল এবং তাঁহাদের সব ভাই-এর সহিতই তাঁহার যোগাযোগ অবচ্ছিন্ন ছিল। কিন্তু তাঁহাদের প্রভাবে তাঁহার নিজস্ব সাধনজীবনে কোন ব্যতিক্রম হয় নাই এবং সঙ্গত লভের আগ্রহও বহুকাল পর্যন্ত হয় নাই।

কুলদানন্দ এবং তাঁহার সকল ভ্রাতাই একদিকে যেমন গোস্বামী প্রভুর শিষ্য ছিলেন, অপরদিকে তেমনি যোগী-

পায়ে চলার আঁকা-বাঁকা পথ ঢেকে যায়। একান্ত তাচ্ছিল্য ভরে জীবজন্তু মানুষ বিলের বালুকাস্ত্রুপে পদ-চিহ্ন এঁকে চলে যায়! চরের কোথাও ভাঙুই কিংবা আউষ ধানের আবাদ চলে। জ্যোতি মাসের মাঝামাঝি সময়ে বসিয়ার আশেপাশের আমন ক্ষেতে সবুজ ধানের গালুচে জেগে উঠে। ন'গাঁর পথ থেকেই তালগাহের প্রহরী ঘেরা অজস্র দীঘি, ছোট ছোট গ্রাম, যোজন জোড়া ধানের জমি, গাছপালা মাঠ, বিলের সীমারেখা—ছবির মত মনে হয়।

বর্ষার সময় নৌকা ছাড়া গতি নেই।

জলপথ ছাড়া অল্প পথে যাওয়া আসা এক রকম অসম্ভব হয়ে উঠে। এঁটুলে মাটির যা' কান্দা...গোন্ধ-গাড়ীর চাকা পর্যন্ত আটকে যায় : মোষের গাড়ীই যা' একটু আধটু চলে। কিন্তু চাষ আবাদের সময় মোষের গাড়ীই বা মেলে কোথায়? কাজেই জলপথেই সাধারণকে পাড়ি দিতে হয়।

গরীব চাষীদের এ দুঃখ গা সওয়া হয়ে গেছে। জল কাদায় মানুষ ওরা। ওদের সুবিধা অসুবিধা বলে কি আছে? দুঃখ কষ্ট পাবার জন্মেই তো ওদের জন্ম! বর্ষার দিনে এমনিই চলে নিত্য রোজ...

আজ সকাল থেকেই মাল বোঝাই খান পাঁচেক মোষের গাড়ী দেখা গেল খেয়াঘাটে। রাতারাতি ওরা

রাজ গজীরনাথের ভক্ত ছিলেন। তাঁহার সকলেই নাথজীকে যেন গুরু গুরু বলিয়া অমৃতব করিতেন এবং তাঁহার কৃপাশক্তির উপর অসীম বিশ্বাস পোষণ করিতেন। রসিকবিহারী তাঁহাদের মুখ হইতে নাথজীর বিষয় অনেক শুনিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার চরণে আশ্রয়দানের আগ্রহ পূর্বে কখনো হয় নাই। ক্রমে তাঁহার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আকর্ষণ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং নিজের অবস্থা বিচার করিতে করিতে সঙ্গত নামের প্রয়োজনীয়তা বোধও তাঁর হইতে লাগিল।

এসে হাজির হয়েছিল। ভোরের সোনা-গলা সূর্যের আলো বিকশিত করছে বিলের জলে। বাবলা তলার আবহা অন্ধকার ভরে উঠেছে আলোর বস্ত্রাঘ। আকাশে ছিন্নভিন্ন মেঘের জটলা। পূর্বাশ্বয় বর্ষা মেঘের কি সমারোহ.....হয় তো বৃষ্টি নামবে একটু পরেই।

রহিম গাড়ী নামিয়ে ছেড়ে দিল মোবিল্লোকে..... ছাড়া পেয়ে ওরা চরে বেড়াচ্ছে...ছোটো মোবিল্লো নেমেছে। ওদিকে রান্নাবান্না নিয়ে কালু আর ছিটি মোড়ল ব্যস্ত। কাল রাতে ওরা পাঁচগাঁ থেকে গাড়ী জুড়েছে আর সকাল নাগাদ এসেছে ঘাটে। বেলা বারোটার মধ্যেই সদরের গ্রেন্থপে ওদের মাল খালস করতেই হ'বে। নইলে জালা কম নয়, ইনস্পেক্টর সাহেব কোন মালই নেবেন না। মালিকের কাছ থেকে ভাড়াও পাবেনা ওরা। এই শর্তেই ছ'টাকা করে গাড়ী চুক্তি ওদের সঙ্গে।

এখনো সময় আছে ঢের। সেই ন'টার আগে তো খেয়া ছাড়বে না। কাজেই খাওয়া দাওয়ার পর্বটা ওরা চুকিয়ে নিচ্ছিল।

ওদেরি এক পাশে বসে শ্রীধর ভুঁইয়ালী ভাবছিল... আজ একটু সকাল সকাল যেতে হ'বে ওপারে। শহর থেকে কয়েকটা জিনিষও খরিদ করতে হ'বে ওকে। দু'দিন বাদে ওর মেয়ের বিয়ে। আর কিছু না হোক, নিদেন গোটা দুই শাড়ী জোগাড় করতেই হ'বে। ঠিকেন্দারবাবু লোক ভালো। ওকে ধরেই এর একটা ব্যবস্থা করতেই হ'বে। দরকার হ'লে কর্ত্ত করবে ও।

হঠাৎ ওর চিন্তার যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়...খুব বেঁচে গেছে ও। আর একটু হ'লেই দু'খানা মাল বোঝাই গোরুর গাড়ী ওর ঘাড়ে এসে পড়েছিল আর কি! ভাগ্যিস ও একটু সোরে গিয়েছিল, নইলে ও পড়তো গিয়ে একেবারে গো-গাড়ীর চাকার তলার।

—আরে চোখে জ্ঞাখ না ক্যান মরুবি! চাপা পড়লে তো এ হালার ভাই-এর দোষ হত। নবাগত গাড়োয়ান দাঁত খিঁচিয়ে উঠে।

—দোষটা কা'র শুনি? মাহুযকে মাহুয বলেই খেয়াল নেই, গাড়ীটা বেমানুম গায়ে তুলে দিয়ে আবার

কথা। পথে হেগে চোখ রাঙানো? ক্রোধে গর্জে উঠল ভুঁইয়ালী।

—আরে রাখ রাখ। হিঁহুলোকেই অমনি ধারা মাথা গরম। দ্বিতীয় গাড়োয়ান ভেংচি কাটে।

—বুলিস কি? মুখ সামলে কথা বুলিস। ভুঁই-মালী এবার চীৎকার করে উঠে। মেজাজ কি সাথে চটে, জাত তুল্লি ক্যান?

—জন্মের ঠিক নেই, তার আবার জাতের দেমাক দেখ! আগজ্ঞক কটুক্তি করে।

—ওরে হালার হালা, তোদের ঠিক আছে তো? ভুঁইয়ালী এবার মরিয়া হয়ে উঠে।

—আলবৎ! মুখ সামলে কথা বুলিস! বহু কঠোর জুক চীৎকার শোনা যায়।

—তবে রে! ভুঁইয়ালী তড়াং করে লাফিয়ে উঠে। আর বচসা চলে না...শুরু হয় তুমুল কাণ্ড...ভীষণ লাঠালাঠি! নিমেষে দুই দলে দালা বেধে যায়।

আগজ্ঞকরা সাগরদীঘির চাষী। ডাকাতের বংশ। এরাও কম যায় না, কাজেই কুকক্ষেত্র বাধে। এদের অবশ্য রহিমই ভরসা। ও একজন বড় লেঠেল।

ভুঁইয়ালীর চোখ দ্বিগুণে আঙন ঠিকরে বার হয়। রহিম কোথায়? ও একবার চারিদিক চেয়ে খোঁজ করে...কোথায় গেল সে? কৈ তার পাক্সা নেই কেন?

হঠাৎ ওর চমক ভাদে! একটা বড় বাঁশ নিয়ে ভুঁইয়ালীকে লক্ষ্য করে ছুটে আসছে কে? রহিম না? তবু পেয়ে চট করে ও একপাশে সরে যায়। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে অমনি বাঁশটা গিয়ে সজোরে লাগে বাবলা গাছের একটা ডালে। ঝর ঝর করে ঝরে পড়ে অজ্ঞত কাঁচা পাকা বাবলার পাতা। একটা বক তবু পেয়ে চীৎকার করতে করতে উড়ে যায়।

খুব বেঁচে গেছে ভুঁইয়ালী! মাথায় লাগলে শুঁড়ো হয়ে যেত একেবারে। বুঝতে আর বাকী থাকে না শয়তানটা ওদের পক্ষ নিয়েছে। রাগে ভুঁইয়ালীর মগজের বিলুতে যেন আঙন ধরে যায়। তাক করে ও এক মোক্ষম ঘা বসিয়ে দেয় রহিমের ডান হাতের কব্জির উপর। অমনি ওর হাত থেকে বাঁশটা পড়ে যায়। বেচারী আর্ভানাদ

করে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। বড় লেপেছে ওর। হয়তো ওর হাতখানা ভেঙে গেছে একেবারে।

চারিদিকে হে-চৈ পড়ে যায়। এমন সময়ে প্রেসিডেন্ট হীরেনবাবু এসে পড়েন। মারপিট থেমে যায়। দু'দলই ওঁকে ঘিরে দাঁড়ায়। ওরা চায় একটা মীমাংসা। অভিযোগের তুমুল চীৎকারে কান ঝালাপালা হয়ে যায়। হীরেনবাবুর ধমকে ওরা চুপ করে। বোর্ড অফিসে বিচারের ব্যবস্থা করে উনি শাস্ত করেন ক্ষুব্ধ জনতাকে।

ওদিকে রূপলাল নৌকা খুলে দেয়।

তাড়াতাড়ি ওরা মাল বোঝাই গাড়ী তোলে নৌকায়। একে একে সকলেই নৌকায় উঠে বসে। নৌকা ছাড়ে ছাড়ে অবস্থা। দড়ি খোলা হয়েছে। দু'জন লোক নৌকা ঠেলতে আরম্ভ করেছে। বোঝাই বেশ একটু বেশীই হয়েছে। কাদায় একটু বসে গেছে নৌকাটা। দু'জনের সাধ্যি কি নডায়।

আরও দু'জনকে নামতে হ'লো। তখনও রহিমের পাক্ষা নেই। ওর জন্তে হীরেনবাবুর প্রাণটা ছাঁৎ করে উঠল। হাজার হোক দেশের লোক তো! পাশের একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন : আরে রহিম ছোঁড়াটা কৈ রে? তাকে তো দেখছি না!।

—শয়তানটা। ভুঁইমালী গর্জে উঠল : হাত ভেঙে পড়ে আছে ঐ গাছতলায়। আরও এসেছে বোধ হয়। গোঙাচ্ছে পড়ে পড়ে! মরুক শালা! ও হতভাগার ছায়া মাড়ালেও পাপ হয়। মরুক ব্যাটা নিমকহারাম বেইমান!

—আহা বেচারী যন্ত্রণায় ছটফট করছে। তোরা থাকতে শেষে.....

—না বাবু! মোরা পারবো না! হীরেনবাবুর কথায় বাধা দিয়ে প্রতিবাদ করে ভুঁইমালী : পারবো না আপনার কথা রাখতে।

—একটা কথা রাখ শ্রীধর। হীরেনবাবু মিনতি করেন।

—মাপ করবেন বাবু! শ্রীধরও আপত্তি জানায়।

—কথাটা না হয় শুনেই উত্তর দে।

—কিছুতেই পারবো না, মরে গেলেও না।

—মাথা ঠাণ্ডা কর দিকি!

হীরেনবাবুর কথাও ওরা শুনতে চায় না। কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটে। হীরেনবাবু কি যেন চিন্তা করলেন। মিনিট দুই কাটলো। বজ্রেন : আমার একটা অমুরোধ রাখ ভুঁইমালী। ও ছোঁড়াটাকে নিয়ে আর, হাসপাতালে ওকে ভর্তি করে দিবে আসবো।

আর কোন আপত্তি উঠল না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওরা রাজী হ'লো। শেষ পর্যন্ত বনোয়ারী চৌকিদার আর ভুঁইমালীই ধরাধরি করে রহিমকে নৌকায় উঠাল। ও তখন আরে অটৈতত। ভুল বকছে মাঝে মাঝে। ওকে গোরুর গাড়ীর মধ্যে শুইয়ে দিল ওরা। স্বস্তিতে ওর চোখ দুটো বুঁজে এলো।

নৌকা ভেগে চলল শ্রোতের মুখে।

রূপলাল ঝিক মারছে প্রাণপণে। মেঘে ঢাকা ধমথমে আকাশ। অক্ষজলের মত টলটল করছে বিলের জল। এখুনি ঝড় উঠবে কিনা কে জানে? আকাশের অবস্থাও খারাপ। ভয় পেয়েছে রূপলাল। ইংগিতে একজনকে হাল ধরতে বলে, ও বৈঠা ঠেলে চল।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই নৌকা ভিড়ল ওপারে।

অশথ গাছের গোড়ায় নৌকা বাঁধল রূপলাল। যাজীরা নামতেই সকলের কাছ থেকে পাভানী আদায় করল রূপলাল।

পাড়ের কড়ি চুকিয়ে যে যার পথ দেখল। রূপলালও চুকলো সামনের গ্রামে। ওখানেই ওর ঘর।

মাস ছ'য়েক পরে।

গায়ের ইলেক্শন নিয়ে একটা দাঙ্গা হয়ে গেছে। ঘটনার দিন হীরেনবাবু ফিরছিলেন সদর থেকে। ফিরতে একটু দেরীও হয়েছে। রূপলালকে বলা ছিল, সে একটু দেরী করেই নৌকা ছাড়বে। সাইকেলে আসতে আরও একটু দেরী হয়ে গেল হীরেনবাবুর। চারিদিকে তখন সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। বনের ছায়ায় সে অন্ধকার আরও গাঢ়তর হয়ে উঠেছে। সামনের মাহুষের মুখ পর্যন্ত চেনা যায় না। এমনি নিকষ কালো অন্ধকার!

হঠাৎ কার আর্ত চীৎকার শোনা গেল।

নৈশ বাতাসে ভেসে এলো একটা গোড়ানি আওয়াজ !
পায়ের দফাদার কিংকর ছুটে গেল সেইদিকে । ব্যাপার
কি ? দু'জন লোক বাঁশবনের ওদিকে ছুটে পালাল কেন ?
রূপলালও ফিরছিল পঁা থেকে ।

ও একটু এগিয়ে গেল সেইদিকে । কে একজন ওরই
পা খেঁসে যাচ্ছিল । অন্ধকারে সে লক্ষ্যই করেনি ওকে ।

হঠাৎ সেই ছায়া মূর্তিটাকে দেখে কেমন যেন সন্দেহ
হ'লো রূপলালের । সুর্যোগ বুঝে ও খপ করে চেপে
ধরল ওর হাতখানা । চমকে উঠল লোকটা । ওর
জন্তে সে যেন প্রস্তুত ছিল না । নিজেই মুক্ত করবার
নিষ্ফল চেষ্টা করলো লোকটা । রূপলালের বলিষ্ঠ হাতের
চাপে লোকটা যেন কাবু হ'য়ে পড়েছে । লোকটা এবার
স্পষ্টই বুঝল এ হাতের কবল থেকে পরিচাণ নেই ।

রূপলাল এতক্ষণে লোকটাকে কায়দা করে ফেলেছে ।
ওর কাঁধে একটু ঝাঁকানি দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে :
ব্যাপার কি ? কি মতলব তোমার ?

কোন উত্তর এলো না ।

ও তখনও সামলাতে পারে নি নিজেকে । রূপলাল
টের পাছে ওর নাড়ীর দ্রুত স্পন্দন ! ভয়ে যেন ওর
সর্বাস্ব কাঁপছে । ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে । কে যেন ওর
বুকের তিতরে জোরে জোরে হাতুড়ি পিটছে ।

রূপলালের আরও সন্দেহ হ'লো ওর সাজপোষাক
দেখে । লোকটার মাখায় পাগড়ী বাঁধা । কোমরে
পামছা জড়ানো । হাতে একটা পাকা বাঁশের লাঠি ।
ওর ঘাড়ের একটা জোর চাপ দিয়ে জিজ্ঞাসা করলো
রূপলাল : কি নাম তোমার ?

—আমি রহিম । এতক্ষণে উত্তর এলো ।

—ব্যাপার কি রে ? হয়েছে কি ? কৌতূহল প্রকাশ
করলে রূপলাল ।

—খুন হয়ে গেছে চাচা । একেবারে খুন । কাঁদো
কণ্ঠে জবাব দিলে রহিম ।

—কে—কে খুন হলো ? আশংকায় রূপলালের
কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠল ।

—আমাদের প্রেসিডেন্টবাবু গো, প্রেসিডেন্টবাবু !
আর বলতে পারলে না রহিম ।

—কে খুন করলো । খুব জোরে ওকে একটা ঝাঁকুনি
দিলে রূপলাল ।

এতক্ষণে সেদিনের কথোপকথনের অর্থ স্পষ্ট হয়ে
উঠল রূপলালের কাছে । সেদিন এমনি একটা ঘটনার
ইংগিত পেয়েছিল সে । ওরই কানে ভেসে এসেছিল
অস্পষ্ট চাপা কণ্ঠের খানিকটা আলোচনা : শালাকে খুন
করতে পারবি তো রহিম ! সদরে গিয়েছে, বুঝি ।
আজকালের মধ্যেই ফিরবে ।

—যে আজ্ঞে ! সেজ্ঞে তাববেন না একটু । স্পষ্টই
শোনা গেল রহিমের কণ্ঠস্বর ।

এবার রূপলাল পরিষ্কার বুঝতে পারলে, এ সুরোধ-
বাবুরই কারসাজি । ইলেকশনেরই এই পরিণাম ।
তোটে হেরে হীরেনবাবুর উপর তাঁর এই আক্রোশ ।

—লোকটা কি পিশাচ ! তন্দ্রলোকের ছদ্মবেশেই কি
এমন জঘন্য শয়তানি লুকিয়েছিল ! আর তাবতে পারে
না রূপলাল ।

ওদিকে আলো হাতে কিংকর এগিয়ে যায় বনটার
দিকে । একটু অহুসঙ্কানের পর ওর চোখে পড়ে একটা
রক্তাক্ত দেহ । একটু কাছে যেতেই কিংকর প্রায় ঝাঁকে
উঠে : একি, এ যে হীরেনবাবু ! তার বুকের তিতরটা
গুড়গুড় করে উঠে : বড়ে প্রাণ আছে তো ? না, এখনো
বঁচে আছে । বুকের কাছটা ধুকধুক করছে । মরেনি
নিশ্চয় ! দেহে এখনও উদ্ভাপ রয়েছে । কিন্তু অজ্ঞান,
অচৈতন্য ।

এই পর্যন্ত বলে ধামলো রূপলাল । সংক্ষিপ্ত
ঘটনা এই । ভাঙা ভাঙা বাংলায় সাক্ষী দিয়ে গেল
রূপলাল ।

তারপর ?

একে একে অনেকের জেরা হয়ে গেল । হীরেনবাবুর
স্বপক্ষে লোক জুটেছিল ঢের । আর কারুর সাক্ষী
বাকী নেই ।

শেষে উঠলেন হীরেনবাবু ।

তাঁর মুখের কথা শোনবার জন্ত সকলেই উদ্গ্রীব ।
সমস্ত মকদ্দমার ফলাফল নির্ভর করছে তাঁরই সাক্ষীর
উপর । নরহত্যার এ হেন বড়যন্ত্রের নিশ্চয় একটা কঠিন

শান্তি হবে। সকলের দৃঢ় বিশ্বাস যে, ইয়াকুব, ধরণী মাঝি আর রহিমের দীপান্তর হ'বেই। এ হেন খুনের আসামী কিছুতেই রেহাই পাবে না। কারণ অপরাধ খুবই গুরুতর।

নিম্নক কোর্ট।

জুরিরা সাগ্রহে চেয়ে আছেন হীরেনবাবুর মুখের দিকে। আর যেন কারুর দৃষ্টি সইছে না। একটু পরেই হীরেনবাবুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল : অকম্প, শান্ত কণ্ঠস্বর। ও রহিম ছোঁড়াটা নির্বোধ গৌয়ার। ওর ঠিক দোষ নেই। পরের প্ররোচনায় ও এ কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিল। তা'ছাড়া ওর লাঠিতে আমি জখম হইনি। ইয়াকুবের লাঠি ধেয়েই আমি মাটিতে পড়ে যাই। ও অবশ্য দলের সঙ্গে ছিল—এই যা।

আর কোন সাক্ষ্য প্রমাণের প্রয়োজন হলো না।

বিচারকের সঙ্গে জুরিরা একমত হ'লেন। বিচারক রায় দিলেন : নরহত্যা করার চেষ্টার অপরাধে দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা অনুসারে ইয়াকুব আর ধরণী মাঝিকে দশ বছরের জজ্ঞ সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হলো। আর আসামী রহিমের বিরুদ্ধে উপযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ না থাকায় তাকে বেকসুর খালাস দেওয়া হলো। তবে এই বড়মন্ত্রে সে লিপ্ত থাকায় তার দুইশত টাকা জরিমানা করা হলো। অন্যদ্বারা একে ছ'মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

টাকার শ্রদ্ধ করে সুবোধবাবু অবশ্য রেহাই পেলেন। তাঁর গায়ে কোন আঁচ লাগল না বটে, কিন্তু দেনার দায়ে তাঁর মাথার চুল বিকিয়ে গেল।

এতদিনের খুনের মামলার এখানে নিষ্পত্তি হলো।

লোকের ভিড় ঠেলে কোর্টের বাইরে এলো রহিম। অহুশোচনার আশুনে যেন পুড়ে যাচ্ছে তার বুকটা। হীরেনবাবুর মহত্বের কথাই যেন তার মনের মধ্যে তোলপাড় করছে : লোকটা কি? মানুষ, না দেবতা? ও যেন আর ভাবতে পারছে না।

এমন মানুষের সঙ্গে কেউ শত্রুতা করে? অর্ধপিশাচ আর্ধপরা সুবোধবাবুর ধগ্নরে পড়ে এ কি অভয়া কাজ করেছে সে? ষোদাতালায় কাছে কি জবাবদিহি করবে সে?

ওর পায়ের তলার মাটিও যেন সরে যাচ্ছে। ওর কেমন যেন সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। জীবনে ও অনেক ঘৃণ্য কাজ করেছে, অনেক খুনখারাপিও করেছে। অনেক রাহাজানি করেছে। কিন্তু তার জন্তে ও এমন আত্মপ্লানির আশুনে দগ্ধ হয়নি কোনদিন। ভালোমন্দ বহু লোকের সংস্পর্শেও এসেছে সে, কিন্তু সে সব মানুষের মধ্যে এমন ঔদার্য, এমন মহত্ব কোনদিন চোখে পড়েনি তার।

তাই এক দুঃসহ লজ্জায় ওর ঘাড় হেঁট হয়ে আসছে। ও আর পারছে না। চেনা লোকের সামনে যেন চোখ তুলে চাইতে পারছে না। বিবেক যেন ওকে পদে পদে দংশন করছে। এমন করে যে প্রতিশোধ নেওয়া যায়, অহুকম্পা করে যে এতখানি চরম সাজা দেওয়া যায়, ওর এ ধারণাই ছিল না।

ওর মনের মধ্যে যেন ঝড় বইছে।

পাগলের মত টলতে টলতে এসে দাঁড়াল হীরেনবাবুর সামনে। বিহ্বলের মত জড়িয়ে ধরল তার পা। জু' পায়ের মধ্যে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সে। অহুশোচনায় যেন তার পাষাণ হৃদয় গলে বার হয়ে আসছে অশ্রুর বজ্রা।

এতটা আশা করেন নি হীরেনবাবু।

এত বড় বেয়াদপ রহিম যে এত সহজে বশে আসবে, তা তিনি ভাবতে পারেন নি। তবে আশা করেছিলেন যে, এ থাকায় নিশ্চয় ওর মন পরিবর্তন হবে। হঠাৎ এ হেন ভাবান্তর দেখে হীরেনবাবু উল্লসিত হয়ে উঠলেন। ধীরে ধীরে ওকে পথ থেকে উঠালেন।

দাঁড়ালেন রহিমের মুখোমুখি হয়ে। সে প্রশান্ত দৃষ্টির সামনে চোখ মেলে চাইতে পারল না রহিম। তার মনে হ'লো যেন স্বর্ষের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছে সে। চোখ বুঁজে সে জ্যোতিকে উপলব্ধি করা যায়, কিন্তু সেদিকে কি চাওয়া যায়?

আশ্চর্য। ছুটি মুখই যেন বোবা হয়ে গেছে। কারুর মুখে কথা সরছে না। কারুর কি আর কিছুই বলার নেই? সব বক্তব্যই কি শেষ হয়ে গেছে?

হীরেনবাবুই সে নীরবতা ভাঙলেন। অনেকক্ষণ

পত্রে পথ-নির্দেশ

[চন্দননগর প্রবর্তক সত্ত্বে শ্রীগুরু-মন্দির ও তৎসংলগ্ন সনাতন ভারত-সংস্কৃতির প্রদর্শনী গৃহ ও অমূল্য-কেন্দ্র নির্মাণ সম্পর্কে প্রবর্তক-সম্পাদক শ্রীরাধারমণ চৌধুরীর লিখিত পত্রের উত্তর এখানে প্রকাশিত হইল। লিপিগাছেন শ্রীধাম নবদ্বীপের 'বঙ্গবিবুধজননী সভা' ও 'পল্লীবাসী' পত্রিকার সম্পাদক, মণ্ডল কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সভাপতি, দেশহিতব্রতী প্রাজ্ঞ প্রবীণ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীগোপেন্দ্রভূষণ সাংখ্যাতীর্থ মহোদয়। পত্রে পরম শ্রেষ্ঠ সাংখ্যাতীর্থ মহাশয় যুগপুরুষ সজ্জগুরু শ্রীমতিলালের অসামান্য জীবনের উপর যে আলোকপাত করিয়াছেন তাহা সজ্জগুরুর জীবন ও সাধনার সহিত তাঁহার অন্তরঙ্গ পরিচয়েরই ফলশ্রুতি—যার আবেদন ব্যক্তিকে অতিক্রম করিয়া জাতীয় চিন্তে পৌঁছানোর প্রয়োজন অনস্বীকার্য বলিয়াই পত্রখানি এখানে পত্রস্থ করা হইল।—প্রঃ সংঃ]

পরম কল্যাণবরেষু,

ভাই রাধারমণ, তোমার ভাগিনেয়ের হস্তে প্রেরিত চিঠি এইমাত্র পাইলাম।

সজ্জগুরু সম্পর্কে তোমাদের আমি পরমাত্মীয় বলিয়াই মনে করি, সুতরাং তোমাদের উপর বিরূপ হইবার উপায় নাই। তবে এখন একে বৃদ্ধ, তাহাতে অসুস্থ, তাই অনেক সময় সবদিকে তাল রাখিতে পারি না। সেজন্য অল্প কিছু মনে করিও না—দুঃখ পাইব।

হাঁ, তোমাদের আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিবার চিঠি ঠিক সময়মতই পাই। সত্য, কিন্তু আমার নিজের চিন্তাটা একটু আলাদা ছিল। কথাটা বলিয়াই ফেলি—

সজ্জগুরু ঘটনাক্রমে চন্দননগর আশ্রয় করিয়াছিলেন, লক্ষ্য ছিল—'পূর্বতন মহাজনগণের প্রদর্শিত পহার সশ্রদ্ধ অঙ্গসরণ' করিয়াই নিজস্ব প্রতিভা ও কর্মোন্মেষ প্রতিষ্ঠা। সুতরাং তাঁহার মত বিরাট ব্যক্তিত্বকে চন্দননগরের আর পাঁচটা ঐশ্বর্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিব কেন? যে সংস্কৃতি রক্ষার জন্ত তিনি শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন, সে সংস্কৃতির রাজধানীই বল, আর প্রাণকেন্দ্রই বল, তা' হইল—নবদ্বীপ, চন্দননগর নয়।

পর কথা কহিলেন : রহিম, এর চেয়ে ঢের কঠিন শাস্তি আজ তোর প্রাপ্য ছিল। ইচ্ছে করলে তাকে ফাঁসিকাঠে লটুকাতে পারতাম। কিন্তু আমি সে পথ মাড়াই নি; কারণ আমি জানতাম দুনিয়ার কোনো দৈহিক সাজাই তোর মনের পরিবর্তন আনতে পারবে না। তাই তোকে বাঁচাতে গিয়ে একটু মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়েছে,

সেই অতীতের কত কথা আজ মনে পড়িতেছে!

অর্ধ শতাব্দীরও পূর্বের কথা। আমরা ছিলাম তখনকার রিপন কলেজের ছাত্র—রাষ্ট্রগুরু অরেন্দ্রনাথ আমাদের অধ্যাপক। কিন্তু বরোদার চাকুরী ছাড়িয়া শ্রীঅরবিন্দের শুভাগমনে ছাত্রদের প্রাণে প্রাণে জীবন্ত প্রেরণা জাগিয়া উঠিল। অরবিন্দের 'ধর্ম' আর উত্তরপাড়ার অরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'কর্মযোগিন্' ধর্মের তিস্তিতে যে নূতন কর্মযোগের সন্ধান দিতেছিলেন, তাহার কেন্দ্র গড়িয়া উঠিল চন্দননগরে। ১৯১০ খৃঃ শ্রীঅরবিন্দ চন্দননগরে আসিয়া সজ্জগুরুরই গৃহকক্ষে আশ্রয় লইলেন। সেদিন হইতেই সজ্জগুরু হইলেন—বিপ্লবী বাংলার তারুণ্যশক্তির সেনাপতি। কিন্তু সেই দীপকের মত জ্বলন্ত দুইটা চোখ যে কি অধ্যাত্মচেতনার ফুলিঙ্গ বহন করিতেছে, তখনকার দিনের তরুণের পক্ষে তাহা ধরা কি তেমন সহজ ছিল? কয়েকজন তখন ধরিতে পারিয়াছে যে, প্রাণে তখন তাঁহার অটল বিশ্বাস ভারতের স্বধর্ম ও স্বাধীনতা যুগনন্দ হইয়া চলিলে তবেই পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ হইবে; তা' না হইলে শুধু পাশ্চাত্য দেশের অন্ধ অঙ্গুষ্ঠে মাথুয বথেছাচার হইয়া পড়িবে,

রহিম। এও একটা পাপ। কিন্তু আমার সে পাপ তোর চোখের জলে ধুয়ে-মুছে গেছে রহিম। এতদিন পরে তোকে আমি ফিরে পেয়েছি মাহুষের মধ্যে। বলতে বলতে রহিমকে জড়িয়ে ধরলেন হীরেনবাবু।

অনুতপ্ত, অভিভূত রহিমের মুখে কোন কথা ফুটল না। কেবল দু' কঁোটা জল গড়িয়ে পড়ল ওর চোখ বেয়ে।

সে স্বাধীনতার দ্বারা দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষিত হইবে না, তাহা স্বার্থসর্কস্ব, আদর্শভ্রষ্ট, অর্থার্জনমাত্রনিষ্ঠ বিজ্ঞাতীয় রূপ পরিগ্রহ করিবে।

তারপর কেমন করিয়া তিনি তাঁহার অনন্তসাধারণ সংগঠন শক্তি দ্বারা তাঁহার সাধনাকে প্রাণবন্ত করিয়া গেলেন, সে এক বিরাট ইতিহাস। বহু যোগ্য ব্যক্তি এ সম্বন্ধে বহু কথা বলিয়াছেন, আমি শুধু আজ তাঁহার অসাধারণ দূরদৃষ্টির সামান্য একটু পরিচয় দিয়াই স্মৃতিতর্পণ শেষ করিব। বলিতেছিলাম—সংস্কৃত ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার পক্ষে তাঁহার জীবনব্যাপী আগ্রহ, উৎসাহ ও প্রচেষ্টার কথা।

তখনও কিন্তু ভাষাসম্রাট রাষ্ট্রের সংহতির মূলে কোন জটিলতার সৃষ্টি করে নাই। ইংরাজীর মোহমুগ্ধ নেতৃবৃন্দ এ প্রস্তাব হাসিয়াই উড়াইয়া দিয়াছিলেন। হিন্দীওষালারা স্বপ্নেও ভাবেন নাই—হিন্দী কোনদিন রাষ্ট্রভাষার দাবি করিতে পারে।

কিন্তু ক্রান্তদর্শী ঋষিদেরই কৃপাসিদ্ধ মহাপুরুষ মতিলাল দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিলেন—যদি স্বাধীন ভারতকে আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসনে বসাইতে হয়, তবে একমাত্র সংস্কৃতকেই রাষ্ট্রভাষা করিতে হইবে। ভারতের ঐতিহ্য, ভারতের সংস্কৃতি, ভারতের সংহতি-শক্তি—একবাক্যে যে এই সংস্কৃতিরই পুনরুত্থানের আশায় প্রতীক্ষা করিতেছে, পরাধীন ভারতে সাধনার বেদীমূলে বসিয়াই সম্বৎসর তাহা দিব্যদৃষ্টিতে দেখিয়া-ছিলেন। ভাগলপুর, ছাপরা, কাশী, বিহার ও উত্তর

ভারতের কেন্দ্রে কেন্দ্রে প্রাণচঞ্চল যাহা কিছু আন্দোলন, তাহারও মূলে ছিল তাঁহারই প্রত্যক্ষ প্রেরণা। চন্দননগরে নিজগৃহে নিখিল ভারত দেবভাষা সম্মেলনের আহ্বান করিয়া ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়াও তাঁহার যে ঐকান্তিক আগ্রহ দেখিয়াছি, তাহাতে মনে হয় এই সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা করিবার যে কোন প্রচেষ্টার সহিত তাঁহার স্মৃতি জড়িত রাখা উচিত।

আর একটি কথা বলিয়াই শেষ করিব? তিনি যখন নবদ্বীপে আসেন, তখন নবদ্বীপের পাঠাগারে তাঁহার সম্বর্জন্য উত্তরে বলিয়াছিলেন—“নবদ্বীপ বাংলার প্রাণকেন্দ্র, বাংলার সংস্কৃতিকে নবদ্বীপ প্রাণবন্ত করিয়াছে। শ্রীগোরাধের প্রেমধর্ম সমগ্র ভারতকে একই প্রেমমুদ্রে বাঁধিবার সন্ধান দিয়াছে। নবদ্বীপের নব্য ছাত্র নাস্তিক্যবাদ চূর্ণ করিয়া ভগবৎশাসনের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়াইয়াছে। নবদ্বীপের জয় হউক।”

এই নবদ্বীপে সংস্কৃত রাষ্ট্রভাষার আন্দোলনে ‘মতিলাল স্মৃতিমন্দির’ গড়িয়া উঠিলে, সেইটাই হইবে সম্বৎসর স্মৃতিরক্ষার সবচাইতে গৌরবময় ব্যবস্থা।

তোমাদের যা খুসী করিতে পার, আমি বলিয়া যাইব—ত্যাগব্রতী বুনো রামনাথের তিতার অদূরেই তাঁহার স্মৃতিপুত সংস্কৃতির গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। যাক, একবার যদি আসতে প্রাণ ভরিয়া সব পুরানো কথা বলিয়া বাঁচিলাম। আশীর্বাদ লও—কুশল জানাও। ইতি—

নবদ্বীপ

৩০/৬/৩০

নিত্যন্তভার্থী

শ্রীগোপেন্দ্রভূষণ সাংখ্যতীর্থ

সহজ কর প্রাণ

শ্রীজলধর বিশ্বাস

প্রার্থনা মোর, প্রার্থনারই কর অবসান,
মোর সাধনার হোক সমাধি, সহজ কর প্রাণ।
পূজার আড়ম্বরে তোমায় করব না গো পর,
স্তব আর স্তুতির অন্তরালে হে রাজ-রাজেশ্বর,
গড়ব না তো বাধার বিদ্যা,
অন্ধ ব্যবধান।

করব না ধ্যান তোমায় নিয়ে গহন বনে,
খুঁজব না গো তোমার আলো বসে ঘরের কোণে।
সবুজ-শ্যামল সোনার মাঠে
গাইব বসে গান।
হাসব আমি, খেলব আমি,
লুটব সবার প্রাণ।

খেলাধুলার বাঙালী

শ্রী সুশীলপ্রসাদ সর্বাধিকারী বার-এ্যাট-ল

বাঙালী তখন ফুটবলে মাতোয়ারা। এমন মাতোয়ারা যেন এ খেলা তাদের প্রধান জাতীয় খেলা। তাদের অজ্ঞাত নয় যে বাঙালীর মস্ততার কারণেই এ 'খেলা সসার' (Soccer) খেলাঙ্গ অসামরিক মহলে চালু হয়। তাদের মুষ্টিমেয় কয়জন এর পূর্বে রাগবি খেলা খেলিত। সেই খেলা দেখে স্কুলের বালক ছাত্রেরা রাগবি বল নিয়ে ফুটবল খেলতে শুরু করে। বাঙালার ইতিহাসে এ এক ব'লবার ঘটনা।

এর ২১ দিনের মধ্যে ছাত্রদের খেলাঙ্গ অধ্যাপকদের পরামর্শে 'সসার' ফুটবল খেলতে তারা আরম্ভ করে। এর পুঙ্খানুপুঙ্খ কাহিনী রচিত ও প্রচারিত হয় বহু বহু পূর্বে। তখনকার অসামরিক খেলাঙ্গ খেলুড়েরা বাঙালীর অহুসরণ করে এ খেলায় যেতে যায়।

তখনকার দেশী কাগজওয়ালারা নিজেদের মধ্যে রাজনীতি লইয়া কামড়াকামড়ি করিতে ব্যস্ত। বাঙালী কিশোরের এই পুঁচকে ব্যাপারের দিকে তারা নজর দেবে! রামচন্দ্র! আর ধলা কাগজওয়ালারা ছোকরাদের বাহাদুরীর কথা পুঁথিগত ক'রবে। অভাবনীয় অচিন্ত্যনীয়! সুতরাং বাঙালীর এতবড় কেরামতি মাঠে মারা যাবার উপক্রম।

এমন সময়ে খেলোয়াড়ের একটা মোক্ষম মার পুঁথিওয়ালাদের করে দেয় একেবারে 'থ'। রসও গড়ায় অনেক দূর। মারের চোটে ছটফটিকে ওঠে সাগরপারের খাস লগুনও। ত্রাহি ত্রাহি রব ওঠে সেখানে সর্বত্র।

ইণ্ডিয়ান হকির দাপটে থর থর কম্পাদিত হয়েছে সারা পৃথিবী। আধুনিক ইণ্ডিয়ান ফুটবল সফরে, 'বাঃ বাঃ' স্বচক মুকুন্ডিয়ানা ভিন্ন ভারতের ভাগ্যে আর কিছু ঘটেনি। সেই ভারতের ক'জন মিলিতভাবে ঘরে বসে যে প্রকাশ কাণ্ড করে তাতে হ্যাঁ হয় ধুরন্ধরেরা সর্বত্র। তখন কোথায় হকি, কোথায় কি! বাঙালী জোয়ান খালি পাশেই এ ভেদে লাগায়। ভেদে বেসামাল হয়ে পড়ে খাস বিলাতী গোরার পাল।

বাঙালীর ফুটবলের আদি সজ্ব শোভাবাজার < বাঙালীকে এইভাবে পরাইয়া দেয় রাজমুকুট সাড়ঘরে। এখানেই এর শেষ নয়। এই সজ্জের বনেয়া হেমার স্পোর্টিং—সংযুক্ত চিন্মুরা টাউন আই-এফ-এ শীঘ্রে ধলাদের মারিয়া পাট বানাইয়া দেয় ১৯০৮-এ। ইহার তিন বৎসর পরে ওই শোভাবাজারেরই আর এক বনেয়া মোহনবাগান সর্ষপ পুষ্পে ধাঁধিয়া দেয় শাদা গোরার শ্রেষ্ঠীদের। যে জানিত সেই বলিয়াছে আঙ্গকের এ মোহনবাগান পূর্বের মোহনবাগানের তুলনায় অনেক কমজোরী।

ইহার পরে চলিয়াছে ও চলিতেছে আপনা-আপনি মারামারি কাটাকাটি। ধলা মিলিটারি নাই। 'সিভিল' দল হইয়া পড়িয়াছে রুড্ (Rude), ঐতিহ্যহীন। বাঙালীই চালু করায় ফুটবল সারা ভারতবর্ষে।

বুলি চালি এখন শুনিতে পাওয়া যায়, স্থানীয় বা প্রাদেশিক ফুটবলের দিন এখন নহে। এখন ফুটবল All India. ইহাতে আমার ছায় অনতিজ্ঞ বলিবে খোড়-বড়ি-খাড়া, খাড়া-বড়ি-খোড়। হাসিয়া অনভিজ্ঞদের মনে এমনও হয়, মূর্ত্তিপূজক আমরা, ওই একই বহুরূপ ধারণ করিতেছে—একমেব দ্বিতীয় আর তুলিবে না। খেলার মান ক্রমে মানকচূতে পরিণত হইতে বাধ্য। অর্থাৎ খোলে-ঝালে অবলে আনাজ পড়িতেছে একই রকমের। তাতেও Profiteering-এর সীমা পরিসীমা নেই। আর খেলোয়াড়দেরও সেই খেলোয়াড়ী স্পিরিট নাই।

বাঙালী এ খেলায় সারা ভারতের শিক্ষাঙ্গুর। সেই গুরুকে গুরু বানাইয়া হাড়িসার করা হইয়াছে, ওই Profiteering-এর ঠেলায়, বাঙালীর সব কিছুর সাধে যাইতে বসিয়াছে বাঙালী খেলোয়াড়ও।

খেলার যে মান দাঁড়িয়েছে, তাতে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করা ভারতীয়ের পক্ষে সুদূর স্বপ্ন। এ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল একদিন বাঙালী একক। মহাক্রান্তের কারণ সেই বাঙালী পাকে-প্রকারে সব হারাইতে বসেছে হাল গুরু

জ্ঞানেশ্বরী

ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতপ্রসিদ্ধ মারাঠী সাধক জ্ঞানেশ্বর বা জ্ঞানদেব
এম্বোদশ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে অতি অল্পবয়সে মারাঠী
ভাষায় গীতার যে টীকা ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহা শুধু
ভারতীয় ধর্মসাহিত্যে নহে, বিপুল সাহিত্য ও শিল্পাদর্শের
বিচারে ইহার খ্যাতি দেশপ্রসিদ্ধ হইয়াছে। আমাদের
পরম সৌভাগ্য যে, প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত প্রাণকিশোর গোস্বামী
মহোদয় এই মহাগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ (দ্বিতীয় সংস্করণ)
প্রকাশ করিয়া বাঙালি মহারাষ্ট্রের ভৌগোলিক ব্যবধানকে
অধ্যাত্মসেতুর সাহায্যে সঙ্কুচিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ
বাংলাদেশে যেমন চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের ফলে
সংস্কৃতভাষায় অধ্যাত্মসাধনা ও রসতত্ত্ব বাংলাভাষা
অবলম্বনে তুফাতুর নরনারীকে পরিতৃপ্ত করিয়াছে, ঠিক
সেইরূপ মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত সাধকসম্প্রদায় প্রাদেশিক
ও লৌকিক ভাষায় অমূল্য শাস্ত্রগ্রন্থকে লোকচেতনার
গোচরীভূত করিবার সুদৃঢ় ব্রত লইয়াছিলেন। জ্ঞানদেবের
জ্ঞান-প্রেম-ভক্তি মহনজাত এই গ্রন্থ বাংলা ভাষায়
অনূদিত হইবার ফলে মহাপুরুষের তীক্ষ্ণ বীশক্তি ও
স্বস্মাতিস্বস্ম মননশীলতা বাঙালীরও অন্তর স্পর্শ করিবে।
বেদ-উপনিষদ-গীতা এই প্রস্থানত্রয় ভারতধর্মকে ধারণ
করিয়াছে, সংরক্ষণ পরিপুষ্টও করিয়াছে।

তন্মধ্যে শ্রীভগবানের মুখনিঃসৃত অমৃতবাণী শ্রীমদ্ভগবদ্-
গীতা শুধু ভারতের নহে, সমগ্র বিশ্বের মুমুক্শু সাধক,
লীলারসিক ভক্ত, নিস্পৃহ কর্মযোগী ও গার্হস্থ্যাত্মবাসী
সাধারণ মানুষের প্রাণমনে যে শাস্তি-সাম্বনার বাণী বর্ষণ
করে, অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে তাহা তুলনারহিত।

বহুকাল পূর্বে পশ্চিম ভারতের এক ত্যাগী ভরুণ সেই

গীতাকে মারাঠী ভাষায় রূপান্তরিত করিয়া সাধারণ
মানুষের জ্ঞান-প্রেম-কর্মের তৃষ্ণা মিটাইয়াছিলেন, তাহার
বহুকাল পরে পূর্ব ভারতের এক মর্মজ্ঞ, জ্ঞানী ও সাধক
প্রভুপাদ গোস্বামী মহোদয় সেই মারাঠী জ্ঞানেশ্বরীকে সহজ
জ্বলিত সরস বাংলায় অমূল্য প্রচার করিয়া বাংলার
ধর্মসাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। ১৩৪১ বঙ্গাব্দে
এই গ্রন্থ সর্বপ্রথম ঢাকা হইতে প্রকাশিত হয়। তারপর
ইহা সম্প্রতি নব কলেবরে বহু জ্ঞানগর্ভ তথ্যসহ প্রকাশিত
হইয়া বাঙ্গালী পাঠকের একটা বহুদিনের অভাব দূর
করিয়াছে। যদি কেহ বাংলা ভাষায় পাণ্ডিত্যের সংযম
ও জ্ঞানভূষিত নিপুণতা দেখিতে চাহেন, তাহা তিনি এই
গ্রন্থে প্রচুর পাইবেন। যদি কেহ বুদ্ধিগ্রাহ্য তত্ত্ববস্তুর
জ্বলিত ব্যাখ্যা পাঠ করিতে চাহেন, ইহাতে তিনি
তাহাও পাইবেন। এই ক্লাসিকধর্মী শাস্ত্র সংযত বাকুরীতি
ধর্মসাহিত্যের আদর্শ ভাষা। বস্তুতঃ এরূপ সুখপাঠ্য ধর্ম-
গ্রন্থ আমরা অধিক পাই নাই। গোস্বামী মহোদয়ের
কুশলী রচনারীতির ফলে বুদ্ধির সত্য হৃদয়ের সত্যে
পরিণত হইয়াছে। একপ মহৎ কল্যাণকর গ্রন্থের বহুল-
প্রচার সকলেরই একটি আবশ্যিক পবিত্র কর্তব্য।
গোস্বামী মহোদয় ভারতীয় ভাষায় লুক্কায়িত এইরূপ
অমূল্য রত্নকে বাংলাভাষায় প্রচার করিয়া বাংলা
সাহিত্যের একটা বিশেষ শাখার গৌরব বৃদ্ধি করুন,
ইহাই আমাদের প্রার্থনা।*

* জ্ঞানেশ্বরী : শ্রীপ্রাণকিশোর গোস্বামী এম. এ. বিদ্যাভূষণ অনূদিত।

প্রকাশক—শ্রীবিনোদকিশোর গোস্বামী, ৩ নং বৈকুণ্ঠ সন্মিলনী লেন,

হাওড়া—৪ মূল্য—বাবো টাকা

কিনে। সে গরু দূর না করে দিলে, সে ভাব ঘোল-আনা
বর্জন না করলে, পাকৈ পড়া রোধ হবে না। বাঙালীকে
আবার বাঙালী খেলোয়াড় গড়বার শক্তি কে ধরে!
সাত নকল হতে আসল বাঙালী বাঙ্গালীই না হারা হয়

দেখবার শক্তি কার আছে? ফুটবল নাটকের অপয্যুত
ঘটবার পূর্বে—বাঙালীর সচেতন হওয়া কর্তব্য। ভাড়াটে
খেলোয়াড় দিয়ে বাহবা অর্জন করায় কোন জাতি বড়
হয় না। মান-মর্যাদাও তাতে বাড়ে না।

জঙ্গলময় ঘন,

A black and white portrait of a man in a military uniform. He is wearing a dark jacket with a light-colored shirt and a tie. He has short, dark hair and is looking directly at the camera with a slight smile. The background is a plain, light-colored wall.

এর পর অষ্ট্রেলিয়ার Stolle এলো শেষ খেলার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে কিন্তু তাকে দাঁড়াতে দিলো না বিদ্যুৎ গতিতে এগিয়ে, পিছিয়ে ও ভঙ্গি মেয়ে। একক খেলার Stolle-এ পর্য্যন্ত কোনওদিনই খুব উচ্চ মানের খেলা দেখাতে পারেনি কিন্তু যে ভাবে সে স্পেনের Santana-কে সেমি ফাইনালে পরাজিত করে শেষ খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার অধিকার লাভ করেছিলো তা সকলকে অবাক করে দিয়েছে। তার দুর্ভাগ্য যে, Mackinley সেদিন অনমনীয় দৃঢ়তা দেখিয়ে তার সব চালকেই বেচাল করে দিলো। অষ্ট্রেলিয়ার মান রাখলো শেষ পর্য্যন্ত তার মার্গারেট স্মিথ মেয়েদের খেলায়।

অপূর্ব কৌশল এবং মানসিক দৃঢ়তা দেখিয়ে একের পর এক টিম করা খেলোয়াড়দের অতি সহজেই পরাজিত করে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মহিলা খেলোয়াড় প্রতিপন্ন করলো নিজেকে। হুঃ হয় Emerson-এর জন্ম। এই বৎসর অষ্ট্রেলিয়া ও ক্রাসের জাতীয় প্রতিযোগিতায় বিজয়ী

এই গুণী খেলোয়াড় টেনিসের 'Grand Slam' লাভ করার আশা থেকে বঞ্চিত হোলো উইম্বলডন-এ পরাজিত হয়ে। Grand Slam করার আর দুটি প্রতিযোগিতা হোলো উইম্বলডন ও আমেরিকার জাতীয় প্রতিযোগিতা। এর পূর্বে এই সম্মান লাভ করেছে অস্ট্রেলিয়ার Rod Laver, সে এখন পেশাদারী দলে নাম দিখিয়েছে।

ক্রিকেট খেলায় ইংলণ্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ছোটখাটো অনেকগুলি খেলা এবং তিনটি টেস্ট খেলা শেষ হয়েছে। চতুর্থটিও আরম্ভ হয়েছে। খেলার ফলাফল এখনও পর্যন্ত সমান সমান হয়েছে। প্রথম টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল অপূর্ণ খেলে ইংলণ্ডকে ১০ উইকেটে পরাজিত করেছে। ইংলণ্ড কিন্তু অসীম দৃঢ়তা দেখিয়েছে পরের দুটি টেস্টে। দ্বিতীয় টেস্টের খেলা অদ্ভুতভাবে শেষ হয়েছে কারও জয় বা পরাজয় না হয়ে। পঞ্চম দিনের খেলার শেষ ওভার-এও খেলার নিষ্পত্তি সম্বন্ধে উৎসুকভাবে দর্শকদের বসে থাকতে হয়েছিলো। ইংলণ্ডের শেষ জুটি খেলছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের Hall বিশ্বের সেরা ফাস্ট বোলার বল করছে। ব্যাণ্ডেজ-বঁধা হাত নিয়ে ইংলণ্ডের কাউড়ে এবং তার জুটি অপরদিকে এলেন। মাত্র ছয় রাণ করলে ইংলণ্ডের জিত হয় এবং মাত্র একটি উইকেট নিতে পারলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের জয় হয়। ইংলণ্ডের ভাগ্য ভাল—এলেন পর পর দুটি বলই আটকিয়ে দিলো এবং কাউড়েকে ভালো হাত নিয়ে আর খেলতে হয়নি। সমান সমান ভাবে খেলা শেষ হোলো। ইংলণ্ড অসীম মনোবল নিয়ে খেলে বুঝিয়ে দিলো যে টেস্টে জিততে হোলো সর্কাদীনভাবে ভাল খেলে তাদের হারিয়ে জিততে হবে। স্পষ্টভাবে এই কথা সত্য সত্যই বুঝিয়ে দিলো এর পরের খেলায় তৃতীয় টেস্টে। অবিরাম বৃষ্টিপাতের জন্ত খেলা বার বার স্থগিত রাখায় খেলার সময় অনেক কম হয়ে গিয়েছিলো। এই খেলায় প্রথম ইনিংসে ইংলণ্ড সর্বপ্রথম বারের জন্ত ৩০ রাণে এগিয়ে থাকলো। ইংলণ্ডের Trueman ও Dexter বোলিং-এ অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়ে দুর্দর্শ ব্যাটসম্যান ওরেল, সোবারস, কানহাই, বুচার, সলোমন

ও হার্টদের ঘাসেল করে দিলো মোটে ১৮৬টি রাণ করতে দিয়ে। ডেস্টার পেলো ৪ উইকেট ৩৮ রাণ দিয়ে আর Trueman ৫ উইকেট ৭৫ রাণ দিয়ে। দ্বিতীয় ইনিংসে সেই বৃষ্টি লেগে রইলো। চতুর্থ দিনে ১৪টি উইকেট, ছিল দুই পক্ষের মাত্র ৩০২ রাণের বিনিময়ে। এর মধ্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ করলো ইংলণ্ডের ২২৬ রাণ ৯ উইকেটের বিনিময়ে এবং বাকি ৭৫ রাণ। পঞ্চম এবং শেষদিনের শুরুতেই ইংলণ্ড এ উইকেটে ২৭৮ করে বিপক্ষকে ছেড়ে দিলো ২৮০ মিনিটে ৩০৯ রাণ করতে। অদ্ভুত দৃঢ়তার সঙ্গে খেললো ইংলণ্ডের ক্যাপ্টেন Dexter, Sharpe ও প্রবীণ খেলোয়াড় Lock। Lock ও Sharpe-এর জুটিতে যে রাণসংখ্যা হোলো তা নবম উইকেটে ইংলণ্ড বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ খেলার রেকর্ড হয়ে রইলো। ২৮০ মিনিটে ৩০৯ রাণ Worell, Kanhai, Butcher, Solomon, Hunte ইত্যাদি খেলোয়াড়দের পক্ষে একটা অসম্ভব কিছুই নয় কিন্তু ইংলণ্ডের ফাস্ট বোলার Trueman সে আশা সমূলে বিনষ্ট করলো অদ্ভুতভাবে বল দিয়ে। মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতির পর এক সময়ে সে মাত্র চার রাণের বদলে ৫টি উইকেট নিলো। টেস্ট খেলার ইতিহাসে অতীব বিরল এই সাফল্য। তারপর বেলা তিনটের ভিতরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সব খেলোয়াড় আউট হয়ে ফিরে গেল তাঁবুতে। ইংলণ্ডের জয় হোলো অপ্রত্যাশিতভাবে।

সাবাস্, ইংলণ্ড সকলে একবাক্যে বলল। আবার আশা হোলো তাদের টেস্টে সমান সমানভাবে লড়াবার। এর জন্ত চিরকুত জয় থাকলো ইংলণ্ড তার আদরের Freddie Trueman-এর কাছে। Trueman সর্বসমেত ১২টি উইকেট পেলো ১১৯ রাণের বিনিময়ে। এ পর্যন্ত সে পেলো ২৫ উইকেট তিনটি টেস্ট খেলায়। চতুর্থ টেস্ট আরম্ভ হোলো Leeds-এ অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। দুই দলের যেই বিজয়ী হবে সে একটা জিত এগিয়ে থাকবে এবং পঞ্চম টেস্ট-এ কোনও প্রকারে সমান সমানভাবে নিষ্পত্তি করতে পারলেও এই দফায় জয় হবে তাদেরই। দুই দলেরই সাজ-সাজ রব। যথারীতি Toss-এ জিতল আবার ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং

প্রথম ইনিংস-এ ব্যাট করে সর্বসমেত ৩৯৭ রান করলো এরা। চতুর্থ উইকেটে Sobers ও Kanhai-এর জুটিতে শতাধিক রান করে দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করলো ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তারপর Solomon একাই ৬২ রান করে তার ওপর পাকা ইমারত তৈরী করলো। Kanhai এর দুর্ভাগ্য। একশত রান করতে মোটে ৮ রান বাকি থাকতে ইংলণ্ডের প্রবীণ বোলার Lock-এর ফাঁদে পা দিয়ে আউট হয়ে গেল। সর্বাপেক্ষা বাহাদুরী দেখালো— Sobers ভাঙ্গা আঙ্গুল নিয়ে ১০২ রান করে। দ্বিতীয় দিনে অসুস্থ খেলা হোলো। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৫ উইকেটে ২৯৪ রান নিয়ে আরম্ভ করে মধ্যাহ্ন ভোজের একটু পরেই ৩৯৭ রানে আউট হলে ইংলণ্ডের খেলা শুরু হোলো। কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজের ফাট বোলার Griffith কাউকে চোখে মুখে দেখতে দিলো না। দুর্দর্শ বোলিং শুরু করলো সে। ৫টিকে আউট করলো সে দেখতে দেখতে মোট ৩২ রানের বিনিময়ে। তার সঙ্গে সঙ্গত করলো স্পিন বোলার Gibbs তার চাতুর্যপূর্ণ বোলিং কোরে। দিনের শেষে ইংলণ্ডের রানসংখ্যা হোলো মাত্র ১৬৯ আটটি উইকেটের বদলে। প্রবীণ খেলোয়াড় Lock অনমনীয় দৃঢ়তা দেখিয়ে ৫১ রান করলো বাকি সব শুল্ক থেকে আরম্ভ করে ৩১ রান পর্যন্ত। তৃতীয় দিনের প্রারম্ভেই মান আর পাঁচ রান করে ইংলণ্ড মোট ১৭৪ রানে সকলে আউট হয়ে গেল। Griffith আরও একটি উইকেট পেয়ে মোট ৩৬ রানে ৬ উইকেটে পেলো। তারপর শুরু হোলো ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংস। যদিও তারা প্রথম ইনিংসে ২২৩ রানে এগিয়ে রইলো ইংলণ্ডের থেকে তবু Frank Worrell 'ফলো অন' না করে দ্বিতীয়বার খেলতে পাঠালো তার দলকে। অসুস্থ খেলা দেখালো Kanhai, Butcher ও Sobers যথাক্রমে ৪৪, ৭৮ ও ৫২ রান করে। যাকে পায় তাকেই মারে এই সিদ্ধান্ত খেলোয়াড়েরা। মোট ৩৯ মিনিটে ৬৫ রান করলো Kanhai আর Butcher এর জুটি এবং ৮০ মিনিটে এরাই ১০০ রান করলো। Butcher ব্যক্তিগত করলো ৬০ মিনিটে ৫০। তারপর Sobers-এর সঙ্গে মিলে চতুর্থ উইকেটে এরা করলো ৫০ রান ২২ মিনিটে। এদের জুটি ভাঙলো ৯৬ রান করে এবং দলগত ১৮১ রান কবে। কিন্তু এর পর ইংলণ্ডের Titurns ও Lock অসুস্থভাবে বল খুরিষে বাকি ছয় উইকেট নিয়ে নিলো মোট ৪৮ রানের বিনিময়ে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের মোট রানসংখ্যা হল ২২৯। ৪৫২ রানে এগিয়ে থাকলো ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ইংলণ্ড আবার শুরু কোরলো অতিশয় নৈরাশ্রজনকভাবে এবং তৃতীয় দিনের খেলার শেষে ইংলণ্ডের রানসংখ্যা হোলো ১১৬ চার উইকেটের

বিনিময়ে। ৩৩৯ রান পিছনে এবং খেলার আরও দুই-দিন এবং দলের আর মোট ছয়টি খেলোয়াড় বাকি। ইংলণ্ডের অবস্থা খুবই শোচনীয়। নিশ্চিত পরাজয় তাদের দিকে তাকিয়ে রইলো, চতুর্থ দিনে খেলার শুরুতে Brian close ও Tim Parks যথাক্রমে ৫৬ ও ৫৭ রান করে ফণিকের ক্ষত্র আশার আলো জ্বাললেও বাকি কয়েকজন প্রাণ বিনা প্রতিবাদেই আউট হয়ে গেল Gibbs ও Sobers-এর চাতুর্যপূর্ণ স্পিন বলের কাছে। দুর্দর্শ Griffithও তার ভাগ বসালো ৩টি উইকেটে নিয়ে। ইংলণ্ডের পুরো দল অতিষ্ঠ হয়ে গেল মোট ২৩১ রান করে। দেড় দিনের খেলা তখনও বাকি, ইংলণ্ড হারলো ২২১ রানে। জয় জয়কার উঠল Worell-এর সুনিপুণ অধিনায়কদের Griffith ও Gibbs-এর অসুস্থ বোলিং সাকল্যে ও Garry Sobers-এর ব্যাট ও বল দুইয়েরই চরম উৎকর্ষতায়। ওয়েস্ট ইন্ডিজ একটি টেস্ট বেনী জিতে এগিয়ে রইলো। সকলে একবাক্যে স্বীকার করলো ওয়েস্ট ইন্ডিজের শ্রেষ্ঠত্ব।

কলকাতার প্রথম ডিভিসন ফুটবল খেলা খুবই জমে উঠেছে। প্রথমার্ধের খেলা শেষ হয়ে দ্বিতীয়ার্ধের প্রায় অর্ধেক শেষ হয়ে এসেছে। শুরুতে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আভাস পাওয়া গিয়েছিলো তাই এখনও চলেছে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার দুটি রূপ। একটি প্রাণ বাচানো আর একটি শ্রেষ্ঠতা লাভের প্রচেষ্টা অর্থাৎ চ্যাম্পিয়নশিপ-এর যুদ্ধ। প্রাণ বাচানোর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আছে পুলিশ, বালিপ্রতিভা ও রাজস্থান। পুলিশ-এর অবস্থাই অপেক্ষাকৃত শোচনীয় এবং চ্যাম্পিয়নশিপের যুদ্ধে আছে মোহনবাগান, ইষ্টবেঙ্গল, বি, এন, আর। আরও ছিল ইষ্টার্ন রেল, কিন্তু এরা এখন পিছিয়ে পড়েছে। শুরু থেকে মোহনবাগান উপরেই আছে। লীগের প্রথমার্ধে ইষ্টবেঙ্গল তৃতীয় স্থানে এবং বি, এন আর দ্বিতীয় স্থানে ছিল। দ্বিতীয়ার্ধে পর পর সাতটি খেলায় জয়ী হয়ে ইষ্টবেঙ্গল মোহনবাগানের নাগাল ধরে নিয়েছে। বি, এন, আর এই দুই দলের ঠিক নীচেই আছে। ভাগ্যচক্র ঘুরছে। যে ইষ্টবেঙ্গল প্রথম পর্বে তাদের খেলায় অনেক দুর্দলতার পরিচয় দিয়েছে সেই ইষ্টবেঙ্গলই দ্বিতীয় পর্বে অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে চলেছে। মোহনবাগান দোষে-গুণে প্রায় একরকম ভাবেই চলেছে। বি, এন, আর কতকগুলি খেলায় বিশেষ করে প্রথমার্ধের বড় সবগুলি খেলায় ভাগ্যদেবীর সুপ্রিয়তায় জয়ী হয়ে আজও ইষ্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের সঙ্গে চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াইয়ে

প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে চলেছে। শেষ পর্যন্ত কে লীগজয়ী হবে, বলা সম্ভব নয়। তবে এবার মোহনবাগানের সম্ভাবনা বেশী। এই চ্যাম্পিয়নশিপ যুদ্ধে অপ্রত্যাশিত জয় ও পরাজয় ঘটে থাকে। তাই সকলে উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে থাকে অপেক্ষাকৃত কমজোরি দলের সঙ্গে এই-সব ক্ষমতাসালী দলেদের খেলার দিকে। নীচের দিকের দলগুলির মধ্যে যে খেলাগুলি হচ্ছে তা দেখে মনে হয় যেন কোনওরকমে একটি পয়েন্ট লাভ করাই হল এই সব প্রতিদ্বন্দ্বিদের একমাত্র উদ্দেশ্য। অনেকে বলে নেপথ্যে এই সব খেলার ফলাফল পূর্বীকৃতই স্থির করা হয়। উদ্দেশ্য তাদের প্রথম ডিভিশনের অস্তিত্ব বজায় রাখা। তাদের ভিতর এই প্রকারের খেলাই নজরে পড়ে বেশী দ্বিতীয়ার্ধের খেলায়। উপরের দলগুলির কিন্তু সব খেলাই ভাল খেলে জিততে হয়। কেননা, তাদের পরাজয় করে যে সব ছোট দল একটি বা দুটি পয়েন্ট অর্জন করতে সক্ষম হয় তারা টিকে যায় এবং বাকির মারামারি করে শেষ পর্যন্ত নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য।

এ বৎসরের খেলায় খুব একটা উঁচু মানের পরিচয় পাওয়া গেছে বলে আমার মনে হয় না। নিরবচ্ছিন্ন সমমানের খেলাও কোনও দল দেখাতে পারেনি। খেলার সুরতে আশা করা গিয়েছিলো যে, প্রতি সপ্তাহে প্রতি দলকে দুটি করে খেলতে হওয়ার জন্য খেলোয়াড়দের পক্ষে অনেক সুবিধা হবে নিজেদের শারীরিক যোগ্যতা বজায় রাখার ও শারীরিক যোগ্যতা বজায় থাকলে খেলাতেও উন্নত মানের পরিচয় পাওয়া যাবে স্বাভাবিকভাবে। সে আশা কতদূর সফল হয়েছে ঠিক বুঝে ওঠা যায়নি। কতকগুলি খেলায় কোনও কোনও খেলোয়াড়কে অতি সুনিপুণ সটে গোল করতে দেখেছি, আবার সেই সব খেলোয়াড়কেই হাস্তকরভাবে দশ হাত দূর থেকে নৈরাশজনক সট মেরে হতাশার সৃষ্টি করতে দেখেছি। কোনও কোনও দল কতকগুলি খেলায় খুব উন্নত ধরনের সংহতিবদ্ধতার পরিচয় দিতে দেখেছি, আবার অন্য খেলায় তারাই এই দলগত অসংবদ্ধতা বজায় রাখতে পারেনি। খেলোয়াড়দের শারীরিক যোগ্যতার অভাবও নজরে পড়েছে। তবে মোটের উপর আনন্দ হয়েছে দেখে যে, সমস্ত দলই মোটামুটি একটা সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি অনুসারে অনুশীলনের চেষ্টা করেছে। অপেক্ষাকৃত

কমজোরি দলেদের পরাজয় করতে দেখেছি শক্তিশালী দলেদের। অগণিত দর্শকরা পূর্বের মতই খেলার মাঠে উল্লাসধ্বনি ও হতাশার গুঞ্জন তুলছে। আশাযিত হয়েছি দেখে যে এ বৎসরে ফুটবল মাঠে খুব বড় রকমের গোল-মালের সৃষ্টি এখনও হয়নি। যে কোনও বড় দলের পরাজয়ের পরেই এই রকম একটা গুণগোলের সম্ভাবনা গত কয়েক বৎসর থেকে নজরে পড়ে আসছে। এর উৎস কিছু সংখ্যক অতি উগ্র সমর্থকদের মনোভাব। এই মনোভাবের অতি লজ্জাজনক প্রকাশে প্রকৃত ক্রীড়া-মোদীদের মনে ঘৃণামিশ্রিত ঘৃণের সৃষ্টি করে। এইবার তাই আশা হয় যে, প্রকৃত ক্রীড়ামোদীর মনোভাব এই উগ্র দর্শকদের ভিতর ক্রমে ক্রমে সঞ্চারিত হচ্ছে। খেলায় জয় পরাজয় আছেই। পরাজিত দলের এবং তাদের সমর্থকদের কর্তব্য যে-সব ক্রটিবিচারিতর জন্য পরাজয় হয়েছে তার সংশোধনের চেষ্টা করা। বিজয়ী দলকে বা নিজেদের দলের খেলোয়াড়দের বা রেফারীদের গালাগালি দেওয়ার অধিকার তাদের নেই। দলগত প্রশংসার দাবী তখনই করা যায়—যখন দলের খেলোয়াড়দের এবং তাদের সমর্থকদের মনে প্রকৃত খেলোয়াড়োচিত মনোভাবের সৃষ্টি হয়। কাজেই নিজেদের দলকে প্রকৃত ভালবাসা হবে তখনই যখন সেই দলের সমর্থকরা অযোগ্যভাবে জয়ের জন্য উৎফুল্ল হবে না, বা ভ্রাত্যভাবে পরাজিত হওয়ার জন্য বিপক্ষদলকে, নিজেদের খেলোয়াড়কে বা পরিচালকদের গালাগালি দেবে না। এর সঙ্গে আরও বাঞ্ছনীয় যেসব খেলোয়াড়রা প্রশংসনীয় খেলা খেলে তাদের দলকে পরাজিত করে তাদের দলনিরপেক্ষভাবে প্রশংসা করা ও উৎসাহ দেওয়া! এই আশা সফল হলেই বুঝব খেলা-ধূলায় প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। দেশ-বাসীর মধ্যে ব্যাপকভাবে খেলোয়াড়মূলত শৃঙ্খলা ও মনোভাব সৃষ্টি করাই খেলাধূলায় সার্থকতা। জাতীয় চরিত্র গঠনে তাই প্রকৃত ক্রীড়ার স্থান এত উচু। আমাদের দেশে খেলাধূলা ব্যাপকতর হয়েছে; কৌতূহলও যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে সেই পরিমাণে ইহাতে প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে, এ কথা বলা চলে না। খেলাধূলা যাতে অর্থকরী বণিক-বৃত্তিতে পরিণত না হয় এবং ইহার মূল উদ্দেশ্য মাঠে মারা না যায় সেদিকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়।



সম্মাদর্শন

জাতীয়তা : জগৎ ও জীবন দর্শন :

জাতীয়তার ভিত্তি জগৎ ও জীবন সম্পর্কে ব্যাপ্তি ও সমষ্টির মূল্যবোধ। এই সমবোধকে প্রকৃত বিশিষ্ট গোষ্ঠির সুনীতি জীবনচর্যা সম্ভাবিত ও সঞ্চিত যে সংস্কার তাহাই সেই জাতির সংস্কৃতি। যুগ যুগ সঞ্চিত ও সংগৃহীত সংস্কৃতি-ধারাটি বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করে বিশিষ্ট সমাজসংস্থায়, নীতিতন্ত্রে, চিন্তাচর্চায়—রাষ্ট্র-সমাজ শিক্ষা অর্থনীতিতে। বিচিত্র বিশ্বে বিভিন্ন জলবায়ু ভৌগোলিক সংস্থান সংহত সামগ্রিক মানসগঠনে সহায়ক। তাই বিচিত্র জাতির উদ্ভব হইয়াছে এবং চিরদিন জাতি-বৈচিত্র্য থাকিবেও। ভৌগোলিক পরিবেশ তথাকার অধিবাসীর স্বভাব, প্রকৃতি ও প্রযুক্তির জন্ম দিয়া থাকে। স্বজন পরিকল্পনার বৈচিত্র্য যেমন অনিবার্য, তেমনি মানস অসাম্যও অব্যাহত। গায়ের জোরে সব পার্থক্যে ভাজিয়া চুরিয়া এক করিতে গেলে যে প্রাকৃতিক নিয়মবিরুদ্ধতা হয় তার ফল কখনও স্থায়ী হইতে পারে না। এই আত্মবিকাশ, এই স্বভাব বিবর্তনের পরিণতিই জাতিকে কল্যাণপ্রতিষ্ঠ করিতে পারে।

এই স্ব-বর্ধ চ্যুতিই স্বাধীনতাস্তর ভারতের মন্ব্যস্তিক ঐতিহ্য। প্রত্যেক দেশের বা জাতি-গোষ্ঠীর সভ্যতা-বিকাশের ইতিহাস অমুখাবন করিলে প্রত্যেকটি সভ্যতার একটি বিশিষ্ট মূলধারা দৃষ্ট হয়। এই বিশেষ ধারাটি সেই জাতির জগৎ ও জীবনদর্শনেরই ফলশ্রুতি। সমষ্টি তথা সামগ্রিক মানব জীবনের সমস্ত সমাধান ও স্ব-শাস্তি বিধানের যে সব বিভিন্ন প্রয়াস আজকের পৃথিবীতে দেখা যাইতেছে তাহারও মূল কারণ এই জগৎ ও জীবনকে দেখার দৃষ্টিকোণের পার্থক্য। এই পার্থক্য অসংখ্য প্রকারের হইলেও, মোটামুটি তিনটি জীবন-বিকাশের ধারায় (way of life) ইহাদের অন্তর্ভুক্ত করা চলে—রাজ-নৈতিক, অর্থনৈতিক, সমাজতান্ত্রিক। এই তিনটি মত ও পথের প্রবক্তা ও প্রয়োগকর্তাদের মর্ম্মকথা এই যে, সাম্য চাই। রাজনৈতিক অধিকারের সাম্য, অর্থের উৎপাদন-বন্টনের সাম্য, সামাজিক ভেদ-বৈষম্যের সাম্য। বিশ্বশান্তি অগ্রাধাৎ অসম্ভব। সাম্যবাদেই প্রশান্তি—অসাম্যেই অশান্তি। এই বন্ধ ধারণার বশবর্তী হইয়া বিভিন্ন দেশের মধ্যে সংগ্রাম সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে। রুশিয়া, চীন প্রভৃতি দেশে ঠেসাইয়া গায়ের জোরে এই সাম্য আনিতে গিয়া মনোলিথিক স্টেটস্-এর (Monolithic

states) আবির্ভাব ঘটিয়াছে। এই বিশিষ্ট মনোভাবের দলীয় জগদ্বল পাষণ্ডতার জনগণের স্বল্পে চাপিয়া বসিয়াছে। মতবাদের মোহমুগ্ধ জনতাও প্রায়োক্ষোনের মতই মতান্তরিত আর কিছু ভাবনার অবকাশ পর্যন্ত পাইতেছে না। এই সব মতবাদীদের ভাব ও ভাবনার প্রবক্তা আছে, আছে স্ববি। মতবাদের ভাষ্যগ্রন্থেরও সীমা পরিসীমা নাই। আমরা যে তিনটি দলের নাম করিয়াছি তাহাদের মধ্যে আর যে পার্থক্যই থাকুক, একটি মৌলিক নীতি ও দৃষ্টির ক্ষেত্রে এই দলগুলি একমত। মানুষের সাম্য, শান্তি, উন্নতি, স্ব-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের দৃষ্টিটি সবারই পার্থিব। মানুষের পারমাণবিক কোন সম্পদের কথা ইহাদের ভাব্য ভাবনার মধ্যে নাই। অধিক বিস্তার না করিয়া ভারত-জীবনদর্শনের পরিভাষায় বলা যায় ইহারা সকলেই দেহাত্মবাদী। খাওয়া-পরা-বাচার পথকে নিরুটক ও নির্বাহ করাই ইহাদের সকল প্রয়াসের মূলে বিদ্যমান। দেহ ও 'ইহ'সর্বস্বতা এই সব মতবাদের গোড়ার কথা। ভারতবর্ষের দৃষ্টিতে এই আহা-নিরা-মৈথুনসর্বস্ব যে জীবন তা পশুজীবনেরই সামিল। পশুমানসসম্পন্ন অর্থ, রাষ্ট্র, সমাজ ও শিক্ষার ক্ষেত্রে সুনীতির স্থান কোথায়? সুনীতি এক্ষেত্রে সহজ এবং স্বাভাবিক। প্রযুক্তির অবাধ প্রস্রয়, অভাবের বৈচিত্র্য সৃষ্টি আর বৃদ্ধিতে এই আত্মরিক সভ্যতা লক্ষ্যপ্রান্ত। অজস্র অ-ভাব স্ব-ভাবকে আবরিত করিয়া এই সভ্যতা মানুষকে আত্মঘাতী আর উন্মাদ করিয়া তুলিতেছে। স্বাধীনতার উত্তেজনায় কিন্তু মানুষ আত্ম-হত্যা করিয়া জীবনের অবমান করে। স্বাধীনতার উৎসব করিতে গিয়া যুক্তরাষ্ট্রের শত শত নরনারী প্রতি বৎসর গতির উত্তেজনায় মুখে মোটর চুর্চটনায় অথবা জাহাজের মাঙ্গল হইতে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ বিসর্জন দেয়। একদিকে গৌরীশৃঙ্গে অভিযান অথবা মহাশূন্যে রকেট-পরিভ্রমণের চুঃসাহসিকতা, অপর দিকে সেই দেশেরই আপামর জন-সাধারণের মধ্যে শুন-জখম, চুরি, রাহাজানি, নারীহরণ ও ধর্ষণ প্রভৃতি হরেক রকম ঘৃণ্য অমানুষিক অপরাধ সংঘটনই প্রমাণ করে এই সভ্যতায় জগৎ ও জীবন সম্পর্কে মূল্যবোধ তথা সংবহনতার ত্রুটি নিশ্চয়ই কোথাও রহিয়া গিয়াছে। পাশবিকতার উর্ধ্বে মনুষ্যত্ব উজ্জীবনের মত সত্য ও সঁদাচারের সূত্র পছা এখনও এই সভ্যতার আলোতে ধরা পড়ে নাই। চক্ষে অভিযানের বিষয়কর তোড়জোড়ের মধ্যে বিজ্ঞানের চমৎকারিত্ব আছে, কিন্তু ইহার অসহায় অক্ষতা ধরা পড়ে যখন দেখি বৈজ্ঞানিক সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে ভূমিকম্পে অসংখ্য অধিবাসীর প্রাণহানি ও ধ্বংস নিবারণে ইহাব অক্ষ অসামর্থ্যতা। প্রকৃতিকে বশ করার যে দস্ত-দর্প ও অন্তর্গত রাজসিকতা তাহাকে মানবতার জয়যাত্রা বলিয়া

করতালি যারা দেয় তারাও অজ্ঞ অন্ধ—বিশ্ব-স্বজনের সামগ্রিক তাৎপর্য তাদের নিকট অনাবিষ্কৃত। বিশ্ব-প্রকৃতির ক্ষুৎকারে এই প্রাচীন পৃথিবীর বুকে কত অসংখ্য কোটিবার এমন অস্বপ্ন সত্যতার উদয় বিলয় সংঘটিত হইয়া গিয়াছে কে তার ইয়ত্তা করিবে!

জড়ধর্মী একান্ত বস্তুনিষ্ঠ সভ্যতার মূলগত গলদ এই যে, ইহার জীবন ও জগৎ দর্শনে বিশ্বাতীত কোন অয়োয নিয়ন্ত, শক্তিসম্পন্ন সত্যের স্বীকৃতি নাই। যার ফলে পশু মানুষের মনুষ্যকে উজ্জীবিত হইবার কোন সম্যক নীতি বা সাধনপন্থাও নাই। খাও, পর, ক্ষুধা কর—এই আদর্শই পাশবিক উন্মাদনা আনে। ভোগসর্বস্ব জীবন-দর্শনে জনসংখ্যা নিবারণে জন্মনিয়ন্ত্রণ অনিবার্য হইয়া পড়ে। এই অসংযত প্রবৃত্তির উশ্জ্বলতার পরিণাম সমাজে ও রাষ্ট্রে পশুধর্মের প্রাবল্য আনিতে বাধ্য। স্বজন-পরিকল্পনার নিগূঢ় তাৎপর্য এই যে, মনননশীল মানুষের ক্ষেত্রে মানুষের দেহ আর হৃদ হাত, হৃদ পা লইয়া জন্মিলেই মানুষ হয় না—একটা শীলসম্মত নীতি আর সাধনার মধ্য দিয়া মনুষ্যত্ব অর্জন করিতে হয়। যে সমাজ, যে রাষ্ট্র, যে অর্থনীতি এই মনুষ্যত্ব তথা দিব্যে সমুদয়নের আনুকূল্য করিতে পারে না, তাহা নিশ্চয়ই অশ্রদ্ধেয়।

ভারতের ঋষিকবি রবীন্দ্রনাথ তাই বিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নে পশ্চিমী জড়বাদী কৈজ্ঞানিক সভ্যতার অনাচারিতায় আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন ‘কিরে দাও সে অরণ্য, লও এ নগরী...’ এই খেদোক্তির মধ্যে তিনি ঋষি ভারতেরই পুনরুত্থান কামনা করিয়াছিলেন। মানবিক সমাজ সমাধানের এমন স্ননীতিসম্মত সমাতন মত ও পথ আর কুত্রাপি মিলিবে না। ভারতীয় দর্শনে জীবন, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থ, শিক্ষাকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখা হয় নাই। দিব্য জীবন-বিকাশ লক্ষ্যে এসবই ওতঃ-

প্রোতভাবে সংজড়িত। স্বাধীনতোত্তর ভারতবর্ষে এই সামগ্রিক জাতীয়তার আদর্শ ও লক্ষ্যে রাষ্ট্র, অর্থ, সমাজ, শিক্ষানীতি সংগঠিত ও ক্রমাগতসরিত হইবে, এইরূপ আশা করা গিয়াছিল। কিন্তু অসুর-উচ্ছিষ্টভোজী হইয়া এই পুণ্যভূমি ভারতে শিব গড়াইতে গিয়া বানরই বানানো হইতেছে। এই নির্বিচার পরামুর্করণতার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই রবীন্দ্রনাথ সতর্ক করিয়া দিয়াছেন : “চিন্তের ঐশ্বর্যকে অবজ্ঞা করিয়া জীবনযাত্রার সিদ্ধি-লাভকেই একমাত্র প্রাধান্য দিয়েছি। কিন্তু সংস্কৃতি বাদ দিয়ে এই সিদ্ধি কি যথার্থভাবে সম্পূর্ণ হতে পারে? * * ভারতবর্ষও হঠাৎ জ্বরদস্তি দ্বারা নিজেকে যুরোপীয় আদর্শের অমুগত করতে গেলে প্রকৃত যুরোপ হবে না, বিকৃত ভারতবর্ষ হবে মাত্র।”

ভারতবর্ষ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। স্বাধীনতা উচ্ছলতা নয়—স্ব-এর অধীনতাই স্বাধীনতার তাৎপর্য। স্বাধীনতা উপায়—লক্ষ্য নহে। লক্ষ্য স্বকীয় ভাবানুকূল নিজে সঙ্গঠিত করা। ভারতবর্ষ নিষ্কণ্টকভাবে বাহ্যতে নিজে লাভ করিতে পারে স্বাধীনতা সেই অযোগ্যই আমাদের দিয়াছে। বিশ্বের প্রত্যেকটি জাতি নিজস্ব জীবন বিকাশের ধারাটি (way of life) সংরক্ষণ করিতে গিয়া আণবিক অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হইয়াছে। ভারতবর্ষেরও আত্মবিকাশের বহু পরীক্ষিত একটি সনাতন মত, পথ ও নীতি আছে। পুরীর্ষ-কালের জগৎ ও জীবনদর্শনেরই ইহা ফলশ্রুতি। ইহা বিচিত্র ভোগময় জীবনযাত্রার মান বুদ্ধি নয়। এই সত্য, এই পথ ও নীতি আমরা বিশ্বত হইয়াছি বলিয়াই উদ্ভ্রান্তের মত বিপরীতধর্মী বিদেশীর ভুক্ত-উচ্ছিষ্ট কুড়াইয়া আনিয়া এই পুণ্যভূমির পবিত্রাঙ্গন কলুষিত করিয়া তুলিতেছি। ইহাই আজিকে, এই নির্মাণের যুগে, ভারতবাসীকে অবহিত হইয়া বিচার করিতে হইবে এবং নিজস্ব পন্থা বাছিয়া লইতে হইবে।

ফোন : ৮৪-৪০৮০, ৮২

যে কোনও
চাউলের
জরায়

গ্রাম .
রাইসডিংস

পশুপতি দ্রাম এণ্ড সন্স
প্রাইভেট লিঃ

ভারতের সর্ববিধ চাউলের প্রথম জাতীয় প্রতিষ্ঠান

৪৩/২ ও ৩৭এ, সুব্রহ্মনাথ ব্যানার্জী রোড, কলিকাতা-১৪।
বাড়ীতে চাউল পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা আছে।

সাধারণ

পঞ্জিকা রচনায় নব অধ্যায় :

১৩৭১ সাল হইতে পঞ্জিকা রচনায় ইতিহাসে এক নব অধ্যায় স্বরূপ হইবে। বিভিন্ন পদ্ধতির গণনার কালে বর্তমানে যে বিভ্রান্তি আছে, তাহা দূর করিবার জন্য আগামী বছর হইতে কেবলমাত্র সূর্যসিদ্ধান্ত অনুসারে ও নিরায়ণ মতে গণনা ভিত্তি করিয়াই পঞ্জিকাদি প্রস্তুত করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হইয়াছে। এই বিষয়ে সাহায্যের জন্য দপ্তর বিশেষজ্ঞকে লইয়া এক উপদেষ্টামণ্ডলী গঠনের স্থপারিশ করা হইয়াছে। ঐ মণ্ডলীতে বিশিষ্ট পঞ্জিকাক্তলির প্রতিমিথি ছাড়া বিশিষ্ট গণিত, গণিতজ্ঞ, বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদদের লগণা হইবে।

দিল্লীতে আণবিক ভেষজ চিকিৎসা কেন্দ্র :

দিল্লীতে নব প্রতিষ্ঠিত নিউ-ক্লিয়ার মেডিসিন এণ্ড এলায়েড সায়েন্স ইনস্টিটিউট চালু করা হইয়াছে। এখানে আণবিক ঔষধাদির সাহায্যে দুঃসাধ্য ও কষ্টদায়ক রোগের চিকিৎসা করা হইবে। এই ধরনের ইনস্টিটিউট ভারতে আর নাই। এখানে সাময়িক ও অসাময়িক বিজ্ঞানীরা কাজ করিবেন। প্রতিষ্ঠানটি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত হইবে।

অল্প মূল্যের পুস্তক-প্রদর্শনীতে প্রেসিডেন্ট :

ভারতের প্রেসিডেন্ট ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ বিগত জুন মাসে ইংলণ্ডে সফরকালে অক্সফোর্ডের অল সোলস্ কলেজের কডরিংটন লাইব্রেরীতে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের অল্প মূল্যের পুস্তক পরিকল্পনাধীনে ভারতে প্রেরিত পুস্তকাবলীর এক প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন। 'সায়েন্স টুডে' সিরিজের তিনটি পুস্তকে প্রেসিডেন্টের নিজের লেখা ভূমিকা রহিয়াছে। এই পুস্তকগুলি মৌল বিজ্ঞানের। উপপ্ৰতিসমূহ সহজ ও সবল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে; বাহ্যদের বিজ্ঞানের বিষয় সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নাই, তাহাদের নিকটও পুস্তকগুলি বোধ্য হইবে। ১৯৬০ সালের পর হইতে ভারতীয় ছাত্রগণ অল্প মূল্যের পুস্তক পরিকল্পনাধীনে প্রভূত লাভবান হইয়া আসিতেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ এক্ষণে তাহাদের পাঠ্যপুস্তকগুলি এক-তৃতীয়াংশ কম মূল্যে ক্রয় করিতে পারিতেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের টেক্সট বুক-সিরিজে এ পর্যন্ত ৪০টির অধিক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে—আরও ২০টি পুস্তক প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। 'ইংলিশ ল্যান্ডমার্ক বুক সোসাইটি' এই পুস্তকাবলীর প্রকাশের কার্যে

ব্যাপৃত। প্রেসিডেন্ট ডঃ রাধাকৃষ্ণণ পরিকল্পনার সাফল্যে মিঃ নরিংটনের নিকট সম্ভোষ প্রকাশ করেন।

বিজ্ঞানে মহিলার ডি-এসসি ডিগ্রী লাভ :

কলিকাতার 'ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপিকা শ্রীমতী বাণী চৌধুরী সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিজ্ঞানে ডি.এসসি ডিগ্রী লাভ করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ পর্যন্ত মাত্র তিনজন মহিলা বিজ্ঞানে ডি.এসসি হইয়াছেন। শ্রীমতী চৌধুরী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন শাস্ত্রের ধারা অধ্যাপক ডঃ অসীমা চট্টোপাধ্যায়ের অধীনে গবেষণা করেন। তিনজন বিদেশী বিশিষ্ট রসায়নবিদ তাহার গবেষণা নিবন্ধের ভূবনী প্রশংসা করিয়াছেন। শ্রীমতী চৌধুরীকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি।

পরলোকে বর্ধমানের মহারাজী :

গত ৩০শে জুন সকালে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের কারা ও সমাজ-কল্যাণ দপ্তরের উপমন্ত্রী বর্ধমানের মহারাজী অধিরাজী শ্রীমতী রাধারাণী মহতাব মাত্র ৫০ বৎসর বয়সে উভল্যাণ্ডস নাসিং হোমে পরলোকগমন করেন। ১৯২৬ সালে পাঞ্জাবের বিখ্যাত ধনী ও কংগ্রেস নেতা লালা দুনীচাঁদের কন্যা রাধারাণী বর্ধমানরাজ-পরিবারে আগমন করেন। বর্ধমানের উন্নতি-বিধানের জন্য তাহার চেষ্টার অবশিষ্ট ছিল না। বর্ধমানের উন্নয়ন প্রচেষ্টার স্থাপন তাহার জীবনের অন্ততম কীর্তি। বহু মূল্যবান এই প্রচেষ্টার তিনি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন। বহু শিক্ষা ও সমাজ-কল্যাণ সংস্থার সহিত মহারাজী অধিরাজী নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। প্রভূত ঐর্ষ্যের অধিকারিণী হইয়াও তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন পরিদ্রের সেবা। মার্জিত রুচি, বিচ্যোৎসাহী ও বিনয়ী মহারাজী বর্ধমানে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। তাহার কল্যাণময়ী জননী রূপটি বর্ধমানবাসীর চিত্তে যে রেখাপাত করিয়াছে তাহা সহজে মুছিবার নহে।

শ্রীসম্মী মজুমদার

ডি.রতন ও কোং

ফটোগ্রাফার্স

২২১, কণ্ঠওয়ালিস ট্রিট, কলিকাতা

ফোন: ৩৪ - ৩৭১১

সম্পাদক : শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি. এ. কর্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত।
প্রবর্তক প্রিন্টিং এণ্ড হাকটোন লিমিটেড, ৫২১৩ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীকণ্ঠদ্বন্দ্ব রায় কর্তৃক মুদ্রিত।



৪৮ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

প্রবর্তক

শ্রাবণ, ১৩৭০

জীবনের আলো

গীতার শ্রীভগবান বলিয়াছেন—“নিয়তং কুরু কৰ্ম”। নিয়ত শব্দের দুটি অর্থ। এক সৰ্বদা অর্থাৎ নিত্য আর এক সংযত। নিত্যকৰ্ম এবং সংযত কৰ্ম শাস্ত্রোক্ত এই দুই কৰ্মের মূলতঃ কোনই পার্থক্য নাই। তবুও দুইটির অর্থ শাস্ত্রকারগণ স্বতন্ত্রভাবেই দিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ‘সংযত’ কৰ্ম বলিতে ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া যে কৰ্ম তাহাকেই বুঝায়। ইহাতে মনের স্বৈর্য্য সৰ্ব্বাঙ্গে প্রয়োজন। নতুবা বাত্যান্মোলিত জলধিবক্ষে কর্ণধারবিহীন তরুণীর গ্রাম মনের সঙ্গে সারা জীবনটাই বিপন্ন হয়। আর ‘নিত্য’ কৰ্ম সম্বন্ধে ক্ষতি স্মৃতি উভয়েই একবাক্যে বলিয়াছেন—ইহা এমন কিছু যাহার অকরণে পাপভাগীই হইতে হয়। আহার, নিদ্রা, দেহধৰ্ম-পালন, সঙ্ক্যাবন্দনাদি সবই এই নিত্যকৰ্মের অন্তর্গত। নিত্যকৰ্ম বলিতে শাস্ত্রে ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ এবং নৃযজ্ঞ—এই পাঁচটি মহাযজ্ঞকেই বুঝাইয়াছে। গীতায় দ্রব্য, তপঃ, যোগ, স্বাধ্যায় ও জ্ঞান এই পাঁচটিকে যজ্ঞাহুষ্ঠানের আশ্রয়রূপে উক্ত হইয়াছে। এই সমস্ত ধৰ্মের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্ত। রাজা শাসননীতির অপলাপ করিলে যেমন অরাজকতারূপে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, ধৰ্মের নিয়ম শৃঙ্খলায় অবজ্ঞা করিলেও অন্তর্জগতে ততোধিক ক্ষতি হইয়া থাকে। আহাৰাদি নিয়ম অস্বীকার করিলে যদি দেহ ভঙ্গ হয়, তবে সঙ্ক্যা-বন্দনাদির নিয়ম ভঙ্গ করিলে, অধ্যাত্ম জীবনের ক্ষতির কারণ না হইবে কেন? ভারতীয় বলিয়া যে জাতি প্রসিদ্ধ, তাহাদের সমগ্র জীবনটাই এইরূপ ধৰ্মাহুষ্ঠানের ভিতর দিয়াই পরিচালিত। গীতার ভগবান ধৰ্মাহুষ্ঠানকে সহজ করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন—কোনটা নিত্যকৰ্ম, কোনটা সংযত কৰ্ম, কোনটা অকৰ্ম, কোনটাই বা বিকৰ্ম এতসব লইয়া মাথা ঘামাইও না। সৰ্বকৰ্ম ভগবানে উৎসর্গ করিয়া দাও। তুমি হও নিষ্কাম কৰ্মী। উৎসর্গই হোক তোমার ধৰ্ম। আর সেই উৎসর্গ অস্ত্র কোথাও নয়—“আমাতে”—“মমি সৰ্বাণি কৰ্ম্মাণি সংভ্রত” —আমাতে সৰ্বকৰ্ম উৎসর্গ করিয়া তুমি হও কৃৎস্নকৰ্মকৃৎ। গীতার ভগবানের এই বাণীকে রূপ দান করিয়া গেলেন দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর গিরিশ ঘোষকে “বকলমা” দিয়া। ভারতীয় সাধনার এতবড় দৃষ্টান্ত সম্মুখে থাকিতেও কি তুমি বুদ্ধিভ্রষ্ট হইবে? ‘কোনটা ধৰ্ম’, ‘কোনটা অধৰ্ম’ জানিবার জন্ত ইতিউক্তি ধাইবে? কেন এই দৈন্ত? তোমার ধৰ্মে তুমি স্বপ্রতিষ্ঠ হও। ঐ শোন ভগবানের পাঞ্চজন্তে অনাহত ধ্বনি উঠিতেছে—“স্বধৰ্মে নিধনং শ্রেবঃ পরোধৰ্মঃ ভয়াবহঃ।” তোমরা কি বধির কণ হইয়া থাকিবে? (পুরাতন ‘প্রবর্তক’ হইতে) ॥

সঙ্ঘস্কর শ্রীমতিলাল

আবেদ

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ (প্রথমঃ অষ্টকং। ষট্‌ত্রিংশং স্কন্ধঃ।) বিংশতি ঋক্

(সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলালের জীবন-ভাষ্য অনুসরণে)

শ্রীঅনিলবরণ তর্কবেদান্ততীর্থ

হেযাসো অগ্নেরমবস্তো অর্চয়ো ভীমাসো ন প্রতীতয়ে।

রক্ষস্বিনঃ সদমিদ যাতুমাবতো বিশ্বং সমত্রিণং দহ ॥ ২০ ॥

অর্থ—“অগ্নে” (হে অগ্নিদেব) “অর্চয়ঃ” (শিখাসমূহ) “হেযাসঃ” (দীপ্তিশালী) “অমবস্ত” (বলবান্) “ভীমাসঃ” (ভয়ঙ্কর) “ন প্রতীতয়ে” (প্রতীতির অতীত) “রক্ষস্বিনঃ” (বলবান, স্পর্ধাস্বিত) “যাতুমাবতঃ” (রাক্ষসগণকে) “সদমিদ” (সর্বদাই) “সংদহ” (সম্যক প্রকারে ভস্মীভূত কর) “বিশ্বং” (সকল) “অত্রিণং” (ভক্ষককে) [সংদহ—সম্যক প্রকারে দহন কর] ॥ ২০ ॥

সরলার্থ—হে অগ্নিদেব! আপনার শিখাসমূহ অত্যন্ত দীপ্তিশালী, বলবান এবং ভয়ঙ্কর—আমাদের ধারণাশক্তির অতীত। আপনি স্পর্ধাস্বিত রাক্ষসগণকে সর্বদাই সম্যক প্রকারে ভস্মীভূত করিয়া থাকেন—সর্বভক্ষক শত্রুগণকেও সেই প্রকার দহন করুন ॥ ২০ ॥

বিশদার্থ—অগ্নির প্রজ্জ্বলিত শিখাসমূহকে শাস্ত্রে অগ্নির জিহ্বা বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বাস্তব চক্ষে শিখা বহু মনে হইলেও ঋষিগণ উহাদের সংখ্যা সাতটি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সেই সপ্ত জিহ্বার নামও তাঁহারা দিয়াছেন কালী, করালী, মনোজবা, স্নলোহিতা, সূক্ষ্মবর্ণা, উগ্রা এবং প্রদীপ্তা। এই জন্মই অগ্নির অপর নাম সপ্তজিহ্ব। এই ঋগ্বেদে ঋষি অগ্নির সেই প্রজ্জ্বলিত সপ্ত জিহ্বার দিকে তাকাইয়া যেন বলিতেছেন—‘হে অগ্নিদেব! আমরা তো তোমাকে অনেক বিশেষণে বিশেষিত করিলাম কিন্তু তথাপি তোমার এই দীপ্তিশালী বলবান ভয়ঙ্কর শিখাসমূহকে ধারণায় আনিতে পারিতেছি না। তুমি আমাদের ধারণার অতীত। তোমার তেজের কাছে, তোমার বলের কাছে আর কাহারও বল স্পর্ধা খাটে কিনা জানি না। তুমি সর্বদাই স্পর্ধাস্বিত রাক্ষসগণকে সম্যক প্রকারে দহন করিয়া চলিয়াছ। সর্বভক্ষক যাহারা, তুমি তাহাদেরও ভক্ষক। সুতরাং তোমার তেজ, তোমার বল, তোমার বীর্য, আমরা ‘প্রতীতয়ে ন’ প্রতীতি করিতে পারি না।

যোর পুত্র কধ ঋষি এই ষট্‌ত্রিংশং স্কন্ধের বিংশতিটি ঋগ্বেদেই অগ্নির স্তবগাথা রচনা করিয়াছেন। এইটি এই স্কন্ধের শেষ মন্ত্র। পরবর্তী সপ্তত্রিংশং এবং অষ্টাঙ্গিংশং স্কন্ধে তিনি মরুৎগণের স্তবগীতি রচনা করিয়াছেন। ষট্‌ত্রিংশং স্কন্ধের এই শেষ মন্ত্রে ঋষি যেন স্বয়ং নতি স্বীকার করিয়া বলিতেছেন—হে অগ্নিদেব! আপনার সম্বন্ধে যতকিছুই বলি না কেন, আপনি যেন সে সব বলার উর্দ্ধে। আপনার তেজ, আপনার বলবস্তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। সুতরাং আপনি সর্বসময় আমাদের রক্ষা করুন। আমরা যেন আপনাকে নিত্য প্রজ্জ্বলিত করিয়া রাখিতে পারি। বাহিরের বিঘ্ন, অন্তরের বিঘ্ন কিছুই যেন আমাদের পরাভূত করিতে না পারে। আমাদের দম্ভ, দর্প, অভিমান প্রভৃতি আত্মরিক গুণসমূহ নিত্য উৎসর্গের হোমান্নিতে যেন আহুতি দিয়া যাইতে পারি। আর বাহিরের আত্মনিক ক্রিয়াকর্মেও যেন আমরা বাধাপ্রাপ্ত না হই। বাধা কি এক রকমের? দেহের অসামর্থ্যতা, পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া, প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রভৃতি কত রকমের। সেই সব বাধারূপ শত্রু যেন আমাদের বিপর্যস্ত, বিভ্রান্ত না করিতে পারে : আমরা যেন অন্তরে বাহিরে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে পারি। প্রাণাগ্নিকে নিত্য প্রজ্জ্বলিত করিয়া রাখিতে পারি—কোনও কারণে প্রাণের আগুন যেন প্রশমিত না হয় ॥ ২০ ॥

ঊনবিংশ শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য

ডাঃ তারাশ্রম সরকার

বিগত দুই শতকে বাংলাদেশ জীবন-বিকাশের সবদিক্ দিয়েই অগ্রগামী হইয়াছে। বিগত শতককে শুধু বাংলা নয়, সর্বভারতেরই স্বর্ণযুগ বলা চলে। শিশু-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও ঊনবিংশ শতকে বাংলায় যে জাগরণ আসে নিখিল ভারতে তার আর তুলনা মিলে না। অনেকে ১৮১৮ সাল হইতে শিশু-সাহিত্যের সূচনা গণনা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ প্রথম পাঠের ক্ষুদ্র যেসব বই প্রকাশিত হয় তাহা ধরিলে শিশু-সাহিত্যের সূচনা বিগত শতকের গোড়া হইতেই বলা চলে। এই প্রথম শিক্ষার্থীর পাঠ-ক্রমের বইগুলিই বাংলায় শিশু-সাহিত্যের ভিত্তি বলা যায়। শিশু-সাহিত্যের যুগকে মোটামুটি এই কয় ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে :

১৮০০—১৮১৭ মিশনারী যুগ

১৮১৮—১৮৪৬ স্কুলবুক সোসাইটি যুগ

১৮৪৭—১৮৭২ বিদ্যাসাগর যুগ

১৮৭০—১৯২১ স্বদেশী বা জাগরণ যুগ

১৯২১ হইতে নবযুগ

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বাংলাদেশে শিশু-সাহিত্যের প্রথম সূচনা হয়। এ বিষয়ে মিশনারিগণ বাংলার অগ্রদূত। শিশু-সাহিত্যেব ইতিহাসে ক্লার্ক মার্শম্যানের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের প্রয়োজনীয়তায় শিশু-সাহিত্যের প্রকাশ, এই কথা অস্বীকার করার উপায় নাই। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর শহরে মিশনারিগণ কর্তৃক বাংলায় মূদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়। ঐ বৎসর কিশোরপাঠ্য “দিগ্‌দর্শন” পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তখন পদ্য-সাহিত্যের শৈশব-কাল হইলেও, রাজা রামমোহন রায় এ বিষয়ে যথেষ্ট সহযোগিতা করেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা জুলাই ‘স্কুল বুক সোসাইটি’ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে স্কুলবুক সোসাইটি ‘পঞ্চাবলী’ নামে একখানি শিশুপাঠ্য পত্রিকা প্রকাশ করে। সোসাইটি প্রতিষ্ঠার অল্পকাল পরেই

রাধাকান্ত দেব, তারিণীচরণ মিত্র, রামকমল সেনের সম্পাদনায় প্রথম গ্রন্থ “নীতিকথা” ১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড ১৮১৮ খৃঃ সোসাইটির তত্ত্বাবধানে শ্রীরামপুর প্রেসে মুদ্রিত হয়। অতঃপর ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্টের “ইতিহাস কথা” বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে তারাচাঁদ দত্তের “মনোরঞ্জন-ইতিহাস” প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থখানি কাহিনী ও প্রবন্ধ সম্বলিত ছিল। সেইজন্য গ্রন্থখানি অত্যন্ত জনপ্রিয় ও সুলভপাঠ্য হওয়ায় পরে উহার ২য় খণ্ড প্রকাশিত হয়। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে রাজ-কিশোর তর্কভূষণের “হিতোপদেশ” প্রকাশিত হওয়ার পর উইলিয়ম কেরীর “ইতিহাসমালা” প্রকাশিত হয়। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম গল্প পুস্তকরূপে শ্রীমতী সিন্ধার উদ্ভের “ছোট হেনরী” অগ্রাধিকার লাভ করে।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর কৃষ্ণধন মিত্রের সম্পাদনায় “জ্ঞানোদয়” শিশুপাঠ্য মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইহা একমাত্র বাঙ্গালী পরিচালিত প্রথম শিশুপাঠ্য মাসিক পত্রিকা। পত্রিকাখানা দুই বৎসর মাত্র জীবিত ছিল।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে “জ্ঞানাসুর” ও “সদাচার দীপক” গল্প গ্রন্থদ্বয় প্রকাশিত হয়। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে গোপাললাল মিত্রের “জ্ঞানচন্দ্রিকা” পুস্তক প্রকাশিত হয়। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে শঙ্কর তর্কবাগীশের “জ্ঞানপ্রদীপ” ১ম খণ্ড প্রকাশিত হয় (২য় খণ্ড ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়)। ঐ বৎসর প্রিয়মাদব বসুর ও শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসুর পরিচালনায় “বিদ্যাদর্পণ” নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (পরে বিদ্যাসাগর) “বেতাল পঞ্চ-বিংশতি” প্রকাশিত হয়। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে পাদ্রি ডব্লিউ ম্যাডামস্ ও মারিয়া এডওয়ার্ড “নীতিবোধক” ইতিহাস রচনা করেন। ১৮৪৯—৭০ খৃষ্টাব্দে মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের “শিশু-শিক্ষা” ১ম, ২য়, ৩য় ভাগ

যথাক্রমে প্রকাশিত হয়। ‘শিশু শিক্ষা’ গ্রন্থখানি শতাব্দীকে অতিক্রম করিয়া বর্তমান কাল পর্যন্ত সমাদৃত। এই পুস্তকের প্রভাত-বর্ণনা কিঞ্চিদূর এক শতাব্দী পর্যন্ত অম্লান হইয়া আছে। প্রভাত-বর্ণনার প্রথম চরণ—“পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল” আজও শিশুদের মুখে মুখে প্রচলিত।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র কৰ্ম্মকারের “বালক-বোধকেতিহাস” প্রকাশিত হয়। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের “নীতিবোধ” প্রকাশিত হয়। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে অক্ষয়কুমার দত্তের “চারুপাঠ” ১ম ভাগ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থখানা তৎকালে অত্যন্তম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসাবে বেশ সুনাম অর্জন করিয়াছিল। গ্রন্থখানার রচনাশৈলী অক্ষয়কুমারের নিজস্ব অবদান।

এই সময় স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক ‘রবিন্সন ক্রুসো’ প্রকাশিত হয়। ‘রবিন্সন ক্রুসো’ বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত পাঠ্য হিসাবে চলিয়া আসিতেছিল। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ডাঃ বেয়ার সেক্সপীয়ারের গল্প অম্ববাদ করেন। এই সময় রাজেন্দ্রলাল মিত্রের “বিবিধার্থ সংগ্রহ” ও রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অপর একখানা অম্ববাদ গ্রন্থ “টেলিমেকাস” এবং “বিদ্যাদর্পণ” নামে একখানা মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের “নীতিরঙ্গ” ও তারশঙ্কর কবিরত্নের “কাদম্বরী” রচিত হয়। কাদম্বরী প্রণেতা তৎকালীন “অম্ববাদ সমাজ” কর্তৃক পুরস্কৃত ও সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়।

১৮৫৬ সালে “সোমপ্রকাশ”-সম্পাদক দ্বারকা বিদ্যাভূষণ কর্তৃক নীতিসার .ম, ২য়, ৩য় খণ্ড, রোম ও গ্রীক ইতিহাস, উপদেশমালা ১ম, ২য় খণ্ড প্রকাশিত হয়। এই বৎসরেই ‘অম্ববাদ সমাজ’ কর্তৃক তৈমুরলঙ্গের বৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের “নবনীতিসার”, মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের “বিচার”, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের “প্রকৃতি বিজ্ঞান” এবং প্রিয়মাধব বসুর “জ্ঞানরত্নমালা” প্রকাশিত হয়।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে রামনারায়ণ বিদ্যারত্নের “হিত-

কথাবলী”, কালীময় ঘটকের “চরিতার্থক”, সাতকড়ি দত্তের “প্রাণীবৃত্তান্ত”, অম্ববাদ সমাজ কর্তৃক “জীবন-চরিত” এবং রাজকৃষ্ণ রায়ে “নীতিবোধ” প্রকাশিত হয়। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ঋগ্বেদ ভাট্টিকুলার এডুকেশন সোসাইটি “সত্য, প্রদীপ” নামে একখানা মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত করে। ঐ বৎসর বঙ্গাহ্বাদক সম্পাদক কর্তৃক “সেকেন্দার শাহের দিগ্বিজয়” প্রকাশিত হয়।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তারকব্রজ গুপ্তের “প্রাণীবিদ্যা”; ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে যোগেন্দ্রনাথ ঘোষের ও বিহারীলাল চক্রবর্তীর প্রকাশিত “অবোধবন্ধু” নামক একখানা মাসিক পত্রিকা, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের “আখ্যানমঞ্জরী”, হরিচরণ মিত্রের “কবিতা-কৌমুদী” প্রকাশিত হয়। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের “বালবোধ”, মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের “জীবরহস্য” ও তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়ের “লক্ষুপাঠ” প্রকাশিত হয়।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের “আদর্শ জীবন” ও যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ ও বিহারীলাল চক্রবর্তীর যুগ্ম সম্পাদনায় “অবোধ বালক” মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন রাহার “চরিতমঞ্জরী” ও হরিচরণ দেব-এর “কবিতামঞ্জরী” প্রকাশিত হয়।

১৮৬৯ খৃঃ কালীময় ঘটকের “চরিতার্থক” গ্রন্থ ও “জ্যোতিরঙ্গন” নামে একখানা মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে মাইকেল মধুসূদন কর্তৃক নীতিমূলক কবিতা “কথামালা” প্রকাশিত হয়। তৎকালীন কথামালা গ্রন্থের “মেঘ ও চাতক”, “রসাল ও স্বর্ণলতিকা” কবিতা দুইটি বিশেষ জনপ্রিয় ও উল্লেখযোগ্য। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত গোপালচন্দ্র দত্তের “কবিতামঞ্জরী” প্রকাশিত হয়। শিশুপাঠ্যছোট কবিতা সম্বলন হিসাবে সেই যুগে “কবিতামঞ্জরী” প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের দীর্ঘ বর্ণনামূলক বহু কবিতা প্রকাশিত হইয়া শিশু-সাহিত্যভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে। কবিতাগুলি তৎকালে যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ঢাকা হইতে হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত “জ্ঞানমঞ্জরী” নামে একখানা কবিতাগ্রন্থ ও মথুরা-

নাথ তর্করত্নের রচিত “কবিতামঞ্জরী” প্রকাশিত হয়। উক্ত গ্রন্থখানা শিশুপাঠ্য নীতিমূলক ও বর্ণামূলক কবিতায় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। ১৮৭৬ খৃঃ অম্বাবাদ গ্রন্থ

— “হিতোপাখ্যান” ২য় ভাগ প্রকাশিত হয়। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজ হইতে ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনের পরিচালনায় “বালকবন্ধু” (পান্থিক) পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কিছুকাল পর পত্রিকাখানার অবলুপ্তি ঘটে। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের পর পত্রিকাখানির নব পর্যায় মাসিকরূপে পুনঃ প্রকাশিত হয়।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে জ্ঞানকী প্রদাদ দে পরিচালিত মাসিক পত্রিকা ‘বালক’ ও সাপ্তাহিক পত্রিকা ‘আর্য্য’ প্রকাশিত হয়। ‘আর্য্য’ বাংলার শিশু-সাহিত্যে প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকা। রাজকৃষ্ণ রায়ের শিশু-কবিতা এই বৎসর প্রকাশিত হয়। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে “মহৎ জীবনের আধ্যাত্মিকাবলী” ২য় খণ্ড ও “নীতিমালা” প্রকাশিত হয়। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে রজনীকান্ত গুপ্তের “আর্য্যকীর্তি” প্রকাশিত হয়। ইহা শিশু-সাহিত্যের এক অবিদ্যমান কর্মী। ঐ বৎসর যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের “প্রাচীন-অরণ্য চরিতমালা” এবং ঢাকা হইতে অক্ষয়কুমার গুপ্তের সম্পাদনায় “বালিকা” মাসিক পত্রিকা, কলিকাতা হইতে ভূদেব চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় “ধর্ম্মামৃত” ও খৃষ্টতত্ত্ব প্রচারার্থে “বালকবন্ধু” পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ঐ বৎসর ১লা জাম্বারী প্রমদাচরণ সেনের পরিচালনায় “সখা” মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাখানা যথাক্রমে শিবনাথ শাস্ত্রী, অন্নদাচরণ সেন, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, ভুবন-মোহন রায় পরিচালনা করেন। “সখা”র আবির্ভাবের সঙ্গে শিশু-সাহিত্যে যুগান্তর আসে বলা চলে। পত্রিকা-খানি শিশু-সাহিত্যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী আনে।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রনগর হইতে তিনকড়ি চক্রবর্তী শিশু রামায়ণ প্রকাশ করেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে জ্ঞানদা-নন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় “বালক” প্রকাশিত হয়। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তিথারীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “কবিতা-কণা” প্রকাশিত হয়। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের “পদ্যপাঠ” প্রকাশিত হয়। পদ্যপাঠ প্রায় শতাব্দীকাল শিশু-সাহিত্যে সমাদৃত ছিল।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে বনগ্রাম হইতে “শিশুবান্ধব” মাসিক পত্রিকা “আর্য্যপাঠ” ও কৃষ্ণকুমার মিত্র কর্তৃক “অখপাঠ” প্রকাশিত হয়।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে কবি মোক্ষামূল হকের “পদ্য শিক্ষা” প্রকাশিত হয়। শিশু-সাহিত্যে ইনিই প্রথম মুসলমান সাহিত্যিক। এই বৎসর অর্ধকুমারী দেবীর “গল্পসল্প” প্রকাশিত হয়। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে যোগীন্দ্রনাথ সরকারের “হাসি ও খেলা” প্রকাশিত হয়। ঐ বৎসর নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের “শিশুরঞ্জন রামায়ণ” প্রকাশিত হয়। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ভুবনমোহন রায়ের পরিচালনায় “সখী” মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে উক্ত পত্রিকা “সখা” পত্রিকার সহিত যুক্ত হইয়া ভুবনমোহন রায়ের সম্পাদনায় “সখা ও সখী” নামে প্রকাশিত হয়; ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর “ছেলেদের রামায়ণ” প্রকাশিত হয়। সেই বৎসরই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “শকুন্তলা” প্রকাশিত হয়। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদনায় “মুকুল” মাসিকরূপে আত্মপ্রকাশ করে। তৎকালে “মুকুল” পত্রিকার লেখক ছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য্য জগদীশ বসু, রামেন্দ্র-সুন্দর, আচার্য্য যোগেশচন্দ্র, গিরীন্দ্রমোহিনী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, হেমেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভৃতি। ঐ বৎসরের প্রকাশিত কয়েকখানা চরিতমালার মধ্যে শতুচন্দ্র বিদ্যারত্নের “চরিতমালা” বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে গুরুপ্রসন্ন দাশগুপ্তের সম্পাদনায় “শৈশব সখা” মাসিক পত্রিকা ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “ক্ষীরের পুতুল” ও যোগেন্দ্রনাথ সরকারের “রাজাহবি” প্রকাশিত হয়। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে যোগীন্দ্রনাথ সরকারের “হাসিখুশি” ১ম ভাগ প্রকাশিত হয়।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে রাজেশ্বর গুপ্তের সম্পাদনায় “অঞ্জলী” পত্রিকা ও যোগীন্দ্রনাথ সরকারের “খেলার সখী” প্রকাশিত হয়।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ছাত্রগণ কর্তৃক “কুসুম” পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইহাই বাংলার ছাত্রগণ কর্তৃক প্রকাশিত আদি মাসিক পত্রিকা।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে বসন্তকুকার বসু কর্তৃক “প্রকৃতি” নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগৃতি আন্দোলন আকস্মিক ঘটনা নহে। তৎকালীন অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার অবশুস্তুতাবী ফল, এক গভীর সামাজিক অসন্তোষের অনিবার্য পরিণতি। বিষয়টি বর্তমানে আলোচ্য না হইলেও প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতেছে—এই নবজাগৃতির আন্দোলনের তরঙ্গ বিভিন্ন ধারায় ভারতের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। ফলে কি রাষ্ট্রে, কি শিক্ষাক্ষেত্রে, সর্বদিক হইতে এক অদ্ভুত জাগরণ আসে। শিক্ষাক্ষেত্রে নূতন নূতন ভাষা-সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। শিশু-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে শিশু-সাহিত্যের উন্নতির সূচনা হইলেও বিংশ শতাব্দীর ৩য় দশক পর্য্যন্ত কয়েকজন বলিষ্ঠ লেখকের আবির্ভাব শিশু-সাহিত্যের ক্ষেত্রে আকস্মিক ঘটনা বলা যাইতে পারে। এই ৩ দশকে যোগেন্দ্রনাথ সরকার, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, কথাসাহিত্যিক দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার, কুলদারঞ্জন রায়, সুখলতা রাও, শাস্তা ও সীতা দেবী, মনোমোহন সেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুকুমার রায়-চৌধুরী, প্রমথ চৌধুরী, অরেন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত, কুমদরঞ্জন মল্লিক, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, দীনেন্দ্র রায়, বরদাকান্ত মজুমদার, বিনোদিনী দেবী, সত্যচরণ বক্রবর্তী, কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত,

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, রামকমল বিজ্ঞানভূষণ, দ্বিজেন্দ্র নিয়োগী, শতদলবাসিনী বিশ্বাস, হরিপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, প্রিয়দর্শনা দেবী, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতলাল গুপ্ত, জগদানন্দ রায় প্রভৃতি লেখকগণের সহজ-সরল এবং সাবলীল রচনা লালিত্যগুণে শিশুমহলের চিত্তহরণ করে।

প্রায় গ্রন্থই আনন্দ-রস পরিপূর্ণ শিশু-সাহিত্য। বিংশ শতাব্দীর ৩য় দশক পর্য্যন্ত “প্রকৃতি”, “তোষিণী” “সোপান সন্দেশ”, “মৌচাক”, “শিশু” ও “শিশুসাবী” “মাস পহেলা”, “খোকা-খুকু” “মুকুল”, “পাতপাড়ি” প্রভৃতি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে বরদাকান্ত মজুমদারের সম্পাদনায় শিশু-পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা দাঁড়ায় দশ হাজার। আজ পর্য্যন্ত কোন-কোন শিশু-সাহিত্য মাসিক পত্রিকা প্রচার বহল হইলেও “শিশু” পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা অতিক্রম করিতে পারিয়াছে কিনা সন্দেহ।

পরবর্তীকালে বহু শিশু-সাহিত্য-লেখকের আবির্ভাব ঘটে। এমনকি দৈনিক সংবাদপত্রে শিশু-সাহিত্যের আসরের বিভাগ খোলা হয়। পাতপাড়ি, আনন্দমেলা মারকত শিশু-সাহিত্যের আসরে ‘স্বপনবুড়ো’ ও ‘মৌমাছি’র আবির্ভাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও চিত্তাকর্ষক।

সরকার পক্ষ হইতে আকাশবাণীর যোগে শিশু-সাহিত্যের আসর খোলা হইয়াছে। বিংশ শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য সর্বদিক হইতে সুবর্ণযুগ বলা যাইতে পারে।

স্বর্গ-দীপ

শ্রীগণেশচন্দ্র সামন্ত

মিটে গেছে মোর বাসনার সব বাহা কিছু ছিল পুঞ্জীভূত ;
ত্যাগের মন্ত্রে পুঞ্জিছি হৃদয়, বিনম্র শির ভক্তিপ্লুত।
গৃহ-আগ্নিনায় জ্বলেছি যজ্ঞ, আতুর-অতিথি আসিছে যারা ;
মিষ্টভাষা তুষিয়া তাদের—তাদের সেবায় আশ্রয় হারা।
ভস্ম, কপ্নি, চিমটা, পাঁজার প্রয়োজন ব’লে ভাবি না এতে ;
দেবতা পূজার এ-নহে মুক্তি, “কাপালিক থাক তাহাতে মেতে।”
সমজ্ঞানে চাহি বিশ্বের পানে—প্রতি জীব দেখি বিরাজে শিব ;
দেবতার ধাম নহেক কোথাও—গৃহকোণে জলে ‘স্বর্গ-দীপ।’



শিল্পীমন

— শ্রীহরী লাল ঘর —

(পূর্বাহ্নরুতি : আষাঢ় সংখ্যার পর)

ক্লান্ত পদে দীর্ঘ বনভূমি পার হয়ে দেবকুমার ঘোগিনী-ঘাটে ফিরলো অপরাহ্ন বেলায়।

মন অবসন্ন। শিল্পকর্মের প্রতি এমন অবহেলা দেবকুমারের জীবনে এই প্রথম। বনভূমির ছায়াচ্ছন্ন অন্ধকার তার ভাবপ্রবণ মনের উপর যেন চেপে বসে। নিঃসীম আকাশের পানে তাকিয়ে সে শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পায় না।

ঘরে এসে মুহূর্তমাত্র সে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে। তারপর সালু খুলে খোদাই-করা পাথরের চাকলাগুলি এক-একখানি তুলে নিয়ে ভীক্ষুদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করতে শুরু করলো।

তার ক্রটি কোথায়? কোন রেখাটি অক্ষুট? কোথাও কি সমতার ব্যতিক্রম ঘটেছে? ভবিষ্যৎ কমনীয়তায় কোন বিক্ষেপ তো নেই! বিচ্যুতিশূন্য সূচ্যম নয়নাভিরাম রেখাচিত্র। এমন শিল্পকর্ম তাদের চোখে ভালো লাগলো না? নৈপুণ্যের বিচার করলো না? শুধু উপকরণের বিচার হলো? কল্পনার ভাবুকতা নেই, শুধু

নিছক বুল বুদ্ধির গ্লেশ। অরসিকের উপহাসের উপকরণ হলো এই শিল্পকর্ম।

পাথরগুলি একপাশে দেয়ালের গায় সাজিয়ে রেখে দেবকুমার মাহুর বিছিয়ে শুয়ে পড়লো। শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ঘরের ছাদের পানে। মনে কোন চিন্তার রেশ নেই, ভাবনার কোন যোগসূত্র নেই। খোলা দরজা দিয়ে আকাশ দেখা যায়, সেই আকাশের পানে তাকিয়ে থাকে।

—শিল্পী, ও শিল্পী, এই অবেলায় এতো ঘুম কিসের!

দেবকুমারের ঘুম ভেঙে গেল, ডাকছে নিরালা।

—সন্ধ্যাবেলায় ঘুমুচ্ছে, হলো কি?

—বড ক্লান্ত।

—মণ্ডলেশ্বরে গিয়েছিলে তো?

—হ্যাঁ।

—দেখা হলো? নরোত্তমদেব মূর্তি দেখে কি বললেন?

—এসব চিত্র চলবে না, ঠাকুর দেবতার চিত্র খোদাই করতে হবে।

—সে আমি গোড়া থেকেই জানি। ওসব ঘরোয়া চিত্র কখনও কারও চোখে লাগে। দেবদেবীর মূর্তিই লোকে পছন্দ করে। এখন থেকে দেবদেবীর মূর্তিই আঁকো।

—না।—দেবকুমার সংক্ষেপে জবাব দিল।

—যাক, সে যা হয় পরে হবে, এখন ওঠো, খাবার নিয়ে এসেছি, খেতে বসো।

—খাবার ইচ্ছে নেই।

—বেশ কথা, সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি চার ক্রোশ পথ ঘুরে এলে, এখন কিছু না খেলে চলবে কেন?

—খিদে নেই।

—কোথায় কে কি বললো তাই নিয়ে স্নানাহার বন্ধ? এমন ছেলেমানুষি তো আর দেখিনি। শিল্পী হতে হলে মনকে শক্ত করতে হয়। সব কাজ সবাইকার চোখে ভাল লাগবে না। সবাই ভালো বলবে না। নিন্দা শুনে শুয়ে পড়লে শিল্পী হওয়া যায় না। তাহলে মূর্তি খোদাই করা ছেড়ে দিয়ে থালা-বাটি বানাওগে।

দেবকুমার বারেক নিরালার মুখের পানে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললো—আমি এদেশ ছেড়ে চলে যাবো।

—কোথায় যাবে?

—যেদিকে হুঁচোখ যায়।

—বিদেশে গেলেই তোমার মূর্তি চলবে? সেখানকার মানুষ ভালমন্দ কিছু বলবে না? এখানে গোষ্ঠীপতির পুত্র বলে যদি-বা ছোটো কম কথা শুনতে হয়, সেখানে আরো বেশী কথা শুনতে হবে। তা জানো?

—তা হোক, তবু আমি চলে যাবো।

—যখন যাবে, তখন যাবে এখন হাতমুখ ধুয়ে খেতে বসো। নাও—ওঠো দিকি—

দেবকুমারের হাত ধরে নিরাল তাকে বসিয়ে দিল।

সন্ধ্যার পর দেবকুমার নর্মদার ঘাটে এসে বসলো।

নর্মদার নীল জল কালো হয়ে গেছে, যত মানুষের গ্লানি সরের মত উপরে ভেসে উঠেছে বুঝি। রাজির অন্ধকারটাও বোধ হয় মানুষের সারাদিনের বিষাক্ত নিঃশ্বাসের গ্লানি। জলের ওই হল ছল শব্দ এক বিব-জর্জর আত্ননাদ শুধু। চাঁদের আলোয় পাহাড়ের উজ্জ্বল স্তম্ভতা নেই। বাতাসেও যেন কেমন থমথমে ভাব। কুয়াশার একটা আভাস ঘন হবে উঠছে। জগতের যাকিছু ক্রন্দ যত-কিছু অসুন্দর সব ওই কুয়াশায় ঢাকা পড়ে যাবে। রাজির অন্ধকারের উপরেও কুয়াশা একটা আন্তরণ।

মৃদু কুয়াশাচ্ছন্ন চন্দ্রালোকে বিবর্ণ নর্মদার তীর আজ আর দেবকুমারের মনকে প্রশান্ত করতে পারে না। কিছুক্ষণ বসে থাকার পর সে উঠে এলো।

ঘরে এসে আবার সে শুবে পড়লো, সন্ধ্যা-দীপ অবধি জ্বাললো না।

কপালে হাতের স্পর্শে ঘুম ভেঙে গেল।

—খুব ঘুম বা হোক, সাত ডীকেও সাড়া নেই!

কণ্ঠস্বর নিরালার।

দেবকুমার বিরক্ত হলো, বললো—কী?

—খাবার এনেছি।

—খাব না।

—সারাটা রাত উপোস দেবে?

—অবেলায় খেয়েছি, খিদে নেই।

—আমি তা জানি, সেইজন্তেই কম করেই এনেছি, চারখানা মাত্র রুটি আছে। উঠে খেয়ে নাও।

—বলেছি তো খাব না, তুমি যাও।

—না খাইয়ে কি করে যাই, আমি তাহলে বসি।

নিরাল মানুষের উপরেই বসে পড়লো।

দেবকুমার উঠে বসলে, বললো—তুমি বড় জ্বালাতন কর।

—বটেইতো, ঘরে একটা আলো অবধি জ্বালানি, নাক ডাকিয়ে পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছ, আমি এসে তবে পিদিম জ্বালি। খাবার এনে ঘুম থেকে তুলে খাইয়ে যাচ্ছি, তাতেও মন উঠছে না।

—দরকার নেই, কাল থেকে খাবার এনো না।

—সে কি করবো আর না-করবো আমি জানি। এখন ভালো মানুষের মত উঠে খেয়ে নাও দিকি। আমি আর অতো সাধাসাধি ক্ষুবুতে পারবো না।

কোন কথা না বলে দেবকুমার উঠে পড়লো। বরাবর গিষে পিড়ির উপর বসে পড়লো, বললো—কই, দাও!

—হাতমুখ ধোবে না?

—না।

—সেকি?

—আমার খুশি।

নিরাল আর কিছু না বলে, শালপাতায় ঢাকা-দেওয়া থালাখানি সামনের আর-এক পিড়িতে বসিয়ে দিল। চারখানি রুটি, চুড়সের ভাজি আর লংকার চাটনি। এক ঘটি জল এনে রাখলো পাশে। দেবকুমার খেতে শুরু করে দিলে।

খাওয়া শেষ হলে থালা নিবে যেতে যেতে নিরাল বললো—এখন আর ঘুমুনো চলবে না। আমি আসছি।

দেবকুমার তার মুখের পানে তাকালো।

—তোমার সঙ্গে গান শুনতে যাবো।

—কোথায় ?

—বেনারস থেকে নটী এসেছিল মণ্ডলগড়ে, শেঠজী তাকে আজ নিয়ে এসেছে এখানে। সারারাত গান হবে।

২ বাবা চলে গেছেন, আমি তোমার সঙ্গে যাব।

—গান শোনার ইচ্ছে নেই। আমি যাবো না।

—বাঃ রে ! তোমার খাওয়া হয়নি বলে আমি বাবার সঙ্গে যেতে পারলাম না। এখন আমি কার সঙ্গে যাব ?

—একলা যাবে।

—দিনে হলে একাই যেতাম, রাত বলেই ভয় করছে

—শিয়াল-কুকুরকে আমার বড় ভয়।

—ভয় করে আর কারও সঙ্গে যেও। আমি যাবো না।

—কার সঙ্গে যাব ? আমার জন্তে কেউ কি এখনও বসে আছে নাকি ? সন্ধ্যারতির পরেই যে-যার চলে গেছে, আমি শুধু একা পড়ে আছি তোমার জন্তে। তুমিই আমায় নিয়ে যাবে। তোমার ভালো না লাগে তুমি আমাকে পৌঁছে দিয়ে চলে এসো, ফিরে আসার সময় আমি অনেক সঙ্গী পাবো।

নিরালি আর কোন উত্তরের অপেক্ষা না রেখে চলে গেল।

দেবকুমার আকাশের পানে তাকিয়ে শুয়েছিল, বাইরে সন্ধ্যাবেলার কুয়াশাটা এখন বেশ জমাট বেঁধেছে বাইরের মানুষকে আর দেখা যায় না। চাঁদটি কেমন যেন ঝাপসা। একখানি পাথরের খালাকে কে যেন হলুদ রঙের গামছা দিয়ে ঢেকে দিয়েছে। এমন কুয়াশা অনেকদিন দেখা যায়নি। ভোরের বেলায় এই কুয়াশা দেখতে বেশ লাগে—কাছের মানুষগুলো ছায়ার মত দূরে গেলেই মিলিয়ে যায়। সবাই যেন প্রেত, ইহ-লোকের দুনিয়াটাকে কুয়াশা পরলোক বানিয়ে দেয়।

কোন এক সময় নিরালি সামনে এসে দাঁড়ালো, বললো—কি ঘুমুলে নাকি ?

—না।

—উঠে পড়, চল।

—আমি তো বলেছি, আমি যাবো না।

—যাব না বললে শুনছে কে ?

—না, আমি যাবো না।

—লক্ষ্মীটি !—নিরালি দেবকুমারের কাছে এগিয়ে এলো।

—না।

—না তো আমিও এই বসলাম।

নিরালি দেবকুমারের পাশেই বসে পড়লো।

—একলা যাও না।

—একলা যেতে পারলে তোমাকে সাধতে আসতাম না।

—আমি ঠিক করেছি আমি আর কোন বড়লোকের দরজায় যাবো না।

—তোমাকে যেতে বলছে কে ? আমাকে পৌঁছে দিয়ে চলে আসবে।

—তা হলে বাড়ী গিয়ে শুয়ে পড়গে।

—একলা বাড়ীতে থাকতে পারবো না, আমার ভয় করে।

—ভয় ?

—ই্যাগো ই্যা, ভয়—ভূতের ভয়।

—নিজের বাড়ীতে ভূতের ভয় ?

দেবকুমার অবাক হয়ে তাকালো নিরালির মুখের পানে।

নিরালি বললো—নিয়ে যাবে নাতো ?

—না।

—আমি তাহলে এখানেই শুই।

নিরালি দেবকুমারের পাশেই শুয়ে পড়লো। দেবকুমার সন্তুষ্ট হয়ে উঠলো, বললো—একী ! ছিঃ !

—কিসের ছিঃ ! নিরালি খিল খিল করে হেসে উঠলো।

—তুমি বড় ছেলেমানুষি করছ, নিরালি।

—আমার বয়স এখন ষোল বছর, এখন ছেলেমানুষি করবো না তো কি ষাট বছর বয়সে ছেলেমানুষি করবো ?

দেবকুমার উঠে বসেছিল, নিরালি ছ'হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরলো। এলিয়ে পড়লো তার বুক

উপর। দেবকুমার হুঁহাত দিয়ে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিতে গেল, কিন্তু আচম্বিতে নিরালার উষ্ণ অধরের স্পর্শে তার সবকিছু গোলমাল হয়ে গেল। উদ্ভিন্নযোবনা তরুণীর দেহের স্পর্শ তাকে বিহ্বল করে তুললো। নিজের অজ্ঞাতেই সে বাহুবন্ধনে বেঁধে ফেললো নিরালাকে। ছুটি হৃদয়ের স্পন্দনে একই সুর বেজে উঠলো। অন্ধকার ঘরে ছুটি মানুষের নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না।

এক ঘুমেরই রাত কেটে যাবার কথা, কিন্তু আজ মাঝ-রাতেই ঘুম ভেঙে গেল। একক শয়ন করাই আবাল্যের অভ্যাস, আজ আরেকজনের সান্নিধ্য তার ঘুম ভাঙিয়ে দিল।

বুকের কাছে নিরালী শুয়ে আছে। কুয়াশাঢাকা চাঁদের ফিকে আলো এসে পড়েছে মুখের উপর। হাসির একটা অস্ফুট আভাস আছে সে মুখে। আলোর আভাস ছুঁয়ে গেছে বুক অবধি। কাঁচুলি নেমে গেছে। প্রতি নিঃশ্বাসে উন্নত বুক চেউয়ের মত উঠছে আর নামছে। একটা মস্তণ পেলবতা সর্বাঙ্গে। একেই বোধ হয় বলে যোবন-লাবণ্য। শিল্পীর দৃষ্টি দিয়ে দেবকুমার তাকিয়ে থাকে। আবাল্য পরিচিত এই মেয়েটিকে সে এমনভাবে আর কখনও দেখেনি। তদ্বীদেহের নবর্যোবনের রেখায় রেখায় রূপের যে রহস্য তা এমনভাবে এর আগে তার কাছে উদ্ঘাটিত হয়নি। এই দেহের যা কিছু মাধুর্য তা আজ তার জ্ঞান হয়ে গেছে, নিরালার আত্মসমর্পণে দেবকুমারের জীবনের পানপাত্র আজ পূর্ণ।

দেবকুমার ভাল করে মুখখানি দেখার জন্ত নিরালার কপাল থেকে এলোমেলো চুলগুলি সরিয়ে দেয়। নিরালার ঘুম ভেঙে যায়। হেসে বললো—উঠে বসে আছ যে?

দেবকুমার কোন উত্তর দেয় না, তার ভারী ইচ্ছা করে নিরালাকে একটু আদর করতে। হুঁহাত

দিয়ে তার গাল দুটি চেপে ধরে। নিরালী খিল খিল করে হেসে হাত সরিয়ে দিলে, বললে—রাত কঁত হলো বলত?

—তৃতীয় প্রহর কেটে গেছে বোধ হয়।

—শিয়ালের ডাক শুনেছ?

—না। চাঁদ দেখে মনে হচ্ছে।

—আর শুয়ে থাকা ঠিক হবে না, আমি তাহলে এবার যাই! ভোরবেলা আবার বাবা এসে পড়বেন, আমাকে না দেখতে পেলে মহা অনর্থ ঘটবে।

নিরালী উঠে বসলো। বিশ্রান্ত বেশভূষা সংবৃত করে নিল। তারপর উঠে দাঁড়ালো। দেবকুমার হেসে বললো—এবার তাহলে গান শুনে বাড়ী ফিরছ!

—থাক, আর রহস্য করতে হবে না। তখন পৌছে দিয়ে এলেই তো সব চুকে যেতো।

—আমি কি বলেছিলাম যে আমার পাশে শুয়ে পড়?

—এখন তো আমারই যত দোষ হবে সে আমি জানি। যাক, এরপর আর দেরী করা ঠিক নয়, কাল সকালেই বাবার কাছে কথা পাড়বে।

—কালই? হুঁচারদিন যাক না।

—না কালই। শাস্ত্রে বলে শুভমুখ শীঘ্র—শুভ কাজে দেরী করা ঠিক নয়।

—আচ্ছা, তাই বলবো।

টুপ্ করে আলগোছে দেবকুমারকে একটা চুমো খেয়ে নিরালী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দেবকুমার তাকালো বাইরের পানে। নিরালার নীল শাড়ী কুয়াশার মধ্যে ঢাকা পড়ে গেল। আনন্দের যে স্খাবেশ এতক্ষণ মনকে আবিষ্ট করে রেখেছিল, নিরালী চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার নিবিড়তা ঘন হারিয়ে গেল। সহসা একটা অবসাদের অহুভূতি দেবকুমারকে অবসন্ন করে তুললো, দেবকুমার বাইরের কুয়াশার পানে তাকিয়ে বসেই রইল অনেকক্ষণ।

(ক্রমশঃ)

বঙ্কিম-বান্ধব অক্ষয়চন্দ্র

শ্রীঅজয়চন্দ্র সরকার

। চার ।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে কাশিম-বাজারে বঙ্কিমচন্দ্র ও অক্ষয়চন্দ্রের দেশাত্মবোধেব মূলসূত্রটি ঋষিকল্প রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় সর্বপ্রথম দেশ-বাসীকে ধরাইয়া দেন। Greatmen think alike ছাড়া আমরা আর কিছুই বলিতে চাহি না।

বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম সংখ্যায় অক্ষয়চন্দ্রের তুলনায় সমালোচনা প্রকাশিত হয়। কবি ভারতচন্দ্র ও তাঁহার চিত্রিত হীরামালিনী যে এক অর্থাৎ বিদ্যাসুন্দরের প্রণয়কর্তা ও বিদ্যাসুন্দরের প্রণয়কর্ত্রী যে এক, ইহা প্রতিপন্ন করা এই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য। বিদ্যাপতি ও কবিকঙ্কণের তুলনা করিয়া তিনি লিখিলেন, বিদ্যাপতির পদগুলি সরল প্রোঙ্গী মৎস্তের দলের স্রায, কিন্তু কবিকঙ্কণ ও তাঁহার চণ্ডীমঙ্গল বৃহৎ রোহিত মৎস্ত-সদৃশ; বিদ্যাসাগর মহাশয় টাঁকশাল এবং তাঁহার গ্রন্থগুলি ছুঁআনি, সিকি, আধুলি ও টাঁকা; দীনবন্ধুবাবু কাঁচামিঠা আমগাছ প্রভৃতি। ইহার পরই অক্ষয়চন্দ্র লিখিতেছেন—‘বঙ্কিমবাবু মিষ্ট লঙ্কার আচার; আর বঙ্গদর্শন সেই আচারের হাঁড়ী। খানিক মিষ্ট লাগিবে, খানিক অম্লরস-ময়; অম্ল—শুধু খেতে ভাল লাগে না, কিন্তু ভাল খাইবার সময় অম্ল না হ’লে চলে না। কিন্তু ঝালের ভাগটা বাহার অদৃষ্টে পড়িবে, তাহার হাড়ে-হাড়ে ঋণ করিবে।’

তখন বঙ্গদর্শনের তৃতীয় বর্ষ চলিতেছে। সাধারণীর ২ ভাগ ২৪ সংখ্যায় ‘মতিচূরের সঙ্গে সঙ্গে চেণচূর’ প্রবন্ধে অক্ষয়চন্দ্র ‘বঙ্গদর্শনের’ একটি অতি চমৎকার অথচ রসাত্মক সমালোচনা লিখিয়াছিলেন।

‘বঙ্গদর্শন জন্ম পরিগ্রহ করিয়াই নারী-গুণবর্ণনে প্রবৃত্ত হন। এক মাস যাইতেই রামচন্দ্রের সীতা নির্বাসন-উপলক্ষ করিয়া বলিলেন যে, স্ত্রীকে কেহই সহজে বিসর্জন করিতে পারে না (উত্তর চরিত)। ...কিছুদিন পরে বঙ্গদর্শন আবার নগেন্দ্র দত্তের মুখ দিয়া তুর্ধ্যমুখীর প্রশংসা

নির্গত করিয়া নারীগুণ-বর্ণনা করিলেন (বিষবৃক্ষ)। ... দ্বিতীয় বৎসরে বঙ্গদর্শন আর সে প্রকার মস্তপরিচায়ক বাক্যে নারীগুণ-বর্ণন করেন নাই। ... দ্বিতীয় বৎসরে একবার আদরিণীর আদর করিলেন.....

সংসারে সহায় তুমি সংসার-বন্ধন বিপদে সাহসনা।

তোমার লাগিয়া সহি ঘোর সংসার-যাতনা ॥ (আদর)

... এ বৎসর (তৃতীয় বর্ষে) ... সম্পূর্ণ ভাবান্তর।

প্রথমেই বৈশাখে “নর-বানর” স্তবরাং “প্রাচীন” এবং “নবীন” লইয়া পীড়াপীড়ি আরম্ভ হইল; “ভ্রমর” ভায়া অমনি সেই সুরে সুর ধরিলেন। জ্যৈষ্ঠ মাসে কমলাকান্ত প্রসন্ন গোয়ালিনীর মান গাছের পাশ হইতে তাহার মুক্তাবগুর্জন মুখগুণ্ড দেখিয়া আসিয়া আফিসের মাজা চড়াইয়া বলিলেন যে, স্ত্রীলোকের রূপ নাই। পৃথিবীতে যে কিছু রূপ আছে তাহা আবগারী মহলে (স্ত্রীলোকের রূপ)। আবাড়ে চণ্ডিকা, বণ্ডিকা, পণ্ডিতা, খণ্ডিতা আর রসময়ী মণ্ডিকার নাম করিয়া নারীদিগের উপর কত কথাই হইল (তিন রকম—নং ১ চণ্ডিকাসুন্দরী দেবী)। শেষে প্রাষণে স্থির করিলেন যে, বঙ্গসঙ্গিনী পাগলিনী না হইলে বাঙ্গালির সুখ নাই। বলিলেন—

ওই কান্না, ওই হাসি আমি বড় ভালবাসি,

ওই বালিকার শূভ্র হৃদয় তোমার,

পাগলিনি রে আমার! (পাগলিনী)

—“বিপদে যে বন্ধু, রোগে যে বৈজ্ঞ, কার্বে যে মন্ত্রী, ব্যসনে যে সখা, বিভায়ে যে শিষ্য, ধর্ম্মে যে গুরু” (উত্তর চরিত)—সেই ক্রমে হইল কি না “পাগলিনীকে আমার!” তাহার পর বঙ্গদর্শন তাত্র মাসটা কোন প্রকারে কাটাইয়া এই আশ্বিনে বড় অত্যাচার করিয়াছেন। যে কমলাকান্তের উর্দ্ধ সাতপুরুষের বিবাহ হয় নাই, তিনি স্বচ্ছন্দে বলিতেছেন,—

“পৃথিবীর রূপসীগণ মাছ; খরিদারের জ্ঞান লেহু আছড়াইয়া ধড়ফড় করিতে থাকে; যত বেলা হয়,

তত কলসা ফুলাইয়া হাঁ করিয়া বিক্রয়ের জন্ত খাবি খায়
(বড়বাজার)।”

...উপভ্রাসে দেখিলাম, লেখক লবঙ্গলতার গুণ-
বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন—

“ললিত-লবঙ্গলতা নবীনা বয়স ১৯ বৎসর। দ্বিতীয়
পক্ষের স্ত্রী—আদরের আদরিণী, গৌরবের গৌরবিনী,
মানের মানিনী, নয়নের নয়নমণি, ঘোল-আনা গৃহিণী।
তিনি রামসদয়ের সিন্দূকের চাবি। বিছানার চাদর,
পানের চূণ, গেলাসের জল। তিনি রামসদয়ের জ্বরে
কুইনাইন, কাসিতে ইপিকা, বাতে ফ্রানেল এবং
আরোগ্যে সুরঙ্গা (রজনী—২য় পরিচ্ছেদ)।”

এই গেল বঙ্গদর্শনের মতিচূর; তাহার পর ধ্বন
সাধারণী চোঁচুর।

রামসদয় আবার ললিত লবঙ্গলতার পক্ষে কেমন?—
তিনি তাঁহার সিন্দূকের সোনার বাউটি, বিছানার পাশ-
বালিশ...তিনি জগচুনারীর ঢোল...। তিনি রোহিতের
ঝোল, আর দয়িতের কোল—বড় মিষ্ট। ...অন্ধের
যেমন ষষ্টি, বন্ধ্যার যেমন ষষ্টি আর সৃষ্টিছাড়া চুম্বন্তর
সালের যেমন বৃষ্টি—বড় প্রয়োজন। তিনি বাবুর পক্ষে
ব্রাহ্মি...তিনি মটনে মন্টার্ড, সূপে জিঞ্জর।...তিনি
ছাপাখানার সংবাদপত্র, সংবাদপত্রের সমালোচন,
সমালোচনের রসিকতা, সেই রসিকতার মূর্ততা, সেই
মূর্ততার উপসংহার, উপসংহারের আশীর্বাদ। ফলকথা
রামসদয় সাধারণীর চোঁচুর।”

বঙ্কিমচন্দ্রে ও অক্ষয়চন্দ্রে বিশেষ সৌহার্দ্য, আন্তরিক
স্নেহ ও প্রগাঢ় ভালবাসা না থাকিলে এইরূপ
‘সমালোচনের রসিকতা, সেই রসিকতার মূর্ততা,
সেই মূর্ততার উপসংহারের আশীর্বাদ’ প্রার্থনা
করা যায় কি?

কমলাকান্তের ২য় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র
লিখিলেন—

“চন্দ্রালোকে” এবং “জীলোকের রূপ” এই দুইটি
প্রসঙ্গ এবার বেশী আছে। চন্দ্রালোকে আমার প্রিয়
সুহৃৎ শ্রীমান বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকারের রচিত এবং
জীলোকের রূপ আমার প্রিয় সুহৃৎ শ্রীমান বাবু রাজকৃষ্ণ

মুখোপাধ্যায়ের রচিত।...অতএব তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে
(ঐ দুই প্রবাদ) কমলাকান্তের দপ্তর ২য় সংস্করণভূক্ত
করা গেল।”

১১শ সংখ্যায় প্রকাশিত মশক ও অক্ষয়চন্দ্রের রচনা;
বঙ্কিমচন্দ্রের দপ্তরভুক্ত করেন নাই, তাহার ‘মোতিকুনারী’
নামক পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে। দপ্তরের সংস্করণের
বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রালোকের লেখকের নাম প্রকাশ
করিবার পূর্বে বঙ্গদর্শনের পাঠকের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে,
উহা বঙ্কিমচন্দ্রেরই লিখিত—ভাব, ভাষা ও লিখনভঙ্গির
এমনই সুসাদৃশ্য। বঙ্কিমচন্দ্র ও অক্ষয়চন্দ্রের বহুদৃষ্টিচক
সহযোগিতার একটি উদাহরণ দিতেছি।

অক্ষয়চন্দ্র লিখিতেছেন—

‘(চুঁচুড়ায়) দীনবন্ধুবাবু প্রণীত লীলাবতী নাটকের
অভিনয়। বঙ্কিমবাবুতে আমাতে লীলাবতীর একরূপ
পরিবর্তন করি। নাটকে ভোলানাথের কন্ঠা অহল্যাকে
লইয়া যে একটি উপকথা লাগানো আছে সেই ভাগটি
পরিত্যাগ করা হয়। বঙ্কিমবাবু লীলাবতীর প্রণয়ন্যাদের
অবস্থায় Raving scene—প্রলাপদ্বস্ত বসাইয়া দেন।
আর টুকরা টুকরা পরিবর্তন বিস্তার করা হইয়াছিল।
দীনবন্ধুবাবু প্রথমে কি কাটা হইয়াছে না-হইয়াছে না
জানিয়া বলিয়াছিলেন, “এক-একটি শব্দ কাটা হইয়াছে
আর আমার শরীর হইতে রক্তপাত হইয়াছে। তবে বঙ্কিম
ভাই, আর অক্ষয় ছেলে, ইহাদের ভালবাসি বলিয়া,
আমার শরীরে জ্বালা লাগে নাই।”...বোধকরি ১৮৭২
সালের গুড্‌ফ্রাইডের সময়ে চুঁচুড়ার প্রসিদ্ধ মল্লিক বাড়ীতে
লীলাবতীর প্রথম অভিনয় হইল।...খুব চুটিয়ে অভিনয়
হইল।...দীনবন্ধুবাবু আমাদের সাত খুন মাপ করিলেন,
আমাকে আশীর্বাদ করিলেন।’

চুঁচুড়ায় কুলীন-কুলসর্বস্ব নাটকের অভিনয়ের পর
মফঃস্বলে বাঙ্গালা নাটকের এই দ্বিতীয় অভিনয়।

১৮৭৪ সালে অক্ষয়চন্দ্র প্রণীত ‘শিক্ষানবীশের পত্ন’
প্রকাশিত হইল। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের ৩য় খণ্ডে ইহার
সমালোচনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন—

“শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার” এই নামবৃক্স গ্রন্থ এই প্রথম
প্রচারিত হইল। অতএব এমন অনেক পাঠক থাকিতে

পাবেন যে, অক্ষয়বাবুর বিশেষ পরিচয় জানেন না। আমরা তাহার সম্বন্ধে এইমাত্র বলিব যে, বঙ্গদর্শনের কতকগুলি অত্যুৎকৃষ্ট প্রবন্ধ তাঁহারই প্রণীত। সেগুলি তিনি স্বনামযুক্ত পুনর্মুদ্রিত করিবেন, এরূপ ভরসা আছে। তাঁহার প্রণীত সেই সকল প্রবন্ধগুলিও সবিশেষ আলোচনা করিলে অনেকেই স্বীকার করিবেন যে, অক্ষয়বাবুর ভ্রায় প্রতিভাশালী গদ্য-লেখক অল্পই বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই পুস্তকের অধিকাংশই বায়রণের অনুবাদ ও অনুকরণ। যাহারা ইংরেজি বুঝেন না তাঁহারা বায়রণের অনুবাদ হইতেও স্বদেশাভিরাগ শিক্ষা করিতে পারিবেন। আর এ শিক্ষা সংশিক্ষা!...অনুবাদ কিরূপ হইয়াছে, তাহার উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

Roll on, thou deep and dark blue Ocean roll, 'সুনীল গভীর সিঙ্কো কল্লোলিয়া চল'।

Ten thousand fleets sweep over thee, invain, 'লক্ষ পোত বক্ষে তব বৃথা ভাসি যায়।' প্রভৃতি প্রথম স্তবকের নবটি ইংরাজী মূল ও সেইগুলির অনুবাদ এইরূপ ভাবে পর পর উদ্ধৃত করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—'ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে যে, ইংরেজি পদ্যের এরূপ উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ আমরা আর কোথাও দেখি নাই।' •

অনেকেই জানেন, 'প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা'র

বঙ্গদর্শনের খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এমন নির্ভীক, নিরপেক্ষ অথচ সরস সমালোচনা ইহার পূর্বে বঙ্গসাহিত্যে দেখা যায় নাই। কিন্তু তৃতীয় খণ্ডের শেষের দিকে এই সংক্ষিপ্ত সমালোচনার প্রকাশ বন্ধ হইয়া গেল। ১২৮১ সালের মাঘ মাসে (১৮৭৪) বঙ্গদর্শনের 'সম্পাদকীয় উক্তি'র শেষ অংশে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিলেন—

'আমাদের স্থূল বক্তব্য এই যে, আমাদের নিকট যে সকল গ্রন্থ এক্ষণে অসমালোচিত আছে বা যাহা ভবিষ্যতে প্রাপ্ত হইব, তৎসম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত সমালোচনা আর বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইবে না। কোন কোন গ্রন্থের সম্বন্ধে আমরা পূর্বে প্রথাস্থারে সবিস্তারে সমালোচনা করিব।'

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা বন্ধ হইবার বিশেষ কারণ আমরা জানি। অক্ষয়চন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রকে বলিলেন, 'এখন ত বঙ্গদর্শন হইতে আপনার আয় বেশ হইতেছে। এখন হইতে সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিবার জন্ত আমাকে মাসে মাসে কিছু কিছু দিতে হইবে।' বঙ্কিমচন্দ্র রাজী হইলেন না—সমালোচনা বাদ হইয়া গেল, কেন-না প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে সমালোচনা করিবার মত সময় বঙ্কিমচন্দ্রের তখন ছিল না। কিন্তু এইরূপ মতভেদ হওয়াতেও উভয়ের মধ্যে যে আন্তরিক হৃদয়তা ছিল, যাহা পূর্বের ভ্রায় অটুট রহিল—একটুও ক্ষুণ্ণ হইল না।

(ক্রমশঃ)

একটি প্রার্থনা

শ্রীশান্তনীল দাশ

একটি প্রসন্ন সুরে ভরে থাক আমার হৃদয় :

একটি প্রসন্ন সুর, আর কিছু নয়।

কোলাহল হ'তে দূরে, বহুদূরে একটি নির্জনে,
নিঃস্রব্ধির একটি আসনে
বসে একা মাঝে নিয়ে সে প্রসন্ন গান,
কেটে যাক সারা দিনমান ;
কেটে যাক একে একে জীবনের এক একটি রাত,
রাতের স্নিগ্ধতা শেষে শুচিস্নাত আশ্রুক প্রতাপ।

এমনি এমনি ক'রে
জীবনের দিনগুলি ভ'রে
উঠুক উঠুক সেই স্নমধুর সুরের আলোকে—
সুখে, শোকে,
বেদনায় অর্জরিত এ হৃদয় কাদে অবিরাম :
একটি প্রসন্ন সুর, একটু বিশ্রাম।

নতুন বছরে

শ্রীঅনিলকুমার সমাজদ্বার

আলো ঝরণাধারায় আকাশ বাতাস নিয়ে ওঠে।
লতায় লতায়, পাতায় পাতায় মৃদু কাঁপন আগে।
আলোবীণায় পাখীর গান বেজে ওঠে...রোজই বাজে...
বিছানা ছাড়ি ছাড়ি মন আবার আঁকড়ে ধরে ধূসর
হয়ে আসা স্বপ্নের স্মৃতিকে। ও বাড়ীর ছাদের রেডিওর
এরিসালে শালিকের ঐক্যতান সুর হয়ে গেছে, একটা
মিঠেল আলো ছাদের পর ছাদ পেরিয়ে শান্তির জ্ঞানলাষ
এসে ঠিকরে পড়েছে...। মিস্তির সাহেবের আম জাম
পেশারা বাগানের কচি সবুজ নরম পাতাষ এত উজ্জ্বল
আলো আর এতো পাখীর ডাক আজকের মতন বোধ
হয় আর আসবে না।

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো শান্তি। টেবিলে পড়ে
আছে কালকের চিঠি...“আমাদের নববর্ষ অমুঠানে
তোমার কিস্ত আসা চাই। প্রাজ্ঞাতে আমরা কবিশুকের
ঋতুরঙ্গ করছি। আসতে তোমাকে হবেই।

তোমারই মণিকা

অমুঠানের অনেক দেবী। সন্ধ্যা ওটায়। মিস্তির
সাহেবের একটা লতায় একটা নাম-না-জানা পাখী দোল
খাচ্ছে—রোদটা ঘুরে ওর জানালার রঙীন কাঁচে এসে
পড়ে ঘরে এক অপূর্ণ মাদুরী সৃষ্টি হলো।

রেডিওটায় বেজে উঠলো মিষ্টি সুরে...

—আলোকের এই ঝরণাধারায়...

প্রাতরাশ সেয়ে বেরিয়ে পড়লো। পথে অনেক
আলো অনেক লোকের আনন্দ উজ্জ্বল। একদল ছোট
ছেলেমেয়ে সাদা ঝকঝকে পোষাকে তালে তালে পা
কেলে এগিয়ে চলেছে...। পথের মোড়ে জটলা...পথে
রাখা ভাঙা চেযাষ বেষ্টিতে বসে চায়ের কাপের ওপর
অগণিত উজ্জ্বল। আনমনে রাস্তাটা পার হচ্ছিল শান্তি—
মনের মধ্যে প্রভাতী সঙ্গীতের রেশ...আলোকের ঝরণা-
ধারায়...হঠাৎ পিঠে কার হাত পড়তে চমকে উঠলো
শান্তি। মুখ ফিরিয়ে দেখে ওর বন্ধু শঙ্কর হাসছে...

: আজকাল কি পথে চলতে চলতেও কবিতা
লিখিস নাকি? কোনদিন গাড়ী-বোড়া চাপা পড়বি!

: কোথায় আছিস? অনেকদিন ধরে দেখা পাই
না যে। ভাবলেম দেশে ফিরে গেছিস বুঝি।

: এই কাছেই আমার বাসা। চল না ভাই।

গলির মধ্যে একতলা হাড় পাঞ্জরা বার করা একটা
বাড়ী। নোনা-ধরা দেওয়াল। চুকতেই অন্ধকার আর
ধোঁয়া সাদর অভ্যর্থনা করলো যেন। সামনেই কল-
তলা। পিছল হয়ে গেছে জায়গাটা।

সাবধান করে শঙ্কর। একটু সাবধানে আসিস
ভাই।

ছোট্ট ঘরটির ভাঙ্গা নড়বড়ে চৌকির ওপর শতছিন্ন
একটা শতরঞ্জিতে বসলো শান্তি।

: দাঁড়া ওদের ডাকি সব। চৌকির ওপর রাখা
একটা পাতা খোলা পত্রিকার পাতা ওটায়।

: নমস্কার! কেমন আছেন? চুড়ির আওয়াজের
মতন মিষ্টি গলা। শান্তি সহাস নেত্রে প্রতি নমস্কার
জানায় নীলিমাকে। ওর সাথে দু’টি মেয়ে আর একটা
ছেলে। পেছনে দাঁড়িয়ে শঙ্কর।

কতদিন আগে দেখেছে সে নীলিমাকে। সঠিক মনে
পড়ে না। তবে লাল চেলি-পড়া লাজুক একটি মেয়ের
কথা তার মনে পড়লো। কিস্ত একি চেহারা হয়েছে
তার! মুখখানা সাদা ক্যাকাশে হয়ে গিয়েছে হাতে
কাঁচের চুড়ি চলচলে, পরনে আধময়লা সাধারণ তাঁতের
সাড়ী।

শঙ্কর একটা ভালো চাকুরী তো করতো...

: তারপর কেমন আছেন বৌদি? অনেকদিন
দেখাশোনা নেই—ছেলেমেয়েদের কি নাম রাখলেন?
বলেই নীলিমার আঁচল আঁকড়ে-ধরা একটি এক মাথা
ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুলওয়ালা ছেলেটিকে ধরবার জল্প হাত
বাড়ায় শান্তি!

: আপনি তো এখন আমাদের ভুলেই গেছেন।
কবিরা সাধারণ জগতে বাস করে না কিনা।

: না না; তা নয়...তবে...মুহু আপত্তি জানার
শাস্তি।

কিছুক্ষণ শব্দর আর শাস্তি গল্পে মেতে যায়...নানান
কথা। কলেজ জীবনের...পুরানো দিনের স্মৃ-
ত্বের থেকে শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের আসে আলোচনার
জের। শাস্তি নিজের একটা সদ্যরচিত কবিতা আবৃত্তি
করলো...শব্দর তার নবতম উপভাসের প্রটটি শোনালো
আর নীলিমা ছুঁচারখানা গান শুনিয়ে দিলো তার
সেতারটি বাজিয়ে। চমৎকার লাগলো সকাল বেলাকার
এই আনন্দময় পরিবেশ।

নীলিমা একবার উঠে গেলো। চা করতে হবে তো
একটু। আপত্তি জানায় শাস্তি—না—না এইতো
এইমাত্র বাড়ী থেকে গিলে এসেছি চা। ছেলেমেয়েরাও
উঠে গেলো, খানিক পরে শব্দরও উঠে জিতরে গেলো।

: বোস একটু ভাই, আমি আসছি এফুনি।

পত্রিকার পাতা ওন্টায় শাস্তি। ওর নিজের একটা
প্রকাশিত কবিতা চোখে পড়ে।

একরাশ ঘোঁয়া এসে ঘরে ঢুকলো। একটা চাপা
স্বর কাণে এলো।

—নাঃ, দোকানদার খার দিল না। বললে আর
হবে না। গলার স্বরটা শব্দরের।

—তা হলে কি হবে গো? বছরের প্রথম দিনটার
তোমার বন্ধুকে এক কাপ চাও খাওয়াতে পারবো না?
আমি একবার ও বাড়ীর সেতুদির কাছে যাবো?

যেতে চাও—যাও। আবার তো বিকেলে হাল-
খাতার আর এক বিরাট বামেলা আছে। কবে যে

ভালো চাকরী পাবো আবার! টিউশনি করে আর কত-
দিন চলবে...

শাস্তির দৃষ্টি থমকে দাঁড়ায় কবিতার একটি ছত্রে।
মাথার মধ্যে সেই লাইনটা যেন তর্জন করে ওঠে...
“পুরাতন বৎসরের জীর্ণ ক্লাস্ত রাত্রি—না না—সম্পূর্ণ
ভুল...মিথ্যা...একরাশি কালো জট পাকানো ঘোঁয়া ঘরে
চোকে।

শব্দর আর নীলিমা ঘরে আসে। একটি পরিষ্কার
মাস্তা থালায় ধূমায়িত চাষের কাপ। শব্দরের মুখে-
চোখে প্রফুল্লতা। ছেলেমেয়েদের চোখে-মুখে একটা
উদাস ভাব। মাকে জড়িয়ে ধরে আছে বাচ্চা ছেলেটা।

তাড়াতাড়ি চুমুক দিতে জিভটা পুড়ে গেল শাস্তির।
উপেক্ষা করে ওদের অপমানিত করতে পারলো না আর
ধরা দিতে চাইলো না যে, সে ওদের দারিদ্র্যতার বাস্তব
চিত্র দেখতে পেয়েছে।

চা খেয়ে পাঁচটি দশ টাকার নোট বৌদির হাতে
দিয়ে বললো, নব-বর্ষের উপহার হিসাবে এটি দিলাম।
ছেলেমেয়েদের জামা কাপড় কিনে দেবেন...প্রত্যুত্তরের
প্রত্যাশায় না থেকে এক রকম ছুটেই ঘর থেকে বেরিয়ে
পড়লো শাস্তি।

আবার আসিস ভাই, আবার আসবেন কিন্তু!

পথে শুধু গোলমাল হাঁকাহাঁকি...অনেক মানুষের
কলরব মাথার ওপর জলন্ত সূর্যের উদ্ভাপ।

না না জীর্ণ ক্লাস্ত রাত্রি এখনো কাটেনি, বাড়ীর দিকে
পা চালালে শাস্তি...মণিকাকে গিয়ে একটা চিঠি লিখে
দিতে হবে...

...তোমাদের নববর্ষ উৎসবে যেতে পারবো না বলে
হুঃখিত।





শ্রীমতী সঙ্কটমুক্তি মালা



প্রবর্তক সঙ্ক
কেন্দ্র কার্যালয়, চন্দননগর
তাং ১৯-৯-৫৫ ইং

প্রবর্তক সঙ্ক, চন্দননগর
৩।১০।৫৫

স্নেহের মধুসুদন,

তোমার পত্র পাইলাম। আমার ২৯।৭।৫৫ তারিখের পত্র পাইয়াছি, কিন্তু তাহার উত্তর পাও নাই শুনিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি না। এই পত্রের উত্তর নিশ্চয়ই তোমার নিকট গিয়াছে।

প্রকাশ্যে যুক্ত হইয়া কার্য্য করিতে চাহিয়াছি। সম্পূর্ণরূপে গোত্রান্তরিত হইতে না পারিলে যুক্ত হওয়া যায় না। অশুভ অমঙ্গল স্বীকার করিতে হইবে। বিবাহিত অবিবাহিত সকলকেই ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইবে। সঙ্ক-প্রবর্তিত উপাসনা সমষ্টিগতভাবে করিতে হইবে। নিজেকে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিতে হইবে। সত্য-সংযম ও সঙ্কল্পের অধ্যাত্মমন্ত্রে সকলকেই দীক্ষা লইতে হইবে। ইহা তোমার পক্ষে সম্ভব হইবে না। সঙ্কমন্ত্রে দীক্ষা লইও। সঙ্কের আদর্শ ও লক্ষ্যের উপর একান্তভাবে আস্থাশীল হইও। সঙ্ক-প্রবর্তিত উপাসনা করিও। আয়ের শতকরা ১৮ টাকা সঙ্ক-ভাণ্ডারে প্রতি বৎসর উৎসর্গ করিও। তাহা হইলেই আমি সন্তুষ্ট হইব। গুরু-রূপা চাই। ব্রহ্মচর্য্যত্রয় অবশ্য পালনীয়। স্ত্রীকে লইয়া যদি এখানে আসিতে পার খুবই ভাল হয়। মার কাছে ও বাবার কাছে ব্রহ্মচর্য্যের অমুমতি পাইয়াছ—স্ত্রীও ইহাতে রাজী হইবেন। নরকের ক্রমি হইতে কে চাহে? উর্দ্ধগতির প্রেরণা রাখিও—একদিন আশা সকল হইবে।

বাড়ী লইয়া যে গোলযোগ বাড়িয়াছিল তাহার যে অংশে ছাপাখানা আছে, তাহা ব্যবহার করার অমুমতি পাইয়াছ—ইহাতে আমি স্তুতী হইয়াছি। বাড়ী ভাড়া না পাও, বাসা সম্বন্ধে এখনই কোন স্থির করিও না। ক্রমে ইহাও হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

আশীর্বাদ নিও।—ইতি

স্নেহের মধুসুদন,

তোমার ২৮।৯।৫৫ তারিখের পত্র পাইয়াছি। ৫৮ টাকা পাইয়াছি জানিও। সৌবীর আমার কথা সারা রাস্তায়ই বলিয়াছে শুনিলাম। পারুল হাসপাতালে আছে। এখনও রোগ নির্গম হয় নাই। পেটের ব্যথায় খুবই কষ্ট পাইতেছে শুনিলাম। তোমার জন্ম-ছকটি পাইয়াছি। যোগাযোগ হইতেছে না, এইজন্য দেখিতে বিলম্ব হইতেছে।

পারুলেরও একখানি পত্র হাসপাতাল হইতে পাইয়াছি। এই সঙ্গে তাহাকেও আশীর্বাদ দিলাম—পত্রখানি তাহার নিকট পৌঁছাইয়া দিও। ইতি।

আমার আশীর্বাদ নিও। ইতি

প্রবর্তক সঙ্ক, চন্দননগর
২২।১২।৫৫

সৌবীরের স্ত্রী ইডেন হাসপাতাল হইতে এক মৃত সন্তান প্রসব করিয়া ফিরিয়াছে, সৌবীরের মুখেই তাহা শুনিলাম। পারুলের অস্ত্রোপচারের কথাও জ্ঞেছি। এখনও আরাম হয় নাই। সে আমার পত্র দিয়াছে এবং জানাইয়াছে সে আসিবে এবং দীক্ষা লইবে। যে ছেলেটির নাম সুবোধচন্দ্র বসু সে আসিতে চায় শুনিয়া স্তুতী হইলাম, কিন্তু আমার দেখিয়া সে ভাব পাইবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। ভগবানের ইচ্ছায় সবই হয়। তোমার পত্রে জানিলাম চামর চিকুরের খেলা লক্ষ্য করিয়াছ, ইহা ভাল সংবাদ। সৌবীরের সহোদর ভাই এবং মামাতো ভাই দিলীপকুমার সরকার আসিতে চাহে—তাহাদের দেখিবার ইচ্ছা আছে। ভালই, কিন্তু সুবোধচন্দ্র বসু সম্বন্ধে ভাবনায় পড়ি। সে আসিয়া কি দেখিবে! আমি মহাপুরুষ নই। স্তুতি পাইবার কোন আশাই আমি দিতে পারিব না। আমার আশীর্বাদ নিও। ইতি।*

* পত্রোন্মিষিত ব্যক্তিগণ: মধুসুদন—মধুসুদন স্ত্রীচাৰ্য্য। পারুল—পারুলবালা বসু। সৌবীর—সৌবীর ঘোষ। ইহারা তিনজনই পরে দীক্ষাপ্রাপ্ত হন। অস্ত্রান্ত ব্যক্তিগণ তাহাদের পরিচিত অমুরাণী মহাদ।

গোপালমা স্মরণে

বীণাপানি দত্ত (রাণী)



গোপালমা

আজ আমি শ্রদ্ধাগ্লুত হৃদয়ে, অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে
যে ভক্তিমতী মহীয়সী মহিলার মহাসমাধি লাভের কথা
জানাতে বসেছি, তাঁর গুরুদত্ত নাম জগন্মাতা। তাঁর গুরু
ছিলেন হরিদ্বারের শ্রীশ্রীভোলানন্দ গিরি মহারাজ। ভক্ত
শিষ্যবৃন্দের তিনি ছিলেন গোপালমা ও অভিজাত বংশের
কুলবধূ বীণাপানি দত্ত। তাঁর শুভ আবির্ভাব হয় ১৮৮৬
সালের ৩০শে আগষ্ট। তাঁর পিতা রামচরণ মিত্র ছিলেন
গভর্নমেন্টের উকীল, কলিকাতা ঝামাপুকুর লেনে তাঁর
বাসস্থান ছিল। ১১ বছর বয়সে ১৮৯৭ সালে তাঁর বিবাহ
হয় কুচবিহারের দেওয়ান রায়বাছাছর ঐকালিকাদাস
দত্তের মধ্যম পুত্র, চ্যারুচন্দ্র দত্তের মধ্যম ভ্রাতা অতুলচন্দ্র
দত্তের সহিত। শিশুকাল থেকেই তিনি ভগবানের জন্ত
ব্যাকুল ছিলেন, আমাদের বলতেন যে, “কুল গাছের টব
থেকে মাটি নিয়ে মনের মত মহাদেব গড়ে’ পূজা করতুম
আমি না জানতে পারলে বকতেন ঐ মাটিতে পূজার জন্ত”

এবং শেষদিন পর্যন্ত মহাদেব পূজা তিনি করে গেছেন।
শ্মশুরমহাশয়ের সঙ্গে যখন তিনি কুচবিহারে থাকতেন,
সমবয়স্ক নন্দ ইত্যাদির সঙ্গে গল্প করতে করতে অর্ধাং
গাছের দিকে চেয়ে বলে উঠতেন, “দেখ কেমন কেঠ-
ঠাকুর বসে’ আছেন—ঐ কদম গাছটায়, বসে’ পা
দোলাচ্ছেন!” তাঁরা হেসে বলতেন, “পাগল, কোথায়
তোমার কেঠ ঠাকুর? কি যে বল তুমি।” পরবর্তী
জীবনে তাঁর এই উপলব্ধি মূর্ত হয়ে উঠেছিল। পূজার
আসনে তিনি ছিলেন ভক্তিমতী মীরাবাইয়ের ছায়া,
আবার গৃহকর্ত্রীর আসনে ছিলেন অল্পপূর্ণাক্রমে। তাঁর
পূজার আসনের সময়ে পাশে ঝাঁরা এসে’ বসতেন, তাঁরা
শুনতে পেতেন গোপালমার মুখে সেই অমৃতলোকের
বাণী, ভক্তনের মধ্যে দিয়ে। তাঁরা যখন বেরিয়ে
আসতেন ঠাকুরঘর থেকে, তাঁদের দেখে’ মনে হ’ত—তাঁরা
যেন অনেক কিছুই পেয়ে’ গেছেন। তাঁদের মধ্যে ব্রাহ্মণ,
খ্রীষ্টান, মুসলমান, ইহুদী ইত্যাদি সকল জাতিই থাকত।
ভেদজ্ঞান গোপালমার ছিল না। তিনি বলতেন আমাদের
“দেখনা জল জলই, তাকে কেউ বলে ওয়াটার, কেউ

বলে পানি আর আমরা বলি জল, তাতে তো জল অল্প
রূপ ধরে না, তেঁটা পেলে সবাইকারই সমান তৃপ্তি হয়
জল খেলে, তেমনি ঠাকুর সবাইকারই, আমরা তাঁকে
ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকি, কিন্তু নাম-তেঁটা পেলে, জলের
মতই তেঁটা সকলের মেটে, যে নামেই তাঁকে ডাকি না
কেন!” এ সম্বন্ধে তাঁর ভক্তনের বই “বেণু-বীণা”য়
একটি ভজন আছে। গুরু তাঁর খুব প্রিয় ছিল, সব সময়েই
তাঁর বাড়ীর গোয়াল গরুতে পূর্ণ থাকত, যে গরু যোগাত
তাঁকে, সে একটি শ্রবীণ মুসলমান গোয়াল, নাম ইছ
মিয়া। সে ঠাকুরঘরের দরজায় এসে বসে থাকত, আর
মা বলে তাঁকে ডাকত। তাই তিনি ভক্তনেতে গাইতেন,
“সে যে মোর মাটির ঠাকুর গোবিন্দ গো এতটুকু নয়,
সে আবার ইছ মিয়া হবে’ এসে, পিতার মত ভালবেসে’,
গিঞার মুখে তাঁহার হাসি ভেসে যেন যায়।
ধ্যানের পাশে কত আসে, ক্রুশবিন্দু হবে’ ভাসে,
জীবের তরে কত যে সে দুঃখ সহে হয়।

আমারও ভাই তাই যে ছাই, আল্লা-যিক্ত ভিন্ন যে নাই
জল, পানি, ওয়াটার, ভিন্ন ভাবে নাম তার

কিন্তু যে গো একেরি সর্ব নাম হয়।

সে যে মোর মাটির ঠাকুর গোবিন্দ গো, এতটুকু নয়।

জাতবিচার ভাই, গেছে যে তাই, সে মোর সকল হয়।

সে যে মোর মাটির ঠাকুর গোবিন্দ গো এতটুকু নয় ॥”

এই সমস্বয় তিনি নিজের জীবনে অনেক সময়ে দেখিয়েছেন। তাঁর স্বামী দেহত্যাগ করার বছরখানেক পরে, একদিন তিনি পূজা ইত্যাদি সেরে, ছেলেদের, সংসারের, আয়-ব্যয়ের হিসাব ইত্যাদি করছিলেন; করতে-করতে বলেছেন “ওরে আমার একটা পান দিবি কেউ”—বলে’ আবার নিজের কাজের মধ্যে ডুবে’ গেছেন। হঠাৎ “মাইজি পান” শব্দে চেয়ে’ দেখেন, তাঁর আশ্রিত বৃদ্ধ মুসলমান রোজা মিঞা ২টা পানের খিলি হাতে দাঁড়িয়ে। এক লহমা তিনি ভেবে নিলেন, তারপরই হাত বাড়ালেন, শুধু এইটুকু জিজ্ঞাসা করলেন “রোজা, হাত ধোয়া ছিল তো?” সে বলল—“হাঁ মাইজি, আপ দেখিয়ে, আবিভক পানি ছায়।” তিনি পান দুটি মুখে দিলেন, শুদ্ধাচারিণী মার আর এক মূর্তি প্রকাশ হ’ল। স্বামী থাকতেই তিনি অনেক কিছু জিনিষই ছেড়ে’ দিয়েছিলেন, স্বামী চলে’ যাবার পর নিজেকে এক কঠিন ব্রতের মধ্যে রেখেছিলেন, এটা সেই সময়কার ঘটনা। তাই সন্ন্যাসী ও সংসারী সবাই আসতেন সমানভাবে তাঁর কাছে। তাঁর সঙ্গে কথা করে’ সন্ন্যাসী তৃপ্ত হতেন। সংসারী ধস্ত হয়ে যেতেন তাঁর উপদেশ পেয়ে, তাঁরা দেখতে পেতেন তাঁর অন্ন-পূর্ণার রূপটী, তখন তিনি ক্ষুধার্তের মুখে অন্ন, তৃষ্ণার্তের মুখে জল, আর্ন্তের সেবা, রোগীকে ঠাকুরের চরণামৃত, ভোগীর বিবেক জাগিয়ে দিয়ে ত্যাগের শিক্ষা এবং এটাও তাঁরা পেতেন—তাঁদের সংসারে কোন জটিল সমস্যা উপস্থিত হলে তাঁরা গোপালমার কাছে এসে দাঁড়াতেন উপদেশ নিতে, তিনিও সহজভাবে সেই সমস্যা সমাধান করে দিতেন। ঠাকুরকে তিনি ভালবেসেছিলেন পূজ-রূপে, তাই মানুষ, পশুপক্ষী, সবার উপরেই তাঁর মাতৃ-স্নেহধারার আশীর্বাদ সব সময়েই ঝরে’ পড়ত। এমন

কি একটা বেড়ালবাচ্চাও তাঁর চোখ এড়াত না। আমরা গৃহবাসীরা আপত্তি করতুম ঘরে বেড়াল ঘুরে বেড়ানোর জন্ত; তাই তিনি আমাদের লুকিয়ে তাকে কোল দিতেন, এটা কতবড় স্নেহের ও উদার মনের পরিচয়, পাঠক-পাঠিকারা বুঝতে পারবেন, কারণ ষাঁর সব, যিনি গৃহের সর্বময়ী কর্ত্রী, তিনিও শিশুগুলত ভয় করতেন গৃহ-বাসীদের। সেই ভালবাসার মাধ্যম দিয়ে তিনি তাঁর গোপাল মূর্তি মাধ্যম্য করে’ রেখেছিলেন, ষাঁরাই দেখতেন সেই গোপাল মূর্তি, বলতেন এমনটা আর দেখি নি। তাই ঠাকুরও তাঁকে সব সময়েই জড়িয়ে-ছিলেন। যখন বা পেতেন গোপালমা আগে তাঁর গোপালকে দিয়ে তবে ছেলেমেয়ে আত্মীয়স্বজনকে দিতেন। প্রসাদের ভাগ আগে তাঁর কর্মচারীরা পেত, তারপর যা’ থাকত, তিনি ভাগ করে’ গৃহবাসীদের দিতেন। এই অভ্যাস তিনি তাঁর গৃহবাসীদের উপর ছড়িয়ে দিয়েছিলেন; তাঁর ছোট্ট নাতি-নাতনীরাও কিছু পেলে আগে জিজ্ঞাসা করে’ গোপাল ঠাকুরকে দোব? ঠাকুরকে অমন সহজভাবে তিনি ভালবেসেছিলেন বলে’ই ঠাকুর তাঁর কাছে ধরা দিয়েছিলেন। ঠাকুর যেন তাঁর বাধ্য পুত্র ছিলেন। একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে, আগেই বলেছি—তাঁর গরু খুবই প্রিয় ছিল; গোয়ালভরা গরু, যে গরুগুলি ছুঁষ দেয় না, তাদেরও তিনি বসিয়ে খাওয়ান। একদিন গোয়াল মাঝে বলে—“না, রাখালকে গরু তিনটা দাও, চরিয়ে দিয়ে যাবে, মাঠে খেয়ে ওদের শরীরও ঠিক থাকবে।” তাই ব্যবস্থা হ’ল। মাঠে গরু যায়, একদিন দুটি গাই ফিরে’ এল, একটা এল না। কত খোঁজাধুঁজি হল, কোথাও গাই পাওয়া গেল না। গোপালমার মন খুব খারাপ। রাজে ভোগারতি শেষ করে’ গোবিন্দজীর কাছে খুব খানিকটা কাঁদলেন এই বলে’ যে, “ঠাকুর, আমার কত অপরাধ হবে, তাকে যদি কশাই ধরে নিয়ে’ যায়, তুমি খুঁজে এনে দাও।” আমরা সব ঠাকুরঘরে বসে’ ভক্ত ও ভগবানের আলাপ শুনছি। খানিক পরে আসন থেকে তিনি উঠলেন, বললেন, “দে দরজা বন্ধ করে’ দে’। ঠাকুরঘর বন্ধ করে’ আমরা সব নেমে এলাম। সকালে উঠে’ শুনছি যে, আমাদের

ডাকাডাকি করছেন “আয় সব দেখবি—গোপাল আমার কেমন ছেলে, কেমন কথা শুনেছে।” গিয়ে দেখি ঠাকুরঘরে দরজা থেকে খাটের উপর অবধি যেখানে ঠাকুর বসে’ আছেন, ছোট্ট ছোট্ট পায়ের ছাপ, আর যে ভেলুভেটের আসনটির উপর তিনি বসে’ আছেন, তার উপর যে ছাপ দুটি চরণের, সে যে কি সুন্দর চরণের ছাপ, ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতা নেই। যারা দেখেছেন তাঁদের দেহমন সব সার্থক হয়েছে, যার চরণের ছাপ ঐ রকম, না জানি তাঁর চরণ কি অপূর্ণ সুবাসিত। তারপর গোপালমা বললেন, “জানিস্ গল্পটা বন্ধ গেটের সামনে দাঁড়িয়েছিল, ভোরবেলা গরুর লোক উঠেছিল, দেখে গরু দাঁড়িয়ে আছে, আবার গেট খুলে তাকে ভেতরে এনেছে। কাহাকাহি যেসব আত্মীয়স্বজন ছিলেন, সবাই শুনে’ দেখতে এসেছিলেন। বেলা ১২টা নাগাদ সেই ছাপ মিলিয়ে গেল। বিশ্বাস করে’ যারা সেই চরণের ছাপ মনের অন্তঃস্থলে এঁকে নিয়েছিলেন, এখনও মাঝে-মাঝে তাঁরা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেন। যারা বিশ্বাস করেন নাই কবির ভাষায় বলি—

“বুঝছি কি বুঝি নাই বা সে তর্কে কাজ নাই,

ভাল আমার লেগেছে যে বইল সেই কথাই ॥

হৃদয়ে মোর কখন জানি, পড়ল পায়ের চিহ্নখানি
চেয়ে দেখি তাই।”

তাঁর উপলব্ধি সম্বন্ধে আর একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে। তাঁর পুত্রসম একটা ছেলে বিলাতে শিক্ষাকালীন এপেন্ডিসাইটস্ অপারেশন করায়। সে কথা ছেলেটা এখানে কাহাকেও জানায় নাই, একদিন পুত্রার আসনে বসে গোপালমা দেখেছেন,—সেই ছেলেটা হাসপাতালে অপারেশন-টেবিলে শায়িত অবস্থায়, তাঁকে (গোপালমাকে) ডাকছে। তিনি ব্যাকুল হয়ে, তাঁর ভগবান্ পুত্রের কাছে ইহগজতের পুত্রের জন্ত প্রাণভরে’ ভিক্ষা চাইলেন, আসন থেকে উঠে ছেলেদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, “হ্যারে, অমুক কেমন আছে?” ছেলেরা বলল—“কেন মা, তার তো চিঠি এসেছে ক’দিন আগে, ভাল আছে।” উনি বললেন, “না রে, আমি দেখলুম—সে হাসপাতালে

টেবিলে শুয়ে’ আমার মনে করছে।” কিছুদিন পরে সেই ছেলেটা ছুটিতে ক’লকাতা এলে, সে বলল, “হ্যাঁ, অমুক তারিখে আমার অপারেশন হয়েছিল।” তারিখ মিলিয়ে ছেলেরা দেখল যে, সেইদিনই গোপালমা ঐ সব দেখেছিলেন। আধুনিক বিজ্ঞানে হয়ত এর অর্থ নাম আছে, কিন্তু আমরা যারা তাঁর সঙ্গলাভের সৌভাগ্য পেয়েছি, তারা বলব ঠাকুরকে সহজভাবে ভালবাসার মূল্য ঠাকুর দিয়েছিলেন তাঁকে। অল্পরূপ ঘটনা তাঁহার জীবনে বহুবার ঘটেছিল। মহাপ্রয়াণের তিনদিন আগে থেকে তাঁর ডান হাতটা অত্যন্ত ও আশীর্বাদ দেবার জন্ত সকল সময়েই প্রস্তুত ছিল—পুত্র, কন্যা, জামাতা, বধূ, আত্মীয়স্বজন, দাসদাসী, ভক্ত-বৃন্দ সকলের জন্ত। কারণ তিনি তাঁর মহাপ্রয়াণের তারিখ গৃহবাসীদের তিনমাস আগে জানিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু তারা যেন জেনেও বিশ্বাস করতে পারছিল না যে, উনি এই দেহ ছেড়ে আমাদের কাছ থেকে চলে যাবেন। কিন্তু যত তারিখ এগিয়ে আসে, তাঁর শরীরেরও অবনতি হয় তত—তাদেরও মন ভারী হয়ে উঠতে থাকে, ও সত্যই যখন সেইদিন এসে উপস্থিত হয়, তখন উনি সবাইকে আশীর্বাদ নিতে ডাকেন, তখন সকলেই ঝড় আসছে জেনেও, অশান্ত মন নিয়ে, শাস্ত মুখে, মাথা নীচু করে তাঁর আশীর্বাদ নিতে আসছিলেন, তিনিও তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মৃদু হাসিতে মুখ ভরিবে শাস্তমুখে আশীর্বাদ বিতরণ করেছিলেন ও যাকে যা’ উপদেশ দেবার দিয়েছিলেন। এবং তাঁর হাতের সেই ছোট্ট মালাটি (যা’ সকল সময়েই তাঁর হাতে ঘুরত) ঘুরিয়ে নাম করে’ যাচ্ছিলেন ও ছেলেমেয়ে ইত্যাদি সবাইকার সঙ্গে গলা মিলিয়ে নাম-গানও করে’ যাচ্ছিলেন। ইচ্ছামৃত্যুর তারিখ ঘোষণা করা সত্ত্বেও, তাঁহার এক পুত্রস্থানীয় চিকিৎসককে নিজের চিকিৎসা করতে তিনি দিয়েছিলেন তার এবং আমাদের সবাইকার অরুরোধে। সমাধিস্থ হবার পূর্ব মুহূর্তে, তাঁর শেষ কথা “আজ অমুখ কলা” বলে’ মৃদু হেসে বুদ্ধাঙ্গুলি দেখালেন। মৃত্যুঞ্জয়ী সাধিকা অন্তিম মুহূর্তে যেন মৃত্যুর সহিতই রহস্ত করলেন। তারপর পদ্মাসন করে’ যে হাত (বাঁ হাত) তিনি তিন বছর নাড়তে পারেন নি, আশ্চর্য

বাণী-মন্দিরে

শ্রী অরুণচন্দ্র দত্ত

ভাব ও রস, ধারণা ও ধ্যান—মনোময় মানুষের অন্তর-সাধনারই উন্নত পরিণাম। ধারণা-যোগ্য ভাব গভীর হইতে গভীরতর মননের ফলে ধ্যানরসে পরিণত হয়। ভাব যতক্ষণ চিন্তাপ্রধান, ততক্ষণ তাহা মস্তিষ্কের খোরাক, বুদ্ধির অস্থূলনের সামগ্রী। দীর্ঘ ধারাবাহী চিন্তাপ্রবাহে মস্তিষ্কের উপজীব্য ভাববিশেষ হৃদয়ের রসায়নে ঘনীভূত ও রসায়িত হইয়া আনন্দনযোগ্য রসরূপ লাভ করে। স্বাধ্যায়ের বাণী এইরূপেই মন্ত্রযোগ্য হইয়া সাধক-সাধিকাকে ধ্যানধন ইষ্টপদে লইয়া চলে। তখন আনন্দনের পর আনন্দ—তবু আর তখন শুধু তত্ত্ব নয়, নাম-রূপ-লীলার উদ্বর্তনে-উদ্ভাটনে কি অপরূপ মাধুর্যময় হইয়া উঠে, তাহা ভাষার অগম্য—হৃদা-মনীষা-মনসাতিকণ্ঠা—হৃদয়-মনীষা ও মনের দ্বারা অভিঘাত হইয়াই অনির্বাচনীয়স্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বাণীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া এই ভাব-রসেরই আনন্দনে-পরিবেশনে ক্ষণকালের জ্ঞানও ব্রতী হওয়ার সাধ জাগিয়াছে। স্বাধ্যায়ের উপাদান-উপকরণ প্রচুর। বাংলার ধর্মসুন্দরমণ্ডলে যে সাধনসিদ্ধ ধ্যান ও চিন্তার ক্রমবিকাশ চলিয়াছে, তাহার প্রকাশ আমরা দেখি—নানা মনননিষ্ঠ সাধক-সাধিকার মুদ্রিত ও প্রকাশিত গ্রন্থ ও রচনার অবাদনে। এই সকল গ্রন্থাদি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের

মনীষী সম্মেলনগণ প্রীতি ও আনন্দভরেই উপহার পাঠাইয়া থাকেন—“প্রবর্তকে” সমালোচনার জ্ঞাত। কর্তব্যধন জীবনে পাঠাবসর অন্ত—স্বধী বন্ধুগণের আগ্রহ ও প্রীতির প্রতি সম্বোধিত সুবিচার করার সম্ভব হয় না। তবু পাঠ ও স্বাধ্যায়ের এই সুযোগকে চিরাকাঙ্ক্ষনীয় সুভযোগ বলিয়াই আমি মনে করি। “প্রবর্তকে” এই “বাণীমন্দিরে” স্তম্ভে ক্রমে-ক্রমে সকল প্রাপ্ত যোগ্য গ্রন্থেরই আমরা উল্লেখ-পরিচয়, তৎ-প্রসঙ্গাগত তত্ত্বগত সমালোচনা বা আনন্দনমূলক উল্লাস প্রকাশ করার চেষ্টা করিব।

চিন্তায়, অহুতবে, রসোপলব্ধিতে ষেটুকু ক্রটি, অসম্পূর্ণতা থাকিবে, লেখকের চিন্ত-প্রণিধানের স্বাভাবিক সীমা-দৈন্য-অনধিকার মনে করিয়াই আশা করি—তাহা উদারচেতাঃ মনস্বিগণের করুণাদৃষ্টিতে ক্ষমাযোগ্য হইবে।

নিগমপ্রসাদ গ্রন্থাবলী *

১ম হইতে ১৭শ সংখ্যা

বঙ্গীয় সারস্বত মঠ হইতে প্রখ্যাত সাধক সম্মাসী ও প্রতিভাবান্ মনীষী স্বামী সত্যানন্দ কর্তৃক বিরচিত

* প্রাপ্তিস্থান—মহেশ লাইব্রেরী, ২১১ শ্রামাচরণ নে স্ট্রিট (কলেজ স্কোয়ার) কলিকাতা-১২ ও শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫২ ঠাকুরবাটী স্ট্রিট, পোঃ শ্রীরামপুর, হুগলী।

আস্তে বালিলে রেখে তবে এপাশ-ওপাশ করতেন, সেই হাত তুলে দুই হাত ষোড় করে' প্রণাম করে' চলে' গেলেন ইহজগৎ ছেড়ে, ২৭শে এপ্রিল ১৯৬৩, রাত্রি ১২টা বাজতে তের মিনিটে। তাঁর স্বামী (আমার পূজ্যপাদ ভাস্করঠাকুর মহাশয়) তাঁর নাম দিয়েছিলেন সদানন্দময়ী। শোক দুঃখের মাঝে তাঁর মুখ সামান্তক্ষণের জ্ঞান মেঘাচ্ছন্ন হ'ত তারপরেই আবার মেঘমুক্ত আকাশের মত তাঁর মুখখানি পরম জ্যোতিঃ ও আনন্দে ভরে উঠত সদানন্দময়ী নাম সার্থক করে'। সকল সময়েই তিনি সহজ ছিলেন। তাই ষাবার সময়েও তিনি সহজ হয়েই গেলেন কবির গান মূর্ত করে—

‘ষাবার বেলায় সহজেরে ষাই যেন মোর প্রণাম সেরে’।

ছেলেমেয়ে ইত্যাদি আমরা সবাই বলেছিলাম, এখন তোমার ষাওয়া হবে না, তাই বলেছিলেন, “আর আটকাস্ না আমায়, দেখনা ওপরে গিয়ে তোদের আরও ভাল করে' দেখতে পারব মনে হয়।” আজ তাঁর ইহজগতের সম্পর্কিত লোকের উপর তাঁর স্নেহ-ভালবাসার ভাঙার উজাড় করে' দিয়ে' তিনি চলে' গেছেন শিবলোকে।

অমৃতের সন্তান তিনি, আমাদের মধ্যে যে অমৃত বিতরণ করে' দিয়ে গেছেন, আমাদের জীবন যেন সেই অমৃতে ভরে' থাকে, এই প্রার্থনা করি।

এই ১৭ বাণি গ্রন্থ প্রায় এক সঙ্গে আমাদের কাছে দীর্ঘ দিন হইল আসিয়াছে। উক্ত মঠের এইগুলি নূতন প্রকাশ।

বিশেষ ধর্মগুরু ও সম্প্রদায়ের বিশেষ সাহিত্য হইলেও, উহার প্রত্যেকখানি বইই সর্বসম্প্রদায়ের সাধকসমাজ ও এমনকি সাধারণ চিন্তাশীল পাঠকপাঠিকাও পড়িয়া আনন্দ পাইবেন—উপকৃত হইবেন।

১। গুরুশিষ্যপরম্পরা—দক্ষিণা। ১০ আনা

মূল সদগুরু এক, কিন্তু পরম্পরাক্রমে নরদেহধারী মন্ত্রদাতা গুরু বহু ও বিভিন্ন। ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ কথা। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ গীতামুখে, শ্রীমৎ নৃসিংহদন সরস্বতী তদ্ব্যবহায়ে, শ্রীমৎ সম্ভদাস বাবাজীর দ্বারা প্রদত্ত সম্প্রদায়চার্য্যগণ এবং পরমহংস শ্রীমৎ নিগমানন্দ সরস্বতী মহারাজ নিজেও স্ব-স্ব-রচিত বিভিন্ন পুস্তকে ও উপদেশবাণীতে এই গুরু-শিষ্য-পরম্পরাক্রমে প্রবাহিত যোগ ও ব্রহ্মবিজ্ঞানশীলনের ধারারক্ষণনীতি স্বীকার ও তৎসম্পর্কীয় নির্দেশাদি দিয়া গিয়াছেন। সম্প্রদায়-প্রবর্তক-বা-নায়ক ধর্মগুরুর পার্থিব দেহাবসানে উত্তরাধিকার-প্রশ্রবটিত ব্যাপারে সমস্তা দেখা দিলে, সামাজিক-বংশধারারক্ষার দ্বারা এই অধ্যাত্ম-কুলধারারক্ষার শাস্ত্রত বিধানকেই আমাদের স্মরণে আনিতে হইবে—আলোচ্য * নিগমপ্রসাদ-গ্রন্থমালার এই ১ম সংখ্যার ছোট পুস্তিকাখানিতে সংক্ষেপে উহারই অমূল্যরূপ গুটিকয়েক সারগর্ভ কথা উপস্থাপিত ও আলোচিত হইয়াছে। ইহা সর্বসম্প্রদায়েরই পূর্বলিখিত সংহতি-সঙ্কট-মোচনচিন্তায় ও তৎসমাধানে বিশেষ আলোকপাত করিবে।

“আমায় ভেবে-ভেবে তোমরা ঠাকুর হয়ে যাও—
আমার চাইতেও তোমরা বড় হয়ে ওঠ—এক নিগমানন্দ-
স্থলে শত নিগমানন্দ হয়ে যাও”—

এ-বাণী যেমন উৎসাহ-সঞ্চারী ও অমোঘ অধ্যাত্ম-
প্রেরণাপ্রদ, তেমনি আবার

“মহাযুদ্ধের পর ধর্মরাজ্যস্থাপন প্রকৃতির অবশুসম্ভাবী
ফল—সুতরাং হিন্দুগুরুর কার্য্যও পৃথিবীব্যাপী.....
বহু শিষ্যের মধ্যে গুরুশক্তিবিকাশের আয়োজন চলিতেছে
—তাই অন্তরিক দৃষ্টিতে না করিয়া, ব্যাপ্তি শিষ্যশক্তিকে

উপেক্ষা করিয়া সমষ্টি শিষ্যশক্তির কার্য্যে আত্মনিয়োগ
করিয়াছি”—

শ্রীমৎ পরমহংসদেবের এই উক্তির মধ্যে যে ‘সমষ্টি-
শিষ্যশক্তি’ অর্থাৎ অধ্যাত্মসত্ত্বশক্তির ইচ্ছিত আছে, তাহার
প্রকৃষ্ট তাৎপর্য্য ও মর্ম্ম অবধারণ করার বিশেষ প্রয়োজন
আছে বলিয়াই আনি মনে করি। গ্রন্থলেখক স্বামী
সত্যানন্দজী এ বিষয়ে আরও বিশদ আলোচনা কোথাও
করিবেন, ইহাই আশা করিব।

২। বেদান্তবিদ গুরু—দক্ষিণা। ১০ আনা

একই প্রতিপাদ্য তত্ত্ব সাধ্য-সাধনার দিক দিয়া এই
২ সংখ্যার পুস্তিকায় আলোচিত হইয়াছে। চতুর্বেদের
চাবি মহাবাক্য ব্রহ্মচৈতন্যকেই সূনির্দেশ করে।
‘তুমিই ব্রহ্ম’—‘আমিই ব্রহ্ম’ ইত্যাদি অখণ্ডাত্মত্বেরই
বিচিত্র দিগ্‌দর্শন। গুরু স্বয়ং সাধনশেষে সিদ্ধ অর্থাৎ
ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াছেন। তিনি শিষ্যকে আবার দীক্ষা
দিবেন—শিষ্যকেও সিদ্ধ অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ হওয়ায় সহায়তা
করার জন্ত।

অতএব বেদান্তবিৎ গুরুর লক্ষ্য—শিষ্যকেও বেদান্তবিৎ
গুরুরূপে প্রতিষ্ঠিত করা। তাহা যদি না হয়, তবে
সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। বরং ইহাও বলা
যাইতে পারে যে, যতক্ষণ শিষ্য স্বয়ং গুরু না হইতেছেন,
ততক্ষণ তাঁর গুরুকরণ পরোক্ষবোধের পর্যায়েই রহিয়া
যাইতেছে—বস্তুতঃ গুরুস্বরূপ হওয়াই অপারোক্ষাত্মত্বের
পথে উত্তরণের শ্রেষ্ঠ পরিণতি।

৩। জয়গুরু—দক্ষিণা। ১০ আনা

দেখা যাইতেছে—এই পুস্তিকাগুলির দক্ষিণা বা
ক্রয়মূল্য ১০ আনা—মাত্র এই চারি আনা মুষ্টিভিক্ষায়
অমূল্য ভাবসম্পৎ ক্রয় করার সুযোগ দিয়াছেন সারস্বত
মঠ—তজ্জন্ত তাঁহারা ধন্যবাদার্থ। আমরা এবার আর
মন্তব্য না করিয়া, “জয় গুরু” পুস্তিকা হইতে সারগর্ভ কিছু
কথা এখানে উদ্ধৃত করাই শ্রেয়ঃ মনে করিলাম—ইহার
প্রত্যেকটি কথাই উপদেশ—অমূল্য ও আশ্বাদ্যঃ—
“ভাগবতে ভগবানেরই উক্তি—‘আচার্য্যরূপে আমিই

বর্তমান।' গুরু-নামও তারকব্রহ্ম নাম—উদ্ধারকর্তা গুরুর মত তাঁর নামেরও মহোদ্ধারশক্তি আছে। গুরু এবং গুরুনাম অভিন্ন।

গুরুরূপে ভগবদ্ভজন সুর।

গুরু মানে ভারী। গুরুর তুলনায় আর সবই লঘু। সর্বাপেক্ষা দ্ব্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ—তমপ্-প্রত্যয়ের যোগ্য স্থানই গুরু। গুরু-নামের ওজন আজ পর্যন্ত কেহই করিতে পারেন নাই।

'জয় গুরু' বলিতে গুরুশিষ্যের অনাদি সম্বন্ধ স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

'জয়তাং'—'সর্বোৎকর্ষণে বর্ততাম্'

কবিরাজ গোস্বামীর 'বন্দে গুরুন্'—বিভিন্নমঙ্গলের বন্দোদ্যেয় গুরু 'চিস্তামণির্জয়তি'—বেদে, উপনিষদে, পুরাণে গুরুর জয়ই সর্বত্র গীত—সর্বোপরি সহস্রারে গুরুস্থান—গুরুস্থান সকলের উপরে।

ভগবান্ গুরুরূপে সর্বপ্রথমে নিজে প্রকাশ করিয়াছিলেন—জীবের বদ্ধ হওয়ার পূর্বেই তার মুক্তির সুব্যবস্থা।

গুরুরেব পরংব্রহ্ম—সর্বদ্ব্যেষ্ঠ-শ্রেষ্ঠ নমস্ত বলিয়াই গুরু ব্রহ্মস্বরূপ।

প্রতিমায় মৃত্তিকা, শালগ্রামে শিলা, গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি, এইগুলি করিতে নাই—ইহা হিন্দুর মজ্জাগত সংস্কার।

যেমন হিন্দু নারীর ভগবান্‌ই স্বামীর মূর্তিতে, তেমন গুরুর মূর্তিতে ভগবান্—ইহাই হিন্দু জাতির বৈশিষ্ট্য—তাহার অপূর্ব আবিষ্কার।

মা যেমন মলমূত্র পরিষ্কার করিয়া সন্তানকে কোলে লন, তেমন গুরুও শিষ্যের চিন্তামল শুদ্ধ করিয়া তাহাকে গ্রহণ করেন।

মায়ের কোল ও গুরুর আশ্রয়ই সম্পূর্ণ নিরাপদ।

গুরু যেন ধোবী—ধোপা কাপড়ের ময়লা ছাড়ায়, গুরু গনের ময়লা সাফ করেন।

নানকপহীদেও জয়ধ্বনি—'ওয়াহি গুরুজীকি কতে'—মহামহিম গুরুজীরই জয়।

'জয় গুরু'—সকলেরই প্রাণারাম মহানাম। ইহা

সর্বসম্প্রদায়গ্রাহ্য। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—সকল যুগেই গুরু ত্রাতা। গুরুনাম ভবকর্ণধার।

গুরুই পরম সত্য—গুরুর জয় পরম সত্যেরই জয়। সত্যমেব জয়তে।

শ্রীগুরুচরণাশ্রয়ী মাত্রেই পরম্পর ভাই। জয়গুরু মন্ত্রে চোখের সম্মুখে তামিষা উঠে স্ব-স্ব গুরুর মোহন মূর্তি আর তার অন্তরালে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে জাগিয়া উঠে অমূর্ত গুরুর অখণ্ড ভাব বা সত্তা। আমরা বহু হইয়াও এক হইব। প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া সর্বমতে, সর্বজাতির এমন মিলনমন্ত্র আর নাই।

দ্ব্যাকর গুরুনাম—মহারাজেশ্বর। গুরু-নাম ব্রহ্মনাম-নার—ইহা সর্বশাস্ত্রমর্ম।

সর্বসম্প্রদায়ী নাম পূর্ণ করে মনস্কাম
মনস্কাম করয়ে বিনাশ

গুরুর জয়ে আমাদেরই জয়। আমাদের স্বার্থ, আনন্দ, মুক্তিতেই তাঁর স্বার্থ, মুক্তি, আনন্দ। তাই তাঁর জয় না দিলে আমাদেরই জয় অপূর্ণ থাকিয়া যায়।

জয়-শব্দ মঙ্গলবাচকও। গুরুর মঙ্গলে আমাদের মঙ্গল। সর্বযুগের আচার্য্যগণ গুরুর জয়-বন্দনায় জয়যুক্ত হইয়াছেন।

'জয়গুরু'—জয়=ঐশ্বর্য্য; গুরু=করণ।

'জয় গুরু' নাম নিলে ভক্তি, মুক্তি সব গিলে,
সন্দেহ ইহাতে কভু নাহি।

সর্কাপদ্ যায় দূরে চিত্ত ভরে নব স্বরে
গুরুনাম সর্ব-অবগাহী

জয়, জয়, জয়, জয় ইহা ছাড়া কিছু নয়
অমৃতের তিনি পারাবার।

অপরিচিত সংস্কৃত গুরুস্তোত্রের স্বামী সিদ্ধানন্দ কৃত সুন্দর প্রাঞ্জল অম্ববাদ একছত্র তুলিয়াই এই উদ্ধৃতি শেষ করি—

ব্রহ্মানন্দপ্রদ পরম সুখদ কেবল জ্ঞানের মূর্তি।
আকাশের মত স্বন্দেহ অতীত 'তত্ত্বমসি'তে স্মৃতি।
এক নিরমল নিত্য অবিচল সাক্ষী দিবস-যামী।
ভাবের অতীত ত্রিগুণরহিত সদগুরুদেবে নাম॥

গোপেশ্বর-স্মরণে

শ্রীকণা দেবী ভারতী

বৈষ্ণবশাস্ত্রের সঙ্গে পরিচিত হবার পর থেকেই বিষ্ণুপুর বেড়াতে যাবার ইচ্ছা। সাহিত্য পরিষদের মাষ্টারমশাই (শ্রীমাপিকলাল সিংহ) যখন ডাকলেন বিষ্ণুপুর দেখে যাবার অহরোধ জানিয়ে, সেই ডাকে সাড়া দিয়ে বেরিয়ে পড়ি এক গ্রীষ্মের তোরে। মেদিনীপুর শহরের নিমতলা বাস ঠ্যাণ্ডে বাসে চড়লুম; ছপুরের আগেই পৌঁছুই বিষ্ণুপুর। শহরে ঢোকান মুখেই গুরুদেবের মূর্তি। প্রতিষ্ঠাতাদের পরিকল্পনা সার্থক হয়েছে।

মুঠেই মাষ্টারমশাইকে পাই। তিনি সাহিত্য পরিষদের সংগ্রহশালা দেখালেন। দেখার মত সংগ্রহ। দেশ ও দেশের সহায়ত্বের অভাব না থাকলে, পরিষদই সংগ্রহ করে তৃপ্তি পেতেন না, ধন্য হতেন আগন্তকেরাও সুপ্রাচীন জেলার অতীত ইতিহাসের অনেক কিছু সংগে পরিচিত হয়ে। এখানেই এক ছবিতে দেখা গেল—অগ্নিবীণা-বাদক কবি নজরুলকে—দল-মাদলে হেলান দিয়ে ঠাঁড়িয়ে।

খাবার পালা চুকিয়ে, পাহাড়ে গরমের মাঝেই বেরিয়ে পড়ি ক'জনে বিষ্ণুপুরের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি দেখতে। দেখা পর্বতি সহজ হ'ল না। প্রচণ্ড গরমে ঘোরায ক্লান্তি সহজেই আমাদের পেয়ে বসে। এক ঠাকুরবাড়ির ধারে বসে জল খাওয়া হল। আবার বেরোনো হল বাকী মন্দিরগুলি দেখার জন্য। বিষ্ণুপুরের অতীতম দর্শনীয় দীঘি—লাল বাঁধের পাড়ে ঠাঁড়িয়ে বিশ্রাম করার সময় কথা হ'ল, সময় কম থাকলেও বিষ্ণুপুর তথা বাংলার গৌরব শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়কে একবার দেখে যেতেই হবে। বাইরের অনেক টান থাকলেও বিষ্ণুপুরের মাটির টান তাঁকে বরাবরের মতই বেঁধে রেখেছে। “সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।” মনে পড়ল, কবিরঞ্জন কুমুদরঞ্জনের কথা। কোথামে একটি সন্ধ্যায় তাঁর মধুকরে (বাড়ির নাম) বসে শুনেছিলুম তাঁকে বলতে—“আমার জন্মভূমি আর মা-মংগলচন্দী, এই দুই-ই আমাকে বেঁধে রেখেছে; কোথায়ও

যেতে মন চায় না। সংগীতনায়ক গোপেশ্বরের মনেও হয়তো এমনি কোন ভাব বিরাজিত।

শরীর ক্লান্ত হলেও, গোপেশ্বরকে দেখার আকর্ষণে মন তখন সজীব। এক সময় এসে পড়ি তাঁর বাড়ির কাছে। খবর দিতে জানা গেল, তিনি বিশ্রাম সেরে উঠেছেন, ডাকছেন ভেতরে যেতে। কোলাপ্সিবেল গেট খুলে দিতে এলেন এক অল্পবয়স্ক অভিজাত মহিলা। জানলাম—তিনি সংগীতনায়কের সহধর্মিণী গৌরী দেবী। ভেতরে ঢুকে দেখি, শাস্ত্র সূক্ষ্ম সংগীতনায়ক বিদ্বানায় বসে আছেন। হাত দুখানি কোলের ওপর। মাথার চুল ধপধপে সাদা। উজ্জল গৌর গায়ের রং। গায়ের রং, মাথার চুল আর গৌর সব এক রংয়ের! মুখে সহজ সরল হাসি। কতদিনের পরিচিতের মত তিনি আমাদের আদর করে বসতে বললেন। তাঁর বিদ্বানার এক ধারে বসে পড়ি। আজকের বিষ্ণুপুর বলতে—গোপেশ্বর; তাঁকে চোখে দেখায় এই বেড়ানো সার্থক হল, এক কথা শুনে হাসলেন তিনি। পিপাসা লাগায় জল খেতে চাইলুম। একটি ছেলে খাবার জল নিয়ে আসতেই তিনি ব্যস্ত হয়ে বলে ওঠেন, “শুধু জল? সন্দেশ নিয়ে এস।” আমরা জানাই, শুধু জল হলেই চলবে; একটু আগেই খেয়েছি। জল খাওয়ার পরে একটু কথাবার্তা। জানা গেল, এই বয়সেও তিনি নিয়মিত সংগীতের চর্চা ও শিক্ষাদান করছেন। সহধর্মিণী গৌরী দেবী তাঁর সহকর্মিণী। অতীতের ছাত্রী আজও নিশ্চয় ছাত্রী। ছেলেদের কথা বললেন। বড় ছেলে শ্রীরমেশ বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনে পিতার স্বাক্ষর নিয়ে আজ ধন্য। গুরুভাই জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের কথা বলবার সময় তিনি বললেন, তাঁর অকালমৃত্যু বাংলার সংগীতজগতের অপূরণীয় ক্ষতি। রবীন্দ্রনাথের কথাও বললেন। আরও অনেক গুণী শিল্পীর কথা, ধারা আগেই চলে গেছেন। হাত দুটি সেইভাবেই কোলের ওপর স্থির। হাত দুটি দেখতে দেখতে ভাবি যন্ত্র-সংগীতেও ওই হাতেরই কী অসামান্য দক্ষতা ছিল।

হিজ মাষ্টারস ভয়েস তাঁর সেতারের রেকর্ডও করেছিল, তিনি একজন সার্থক সেতার-শিল্পী, এ কথা আজ হয়তো অনেকেই জানেন না।

বিদায় নেবার সময় হয়ে আসে। সংকোচের সংগেই বলে ফেলি—“আপনার সেই শ্রামা-সংগীত ছ’খানি ছেলেবেলায় রেকর্ড থেকে তুলেছিলুম, আজও গাই।” উৎসুক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, “কোন্ ছটি?” বলি—‘হুর্গা নাম মহামন্ত্র’ও ‘কালী নাম জপরে’। হাসি মুখে একটু কি ভাবেন, বলেন পরে—“কত গানই তো রেকর্ড হয়েছে।” তারপরেই গুণ গুণ করে স্বর ভাঁজতে থাকেন। স্বর ক্রমেই মৃদু থেকে গভীরে যায়, গেয়ে ওঠেন গোপেশ্বর—‘হুর্গা নাম মহামন্ত্র....’। অতিভূত হলাম, বহু হলাম গানটি তাঁর মুখে শুনে। সেই উদাত্ত মধুর স্বর আজও অবিকৃত, তেমনি স্বচ্ছন্দ স্বর-সম্পদে মোহময়। কালপ্রবাহ তার গতিপথে কোন বাধাই যেন সৃষ্টি করতে পারে নি। বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম তাঁর মুখের দিকে। মনে পড়ে যায় স্মদূর শৈশবের কত মধুর স্মৃতি।

সময় আর নেই, উঠতেও মন চায় না। গান

থামিয়ে হাসিমুখে বললেন, “এটা দরবারী কানাড়া, কালী নাম জপ রে,—এই গানটির স্বর বোধ হয় আড়ানা।” মাথা নেড়ে বললুম—হ্যাঁ।

উঠে দাঁড়াতে হল সময়ের তাড়নায়। বললেন, “আর একদিন আসবে, থাকবে, থাকবে, কথা হবে।” প্রণাম জানিয়ে বলি, আসবো। ঘর থেকে বেরোনোর সময় দেখি, আনন্দে মন ভরে উঠেছে, বিষ্ণুপুরের সবকিছুর ওপরে গোপেশ্বর; তাই মন বলেছিল—আজকের বিষ্ণুপুর বলতে গোপেশ্বরই।

আবার আগার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু কালচক্র ছাড়ল কই? যাওয়া গেল না, দেখা হ’ল না। মাসুষের চির অজ্ঞানার পথে বাড়ী হলেন গোপেশ্বর। মৃত্যু মানব-জীবনের নিত্য-সত্য পরিণতি—“চির স্থির হবে নীর হায়রে জীবন-নদে!” তবু এই মহা বিচ্ছেদ অসহনীয়। কিন্তু কবিশুকের সেই—“যে নদী মরুপথে হারাল ধারা, জানি হে জানি তাও হয়নি হারা” শাস্ত সত্য বাণী। গোপেশ্বরের স্বর অমর; কাল তাকে সীমারেখার ক্ষেত্রে আবদ্ধ রেখে লুপ্ত করতে পারবে না। গানের সাথেই অমর হয়ে থাকবেন মহান স্বরসাধক গোপেশ্বর। লক্ষ প্রাণে মানের আসন পাতা থাকবেই তাঁর জন্তে।

সৈনিক-সঙ্গীত

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(ইনিরা দেবীর “সৈনিক-সঙ্গীত”-এর অনুবাদ। ঐ স্বরেই গায়)

আমরা যে ভারতের ধর্মধারক সবে, দেশের শৌর্ষ চিরজাগ্রত প্রাণ,
গৌরবী তারি মহা গরিমার গৌরবে, মায়েয় কোলের আদরের সন্তান।
দেয় যেন আমাদের পতাকা পাহারা সত্যদিশারি-আলো, সকালের তারা
শিব হবে নত কেন? চরণ না টলে যেন।

দিকে দিকে ঝড় হ’য়ে বাজাব বিধান—

“আগে চল চল আগে” দীপক তুর্ঘ্যরাগে মৃত্যুরো সাথে রণে হব আগুয়ান ॥
আমরা যে তুফানের সাথী, খেলি দোললীলা বহ্নি-আবীর ল’য়ে রজনী বিহান,
স্বর্ধের জ্বালা শিখা দামিনীর চলধু ধরি’ করে বরি’ দেশমায়েরি বিধান।

দেয় যেন আমাদের.....হব আগুয়ান ॥

জুগ্ম গহন কি ফুল ফুলের পথ—যেতে হবে যেথা ডাকে লক্ষ্য নিশান
দেশের মহিমা জপি’ দেশের জ্বলাল ছিনি’ আনিব আকাশ হ’তে তারা অগ্নান

দেয় যেন আমাদের.....হব আগুয়ান ॥

ভক্তযোগী রসিকবিহারী

আচার্য্য শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

(তিন : আষাঢ় সংখ্যার পর)

১২১০ খৃষ্টাব্দে একদিন কোন একটি বিশেষ স্থানে কীর্ত্তন ও সংপ্রসঙ্গে নিমন্ত্রিত হইয়া রসিকবিহারী উপস্থিত হন। শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কীর্ত্তন আরম্ভ হইতে না হইতে রসিকবিহারী ভাবে বিভোর হইয়া যান। প্রথমে অক্ষকম্পাদি প্রকাশ পায়, তারপর সমাধিতে ডুবিয়া যান। সমাধি শিথিল হইলে উঠেঃস্বরে ‘মা-মা’ ধ্বনির সহিত তাঁহার হাসি-কান্না আরম্ভ হয়, কখনো বা তিতর হইতে ঠু-নাদ উথিত হইতে থাকে। ব্রহ্মচারীজি ও অন্যান্য বিশিষ্ট ভক্তগণ তাঁহার অপ্রাকৃত অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত ও উৎফুল্ল হন। ব্রহ্মচারীজি তাঁহার আবাল্য স্মৃদ্ধি। তিনি তাঁহার উন্নত আধ্যাত্মিক জীবনের কথাও জানিতেন, এবং তিনি যে তখনো সদ-গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই, তাহাও জানিতেন। সাদক স্বীয় পুরুষকার প্রভাবে সাধনার যত উচ্চ স্তরেই আরোহণ করুক—জ্ঞান, ভক্তি ও যোগের চরম ভূমিতে স্থিতিলাভ যে সদগুরুর বিশেষ রূপা ব্যতীত সম্ভব নয়, এ সম্বন্ধে ব্রহ্মচারীজির স্মৃদ্ধি বিশ্বাস এবং তাঁহার গুরুদেব বিজয়রুক্ম গোস্বামী মহাশয় ইহা পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিয়াছেন। সেইদিন অমুঠানের অস্ত্রে ব্রহ্মচারীজি আবাল্য ধর্মবদ্ধ রসিকবিহারীকে তাঁহার সাধনার পূর্ণতা সম্পাদনের নিমিত্ত অবিলম্বে গোরক্ষপুরে গিয়া শ্রীশ্রীযোগিরাজ গম্ভীরনাথের শরণাপন্ন হইতে উপদেশ দেন। তাঁহার মত উচ্চাধিকারীর পক্ষে শ্রীনাথজীই যে একমাত্র সদগুরুর আসন গ্রহণ করিবার যোগ্য, তাহাও তিনি দৃঢ়তার সহিত বলেন। গোস্বামী প্রভু শ্রীনাথজীর সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, সেদিকেও তিনি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সেদিন ব্রহ্মচারীজির কথায় রসিকবিহারীর নূতন উদ্দীপনা লাভ হইল। তিনি অন্তরে নাথজীর প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিলেন। আর যেন তিনি প্রতীক্ষা করিতে পারেন না। অল্পদিনের মধ্যেই স্থলে ছুটি লইয়া

এবং পাথের সংগ্রহ করিয়া তিনি গোরক্ষপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। নাথজীর শিষ্যসংখ্যা তখনো খুব বেশী নয়। গোরক্ষনাথ মন্দিরে উপনীত হইয়া রসিকবিহারীর বোধ হইল, যেন যোগিরাজ তাঁহাকে গ্রহণ করিবার জন্তে প্রস্তুত হইয়াই আছেন। তিনিও গুরুজীকে দেখিয়াই ভাবে বিভোর হইলেন। গুরুজীর নির্দেশ অনুসারে যথাসময়ে দীক্ষা হইল,—১২১০ মার্চ। তখন তাঁহার বয়স ৪৭ বৎসর। রসিকবিহারীর আধ্যাত্মিক জীবনের চরম অধ্যায় আরম্ভ হইল। দীক্ষা গ্রহণ করিয়া গুরুর আদেশে তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। তদবধি গুরুই তাঁহার জীবনসর্বস্ব হইল। সকল কথাতে, সকল ব্যাপারে ‘জয় গুরু’ ‘জয় গুরু’ ধ্বনি তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইতে লাগিল। তাঁহার চিরাত্যস্ত হৃদয়ভেদী ‘মা-ডাক’ অবশ্য তিনি ছাড়িলেন না; মা-র সঙ্গে এখন গুরু যুক্ত হইলেন। তাঁহাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হইত,— গুরু আপনার কে? গুরুর সঙ্গে আপনার কি সম্বন্ধ? তিনি উত্তর করিতেন—‘গুরু আমার সব, গুরু আমার ভিতর বাহির সব ব্যাপ্ত করিয়া আছেন’। পূর্বে মাকেই তিনি তাঁহার ‘সব’ বলিয়া অনুভব ও উল্লেখ করিতেন। তাঁহার সে ভাব এখনো নষ্ট হইল না। আবার গুরু সম্বন্ধেও তিনি তাহাই অনুভব করিতে লাগিলেন। মা এবং গুরু যেন তাঁহার অমুভূতিতে অভিন্ন হইয়া গেলেন। ভাবাবস্থায় তিনি কখন ‘মা-মা’ বলিতেন, কখন ‘গুরু গুরু’ বলিতেন। তবে একটা ভেদ লক্ষিত হইত— তাহার ‘মা-মা’ চীৎকারে যেমন চারিদিক কাঁপিয়া উঠিত, ‘গুরু-গুরু’ ধ্বনিতে তাহা হইত না, ‘গুরু-গুরু’ ধ্বনিটা প্রায়ই গুরুগম্ভীর হইত; সেইরূপ ‘মা-মা’ বলিতে বলিতে যেরূপ কান্নার রোল ও হাসির তরঙ্গ দেখা যাইত, ‘গুরু-গুরু’ বলিতে বলিতে তৎপরিবর্তে তিনি যেন গাভীর্ষ্যপূর্ণ আনন্দে মগ্ন হইতেন। যাহা হোক, তাঁহার বাহিরের জীবনযাত্রা প্রণালী ও আচার ব্যবহার পূর্বের স্তায়ই চলিতে লাগিল।

১৯১৪'র ডিসেম্বরে নেত্র-চিকিৎসা ব্যাপদেশে শিষ্য-গণের সনির্বন্ধ অহুরোধে যোগিরাজ কলিকাতা আগমন করিয়া একমাস ছিলেন। সেই সুযোগে বাংলাদেশের বহু ধর্মপিপাসু নরনারী তাঁহার চরণে আশ্রয়লাভের প্রার্থনা লইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হন এবং যোগিরাজও করুণায় বিগলিত হইয়া তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করেন। রসিকবিহারীর স্ত্রীপুত্রাদি সকলেই সেই সুযোগে দীক্ষা লাভ করেন। রসিকবিহারী প্রায় প্রতিদিনই গুরুর নিকটে গমন করিতেন এবং তাঁহার সেবা-শুশ্রূষাদি ব্যাপারেও একটু দূরে দূরে থাকিয়া সাহায্য করিতেন। তিনি গুরুর খুব সন্নিহিতে কমই বাইতেন, কারণ গুরু-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেই তাঁহার ভাব সংবরণ করা কঠিন হইত, সমাধির উপক্রম হইত। ভাবের উদ্বেলতা হইলে অল্প লোকের উদ্বেল জ্ঞানিতে পারে এবং তিনিও প্রকাশিত হইয়া পড়িবেন, এই আশঙ্কাতেই তিনি একটু দূরে দূরে থাকিয়া গুরুদেবকে দর্শন ও প্রণাম করিতেন। যোগিরাজ একমাস কলিকাতায় আসিয়া বহু নরনারীকে রূপা বিতরণ করিয়া গোরক্ষপুর প্রত্যাবর্তন করেন। তৎপরে তিনি দুই বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক কাল জুল দেহে বিদ্যমান ছিলেন। ১৯১৭-র মার্চ মাসে মধুকৃষ্ণ ত্রয়োদশীতে তাঁহার মহাপ্রয়াণ হয়। এই অল্প সময়ের মধ্যে আরো বহু বাঙ্গালী ধর্মপিপাসু তাঁহার নিকট গমল করিয়া দীক্ষালাভ করেন। শিষ্যগণের মধ্যেও অনেকে অবসর পাইলেই দর্শন ও সঙ্গলাভের নিমিত্ত তাঁহার নিকট গমন করিতেন। কিন্তু রসিকবিহারীর স্ত্রীপুত্রকে জুল দেহে দর্শন করিবার আর সুযোগ ঘটে নাই।

সদৃশ গন্তীরনাথ রসিকবিহারীকে মহাযোগীশ্বর শিবের মস্ত্রে দীক্ষিত করেন এবং তাঁহার অন্তর্জীবনকে অন্তরঙ্গ যোগমার্গে প্রবর্তিত করেন। ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনার চিরন্তনী ধারা অহুসারে শিবই সব যোগীর পরমারাধ্য, পরম আদর্শ, পরম ঈশ্বর ও সর্বাস্ব্যামী আদিগুরু। মানব জীবনে শিবই লাভই যোগীদের চরম লক্ষ্য। শিব মহাযোগীশ্বর, মহাজ্ঞানীশ্বর, মহাপ্রেমীশ্বর, মহাশান্তিশ্বর, মহাত্যাগীশ্বর। তিনি নিত্যসিদ্ধ, নিত্য-মুক্ত। তাঁহার স্বরূপে সর্বপ্রকার শক্তি ও ঐশ্বর্যের নিত্য

পরিপূর্ণতার সহিত সর্বপ্রকার শক্তি ও ঐশ্বর্যের প্রতি পরম উদাসীন সমভাবে বিরাজমান। বিশ্বের সব শক্তি ও ঐশ্বর্যের অধীশ্বর হইয়াও তিনি নিকঙ্কণ নিরভিমান পরম বৈরাগী। বিশ্বজননী বিশ্বপালিনী বিশ্বমোহিনী মহামায়া তাঁহারই কোলে বসিয়া, তাঁহাকেই আশ্রয় ও অধিষ্ঠান করিয়া, চিরকাল বিশ্বলীলা করিতেছেন, অথচ তিনি নিত্য নির্বিকার, আত্মসমাহিত, স্বীয় স্বরূপানন্দে বিভোর। তিনি সর্বকর্তা হইয়াও অকর্তা, সর্বভোক্তা হইয়াও অভোক্তা, সর্বগুণাধার হইয়াও নিগুণ, সর্ব-নিয়ন্তা হইয়াও উদাসীন, আবার উদাসীন হইয়াও প্রেম ও করুণায় ভরপুর। মহর্ষি পতঞ্জলি তাহার 'যোগসূত্রে' এই মহাযোগীশ্বর শিবের প্রণিধান দ্বারাই আসন্নতম সমাধিলাভ হয় বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন এবং তাঁহার স্বরূপ নির্দেশ এইরূপ করিয়াছেন,—তিনি “ক্লেশ কর্ম-বিপাকশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষঃ”, “স পূর্বৈবামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ”। “তস্মিন্ নিরতিশয়ং সার্বজ্ঞ্যবীন্দম্”। “তস্ত বাচকঃ প্রণবঃ”। ক্লেশ কর্ম-বিপাক ও আশয় তাঁহাকে কখন স্পর্শ করে না। অবিজ্ঞা, অশ্রিতা, রাগ, দ্বেষ ও অতিনিবেশ,—এই পাঁচটি ক্লেশ নাগে আখ্যাতি। এই পাঁচটি ক্লেশ হইতে আত্যাত্মক বিমুক্তি সব যোগীর, সব সাধকের,—সব মানুষেরই জীবনাদর্শ; শিব এই পাঁচটি ক্লেশ—অর্থাৎ পাঁচটি বন্ধন ও হৃৎকের হেতু হইতে নিত্যযুক্ত। এই পাঁচটি ক্লেশ হইতেই কর্মবন্ধন ও কর্মফল বন্ধনের উদ্ভব, ধর্মার্থ, স্বার্থ, জন্মমৃত্যুর অধীনতা প্রভৃতি সর্ববিধ বন্ধনের উৎপত্তি। পাঁচটি ক্লেশ হইতে মুক্ত হইতেই কর্ম, কর্মফল, কর্মসংস্কার প্রভৃতি সব বন্ধন হইতে মুক্তি। যোগীশ্বর শিষ্য এই মুক্তিপথে নিত্য প্রতিষ্ঠিত, এবং এই হেতু শিষ্যজলাভই সব সাধকের সাধনার লক্ষ্য। সব ক্লেশের মূল অবিজ্ঞা। সমাধিতে পূর্ণ প্রজ্ঞা লাভ হইলেই অবিজ্ঞার নিবৃত্তি, সব ক্লেশের নিবৃত্তি, সব বন্ধনের নিবৃত্তি। এই পূর্ণজ্ঞান শিবের স্বরূপগত। সুতরাং শিবই পরমারাধ্য।

যোগিরাজ গন্তীরনাথ মুমুক্শু শিষ্যদিগকে মহাযোগীশ্বর শিবের মস্ত্রেই দীক্ষিত করিতেন, শিবনামজপ ও শিব-স্বরূপের ধ্যানচিন্তন করিতে উপদেশ দিতেন, তত্ত্ববিচার-

পূর্বক সাধনপথে অগ্রসর হইতে শিক্ষা দিতেন। শিবমন্ত্র বস্তুতঃ ত্যাগবৈরাগ্যের ও ধ্যানসমাধি-প্রজ্ঞার মন্ত্র। শিবমন্ত্র কোন দেবতাবিশেষের মন্ত্র নয়, সব দেবতায় এক “শাস্তং শিবমঐদেবতম্” “প্রজ্ঞানমানসং ব্রহ্ম” দর্শনের মন্ত্র,— নিজের মধ্যে, সব দেবতা, সব মাহুষ, সব জীব ও সারা বিশ্বের মধ্যে এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ স্বরূপ দর্শনের মন্ত্র। মহাযোগীশ্বর শিবকে আশ্রয় করিয়া, শিবভাবে ভাবিত হইয়া, চিন্তকে শিবময় করিয়া, ভিতরে বাহিরে এক দেশ-কালাতীত সর্বাধিকভেদবর্জিত সচ্চিদানন্দ স্বরূপের উপলব্ধি এই সাধনার লক্ষ্য। কিন্তু যোগিরাজ সাধারণতঃ গৃহী শিষ্যদিগকে গৃহত্যাগী সম্যাসী হইতে, কর্ম্ম শিষ্যদিগকে কর্ম্মত্যাগী যোগী হইতে অহুমতি দিতেন না। পরিবাব ও সমাজের মধ্যে থাকিয়া, সনাতন ধর্মবিধি অনুযায়ী পারিবারিক ও সামাজিক কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠার সহিত সেবাবুদ্ধিতে সম্পাদন করিয়া, ইহারই মধ্যে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের অনুশীলন করিতে হইবে, অবসরমত ছপ ধ্যান বিচারের অভ্যাস করিতে হইবে, ব্যবহারিক জীবনে সংসারী হইয়াও অন্তরে সম্যাসী হওয়ার চেষ্টা করিতে হইবে,—ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। তত্ত্ববিচারের সাহচর্য অহংকার ও মমতা এবং আসক্তি ও বিদ্বেষ যথাসম্ভব বর্জন করিয়া, সংকল্প শক্তিপ্রভাবে কামাদি রিপুসমূহকে সংযত করিয়া, এই সংসারকে (আমার সংসার বোধ না করিয়া) শিবের সংসার বলিয়া ধারণা করিতে অভ্যাস করিতে হইবে এবং শিবের সংসারে শিবসেবক হইয়া শিবসেবাবুদ্ধিতে সব জায়সম্মত কর্তব্য

সম্পাদন করিতে হইবে, শিবজ্ঞানে আত্মীয়স্বজন সহ সব জীবের যথাশক্তি সেবা করিতে হইবে, এইরূপে সেবার ভিতর দিয়া কর্ম্মের মধ্যেও ত্যাগের অনুশীলন হইবে, সাংসারিক জীবনেও সম্যাসের অনুশীলন হইবে, কর্ম্ম ও ভোগের সঙ্গে সঙ্গেই সর্বোদয় শিবজ্ঞানের নিয়ত স্রবণ চলিতে থাকিবে। সব সাংসারিক কর্ম্মও ভগবদ্ভক্তির সহিত এবং প্রেম ও পবিত্রতার সহিত অনুষ্ঠিত হইবে, স্বাভাবিক জীবন যোগজীবনে উন্নীত হইবে।

যোগিরাজ গঙ্গীরনাথ নিজ সিদ্ধ জীবনে গোরক্ষনাথ মন্দিরে কর্ম্মকোলাহলের মধ্যে সমুজ্জলভাবে এইরূপ শিবত্বসাধনার ও যোগ জীবনের আদর্শ দেখাইয়া শিষ্যদিগকে এই পথে পরিচালিত হইতে ইঙ্গিত করিতেন। তিনি মৌলিক উপদেশ খুবই কম দিতেন। তাঁহার জীবনযুক্ত অবস্থায় আশ্রমিক জীবনটাই ছিল সব বিচারশীল মুমুক্শু সাধকের নিকট এক জীবন্ত উপদেশমালা। তিনি সব শিষ্যকে সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা হইতে, ভক্তি সাধনার বাহ্যিক আতিশয্য হইতে, সর্ববিধ সংকীর্ণ মতবাদের গোঁড়ামি হইতে, সর্বপ্রকার সংকীর্ণ আচারের বন্ধন হইতে, মুক্ত থাকিয়া প্রশান্ত ও উদার চিন্তে তত্ত্বজ্ঞানের পথে ও পরামুক্তির পথে নিয়ত অগ্রসর হইতে শিক্ষা দিতেন। অতিরিক্ত ভাবের উচ্ছ্বাস, ধর্মের উন্মাদনা, ভক্তিপ্রেমের বিকৃত প্রকাশ হইতেও তিনি শিষ্যগণকে আত্মরক্ষা করিতে উপদেশ দিতেন। বিচার-সম্মত সহজ জীবনে অত্যন্ত আধ্যাত্মিক আদর্শকে রূপায়িত করাই তত্ত্বপদার্থ যোগসাধনার লক্ষ্য ছিল।

ফোন :
৪৪-৪০৮২, ৮২



স্বাস্থ্য
রাইসকিংডম

পশুপতি দায় এণ্ড সন্স
প্রাইভেট লিঃ

ত্রিভুবের সর্ববিধ চাউলের প্রথম জাতীয় প্রতিষ্ঠান

৪৩/২ ও ৩৭এ, সুব্রহ্মনাথ ব্যানার্জী রোড, কলিকাতা-১৪।

বাড়ীতে চাউল পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা আছে।

পত্রে পথ-নির্দেশ

[গীতাভারতী মিশনের প্রতিষ্ঠাতৃ সভাপতি ও গুরু শ্রীমৎ মহর্ষি প্রেমানন্দ মহারাজের পত্রখানি এখানে প্রকাশিত হইল। এই আলোচনা পত্রখানি নানা দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য। পূর্ববঙ্গের সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়, বর্তমান বিশ্বসমস্তার মৌলিক সমাধান প্রভৃতি সম্পর্কে লিখিত প্রবর্তক-সম্পাদক শ্রীরাধারমণ চৌধুরীর পত্রের সবিশদ উত্তর ইহা। এই পত্রে সিদ্ধ রাজ্যযোগী মহর্ষিজীর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত সাধনার ধারার অনেকখানি স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলিবে। ব্যক্তিগত হইলেও, জিজ্ঞাসু পাঠকপাঠিকা মাঝেই পত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়-বস্তুর মধ্যে আলো ও সাধনার একটি বিজ্ঞানসম্মত সহজ পথের সন্ধান পাইবেন বলিয়াই প্রত্যয় করি। প্র: স:]

নারায়ণেশু—

আপনার পত্র পেয়েছি যথা সময়েই। সাম্প্রতিক ঋণিকড়ের পর থেকে এত চিঠি নানা দিক থেকে আসছে যে সবগুলির উত্তর দেবারও সময় করে উঠতে পারছি না। এবারকার ঋণের তাগুতায় ধ্বংস হয়েছে বেশী চট্টগ্রাম ও তার উপকূলবর্তী অঞ্চল এবং সন্দীপ। হাতিয়ার হাজার হাজার লোক গৃহহারা হলেও, ব্যাপক প্রাণহানী এবং জলোচ্ছাস হয় নি। বিক্ষুব্ধ প্রকৃতির এই প্রতিশোধ স্পৃহা কবে যে প্রশান্ত হবে তা' একমাত্র ভগবানই জানেন। আমাদের চিন্তা-ভরজের প্রভাব প্রকৃতিকে কি ভাবে প্রভাবান্বিত করে' দৈনন্দিন জীবন-চর্যায় রূপ নেয়—সে বিষয়ে আমি ইতিপূর্বে প্রবর্তক পত্রিকায় লিখেছি। বর্তমান বেদনার্ত বিশ্বের সকল দুঃখের মূলেই রয়েছে আমাদের ক্রুদ্ধ চিন্তাধারারই অভিপ্রকাশ। বাইবেলে আছে—“But he that doeth wrong shall receive for the wrong which he hath done; and there is no respect of persons.”

বিশ্ব-চিন্তা আজ জৈবী স্বার্থ বুদ্ধিতে আচ্ছন্ন। তাই আঙ্গিক সংহতিও বিনষ্ট। পরমের লীলায়নে সৃষ্টির প্রত্যেকটি অঙ্গই যে এক একটি individual unit এবং প্রত্যেকেরই স্থিতির যে অনিবার্য প্রয়োজনীয়তা আছে সে কথা আজ যেন বিশ্ব-মন বিস্মৃত হয়েছে। পরস্পর “স্বত্রে মণিগণা ইব” যে এক মহাকর্ষণের ফলে প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাথে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে সে বিষয়টিও যেন অমূল্যতার জগৎ থেকে তিরোহিত। তাই প্রত্যেকে স্বীয় প্রবৃত্তির লালসা পূরণের ব্যস্ততায় অপরকেও করছে বিব্রত। সৃষ্টির সব কিছুই যে একই উৎসমূল

থেকে উদ্গত, আঙ্গিক জ্যোতিঃ সত্তায সবাই যে এক ও অভিন্ন, এই চেতনা আজ গণ-স্মৃতি থেকে একেবারেই বিলুপ্ত। সে কারণেই আজ হিংসায় উদ্ভূত পৃথি।

গন-মানস থেকে অধ্যাত্ম চেতনার অবলুপ্তিই এই অধঃপতনের মূল কারণ। ধর্মের নামে গণমাণসে যা' দেখতে পাওয়া যায় তা' হচ্ছে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা। সাধনার নামে চলেছে সাম্প্রদায়িক গোডামী—যা হচ্ছে বলিষ্ঠ আধ্যাত্মিকতার পরিপন্থী। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এই পৃথিবীতে আজকে যারা নিজেদের সুসভ্য বলে পরিচয় দিতে ব্যস্ত তারা সবাই কিন্তু নিজেদের আর্ধ্যবংশোদ্ভূত বলেই পরিচয় দেয়। এই পরিচিতির মূলে জীবনের আচরণীয় কর্ম প্রবাহের কোন সঙ্গতিই খুঁজে পাওয়া যায় না। আর্ধ্য শব্দের অর্থই “জ্ঞানশীল”। এই আর্ধ্যদের আচরণ দেখলে মনে পড়ে সেই ফলটির কথা যার সকল দেহ দানায় ভর্তি অথচ নাম তার “বেদানা”। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসীরা স্বীয় স্বীয় ধর্ম বিশ্বাসের নামে সমাজে নিজেদের যে পরিচয় দেন, তার সাথে এবং ব্যক্তিগত আচরণের সাথে যদি সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য থাকত তা'হলে জগৎ বহুপূর্বেই হিংসার কলুষমুক্ত হ'ত। হিন্দু—দূরপ্রত্যয় করেই হিন্দুশব্দ। হিন্দু—দূর=হিংদূর=হিন্দুর=হিন্দু। হিন্দু শব্দের ষথার্থ অর্থ হচ্ছে হিংসা যার জীবনে দুস্কর, অর্থাৎ অহিংস। খৃষ্টান শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রেমিক লোক (Loving man), বৌদ্ধ শব্দের অর্থ হচ্ছে জ্ঞানী (Wise)। পরিচিতির তাৎপর্যগুলি সর্কতোভাবে অমুখাবনীয়। এইটি যদি সবার অমুখাবনে থাকত তা'হলে দু'টি অহিংস-জাতির মধ্যে দ্বিতীয় মহাসমরের ভাষ এমন একটি সহিংস সংগ্রাম ঘটত না। হিন্দুরাও আজ এক জাতে হুজি

জাত হ'ত না। বাদের দর্শন সমগ্র বিশ্বকে বলেছে অন্ততের পুত্র, তাদের কাছে বিশ্বাসী কথাটা দর্শনবিরোধী। সমগ্র বিশ্বটাই তাদের চোখে একান্ত আপন্যার।

সার্বিক অধ্যাত্ম পথচারী সাধ্যবস্তু বিষয়ে সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত নয় বলেই হয়ত আজ সমাজ-জীবনে দেখা দিয়েছে প্রজ্ঞার ন্যূনতা।

সাধনায় সাধ্যবস্তু নির্ণয়ের সাধে চাই অধ্যাত্ম সাধনার থাকের (Stage) জ্ঞানও। পরমকে চরমভাবে জানতে প্রতিটি সাধকের সাধনা অভিগমিত হয় চারিটি পর্যায়—বৈখরী, মধ্যমা, পশুস্তি ও পরা। অবশ্য যে সাধক সঙ্গুতর কৃপায় প্রথমেই মধ্যমা থাক থেকে তার অধ্যাত্ম সাধনা শুরু করতে পারে—এগিষে যেতে পারে প্রকৃষ্ট রাজর্যোগিক ধারায়—তা'র কিন্তু বৈখরীর কোন প্রয়োজন হয় না। বৈখরী হচ্ছে অক্ষর থাকের সাধনা। সেখানে আছে স্তোত্র, মন্ত্র, অহুষ্ঠান, বহরকমের বৈধী আচার। সেটা জপমূলক বিধিমাৰ্গ। এই মার্গে সাধনা চলে কৃতির ধারায়। কিন্তু মধ্যমার গেলেই সাধনা চলে কৃতির ধারায়। এখানে সকল কৃতির ভাবই হয়ে আসে বক্ষ্যা। যেখানে অক্ষর সেখানেই আচার, অহুষ্ঠান, বিধি। অক্ষর ঝরে গেলে সকল বৈধী অহুষ্ঠানও ঝরে যায়। উপনিষদ তথা তাঁর সংহত রূপ শ্রীগীতা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে সেই মধ্যমা থাকের সাধনা। সেখানে নাদানুসন্ধান কর্মে অহংগ্রহ উপাসনার ধারায় জানতে হয় পরমের চরম তত্ত্বকে। তাইত সেখানে দেখতে পাওয়া যায়না কোন স্তোত্র, মন্ত্র বা বৈধী কর্মের কোন আনুষ্ঠানিক পৰ্ব। অনাহত নাদানুসরণে 'আত্মানং বিদ্ধি' স্বত্রে ধরেই চলে সাধকের সাধনা। এ ভাবে মধ্যমার থাক বেয়ে সাধক 'পশুস্তি' হয়ে চলে যায় 'পরাত্তে', তুরীয় সত্তাতে। তখনই প্রতিভাত হয় সাধ্যবস্তু মহাসত্য।

শ্রীগীতার ২য় অধ্যায়ের ৫০ শ্লোকে "যোগঃ কৰ্ম্মসু কৌশলম্" কথার পরেই—৫২ ও ৫৩ শ্লোকে ইঙ্গিতে বলা হয়েছে নাদ সাধনারই কথা—

যদা তে মোহ কলিলং বুদ্ধিৰ্য্যতিতরিত্যতি।

তদা গম্যসি নির্কেদং শ্রোতব্যন্ত শ্রুতন্ত চ ॥

শ্রুতি বিপ্রতিপন্ন তে যদাস্থান্ততি নিশ্চলা।

সমাধবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাস্পাসি ॥

যখনই তোমার বুদ্ধি মোহের নিবিড়তা অতিক্রম করিবে তখনই তুমি শ্রুতব্য ও শ্রুত বিষয়ে (অর্থাৎ অনাহত নাদ শ্রবণ বিষয়ে) অহুষ্ঠান রহিত (নির্কেদং) হইবে। যখনই তোমার বিক্ষিপ্ত কর্ণকুহর (শ্রুতিবিপ্রতিপন্ন) নিশ্চল হইবে (অর্থাৎ অনাহত নাদ শ্রবণের ফলে বহির্বিষয়াদি শ্রবণ করিবে না) তখনই তোমার বুদ্ধি সমাধিতে নিশ্চল হইবে এবং তুমি যোগযুক্তি লাভ করিবে।

এই অনাহত নাদ বিষয়ে আচার্য্য শ্রীশঙ্কর তাঁহার যোগতারাবলী গ্রন্থে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। শিবসংহিতাও বলেছেন—"ন নাদসদৃশো লয়"। অহংগ্রহ উপাসনার কথা বলতে যেয়ে শ্রীগীতার ৩য় অধ্যায়ের ১৭শ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

যদ্বাস্তরতিরেব স্তাদানুতত্ত্বশ্চ মানবঃ।

আত্মন্তেব চ সন্ততন্ত্বশ্চ কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥

আত্মাতেই যা'র রতি, আত্মাতেই যা'র তৃপ্তি এবং আত্মাতেই যা'র সন্তোষ, তা'র কর্ম্মানুষ্ঠানের (বৈধী কর্ম্মানুষ্ঠানের) প্রয়োজন নাই।

ব্রহ্মকে অহং (জীবাত্মরূপে) এবং অহংকে (জীবাত্মা-কে) ব্রহ্মরূপে উপাসনা করার নামই অহংগ্রহ উপাসনা।

আত্মাকে ধরে ঈশ্বর তত্ত্ব জেনেই সাধক পরিচিত হয় পরমেশ্বর তত্ত্বের। এই ঈশ্বর তত্ত্ব বিশ্বরূপেই আত্মিক সত্ত্বায় পরিব্যাপ্ত। ঋগ্বেদের ভাষায়—"ন তস্য প্রতিমা অস্তি যন্ত নাম মহদযশঃ।" পরম ত নয়ই—ঈশ্বর তত্ত্বও বিধিমাৰ্গে অহুতব্য নয়।

শ্রীল করিবাজ গোস্বামীর শ্রীমুখেও শুদ্ধি একই কথা তাঁর চৈতন্ত-চরিতামৃত গ্রন্থে—"বিধিমাৰ্গে না পাইবে ব্রজের কৃষ্ণচন্দ্র।" ব্রজ অর্থে চলার পথ। বিশ্বাতীত সত্ত্বা হতে বাহির হয়ে বিশ্বোত্তীর্ণ ও বিশ্বাঙ্গ সত্ত্বা হয়ে আবার বিশ্বাতীতে ফিরে যেতে যে পথ পরিক্রমা উহাই ব্রজধাম। ব্রজেই হয় বংশীধ্বনি। অর্থাৎ সৃষ্টিমূলে পরমের ইচ্ছার সংঘাতে জাত মহাওম্কারের অন্তরঙ্গন এই ব্রজধানেই প্রবাহমান। তাইত সাধক নাদসাধন প্রণালীতে সহজ ধারায় আত্ম পরিচিতি লাভ করে, লাভ

করে বিশ্ব পরিচিতি, তারপরে পাষ পরমের পূর্ণ পরিচিতি। লাভ করে বিশ্ব আকর্ষণী সত্ত্বা কৃষ্ণের জ্ঞান, কৃষ্ণের অমৃত্যু।

এটাই হচ্ছে রাজ্যযোগিক ধারায় মধ্যমা থাকের সাধনা। শ্রীগীতার ভাষায়—‘প্রত্যক্ষাবগমং ধর্মং স্মৃৎস্বং কৰ্ত্তুমব্যয়ম্’ ৥৯২

অধ্যাত্ম জ্ঞানকে তার বিজ্ঞানটি সহ জ্ঞানতে পারলেই হয় জ্ঞানার পরিপূর্তি। এটিই হ’ল তত্ত্বতঃ জ্ঞান। তাইত শ্রীগীতা বলেছেন “জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং”... (৯১) নিম্নলিখিত পরম আত্মাবিকাশে হলেন উদ্ভেল। সেই উদ্ভেলতায় প্রথম হ’ল বিকাশের ভাবায়ণ (emotion)। ভাব পেল একটা গতিবেগ (motion)। ক্রমে সেই গতির ধারায় হ’ল সৃষ্টির রূপায়ণ (creation)। ভাবায়ণ থেকে অনন্ত বৈচিত্র্যময় রূপায়ণের তথ্য অমুসন্ধান করতে অধ্যাত্ম বিজ্ঞান সন্ধান পেয়েছে এক মহাজাগতিক ধ্বনির তত্ত্ব—যার ক্রমকম্পন নিরন্তরধের (frequency of vibration) ফলেই বিকশিত হয়েছে স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। সেই অনাদি মহাজাগতিক ধ্বনিই ক্রম রূপান্তরের মধ্য দিয়ে পরিণামে রূপায়িত হয়েছে বিশ্বরূপে। ধ্বনি ও তন্নিহিত বিদ্যুৎসঙ্গারই যে হয় ক্রমরূপায়ণ সে তথ্যকে আত্ম জড়বিজ্ঞানও দিয়েছে স্বীকৃতি। বস্তুতঃ দর্শন ও বিজ্ঞানের মাঝে নেই কোন দ্বন্দ্ব। একে অপরের পরিপূরক হয়ে রয়েছে।

সেই মহাজাগতিক ধ্বনি বস্তুতে রূপান্তরিত হয়েই নিঃশেষ হয়ে যায়নি। তা’র অধ্বরণ (resonance) চলছে অমুক্ষণ প্রতিটি অমুতে অমুতে! গতিবেগও রয়েছে অমুক্ষণ। এই অধ্বরণের ধারাই সৃষ্টিকে প্রবাহ-রূপে করে রেখেছে নিত্য আর সত্য। ভাবায়ণ থেকে রূপায়ণে গতিবেগজাত যে ধ্বনি তা’ হিন্দুর ওঁ (ওম্); ইসলামের কোন্ হ’, খৃষ্টানের ওণ্ (own), বৌদ্ধের ওম্ হ’।

যে যে-ভাষায়ই বলুক না কেন, ভাবের ঘরে এবং ধ্বনির মূল্যের তরফ থেকে সবাই এক। এটিই জগতের মূলধ্বনি (basic sound) যাকে ভিত্তি করে বিশ্বের সকল শব্দ হয় উদ্গাত। এটিরই আবার প্রত্যেক বস্তু বা

ব্যক্তিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অধ্বরণিত যে অভ্যপ্রকাশ তাকেই বলা হয় “অনাহত নাদ” (unsmitten sound)। এটি অর্ধমাত্রাকরা (half accented)। মহাজাগতিক নাদের অধ্বরণন শুদ্ধ হলেই প্রলয়। কারণ এই ধ্বনি তরঙ্গের মনের বিকাশ। মনেই ভাবের জন্ম। সেখানেই স্বপ্নের বীজাকুর। নাদ সাধনার ধারাতে সাধক যখন নিবদ্ধ—তখন সে এই মহাসত্যকে প্রত্যক্ষ অমুভব করতে পারে তা’র ধ্যান তন্ময়তার গভীরে।

মুরতরঙ্গ সাধনার ধারাকে স্বীকৃতি দিয়েছে বিশ্বের সকল অধ্যাত্ম মতবাদ। স্তোত্র, মন্ত্র, গানে সকল আত্ম জিজ্ঞাসাই ছুটে চলেছে আহত ধ্বনির মাধ্যমে সেই অনাহত ধ্বনির সন্ধানে—যেখানে সাধক পায় বিভেদহীন এক সমন্বিত ভূমিতে প্রতিষ্ঠা। জ্ঞাত হয় বিশ্বরূপের সত্য পরিচয়; বোঝে স্বরূপের সাথে বিশ্বরূপের নিত্য-লীলার নিবিড় সংযোগের রহস্য। সেইখানেই জীবনের ক্ষুদ্রগণ্ডী নিজেকে হারিয়ে ফেলে মহাপ্রাণের, মহা-প্রেমের বিশালতায়।

ধ্বনি-তরঙ্গের মাধ্যমেই যে করতে হয় আত্মস্বরূপের সন্ধান, এ বিজ্ঞানকে অস্বীকার করতে পারেনি উপনিষদ-পরবর্তী কোন অধ্যাত্ম মতবাদই। সকল অধ্যাত্ম মতবাদে আত্মজিজ্ঞাসার আচার্য্য সম্মিধানে দীক্ষা গ্রহণের ধারাতেই পাই এর পরিচয়। মানুষে মানুষে, ধর্মীয় মতবাদে বিভেদ যেটুকু তা’ অক্ষরে’ আর অমুঠানে। ভাঙেই ত ব্রহ্মাণ্ড। এই ভাঙের পরিচয়েই সাধক বুঝতে পারে নিখিলের একত্ব ও সমন্বিত সত্ত্বার। তখনই প্রেমাপ্লুত, অমুভূত মনে নিরন্তর প্রোচ্ছল হয়ে থাকে সবার অন্তরের শুদ্ধ, বুদ্ধ আলোর মাহুঘটি। তারি মহিমাঘটিত প্রকাশে অমুভূত হয় “কেউ ছোট, নয়, সবাই বড়, নিখিল ভুবন ব্রহ্মময়।” হিন্দুদর্শনের “আত্মানং বিজ্ঞি”, ইসলাম দর্শনের “মান আরাফা নাক্ছাহ” ও খৃষ্টান দর্শনের “know thyself” বাণীর মধ্য দিয়ে অহংগ্রহ উপাসনার কথাই ব্যক্ত হয়েছে।

হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান সবার মাঝেই মহাসত্যের অমুভূতি যেমন এক, তেমনি সেই মহাসত্যকে অমুভব করবার শুদ্ধ এবং সিদ্ধ পন্থাও এক। সে শুদ্ধ

পন্থায় সাধককে হতে হয় অন্তরঙ্গ অর্থাৎ গমন করতে হয় অন্তরে। অন্তরগমনের সেই কর্মটি সাধক অসম্পন্ন করে আস্তর বাধুধারার পথরেখা ধরে'। এটিই শ্রীশ্রীতে বর্ণিত “ব্রাহ্মী হংস”। একে আশ্রয় করতে পারলেই সাধক লাভ করে আত্মিক শক্তির প্রত্যক্ষ জ্ঞান—শ্রীগীতার “কেবল কুস্তকাবস্থা”। শ্রীগীতারই ঘোষণা “শারীরং কেবলং কর্ম কুর্কম্মাপ্নোতি কিঞ্চিৎ”।

আস্তর বাধু ধারায় অধ্যাস্ত পথ চলাকে বলা হয় “কাল্পে নামাজ” “অজ্ঞপা” “নিরন্তর উপাসনা” ইত্যাদি। যে যেই ভাষায়ই বলুক না কেন, শুদ্ধ ক্রিয়াটি কিন্তু একই। বিভেদ কেবল ভাষার অভিব্যক্তিতে। এ ক্রিয়ার সঠিক সন্ধান পেলেই তার জপকর্ম চলে যায় কৃতি থেকে শ্রুতিতে—বৈখরী থেকে মধ্যমায়। বৈখরী আচার অমুষ্ঠানগুলি নারকেল গাছের বালুতোর মত আপনাথেকেই ঝরে যায়। সাধক নিরন্তর অর্ধমাত্রাকরা মহাজাগতিক নাদের অন্তরঙ্গন শুনে শুনে দুর্দম চিন্তবৃত্তির করে নিরোধ। ক্রমে সন্ধান পায় প্রজ্ঞার আলোর। সেই পথরেখা ধরেই সাধকের হয় পরমের সাথে যোগ বা যুক্তি।

স্রষ্ট্রমূলে এক সমন্বিত অবস্থা থেকেই বিকশিত হয়েছে সবাই। রূপায়ণের বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্ন পরিবেশে বস্তু ধর্ম্যে দেখা দিল আপাতঃ দৃশ্যমান বিভিন্নতা। মূলতঃ সবাই, সব বিচিত্র এক ও অখণ্ড। ধ্বনি থেকে বিশ্বের বিকাশ বলে অধ্যাস্ত সাধনায় সবারই যেতে হয় ধ্বনির আশ্রয়ে স্রষ্টির উৎস মূলে। গানের সুর ধরেই পৌঁছতে হয় গায়কের কাছে। এখানেই লুকিয়ে আছে সর্বধর্ম্য সমন্বয়ের নিগূঢ় সত্য। বস্তুধর্ম্যে ইন্দ্রিয়জাত সকল দানব বৃত্তিকে দলিত করে মহামানবতার অভিক্ষুপণ ও মহাসত্যের অমুভূতির জন্মই অধ্যাস্ত সাধনা। যাকে ধারণ করে মাহুঘের মানবতার হয় বিকাশ তারি নাম ধর্ম্য। যথাযথ ধর্ম্মাচরণই অধ্যাস্ত সাধনা। তাইত দেখতে পাই—সত্য, প্রেম, পবিত্রতা সর্বধর্ম্মের সার কথা।

সকল ধর্ম্মমতবাদের লোকই স্ব-স্ব ধর্ম্মমতকে বলছে সনাতন ও শাস্ত। বাস্তব পক্ষে সকল অধ্যাস্ত

মতবাদই সনাতন ও শাস্ত। যা প্রকৃষ্টরূপে বিজ্ঞানভিত্তিক তাই সনাতন, শাস্ত। আধ্যাত্মিকতায় বিজ্ঞান না থাকলে তা' কখনও সার্বজনীন ও সার্বকালিক রূপ নিতে পারে না। বিজ্ঞান বলে H_2O তে জল হয়। জল প্রস্তুতির এই বৈজ্ঞানিক সূত্রটি সার্বজনীন, সার্বকালিক ও সর্বদেশীয়। অমুভূতির ন্যূনতার জন্মই সাধকের জীবনে, বিশেষ করে তার অবচেতন মনে ধর্ম্মাচরণের নামে একটা সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামী ক্রিয়মান থাকে বিজ্ঞানী মনের অভাবে। তত্ত্বতঃ অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতার বিজ্ঞানটি যারা জেনেছেন এমন হংসসাধক অত্যন্ত বিরল। এজন্যই শ্রীগীতা বলেছেন, ...কশিমাং বেত্তিতত্বতঃ—৭.৩

অধ্যাস্ত প্রচেষ্টায় অনাহত নাদ-সাধনপ্রলালী বা মধ্যমা থাকের সাধনার ধারাই বিজ্ঞানভিত্তিক। ধ্বনিরন্তরগত জ্যোতিঃ—বিজ্ঞানের এই সূত্রটি ধরেইত শুরু হয় এই সাধনার ধারা। এই ধারাটি অত্যন্ত প্রত্যক্ষ, পরিচ্ছন্ন ও পরিষ্কৃত। এখানে আরোপ বা কল্পনার কোন স্থান নেই। এই থাকে সাধনা অভিগমিত হলেই শ্রীগীতার “এবং সততযুক্তা যে ভক্তা...১২।১, অনন্তেনৈব যোগেন ... ১২।৬; নিয়তং সঙ্গরহিতং...১৮।২৩, নিয়তন্ত তু সন্ন্যাস ... ১৮।৭ ইত্যাদি বাণীগুলির স্বতঃস্ফূর্ত পরিচ্ছন্ন পরিষ্করণ ঘটে সাধকের জীবনে। তখনই সাধক সমর্থ হয় “চেতসা সর্ব কর্ম্মানি” (গীতা-১৮,৫৭) পরমকে সমর্পণ করতে।

অধ্যাস্ত সাধনায় বৈখরী হয়েই যে মধ্যমায় যেতে হবে এমন কোন প্রশ্ন নেই। ঋতত্ত্বজ্ঞ আচার্য্যের কৃপাবলে বৈখরীকে রাদ দিয়েও সোজা মধ্যমা থাক থেকেই সাধক শুরু করতে পারে তার অধ্যাস্ত অভিযাত্রা। ক্রমে আপনা হতেই পশ্চিম হয়ে পৌঁছতে পারে পরাতে—পরমের সম্মিধানে।

পত্রে নাদাহুসন্ধান বিষয়ে এত বিশদভাবে লেখার উদ্দেশ্য এই যে, আপনাদের মত মাহুঘ যদি এ বিষয়ে একটু প্রচার করেন তবে দেশের কল্যাণই হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, যদি ধর্ম্মসাধনা বিজ্ঞান-ভিত্তিক না হয় তা হলে বিশ্ব-মনের এই অশান্ত অবস্থা কোনদিনেই প্রশান্ত হবে না। ধর্ম্ম-ঈশ্বর ও ধর্ম্মীয় গোঁড়ামীর

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

শ্রীমদর্শন চক্রবর্তী

একটা বিশেষ যুগের বহিঃপ্রকাশকে বলি ফ্যাশান, কিন্তু সংস্কৃতিই হ'ল সভ্যতার অন্তরের স্রষ্টা প্রকাশ। সভ্যতার বিনাশ আছে, বিনাশ নেই সংস্কৃতির। কারণ সে গড়ে ওঠে সম্পূর্ণ পরার্থপরতা ও আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে তাই কোপিন, লুন্ডি, ধুতি, প্যাণ্টের মত মজ্জাগত সংস্কৃতি এত সহজে বিনাশ হয় না। আসলে প্রাণে তাপ সৃষ্টি না হ'লে জামা-কাপড় কাপিয়ে কি জীবন দেওয়া যায়? আসলে মেকি নাচ-গানের ভড়ং দিয়েই আজকের এই তথাকথিত সংস্কৃতি এত মুমূর্ষু হয়ে পড়েছে।

সাহিত্যকে বাদ দিয়ে সংস্কৃতি বাঁচে না, তাই সাহিত্যও জীবনে অপরিহার্য। সৃষ্টিকর্তার শুভ অমুগ্রহকে ঠেকিয়ে রেখে শুধু মর-জগতে কোনমতে টিকে থাকার বাউল যে সাহিত্যিক নয়, একথা কবিশুভ্রই ব'লে আমাদের সাবধান ক'রে দিয়েছেন। তাইত বন্ধিমবাবু বলেছেন, যা অপবিত্র, অদর্শনীয় তা আমরা দেখাব না, যা নিতান্ত না বললেই নয় তাই বলিব। বাস্তবের রূঢ় নিষ্পেষণ থেকে ভিতরের সত্যকে উদ্ধার করাতেই সাহিত্য। বৈষয়িক উন্নতির সঙ্গে মানসিক উন্নতির যথাযথ সমন্বয় সাধন না হ'লে সম্যক বিকাশ হয় না মনুষ্যের। তাই শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি, লেখক এরা

সবাই প্রভাবান্বিত করেন মানুষকে, তার মনকে, দেশকে, জাতকে, সমাজকে। বিশেষ এই বিদেশীয় আক্রমণে—জাতীয় সঙ্কটে সাহিত্যিক ও শিল্পী যদি বলিষ্ঠ হাত নিয়ে আগিয়ে না আসেন পুরোভাগে তাদের আন্তরিক দৃঢ়নিষ্ঠার তাগিদে, তবে সত্যিই সংস্কৃতির দুর্দিন! আজ সমগ্র বিশ্বের স্বাধীন দেশগুলোর দিকে তাকালে তাই সত্যিই নিরাশ হ'তে হয়, যখন দেখি প্রত্যেকটি স্বাধীন দেশেই আর্থিক সচ্ছলতার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য ও সংস্কৃতির ঘটেছে বিপর্যয়। এ দৈন্ত্যতা স্বাধীনতার পাবার আগে পর্যন্ত আমাদের ছিল না। তাইত মননশীল সাহিত্য আজ বিশ্ববিদ্যালয়কেই ছাপাতে হয়, কারণ হালকা সাহিত্যে দেশ যায়-যায় অবস্থা। সমগ্র ইউরোপ ও এশিয়ার মত ভারতবর্ষেও আজ তার প্রভাব যেভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে, তাতে অচিরেই যদি কাশ্মীরী হাতে হাল ধ'রে এর মোড় না ফেরানো হয়, তবে সম্মুখে বড়ই দুর্দিন।

আজ তাই সেই কাশ্মীরী সঙ্গে হৃদয়ের যোগসূত্র স্থাপনের প্রার্থনা ক'রে বলি—“ও বাঙমে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনো সে বাচি প্রতিষ্ঠিতম, আবিরাবীর্যএধি”। বাক্য মনে ও মন বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হ'ক, হে স্বপ্রকাশ চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্ম, তুমি আমার সমীপে প্রকটিত হও, ও শান্তি।



নিরসন না হলে কোন সমস্তারই সমাধান সম্ভব নয়। অধ্যাত্ম সাধনা যে কেবল তাবালুতা নয়—প্রকৃষ্টরূপে বিজ্ঞানভিত্তিক, এই চেতনারই সঞ্চার করতে হবে সমাজ জীবনে। গণ-জীবনে উপনিষদের ধারারই করতে হবে পুনরুজ্জীবন ও পুনরোদোধন। তবেই অতি সহজে স্রুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারবে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র—মানুষেরও অতি সহজে বোধগম্য হবে সহাবস্থানের নীতির মর্ম।

অধিক কি, ঘূর্ণিঝড়ের পরে আজ অবধি প্রকৃতি শাস্ত হয়নি। প্রায় বোজাই আবহাওয়ার সংবাদে ঝড়ের সঙ্কেত থাকে। এদিকে জনগণ ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়েছে দিন

কাটাচ্ছে। খবরের কাগজে প্রকাশ চট্টগ্রামের একস্থানে অগ্নিঝড় প্রবাহিত হয়ে কয়েকটা প্রামই জালিয়ে দিয়েছে। বীরেনবাবুর পত্রে জানলাম, এবারকার ঘূর্ণিঝড়ে চট্টল প্রবর্তক আশ্রমের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ ৫০,০০০ টাকার উপরে। গীতাতারতীর মিশন গৃহটি এবারকার ঝড়ের প্রকোপ থেকে কোন রকমে রক্ষা পেয়েছে। মিশন সন্তানেরা সবাই আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হলেও—প্রাণের দিক দিয়ে কারো কোন ক্ষতি হয় নি।

২৯/৬/৬৩ স্নেহাশীষ গ্রহণ করবেন। ইতি
গীতাতারতী মিশন : হাতীয়া আঃ প্রেমানন্দ



সম্মাদকার্য

স্বাধীনতা : সঙ্কল্প ও স্বদেশপ্রেম :

আমরা ভারতবাসী আজ ষোল বৎসর হইল স্বাধীন হইয়াছি। স্বাধীন হইয়াছি অর্থে বিদেশী ইংরাজ-শাসন-পাশ মুক্ত হইয়াছি। অম্লরূপভাবে পাকিস্তানও স্বাধীন হইয়াছে এবং পাকিস্তানীরাও ভারতবাসীর মতই স্বাধীনতা উৎসব বর্ষে বর্ষে পালন করিয়া থাকে। আমরা ইংরাজী তারিখের গণনায় ১৫ই আগষ্ট এই উৎসব করিয়া থাকি আর পাকিস্তানীরা দিল্লী হিসাবমত একদিন আগে এই উৎসব পালন করে, এইমাত্র যা প্রভেদ।

স্বাধীনতার ফলশ্রুতি হইয়াছে দ্বিখণ্ডিত ভারত। তিনদিকে—পূর্ব-পশ্চিম-দক্ষিণে সমুদ্র আর উত্তরে উন্মুক্ত হিমালয় এই অঞ্চল ভৌগোলিক ভূখণ্ড আজ দ্বিখণ্ডিত অর্থাৎ দুইটি জাতির উদ্ভব হইয়াছে। এই দ্বিখণ্ডিত ভূখণ্ডবাসীর সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন ধ্যান ধারণার প্রতীক রূপে দুইটি জাতীয় পতাকা একই গগনতলে শোভমান। একই ভারতজননীর প্রসাদকর্ণাভোজী হইয়া এবং একই সূর্যতল অঞ্চল ছায়ায় প্রাণ জুড়াইয়াও এই দুইটি জাতির ধ্যান-ধারণা ও স্বপ্ন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অবশ্য একটি ক্ষেত্রে উভয়েই মিল আছে। সেটি হইতেছে ষাওয়া পরার সচ্ছল সাচ্ছন্দ আর দৈহিক পার্থিব তোগসুখের মানবুদ্ধি। এই শেষজোড়টিই যেন রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার একমাত্র কাম্য এমনি একটি ভাব ও ভাবনার অভিব্যক্তিই আমাদের রাষ্ট্রীয় কর্ণধারেরা যখন তখন দিয়া থাকেন। এবারকার স্বাধীনতা উৎসবের যে বাণী দিল্লীর কেন্দ্র-মসনদ হইতে প্রাচ্যীয় রাজ্যের প্রান্তরে-প্রান্তরে বিঘোষিত হইল তার মর্ম বিল্লেখ্য করিলে ইহার অতিরিক্ত কিছুই মিলিবে না। উপরের এ বাণীর আবেদন সাময়িকভাবে জনতাকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে, কিন্তু জাতীয় সত্তার উদ্বোধন ইহা কখনই করিতে পারে না। আবেদনের গভীরে যে সচেতন থাকিলে স্বপ্নবিভোর তরুণ প্রাণ ফাঁসির মঞ্চকে ফুলের মালঞ্চ জ্ঞানে উজ্জাসে নিজের প্রাণোৎসর্গ করিতে পারে তার একান্ত অভাবই

পরিদৃষ্ট হয়। সত্য কথা এই যে, স্বাধীনতাস্তর বিগত ষোল বৎসরে জাতীয়তার মর্ম-ধারণা এ জাতির যতটুকু ছিল তাহাও স্তান হইয়া পড়িয়াছে। সেই স্বদেশী যুগের স্বদেশ প্রেম আজকের দিনে গবেষণার বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের আজকের রাষ্ট্রীয় কর্ণধারেরা যে ভারতজাতীয়তার স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত নহেন, এমন নহে। বর্তমানের পরিবর্তিত পরিপ্রেক্ষিতে ইহার প্রকাশ্য অভিব্যক্তি দিতে তাঁদের প্রাণ কাঁপিয়া উঠে, কণ্ঠ রোধ হয়, ইহা স্নানিশিত। ইহার ফল দাঁড়াইতেছে এই যে, আজকের দিনে উদীয়মান তরুণদের জীবনের মূল্যবোধের ভিত্তি বদলাইয়া আত্মসম্মতি হইয়া পড়িতেছে। সকলেই স্ব-স্ব স্বার্থসচেতন হইয়া সমাজ ও রাষ্ট্রে মহৎ আদর্শের অভাব ঘটাইয়া জাতীয় জীবন স্বার্থ-পঙ্কিল করিয়া তুলিতেছে। মানবতার দোহাই দিয়া এবং উদর আর উপস্থের ক্ষুধা মিটাইবার প্রলুব্ধ প্রলোভনে এ অনর্থ যে নিবারণিত হইবার নহে, কাল ইহার প্রমাণ করিবে।

*

বিগত ১৫ই আগষ্ট প্রাতঃকালে চন্দননগর প্রবর্তক সম্মেলন-প্রাঙ্গনে এক অনাউন্সের ক্ষুদ্র আয়োজনের মধ্যে প্রবর্তক-সম্মেলন স্বাধীনতা উৎসব পালন করে। চন্দননগর পৌরশাসকের অস্থপস্থিতিতে সজ্জের সহ-সভাপতি শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত শম্ভু ও বন্দেমাতরম্ ধ্বনির মধ্যে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। পতাকা উত্তোলনের পর যে প্রার্থনা পত্রটি তিনবার পাঠিত ও যে সঙ্কল্প গৃহীত হয় তাহা হুবহু নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

“জাতীয়স্বারাই চিরপুঞ্জরী ও সিদ্ধবিগ্রহ প্রবর্তক সজ্জের সর্বশ্রেণীর সভ্য সভ্যা, শিক্ষয়িত্রী, ছাত্র-ছাত্রী, সকল প্রবর্তক প্রতিষ্ঠানের নারীপুরুষ কর্মীবৃন্দ এবং শুভামুখ্যায়ী বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনদের প্রত্যেকে অঞ্চল হৃদয়ে সঙ্কল্প গ্রহণ করিতেছি—

“আমরা স্বাধীন ভারতজাতিকে তার অঞ্চল জাতি-সম্মেলন সুপ্রতিষ্ঠিত করিব—পবিত্র ভারতভূমিকে সর্বস্ব-পণে শত্রুমুক্ত করিয়া ও লোভ, স্বার্থ, দুর্নীতি, ভেদবুদ্ধি, বিপত্তিকর এবং অনর্থকামী দুই শক্তিসমূহকে সমাজ-মন হইতে সমূলে উৎপাটিত করিয়া, প্রেম ও ঐক্যবদ্ধ এক নবজাতিগঠন করিতে আমাদের প্রত্যেকের চিন্তা, প্রেরণা, সাধনা, সম্পদ ও কর্মকে নিযুক্ত করিব এবং অহর্নিশ

সাধ্যমত মৌন নীরবতায় শ্রীভগবান্ ও মাতৃশক্তির নিকট প্রার্থনা জানাইব—জয়ং দেহি, দ্বিষো জহি।”

এই সঙ্কল্পের মর্ম্ম স্বাধীন ভারত জাতিকে তার অখণ্ড জাতিসত্তার সুপ্রতিষ্ঠিত করা। তাহা হইলে ভৌগোলিক ভারতভূমির একটা অখণ্ড জাতিসত্তা আছে? প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক এই জাতিসত্তার স্বরূপ কি? এই প্রশ্নেরই উত্তর সেদিনকার সেই ক্ষুদ্র সভায় মুষ্টিমেয় উপস্থিত নর-নারী ও শতখানেক ছাত্র-ছাত্রীর সম্মুখে শ্রীদত্ত অনাবিল উদ্বুদ্ধ প্রাণাবেগের সঙ্গে অত্যন্ত পট্ট নির্ভীক ভাব ও ভাষায় বিস্তার করিয়াছিলেন। সেই বিশ্বজয়ী চিন্ময় ভারতবর্ষের এমন ধারণা চিন্তে জলোজ্জল না থাকিলে মানুষ আপন তুচ্ছতা ভুলিয়া কার প্রেমের বেদীমূলে জীবন উৎসর্গ করিবে—কোন বিশিষ্ট জাতীয় মিশনের পতাকাতলে সর্বস্বহারা হইয়া প্রেমৈক্যবদ্ধ হইবে? জানি না, এই ক্ষুদ্র সঙ্ঘ-পরিধির বাহিরে আর কোথাও এমন সঙ্কল্প কারও মনে জাগিয়াছে কি না? ইহাও জানি যে, আজকের চিন্তা ও ভাবনার অরাজকতার মধ্যে ভারত জাতীয়তার এই ধ্যান ও ধারণা আমল পাইবে না। কিন্তু ইহাও সত্য যে, সঙ্কল্পের বীৰ্য্য যদি সত্য হয়, ইহাই অনতিদূর আগামীকালে অমোঘ অব্যর্থ হইতে বাধ্য। ভাব-ভাবনার ঘনিমায় একদিন না একদিন এই সঙ্কল্প রূপ পরিগ্রহ করিবেই করিবে। ভারতাস্থার এই জাগরণ লক্ষ্যেই প্রবর্তক সঙ্ঘের নীরব সাধনা। বিগত শতবর্ষের স্বাধীনতার সঙ্কল্প ও সাধনা শ্রীঅরবিন্দে মূর্ত হইয়াছিল। পনেরই আগষ্ট শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিনে ভারতের স্বাধীনতা লাভের মাহোৎসব মুহূর্ত্ত আকস্মিক নহে—ইহা অলক্ষ্য বিধানের পাঠ গ্রহণের অন্তর্দৃষ্টি বাদের আছে তারাই অসুভব করিবে! সঙ্ঘের প্রার্থনা পত্রে প্রবর্তক সঙ্ঘকে যে জাতীয় আস্থারই চিরপূজারী ও সিদ্ধ বিগ্রহ বলা হইয়াছে তাহা হয়তো আজকের খিপ্রাস্ত চিন্তের নিকট অতিরঞ্জিতই ঠেকিবে, কিন্তু আগামী কালে ইতিহাস ইহার সত্যতার সাক্ষ্য দিবে—সে কালও খুব বেশী দূরে নহে। প্রবর্তক সঙ্ঘের প্রাণপুরুষ সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলালের পিতৃ-দেহকে আশ্রয় করিয়া এই ভারতাস্থারই জাগরণ লক্ষ্যে পড়ে। মোক্ষ মুক্তি নির্বাণ, দ্বিতীয় স্বতন্ত্র কোন

ভগবান কিছুই তাঁর কাম্য ছিল না। বস্তুতঃ ভারতাস্থার জাগরণ চাকল্যেই তিনি আত্মভোলা হইয়াছিলেন। তাঁর ধর্ম্মকর্ম্ম সাধনা দর্শন এই একই সাক্ষ্য রাখিয়া গিয়াছে। সঙ্ঘগুরুর নিবিড় অন্তরঙ্গ পরিচয়ের সৌভাগ্য শ্রীদত্ত লাভ করিয়াছিলেন। সেই জলন্ত অগ্নিপ্রাণের পরশ বহন করিয়াই সঙ্ঘের সহ-সভাপতি সেদিনকার সভায় ভারত-জাতীয়তার আশ্রয়ে ভারতাস্থার অনাগত জাগরণের ইতিময় স্বপ্নের কথাই ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

*

ভারতজাতীয়তাই ভাবতবাসীর সাধ্য, মৌল প্রতিপাদ্য ও প্রকাশের বিষয়। সঙ্কল্প, স্বাধীনতা ও স্বদেশপ্রেম সাধ্য-সাধনা সঙ্ঘবিশিষ্ট। যে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা এই জাতীয়তার পরিপোষক নয়, তা কখনও শ্রদ্ধেয় হইতে পারে না। বিগত পঞ্চাশ শতাব্দীর ইতিহাস সাক্ষ্য দিবে যে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাহীন হইয়াও ভারত-জাতীয়তার প্রবাহ অক্ষুন্ন আছে। পরাধীনতা এই জাতীয়তাকে ছিন্নভিন্ন করিয়াছে, কিন্তু নিশ্চিহ্ন করিতে পারে নাই। প্রাচ্য অর্দ্ধ সহস্র বৎসরের পাঠান-মোগলের অধীনতা, অমাহুযিক বর্বরতা ও লুণ্ঠন, নারীধর্ষণ, ধর্ম্ম-সমাজ দেব-বিগ্রহ ও মন্দির ধ্বংসকরণ ভারতজাতীয়তার মূল ছিন্ন করিয়া অবলোপ সাধন করিতে পারে নাই। স্বাধীনতা বা পরাধীনতা ভারতের আত্মপ্রকাশের, তাঁর আত্মস্থ বা স্ব-প্রতিষ্ঠ হইবার পথে আমুকুলা বা প্রাতিকূল্য করিয়াছে মাত্র। বস্তুতঃ এই বিশাল ভারত ভূখণ্ড কোন কালেই সামগ্রিকভাবে এক অখণ্ড রাষ্ট্রীয় শাসনাধীন হয় নাই। না হইলেও, বিচিত্র রাষ্ট্রীয় অনৈক্যের মধ্যেও নিখিল ভারতে এক জাতীয় চেতনার অপলাপ কখনও ঘটে নাই। ভারতে ব্রিটিশের অখণ্ড রাষ্ট্রীয় শাসন যে অখণ্ড জাতীয়তার উন্মেষ ও প্রতিষ্ঠার আশীর্বাদ বহন করিয়া আনিয়াছিল তাহা চরম অভিশাপে পরিণত হইল অসহযোগ আন্দোলনকালে স্বাধীনতা সংগ্রামের সহিত ‘খিলাফত’ আন্দোলনকে অঙ্গানী করিবার ফলে—যার পরিণতি ভারত খণ্ডন ও বিপরীত ধর্ম্মী দুইটি জাতির আবির্ভাব। সুপ্রাচীন ভারতের ইতিহাসে এমন দ্বৈজিতি ইতিপূর্বে আর কখনও সংঘটিত হয় নাই। সেই জেতা

যুগ হইতে 'জননী জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরীষণী' বলিয়া যে ভারতীর পূজা ভারতবাসী কবিষাছে সেই জননীর পবিত্র আঙ্গিনায় এই অনাচারে সাক্ষ্য পাঠিতে পারে তারাই যারা অস্ত্র মূঢ় মাতৃদ্রোহী ঘুরাচারী। সবচেয়ে আশ্চর্য্য এই যে আজকের যারা ভারত রাষ্ট্রের কর্ণধার তাঁরা গণতন্ত্রের খোলসে আত্মবিস্ময় লুকাইয়া জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সর্ব মানুষ্যের অধিকার ও আত্মবিকাশের ভাণের মধ্যে আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছেন। দৃষ্টি তাঁদের জড়, নগ্ন বাস্তবতার মধ্যে নিবদ্ধ। ভোগোপকরণ বুদ্ধির ফাঁকা বুলি দিয়া কখনও এই খণ্ডিত ভূখণ্ডবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করা যে সম্ভবপর নয় তা বোল বছরের স্বাধীনতাকালেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আসন্ন আগামীকালে ইহার উগ্র অনৈক্যের কুংসিং চেহারা বিভীষিকা সৃষ্টি যে করিবে ইহা সুনিশ্চিত। এই খণ্ডিত ভূভাগ আজ অসংখ্য খণ্ডনের সম্ভাবনার দ্বারে উপনীত। এই প্রতিকূল শ্রোত রূপে কে, ইহাই আজকের স্বাধীনতা উৎসব দিনে প্রশ্ন জাগে। কিন্তু আমরা তথাপি নিরাশ নহি। ভারত সত্তার সহিত যার এতটুকু পরিচয় আছে সেই প্রত্যয় করে যে, বালসাপেক্ষ হইলেও, অথও ভারত জাতীয়তার ঐক্যসিদ্ধি একদিন ঘটিবেই। এ সম্পর্কে স্বয়ং শ্রীমদ্রবিন্দ্রের ভবিষ্যদ্বাণী : "A free and United India will be there and the Mother will

gather around her sons and weld them into a single national strength in the life of a great and united people." শ্রীমদ্রবিন্দ্র-উল্লিখিত এই 'Mother'-এর স্বরূপটি ঠিক ঠিক অবধারণ করিতে না পারিলে ভাবতান্মাব ধারণা সুস্পষ্ট হইবার নহে। প্রবর্তক সঙ্ঘের স্বাধীনতা উৎসবে গৃহীত সঙ্কল্প পত্রে উল্লিখিত 'জাতীয় আত্মার' তাৎপর্য্য ইহারই মধ্যে নিহিত। বিশ্বাভীত অবাক চৈতন্যের ভারতীয় সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রকৃতি আশ্রয়ে ব্যক্ত হইবার নিগূঢ় মর্ম দেশবাসীর মনের মূলে ঠিক ঠিক অবধূত না হইলে প্রেমৈক্যসিদ্ধ জাতীয় সংহতির বেদী নিশ্চিত হইতে পারে না। সেক্ষেত্রে উপরিচর 'Emotional integration' এর প্রচেষ্টা শূন্যগর্ভ শ্লোগান হইয়াই হাওয়ায় উবিয়া যাইতে বাধ্য। মৃন্ময় ভারতবর্ষের এই চিন্ময় রূপটি উদীয়মান তরুণের ধ্যান ধারণায় না জাগরুক করিতে পারিলে সুসংহত জাতীয় ঐক্য আশা করা বাতুলতা মাত্র। জাতীয় জীবনের মহত্তর উজ্জীবনও সম্ভবপর নয়। স্বদেশ-প্রেমের নামে আত্মভোগের প্রতিযোগিতা জাতীয় চিন্তকে কলুষিত করিয়া তুলিতে বাধ্য যেমনটি আজকের দিনে আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। এই বৃহৎ সঙ্কল্প লক্ষ্যে দেশবাসীকে পরিচালিত করিতে না পারিলে স্বাধীনতার সার্থকতাই বা কোথায়?

আর মিষ্টের
স্বয়ং স্বাক্ষর
তিল তৈল



বিশুদ্ধ ও সুপরিষ্কৃত তিল তৈল হইতে প্রস্তুত
যাতনীয় শিরঃস্ফোপ অম্লিতীয়

রুচির রূপায়ণে কিনয়

- বিজ্ঞাপনের নম্বর
 - প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
 - ভাবচিত্রণ ও ব্যঙ্গচিত্র
 - হাতে আঁকা সাংকেতিক চার্ট
- ॥ বহুমুখী বিজ্ঞান ও কলেজের অন্তঃস্থ ॥
এক রঙ ও বহু রঙের
রাইফাজাতলা ট্রেন রোড,
ডাক : সোঁতরাগাঁহি, হাওড়া
কলিকাতার টিকানা :
C/o গীতাতারতী প্রেস
১১৭/১ বি, বি, গান্ধী ষ্ট্রিট, কলি-১২

সাময়িক

শ্রীশ্রীসম্ভবজ্ঞানীর আবির্ভাবোৎসব :

প্রবর্তক সম্ভবজ্ঞানীর পরমাধ্যমী সম্ভবজ্ঞানী শ্রীশ্রীরাধারানী দেবীর ৭০তম আবির্ভাবোৎসব গত ৬ই আষাঢ় শুক্রবার চন্দননগর বোড়াইচৌতলাস্থিত সম্ভব সন্নিহিত নিবিড় নিষ্ঠার সহিত পালিত হয়। আগের দিন সম্ভাব উৎসবের অধিবাসকৃত্য সম্পন্ন হয় সম্ভব-সম্মেলনে। সমবেত উপাসনাসম্মেলন সম্ভব কল্যাণ মাছু শ্রুতিমূলক গান করেন ও মাতের কথা পাঠ করেন। সম্ভবপ্রবোধের মধ্যে মাতৃস্বপ্ন আলোচনা চলল। ৬ই আষাঢ় প্রাতঃকালে ১০৮ মাতৃনাম জপ, সমবেত উপাসনা, ও সম্ভবগী পাঠ হয়। ষটে পটে পূজা ও ভোগারতর মধ্য দিয়ে চলল উৎসবের প্রবাহ মৌন নীরব নিষ্ঠায়। সম্ভাব উৎসব সভার পৌরোহিত্য করেন জেলা-জজ শ্রীঅনন্দেরঞ্জন শ্রীমান মহোদয়। চন্দননগর পৌরসভার এডমিনিষ্ট্রেটর শ্রীঅমরনাথ পালিত এক দীর্ঘ ভাষণে ভারতনারীর মহিমার কথা ব্যক্ত করেন। সম্ভবের চারুজ্যোতিঃ ও তরুণ সম্ভব শ্রীমধুসূদন দত্ত মাতৃবৈষ্ণবক নিবন্ধাদি পাঠ করেন। সম্ভবের সহ-সভাপতি শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত সম্ভবজ্ঞানীর অধ্যাক্ষ বিবর্তন কথা অগ্নিময় ভাব ও ভাষায় ব্যক্ত করেন।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় :

বাংলার খ্যাতিমান সাহিত্যিক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় গত ২৩শে জুলাই স্থল ল করনানি হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল মাত্র ৫৮ বৎসর।

১৩১২ সালের ২রা মাঘ জয়নগর-মজিলপুরের ফুটগোদা গ্রামে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের জন্ম হয়। বাল্যকাল কাটিয়াছে কলিকাতার বেলেঘাটা অঞ্চলে। কিশোর বয়স হইতেই তাঁহার সাহিত্যমুগ্ধতা দৃষ্ট হয়। বহুমুখী প্রতিভা লইয়া তিনি সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। বাংলা অমুবাদ-সাহিত্যের

তিনি অন্ততম পথিকৃৎ। শিশু সাহিত্য রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। আজীবন সাহিত্য রচনায় তিনি পাঁচ শতের অধিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কল্যাণপ্রেমিণী অন্ততম নব্ব্বক ছিলেন নৃপেন্দ্রনাথ। 'গল্প-ভারতী' মাসিক পত্রের তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। নাটক ও চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও তাঁহার একাধিক ভূমিকা ছিল। চিত্রনাট্য রচনা, সঙ্গীত রচনা, চিত্র পরিচালনা এমনকি অভিনেতাঙ্গণেও তিনি চলচ্চিত্রের দেবা করিয়াছেন। বাংলা দেশে বেতারের বর্তমান জনপ্রিয়তার পিছনেও নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের অশেষ দান রহিয়াছে। কলিকাতা বেতার-কেন্দ্রের উদ্বোধনকাল হইতেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন। জনপ্রিয় 'বিদ্যারীমুল' ও 'পরীমঙ্গল আশ্রম'ের তিনি প্রতিষ্ঠাতা। গল্প-দাহুর আশ্রম পরিচালনার ভারও দীর্ঘদিন তাঁহার উপর দৃঢ় ছিল। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের এই অকাল বিয়োগে বাংলা সাহিত্যে ও চলচ্চিত্রের অপূরণীয় ক্ষতি হইল।

সব চেয়ে বড় দুর্নীতিপরায়ণ :

সম্প্রতি নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে সভাপতি সর্বকারী প্রভুবা সমর্থন কবিত্তে বাইরা বেল্লীবা প্রভুবা শ্রীপাতিলা মাত্রভের মুখমন্ত্রী শ্রীকামরাজের জনসেবার প্রশংসা কবিত্তে কবিত্তে বলিয়া ফেলেন—মন্ত্রীদেব মধ্যে তিনিই "সংচেয়ে কম দুর্নীতিপরায়ণ।" কথাটি শোনা মাত্র গোটা স্তম্ভস্থল হাসিতে ফাটিয়া পড়ে। শ্রীপাতিলা কিন্তু হাসিতে যোগ দেন নাই। মনে হয় শ্রীপাতিলা কথার কোঁকে একটি মর্দঙ্গ সত্য প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন।

পরলোকে অগ্নিলাল বন্দোপাধ্যায় :

প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীদিলীপ বন্দোপাধ্যায় গত ১৫ই আগষ্ট ৭৮ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। শ্রীবন্দোপাধ্যায় ১৮৮৬ সালে ২৪ পরগণার মণিখালি কৃষ্ণনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'গণিত অধ্যাপক'র পদ লাভ করেন। তাঁহার গ্রন্থগুলির মধ্যে অরসিদ্ধা, অপবাজিতা, রাগিণী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

এ যুগে মণিলালের মত এমন সংযত স্বসংকতিষ্ঠিত লেখক খুবই বিরল। যাঁরাই এই বিনয়নন্দ্র মামুঘটর সম্পর্কে আদিগাছেন তাঁরাই তাঁর স্বভাব-প্রকৃতির মামুঘা ও শ্রদ্ধা সাধচর্চা মুগ্ধ হইয়াছেন। প্রবর্তক পত্রিকার সহিতও একদা তাঁর বন্ধিত সংযোগ ছিল। প্রবর্তক সম্ভবজ্ঞানীর প্রতিও তিনি অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিলেন।

শ্রীলক্ষ্মী মজুমদার

ডি. রতন ও কোং

ফটোগ্রাফার্স

২২৬ কংওয়ালিস ট্রিট, কলিকাতা

ফোন: ৩৪ - ৩৭১১

সম্পাদক : শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৩১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি এ. কর্তৃক পবিচালিত ও প্রকাশিত।

প্রবর্তক প্রিন্টিং এণ্ড হাকটোন লিমিটেড, ৫২/৩ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীকৃষ্ণকৃষ্ণর কর্তৃক মুদ্রিত।



৪৮ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা

সেবাস্তা

ভাদ্র, ১৩৭০

জীবনের আলো

জ্ঞান পরোক্ষ, বিজ্ঞান অপরোক্ষাত্মক। জ্ঞানে হব ইষ্ট নিরূপণ; বিজ্ঞানে ইষ্ট লাভ হয়। বিজ্ঞান জ্ঞানেরই পরিণত রূপ। অধিতীয় বস্তুতে তদাকারাকারিতা যে বুদ্ধি, তাহাকেই বিজ্ঞান বলে। জ্ঞান বিষয়কে সম্মুখে রাখিয়া দেখে, জানে। বিজ্ঞান তাহাতে এক হইয়া ভদ্রাকার প্রাপ্ত হয়। জ্ঞান বিষয় নির্ধারণ করে, বিজ্ঞান একাত্মতা সম্পাদন করিয়া, জ্ঞেয় বস্তুর সহিত একাত্ম হইয়া যায়। এই জ্ঞান এবং বিজ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া জ্ঞেয় বস্তুর সহিত একাত্মতা প্রাপ্ত হইতে দেয় না—যে দুস্পূর্ণীয় কাম, সেই কামের উৎপত্তি এবং পরিণতি সম্বন্ধে শ্রীভগবান স্বয়ং তাঁর বাণীতে বলিয়াছেন—“কোন বস্তুতে আসক্তির উদয়ের গোড়ায় থাকে বিষয় চিন্তা। ইহা সঙ্কল্পেরই নামান্তর। বিষয় চিন্তা হইতেই আসক্তির উৎপত্তি, আসক্তি কামের জন্মক্ষেত্র। কাম বাধা প্রাক্ত হইলে ক্রোধোদয় হয়; ক্রোধ হইতে বিবেক নাশ, পরে স্মৃতি লোপ, তারপর বুদ্ধিভংশ হয়, বুদ্ধি নাশ হইলেই সর্বনাশ হয়। ইহাই কামের পরিণতি। কিন্তু আমি বলি—এই বিষয়টিকে একটু উচ্চ দিক হইতে চিন্তা করিতে শেখ। চিন্তা অর্থে সঙ্কল্প; ভগবানকে বিষয় করিয়া তাঁহাতে আত্মসমর্পণের সঙ্কল্প জাগ্রৎ করিলে, সঙ্কল্প হইতে দুস্পূর্ণীয় কামের উদ্ভব হইবে—এই কামের সাহচর্য্যেই তাঁহাতে একান্ত আসক্তি জন্মিবে। ভগবানকে ভালবাসার পথে অন্তরায আছে, বাধা আছে; কাজেই ক্রোধ এই ক্ষেত্রে মহাবীর্য্যরূপে প্রকাশ পাইবে। জ্ঞান বিচার এই শ্রদ্ধা ও বীর্য্যের সম্মুখে মাথা নত করে; যে স্মৃতিপটে অহঙ্কারের আঁচড় পড়িয়াছে, তাহা মুছিয়া যায়। তারপর বুদ্ধি-অহংকারের ক্ষেত্র তাহারও লোপ হয় তাঁহাতেই। ইহাই লম্ব—ইহাই বাংলার সহজিয়া। কাম-বীজ ঘুরাইয়া ধরিলেই এই সহজ সাধন-পন্থা অনায়াসে সিদ্ধ হয়। রূপান্তরের ভিতর দিয়াই আমরা এই পরম সাধন-বিজ্ঞান লাভ করি। মনের সঙ্কল্পশক্তি, বুদ্ধির অধ্যবসায়, ইন্দ্রিয়গণের ভোগ প্রবৃত্তি—এ সকল কামের সম্পদ নহে, ভগবানের। ভগবানই জীবনের প্রভু হইলে, আমরা জীবন্ত হইতে পারিব। তাহা না হওয়ার কারণ, মধ্যে কাম বলিয়া এক বিপর্য্যয় বৃত্তি দেহ, মন বুদ্ধিতে উপচিহ্ন হইয়া ভগবানকে আড়াল করিয়াছে—এই ভেদ দূর করিয়া কামকে করিতে হইবে ভগবদ্বিভূতি। হে বাংলার তরুণ যদি জীবনকে দিব্য ও ভাগবতময় করিতে চাও—তবে এই সাধনায় ত্রুটি হও। জীবন আলোকিত হইবে ॥ [সংকলিত]

সম্পাদক শ্রীমতিনাল

ঋগ্বেদ

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ (প্রথমঃ অষ্টকং । সপ্তত্রিংশং সূক্তং ।) প্রথমো ঋক্

(সম্বৎসর শ্রীমতিলালের জীবন-ভাষ্য অনুসরণে)

শ্রীঅনিলবরণ তর্কবেদান্ততীর্থ

ক্রীলং বঃ শর্দ্ধো মারুতমনব্বাণং রথে শুভং

কথা অভি প্র গায়ত ॥ ১ ॥

অর্থ—“কথাঃ” (হে কথবংশীয়গণ অথবা মেধাবী ঋত্বিকগণ) “বঃ” (তোমাদের জন্ত) “রথে শুভং” (রথে শোভমান) “মারুতং” (মরুৎসমূহ) “শর্দ্ধং” (বলের প্রতি) “অভি” (লক্ষ্য করিয়া) “প্র গায়ত” (প্রকৃষ্টরূপে স্তুত) [কীদৃশং বলং ?—কিরূপ বল ?] “ক্রীলং” (সর্বদা বিহরণশীল), “অনব্বাণং চ” (এবং শত্রু সংশ্রব রহিত) ॥ ১ ॥

সরলার্থ—হে কথ বংশীয়গণ অথবা মেধাবী ঋত্বিকগণ! অতঃপর তোমাদের জন্ত রথে শোভমান মরুৎসমূহের সর্বদা বিহরণশীল শত্রু-সংশ্রব রহিত যে বল বা শক্তি, সেই বলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই স্তুতিমন্ত্র রচিত হইতেছে ॥ ১ ॥

বিগদর্থ—ষট্‌ত্রিংশং সূক্তের উদ্যাতা ছিলেন ঘোর পুত্র কথ ঋষি। তিনি ঐ সূক্তের বিংশতিটি ঋকেই অগ্নিদেবতার স্তুতি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছেন। এক প্রকার আশ্রয়ে সূক্তরূপেই যেন উহা রচিত। এই সপ্ত ত্রিংশং এবং ইহার পরবর্তী অষ্টাত্রিংশং সূক্তে ঘোর পুত্র কথ ঋষিই আবার অগ্নির পরেই মরুৎগণের উদ্দেশে স্তুতিমন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন। এই সূক্ত দুটিকে এক কথায় বায়বীয় সূক্তও বলা চলে। অগ্নির পরেই মরুতের স্তুতি—আশ্রয় সূক্তের পরই বায়বীয় সূক্তের সন্নিবেশ—বর্তমান বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক যুগেও যে ইহা কতবড় বিজ্ঞানসম্মত প্রতিভার পরিচায়ক তাহা না বলিলেও চলে।

ঋষি কথ বংশীয়গণকে অথবা আচার্য্য সায়নের মতে মেধাবী ঋত্বিকগণকে সন্মোদন করিয়া বলিতেছেন—‘রথে শোভমান মরুৎসমূহের সর্বদা বিহরণশীল, শত্রু-সংশ্রবরহিত যে বল বা শক্তি—সেই বলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই ঋক্সট্রি উদ্যাত হইতেছে।’ লক্ষ্য করিবার বিষয়...এই মন্ত্রটিতে ঋষি বলিতেছেন, “শর্দ্ধং অভি প্র-গায়ত”—নতু মারুতং। চতুর্দিকে মরুদ্দেবগণের যে বলের পরিচয় মিলে সেই বলেরই স্তুতিমন্ত্র উচ্চারিত হইতেছে—পরন্তু মরুৎ সমূহের নহে। আচার্য্য সায়ন তাই বলেন—যে বলের স্তুতিমন্ত্র চতুর্দিক হইতেই বিধোষিত হইতেছে—সে কেমন বল ? কীদৃশং বলং ? বেদ-মন্ত্র উত্তরে বলিতেছেন—“ক্রীলং অনব্বাণং চ”—সর্বদা বিহরণশীল এবং শত্রুসংশ্রব রহিত। এই ঋক্সট্রি বায়ু সম্বন্ধে ঋষির জ্ঞান যে কত গভীর তাহারই পরিচয় মিলে।

পৃথিবীতে বায়ুশূন্য স্থান কোথাও নাই। উহা অপ্রতিহতভাবে সর্বত্র বিচরণশীল—তথাপি উহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষতা নাই—আছে মাত্র স্বাচ্ প্রত্যক্ষতা। নৈয়াদিকদের মতে—“বায়ু স্পর্শাদি লিঙ্গকঃ।” তাঁরা বলেন—আদি পদে “স্পর্শ-শব্দধৃতিকৈস্পিরুণীয়াত”—শব্দ, ধৃতি, কম্প প্রভৃতিকে বুঝায়। “বিজ্ঞাতীয় স্পর্শেন, বিলক্ষণ শব্দেন, ভৃগাদীনাং ধৃত্যা, শাখাদীনাং কম্পনেন চ বায়োরণ্মানাং যথা চ বায়োর্ন প্রত্যক্ষং”—বায়ু যে প্রত্যক্ষ করা যায় না, তাহা যে স্পর্শ, শব্দ, ধৃতি, কম্প প্রভৃতির দ্বারা অনুমানসিদ্ধ, উদাহরণ দ্বারা তাহা বুঝাইয়া বলিতেছেন—বাতাস যখন বয়, তখন একটি শোঁ শোঁ শব্দ হয়, বৃক্ষের শাখা প্রশাখা ঝুলিতে থাকে, এমন কি মাঠের সবুজ ভূগুচ্ছটিও হেলিতে ঝলিতে থাকে—তখনই আমরা অনুমান করি বাতাস বহিতেছে বলিয়া। বায়ু কখনও

বাংলার মন্দির : ঝাড়গ্রাম

শ্রীপঞ্চানন রায়, কাব্যতীর্থ, জ্যোতির্বিদ্যোদ

ঝাড়গ্রাম মহকুমা প্রাচীন মহাকাব্যের অঙ্গভুক্ত। প্রধানতঃ শালের জল ইহার বিস্তৃত অঞ্চল জুড়িয়া রহিয়াছে। বিহার ও উড়িষ্যার সীমান্তে এই ভূখণ্ড। অতীতকালে ইহা বাঁকুড়া জেলার সহিত সংযুক্ত। এখানকার মন্দিরে বিহার, উড়িষ্যা ও বিষ্ণুপুরী রীতির প্রভাব দেখা যায়। এখানকার সহজলভ্য বামা পাথর অথবা ইষ্টকে মন্দিরগুলি নির্মিত। কোন কোনটিতে লিপি আছে। কার্যকার্য সবগুলিতে নাই।

ঝাড়গ্রাম সহরটি শালবনের মধ্যেই অবস্থিত। এখানকার সাবিত্রী দেবীর মন্দির ক্রম-দ্বন্দ্বশীর্ষক। উহা খ্রীষ্টীয় রীতিও বলা যায়। কলিকাতার রাজা রাজেন্দ্র-লাল মল্লিকের গৃহদেবতার মন্দিরও অল্পরূপ। ডোম রাজকন্ডা সাবিত্রী, পিতার রাজধানী পড়িহাটি বাস করিতেন। তাঁহার অলৌকিক কাহিনী এই অঞ্চলে সুবিদিত। ক্ষত্রিয় রাজকুমারের আকর্ষণকে অগ্রাহ্য করিয়া এই মহীয়সী মহিলা দেবীকে পরিণতি পাইয়াছেন।

জামবনী ধানার ১১২ নং মোজা গিধনীর আয়তন ৪২২'২৫ একর, ইং ১২৫১ সালের গৃহসংখ্যা ১৮২, জনতা ৮৬৭, শিক্ষিত ২২০। এখানে উচ্চ বিদ্যালয়, রেলওয়ে স্টেশন, ডাক ও তারঘর প্রভৃতি আছে। এখানকার ক্রমশঃ চুড়। উপরে দুইটি কলসের পরে তিনটি ত্রিশূল, বড়টা সোজা, ছোট দুইটি আড়া-আড়া স্থাপিত। মন্দিরের চারিদিকের অলিন্দে টালীর ছাদনী। দুইটি

দ্বার। পূর্বদ্বারের দুই পাশে ও ভিতরে মোট তিনটি লিপি। উত্তরে একটি দ্বার। পূর্ব দ্বারের সম্মুখে ছোট ধামের উপর ক্ষুদ্র মর্মর ব্যব। লিপি :—

ওঁ নমঃ শিবায়

পিতামহ কৈলাসেশ্বর সভক্তি আনিলা।

লিঙ্গরূপী মহাদেব পিতৃলা আবাসে ॥

পিতা মোর বগলাচরণ গৌরী সহ—

গৌরীনাথ স্থাপিলেন স্বগৃহে তাঁহার।

এ দীন তনয় পাইয়া প্রেরণা দেব!

তুষিত ভক্তের তরে বামলিঙ্গ রূপে

প্রকাশ করিলা তোমা গিধনী মন্দিরে।

এস ভক্ত করি পূজা ধ্য কর দাসে

ভুবনমোহনে

প্রতিষ্ঠা ৩২ আষাঢ় ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ ॥

(ডাহিনে)

ওঁ নমঃ ভুবনেশ্বরায়

ভারতের পূজনীয়া সতী সাধ্বী নারী

তাঁদের স্মরণ্য যেন আমি হ'তে পারি।

রক্তনে দ্রোপদী সমা অন্নপূর্ণা দানে

মেনকা যশোদা সমা সন্তান পালনে

লক্ষ্মী সমা গুণবতী সীতা সমা সতী

দময়ন্তী সমা যত্ন করি পতি প্রতি

গৌরী সমা গৌরবিনী পতিব্রতা মাঝে

সুপ্রসিদ্ধা অরুণভী গৃহিণীর কাছে

মৃদুমন্দভাবে প্রবাহিত হয়—কখনও আবার তীব্র বেগে অতিশয় জোরের সহিত বহিয়া চলে—তাহা না হইলে বিষদাকাশে জলদ মেঘের আবির্ভাব হইবে কেমন করিয়া? ঋষি এই ঋতুতে তাই স্নিগ্ধ কোমল মৃদুমন্দ মলয় পবনের স্তুতিমন্ত্র গাহিতেছেন না, তিনি স্তুতি করিতেছেন সেই “শর্দূঃ” যাহাই বায়ুর ওজঃ, সহো, বলং, চেষ্ঠা এবং গতিরূপে প্রকাশ পায়। ওজঃ অর্থে পরাক্রম সর্কনির্জয় শক্তি, সহঃ বহিরন্তর্যাপিকা শক্তি, বলং উৎপাটনাদি শক্তি, চেষ্ঠা নয়নাদি শক্তি এবং গতি অর্থে শীঘ্র গমনাদি শক্তি বুঝায়। এইরূপ শক্তিসম্পন্ন বায়ুই বিষদাকাশে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘকে একত্রিত করিয়া ধারা বর্ষণে পৃথিবীকে শস্যশালিনী করে। কিতাবে, পরবর্তী ঋতুতে ঋষি নিজেই তাহা ব্যক্ত করিবেন ॥

সবারে প্রসন্ন রাখি করি যেন ঘর
এই বরদান মোরে কর মহেশ্বর
পিতা মাতা আদি যেরা গুরুজন আছে
চাহিছি আশীশ ভিক্ষা তাঁ সবার কাছে
বসুন্ধর্যা সেবিকা বিজলীপ্রভা

৩২ আষাঢ় ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ

মন্দিরমন্ডোর লিপি :

নমঃ শিবায়

গিধনি নাথায়

ভুবনেশ্বরায়

বামলিঙ্গায়

নমঃ

৮কালীপূজার সময় সিধনীতে প্রায় একমাস ধরিয়
মেলা ও উৎসব, অভিনয়াদি হইয়া থাকে।

গিধনীর নিকটবর্তী জামবনী থানার ১৬৩ নং মোজা
চাঁদাবিলার আয়তন ১১২'৫১, গৃহ ২০, জনতা ৯৬,
শিক্ষিত ১৭; ইহার প্রান্তরে একটি শেওড়া গাছের তলায়
ঝামা পাথরের প্রাচীন ত্রিমূর্তি ও কয়েকটি আমলক
শীর্ষক প্রাচীন সমাধি স্তম্ভ বর্তমান। এই মহাকুমার বহু
স্থানে এইরূপ স্তম্ভ দেখা যায়। প্রাচীন যুগে মৃতের
অস্থিগুলি চিতাত্ম্য হইতে সঞ্চয় করিয়া একটি হাঁড়িতে
রাখা হইত। পরে ঐ হাঁড়িটি মাটিতে পুতিয়া তাহারই
উপর ঐরূপ স্তম্ভ দেওয়ার রীতি ছিল। চাঁদাবিলার
সংপথীগণ উৎকলশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। উহাদের চাঁদনী
দেবালয়ে কুলদেবতা মধুসূদন ও অন্যান্য দেবতা আছেন।
একটি সূক্ষ্মাঙ্গ গহ্বজুড় শিবালয়। অপরূপ অপর ছয়টি
মন্দিরে এখনও শিবপ্রতিষ্ঠা হয় নাই। মন্দিরগুলিও
সংপথীগণের বিরাট প্রাসাদ অযোধ্যাধারী আধুনিক।

জামবনী থানার ১৩১ নং মোজা বিদ্বিগড় সিধনী
ষ্টেশন হইতে বনপথে তিন মাইল দূরে। এখানে রাজ-
বাটা আছে। উহার প্রবেশ দ্বারের বামে বৃহৎ দেউল-
শ্রেণীর শিবালয়। উহার চারিদিকে অলিন্দ। রাজ-
কুলের গৃহদেবতা ৮কালীচাঁদের নবরত্ন মন্দিরটি বিশেষ
উচ্চ নহে। কারুকার্য নাই কিন্তু চূড়াগুলিতে ঝাঁজ
আছে। নিকটে পঞ্চরত্ন রাসমঞ্চ। কোনটিতেই লিপি

নাই। রাজবাটিতে কোন পরিখা নাই। দুইটি সৌধ
আধুনিক। গ্রামে ধবলদেব উপাধিক রাজবংশের
কাছারীবাটা। ডাকঘর ও উচ্চ বিদ্যালয় আছে।
গ্রামটির আয়তন ২২৮'২৭ একর, বাটা ১২৭, জনসংখ্যা
৭২১, শিক্ষিত ১৬৩। হুলাং নদীর দ্বারা গ্রামের একদিক
বেষ্টিত। নদীর পরপারে গভীর বন মধ্যে রমণীয় পরিবেশে
৮কনকভূর্গার পরিত্যক্ত পঞ্চরত্নের কাছে আধুনিক দেউল,
উহাতে লিপি :—শ্রীশ্রী ৮কনকভূর্গা—শিল্পী শ্রীজ্যোতিষ-
চন্দ্র দেও ধবলদেব। ৯ই পৌষ, সন ১৩৪৪ সাল।
এখানকার কোন মন্দিরেই কারুকার্য নাই। প্রাচীন
মন্দিরগুলি বিষ্ণুপুরী রীতিতে গঠিত। ৮কনকভূর্গার
নিত্য পূজা ও দুইবেলা ভোগের ব্যবস্থা আছে। এখানে
কাননের নিচ্ছতি মনকে সহজেই আশ্রয় করে।

গিধনীর নিকটবর্তী জামবনী থানার ১০৮ নং মোজা
হুনিয়া গ্রামে বিস্তৃত এলাকা জুড়িয়া একটি প্রাচীন মন্দিরের
ধ্বংসাবশেষ বর্তমান। সম্মুখে গরাইসাগর নামক প্রাচীন
জলাশয়ের সুউচ্চ পাহাড়। মন্দির-চত্বর কামার মন্দির
খণ্ড দ্বারা গ্রথিত। জগমোহনের অংশটি মাত্র আছে।
দূর অতীতে এখানে শ্রীজগন্নাথের দেউল, ভোগশালা
প্রভৃতি ছিল বলিয়া প্রবাদ। সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগ
এখানে প্রাচীন মুদ্রা, প্রস্তরযুগের অস্ত্রাদি পাইয়াছেন।
মন্দিরটি ভারসাম্যে নির্মিত ছিল। পাণ্ডুনির জন্ত মসলা
ব্যবহার হয় নাই। গ্রামে শ্রীকেশব পান মহাশয়ের গৃহে
একটি ক্রমবৃদ্ধ অষ্টকোণ শিবালয় আছে। উহার উপরের
অংশে প্রমাণ আকৃতির গণেশ প্রভৃতির মূর্তি বর্তমান।
একটি পঞ্চরত্নের মতই আধুনিক বিষ্ণুমন্দির ইহাদের
আছে। উহার প্রধান দ্বারের উপর বৎসহ গাভী ও
দোহনকারিণীর ক্ষুদ্র মন্দির মূর্তি। গ্রামের উত্তর প্রান্তে
একটি গহ্বজুড়ওয়ালা ছোট শিবমন্দির। রেল লাইনের
একজন ঠিকাদার এইটী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই
গ্রামটির আয়তন ৬০২'৩৩, গৃহ ১৫৬, জনতা ৬৩৭, শিক্ষিত
১৭৭—এখানে শ্রীপঞ্চমীর সময় একটি মেলা হয়।

হুনিয়া হইতে দুই মাইল উত্তরে পরিহাটি গ্রাম
জামবনী থানার ৫০নং মোজা। ইহার আয়তন ৬২১'৩৫,
গৃহসংখ্যা ১২০, জনতা ১৭৩১, শিক্ষিত ৩২৫। উৎকল-

জনমেজয় মল্লিকের নিকট বন্ধক রাখেন। পরে মেদিনীপুরের মল্লিকবংশ পরগণার মালিক হন। অনন্তর ওয়াটসন কোম্পানী এই জমিদারী ক্রয় করেন। বেলপাহাড়ী গ্রামে তাঁহাদের বৃহৎ কাছারীবাটী ও মনোরম উদ্যান দর্শনীয়। সেখানে একটা পূর্ণাঙ্গ পরিত্যক্ত নৌল-কুঠি ও বৃহৎ বাঁধ আছে।

মুকুন্দনারায়ণের দুই পুত্র জুহরনারায়ণ ও যজ্ঞেশ্বর পৈত্রিক রাজ্য লাভ করেন। যজ্ঞেশ্বর শিলদার ছয় আনা অংশের মালিক হ'ন। তিনি চার আনা অংশ মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানীকে বিক্রয় করিয়া দেন। যজ্ঞেশ্বর-বাবুর মাতার নাম দুর্গাকুমারী। শিলদার বিখ্যাত মজুমদার বংশের রামনারায়ণ এই রাজকুলের দেওয়ান ছিলেন। সন্তদয়তা, সত্যনিষ্ঠা ও বদান্ততার জন্ত তিনি খ্যাত।

শিলদার রাজবংশ ইং ১৫২৪ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীমল্ল কর্তৃক প্রবর্তিত হয়। শেষ রাজা মানগোবিন্দের পাটরাণী কিশোরমণি। তাঁহার সপত্নীকন্যা রাণী সুবর্ণময়ী। ইং ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র বাঁকুড়া রসপালের রাজা মুকুন্দনারায়ণ শিলদা রাজ্য গ্রহণ করেন। বাং ১২৬৮। ২০শে শ্রাবণ গঙ্গারাম দত্ত রাজ্যের অর্ধাংশের মালিক হ'ন। মেদিনীপুরের জনমেজয় মল্লিক ইং ১৮৮৬।২০শে জুলাই হইতে রাজ্যের চৌদ্দ আনা দখল করিতে থাকেন। ইংরাজ জমিদারী কোম্পানী খরিদদ্বারা ইং ১৯০৭ সাল হইতে রাজ্যলাভ করিয়া দেবসেবাদি অক্ষুণ্ণ রাখেন।

শ্রীসিংহবাহিনী, কিশোর কিশোরী, ললিতা গোপাল, আবাল গঙ্গনাথ, দ্বাদশনাথ, মহেশ্বর স্বয়ম্ভু বা শঙ্কুনাথ, বকুলভলার শিব-শীতল-জয়চণ্ডী, শুকযোড়ার রসিকনাগর ও মহাদেব। ওড়গোন্দার শিব, ভৈরব ও বজ্রবলদ। রূপাই, রংপুর, হিজলী, জয়পুর, ডুমুরিয়া ও রাজপাড়া গ্রামের শিব। কেচন্দার সোনাঘণি, এঁবালার কালাচাঁদ ও বিনপুরের শ্রামজন্মের রাজবংশের দেবতা।

শিলদা জমিদারীর দুই আনা অংশ ও নগদ তিনশত নব্বুই টাকা, শিলদার রাজ্যের বাঁধ, হাট ও রাস্তার, ওড়গোন্দার মজুর জমিন, বনকাটি ও ধনধুকড়া মৌজা,

নিশিচুপুর, কালভৈরব ও কালা পাথরের জঙ্গল, বাগান, পুকুর এবং চালতালতার গড় হাতীশাল, পরগণার গোলা, গঙ্গ, ডাহী, পতিত ও ঝুড়িঙ্গলসমূহ দেবোত্তর-রূপে নির্দিষ্ট ছিল। উহাদের আর হইতে নিত্য ও নৈমিত্তিক পূজা-পার্বণ হইত। দেশ স্বাধীন হইবার পর হইতে সবকিছু বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

শিলদা রাজবাড়ীর অঙ্গনে তমাল তরুর সম্মুখে শ্রীকিশোর কিশোরীর বিষ্ণুপুরী রীতির কাটাচাল আটচালা মন্দির। প্রবেশ দ্বারের সম্মুখের অলিন্দে দুইটা পূর্ণ ও দুইটা অর্ধ ইমারত থাম। মন্দিরের উপরের দিকে মকরমুখের উপর সিংহ ও কার্ণিসের নিম্নভাগে কয়েকটা দোলক। পূর্ব ভাগের সম্মুখের মধ্য খিলানের উপর চারি সারি সংস্কৃত লিপি : পদ্মবেদ সমুদ্রশ শশি সন্ধ্যা শকাব্দ। কেশবপ্রিত কার্যেযু দাবাদ চন্দামাহং। শকাব্দ ১৭৪২।১১। লিপির ভাষা শুদ্ধ নহে, সম্ভবতঃ উহার শিল্পীর কাজ। উচ্চপীঠের উপর মন্দির নির্মিত। উপরের চারচালার নিম্নে কারু ও উপবিষ্ট নবমুখি খিলানগুলি দকণ শ্রেণীর।

একটি উচ্চ চত্বর মন্দিরের সম্মুখে অবস্থিত। ইহা নাট্যশালারূপে ব্যবহৃত হইত। উহার পূর্বভাগে উত্তর ঘেসিয়া একটা সুঠাম চাঁদনী মন্দির আছে। ইহা কলাগেছে থাম, কারু ও পুস্তলিকাখচিত। ইহার পূর্বভাগের গায়ে চারি সারি লিপি—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শকাব্দ ১৭৪৮, সন ১২৩৪ (৭) সাল, মাহ বৈশাখ। বাতুময়ী চতুর্ভুজা সিংহবাহিনী মন্দিরের দেবতা।

রাজবাটীর বৃহৎ দ্বিতল ফটকটির দোতারা ছাদ। বাহিরে পথের পাশে দেউলচূড় নবরত্ন রাসমঞ্চ। ইহা কারুখচিত, কার্ণিসে বহু প্রস্তর নির্মিত মকরমুখ। রাসমঞ্চটি অতীব মনোরম।

রাজার বাঁধের দিশান কোণে ঘাটের বামদিকে উমেশ্বরের পঞ্চরত্ন। উহার চূড়াগুলি খাঁজযুক্ত। দ্বার সম্মুখে তিনচালা মণ্ডপাংশ কারুবহল। নিম্নে একটি স্তম্ভাগ্র কৃষ্ণপ্রস্তরে যেন রঞ্জুর দাগ। দ্বারদীর্ঘে চারি সারি লিপি। উহাতে শকাব্দ ১৭৬৭ সন ১২৫২ পড়া যায়। গ্রামের মধ্যে স্বয়ম্ভুনাথের দেউল। উহার

প্রবেশপথের বামে সিংহ ও ডাহিনে বৃষ। হাট ও স্কুলের নিকটে দ্বাদশ শিবের চারচালা মন্দির। এইগুলি লিপিবহীন।

ঝাড়গ্রামের রাজবাটীর নিকটস্থ জলাশয়ের ধারে শিবলিঙ্গাকার একটি মন্দির আছে। লিঙ্গ ঐ মন্দিরের চূড়া—শক্তি অলিন্দের ছায়া। মধ্যে কৃষ্ণপ্রস্তরের ক্ষুদ্র শিবলিঙ্গ বর্তমান। রাজবাটীর গৃহদেবতার মন্দিরদ্বয় বলষবেষ্টিত পঞ্চরত্ন ও দেউল।

শিলদা বাজারে আবালগঞ্জনাথের আটচালা মন্দির। ইহার রীতি গোড়ী। উপর চারচালের সহিত নিম্ন চারচালের ব্যবধান অধিক। অতীত যুগে শিলদা শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে উন্নত ছিল। ইং ১৮৩৫ শতকে লিখিত পাদরী অ্যাডামসের বিবরণীতে তৎকালীন শিলদা থানার ঘোলটি বাংলা শিক্ষাপীঠের উল্লেখ আছে। এখন শিলদা উন্নতিশীল বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। ৪৮৮ বিদ্যালয় প্রভৃতি এখানে আছে।

বিনপুর থানার ২৩৪ নং মৌজা ওড়গন্নার আয়তন ৬৯৩'১৮ একর, গৃহ ১২৬, জনতা ৯৩০, শিক্ষিত ১১৫। এখানে ভুড়ুংরি নামক পার্বত্য টিবি ও উহার তলীয় প্রান্তরে দশহাজার বৎসর পূর্বের প্রস্তরযুগের সভ্যতার বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রায় দুই মাইলের মধ্যে মাটিয়ালা গ্রামেও অল্পরূপ নিদর্শন আছে। তামাজুরি নামক সম্মিহিত স্থানে ৭"১০ ইঞ্চি দীর্ঘ, ৬"৪০ ইঞ্চি প্রস্থ ও ০"৬৩ ইঞ্চি বেধের একটি তাম্রকুঠার পাওয়া গিয়াছিল। উহা তাম্রযুগের পরিচায়ক। ওড়গন্নার ৮ভৈরবের পীঠ বিখ্যাত। ইনি প্রধানতঃ আদিবাসিগণের দেবতা। এটি উচ্চ প্রস্তরপীঠের আকৃতি সর্বতোভদ্র মণ্ডলের মত। উহার উপর অসমাপ্ত প্রস্তর স্তম্ভ ও মন্দিরের অংশ আছে। পূর্বদিকেরটিতে ঘটের উপর মুখবিশিষ্ট ভৈরব ও তাঁহার অমুচরণের মূর্তি। কালীপূজার সময় এখানে মেলা, মহাপূজা ও প্রচুর পণ্ডবলি হয়। কোন কোন সময় এই অঞ্চলে ভীষণ গর্জনের সহিত ভূমিকম্পের মত হয়। উহাকে ঘাটশীলার রক্ষিনীমাতার স্থান হইতে প্রত্যাগমন কালীয় ৮ভৈরবের গর্জন বলা হয়।

গ্রামের মধ্যে আমলক শিলা ও প্রস্তর নির্মিত বিরাট

বৃষ আছে। আনুমানিক দেড় হাজার বৎসর পূর্বে এখানে মন্দিরাদি নিৰ্ম্মাণের চেষ্টা হইয়াছিল। নিকটে শালবন ও ভৈরবের জলাশয়। পথের পাশে ভৈরবের পরিত্যক্ত ভোগশালা একটি সুদৃঢ় ইমারত। গোল সিঁড়িগুলির উপর সুউচ্চ অলিন্দ। ভিতরে হলঘরের দুইপাশে দুইটি কক্ষ। গ্রামের ভিতর সাহদিগের পরিত্যক্ত চাঁদনীটিও স্মৃষ্টাম। দেবতা আছেন কিন্তু পূজা হয় না।

২৩৫ নং মৌজা শুকজোড়ার আয়তন ২৯৮'৩৯, গৃহ ২৫৬, জনতা ১২৮০, শিক্ষিত ২০৬। এখানে শিলদা-রাজবংশের একজনের বাস ছিল। প্রাচীরবেষ্টিত এলাকায জলাশয়, জীর্ণ প্রাসাদ, উদ্যান ও স্মৃষ্টাম পঞ্চরত্ন মন্দির আছে। ইহার কার্নিসে বিচিত্র মকরমুখাবলী। একটি দেউল শিবালয়ে পাঁচ সারি লিপির সবটা পড়া যায় নাই। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ। শকাব্দা ১৭৬২/১১২৭ সন ১২'৪৮। শ্রীশ্রীরাজা কিশোরমণি, রামমোহন ইত্যাদি। সংস্কৃত লিপি ১লা আশ্বিন মঙ্গলবার সন ১৩৪২ সাল।

৩৮৩ নং মৌজা বাঁকোর আয়তন ৩১৬'৭৪, গৃহ ১৫৮, জনতা ৭৯৯, শিক্ষিত ২৩৫। এখানে পাজদের বাড়ীতে একটি পঞ্চরত্ন মন্দির আছে। উহার চূড়াগুলিও আমলকের গঠনে বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। ৪২৬ নং মৌজা বিনপুরে থানা, উচ্চ বিদ্যালয় প্রভৃতি আছে। ইহার আয়তন ২৫০'৪৭, গৃহ ১১১, জনতা ৪৬২, শিক্ষিত ৭৫। এখানকার মদনমোহনজীউর আটচালা মন্দির গোড়ীর রীতির। কোন লিপি নাই। ৮মদনমোহন, রাধারানী, গোপালজীউ ও বহু শালগ্রাম মন্দিরের দেবতা। এইটি শ্রীরামানুজাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত শ্রীসম্প্রদায়ের অস্থল।

৪০২ নং মৌজা রাজপাড়া একটি প্রাচীন গ্রাম। ইহার আয়তন ৪৬০'৬৫, গৃহ ১২৪, জনতা ৪২৩, শিক্ষিত ৬৬। এখানে প্রাচীন যুগের কতকগুলি আমলক শীর্ষক সমাধি স্তম্ভ আছে। ঐগুলির নীচে মৃত্তিকাগর্ভে হাড়ির মধ্যে মৃতের অস্থি নিহিত। দুইটি প্রস্তরমূর্তির একটি বাসুকীর ফণাগুলির নিম্নে অনন্ত বাসুদেব বা বলরাম। অপরটি ছিল শাস্তিনাথ তীর্থঙ্করের মূর্তি। উহা এখন সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক স্থানান্তরিত। একটি দেউল শিবালয়ে লিপি:—শকাব্দা ১৭৬২ সন, ১২৪৮

সাল। শ্রীশ্রীরাজা কিশোরমণি। রাজপদানপন্নী।
সম্ভবতঃ সেকালে গ্রামটির নাম ছিল “রাজপদানপন্নী”।

৩৩ নং মৌজা জয়পুর, আয়তন ৪৭৪*১৩, গৃহ ১৪০,
জনতা ৭০০, শিক্ষিত ১০৪। গ্রামের সাধারণ শিবালয়টির
রীতি চারচাল। ইহা শ্রীবাহুর মাহাত কর্তৃক ১৩৪৪
সালে সংস্কৃত। গ্রামের মধ্যে সুবর্ণ বণিকদিগের একটি
সুঠাম মন্দির বর্তমানে ভগ্নপ্রায়। উহার চূড়াগুলির
গঠনবৈচিত্র্য লক্ষ্যণীয়। সম্ভবতঃ ইহা পঞ্চরত্ন ছিল।
বামা পাথরে নির্মিত ইহার গাত্র মন্মথ।

দ্বাদশ গোপালের পাটের অতীতম গোপীবল্লভপুর
সুবর্ণরেখা নদীর কূলে অবস্থিত। এখানে থানা, হাই স্কুল,
ডাক ও তারঘর প্রভৃতি আছে। নদীর নিকটে পাটবাড়ী
বা অস্থল। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের লীলাসহচর শ্রামানন্দ
গোস্বামীর শিষ্য, রোহিণীর রাজা রসিকানন্দ ইহার
প্রতিষ্ঠাতা। এখনও তাঁহার বংশীয় ব্যক্তিই মহাস্তের পদ
অলঙ্কৃত করেন। ইনি পরম্পরাক্রমে গৃহী। সঙ্গীক
সন্তানসন্ততিসহ এখানেই বাস করেন।

প্রাচীরবেষ্টিত বিশাল ভূখণ্ডে পাটবাড়ী বর্তমান।
দক্ষিণ দিকে ইহার প্রধান দ্বারটি খাঁজযুক্ত পঞ্চরত্ন মন্দির-
শীর্ষক। ভিতরের প্রথম মহালের পশ্চিমদিকে দেউল-
শ্রেণীর প্রধান মন্দির। সম্মুখে পূর্বদিকে মণ্ডপাকৃতি ভগ্ন
স্কলান মন্দির। দেবালয় ও প্রাচীরগাত্রে স্থানে স্থানে
প্রস্তরমূর্তি নিহিত। ফটকের বাহিরে পথের অপর
পারে বিহারীচূড় নবরত্ন রাসমঞ্চ। পুরীর ধরণের
দোলমঞ্চ ও বিষ্ণুপুরী আটচালা রীতির অভিসার বাটী।

প্রধান মন্দিরের দেবতা ৮রাধাগোবিন্দ। পাশের
প্রাসাদে ৮জগন্নাথ, বলভদ্র, সুভদ্রা, গৌরাজ প্রভৃতি
দেবতা সমাজ। অহোরাত্রে কয়েকবার দেবতার ভোগ
হয়। সকালে বালাতোগে চিড়াভাজা প্রভৃতি ও সকাল
আটটায় রাজভোগে সপ্ত উপচার নিবেদন-রীতি। বেলী
তিনটা ও রাজি দশটায় রাশিভোগের প্রসাদ সাধারণতঃ
সেবক এবং অতিথিগণকে বিতরণ করা হয়। মহাস্ত
পরিজন সহ উপস্থিত থাকিয়া সকল ব্যবস্থা করেন।
ভিতরের মহলের একাংশে মহাস্তের বাস। উহার
নিকটে ধামযুক্ত বৃহৎ ইমারত ভগ্ন। মগধ রাডু নামক
সুজির মধুর গিঠান্ন এখানকার বিশেষ স্বাবার। এই
প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে রসিক মঙ্গলকাব্য
উল্লেখযোগ্য। বর্তমান পাটবাড়ীর বহু ইমারতই
ভগ্ন। মম্বরভঞ্জের রাজা কাঠ দেওয়া বন্ধ করায় প্রতি
বৎসর যে নূতন রথ প্রস্তুত হইত, তাহাও উৎসব
আর হয় না।

সংলগ্ন সাধুর আশ্রমে মহারাণীজীউর বিরাট মূর্তি
আছে। নদীতীরে হাটের উপর একটা গোড়ী-রীতির
আটচালা শিবালয়। ইহার ভিতর বাণলিঙ্গ শিব ও
নারায়ণের একটা প্রস্তর মূর্তি। খোপেও মূর্তি আছে।
নিম্নে দুইটি নারীমূর্তি। নদীর ধারে বহু সমাধি মন্দিরের
মধ্যে বারোচালা মন্দিরটি দর্শনীয়। গ্রামের পশ্চিমদিকে
জগমোহন যুক্ত দেউল শিবালয়। নিকটে বৃহৎ তিন
গম্বুজওয়াল মসজিদ। সুবর্ণরেখার বন্যাস গ্রাম ধীরে
ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে।



যদিও জেনেছি

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ

যদিও জেনেছি তাকে এ জীবনে পাব নাক' হয় !
তবু তা'র স্মৃতি-মুখ এই ক্ষণে ভোলা বড় দায় !
অব্যক্ত বেদনা সেত' হৃদয়ের মরু-ধূ-ধূ দেশে,
ব্যর্থ পটভূমি : প্রেম-কুঞ্জবনে, দিনান্তের শেষে।

ফাগুন বধুর মত সেই মেয়ে অকস্মাৎ কাছে এসেছিল,
একদা, বসন্তে—পাখি স্নেহ-নীড় ভাল বেসেছিল।
একটি বিরাট হৃদয় হয়ত সে চেয়েছিল নারী।
দার্শনিক চেতনায়—শুভঘর ; সে তবু আমারই।



প্রবর্তক ৪ কাভিক, ১৩৭০



ব্রজেশ্বরী মন্দির : কাংড়া ফ্রেস্কো চিত্র

প্রবর্তক ৪ কাৰ্ত্তিক ১৩৭০



“হে সমুদ্র স্তব্ধ চিন্তে শুনেছিলু গর্জন তোমার”—দীঘা



অনন্তের পটভূমিকায় দেউদার শ্রেণী—দীঘা



শিল্পীঘন

—শ্রীধর লাল বীর

(পূর্বাহ্নবৃত্তি : শ্রাবণ সংখ্যার পর)

অতি প্রত্যুষে ঘুম ভাঙাই আবাল্যের অভ্যাস। আজ কিন্তু ঘুম থেকে উঠতে দেরী হ'ব। খোলা দরজা দিয়ে আকাশের পানে চোখ পড়তেই বোকা যায়, আকাশ রক্তিমাত, স্বর্গোদয়ের আর বিলম্ব নেই।

দেবকুমার ধড়মড় করে উঠে বসে। মাথা তুলেই সে বুঝতে পারে, রাত্রির অবসাদ তখনও জড়িয়ে আছে সর্বদে। ঘুম ভাঙার পর এই অবসন্নতা দেবকুমারের জীবনে এই প্রথম। রাত্রির অন্ধকারে যা সুখপ্রদ বলে মনে হয়েছিল প্রত্যুষের দিবালোকে তার গ্লানি লজ্জা দেয়।

ঘরের কুলুঙ্গী থেকে একটা দাঁতন নিয়ে চিবুতে চিবুতে দেবকুমার ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো। রাত্রির কুশা তখন অনেক কিকে হয়ে এসেছে। পথের মাছগুনিকে এখন অনেকটা দূর থেকে দেখা যায়। অন্তদিনের মত ঘাটের পথ আজ আর একেবারে নির্জন নয়। আজ ছ'চারজনকে দেখা যাচ্ছে। আজ দেবকুমারের উঠতে দেরী হয়েছে।

ঘাটের মুখে এসেই দেবকুমার থমকে দাঁড়িয়ে

পড়লো। এক বৌদ্ধ শ্রমণ স্নান করে উঠে আসছেন। মুণ্ডিত মস্তক, হাতে লাউ-এর খোলার ভিক্ষাপাত্র। মুখখানি যেন চেনা।

শ্রমণ সামনে এলেন। সত্যি চেনা। দেবকুমার তাড়াতাড়ি নত হয়ে প্রণাম করলো। সন্ন্যাসী হাত বাড়ালেন, দেবকুমারের মস্তক স্পর্শ করে আশীর্বাদ করলেন। দেবকুমার তাড়াতাড়ি কয়েক পা পিছিয়ে এলো, বললো—আমি এখনও স্নান করিনি।

শ্রমণ বললেন—তাতে কি ?

—আমার বাসি কাপড়, আপনি স্নান করে যাচ্ছেন।

—এহ বাহ, মনকে সম্যকভাবে শুদ্ধ কর, পবিত্র কর, অন্তর পবিত্র হলে সবই পবিত্র। কল্যাণমস্ত।

—আপনি কি ধর্মশালায় আছেন, স্নান করে যাবো ?

—আমি সঙ্ঘীয় পথে যাত্রা করবো, পথে বিলম্ব করার অবকাশ নেই। মুক্ত সমাগত, তা প্রতিরোধ করতে হবে।

শ্রমণ অগ্রসর হলেন।

দেবকুমার বললো—তাহলে আবার প্রণাম করি।

শ্রমণ পিছন পানে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললেন—ভগবান তথাগত তোমার কল্যাণ করুন।

দেবকুমার ঘাটে এসে দাঁতন করতে বসলো।

বহরখানেক আগের কথা তার মনে পড়লো। সঙ্ঘীয় বৌদ্ধ বিহারের এই সহায়ের ভিক্ষু তদ্রশীল প্রয়াগের পথে এখানে এসে ধর্মশালায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। নীলধ্বজের সঙ্গে সে গিয়েছিল সাধু দর্শন করতে। অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন এই সন্ন্যাসী, প্রথমেই নীলধ্বজকে বলেছিলেন—তোমার বন্ধুটিও তো সাধনায় মেতেছে ?

—কে ? কার কথা বলছেন ?—নীলধ্বজ প্রশ্ন করেছিল।

—এই যে, যাকে সঙ্গে এনেছ। কালে এ এক খ্যাতিমান শিল্পী হবে।

—আমি ? —দেবকুমার প্রশ্ন করেছিল।

তদ্রশীল মাথা নেড়ে নেড়ে বলেছিলেন—শিল্প সাধনার বস্তু, অনেক নিষ্ঠা অনেক ত্যাগের মধ্যে দিয়ে এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ ঘটে। সংসার মাছকে পাকে

পাকে জড়িয়ে ধরে, সাধনার পথে সংসার এক মন্ত বাধা। বহু প্রতিভা এই সংসারের আবর্তে হারিয়ে যায়, যে ভোগের স্পৃহাকে জয় করতে পারে তারই মাথায় সরস্বতীর আশীর্বাদ বর্ষিত হয়। বাসনাকে জয় করার চেষ্টা করো, তাহলেই শিল্পকর্ম সার্থক হবে।

মহাস্বির যেদিন এই কথা বলেছিলেন সেইদিনই সোমনাথ জ্ঞানার্দনের কাছে নিরালার বিবাহের কথা তুলেছিলেন। জ্ঞানার্দন বলেছিলেন—কিছু উপার্জন করতে শিখুক, আর ক'দিন যাক। দেবকুমারকে ডেকে বলেছিলেন—ব্যবসার দিকে একটু মন দে, পরে খাবি কি ?

মহাস্বিরের কথাগুলো দেবকুমারের মনে তখন তোলপাড় হচ্ছিল, দেবকুমার বলেছিল—আমি বিয়ে করবো না বাবা।

—পাগল—বলে পিতা হেসেছিলেন—বিবাহ একটা সংস্কার, জীবনকে শুদ্ধ করে। তাছাড়া তুই বংশের একমাত্র সম্ভান, পিতৃপুরুষের জলপিণ্ড দানের ব্যবস্থা লোপ করলে মহাপাপের ভাগী হবে।

মহাপাপ অর্থাৎ পরকালে নরক ভোগ। নরকের ভয় হিন্দুমানুষেরই আছে। তাহলে কি সেই সাধনার কোন পুণ্য নেই, যা পরলোকে নরক থেকে উদ্ধার করতে পারে ?

এই প্রশ্ন দেবকুমার অনেকদিন স্তবেছে, কিন্তু কোন সমাধান খুঁজে পায় নি। আজ আবার জীবনে সেই সমস্ত দিন এসেছে, নিরালাকে কাল রাত্রে কথা দিয়েছে তার বাবার কাছে আজ বিবাহের প্রসঙ্গ তুলবে। আজই আবার মহাস্বিরের সঙ্গে দেখা। এ দৈব যোগাযোগ। মহাস্বিরের কাছে এখনি গিয়ে প্রশ্নটার সমাধান করে নিয়ে এলে হয়।

দেবকুমার তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে ছুটলো ধর্মশালার পথে।

ঘাট থেকে কিছুটা গেলেই, পাহাড়টার ধার দিয়ে একটা মোড় ফিরলেই, পাহাড়ের কোলে বনের ছায়ায় একখানি বড় পাথরের ঘর, উপরটা গাছের পাতা দিয়ে ছাওয়া। সাধু-সন্ন্যাসীরা এলে এখানেই আশ্রয় নেন। ত্রিশ-চল্লিশ জনের থাকার মত স্থান এখানে আছে।

সামনেই পাহাড়ের উপর উঠে বাবার একটা পথ, বরাবর চৌষটি যোগিনী মন্দিরের পিছনে গিবে পড়েছে।

ধর্মশালা অবধি দেবকুমারকে আসতে হলো না। পথের মোড়েই মহাপথের সঙ্গে দেখা, দেবকুমার তাড়াতাড়ি প্রণাম করে বললো—আপনার কাছে যাচ্ছিলাম।

—আমি তো বেরিয়ে পড়েছি।

—একটা সমস্যা জেগেছে।

—বল ?

মুহূর্ত ইতস্ততঃ করে দেবকুমার বললো—বিবাহের কথা উঠেছে, বিবাহ করলে কি আমার শিল্প সাধনা ক্ষুণ্ণ হবে ?

ভদ্রশীল কয়েক মুহূর্ত চুপ করে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন দেবকুমারের মুখের পানে। তারপর বললেন—নারী দৃষ্টিকে সীমিত করে সংসারের মধ্যে, শিল্প দৃষ্টিকে প্রসারিত করে বিশ্বসৌন্দর্যে। নারী আনে বন্ধন, শিল্পের ভিত্তি ত্যাগ। বন্ধনের মধ্যে মায়া, সাধনার মধ্যে মুক্তি। একে অন্নের বিরোধী। সাধনা সংসারের চেয়ে বড়। মায়া সাধনাকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরে। দুটিকে সমভাবে গ্রহণ করতে পারে অসাধারণ মানুষ, সাধারণের পক্ষে এককে বড় করতে হলে অন্ধকে ছাড়তে হবে। সমস্তার সমাধান নিজেই করতে হবে। মন যা চায় শাস্ত্রভাবে তা প্রণিধান করতে হবে, সেইটাই তোমার কাছে সত্য, তাই তোমার জীবনের ভবিষ্যৎ নির্ণয় করবে। কল্যাণমস্ত।

মহাস্বির অগ্রসর হলেন। দেবকুমার সেইখানেই কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। তারপর ধীরপদে ফিরে এলো নর্মদার তীরে। ঘাটের অদূরে অশথ গাছটার নীচে বুদ্ধ যথারীতি আশ্রিক করতে বসে গেছেন। আরেকটু এগিয়ে বড় পাথরখানির আড়ালে দেবকুমার বসে পড়লো।

নর্মদার স্বচ্ছ নীল জলধারার মত দেবকুমারের ভাবনা তখন স্রোতের মত বহে চলেছে। এক প্রশ্ন—নিরালাকে অবলম্বন করে সে শিল্পের সাধনা করতে পারবে কি ? একার জ্ঞান চিন্তা নেই, কিন্তু ছুটি মুখের অন্নসংস্থান তখন

করতে হবে। দুই থেকে তিন, তিন থেকে চার, পাঁচ, আরো তো হতে পারে। তখন অর্থ সংস্থানের চেষ্টা ছাড়া আর কোন অবকাশ থাকবে না। খালা বাটি কুঁদতে হবে সারাদিন। সংসারের পাকে পাকে জড়িয়ে যাবে জীবন। জীবনের সব সম্ভাবনাকে মুছে দেবে ওই এক নারী।

ওদিকে বৃদ্ধ তখন আত্মিক শেষ করে গীতার শ্লোক আবৃত্তি কবছেন। শ্লোকের একটা অংশ দেবকুমারের কানে এসে বাজলো—তমাং হুমুস্তিষ্ঠ যশো লভস্ব...

এই শ্লোক পিতার মুখে দেবকুমার বহুবার শুনেছে। পাথর কাটলেও জনার্দন অবসর সময়ে কিছু কিছু সংস্কৃত চর্চা করেছিলেন। এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর কাছে তিনি সংস্কৃত শিখতেন, পরে অত্রাঙ্গণের সংস্কৃত পড়া নিয়ে এখানে একটা সোরগোল ওঠে, ভিক্ষু চলে যান, পিতারও সংস্কৃত শেখা বন্ধ হয়। তবে ভিক্ষুর কাছে কয়েকটি গীতার শ্লোক তিনি নকল করে নিয়েছিলেন, সময় অসময় তিনি সেইগুলি পড়তেন, দেবকুমারের কাছে ব্যাখ্যা করতেন। লাল সাগু জড়ানো সেই ভূজপত্রগুলি এখনও দেবকুমারের ঘরে সযত্নে রক্ষিত আছে।

দেবকুমার মনে মনে আবৃত্তি করলো—তমাং হুমুস্তিষ্ঠ যশো লভস্ব! এর মানে দেবকুমার জানতো। কৃষ্ণের মুখের বাণী। ওঠো, যশোলাভের জন্ত সচেষ্ট হও! যশ চাই—শিল্পী-খ্যাতি। নিরালেকে নিয়ে ছোট্ট পরিবেশের মধ্যে নিজেকে সে গুটিয়ে রাখবে কেন? আর পাঁচজন ভাস্করের মত সারা জীবন সে পাথরের খালা-বাটি কেটে মরবে কেন? ভোগ ও ভালবাসা। গত রাজির সন্তোষের অবসাদ এখনও জড়িয়ে আছে সারা দেহে। এর মধ্যে আনন্দ বোধ কই? এই জীবন চলবে দিনের পর দিন, এই নিরালেকে শয্যাসজিনী করবে রাজির পর রাজি—সারা জীবন। দেবকুমার হবে ভাস্কর, শিল্পী দেবকুমারের মৃত্যু হবে। এ তো দেবকুমারের পক্ষে সম্ভব নয়।

নদীর ঘাটে বসে দেবকুমার অনেক ভাবলো। তারপর ঘান সেরে সে বাড়ী ফিরলো। কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল, মাথার পাগড়ী, হাতে বল্লম, কাঁধে ঝোলা নিয়ে দেবকুমার পথে নেমেছে। বেলা প্রথম প্রহর অতিক্রান্ত হবার আগেই সে নগর সীমা পার হয়ে গেল।

(ক্রমশঃ)

কবি-তুলিকা

শ্রীধীরেন্দ্রকুমার সরকার

শুধু কোলাহল বনানী উত্তল জীবন মেলেছে পাখা
ফাগুন বাসরে ফুলের আসরে আল্পনা কার আঁকা!
আকাশের গায় নীল চাঁদোয়ায় অপনের মালা গাঁথা
এ-ধরা চমকে তুলিকা ঝলকে সাত্তরঙা ঝারি পাতা।
লালসা বিলাসে ফুলের স্ববাসে শোণিতের ডেউলাগে
লাজের আঙিষা উঠেছে রাঙিষা দেহমন ফুল বাগে।
কোকিল কুহরে লহরে লহরে কোকিলা যে তার সাথী
পরদেশী ছুড়ি দিকে দিকে ঘুরি' প্রেমগাথা যায় গাঁথি'।
ঝিরি ঝিরি বায় কবরী দোলায় মধুকর করে ধুম
এ ফুলে ও ফুলে মাখে ফুলে ফুলে পরাগের কুমকুম।

ইথার বাতাস বায়বীয় গ্যাস এরাও যে মধুময়
আকাশে মাটিতে লুটায় প্রীতিতে ফাগুনের গাহে জয়।
ছুটি কবি পিয়া ছুটি স্বরে হিয়া—একটি ধুশীতে তরা
অপরটি তার গাঁথে ছুথ-হার' নয়নের নীর বরা।
একটি যে তার অধা ভারে ভার প্রেমময়ী হলহল
নিবিড় আবেশে নব নব বেশে হাসি গানে উলমল।
তার দেহবাসে ধূলি, সেও হাসে প্রেমিকের মন দোলে
মিলনের কাঁসে নিশাসে প্রাণাসে ছুটি হিয়া উত্তরোলে।
অপরটি হায়! কবি-তুলিকায় বিরহিণী একাকিনী
বাখা বেদনার প্রদীপ শিখায় আগে জলে অভাগিনী।

ফাগুন পাতায় কবি লিখে যায় কতু লুখে কতু লুখে
বিরহ মিলন এ-ছুটি লিখন মায়া পৃথিবীর বুকে।

বঙ্কিম-বান্ধব অক্ষয়চন্দ্র

শ্রী অক্ষয়চন্দ্র সরকার

। পঁচ ।

সকলেই জানেন, বঙ্গদর্শন চার বৎসর প্রকাশিত হইয়া বন্ধ হইয়া যায় এবং কিছুদিন পরে সঙ্ঘীববাবুর সম্পাদকতায় পুনঃ প্রকাশিত হয়।

বঙ্গদর্শনের ৪র্থ খণ্ডে চৈত্র ১৮৭৫ সালে ‘বঙ্গদর্শনের বিদায়’ শীর্ষক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিলেন ‘যেদকল কৃতবিদ্বৎ স্নলেখকদিগের সহায়তাতেই বঙ্গদর্শন এত আদরগীর হইয়াছিল, তাঁহাদিগের কাছে আমার অপরিশোধনীয় ঋণ স্বীকার করিতে হইতেছে।’ এই সকল কৃতবিদ্যা স্নলেখকদিগের নামের মধ্যে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতির নাম উল্লেখ করিয়া তিনি লিখিলেন ‘(ইহাদের) লিপিশক্তি, বিদ্যাবস্তু, উৎসাহ এবং শ্রমিকতাই বঙ্গদর্শনের উন্নতির মূল কারণ।’ তিনি প্রবন্ধ শেষে আরও লিখিলেন ‘...যথার্থবাদী ভারত-সংস্কারক, বিজ্ঞ এডুকেশন গেজেট ও তেজস্বিনী তীক্ষ্ণদৃষ্টিশালিনী সাধারণী এবং সত্যপ্রিয় সাপ্তাহিক সমাচার প্রভৃতি পত্রকে, বহুবিধ আত্মকুল্যের জন্য আমি শত শত ধন্যবাদ করি।’

আর ১৮৭৬ সালের ২৩এ আশ্বিন অক্ষয়চন্দ্র সাধারণীতে লিখিলেন :

‘বঙ্গদর্শন অকালে বিদায় গ্রহণ করাতে বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজ সান্তিশয় হুঃখিত হইয়াছেন। আপনার গুরুভার আর্থদর্শন ও বান্ধব প্রভৃতি অমুজগণের উপর অর্পণ করিয়া বঙ্গদর্শন অবসৃত হইয়াছে। বৃদ্ধ দশরথের চারি পুত্র, তিনি চারিজনকেই সমান স্নেহ করিতেন, অথচ শ্রীরাম-লক্ষণের শোকে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। বৃদ্ধা বঙ্গমাতা যে জ্যেষ্ঠ পুত্র বঙ্গদর্শনকে হারাইয়া বান্ধব বা আর্থদর্শনের মুখ দেখিয়া সকল হুঃখ বিস্মরণ করিবেন—এ প্রত্যাশা আমরা শীঘ্র করিতে পারি না। তবে ইতিমধ্যে বান্ধবের কলেবর বৃদ্ধির বিজ্ঞাপন দেখিয়া কিঞ্চিৎ ভরসা হইতেছে। বঙ্গদর্শন বিদায়কালে ক্ষুদ্রপ্রাণী সাধারণীকেও বিস্মৃত হয়েন নাই—কনিষ্ঠা ভগিনী বেক্রপ অজ্ঞাতবাস প্রয়াসী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুনরাগমন প্রত্যাশা করে, আমরাও আজি

সেইরূপ অক্ষপূর্ণ লোচনে বঙ্গদর্শনের পুনর্দর্শনের আশাপথ চাহিয়া রহিলাম।’

তখনও অক্ষয়চন্দ্রের ‘নবজীবন’ প্রকাশিত হয় নাই, তাই বঙ্গদর্শনের বিদায়ে ইহার উল্লেখ ছিল না। নব-জীবনের প্রকাশের সঙ্গেও বঙ্কিমচন্দ্রের নাম বিশেষরূপ জড়িত। তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়াই বঙ্গে নবজীবনের সূচনা। এইবার সেই কথাই উল্লেখ করিতেছি।

১৮৮৪ সালে সাধারণী প্রেস কলিকাতায় উঠাইয়া লইয়া যাওয়া হয়। তখন কলিকাতার কলুটোলার বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যসম্রাট রূপে বিরাজমান। তাঁহার বৈঠকখানায় প্রতি রবিবারে সাহিত্য-সঙ্গত হয়। উপস্থিত থাকেন—চন্দ্রনাথ বসু, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলকণ্ঠ মজুমদার প্রভৃতি। মধ্যে মধ্যে আসেন বারাসত হইতে তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বর্ধমানের ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঢাকার কালীপ্রসন্ন ঘোষ ও গোবিন্দচন্দ্র দাস এবং চট্টগ্রামের নবীনচন্দ্র সেন। অক্ষয়চন্দ্র নিয়মিতভাবে প্রতি বুধবার অপরাহ্নে ত বটেই এবং অন্তর্দিন অল্প সময়েও বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ীতে উপস্থিত থাকিতেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে ঘিরিয়া সে এক অভূতপূর্ব মজলিস।

তখন পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় মুদ্রের, বর্ধমান প্রভৃতি স্থানে ধর্মব্যাখ্যা, প্রচার ও বক্তৃতা করিয়া কলিকাতায় অবস্থান করিতেছিলেন। চূড়ামণি মহাশয়ও মাঝে মাঝে এই মজলিসে উপস্থিত হইতেন। অক্ষয়চন্দ্র লিখিতেছেন :

‘সাহিত্যসেবার সভার’ ধর্মের কাহিনী উঠিল। চূড়ামণি মহাশয় আলবার্ট হলে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। শাস্ত্রসঙ্গত ধর্মব্যাখ্যার সঙ্গে তিনি বিজ্ঞানের দোহাই জাঁকাইয়া দিতে লাগিলেন। ধর্ম বিজ্ঞানের উপর দাঁড়াইবে, কথাটা নিতান্ত উন্টা কথা বলিয়াই আমার বোধ হয়। সাধারণীতে এই মতের প্রতিবাদ করিলাম। ধর্মই সকলের অবলম্বন, ধর্ম আবার বিজ্ঞানের আশ্রয়

পাইবে কেন? এই সকল কথার আলোচনার ফলে নবজীবন প্রকাশিত হইল। বঙ্কিম-সঙ্গতে হাওয়ার স্তর বুঝিয়া নবজীবন প্রকাশিত করিলাম।'

নবজীবনের স্বচনাতেই অক্ষয়চন্দ্র বুঝাইয়া দিলেন যে, বিশাল মহান স্তর সমাজ-তত্ত্বাদির আশ্রয়স্বরূপ, অবলম্বন-স্বরূপ হইয়া ঐ সকলকে গর্ভে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, সেই বিশাল মহান আশ্রয়-স্তরের নাম ধর্ম। বঙ্কিমচন্দ্র নবজীবনের প্রথম সংখ্যা হইতেই ধর্মের 'অহুর্জীলন', 'ধর্মতত্ত্ব' প্রভৃতি লিখিতে লাগিলেন।

ইতিপূর্বেই 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ' ঋগ্বেদঃ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল; প্রথমে প্রকাশিত হইয়াছিল 'বিদ্যাপতি'। প্রাচীন কাব্য সংগ্রহের সমালোচনা-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র (বঙ্গদর্শনের ৩য় খণ্ডে) লিখিলেন:

'যে কার্যে ইঁহারা (অক্ষয়চন্দ্র ও সারদাচরণ মিত্র) প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহা গুরুতর, সুকঠিন এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয়। ইঁহারা সে কার্যের উপযুক্ত ব্যক্তি। উভয়েই স্কটবিদ্যা এবং অক্ষয়বাবু সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত। তিনি কাব্যের সুপরীক্ষক, তাঁহার রুচি সুসজ্জিত এবং তিনি বিদ্যাপতি কাব্যের মর্মজ্ঞ। দুইজনেই শব্দসকলের ইঁহারা যে প্রকার সদর্থ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা বিশেষ সাধুবাদ করিতে পারি।'

বঙ্গদর্শন প্রকাশের ৩৫ বৎসর পরে নব পর্যায়ের বঙ্গদর্শন-এ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'ষোড়শী' এবং অল্প দুইখানি গ্রন্থ-সমালোচনা প্রসঙ্গে অক্ষয়চন্দ্র লিখিলেন:

'বঙ্গদর্শনের অধ্যক্ষ স্বয়ং হাতে করিয়া আমার হাতে তিনখানি বিচিত্র পুস্তক দিয়াছেন, অহুরোধ—আমি সমালোচনা করি বঙ্গদর্শনের জন্ত। কিন্তু দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিলে অহুরোধটি দাঁড়াইয়াছে বঙ্গদর্শনের জন্ত নহে—বঙ্গদর্শনের জন্ত। বঙ্গদর্শনের আদিযুগের একটা কথা মনে পড়িল। বহরমপুরে নূতন বঙ্গদর্শন বাহির হইয়াছে ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা। আমিও তখন বহরমপুরে থাকি। সম্পাদকের নিজস্ব নগরখানিতে শ্রীমতী কর্ণী-ঠাকুরাণী সদর পৃষ্ঠায় যে বড় বড় অক্ষরে "বঙ্গদর্শন" ছাপা আছে, তাহারই "ব"-র নীচে কখন একটি "শু" বসাইয়া দিয়াছেন। সম্পাদকের কনিষ্ঠা কন্যা (দ্বিতীয়া কন্যা

হেমললিনীই তখন কনিষ্ঠা কন্যা) তখন সবেমাত্র দ্বিতীয় ভাগ পড়িতেছেন; তিনি সেই বঙ্গদর্শনখানি লইয়া তাড়াতাড়ি পিতার কাছে আসিয়া অহুরোধ করিলেন, "বাবা, তুমি যে বলিয়াছিলে "বঙ্গদর্শন"—এ যে "বঙ্গদর্শন"। বঙ্কিমবাবু হাসিতে-হাসিতে বলিলেন, "তোমার গর্ভ-ধারিণীর গুণে রঙ্গ হইয়াছে, আমি কি করিব মা!" এখন আমার কপালগুণে দেখিতেছি বঙ্গদর্শন আবার বঙ্গদর্শন হইয়া পড়িল।...গ্রন্থের নাম ষোড়শী। তা ষোড়শী আমার কাছে কেন? এইরূপ কৈফিয়তের উত্তর দিবার জন্তই যেন ভূমিকার প্রথমই গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—এই গ্রন্থে আমার ষোলটি গল্প প্রকাশিত হইল, তাই ইঁহার নাম রাখিলাম ষোড়শী। আমরা কিন্তু বোধ করি অলীলতা-নিবারণী সভার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্ত গ্রন্থকার এইরূপ চতুরতা করিয়াছেন। সমস্ত গ্রন্থের অধিকাংশই ষোড়শী-রূপসী লইয়া ঘটনা-গ্রন্থন। ষোলটি গল্পের আটটিতে ষোড়শীই জ্ঞান।' এইখানেই বলা ভাল, অক্ষয়চন্দ্রের দ্বিতীয় কন্যার নামও হেমললিনী—উভয়েই সমবয়স্ক।

এই সমালোচনাতেই বঙ্কিমচন্দ্রের উপর যথেষ্ট অভিমান বর্ধিত হইয়াছে। অক্ষয়চন্দ্র লিখিতেছেন—'এখন জিজ্ঞাসা করি কেন তোমরা কুমারী, সধবা, বিধবা, বহুধবা (সচ্চরিত্র গল্পে গ্রন্থকার তাহাদেরও ছাড়েন নাই) ষোড়শী লইয়া কারবার করিবে? এখন বুড়া বয়সের দোবে এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছি, তাহা নহে। ভোর যুবক সময়ে বঙ্কিমবাবুকে বলিয়াছিলাম, বিস্তর হগো যেমন নাইনটিখীতে একটি মাতৃছবি দিয়াছেন, আপনি কেন সেইরূপ কিছু দেন না। সতীশবাবুর মা এক টুকরা কমলমণিকে পাইয়া আমাদের ত আশা মিটে না! বঙ্কিমবাবু কার্য্যত কোন উত্তর দেন নাই। কিন্তু তাহার পরে তোমরা অনেকেই দেখিতেছি গল্প লিখিতে অগ্রসর;—ষোড়শীর গ্রন্থকার বেশ ভাবুক...তাঁহার যখন এত গুণ, তখন তিনি কেন কেবল ষোড়শী আর ষোড়শী করিবেন, কেন বয়সী বাঙ্গালী মার চিত্র অঙ্কন করিবেন না?...তুমি পথেঘাটে বলিবে বন্ধেমাতরম্, আর সাহিত্যে কেবল লিখিবে, বন্ধে ষোড়শীং রূপসীং প্রেমসীম্! হিঃ! তুমি আপনাকে আপনি চিন না। ইঁরাজি সাহিত্যের

কুহকের মোহে তোমাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। ঐ মোহ কাটাঁইতে যত্ন কর। সাহিত্যে মাকে ভুলিও না। যে রাম বহু কিশোর কিশোরীর বিরহগীতি গাহিয়াছেন, তিনি ত আগমনী গানে, মেনকা উক্তিভে নানাবিধ মাতৃস্মৃতি অঙ্কিত করিয়াছেন।...

এই সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে অক্ষয়চন্দ্রের আর একটি অভিযোগ—এবার অভিমান নয়—খাঁটি অভিযোগের উল্লেখ করিতেছি। অভিযোগ বটে, কিন্তু কত মুনসীআনা করিয়া, নবীনচন্দ্রকে সাফাই সাক্ষী খাড়া করিয়া এবং কবিবরের উপরেও দ্বন্দ্ব বক্রোক্তি করিয়া এই মন্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে, বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের চট্টগ্রাম অধিবেশনের সভাপতিরূপে। অক্ষয়চন্দ্র লিখিতেছেন—

‘আর আমাদের সাহিত্য-সম্রাট, মাথার মণি, চুড়ার ময়ূর-পাখা বঙ্কিমচন্দ্র তেমনই কুক্ষণে ইংরাজী হইতে নায়ক-নাগ্নিকার অবতারণা করিয়াছিলেন। আমাদের নবীনচন্দ্র, তোমাদের নবীনচন্দ্র তাহা সুন্দররূপে ধরাইয়া দিয়াছেন। সে কথাও এখানে বলা আবশ্যক। তিনি লিখিয়াছেন :

“বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিমবাবু অমর। তাঁহার উপভাস-শুলিতে অতি উচ্চ শিল্প ও শিক্ষা আছে। কিন্তু আদর্শ চরিত্র নাই।...বঙ্কিমবাবু এ সকল আদর্শ (রামায়ণ-মহাভারতের) তাঁহার সাধারণ প্রতিভার আঘাতে বরং ভাঙ্গিয়াছেন, গড়িতে পারেন নাই।...বঙ্কিমবাবুর উপভাস-শুলি যুরোপীয় উপভাস হিসাবে উৎকৃষ্ট উপভাস। ভারতীয় সাহিত্যের হিসাবে উৎকৃষ্ট সাহিত্য নহে।”

এরূপভাবে না বলিলেও, বাঙ্গালির যশোদা, মেনকা, জগদম্বার উল্লেখ করিয়া আমি বঙ্কিমবাবুর হাতেপায়ে ধরিয়া তাঁহাকে মাতৃচিত্র অঙ্কিত করিতে বার বার অমরোধ করিয়াছিলাম। সকলেই জানেন, সে অমরোধ রক্ষা হয় নাই। এখনও অনেক কৃত্তী লেখককে সেইরূপ অমরোধ করিয়া থাকি, তাহাতেও বিশেষ ফল হয় না।...ঐ সমালোচক নবীনচন্দ্র ও কবি নবীনচন্দ্রের মধ্যে তুলনা করিয়াই দেখুন না। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনাকালে কেমন আমাদের আদর্শের কথা তুলিলেন, কিন্তু তাঁহার কাব্যের সুভদ্রা, সুলোচনা, শৈলজা—এ সকল কি ? তাঁহারই কথা

জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়—ভারতীয় সাহিত্যের হিসাবে উৎকৃষ্ট কি ? সেই যে কুরুক্ষেত্রের সময়ের অবসর-সময়ে হিন্দুরমণী দীপ লইয়া হতাহতের অমুসন্ধান করিতেছেন—সেটি কি ক্লোরেন্স নাইটিংগেলের একরূপ সংস্করণ নয় ?

এই সঙ্গে সাধারণীতে প্রকাশিত (২৮/৩/৮২) অক্ষয়-চন্দ্রের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :

‘বিশ্বাস এবং সন্দেহ দুইটিই সমান প্রয়োজনীয় ; কার্যের প্রাণ বিশ্বাস—চিন্তার প্রাণ সন্দেহ, স্তূতরাং চিন্তাশীল, কার্যক্ষম লোকের পক্ষে বিশ্বাস এবং সন্দেহ দুইটিই সমান প্রয়োজনীয়। অলৌকিক মানবের কথা ছাড়িয়া দিয়া সাধারণের কথা বলি। বিশ্বাসেই ঐহার প্রকৃতি, বিশ্বাসেই ঐহার প্রবৃত্তি ও বিশ্বাসেই ঐহার নিবৃত্তি, তিনি আজীবন অন্ধকারচারী—তিনি কপাল-কুণ্ডলা। তিনি জীলোক। আর বিশ্বাসে ঐহার আরম্ভ, সন্দেহে প্রবৃত্তি এবং সন্দেহেই পরিণাম—তিনি চন্দ্রশেখর। তিনি শুট্টাচার্য্য। আর বিশ্বাসে ঐহার উদ্যোগ, সন্দেহে ঐহার প্রবৃত্তি এবং বিশ্বাসে ঐহার পরিণতি—তিনি প্রতাপ রায়। আমরা কপালকুণ্ডলা, চন্দ্রশেখর রাশি রাশি দেখিতেছি, এখন চাই জনকতক প্রতাপ রায়।’

ইহাও আদর্শ এবং অধিতীয়, অপূর্ব, অমূল্য আদর্শ।

বঙ্কিমচন্দ্রে ও অক্ষয়চন্দ্রে দেখাসাক্ষ্য হইলেই উভয়ে নানা বিষয়ের আলোচনা হইত—বর্ষ, দর্শন, সমাজ, সাহিত্য প্রভৃতি। তন্নিম্ন কোনও জিজ্ঞাসা থাকিলে, অক্ষয়চন্দ্র খোলাখুলি বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রশ্ন করিতেন—তা’ সে যে কোন বিষয়েই হউক, এমনকি বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের আধ্যাত্মিক মতামত সম্বন্ধেও।

আমরা অনেকেই জানি, কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের ভবনে জৈনক সম্রাসী-প্রদত্ত রাধাবল্লভজীউর বিগ্রহ বহুকাল হইতে প্রতিষ্ঠিত আছেন। অক্ষয়চন্দ্র লিখিতেছেন—(ভাদ্র, ১৯১২) :

‘বঙ্কিমচন্দ্রের বালাবস্থায় এই বিগ্রহের এবং অতিথি-অভ্যাগত-সেবার সুন্দর বন্দোবস্ত ছিল, এখনও অনেকটা আছে। সেই সুন্দর বিগ্রহ ও তাঁহার ঐকান্তিক সেবা-সন্দর্শনে অভ্যস্ত বঙ্কিমচন্দ্র বয়সকালে কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ হইয়াছিলেন।

কেবল কৃষ্ণভক্তি নহে। শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস তিনি আপনার গ্রন্থমধ্যে লিখিয়া গিয়াছেন, সে ত সকলেই জানেন ; আমি বলিতেছি, এই প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের অলৌকিকত্বে তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন। এই সম্বন্ধে আমি তাঁহাকে ধীরে-ধীরে একটু জেরার ভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—তিনি প্রথমে প্রফুল্ল অন্তঃকরণে সহাস্ত বদনে বলিতে থাকেন—

“তোমাদের চুঁচুড়ার একটি সুবর্ণবশিক-মহিলা বিশ-ত্রিশজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে এ পারে আমাদের এই ঠাকুর দেখিতে আসেন।”

বলিতে-বলিতে তাঁহার চোখে জল আসিল, বলিতে লাগিলেন—

“কিন্তু সকলেই ঠাকুর দেখিল, তিনি দেখিতে পাইলেন না ; আমরা বাড়ীতে ছিলাম, সকলেই তাঁহার কাছে গেলাম, সমস্ত লোকজন সরাইয়া দিয়া তাঁহার ভাল করিয়া দেখিবার স্থবিধা করাইয়া দিলাম—অভাগিনী কিছুতেই ঠাকুরকে দেখিতে পাইল না, উচ্চৈঃস্বরে কাদিতে লাগিল।”

বঙ্কিমবাবুও কাদিতে লাগিলেন, আর বলা হইল না। তাঁহার বিগ্রহ-ভক্তি দেখিয়া আমিও অভিভূত হইলাম।

বঙ্কিমচন্দ্রে ও অক্ষয়চন্দ্রে প্রগাঢ় প্রীতি ও ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও অক্ষয়চন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রকে কখনও ‘তুমি’ বা ‘বঙ্কিমবাবু’ বলিয়া সম্বোধন করিতেন না—সাক্ষাতে মুখোমুখি ‘আপনি’, অপরের নিকটে ‘বঙ্কিমবাবু’ বলিতেন। অক্ষয়চন্দ্র তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন, সব সময়ে খুব সমীহ করিয়া চলিতেন, কিন্তু একটুও সম্মুচিত ভাব দেখা যাইত না—সে যেন হরিহর আত্মা। বঙ্কিমচন্দ্র সব সময়ে অক্ষয়চন্দ্রকে ‘অক্ষয়’ ও ‘তুমি’ বলিয়া সম্বোধন করিতেন, কখনও ‘অক্ষয়বাবু’ বলিতেন না। আর অক্ষয়চন্দ্রের সহধর্মিণী সৌদামিনীকে বঙ্কিমচন্দ্র ‘অসাধারণী’ বলিয়া ডাকিতেন। তিনি কখনও বঙ্কিমচন্দ্রের সম্মুখে বাহির হইয়া সামনাসামনি কথা বলিতেন না—তবে ঘোমটা দিয়া নিঃসঙ্কোচে, প্রফুল্লচিত্তে পরিবেষণ করিতেন—বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত তাঁহার সখ্য ছিল—ঠিক যেন সেকালের ভান্সর-ভান্সবৌ-এর।

বঙ্কিমচন্দ্র ও অক্ষয়চন্দ্রের মধ্যে খাওয়া-দাওয়া এবং খাওয়া-আসা খুবই ছিল। এখনকার মত এক কাপ চা খাওয়াইয়া বিদায় দেওয়া নয়—ফলমূল, মিষ্টান্ন, সরবৎ প্রভৃতি আহারের প্রচুর সমাবেশ হইত আর উভয়েই উভয়ের বাড়ীতে আবশ্যক হইলেই ভাত খাইতেন। অক্ষয়চন্দ্র তামাক পর্য্যন্ত খাইতেন না, সুতরাং সে সব কথার উল্লেখ না করিলেও চলে।

বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্র অক্ষয়চন্দ্রকে পুত্রের হায় স্নেহ করিতেন—অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন—অক্ষয়চন্দ্র নামজাদা সাহিত্যিক বলিয়া নহে, চরিত্রবান্ পুরুষ বলিয়া নহে, তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তির জন্ত নহে—সুধু তিনি প্রতিভাশালী প্রিয়তম পুত্র বঙ্কিমচন্দ্রের পরম বান্ধব বলিয়া, নতুবা যাদবচন্দ্রের সহিত অক্ষয়চন্দ্রের বাক্যালাপ অতি কমই হইত। অক্ষয়চন্দ্র লিখিয়াছেন :

‘অনেকদিন তাঁহাকে (যাদবচন্দ্রকে) একটি প্রণাম করা পর্য্যন্ত আমার তাঁহার সহিত আলাপের সীমা ; তবে আলাপের দিন একাদশী হইলেই বড় গোলে পড়িতাম (অক্ষয়চন্দ্র একাদশীতে অন্নগ্রহণ করিতেন না)। সেইদিন অতি যত্নে, অতি আদরে, আমার উপর পুজা-ধিক স্নেহে, তিনি কাছে বসিয়া আমাকে “জল” খাওয়াইতেন। “এটি খাও”, “ওটি খাও” করিতেন, ফল সন্দেশের স্বাদুতা বর্ণন করিতেন। নিজে রসগ্রাহী লোক ছিলেন, অল্পকে রসগ্রহণের পদ্ধতি-প্রকরণ দেখাইয়া দিতে আনন্দ বোধ করিতেন। একদিন ঐরূপ একাদশীতে আমি রসগোল্লা লইতে ইতস্ততঃ করিতেছিলাম ; তিনি হাস্ত করিয়া বলিলেন, “এ কি তোমার ও-পারের কিরিঙ্গি মুলুকের রসগোল্লা পেয়েছ যে, সুজির বাঁধন দিবে ?—এ-পারে সে সকল হবার যো নাই, তুমি স্বচ্ছন্দে খাইতে পার।” এই যে রাশভারী লোকের রহস্যে রসান্বাদ—সেটি বড় অপূর্ণ পদার্থ।’

নলহাটি ষ্টেশনে বিশ্রাম-গৃহে বসিয়া রেনন্ডের মুড়ি চিবাইতে-চিবাইতে সেই যে বঙ্কিমচন্দ্র ও অক্ষয়চন্দ্রের বন্ধুত্বের অনুরোধকম হয়, তাহা ক্রমে ক্রমে বিশাল মহীকূলে পরিণত হইয়াছিল ; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ‘বয়সে বড়, জ্ঞাতিতে বড়, বিদ্যায় বড়, কৃতিত্বে বড়’—এই

(মস্মট ভট্টের মত)

(২) " অলঙ্কার ধ্বনি ।

(১২) " " " " " অলঙ্কার ধ্বনি ।

तुङ्कामये ह्यम् अहम् अप्रमेयम् ॥

বিভক্ত হইতে পারে, তথাপি এইরূপ অসংখ্য শ্রেণী প্রদর্শন পরিহার করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে তিনি একক রূপেই গণনা করিয়াছেন। তবে এইরূপ ধ্বনিগুলিতে অন্ততঃ ৬টি অবাস্তর বিভাগ স্বীকার না করিয়া তিনি পারেন নাই। উক্ত ৬টি শ্রেণী, যথা—(১) বর্ণগত (২) পদাংশগত (৩) রচনাগত (৪) প্রবন্ধগত (৫) পদগত এবং (৬) বাক্যগত। পূর্বে যে ৪৭টি শ্রেণীর কথা বলিয়াছি পদগত এবং বাক্যগত অসংলক্ষ্যক্রম ধ্বনি দুইটি তাহাদের মধ্যেই গণনা করা হইয়াছে; সুতরাং অবশিষ্ট ৪টির সহযোগে সম্প্রতি ধ্বনিতে মোট (৪৭ + ৪) = ৫১টি শ্রেণী স্বীকৃত হইল।

মন্মট ভট্টের স্বল্প বিচারশক্তি এখানেই ক্ষান্ত হয় নাই। ইহার পরেও তিনি ধ্বনিগুলির মধ্যে স্বল্পতর বিভাগ কল্পনায় ত্রী হইয়াছেন। তিনি বলেন—উল্লিখিত ৫১ প্রকার ধ্বনির প্রত্যেকটিতে আবার একই পদ্ধতিতে ৫১টি পৃথক শ্রেণী স্বীকার করা যায়। এইভাবে ধ্বনিগুলির মধ্যে যে (৫১ × ৫১ =) ২৬০১টি শ্রেণী পাওয়া গেল, তাহাদের প্রত্যেকটিকে আবার চারিটি পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় বলিয়া তিনি মনে করেন। তাঁহার মতে তিন প্রকার সঙ্কর এবং এক প্রকার সংসৃষ্টি দ্বারা উল্লিখিত বিভাগ-চতুষ্টয় হইতে পারে, তাহা হইলে ধ্বনির শ্রেণী সংখ্যা দাঁড়াইতেছে (২৬০১ × ৪ =) ১০৪০৪। ইহাদের সহিত আবার বিস্তৃত ৫১ প্রকার ধ্বনির যোগে মোট ১০৪৫৫ প্রকার ধ্বনি আছে বলিয়া মন্মট ভট্ট অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

সঙ্কর এবং সংসৃষ্টি বলিতে মন্মটভট্ট কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন, তাহাও এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক।

(১) দুইটি পৃথক ধ্বনির একত্র অবস্থিতিকালে দেখা যায়—কোথাও এইরূপ ধ্বন্যর্থব্ধের মধ্যে কোন অর্থ দ্বারা কোন অর্থটি আকৃষ্ট হইতেছে, এই বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হয়; অর্থাৎ প্রত্যেক অর্থ দ্বারাই অপর অর্থটি আকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এইরূপ মিশ্রণের নাম সন্দেহ-সঙ্কর।

(২) কোথাও দেখা যায়—একটি ধ্বন্যর্থ দ্বারা অপর ধ্বন্যর্থটি উপকৃত বা অধিকতর মনোরম হইতেছে। এইরূপ মিশ্রণের নাম অল্পগ্রাহ্যগ্রাহক বা অঙ্গাদ্ভিভাব-সঙ্কর।

(৩) কোন কোন স্থলে একটি মাত্র অর্থ হইতে দ্বিবিধ ধ্বন্যর্থ আকৃষ্ট হইয়া থাকে, এইরূপ ধ্বনিদ্বয়ের আশ্রয় অভিন্ন থাকায় ইহাদের সংযোগকে একাশ্রয়মুপ্রবেশ বা একব্যঙ্গকামুপ্রবেশ সঙ্কর বলে।

(৪) কোথাও দেখা যায়—একটি মাত্র বাচ্যার্থ হইতে পরস্পর নিরপেক্ষ ভাবে দুই বা ততোধিক ধ্বনির উদ্ভব হয়। এইরূপ পরস্পর-নিরপেক্ষ ধ্বনিগুলির একত্র অবস্থিতিকে বলা হয়—‘সংসৃষ্টি’।

জয়দেবের মত

আলঙ্কারিক জয়দেব তাঁহার চম্পালোক নামক গ্রন্থে (৭ম মযুখ) কাব্যপ্রকাশের মতামুযায়ীই ধ্বনির বিভাগ প্রদর্শন করিয়াছেন। জয়দেবের মতের বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি শুদ্ধ ৫১ প্রকার ধ্বনি পৃথকভাবে স্বীকার না করিয়া মোট সংখ্যা ১০৪০৪ বলিয়াছেন। আমরা মনে করি—অত্যন্ত সমুদয় বিভাগ স্বীকার করিয়া এইভাবে ৫১টি শ্রেণীর অন্তর্গত স্বীকার করিবার মত কোন সম্ভব কারণ নাই। তাদৃশ কোন কারণ জয়দেব নিজেও দেখাইতে পারেন নাই এবং টীকাকার বিশেষর ভট্টও উক্ত মতের সমর্থনে কোন অকাট্য যুক্তি প্রদর্শনে সমর্থ হন নাই।

বিশ্বনাথের মত

আচার্য্য বিশ্বনাথ তাঁহার সাহিত্যদর্পণের চতুর্থ পরিচ্ছেদে মন্মট ভট্টের পদ্ধতিতেই ধ্বনিগুলির মধ্যে শ্রেণী-বিভাগ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার মতের বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি স্বজাতীয়ের সহিত স্বজাতীয়ের মিশ্রণে পৃথক ধ্বনির সৃষ্টি হয় বলিয়া স্বীকার করেন না। ফলে তাঁহার মতে ধ্বনির সংখ্যা ৫৩৫৫ দাঁড়াইয়াছে। যদিও সাহিত্যদর্পণের কোন কোন টীকাকার মন্মট ভট্টের মতই সমর্থন করিয়াছেন, তথাপি আমাদের বিবেচনায় এই বিষয়ে বিশ্বনাথের মতটিই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। অর্থান্তর সংক্রমিত-বাচ্য ধ্বনির সহিত অত্যন্ততিরস্কৃত-বাচ্যধ্বনির যোগে যে শ্রেণীটি পাওয়া যায়, অত্যন্ততিরস্কৃত বাচ্য ধ্বনির সহিত অর্থান্তরসংক্রমিত বাচ্যধ্বনির যোগেও আবার ঠিক সেই শ্রেণীরই উপস্থিতি হয়। ইহাদের মধ্যে একটিকে প্রধান এবং অপরটিকে অপ্রধানও বলা চলে

না, কারণ একটির অপ্রাধান্য স্বীকার করিলে, যেটিকে অপ্রধান মনে করা হইবে তাহাকে ধ্বনি না বলিয়া গুণীভূতব্যঙ্গ বলিতে হয়; এবং ফলে ধ্বনিবিশেষের সংযোগই স্বীকার করা চলে না। অতএব, দেখা যায়, উল্লিখিত ৫১ প্রকারের প্রত্যেকটির মধ্যে পুনরাব ৫১টি করিয়া শ্রেণী থাকা মোটেই সম্ভবপর নহে। প্রথমটি যদিও অবশিষ্ট ৫০টির সংমিশ্রণে এবং সংমিশ্রণ ব্যতিরেকে মোট ৫১ প্রকার হইতে পারে, তথাপি দ্বিতীয়টির বেলা সংমিশ্রণ-সংখ্যা এক কমিবেই। এইরূপে তৃতীয় হইতে ৫০তম পর্যন্ত ধ্বনিগুলির এক একটি করিয়া শ্রেণী কমিবার ফলে ধ্বনির মোট শ্রেণী সংখ্যা দাঁড়াইবে—১ হইতে ৫১ পর্যন্ত সংখ্যাগুলির যোগফলের সমষ্টি। পাঠকগণের সুবিধার জন্য একটি লৌকিক দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা সহজভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি।

মনে করুন—লবণ, মরিচ, হলুদ, ধনে এবং জিরা পাঁচটি মসল্লার সংমিশ্রণে আপনি একটি তরকারী প্রস্তুত করিলেন। ইহার পর যদি ঐ সকল মসল্লার বিভিন্নটির সংমিশ্রণে বিভিন্ন প্রকার তরকারী প্রস্তুত করিতে চাহেন, তাহা হইলে কি আপনি $৫ \times ৫ = ২৫$ প্রকারের বিভিন্ন সংমিশ্রণ ঘটাইতে পারিবেন? ভাবিয়া দেখুন—আপনি উহা পারিবেন না। আপনি যে সকল বিভিন্ন প্রকার সংমিশ্রণ ঘটাইতে পারিবেন, তাহাদের মোট সংখ্যা দাঁড়াইবে—এক হইতে পঁচ পর্যন্ত সংখ্যাগুলির যোগফলের সমষ্টির সমান; অর্থাৎ ১৫। প্রথমে লবণের সহিত মরিচ প্রভৃতি প্রত্যেকটি মসল্লারই এক একটি বিভিন্ন প্রকার সংমিশ্রণ ঘটিবে বটে; কিন্তু তাহার পর যখন মরিচের সহিত অবশিষ্টগুলির সংমিশ্রণ ঘটাইতে যাইবেন, তখন দেখিবেন ‘লবণ-মরিচ’ জাতীয় একটি শ্রেণী পূর্বের একটি শ্রেণী পূর্বের একটি শ্রেণীর সহিত অভিন্ন হইয়া যাইতেছে। এইরূপে হলুদের সহিত বাকী মসল্লাগুলির সংমিশ্রণের সময় দেখিবেন—‘লবণ-মরিচ-হলুদ’ এবং ‘মরিচ-হলুদ’ এই দুইটি শ্রেণী আর নূতন থাকিতেছে না। এইভাবে পরবর্তী প্রত্যেকটি সংমিশ্রণকালে এক একটি করিয়া সংখ্যা কমিতে থাকিবে। ধ্বনির ক্ষেত্রেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না—ইহাই আচার্য্য বিশ্বনাথের অভিপ্রায়।

বর্তমান লেখকের নিজ মত

যদিও যুক্তির দিক দিবা বিচার করিলে মনুষ্য ভট্টের উক্তি অপেক্ষা বিশ্বনাথের উক্তিই অধিক সারবত্তা দেখা যায়, তথাপি ধ্বনিগুণিকে উল্লিখিত প্রকারে অসংখ্য শ্রেণীতে বিভক্ত না করিয়া আমরা একটি নূতন পদ্ধতিতে ইহাদের শ্রেণীবিভাগ করিতে চাই। মংগলীত ‘ধ্বনিবিচারঃ’* নামক সংস্কৃত ভাষাময় (অপ্রকাশিত) গ্রন্থে আমার নিজস্ব পদ্ধতিতে ধ্বনিগুলির মধ্যে ১০০টি মাত্র শ্রেণী প্রদর্শন করিয়াছি। বর্তমানে উল্লিখিত শ্রেণীগুলিই বঙ্গভাষায় প্রদর্শন করিতেছি।

আমার বিবেচনায় ধ্বনিগুণিকে প্রথমতঃ শব্দশক্তি-মূলক এবং অর্থশক্তিমূলক ভেদে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় (জ)। কোথায় শব্দশক্তিমূলক এবং কোথায় অর্থ-শক্তিমূলক ধ্বনি হয়, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। শব্দশক্তি-মূলক ধ্বনিগুণিকেও দুইটি পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে : যথা—বস্তু এবং অলঙ্কার (ঝ)। বস্তুধ্বনির উদাহরণ ধ্বন্যালোকের আলোচনাকালে প্রদর্শিত হইয়াছে।

অলঙ্কারধ্বনির উদাহরণ, যথা—

“লোকমাত্ম মহাতেজাঃ মদন-বিজয়ী
ভোগিগণ-পরিবৃত-পার্কী-বল্লভ
বিপ্লবের ত্রাণকারী বিদিত জগতে।”

এখানে পার্কীবল্লভ নামক রাজা পার্কীবল্লভ (মহাদেব) সদৃশ এইরূপ একটি উপমালঙ্কার ধ্বনিত হইতেছে। কবিতাস্থিত বিভিন্ন শব্দের দ্ব্যর্থকতাই এইরূপ ধ্বনির কারণ।

অর্থশক্তিমূলক ধ্বনিগুণিকেও প্রথমতঃ চারিটি বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; যথা—(১) বস্তুদ্বারা বস্তু (২) বস্তুদ্বারা অলঙ্কার (৩) অলঙ্কারদ্বারা বস্তু এবং (৪)

* এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃক পি. আর. এন্স গবেষণার কার্যরূপে অমুমোদিত হইয়াছে।

(জ) শব্দার্থ শক্তিভেদে বাল্লভা ভজ্যতে যতঃ।

তেনৈব কাব্যমার্গেণ ধ্বনি বিভজ্যতে ধ্বনিঃ।

—ধ্বনিবিচারঃ।

(ঝ) বস্তুলঙ্কাররূপাচ্ছবশক্ত্যাক্রবো দ্বিবা।

—ঐ।

অলঙ্কারদ্বারা অলঙ্কার (ঞ)। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় এইগুলির উদাহরণ প্রদর্শনে বিরত রহিলাম।

উল্লিখিত চারিপ্রকার অর্থশক্তিমূলক ধ্বনি আবার তাহাদের কারণরূপ বস্তু ও অলঙ্কার প্রত্যেকটির বৈবিধ্য-বশতঃ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া মোট ৮টি শ্রেণীতে পরিণত হয়। কারণরূপ বস্তু ও অলঙ্কারের প্রত্যেকটি কবি-প্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধ এবং স্বতঃসম্ভবীভেদে দ্বিধা বিভক্ত হওয়ার ফলেই উল্লিখিত শ্রেণীগুলি সৃষ্টি হয় (ট)।

অর্থশক্তিমূলক উক্ত ৮ প্রকার ধ্বনির প্রত্যেকটি আবার অসংলক্ষ্যক্রম এবং সংলক্ষ্যক্রম ভেদে দুই ভাগে বিভক্ত হইতে পারে (ঠ)। এইরূপ বিভাগের ফলে যে ১৬টি শ্রেণীর সৃষ্টি হইল, তাহাদের প্রত্যেকটিকে পুনরায় অর্থাস্তরসংক্রমিত বাচ্য এবং অত্যন্ততিরস্কৃত বাচ্যভেদে দ্বিধা বিভক্ত করা যায় (ড)। এইভাবে প্রাপ্ত ৩২টি অর্থশক্তিমূলক ধ্বনির প্রত্যেকটি আবার পদগত, বাক্য-গত এবং প্রবন্ধগতরূপে তিনভাগে বিভক্ত হওয়ার ইহার মোট ৯৬টি শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে (ঢ)। ইহাদের সহিত শব্দশক্তিমূলক ধ্বনি দুইটির যোগে এযাবৎ আমরা মোট ৯৮টি শ্রেণী পাইলাম।

(ঞ) বস্তুনা বাচ্যতে বস্তু তেনৈবালঙ্কৃতিত্বা।

অলঙ্কারেণ বস্তু চ স এব চেতি দৃষ্টতে।

চতুর্ধা ভজ্যতে চৈবমর্থশক্ত্যুক্তবো ধ্বনিঃ ॥ —এ।

(ট) বস্তুলঙ্কারমংখ্যোযো কারণতঃ গতৌ হি বো।

ভিদ্যোতে তৌ পুনর্লোকে দ্বিধেতি দৃষ্টতে বুধৈঃ ॥

কবিপ্রৌঢ়োক্তি'সঙ্কটং স্বতঃসম্ভবহেতুনা।

তদ্ বৈবিধ্যাদ্ ধ্বনিচাপি দ্বিধা বিভজ্যতে পুনঃ ॥ —এ।

(ঠ) অসংলক্ষ্যক্রমো ব্যঙ্গঃ সংলক্ষ্যক্রম এব চ।

তদভেদাদর্থশক্ত্যুখঃ পুনর্বিভজ্যতে ধ্বনিঃ ॥ —এ।

(ড) অর্থাস্তরেষু সংক্রান্তে বাচ্যেহত্যন্ত তিরস্কৃতৈঃ।

দ্বিধা বিভজ্যতে তথ পুনরুক্তবিধো ধ্বনিঃ ॥ —এ।

(ঢ) কচিৎ পদে কচিদ্ বাক্যে প্রবন্ধে চ তথা কচিৎ।

বেন ভবত্যসৌ ব্যঙ্গস্তেন ভেদাঃ পুনঃ ॥ —এ।

শব্দ এবং অর্থ উভয়ের শক্তি হইতে উদ্ভূত আর এক প্রকারের ধ্বনি আছে। ইহা কেবলমাত্র বাক্যেই থাকিতে পারে; স্তবরাং ইহার আর অবাস্তর বিভাগ নাই (ণ)। এই শ্রেণীতে ধ্বনির যোগে ধ্বনিগুলিকে মোট ৯৯টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা গেল (ভ)।

উল্লিখিত ৯৯ প্রকার ধ্বনির দুই তিনটির সংযোগও কোন কোন বাক্যে দেখা যায়। এই শ্রেণীর মিশ্রিত ধ্বনিগুলিকে আমরাও 'ধ্বনিসঙ্কর' নামে আর একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে বলিয়াই মনে করি (প)। ইহার যোগে আমাদের স্বীকৃত ধ্বনিগুলি মোট ১০০টি শ্রেণীতে বিভক্ত হইল।

মাত্রট এবং বিশ্বনাথ যেভাবে ধ্বনিগুলির মধ্যে অবাস্তর বিভাগ কল্পনা করিয়াছেন, সেইভাবে যদি আমাদের স্বীকৃত উল্লিখিত ১০০ প্রকার ধ্বনির মধ্যে অবাস্তর বিভাগ কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে মন্মটাচার্যের পদ্ধতি অনুসারে ইহাদের মোটসংখ্যা দাঁড়াইবে ৩৯৩০৩ (৯৯ × ৯৯ × ৪ + ৯৯) এবং বিশ্বনাথের পদ্ধতি অনুসারে ইহাদের মোট সংখ্যা হইবে ১২৮৯৯ (১ হইতে ৯৯ পর্যন্ত সংখ্যাগুলির যোগফল × ৪ + ৯৯)।

আমরা এইরূপ অসংখ্য শ্রেণী স্বীকারের পক্ষপাতী নহি। ৩ প্রকার সঙ্কর এবং ১ প্রকার সংসৃষ্টির যোগে মিশ্রধ্বনিগুলিকে চারিটি পৃথক্ শ্রেণীতে বিভক্ত না করিয়া আমরা ইহাদিগকে একটিমাত্র শ্রেণী হিসাবে গণনা করাই যুক্তিযুক্ত মনে করি। এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা মৎপ্রণীত 'ধ্বনিবিচারঃ' এবং 'কাব্যপ্রভাকরঃ' নামক অপ্রকাশিত সংস্কৃত গ্রন্থ দুই-খানিতে রহিয়াছে।

(ণ) শব্দার্থোভয়শক্ত্যুখো বাক্যে স্তাদপরো ধ্বনিঃ। — এ।

(ভ) নবমবতিদোপমঃ ধ্বনিস্তেন প্রকীর্তিতঃ। এ।

(প) কচিদন্তোত্তমাক্ষর্যমেবাং লক্ষ্যেণ দৃষ্টতে। এ।



প্রেতাত্মা

অনুবাদক : শ্রীজগদ্বন্ধু দাস

[১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে লোয়ার সিলেসিয়ার অন্তর্গত বৃহত্তর গ্লোগতে আরনল্ড্ ভাইগ্ জন্মগ্রহণ করেন। লেখক তাঁর যৌবনকালটা কাটান অধ্যয়নে। তাঁর প্রথম লেখা প্রকাশ হয় ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে হইতে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মান-বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে যোগ দেন। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে রাজনৈতিক কারণে মিষ্টার ভাইগ্ জার্মানী ত্যাগ করেন। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে তিনি নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। তের বৎসর পরে জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক দল তাঁকে পশ্চিম বার্মিনে সাদরে ফিরিয়ে আনেন। সেই সময় থেকে সুনামগ্রন্থি ও সুনামগ্রন্থি হিসাবে তিনি নানারূপ সম্মানে বিভূষিত হন :—জার্মান আকাদেমি অব আর্টস্-এর প্রেসিডেন্ট পদে নিযুক্ত হন; আর্টস্ ও লিটারেচার-এর স্নাতক প্রাইজ লাভ করেন, প্রথম পর্যায়; পশ্চিম জার্মানীর পিপলস্ চেম্বার-এর সদস্যপদে নির্বাচিত হন; অল-জার্মান পেন ক্লাব-এর প্রেসিডেন্টের পদ বিভূষিত করেন। ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে আন্তর্জাতিক শান্তি ও স্বাধীনতার উন্নতিবিধানে তাঁর একাগ্র-চিন্ততার জন্য লেনিন প্রাইজ লাভের দ্বারা তিনি শান্তিকামী জগতে সমাদৃত হন। দীর্ঘ প্রকাশ বৎসর ধাবৎ তিনি লেখনী প্রয়োগ করেন। তাঁর লিখিত ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধের জন্য বিশ্বের সাহিত্যিক জগতে তাঁর আসন অনেক উচ্চে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর-ই রচিত একটি ছোট গল্প “Apparition”-এর বঙ্গানুবাদ এই “প্রেতাত্মা”। সংস্কারাচ্ছন্ন প্রাচীন জার্মানীর এ একটি অস্বাভাবিক কাহিনী—লেখক]

শীতকাল। কার্পেথিয়ার পূর্ব অঞ্চল। এখানে এ সময়ে শীতের প্রকোপ সবচেয়ে বেশী। পার্বত্য দেশ। সমতল ভূমি থেকে হঠাৎ উচু হয়ে উঠেছে পর্বতগুলো। ঘন লোমে ঢাকা রোমন্থনকারী মেঘ এ দেশের সম্পদ। ছোট বড় গ্রাম, গোলাবাড়ী—এক একটি বিন্দুর মতো সমতলভূমিতে অবস্থিত। পর্বতের পাশ দিয়ে রেখার মতো নেমে এসেছে সরু সরু বনভূমি। আর আছে সেখানে মাঠ; বহুকাল আগেই শ্লোভাকিয়া দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন। এই সব মাঠ, এই সব বনভূমি,—এক একটি গ্রামকে, এক একটি গোলাবাড়ীকে অস্পষ্ট হতে রেখেছে আলাদা করে।

আলোচ্য অঞ্চলটি বহুদূরে—আলোচ্য বিষয়টিও পূরাপুরি চার শ’ বছর আগেকার। অলৌকিক ঘটনা, মহামানব ও রাক্ষস—এই সব-ই ছিলো তখনকার দিনে গল্প-গুজবের সাধারণ বিষয়। আর ভয় বলতে ছিলো সংস্কারজনিত ভয়; তবে সরকারী কর্মচারী, সংবাদপত্র, কল-কব্জা, টেলিফোন, রেডিও ইত্যাদিতে এ রকমের ভয় থাকারও যে একটা দরকার না ছিলো, তা নয়।

এ অঞ্চলের অধিবাসিগণ সবাই ধর্মপরায়ণ। ইহুদীদের বিশ্বাস তাদের নিজেদের ধর্মকাহিনীতে—শ্লোভাকেরা বিশ্বাস করে খৃষ্টীয় ধর্ম-কাহিনী; শুধু মুখের কথায় নয়, মনের ভক্তিতেও বটে। তাদের পূর্বপুরুষেরা তাদের

জন্মে লিখিতমতে বা মৌখিকস্বত্রে যে সব রীতিপ্রথা রেখে গেছেন, সে সব তারা পালন করে। ওই অঞ্চলে তারা খুব গরীব; তবে ইহুদী চাষীদের চেয়ে শ্লোভাক চাষীদের অবস্থা একটু ভালো। কিন্তু এই দুই শ্রেণীর অধিবাসিদের নিরপেক্ষ থাকবার উপায় ছিল না—যেমন সিংহ-মুখিক উপাধানে একে অপরকে নির্ভর না করে থাকতে পারে নি।

শীতের এক সন্ধ্যাবেলা। অতিশয় ঠাণ্ডা। গরীব অরুণা। সকাল সকাল কুঠীর থেকে বেরিয়ে পড়লো রিফ্কি লিয়া। গেলো সে এক বনের ভেতর। এ বনে সেদিন গভীর তুষারপাত হয়—তুষারও অব্যাহত অবস্থায় পড়ে থাকে সেখানে। রীতি অনুসারে ইহুদী মেয়েরা সেখানে যায় শ্রোতের জলে অবগাহন স্নান করতে—ত্রিশদিন অন্তর অন্তর। রিফ্কি লিয়ার সঙ্গে ছোট একখানা কোদালি। মাছবের দৃষ্টির আড়ালে বনের এক প্রান্তের ধারে পরিচিত একটি স্থানে গিয়ে আরম্ভ করলো সে ব্যস্তভাবে বরফ খুঁড়তে; আর নিজেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার জন্য লেগে গেলো সে নীচের বরফ চাংড়া ভাঙতে। বরফ চাংড়া মাথায় নিয়ে স্নানীতল ও স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ জলরাশি আসতে থাকে পর্বত থেকে। বরফের ছাউনি হতে হঠাৎ মুক্ত হয়ে, ঠাণ্ডা বাতাসের সংস্পর্শে এসে সেই জলরাশি তখন বাষ্প

হতে থাকে। পাছে কোন লোক ঐ পথে যাবার বেলায় তাকে দেখে ফেলে, সেই ভবেই রিফ্কি লিয়ার দেহ তখন কস্পিত।

প্রদোষ কাল। তখনও চন্দ্র পীতবর্ণের এবং আকাশের নিম্নভাগে। বৃষ্টির নগ্ন শাখার ভেতর দিয়ে জ্বলছিলো শীতকালের উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলো...। তারপর, যে ভয় তার মনে উদয় হচ্ছিলো সেই ভয়-ই তাকে পেয়ে বসলো। গ্রামের সরাইখানা হতে কৃষকেরা তখন সোচ্ছাত্ত্র বনের ভেতর দিয়ে বাড়ী ফিরছে। তাদের কণ্ঠস্বর চুপে গিয়ে রিফ্কি লিয়ার কানে পৌঁছালো:

—‘ওঃ ভগবান—এরা যে মানুষ! তাও তো ধায়ে কাছে! হয়ত এরা মদ পান করেছে—তাই তারা গান ধরেছে। লোকগুলোর প্রকৃতি ভালোই হবে; তবে চায়ের আসরে একটু-আধটু রসিকতা করতেও হয়ত তারা প্রস্তুত।’—সম্ভ্রাসের চীৎকার সংযত করলো রিফ্কি লিয়ার। ক্রকের প্রান্তভাগটা গুটিয়ে এমনভাবে সে মাথায় দিলো, লোকে যাতে তাকে চিনতে না পারে। তারপর সোনালি রংয়ের নিম্প্রত চাঁদের আলোয় তুষারের ভেতরে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে সে রওনা হলো বাড়ীর দিকে—তার সর্বাঙ্গ সাদা, অদ্বুত তাঁর চেহারা! রিফ্কি লিয়ার এড়িয়ে গেলো বটে লোকগুলিকে; তবে দেহ তার কস্পিত, অন্তঃকরণ তার স্পন্দিত। সরাইখানা পরিবেষ্টন করে, কয়েক মিনিট পরেই সে গিয়ে পৌঁছালো তার কুটারে...

চারিদিকে বরফ। বরফ যেন যাহুমন্ত্রে গলে জল হচ্ছে। কালো জল বাষ্প হয়ে উঠছে ওপরে। জলের ধারে কৃষক তিনজন তখন নির্বাক দাঁড়িয়ে। তারা কি দেখলো! দেখলো তারা একটি সুন্দর সাদা আকৃতিকে গাছের ভেতর দিয়ে চলে যেতে।

—‘হয়ত ইনি-ই পরিজ্ঞাপকারীর পুণ্যময়ী মা, ভার্জিন মেরী—এসেছেন গ্রামবাসীদের ভালো কসলের আশ্বাস দিতে। তাদের ভীষণ অভাবে এসে উপস্থিত হয়েছে ভগবানের দয়্যা। তোমাদের টুপি খুলে ফেলো; বনের ভেতরে বরফের নির্জনতায় আধিভৌতিক একটা ব্যাপার ঘটেছে। প্রকৃতপক্ষে, এখনও আমাদের চোখের

সামনে ধূপের ধোঁয়ার মতো বাষ্প উঠছে।’—তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো। পরিজ্ঞাতার খেতা, মনোরমা, পুণ্যময়ী ভার্জিন মেরীকে তারা দেখেছে বনের ভেতর দিয়ে চলে যেতে। সেই জলরাশির চারিদিকে বরফের ভেতরে তাড়াতাড়ি গাছের ডাল পুতে সেই জায়গাটাকে তারা চিহ্নিত করে রাখলো। এখানে যে আধিভৌতিক ব্যাপার ঘটতে তারা দেখেছে, সেই ঘটনাটি অপরাপরের কাছে তারা পরদিন সকালবেলায় বিশেষ করে পরের রবিবারে আগ্রহের সঙ্গে বললো। ভার্জিন মেরীর আগমনে তাঁর উদ্দেশ্যে প্রণিপাত করতে, নতজাহু হয়ে তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে কোনরূপ ক্রটি তারা করলো না।

জলাশয়টি আবার জমাট বেঁধে গেলো, বরফে ছেঁবে ফেললো। বহু দৃষ্টি লোক ও মেয়েছেলেরা সেখানে যেতে লাগলো। ধর্মবিশ্বাসীদের মধ্যে একজন ভার্জিন মেরীর এবং তাঁর প্রিয় পুত্রের একখানা চিত্র টাঙ্গিয়ে দিলো নিকটস্থ একটা বৃক্ষে। এর পরে গির্জা থেকে এলো কাগজের ফুল। বৃষ্টিতে চিত্রখানির কোন ক্ষতি যাতে না হয়, সেজন্য তৈরী হলো সেখানে ছোট্ট একটা ছাউনি। অল্পরক্ত কৃষকেরা এবং সহরবাসিরা ক্রম-বর্ধমান সংখ্যায় যেতে লাগলো সেখানে তীর্থপর্যটনে। পুরোহিতদের কানে গিয়ে এ সংবাদ পৌঁছালো। তাঁরাও কৃষকদের মতোই ছিল সরল। ধর্মবিশ্বাসীদের মধ্যে অনেকেই সামান্য সামান্য কষ্ট হতে অব্যাহতি পেতে লাগলেন—কেউ কেউবা এই অদ্বুত ঘটনায় আনন্দ ও শাস্ত্য পেলে। তাই, ঘটনাটিকে তাঁরা একেবারে অবিশ্বাস করতে পারেন নি।

সেই বছর বসন্তকাল অনেক আগেই এসে উপস্থিত হলো। স্বর্ঘের উত্তপ্ত রশ্মি মাঠগুলো ছেয়ে ফেললো। স্বর্ঘের রাণী ভার্জিন মেরীর প্রতিশ্রুতিতে আনন্দিত হয়ে কৃষকেরা আশ্বস্তমনে জমি চাষ করতে লেগে গেলো। ইহদীরা যথাসময়ে বনের মধ্যে মন্দির-স্থাপনের সংবাদ শুনতে পেলো। খুবই আশ্চর্যের বিষয়, মন্দিরের ভিত্তি যে কোথায় স্থাপিত হবে এ বিষয় সকলের আগে জেনেছিলেন—রিফ্কি লিয়ার ও তার স্বামী...

‘বেন্জামিন সব সময়েই খুব সজাগ’—ইহুদীরা বলাবলি করতো এবং তাঁর পেছন পেছন ছুটতো। গ্রীষ্মকাল আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে বেন্জামিন ও তাঁর জী তীর্থযাত্রীদের কাছে রুটি, বিস্কুট, লেমনেড্ এবং মোমবাতি বিক্রী করতেন।

পবনবর্তী শরৎকাল। যথেষ্ট ফসল ফলেছে। ভার্জিন মেরীর পুণ্যময় পরিদর্শনের আরম্ভরূপে তথায় একটা গির্জার ভিত্তি তৈরী হয়েছে। শীতকাল আরম্ভ হবার আগেই গির্জার উৎসর্গের জন্ত কোসাইয়ের ধর্মযাজক সেখানে এসেছেন। স্থানীয় ধর্মযাজকের মতামত সব তিনি শুনলেন। শুনে তাঁর মনে যে যথেষ্ট সন্দেহ না হলো, তা নয়। এসব মতামত প্রথমে অস্বতীকর বলে মনে হলেও ক্রমে ক্রমে দেখা গেলো, লোকেরাও সেই সব মন্তব্যের পক্ষপাতী। মোক্ষলাভের পথ অনেক; কোন পথকেই অবলীলাক্রমে উপেক্ষা করা চলে না—আবার মনের নীচতার কারণে আধ্যাত্মিক প্রয়োজনীয়তাকে বাদ দেবার মতো সময়ও এ নয়। নিশ্চয়ই কোন অজুত ব্যাপার ঘটে থাকবে—লোকদের এই বিশ্বাস—এই বিশ্বাস—ই তখন প্রবল।

ধর্মযাজক চাক্ষুষ দেখলেন, কৃষকদের মুখ ঠাণ্ডায় বিকৃত ও ধুলরবর্ণ হয়ে গেছে—তাদের চোখ বিষয়ে বিস্ফারিত হয়ে পড়েছে। প্রকৃতপক্ষে তারা যে কি দেখেছিলো, এ বিষয়ে তাদের প্রশ্ন এবং জেরা করলে তারা জোর গলায় বলতো যে শীতকালে ওই বনের ভেতর দিয়ে যিনি গিয়েছিলেন তিনিই স্বয়ং ভার্জিন মেরী। রাজিবেলাষ শিশিরযুক্ত উষ্ণ জলাশয়ের ওপর দিয়ে বাষ্প উঠতে তারা দেখেছিলো, আর কিছুই তারা দেখে নি। নাস্তিকেরা হাসি ভামাসা করে করুক, দোষ ধরে ধরুক, যত রকমের ব্যাখ্যা করতে চায় করুক;—ওই যে ধর্মযাজক, উনি

যদি আন্তিমূলক মনোভাব সমর্থন করবার ভবে প্রেতাশ্বার দৃশ্যটির ওপর কর্মজীবনের, আধ্যাত্মিক জীবনের পবিত্রতার গুরুত্ব আরোপ করতে রাজী না হন তবে বুঝতে হবে ধর্মযাজক এসব লোককে পথে আনতে অক্ষম। সাধারণভাবে গান্ধীর্থের সঙ্গে এসে ধর্মযাজক দাঁড়ালেন তাদের সামনে—লাটিন ভাষায় ভগবানের স্তুতিগান করতে লাগলেন—আর লাগলেন যাতে দেশের এবং দেশের লোকের সাধারণ ধর্মবিশ্বাসের মঙ্গল হয় সেজন্ত ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে।

ইউরোপের পূর্বভাগে বহুদূরে কোসাইস অঞ্চল অবস্থিত। সে-সময়কার চাল-চলন থেকে এ জায়গাটা কয়েক শ’ বছর পেছনে। ‘খুব বেশীদিন হয় নি, এ অঞ্চলে ভীষণ যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছে। এ জায়গার ইহুদীরা একত্রিত হলে পরস্পর বলাবলি করতে থাকে যে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, বিশেষভাবে তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য এতটা উন্নত হয়—এইটাই শুধু তাদের মঙ্গলের বিষয়।

তবে প্রেতাশ্বার প্রকৃত ঘটনাটা কি, তা’ কি কোন তীর্থযাত্রী প্রকাশ করে বলেছে? হ্যাঁ, বলেছে—ভিন্ন রকমের একজন তীর্থযাত্রী। ইনি যে একজন বিখ্যাত বিদ্বান ও রাজনীতিজ্ঞ, একথা বলা যেতে পারে। ইহুদীগণ কেন এবং কিভাবে তাদের মনের ইচ্ছা প্রকাশ করবে, এই বিষয়ে শিক্ষা দেবার জন্তই ইনি এগিয়েছিলেন প্রধান সহর ও রাজধানী প্রাণ্ থেকে কোসাইসে। এঁর কাছে বিশ্বস্তভাবে ঘটনাটির উদ্ঘাটন করেন রিফ্কি লিয়ার স্বামী বেন্জামিন। তবে রিফ্কি লিয়ার স্বামী বেন্জামিনের পানের মাত্রাটা সময়ে সময়ে খুব বেশী হবে যেতো; তাই, তিনি বলতে বাধ্য হতেন—আবোল-তাবোল।



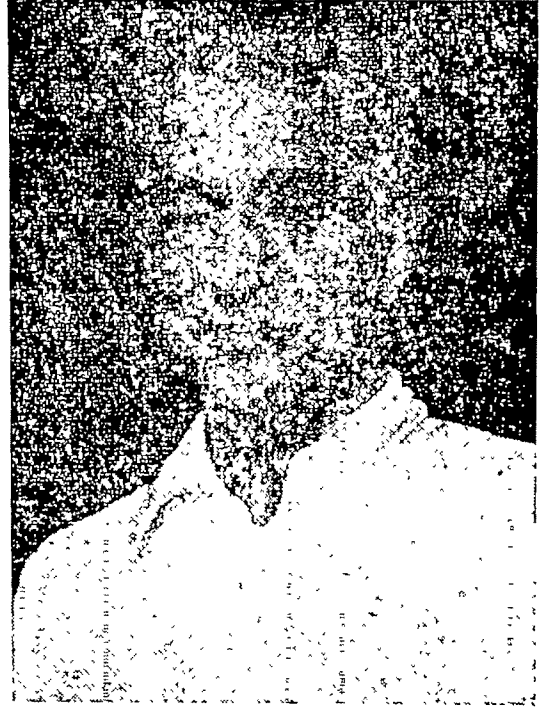
কর্মযোগী সূর্যকুমার

শ্রীশুশীলপ্রসাদ সর্বাধিকারী বার-এট-ল

চারি যুগের অধিক বঙ্গদেশ ও বাঙালীর সেবা কাম-
মনোবাক্যে করিয়া শীর্ষশিল্পপতি স্বনামধন্য সূর্যকুমার বহু
টির অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। বঙ্গশিল্প ক্ষেত্রে বাঙালার
মাথার মনি ছিলেন সূর্যকুমার। অতিবড় শত্রুও বাঙালীর
মগিহার। অবস্থায় গভীর ব্যথা অনুভব করিবে নিশ্চয়ই।
গুণবানের গুণ স্বরণে ইহার অন্তথা ঘটিতে পারে না।

সূর্যকুমারকে জানিবার মত জানার সৌভাগ্য আমার
হইয়াছিল। সাধারণ গৃহস্থ ঘরের সম্মান সূর্যকুমার।
লেখাপড়াতেও মারকাট বড় তিনি করেন নাই। সেই
সূর্যকুমার অবাধে গড়িয়া তুলেন তিন চারিটা নামজাদা
মিল। তাঁর কোন গুণনায় ইহা সম্ভবপর হইল, ইহাই
বুঝিবার কথা।

“মা নিবাদ” শুনিয়াই রত্নাকর বাল্মিকী হইয়াছিলেন।
কেমন করিয়া নিঃসম্মল, অর্দ্ধশিক্ষিত সূর্যকুমার বাঙালার
বঙ্গশিল্পের শীর্ষস্থান অধিকার করিলেন! “মা নিবাদ”-রূপ
শোকগাথাই ইহার মূল। কার্জনী প্রচণ্ড আঘাতে সোনার
বাংলা দ্বিধা বিভক্ত। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের শোকোচ্চাসে
বাঙালী ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ বন্ধপরিকর। কার্জন
বাঙালীকে ভাতে মারিবার উদ্দেশ্যেই বাঙালি হইতে
বিহার, উড়িষ্যা, আসাম পৃথক করিয়া দেওয়া এবং খাস
বাংলাকে দ্বিধা বিভক্ত করায় সুরেন্দ্রনাথ (বাহার
নামকরণ যেতাদেবাই ‘Surrender Not’ বলিয়া)
দীক্ষিত করিল বাঙালীকে স্বদেশীমত্রে। মন্ত্র ফলপ্রসূ
করাইতে কৃষ্ণকুমার মিত্র ইঙ্গিত করিল সর্বতোভাবে
বিদেশী বর্জন করিতে। সুরেন্দ্রনাথ গর্জন করিয়া
কার্জনী পক্ষকে শাসাইল, দেখা যাউক তোমরা আমাদের
ভাতে মার না আমরা তোমাদের ভাতে মারিব। সূর্য-
কুমারের কাণে ইহাই ‘মা নিবাদ’রূপে প্রতিধ্বনিত
হইল। দিব্যভাবে সম্মোহিত হইল সূর্যকুমার। ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষা দিবার সময় সূর্যকুমারের
সমাগত প্রায় ঠিক সেই সময়ে ‘মায়ের দেওয়া মোটা
কাপড় মাথায় তুলে-নেরে ভাই—’ দৈববাণী সূর্যকুমারকে
অভিভূত করিল। ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল সূর্যকুমার



সূর্যকুমার বহু

বিশ্ববিদ্যালয়ী তত্ক্ষণাত লোভ—বন্ধপরিকর হইল মায়ের
ডাকে সাড়ার মত সাড়া দিতে।

রওনা হইল সূর্যকুমার বঙ্গশিল্পে জ্ঞানার্জনের জন্য
বোম্বাই অঞ্চলে। কপর্দকহীন হইলেও উৎসাহের বস্ত্রায়
ভাসিয়া চলিল মহামন্ত্রবলে। বোম্বায়ে উপযুক্ত শিক্ষা
গ্রহণান্তে অনায়াসে স্বদেশের বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের লম্বু
হইতে সমান দক্ষতার সহিত সম্পাদনে সমর্থ হইল সূর্য-
কুমার। আত্মবিশ্বাস উপজিল সূর্যকুমারের হৃদয়ের
কাণায় কাণায়। মন ছুটিল কর্মীর জন্মভূমির প্রাঙ্গণ
সুশোভিত করিতে। বাহিরের আকর্ষণ টানিয়া রাখিতে
সূর্যকুমারকে পারিল না। কাঁপাইয়া পড়িল মাতৃভক্ত
জন্মভূমির ক্রোড়ে। ইতিহাসপ্রখ্যাত ঢাকায় নূতন
ইতিহাস রচিত হইল। ঢাকার জামদানী প্রভৃতির পাদ-
দেশে স্বেচ্ছা হইল এমন শিল্প বাহার প্রতাপে ধরধরি

কম্পাদিত হইল ম্যান্‌চেষ্টার। একদা কপর্দকহীন স্বদেশের শত শত কপর্দকহীনকে ভারে ভারে কপর্দক যোগাইবার প্রস্রবণ হইল। শীতলক্ষার শীতলতার স্বচ্ছন্দে গড়িয়া উঠিল স্বর্ধ্যকুমারের অপক্লপ কপর্দবেদী।

মনে পড়ে স্বদেশী যুগে সকলেরই মুখে “ঢাকেশ্বরী”র কথা। ঢাকা বাসকালে মিল দেখার জন্ত আমাকে নাগাড় তাগিদ করিতে থাকেন কর্তৃপক্ষ। মোক্ষম সময়ে সে অসুরোধ রক্ষা আমি করি, পাকিস্থানের ইণ্ডিয়ান হাই কমিশনারকে সঙ্গে লইয়া। শীতলক্ষার সৈকতে মিল অবস্থিত স্মরণীয় কয়েক একর ভূমি বেঠন করিয়া। পরিপাটি কানন তাহার শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। তাহার বেশ একটা বৃহদংশ মিলকর্মীদের স্বেচ্ছা বাসস্থানে পরিণত। তৎসংলগ্ন এক স্থানে কর্মীদের জন্ত আধুনিক আয়োজন সমন্বিত একটি যথাযোগ্য স্বাস্থ্য-নিকেতন। নিকেতন পরিদর্শনার্থ চিকিৎসাদি হামেহাল হাজির।

মিলের বিস্তৃত ভূখণ্ডে সমরোপযোগী কৃষিকার্য্য অবিরাম গতিতে চলিছে ও তার উপসঙ্ঘ ষোল আনা উপভোগ করে মিলকর্মীরা। খেলাধুলা ও আমোদ প্রমোদেরও স্বেচ্ছা ব্যবস্থা করিয়া রাখা হইয়াছে। সমগ্র স্থানটির এক প্রান্ত হইতে অল্প প্রান্ত পর্যন্ত সদাসর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—দেবতা আস্থানের প্রস্তুতিস্বরূপ যেন সতত শুচিচক্ৰ। সব দেখিয়া শুনিয়া তাহা উপভোগ করিতে করিতে হাই কমিশনারকে বলিলাম, “কর্মীদের সর্বতোভাবে সুখ-সমৃদ্ধি সাধনের উদ্দেশ্যে এমন নিখুঁত আয়োজন ইহার পূর্বে আর কোথাও দেখিয়াছেন কি? দৃঢ় স্বরে তিনি বলেন, ‘না’। জ্ঞানান তিনি, ‘এখানে আসিবার সুযোগ পাইয়া ধন্ত হইলাম আমি। ইহার জন্ত মিল কর্তৃপক্ষ’ বটেই। সর্বাধিকারী মহাশয়ের কাছেও কৃতজ্ঞ আমি।’ কর্মী স্বর্ধ্যকুমার, এইভাবে মিল গড়িয়া তুলিয়াছেন তিন তিনটি। তাঁর নবতম মিল আসানসোলে স্থাপিত।

কাগজে-কলমে, বক্তৃতামঞ্চে বা রেডিওতে দেশ-প্রাণতার চেউ বহিয়া যাইতেছে আপামর কাল। ইহার কোনটির সংসর্গে স্বর্ধ্যকুমার বড় একটা আসেন নাই। তিনি ছিলেন খাঁটি স্বদেশী, খাঁটি বাঙালী। বাঙালীর

সৌভাগ্য চিন্তাই ছিল তাঁহার ঐকান্তিক ধর্ম। মহতাদর্শে আস্থাবান, সহজ সরলভাবেই আদর্শের অনুসরণ করিয়াছেন জীবনভোর।

স্বগ্রামের নানাদিকে উন্নতিকল্পে পরিশ্রমের অবধি তিনি রাখেন নাই। প্রায়ই গ্রামভিত্তির গমনাগমন তাঁহার ছিল, বহুবিধ কাজ সহরে ফেলিয়াও স্বগ্রামে যাইবার সুযোগ করিয়া লইতে কখনও তিনি ইতস্ততঃ করেন নাই। দেবীপূজা, অর্দ্ধাঙ্গিনীর বাৎসরিক ক্রিয়া-কর্মাদি গ্রামবাসীকে লইয়া সম্পাদিত হইয়াছে স্বগ্রামে সাড়ম্বরে। গ্রামের শুভান্ততে ঐকান্তিকতার কারণে তথাকাব সর্বজনশ্রদ্ধায় তিনি হ’ন।

বিপত্নীক স্বর্ধ্যকুমার হ’ন বহু পূর্বে। বিপত্নীক হওয়াতে সন্তানাদি সম্বন্ধে পিতাকে মাতার কর্তব্য করিতে হয় বহুরূপে বহলাংশে। কস্তাদির বিবাহ সংস্কারাদি ত’ বটেই, পুত্রদ্বয় সুনীলকুমার ও অনিলকুমারের উচ্চ আদর্শাদিতে সবিশেষ আস্থা ও ব্যবসায়াদি বিষয়ে তাঁহাদের অনুপূর্ণতা হইতে সকলেই বুঝিবে, পিতার কর্তব্য স্বর্ধ্যকুমার কিভাবে পালন করিয়াছেন। আদর্শ স্বামী, আদর্শ পিতা ও আদর্শ আত্মীয়রূপে স্বর্ধ্যকুমার নগণ্য হ’ন। তাঁহার পরলৌক্যগমনের কয়েকদিন পূর্বে স্বর্ধ্যকুমাররূপ দেবদর্শনে আমি যাই। যাইয়া শুনিলাম তাঁহার মুখে বাঙালীর কথা, বাঙালীর শুভান্ততের চিন্তা। হায় বাঙালী কি হিতৈষী যে হারায়েছে! স্বর্ধ্যকুমারের বিয়োগে পিতৃহীন হইল না শুধু সুনীল ও অনিল। পিতৃহীন হইল সুস্থ বাঙালী মাজেই। জ্ঞান, বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, ব্যবসায় প্রভৃতি যে কোন ক্ষেত্রেই হউক বাঙালীর মনীষার সংবাদে স্বর্ধ্যকুমারের আনন্দের সীমা পরিসীমা থাকে নাই, গর্বে তাঁহার বুক ভরিয়া গিয়াছে। আবার বঙ্গ-বিভাগের ফলে স্বজাতির দুঃখ-দুর্দশায় দেখিয়াছি প্রাণ তাঁহার আকুলি-বিকুলি করিবা কাঁদিয়া উঠিয়াছে। তাহাদের দুঃখ দুর্দশা যথাসম্ভব দূর করিবার চেষ্টায়, অক্লপন হস্তে অর্থ সাহায্য বা আশ্রয় দান করিবার বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ বোধ তিনি করেন নাই। রাজনীতির দার দিয়াও কখনও স্বর্ধ্যকুমার যান নাই। তবে পূর্বে পাকিস্থানে যখন দুইটির বঙ্গবিভাগের প্রায় সঙ্গে

সঙ্গে হিন্দুর বিরুদ্ধে তীব্র নৃত্য আরম্ভ হইল, ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনারের সহযোগিতায় নির্ধাতিত হিন্দুর রক্ষার্থে যে আয়োজন করা হয় সূর্য্যকুমার অর্থে ও সামর্থ্যে তাহার পরিপূষ্টি সাধন করিতে দ্বিধা বোধ করেন না। হিন্দু মহাসভার (ঢাকা কেন্দ্রের) সভাপতিত্বপেও বিরাজ করেন তিনি কয়েক বৎসর।

১৯৫২তে মস্কোয় অমুষ্ঠিত International Economic Conference and Industrial Development of the Continent and the U.K.তে একমাত্র বাঙালী যিনি নিমন্ত্রিত হ'ন, তিনি হইতেছেন সূর্য্যকুমার বসু। সূর্য্যকুমারের এ স্থানে বসিয়া বাঙালীকেই সম্মানিত করে। এখানে সূর্য্যকুমারের অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় মাত্র প্রদত্ত হইল।

স্মারক

জন্ম—২৩ ডিসেম্বর ১৮৮০, ঢাকা বিক্রমপুরের, টাংবারি গ্রামের রাউথভোগে।

পিতার নাম—রামগোপাল বসু, তালুকদার। সূর্য্যকুমার পিতার ষষ্ঠ সন্তান।

শিক্ষা—বাল্যশিক্ষা গ্রাম ও গ্রামের সন্নিকটবর্তী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। কলিকাতার • উর্দু কলেজ, বিহার জাশহাল কলেজ, ভিক্টোরিয়া কলেজ কুমিল্লা, ঢাকা কলেজ।

বঙ্গভঙ্গ ও সূর্য্যকুমার—১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ। বাংলার স্বদেশী আন্দোলন ও তাহার ফলে কলেজ ত্যাগ করিয়া 'স্বদেশী' করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়।

বোম্বাই যাত্রা—জাপানে বঙ্গবরন শিক্ষা করার ঐচ্ছিক্য পরিণত হয় সে বিদ্যা বোম্বাই সহরের মিলে আয়ত্ত করিতে। আমেদাবাদের কেশবলাল যেটার আহুকূলে তথায় মিলবন্ত্র বরন শিক্ষা সমাপ্ত হয় ষষ্ঠাসময়ে।

১৯০৯—বোম্বাইয়ের শিক্ষা শেষ হইলে, সূর্য্যকুমারের বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলে যোগদান ও মিলের কার্যে

কর্তৃপক্ষের নিকট সুখ্যাতি অর্জন ও মিলের উইভিং মাষ্টার ও সহকারী মিল ম্যানেজারের দায়িত্ব গ্রহণ।

১৯২২—কবেক বৎসর বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের কার্যে উচ্চাঙ্গ-ভাবে করিয়া ঢাকায় ঢাকেশ্বরী মিলের জ্যেষ্ঠ ডিরেক্টররূপে মিল রেজিস্ট্রী ধরণ অনাথবন্ধু গৃহ প্রভৃতির সহযোগিতায়।

১৯২৪—নারায়ণগঞ্জের তিন মাইল উত্তরে শীতলক্ষা সৈকতে মিলের জন্ত ভূমি ক্রয়।

১৯২৬—মৈমনসিংহ-মহারাজা কর্তৃক মিলের ভিত্তি স্থাপন।

১৯২৭—মিলের কার্য্যারম্ভ।

১৯৩৯—ঢাকেশ্বরী মিলের সম্মুখে নদীর অপর পারে 'ঢাকেশ্বরীর' দ্বিতীয় ইউনিট স্থাপিত হইয়া মিহি ধুতি শাড়ীর কার্য্যারম্ভ। চিত্তরঞ্জন কটন মিলস্ ও লক্ষ্মীনারায়ণ কটন মিলস গঠন ও চালুকরণে সূর্য্যকুমারের অবিস্মরণীয় সহায়তা। ভেঙে-পড়া আদর্শ মিলকে জুড়িয়া তোলা ও 'ঢাকেশ্বরীর' অঙ্গাদীকরণ।

১৯৩৮—এর মধ্যে ঢাকেশ্বরীর দুই ইউনিটের মোটা ও মিহি বস্ত্রাদি দেশ ছাইয়া ফেলে। ইজিপটিয়ন কটন বহুলভাবে ব্যবহৃত হইতে থাকে। ১১,৪৫০ স্পিন্ডল ও ৩০০ লুমে হয় কার্য্যারম্ভ—তাহা টানিয়া তোলা হয়, ৩০,৪৪০ স্পিন্ডল ও ৮৪০ লুমে। দুই ইউনিটের মোট কার্য্যাকরী অবস্থা দাঁড়াষ ৫২০০০ স্পিন্ডল-এর উপর এবং ১৩০০০ লুমে প্রতিযোগিতায় 'ঢাকেশ্বরী' তখন ভারতের যে কোনও মিলের সহিত পাল্লা দিতে সমর্থ।

১৯৩০—বঙ্গ বিভাগের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যকুমারের দূর-দর্শিতায় আসানসোলে স্থাপিত হয় ঢাকেশ্বরীর তৃতীয় ইউনিট। এই ইউনিটে আছে ২২০০০ স্পিন্ডল ও ৪০৪ লুম।

১৯৫২—মস্কোতে আন্তর্জাতীয় ইকনমিক অমুষ্ঠানে বিশেষ আস্থানে যোগদান।

পরলোকগমন—১৪ই জুন ১৯৬৩।

ভক্তযোগী রসিকবিহারী

আচার্য্য শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

(চার : শ্রাবণ সংখ্যার পর)

যোগিরাজ গম্ভীরনাথের নিকট দীক্ষালাভের পরে নাথক রসিকবিহারীর ব্যবহারিক জীবনে বিশেষ কোন পরিবর্তন লক্ষিত না হইলেও, তাঁহার অন্তর্জীবনে ধীরে ধীরে একটা গুরুতর পরিবর্তন আরম্ভ হইল; তাহা তিনি নিজে অন্তরে অন্তরে, অমুত্তব করিতেন। তাঁহার চিত্তের স্বাভাবিক ভাবপ্রবণতাকে অভিভূত করিয়া বিচারপ্রবণতা বর্জিত হইতে লাগিল, ধ্যানে ভাবের নেশা ও তজ্জনিত রসাস্বাদ যেন কম বোধ হইতে লাগিল এবং তৎপরিবর্তে ধ্যানের গভীরতা ও প্রশান্তবাহিতা বাড়িতে লাগিল। তিনি অমুত্তব করিতেন যে, তাঁহার হৃদয়ে ভক্তির উচ্ছ্বাস যেন হ্রাস পাইতেছে, চিন্তা আরো আশ্রয় হইতে চাহিতেছে, সচ্চিদানন্দ স্বরূপে বিলীন হইয়া বাইতে চাহিতেছে। তাঁহার আত্যন্তরীণ বিচারশক্তি ক্রমেই পরিমার্জিত হইতেছে, অন্তরে নিগূঢ় ভক্তের স্মরণ হইতেছে, এক অসীম অনন্ত ভেদবর্জিত অদ্বয় ভক্তের তিনি আশ্বাস পাইতেছেন, তাহার মধ্যে নিজের অহমিকাকে সম্পূর্ণরূপে ডুবাইয়া দিবার জন্য একটা প্রচণ্ড আকর্ষণ বোধ হইতেছে, অথচ তাহাতে ডুবিতে পারিতেছেন না। চিত্তের সাধারণ বিক্ষেপ ও বিষয়ের আকর্ষণ যেমন তাহার প্রতিকূল, তাঁহার প্রাক্তন সাধন-প্রসূত ভক্তিভাবের উদ্বেলতাও চিত্ত ও অহঙ্কারকে সেই অদ্বয় আশ্রয়রূপে সম্পূর্ণরূপে ডুবাইয়া দিবার পক্ষে তেমনি অন্তরাধ। এইসব অন্তরায় হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া সর্বতোভাবে আশ্রয় হওয়ার নিমিত্ত যেরূপ দীর্ঘকাল নিরন্তর ধ্যানসমাধির অভ্যাস করা আবশ্যিক, তাহা করিবার সময় ও সুযোগ রসিকবিহারীর ছিল না। সাংসারিক দায়িত্ববোধ হেতু শিক্ষকতা কার্য্যেই তাঁহার অনেক সময় ব্যয়িত হইত। তৎবিচারে নিজেকে সংসার সম্বন্ধ বিরহিত বলিয়া স্থানান্তিত সিদ্ধান্ত হইলেও ব্যবহারিক জীবনে এই দায়িত্ববোধকে তিনি অস্বীকার করিতে পারিতেন না। গুরুদেবেরও সেরূপ উপদেশ ছিল না। স্মরণ্য গম্ভীর সাধনার সময় তাঁহার খুবই

কম ছিল। এই সময়ে দীর্ঘকাল একাসনে বসিয়া গম্ভীর ধ্যানে আশ্রয়তস্তে ডুবিয়া থাকিবার প্রয়োজনীয়তা তিনি খুব তীব্রভাবেই অনুভব করিতেন, কিন্তু সুযোগ করিতে পারিতেন না।

তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শচীন্দ্রনাথ তখন কলেজে পড়েন। তিনিও যোগিরাজের রূপাশ্রয় হইয়াছিলেন এবং জপ-ধ্যানাদিতে সেই বয়সেই তাঁহার খুব রুচি ও আগ্রহ ছিল। একবার তিনি এই ছাত্রজীবনেই বৈরাগ্যের প্রাবল্যে গৃহত্যাগ করিয়া একবজ্রে নিঃসম্বল অবস্থায় সম্যাসের উদ্দেশ্যে বহির্গত হইয়াছিলেন। গুরুদেব তাঁহাকে অলৌকিকভাবে আকর্ষণ করিয়া গোরক্ষপুরে আনাইয়া পুনরায় পাঠে মন দেওয়ার ও পিতামাতার সেবা করিবার উপদেশ দিয়া গৃহে পাঠাইয়া দেন। শচীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—“এই সময়ে পিতৃদেব মাঝে মাঝে আমাকে বলিতেন, ‘দেখ, আমাকে অবসর দে, আমাকে বসতে দিলেই তোরা সব হয়ে যাবে, তোরা আর পৃথক সাধন-ভজনের প্রয়োজন ‘হবে না।’ কিন্তু তখনো আমি চাকরীতে প্রবেশ করি নাই। কয়েক বৎসর পর আমি চাকরীতে প্রবেশ করিয়াও পিতৃদেবকে সাধনার জন্তে পূর্ণ অবসর দিতে পারিলাম না, কারণ তখন আমার বেতন ছিল অল্প, তাহাতে সংসার চালান যাইত না। তবে, আমার চাকরী হওয়ার পর হইতে তাঁহাকে আর সকাল সন্ধ্যায় ছাত্র পড়াইতে হইত না। বেলা ১০টায় স্কুলে যাইতেন, ৪টায় বাড়ী ফিরিতেন। তাঁহার পরিশ্রমের কিছু লাঘব হইল। তখন তিনি সকাল সন্ধ্যায় রাত্রি নিশ্চিন্তমনে সাধনে মগ্ন হইতে পারিতেন। আমার ছোট ভাই বি. এ. পাশ করিয়া চাকরীতে প্রবেশ করিলে পর পিতৃদেব সাংসারিক দায়িত্ব হইতে পূর্ণ অবসর পান। তখন তাঁহার বয়সও ৬০ অতিক্রম করিয়াছে। তৎপূর্বেই তিনি ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করিয়াছেন। স্মরণ্য সাধন-ভজন তাঁহাকে কণ্ঠের মধ্যেই করিতে হইয়াছে।”

সদগুরু যোগিরাজ গম্ভীরনাথের নিত্যযোগযুক্ত

জীবনকে মন ও বুদ্ধির সম্মুখে আদর্শ রাখিয়া এবং তাঁহার অন্তঃপ্রেরণায় চালিত হইয়া সাধক রসিকবিহারী জ্ঞান ও যোগের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই সাধনার প্রথম অবস্থায় রসিকবিহারীর জীবনে একটা স্বন্দ উপস্থিত হইল। সময় ও সুযোগের অভাবে তিনি জ্ঞান ও যোগের সাধনায় গভীরভাবে ডুবিতে পারিতেছিলেন না এবং এই হেতু অদ্বয় তত্ত্বোপলব্ধির ও আত্মসমাহিত-চিন্তার নিরাবলি প্রাশস্ত আনন্দও তিনি সম্যক্ আন্বাদন করিতে পারিতেছিলেন না। পক্ষান্তরে, ভক্তির উদ্বলভাষ যে আনন্দ তিনি সম্ভোগ করিতেন, মা-মা বলিতে বলিতে বেক্রপ তনয় ও আত্মহারা হইতেন, ভাবের প্রাবল্যে তাঁহার হৃদয়ে যে রসাহুভব হইত, তাহা হইতেও তিনি যেন কতকটা বঞ্চিত হইলেন। জ্ঞানের সাধনা ও ভক্তির সাধনার মধ্যে যেন একটা সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। শিব-ভাবের সাধনা ও মাতৃভাবের সাধনা যেন পরস্পর-প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া তাঁহার চিন্তে একটা বিষাদ ও অস্থিরতা সৃষ্টি করিল। উচ্ছ্বাসময়ী ভক্তির সাধনা তাঁহার জীবনে স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে, ইহাতে তিনি প্রায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। বিশ্বজননীর সারা হৃদয় দিয়া তিনি মা বলিয়া অনুভব করেন, মা বলিতে তাঁহার সমগ্র সত্তা বন্ধার দিয়া ও নৃত্য করিয়া উঠে, মা'র প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক অহুরাগ। মায়ের সাক্ষাৎ দর্শনও তিনি অনেক সময় লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার লীলা তিনি সব ক্ষেত্রে উপলব্ধি করেন। এই মা'কে ত্যাগ করিয়া, অনন্ত লীলাময়ী সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারিণী বিশ্বজননীর প্রতি বৈরাগ্য করিয়া, মহাযোগীধর আত্মসমাহিত শিবের ভাবে ভাবিত হইতে তাঁহার মাতৃস্নেহসিক্ত হৃদয় বিদ্রোহ করিয়া উঠে। কাজেই চিন্তকে সেই আত্মসমাহিত অবস্থায় স্থির করিতে তাঁহার বিশেষ বেগ পাইতে হয়। অথচ গুরুশক্তি তাঁহাকে সেদিকে টানিতেছে, তাঁহার বিবেকবিচার তাঁহাকে সেদিকে লইয়া যাইতেছে, সেদিকে উদাসীন হওয়াও তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। আবার স্নানীয়ত অভ্যাসযোগের অভাবে তাহাতেও সম্যক্ কৃতার্থতা লাভ তিনি করিতে পারিতেছেন না। তাঁহার অন্তর্জীবনে একটা তোলপাড় উপস্থিত হইল।

শ্রীমান্ শচীন্দ্রনাথ কখন কখন পিতার এই অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিচয় পাইতেন। তিনি লিখিয়াছেন,—“দীক্ষার কয়েক বৎসর পর তিনি যেন মাঝে মাঝে একটু উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন। একদিন বলিলেন, ‘গোরক্ষপুর গিয়াই আমার সর্বনাশ হইয়াছে, পূর্বে আমার যে ভাব’ খেলিত এবং যে আনন্দ পাইতাম, তাহা যেন ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে।’ আর একদিন হঠাৎ আমাকে বলিলেন, ‘দেখ, গোরক্ষপুর হইতে আসিয়া আমার যেন অবনতি হয়েছে, আমি নিত্য নিরন্তর যে ভাব ও যে আনন্দে ডুবিয়া থাকিতাম, এখন যেন আর সে রকম হয় না, তুই কিছু বুঝতে পারছিন্?’ আমি সেদিন মন্ত্রমুগ্ধের মত বলিয়া ফেলিলাম,—‘দেখুন, গুরুদেব কাকে কোথা দিয়ে নিয়ে গিয়ে কোথায় দাঁড় করান, তা তিনিই জানেন। আমি ত শিশু, এ সম্বন্ধে আমি কি বলব? আমরা ত আপনার অবনতির কোন লক্ষণ দেখছি না। বরং দেখি যে, আপনি এখন পূর্বাপেক্ষা ঘন ঘন সমাধিস্থ হন এবং দীর্ঘ-কাল সমাধিস্থ থাকেন।’ বাবা বলিলেন, ‘কি জানি, কিছু ত বুঝি না।’ কিছুদিন পর আবার একদিন তিনি আমাকে নিছতে বলিলেন,—‘দেখ, আমাদের পূর্বপুরুষ শাক্ত, আমরা শক্তির উপাসক, কিন্তু বীজ পেলাম অস্ত্র দেবতার, এতেই হয়ত কিছু অসুবিধা বোধ হচ্ছে।’ তখন আমার মুখ দিয়া যেন কতকটা আমার অজ্ঞাতসারেই কয়েকটা কথা বাহির হইয়া গেল। আমি বলিলাম, ‘সাধারণ লোকের সে অসুবিধা হ’তে পারে, তাদের সংস্কারে বাধা পায়। সমস্তের মূলে তো একই। বীজ তো সেই এক পরম দেবতারই। গুরুদেব তো কারো সংস্কারে আঘাত করেন না। আপনি যে মাতৃভাবে ছিলেন, সে ভাবেই থাকুন না, ক্ষতি কি? তাও তো গুরুদেবের অননুমোদিত নয়। ভাবও তো সংস্কার ছাড়া কিছু নয়?’ কি বলিলাম না বলিলাম, জানি না। কথা কয়টি যেন আমার মুখ থেকে আপনা-আপনি বাহির হইয়া আসিল। বলার পরে একটু লজ্জাও বোধ হইতে লাগিল। বাবা কিছুক্ষণ বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন এবং ধীরে ধীরে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। ইহার পর কিন্তু বাবার

মুখ হইতে আর কোনদিন ঐ প্রকার কোন অভিযোগ শুনি নাই।”

১৯২১ খৃষ্টাব্দে শচীন্দ্রনাথ চাকরীতে প্রবেশ করেন, এবং তখন হইতে প্রাইভেট পডান ছাড়িয়া দিয়া স্কুলের কয়েক ঘণ্টা ব্যতীত প্রায় সব সময় রসিকবিহারী ধ্যান সমাধি অমুশীলন করিবার সময় ও সুযোগ পান, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। পুরাতন জীর্ণ বাড়ীটি পরিত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত একটু ভাল বাড়ীতে টালাতেই মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের লেনে পরিবারবর্গ সহ তিনি তখন স্থানান্তরিত হন। পারিবারিক দায়িত্ব মুখ্যতঃ শচীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন এবং পিতাকে সর্বপ্রকার সাংসারিক চিন্তা হইতে যথাসম্ভব অব্যাহতি দেন। এই সময়ে তাঁহার যোগ ও জ্ঞানের অন্তরঙ্গ সাধনা দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে থাকে। গুরুভাই ও ভক্তগণ তাঁহার সঙ্গ ও উপদেশ লাভ করিতে আসিতেন। তাঁহাদের সহিত বাক্যালাপ করিতেন। গুরুদেবের আবির্ভাব ও তিরোভাব উৎসবে যোগদান করিতেন। তদ্ব্যতীত আর কাহারো সঙ্গে প্রায় মেলামেশা করিতেন না। ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মধ্যান ব্রহ্মানন্দ রস পানেই প্রায়শঃ বিভোর থাকিতেন। শক্তি ও ব্রহ্মের ভেদজ্ঞান তাঁহার দূরীভূত হইল, গুরু ও ব্রহ্মের অভেদবোধও প্রতিষ্ঠিত হইল। শিব শক্তি গুরু ব্রহ্ম কৃষ্ণ রাম,—সবই যে তত্ত্বতঃ এক, কোন ভেদ নাই, ইহা তাঁহার অমুভবগোচর হইল। তিনি বাহ্যিক কর্তব্য সম্পাদনের সময়টুকু বাদে নিত্য নিরন্তর এক অদ্বয় পরম তত্ত্বের মধ্যেই ডুবিয়া থাকিবার অভ্যাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার সমগ্র সত্তা ক্রমশঃ এক তত্ত্বাহুরঞ্জিত হইতে লাগিল।

এই সময়ে একবার তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং তাঁহাকে দেওঘর নিয়া যাওয়া হয়। এই সময়ের কথা শ্রীমান শচীন্দ্রনাথের বর্ণনা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

“বাবার স্বাস্থ্যভঙ্গের লক্ষণ দেখা গেল। চিকিৎসায স্কল হইল না দেখিয়া তাঁহাকে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে কিছুদিন রাখিবার কল্পনা জল্পনা চলিতে লাগিল। কিন্তু তাঁহাকে একলা তো কোথাও পাঠান সম্ভব নয়। কাজেই আমি চারি মাসের ছুটি লইয়া দেওঘর চলিয়া গেলাম এবং একখানি বাড়ী ঠিক করিয়া আসিয়া সকলকে লইয়া

গেলাম। প্রথমতঃ তিনি অন্তত যাইতে আপত্তি করিয়া- ছিলেন, তারপর বৈদ্যনাথ দর্শন হইবে বলিয়া আর আপত্তি করিলেন না। দেওঘরে আমাদের বাসা হইতে বাবা বৈদ্যনাথের মন্দিরের দূরত্ব এক মাইলের কিছু কম ছিল। তিনি প্রত্যহ সকালে সন্ধ্যায় মন্দিরে পূজা ও আরতি দেখিবার জন্তে হাঁটিয়া যাইতেন, তাহাতে কিছু শারীরিক পরিশ্রমও হইত। স্বাস্থ্যের কিছু উন্নতি দেখা গেল। মন প্রায় সর্বদাই অন্তর্মুখীন থাকিত। তিনি ভিতরে বাহিরে সর্বদাই যেন শিবদর্শন করিতেছেন, বোধ হইত।

“এইখানে একদিন এক অভূতপূর্ব ব্যাপার দেখিলাম। মধ্যাহ্নে আহারাদির পর তিনি তাঁহার শয্যা শয়ন করিয়া আছেন। শীতের দিন, একখানা লেপ গায়ে, ঘরের দরজা জানালা বন্ধ। অহমান বেলা ৩টার সময় হঠাৎ তাঁহার ঘরে উচ্চৈঃস্বরে শব্দ শুনিয়া সকলের মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। আমরা সকলেই ছুটিয়া গেলাম। দেখিলাম, তিনি চিং হইয়া শুইয়া আছেন, চক্ষু স্থির, হাত পা টান। লেপখানি সরাইয়া লওয়া হইল। তিনি উচ্চরবে অনর্গল কেবল “সর্বং খন্দিৎ ব্রহ্ম” “সর্বং খন্দিৎ ব্রহ্ম” বলিয়া যাইতেছেন। তাঁহার সর্বশরীরে যেন আনন্দের হিল্লোল বহিয়া চলিয়াছে। বৃন্দালায় সমাধি ভঙ্গের পূর্বাবস্থা। বাহ্যজ্ঞান তখনো কিরিয়া আসে নাই। ধীরে ধীরে কিছুক্ষণ পর কতকটা প্রকৃতিস্থ হইলে বলিতে লাগিলেন,—“জয় গুরু জয় গুরু, আজ আমার জীবন সার্থক, বস্ত্র গুরু, ধন আমি, আজ আমার জীবন ধন” ইত্যাদি। তাহার পরেই আবার নিজের মনেই বলিতে লাগিলেন,—‘গুরুদেব, তোমাকে কত দোষারোপ করেছি, কত কটুক্তি করেছি, অসীম কৃপা তোমার’। এইরূপ বলিতে বলিতে তাঁহার হাসি কান্নার কোয়ারা ছুটিতে লাগিল।

“ইহার কয়েকদিন পর আমাকে নিম্নতঃ বলিলেন,—‘দেখ, এবার আমার ব্রাহ্মীস্থিতি হয়েছে, এতদিনে আমার জীবন সার্থক হলো; বস্ত্র কৃপা তাঁর! আমি পূর্বদিনও তাঁকে কত-কিছু অভিযোগ করেছি।’ বলিতে বলিতেই তাঁহার অতুলনীয় হাসি তাঁহাকে পাইয়া বসিল, হাসিতে হাসিতেই চীৎকার করিয়া কাঁদিতে শুরু করিলেন,

কাদিতে কাদিতেই একেবারে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন, সারা শরীর নিষ্পন্দ হইয়া গেল।

দেওঘর হইতে কলিকাতার ফিরিয়া আসা অবধি পিতৃদেবের সকল বিষয়ই যেন অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা যাইতে লাগিল। মনে হইত, যে বস্তুর সন্ধানে তিনি আজীবন কৃতবিস্কৃত হইয়াছেন, তাহা যেন তাঁহার সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীনে আসিয়াছে। সেই সময় হইতে তাঁহার হাবভাব, চলাফেরা, কথাবার্তা, আহার বিহার, প্রীতি কর্ণেই যেন অঙ্গসমাহিত অবস্থা। শুভ শাস্ত্রশুশ্রূষা-শোভিত প্রশান্ত মুখমণ্ডলে স্নেহকরণা প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিত। দেহের বর্ণ স্বভাবতঃই উজ্জ্বল ছিল এবং অঙ্গকাস্তিও মাধুর্য্যপূর্ণ ছিল, কিন্তু তাহার মধ্যেও যেন আরো উজ্জ্বলতা এবং আরো মাধুর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল। রোগশোকও তখন আর বিশেষ দেখা যাইত না। তাঁহার সমগ্র জীবনটা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহার জীবনেব শেষ ৮।১০ বৎসর তিনি সাধনার পরিসমাপ্তিতে অতীষ্টবস্ত্র লাভে কৃতকৃতার্ব হইয়া পরম পরিতৃপ্তির সহিত পরমানন্দে অতিবাহিত করিয়াছেন। যে জীবন এক সময় সাংসারিক পরিস্থিতির প্রাতিকূল্যে এবং সুখ্যবস্ত্রলাভের অভাবে দুর্নিবহ হইয়াছিল, সেই জীবন শেষ অবস্থায় পূর্ণরূপে মধুময় ও অপার্থিব আনন্দে ভরপুর হইয়া গিয়াছিল। এই সময়ে সমাধি যেন তাঁহার প্রায় স্বভাবে পরিণত হইয়াছিল; ব্যক্তি অবস্থায় তাঁহাকে যেন জোর করিয়া থাকিতে হইত। তাঁহার মনকে চঞ্চল ও বহির্গামী রাখাই যেন কষ্টসাধ্য হইত। সমাধিভঙ্গে তাঁহার সর্বদে অপরূপ রূপলাবণ্য ফুটিয়া উঠিত। দেখিলে মনে হইত যেন প্রীতি লোমকূপ ভেদ করিয়া একটা মনোমুগ্ধকর স্নানিষ্ঠ স্খোভিঃ বাহির হইতেছে এবং পাঁচ বৎসর বয়স্ক স্নানর বালকের একটি কচিমুখ তাঁহার স্বদেহে বসান হইয়াছে। অবশ্য এ ভাব দীর্ঘকালস্থায়ী

হইত না, বাহ্য স্থিতির সঙ্গে সঙ্গে তাহা ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইত।

“গভীর সমাধির অবস্থা হইতে বাপানে নামিয়া আসিবার সময় কখন কখন বোধ হইত যে, তাঁহার পূর্ব স্থিতি জাগাইয়া তুলিতে যেন বেশ বেগ পাইতে হইতেছে। তিনি এক একবার ফ্যান্ ফ্যান্ করিয়া এদিক ওদিক তাকাইতেছেন, আবার চোখ বুজিয়া স্থির হইয়া যাইতেছেন। বহুবার চেষ্টা করিয়া যেন ধীরে ধীরে বহির্জগতের সহিত পরিচয় করিতেছেন। এমনভাবে দৃষ্টিক্ষেপ করিতেন, যেন কোথায় আছেন, কাহাদের মধ্যে আছেন, রাজি কি দিন, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না, আমাদিগকেও চিনিতে পারিতেছেন না। সব যেন তাঁহার নিকট নূতন, অপরিচিত। কখন কখন মনকে বাহিরে আনিবার জন্যে অশ্রুট স্বরে একটু জল পান করিতে চাহিতেন। কখন কখন বিশ্বয়াবিষ্ট চিত্তে অস্পষ্ট ভাষায় বলিতেন—‘এ কি! কোথায় আসিলাম! এরা সব কে? ওঃ, কি নরকতুল্য ভীষণ দুর্গন্ধময় স্থান! শ্বাস নিতেও কষ্ট হয়। মা-মা, কোথায় ফেলে দিয়ে গেলি? এখানে থাকতে পারব না।’ এরূপ বলিতে বলিতে কাদিতে আরম্ভ করিতেন। সে কী বুকফাটা কান্না! বহু প্রচেষ্টার পর প্রকৃতিস্থ হইতেন, ধীরে ধীরে পূর্বস্থিতি ফুটিয়া উঠিত।

“প্রত্যুষে গঙ্গাস্নান তাঁহার নিয়মিতভাবেই চলিত। গঙ্গাস্নান করিয়া উঠিলে, তাঁহার অলৌকিক দিব্য বাস্তি দেখিয়া সুপরিচিত সমবয়স্ক বন্ধুগণ কেহ কেহ বলিতেন—‘ভাই, তোমাকে দেখিলে পুণ্যকালের ব্যাস বশিষ্ঠের কথা মনে পড়ে।’ তিনি একটু মুহু হাসিতেন। গঙ্গার বাটে বহু অপরিচিত ব্যক্তি মুগ্ধ নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিত এবং তাঁহার বিশেষ বিবরণ জ্ঞানিবার জন্যে অনুসন্ধিৎসু হইত।”

। সমাপ্ত ॥





আমি পাইগুরু মালা



প্রবর্তক সঙ্ঘ : কেন্দ্র কার্যালয়
তাং ৩।৩।৫৩

আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করিবে। শীঘ্র শীঘ্র ভাল হও,
এই আশীর্বাদ ভগবান নিশ্চয়ই করিবেন। ইতি

স্নেহের পারুলবালা,

পূর্ণিমা সম্মেলন ভাল লাগিয়াছে শুনিয়া সুখী হইলাম।
নিরহঙ্কার ও নিরাসক্তি জীবনে শান্তি আনে। তোমার
খবর দিও। সকল কথা আমায় জানাইও আগামী পত্রে।
আশীর্বাদ গ্রহণ করিও। ইতি

প্রবর্তক সঙ্ঘ : চন্দননগর
৩০।১।৫৬

স্নেহের পারুল,

তোমার ২৪।-এর পত্র পেয়েছি। তোমার
অপারেশানের ক্ষতটা ক্রমশঃই সারিয়া যাইতেছে
লিখিয়াছ। নিশ্চয়ই ভাল হইয়া যাইবে। আমার জন্ত
মন ধুবই অস্থির হইয়াছে বুঝিলাম। তোমার এই
অবস্থায় আসা এখন উচিত হইবে না বলিয়া মনে করি।
মন্ত্রের স্মরণ করিও। সর্বসময় ভগবানই চালাচ্ছেন—এই
কথা মনে রাখিও। শরীর, প্রাণ ও মন লইয়া ভগবান
কাজ করিতেছেন—এই কথায় বিশ্বাস করিও। পরে
বিশেষ করিয়া বলিব। আজ এই পর্য্যন্ত। আমার
আশীর্বাদ নিও। ইতি

প্রবর্তক সঙ্ঘ : চন্দননগর
তাং ৫।১০।৫৩

স্নেহের পারুলবালা,

তোমার ৩।১০।৫৩ তারিখের পত্র পাইলাম। পত্র
পাওয়া মাত্র আমি উত্তর দিই, ইহা আমার স্বভাব।
তোমার পত্র পাইতে বিলম্ব হওয়ায় আমি দুঃখ অনুভব
করি নাই। তোমাকে পাইবার ইচ্ছায় আছি।

নিরহঙ্কার ও নিরাসক্তি দুইটি সাধনার দুয়ার।
সংসারবাসী হইয়া কি উপায়ে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় সে
কথা সাক্ষাতে বলিব। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি,
তুমি মুক্তি লাভ কর। আমার সহদয় আশীর্বাদ
গ্রহণ করিও। ইতি

প্রবর্তক সঙ্ঘ : চন্দননগর
২৮।১২।৫৫

স্নেহের মধু,

তোমার টাকা এখনও পূরণ হয় নাই। আমি আগামী
জাহ্নমারী পর্য্যন্ত এই দুর্বিসহ কাজে লিপ্ত থাকিব।
অতঃপর এই কার্য হইতে আমায় অব্যাহতি লইতেই
হইবে। আমার আশীর্বাদে জয়যুক্ত হও। ইতি

চন্দননগর
তাং ৫।১০।৫৫

স্নেহের পারুল,

তোমার ২।১০।৫৫ তারিখের পোষ্টকার্ড পাইলাম।
তুমি ৪ মাস পেটের বেদনায় ভুগিতেছ শুনিয়া চিন্তিত
হইলাম। রোগ এখনও ডাক্তারেরা ধরিতে পারে নাই
শুনিয়া বিস্মিত হইলাম।

ইষ্টকে স্মরণ করিয়া অসহ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হও—
ইহাই আমার প্রার্থনা। আমার আশীর্বাদ নিও।
হাসপাতালে আছ, এই অবস্থায় আমার যাওয়ার সুবিধা
নাই। এই ভোগের কবে শেষ হইবে—জানিবার জন্ত
ব্যস্ত হইও না। ভগবান যাহা দিয়াছেন, তাহা সহ
করিও।

স্নেহের মধুসুন্দন,

তুমি ২১শে পৌষ পারুল এবং সৌবীরের মাতৃদেবীকে
লইয়া আসিবে, লিখিয়াছ। টাকার হাজিমা মিটিয়াছে।
অতঃপর দীক্ষার জন্ত মনোযোগী হইয়াছি।

তাহাদের আর স্বতন্ত্র পত্র দিলাম না। আমার
আশীর্বাদ নিও। ইতি

[পত্রোন্মুক্ত ব্যক্তিগণ : পারুল—পারুলবালা বোস। মধুসুন্দন—
মধুসুন্দন ভট্টাচার্য। ইহারা পরে দীক্ষাপ্রাপ্ত হন]

সম্পাদকীয়

ভারতবর্ষ ও মানব সভ্যতা :

আজকের দিনের পরনির্ভর আশ্রয়বিস্তৃত ভারতের স্বপক্ষে এ কথা বলিলে গোঁড়ামির মতই শুনাইবে যে, মানব সভ্যতার মূল স্রষ্টা ভারতীয়তার মধ্যেই নিহিত। স্বধর্ম-ব্রহ্মতাই এই মানসিক দুর্বলতার হেতু। বিগত দেড়শো বছর প্রত্যক্ষবাদী পশ্চিমী বৈজ্ঞানিক সভ্যতার ঔজ্জ্বল্যের সম্মুখে ভারতবর্ষ নিজেকে হীন ভাবিতে শুরু করিয়াছে। ভারতীয় ইতিহাসের সত্যকার অধঃপতনও শুরু হইয়াছে ব্রিটিশের আমল হইতে ভারতের। এই আশ্রয়-বিমরণকেই বলা যায় বিশ্বমানবসভ্যতারই চরম সঙ্কট। যেহেতু ভারত না থাকিলে বিশ্বকে আলো ও অমৃতের দিশা দিবার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। বস্তুতঃ ভারতীয়তার গর্ভেই মানবসভ্যতার চরম পরিণতির সূক্ষ্মপ্রতি প্রতিশ্রুতি বিদ্যমান। ভারত ইতিহাসের সুমহান দায়িত্বই হইল মানবতাকে তার চরম ও পরম অভিব্যক্তির পরাকাষ্ঠায় পৌছিয়ে দেওয়া। ভারত ধর্মের প্লানি তখনই সমুপস্থিত হইয়াছে যখনই ইতিহাসের এই মূলস্রষ্টা ছিন্ন হইয়াছে। কালপ্রবাহে যখনই এমন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে ভারতাস্রার আবির্ভাব তখনই সম্ভব হইয়াছে। পূর্ণতা-লক্ষ্যে মানব সাধনার এই স্রষ্টার ধারক ও বাহক এই পৃথিবী ভারতের মাটিতেই সেই প্রাচীন বৈদিক কাল হইতে বার বার জন্ম লইয়াছেন। ইহার এক ও অখণ্ড তাব-শৃঙ্খলেরই যুগাভিব্যক্তি। ভগীরথের মতই মানবতার অমরত্ব স্বপক্ষে মহাকালের পথে এই সব যুগমানবেরা অগ্রবহ করিয়া লইয়া চলিয়াছেন। ইহাদের ইতিহাসই শাস্ত ভারতবর্ষের ইতিহাস। এ ভারতবর্ষ আজকের নেহেরুর ভারতবর্ষ নয়। বৈষয়িক সমুন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগ্রস্ত ভারতবর্ষও নয়। আজকের রাজনীতি পরিকল্পিত, দৈত্য আর অস্বাভাবপীড়িত ভারতবর্ষের বহু উর্দ্ধে চিরদিনের নিত্য এক ভারতবর্ষ বিদ্যমান। বিবেকানন্দ-অরবিন্দ-রবীন্দ্রের ভারতবর্ষ—যে ভারতবর্ষ অপরাধের নিত্য প্লানিমুক্ত।

মানব সভ্যতার এই বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয়তার মূল্যমান সম্বন্ধে সঠিক সচেতন হইতে না পারিলে সত্যকার দেশপ্রেমও সম্ভবপর নহে। Emotional Integration-ভিত্তিক যে আজকের রাজনৈতিক জাতীয় সংহতি সংগঠনের প্রচেষ্টা তা সাময়িকভাবে সফল হইলেও, কখনও স্থায়ী হইতে পারে না। মানুষের একান্ত বাহ্য প্রয়োজনের তাগিদ মিটানোর মাঝে তার সম্ভার চরম চরিতার্থতা সাধনের সম্ভাবনা কোথায়? আসল মানুষটা রাজনীতি বা অর্থ-নীতির অনেক উর্দ্ধে—অনেক মহৎ আর বৃহৎ। অনন্ত তার সম্ভাবনা। এই সম্ভাব্য পূর্ণতা আর অমরত্বের দিকে মানুষকে বিকশিত করিয়া তুলিতে যে চিন্তা-চর্চা, যে নীতি-তত্ত্ব, যে বাদ আনুকূল্য করিতে পারে না তাহা 'এহ বাহু' বলিয়াই ভারতবর্ষের নিকট পরিত্যক্ত হইয়াছে। কারণ সে বুঝিয়াছে গোঁড়ামিলের মধ্যে কখনই মিল খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভবপর নহে। ভারত ভিন্ন সর্বত্রই তাই দ্বন্দ্বিক (dialectic) সংঘর্ষের মধ্য দিয়াই অন্ধকারে হাতড়াইতে-হাতড়াইতে মানবসভ্যতাকে আগাইয়া চলিতে দেখা যায়। এইরূপ গতি কখনও মানবত্বের পূর্ণ বিকাশ বা দেবত্বের উজ্জীবন আনিতে পারে না, যেহেতু একান্ত বস্তুনিষ্ঠ এইসব মত ও পথের জীবনদর্শন মূলতঃ পশ্চাদ্ধর্মকেন্দ্রিক। ভারতবর্ষ এই একান্ত ভোগসর্বস্ব সভ্যতাকেই আশ্রয়-সভ্যতা বলিয়া অভিহিত করিয়াছে।

ভারতবর্ষ এখন স্বাধীন হইয়াছে। স্বাধীনতার পরে এই অনাদিকালের ভারতীয়তার স্বপ্নবিত্তের যারা তারা স্বভাবতঃই আশা করিবে যে, মানবকল্যাণের জন্তই এই পৃথিবী ভারতে জীবনবিকাশের ভারতীয় মৌলনীতি অনুসরিত হইবে এবং হওয়া কর্তব্য। এই সর্বতোমুখী মানবত্ববিকাশের যে মত ও পথ তাকেই ভারতবর্ষ ধর্ম বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। ঋষিভারতের আবিষ্কৃত এই নীতিই সনাতন—সর্ব দেশে সর্বকালে প্রযোজ্য। এই সত্য এক ও অখণ্ড। মহাকালের ভাঙ্গা-চুরার গতিপথে এই সত্যকেই ভারতবর্ষ বুকে বহন করিয়া চলিয়াছে। তার নিরবচ্ছিন্ন তপস্বী এই সত্যধর্মকে রক্ষা করার জন্তই। মানবতার শাস্ত ইতিহাসের ধারক ও বাহক যারা তাঁরা ভারতের পবিত্র অঙ্গনে বার বার জন্ম-

গ্রহণ করিয়া কালতরঙ্গের ঘাত-অভিঘাত হইতে এই সত্যাত্মকে অবিচ্ছিন্ন রাখিয়াছেন। বিশ্বসৃষ্টির এই সত্য অভিসন্ধিটিকে চিরপ্রবাহমান রাখিতে বিধাতারই অভিপ্রেত এই মহামানবদের কালে কালে যুগপ্রকাশ। ইহার অখণ্ড ভারতসত্তারই অবিচ্ছিন্ন অংশ। এঁরাই হিরণ্যগর্ভ পুরুষ—ঠাকুর রামকৃষ্ণের ‘নিত্যকোটির থাক’—কালতরঙ্গ-ভঙ্গের অন্তরালবাসী—মহাকালের অন্তঃপুৰাণী।

এই সনাতন ধর্মকে না জানিলে, না চিনিলে ভারতীয়তা যে কি বস্তু, মানবসভ্যতায় ভারতবর্ষের যে কি ‘মিশন’ তা বোধগম্য হইবাব নয়। শ্রীঅরবিন্দের কথা, “আমরা অনেক সময় হিন্দু ধর্মের কথা বলি, সনাতন ধর্মের কথা বলি কিন্তু সে ধর্ম যে কি বস্তু তা আমাদের মধ্যে ক’জন জানে? অজ্ঞাত ধর্ম হচ্ছে বিশ্বাস ও মতবাদ কিন্তু সনাতন ধর্মই হচ্ছে জীবন। এটি বিশ্বাস করবার নয়, জীবনে ফুটিয়ে তোলবার। মানবজাতির মুক্তির জন্য ধর্মকে পুরাকাল হইতে এই উপদ্বীপের নিঃসঙ্গতায় পোষণ করা হয়েছে। অজ্ঞাত দেশের মত সে নিজের জন্য ভাবছে না।...ভারত চিরদিনই মানবজাতির জন্য জীবন যাপন করেছে, নিজের জন্য নয়। আজ তাকে যে বড় হতে হবে, সেও নিজের জন্য নয়—মানবজাতির জন্য।...ভারত আর সনাতন ধর্ম এক” “ধর্মকে বড় করাই দেশকে বড় করা।” দেশ ও জাতি সম্বন্ধে ঠিক এমনটি ধারণা না হইলে মানুষ বৃহৎ হইতে পারে না। শ্রীঅরবিন্দের কথা, “মানুষ তখনই শক্তিমান হয় যখন মহত্তর শক্তি তাকে শক্তিমান করে।” মহত্তর চিন্তার ঘনিষ্ঠায়ই মস্তিষ্কের কোষে-কোষে যে বিদ্যুৎ সঞ্চার করে তাই মানুষকে বৃহত্তর মহত্তর স্বার্থে প্রাণবলী দিবার, নিজেই উৎসর্গ করার বীৰ্য্য-বিক্রমে উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকে। স্বাধীনতা লাভের পরে আমাদের যে হীনতা, যে দীনতা, যে আদেশিকতার অভাব আর আনুজ্ঞাতিকতার অভিহৃতি তার কারণ আমরা ভারতাস্রার এই ভাব-বাণী তুলিয়া গিয়াছি। ফলে তুচ্ছতার পঙ্খিল আবর্তে পড়িয়া ডুবিয়া মরিতেছি। জীবনের মূল্যবোধ একান্ত বস্তুগত

হইয়া পড়ায় সমাজ-রাষ্ট্র-শিক্ষা-অর্থক্ষেত্রে যে পাপচক্র সৃষ্টি হইয়াছে তাহা হইতে পরিত্রাণের উপায় পুনশ্চ পূর্বগামী ভারতাস্রার বাণীবিশ্লিষ্টদের অমূল্য ও অমুসরণ করা। অজ্ঞাত নিজেই ফিরিয়া পাইবার আর দ্বিতীয় পথ নাই।

আজ যে পথে আমরা অর্থাৎ ভারতবাসীরা চলছি তা মরণেরই পথ। প্রবৃত্তির এই গতিপথ সহজ—পশুধর্মের স্বভাব। ভারতের অমূল্য অপরূপ উত্তরাধিকার এ নয়। কিন্তু আমরা ভারতবাসী—ধর্ম ভারতের উত্তরাধিকারী। বিশ্বমানবতার জন্যই যে পথে জীবন, যে পথে মানুষ আর দিবঙ্গ সে পথ যত দুর্গম আর দুঃসাহ্যই হোক, সেই মত ও পথ আমাদের বরণীয়। অজ্ঞাত এ মর্ত্যের শূন্যতা পূর্ণতা পাবে না। পৃথিবীর অশান্ত হিয়া প্রশান্ত হইবে না, আশ্রয়ের হাহাকারও নিবৃত্ত হইবে না। স্বজনের অভিসন্ধি অসিদ্ধ থাকিয়া যাইবে। ভারতের এই আকৃতি আমরা মূর্ত হইতে দেখি সজ্জগুরু শ্রীমতি-লালের মধ্যে। বর্তমান শতাব্দীর চতুর্থ দশকে সজ্জগুরু ভারতের লক্ষ্য ও কর্তব্য সম্বন্ধে তাঁহারই সৃষ্ট প্রবর্তক সজ্জকে যে ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন তাহা আজও শুধু সজ্জের নয়, দেশেরই সাধ্য হইয়া আছে। সজ্জগুরু বলিয়াছেন : “রক্তই চলে যেতে হয় যুগে যুগে। তোমরা ক্রাইষ্টের বর্মের হত্যাকাণ্ড দেখে আশ্চর্য্যের উৎকট দৃষ্টান্তে মোহিত হও, বিশ্বাসঘিট হও। ভারতের আশ্চর্য্যের অধ্যাত্ম ঘটনা লক্ষ্যে পড়ে না—সে কত রক্ত, কত অশ্রু—কেবল বাঁচারই জন্য। বাঁচাতে গেলে অমৃত চাই, তা না হলে বাঁচার মন্ত্র সিদ্ধ হয় না। সে অমৃত যে পথে বাঁচার প্রেরণা সে পথে। ভারতের বাজা স্থল থেকে অধ্যাত্ম-চেতনায় উঠে গেছে। জগতের অন্ত জাতির চেষ্টা বস্তুতঃ জগৎ নিয়ে। আমি চাই উর্দে দক্ষিণ বাহ প্রসারিত করে অজ্ঞ হাতে পৃথিবীর টুটি ধরে উপরে তুলে নিতে। সে অসাধারণ তপস্বী মানুষের দুর্কোষ। প্রার্থনা আজ সকলের চেতনা স্রবের ন্যায় তীব্র হোক, অমিশ্র ভবিষ্যৎ সম্মুখে রূপ নিয়ে ফুটে উঠুক।”

সজ্জগুরু ‘ভারতের এই মিশন-বোধে উদ্বুদ্ধ উন্মাদ হইয়াছিলেন। ভারতের সাধ্য দিব্য জাতীয়তার নিগূঢ় মর্ম এখানেই নিহিত। দিব্য জীবন ও জাতীয়তার বস্তু-তত্ত্ব আদর্শ এখনও অনাগত—সৃষ্টিসাপেক্ষ। এই অনাগত মহৎ ভবিষ্যৎকে পুণ্যভূমি ভারতের মাটিতে মূর্ত করিয়া তুলিতে ভারতবাসী সংবুদ্ধ হোক—ইহাই ভারতের ভাগ্যবিধাতার নিকট প্রার্থনা।

স্বপ্নমোচন

গীতা-মাধুরী—শ্রীকিমচন্দ্র সেন, ভক্তিভারতী
প্রণীত। প্রকাশক : জয়নারায়ণ কাপুর, ৭/ডি রামকৃষ্ণ
সেন, কলিকাতা-৩। মূল্য : বারো টাকা। ডিমাই
সাইজ, প্রায় ৬৫০ পৃষ্ঠা।

‘গীতা-মাধুরী’—এক নিঃসঙ্গ পড়িয়া শেষ করিয়াছি। সমালোচনার
অতীত অপ্রাকৃত ভাবকে বৈধরী ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। ভগবৎবিমূখী-
জনকে ‘গীতা-মাধুরী’ সহ্যই ভগবৎমুখী করিবে—ইহাতে সন্দেহ নাই।
চিদানন্দধন ভগবান একমাত্র ভক্তিতেই প্রতিবিম্বিত হন। ভক্তিতে
আনন্দাধিকা। ভক্তিরসে রসিক ভাবুক ছাড়া গীতা মাধুরী আবাদন-
যোগ্যতা আর কাহারই বা আছে? ভক্ত ভগবান অপেক্ষাও বেশী দয়াল,
তাই ভক্তপ্রবর বঙ্কিমবাবু তাঁহার নিঃস্ব অমুভবকে ভগতে ছড়াইয়া
দিয়াছেন। গীতা মাধুরীকে আমি মুগ্ধিত গ্রন্থ বলিব না—গ্রন্থ পড়িয়া
স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা চলে; কিন্তু ভাগীরথীর প্রবল প্রোতে পড়িলে যেমন
প্রোতই স্বাধীনতা হরণ করিয়া টানিয়া লইয়া চলে, তেমনি গীতা-মাধুরী
একটি প্রবল প্রোতাদ্বিতী। ইহাতে পড়িলে জীব ইচ্ছায় অনিচ্ছায়
ভগবৎ-সান্নিধ্য লাভ করিবেই। অনেক গ্রন্থ পড়ি, কিন্তু গ্রন্থে প্রবাহ বা
প্রোত দেখিতে পাই না। অনেকদিন পরে গীতা-মাধুরী পড়িয়া
ভাগীরথীর প্রবাহে ক্রমেই ভগবৎ সান্নিধ্যের আনন্দে নিমজ্জিত হইলাম।
বঙ্কিমবাবুর সান্নিধ্যে ভগবৎ-বোধ জাগ্রত হইয়া ওঠে। দুর্নিবার এই
আকর্ষণ। তর্ক-বিতর্ক গীতা-মাধুরীতে সম্পূর্ণ বিলীন হইয়া যায়।
গ্রন্থকারের ভগতে অরুণ কিছুদিন বাঁচিয়া থাকি এয়োজন। আমরা
কাতর প্রাণে ভগবতরণে এই প্রার্থনাই করি।

স্বামী সত্যানন্দ

বাংলার বিবেকানন্দ—স্বামী প্রদ্বানন্দ (শ্রীরামকৃষ্ণ
মিশন)। প্রকাশক : শ্রীমহারাজেন্দ্র সামন্ত। বিবেকানন্দ
সংঘ, বঙ্গবন্ধু (২৪ পরগণা)। মূল্য—দুই টাকা মাত্র।

‘বিবেকানন্দ’ আজ আর কোন ব্যক্তি-বিশেষের নাম নয়—একটি
আদর্শের নাম—যে আদর্শ বর্তমান বাংলার তরুণ সন্তানদের একমাত্র
লক্ষ্য হওয়া উচিত। এমন একদিন ছিল, যেদিন বাংলা ছিল সমগ্র
ভারতের আদর্শ। কালের আবর্তনে অনেক কিছুর সাথে আদর্শকে

হারিয়েছি আমরা। আমাদের সামনে উজ্জ্বল হয়েই নিশ্চিত আদর্শিক
মুক্তির পথ। মুক্তার এই করালগ্রাস হতে বাঁচার একটমাত্র পথই থোলা
আছে—সে পথ বিবেকানন্দের পথ। স্বামী প্রদ্বানন্দ বিবেকানন্দের
নামে আহ্বান জানিয়েছেন বাংলার তরুণদলকে। কামনা কবি, তাঁর
ভাকে সাদা আন্তরিক তরুণ প্রাণে। সহজ সরল ভাষায় স্বামিজীর জীবনের
ঘটনাবলী ও তাঁর বাণীর কয়েকটি দিকের আলোচনা করে স্বামী
প্রদ্বানন্দজী আমাদের কৃতজ্ঞতাভারন হলেন। ‘বাংলার বিবেকানন্দ’
বাংলার তরুণ সমাজে সারস সম্বর্ধনা লাভ করুক, এই কামনাই জানাই।
ছাপা ও বাধাই ভাল। প্রচ্ছদপট্ট মনোরম।

অলীক ধারণা ও বাস্তব সত্য—রবার্ট এক.
কেনেডি। ইউনাইটেড ষ্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিস,
৭ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩ হইতে ক্রেত ডবলিউ
দৌধুর কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

১৯৬২ সালের প্রথম দিকে বুক্তরাষ্ট্রের এটর্নী জেনারেল রবার্ট এক.
কেনেডি-ও মিসেস কেনেডি বিশ্বপরিভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। এটর্নী
জেনারেল যে সকল দেশ পর্যটন করেন, সে সব দেশে বুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে
মনোভাব কি, তার সম্পর্কে প্রচলিত অলীক ধারণাসমূহ কি এবং সংশ্লিষ্ট
বিষয়ে বুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা কি তাহারই সংক্ষিপ্ত আলোচনা এই
পুস্তিকাটিতে রহিয়াছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কে বুক্তরাষ্ট্রের নীতি ও
মনোভাব জানার পক্ষে বইখানি বিশেষ সহায়ক হইবে। ছাপা ও সজ্জা
সমকার।

Stellar Message—(Januray 1968)—Edited
by Prof. Niren Banerjee from 2A, Kalighat
Park South, Calcutta-26. Price Re 1/-

আলোচ্য মাসিক পত্রিকাটি নানা নিক দিয়ে বৈশাখ্যের দাবী রাখে।
জ্যোতির্বিজ্ঞানের বহুমুখী আলোচনা রয়েছে এই সংখ্যাটিতে। ‘The
Cataclysm and the New Age’ ও ‘জ্যোতির্বিজ্ঞানে পদার্থ
বিজ্ঞানের ধারা’—এ দুটি প্রবন্ধ স্বকীয় বৈশিষ্ট্য প্রোচ্ছল। এই সংখ্যাটিতে
প্রবর্তক সজ্জের প্রতিষ্ঠাতা সজ্জক শ্রীমতিলালের জন্মকুণ্ডলী আলোচিত
হয়েছে। এ ধরনের আলোচনার ব্যবস্থা করে পত্রিকা সম্পাদক
শক্তিবাহারী হয়েছেন। আশা করি ভবিষ্যতে বিশ্বাত ব্যক্তিদের সম্পর্কে
অনুরূপ আলোচনা যেতে পার। বিভিন্ন রেখা ও গ্রহাদির অবস্থানের
চিহ্ন সম্বন্ধিত একটি হাতের ছবি থাকলে ভাল হোত—বিশেষ করে
অনভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষে।

শ্রীশ্রী মজুমদার

সাময়িক

শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণের আবির্ভাব মহোৎসব :

জ্ঞান-পূর্ণিমায় শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোষামী প্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে শ্রীশ্রীসদগুরু সাধন-সংঘের উদ্যোগে গত ২৪শে শ্রাবণ শনিবার অপরাহ্ন ৫টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত ভবানীপুর গঙ্গাপুঙ্কর ইনস্টিটিউশনে এক মহতী ধর্মবক্তা অনুষ্ঠিত হয়। মহানশুলেবর শ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ গিরি মহারাজ এই পূণ্য অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন। সভাপতি অখণ্ড মণ্ডলেবর শ্রীমৎ স্বরূপানন্দ পবনহংস তাঁহার হৃদয় ভাষণে শ্রীশ্রীগৌসাইজীর দিব্য লীলার বিভিন্ন দিকদর্শন করান। তিনি বলেন, মহাপ্রভুর ভায় গোষামীপ্রভু আশী যে লীলা করেন, ভক্তিমানই তাগ আধারন করিতে পারেন। শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী মহারাজ, ডঃ মহানামরত ব্রহ্মচারী এবং ভাগবতবন্ধু শ্রীবিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌসাইজীর দিব্য জীবন দর্শন সম্বন্ধে হৃদিভিত্তি ভাষণ দেন। সংযুক্ত শ্রীমৎ গঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ সাধুগুণীকে ব্যাপ্ত জ্ঞানান এবং তত্ত্বমণ্ডলীকে আশীর্বাদ করেন। সঙ্গীতমহাশয় শ্রীসত্যেন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে হুমধুর ভজন গীত পরিবেশন করেন।

জাতীয় গ্রন্থাগারে পোকার উপদ্রব :

কলিকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারের সংগ্রহশালায় পোকার উপদ্রব ইতিমধ্যে আর দুই সহস্রাধিক মূল্যবান পুস্তক পোকার কটিরাছে। পোকার আক্রমণ হইতে এই গ্রন্থশালাকে রক্ষা করিবার জন্ত নয়া দিল্লীস্থিত মহাক্ষেত্রজ্ঞানার বাষ্প স্নানাগারের (ফিউমিগেশন চেম্বার)

সাহায্য লওয়া হইতেছে। বিহুদিন আগে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের মজুরে আসে যে, তাহাদের 'চীনা সংগ্রহশালায়' ব্যাপক পোকার আক্রমণ দেখা দিয়াছে। এই সংগ্রহশালায় চীনদেশের প্রাচীন সাহিত্যের বহু মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত আছে। আমরা আশা করি ভবিষ্যতে কলিকাতার জাতীয় সংগ্রহশালায় নিচেষ্টা বাষ্প স্নানাগারের ব্যবস্থা হইবে এবং মূল্যবান পুস্তকাদি বাহাতে বিনষ্ট না হয় কর্তৃপক্ষ সে বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন।

সঙ্গীতনামক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় :

বিষ্ণুপুর বরাণসীর স্বনামধন্য হরসাঁধক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় গত ২৮শে জুলাই ৮০ বৎসর বয়সে তাঁহার বিষ্ণুপুরস্থ আবাসে পরলোক গমন করেন। ১৮৭৮ সালে বাঁকুড়া জেলার এই বিষ্ণুপুরেই শ্রীগোপেশ্বর জন্মগ্রহণ করেন। সঙ্গীতের অসাধারণ প্রতিভা লইয়া তিনি তৎপ্রগ্রহণ করিয়াছিলেন। কোন গান এববার শুনেলেই তাঁহার আরম্ভে আসিত। প্রথম সঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তিনি এই সঙ্গীত-সাধনার জন্ত জীবন উৎসর্গ করেন। ১৮৯৮—৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বর্ধমানবাসিনের সভাপাদক পদে বরিত হন। ১৯১৯ সালে বেনারসে নিখিল ভারত সঙ্গীত-সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনে তাঁহার অলাপ ও প্রথম গান এতদ উচ্চাঙ্গ হয় যে সমবেত শুভাঙ্গ ও জ্ঞানী-ভগীণগণ তাঁহাকে ভারতের অদ্বিতীয় শিল্পী রূপে অভিনন্দন জানান। ভারতবর্ষের মধ্যে গোপেশ্বরই একমাত্র শিল্পী যিনি বিশ্বভারতীর নিকট হইতে উপাধি লাভ করিয়াছেন। বিশ্বভারতীর পক্ষ হইতে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে সঙ্গীত-সরস্বতী উপাধি দেন। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁহাকে 'সঙ্গীতনামক' উপাধিতে ভূষিত করেন। কলিকাতার এ্যাকাডেমি অব মিউজিক তাঁহাকে ডক্টরেট ইন মিউজিক' উপাধি দান করেন। বাংলা দেশে গোপেশ্বর প্রথম গানের পুনরুজ্জ্বল করিয়াছেন বলা যায়। তানসেন-স্বরাণব বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া তিনি এই সঙ্গীতকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন। সঙ্গীতরসপিপাসুজনের নিকট তাই তিনি স্বর্গদেব। এই প্রখ্যাত

আর মিষ্টের

স্মারক

তিল তৈল



বিশুদ্ধ ও সুপরিষ্কৃত তিল তৈল হইতে প্রস্তুত
যাবতীয় শিরঃশ্রোগ অস্থিতীয়

আর নাকীর স্নানোলের উপর প্রয়োগিত

রুচির রূপায়ণে কিনর

- ১) বিজ্ঞাপনের নমুনা
- ২) প্রচ্ছদ ও অলঙ্কার
- ৩) ভাবচিত্রণ ও ব্যঙ্গচিত্র
- ৪) হাতে আঁকা সায়েন্টিফিক চার্ট
- ৫) বহুমুখী বিশ্লেষণ ও কলেজের জন্ত
- এক রঙ ও বহু রঙের
- সামরাজ্যতলা ষ্টেশন রোড,
- ডাক : সাঁতরাগাছি, হাওড়া
- কলিকাতার টিকানা :
- C/o গীতাতারতী প্রেস
- ১১৭/১ বি, বি, গান্ধী ষ্ট্রিট, কলি-১২

সঙ্গীতনায়কের জীবনাবসানের ফলে বাংলা তথা ভারতের সঙ্গীতজগতে যে স্থান শূন্য হইল তাহা সহজে পূরণ হইবার নয়।

বিদেশে কর্মরত ভারতীয় বিজ্ঞানী :

একটি সংবাদে প্রকাশ, বিদেশে কর্মরত ভারতীয় বিজ্ঞানীর সংখ্যা প্রায় সাত হাজার। দেশী বিজ্ঞানীদের ক্রমাগত বিদেশ পাড়ি ভারত সরকারের চুক্তিভাৱ কারণ হইয়া পড়িয়াছে। নানা কড়াকড়ি সত্ত্বেও ইহাদের বাড়া অবাঁহত। জ্ঞান গিরিছে, ভারত সরকারের বিজ্ঞানীদের হ্রবিধা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও করণত বিজ্ঞানীদের তরফ থেকে সাড়া বিশেষ আশাস্বরূপ নয়। ইহার মূল আছে গিদেশী বৃত্তি ও মাহিনার পরিমাণ। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতি দপ্তরের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীহমায়ুন কবীর সম্মতি এক সাংস্কাংকারে বলেন, প্রবাসী বিজ্ঞানীদের ফিরাইয়া আনার জন্য আরও বিশদ পরিকল্পনা গ্রহণ করা সরকার। চাকুরীর শর্ত, গবেষণার সরঞ্জাম ও বিজ্ঞান-চর্চা ক্ষেত্রে ভাল করা সরকার। তাহা ছাড়া দেশের বর্তমান আর্থিক অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া প্রবাসী বিজ্ঞানীদেরও কিছুটা স্বার্থত্যাগ করা বর্তব্য।

জাতীয় অধ্যাপক ডঃ শিশিরকুমার মিত্র :

প্রখ্যাত পদার্থ-বিজ্ঞানী ভারতের জাতীয় অধ্যাপক ডঃ শিশিরকুমার মিত্র গত ১৩ই আগষ্ট মাত্র ৭০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। শিশিরকুমার ছিলেন ভারতে বেতার এবং উচ্চাকাশের তৎসংক্রান্ত গবেষণার পথিকৃৎ। অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন মৌলিক সূত্র আবিষ্কারের জন্য ডঃ মিত্র বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৪৭ সনে ডঃ মিত্রের জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ 'দি অ্যাপার এ্যাট্রিমোস্ফিয়ার' প্রকাশিত হইলে বিশ্বের পদার্থবিজ্ঞানী মহলে সাড়া পড়িয়া বাব। গ্রন্থটি অচিরেই বিভিন্ন বৈদেশিক ভাষায় অনূদিত হয়। ১৯৪৮ সালে ডঃ মিত্র লণ্ডনের রয়াল সোশাইটির 'ফেলো' নির্বাচিত হন। ভারতে রেডিও রিসার্চ কমিটির তিনিই ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেডিও ফিজিক্স ও ইলেক্ট্রোনিक्स বিষয়ে স্নাতকোত্তর বিভাগ এবং হরিনগাটার আয়নোস্ফিয়ার ফিল্ড স্টেশনটি ডঃ মিত্রের উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬২ সালে তিনি জাতীয় অধ্যাপক হন এবং 'পদ্মভূষণ' উপাধি লাভ করেন। ডঃ মিত্রের মৃত্যুতে সমগ্র বিশ্বের অপূরণীয় ক্ষতি হইল।

ভারত শিল্প নিকতন

আধুনিক ; সম্পূর্ণ ; নির্ভরযোগ্য
বুক বাইণ্ডিং কারখানা।

পুস্তক, পত্রিকা ও ছাপার যাবতীয়
বাঁধাই কাজ সস্তার ও স্থলভে সম্পন্ন হয়।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৫৬ নং সূর্য্য সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

ডি.রতন ও কোং

ফটোগ্রাফার্স

২২-১ কংওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

ফোন: ৩৪-৩৭১১

শ্রীবীজকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী এম-এ. পি-আর-এস.
শকার্ণভব—৫, শকভব—১৫,
জাতিভেদ—১, বেদ ও কোরাণের সাদৃশ্য—১,
স্বামী ভগদীশ্বরানন্দজীর মহামায়া—১-৫০
শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
প্রবাদ বাক্যের জম্মকাহিনী—১,
সত্যেন আনার রবি ভূর্ণণ (সচিত্র ৥ দাম : তিন টাকা)
প্রবর্তক পাবলিশার্স : কলিকাতা-১২

প্রবর্তক

আগামী মহালয়ায় কার্তিক পূজা সংখ্যা প্রবর্তক
যথারাতি বাহির হইবে। দাম এক টাকা।
বিঃ দ্রঃ—পূজা উপলক্ষে আগামী ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত
সম্বৎসর শ্রীমতিলাল প্রণীত গ্রন্থাবলীর উপর শতকরা
২৫ টাকা কমিশন দেওয়া হইবে।
প্রবর্তক পাবলিশার্স : কলিকাতা-১২

শুভকরের

মন্দা'-নন্দা'র দেশে ৪-০০

(নূতন দৃষ্টি ও আজিকে উপস্থাসোপম ভ্রমণ কাহিনী)

॥ প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৬১নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ॥

শ্রীশুশীলপ্রসাদ সর্বাধিকারীর

সতীরানী ৩-০০

(সমুদ্রত দাম্পত্য জীবনের অল্পম আলোচ্য)

বিদেশে বাঙালী ছাত্রীর কৃতিত্ব :

শ্রীমতী কেতকী কুশারী এই বৎসর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইংরাজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর অনার্স পাইয়াছেন। ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে অক্সফোর্ডের প্রথম শ্রেণীর ডিগ্রী ভারতে খুব কম ব্যক্তিই লাভ করিয়াছেন। ১৯৫৮ সালে শ্রীমতী কুশারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইংরাজী-সাহিত্যে ৭০ % নম্বর পাইয়া বি. এ. অনার্স পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন ও বঙ্কিম স্বর্ণপদক লাভ করেন। রাজ্য সরকারের বৃত্তি পাইয়া তিনি ১৯৬০ সালে অক্সফোর্ডে পড়িতে যান। শ্রীমতী কেতকী কুশারী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থবস্ত্রের জয়েন্ট সেক্রেটারী শ্রীঅনন্মোহন কুশারীর কন্যা। আমরা শ্রীমতী কুশারীকে এই বিরল কৃতিত্বলাভের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

এমার্জেন্সি আর আর্জেন্সি :

সম্প্রতি কলিকাতায় পনষাত্মকভাবে যাদবপুরে এক অনুসন্ধান আচার্য্য বিনোবা ঠাণ্ডে মন্তব্য করিয়াছেন, দেশে আর্জেন্সি থাকিলে এমার্জেন্সি আর কি সরকার। ভাবেঞ্জির দ্বিতীয় পর্য্যায়ের পনষাত্মক আর্থনাস্তিক ভাবগুণি সরকারের সমালোচনায় মুগ্ধ। কংগ্রেসী সরকারের সাহিত্যিক আদর্শের সংস্কৃত ক্রমশঃই নষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

বাইশ বছর পরে অনার্স গ্রাজুয়েট :

শ্রীমতী মীরা সর্বাধিকারী এ বৎসর সংস্কৃত অনার্স লইয়া স্নাতক পরীক্ষার বেণুন কলেজে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনি উচ্চ সংখ্যায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীমতী মীরা দুইটি পুত্র-

কন্যায় জন্মনী। ২২ বছর আগে লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়া গৃহকর্ত্তের মধ্যে অবসরকালে অধ্যয়ন করিয়া এবার তিনি অনার্স পরীক্ষা দেয়। শ্রীমতী সর্বাধিকারী, চারণকাবি শ্রীময়জ্ঞ সর্বাধিকারীর পত্নী এবং ক্রীড়া সম্রাট নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারীর পুত্রবধূ।

বিনোবাজীর ব্যয় :

গত ২৩শে জুলাই কোন কোন সদস্যের প্রস্তাবণেব উত্তরে পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅরুণচন্দ্র সেন বিধান পরিষদে এই তথ্য প্রকাশ করেন যে, আচার্য্য বিনোবা ভাবের পশ্চিমবঙ্গ পনষাত্মক উক্ত একমাত্র সরকারী গাড়ী ব্যবহারের খাতেই সাতাশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। ২১শে সেপ্টেম্বর হইতে '৬০ সালের ১৯শে জুলাইএর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মোট ৫৫,৪৬৪ টাকা ৭৪ নং পং ব্যয় হইয়াছে। জাতীয় সড়কের কালে সরকার যখন নানাবিধ 'সকল পরিবহন' গ্রহণ করিতেছেন তখন এই ধরনের সরকারী অপব্যয়ের প্রতি কোন কোন সদস্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অল্প কোন রাজ্যে ভাবেঞ্জী রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠার মর্যাদা পান নাই অথচ পশ্চিমবঙ্গে পাইয়াছেন।

কলিকাতায় আর একটি ব্লাড ব্যাঙ্ক :

রক্তের সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য কলিকাতায় আর একটি ব্লাড ব্যাঙ্ক খোলার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। শেঠ হুৎলাল কর্ম্মানি মেমোরিয়াল হাসপাতালে এই ব্লাড ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইবে। ইহা কলে আশা করা যায় অনেক কালের উপলব্ধি একটি অভাব অনেকটা মিটিবে।

শ্রীলক্ষ্মী মজুমদার

ফোন :
৪৪-৪৩৮১, ৮২



ব্রাহ্ম :
ব্রাহ্মসকল

পশুপতি দাম এণ্ড সন্স
প্রাইভেট লিঃ

ওয়েবসাইট : www.pashupati.com

৪৩/২ ও ৩৭এ, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড, কলিকাতা-১৪।
বাড়ীতে চাউল পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা আছে।

সম্পাদক : শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৬১ বিপিনবিহারী গান্ধী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি. এ. কর্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত।

প্রবর্তক প্রিন্টিং এণ্ড হাক্সটোন লিমিটেড, ৫২/৩ বিপিনবিহারী গান্ধী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীকিশোরী রায় কর্তৃক মুদ্রিত।



আশ্বিন, ১৩৭০

প্রাণুটের ঘনঘটার অবসান, মেঘমালা উদ্ভিন্ন করিয়া স্বর্ধ্যাকিরণ বর্ষণে সরসীর বৃকে কমলদল বিকশিত, শারদ জননীরা আগমন-সঙ্কেত-চরণ-নুপুর হংস'নাদে প্রতিগোচর হয়। নদী-পুলিন বিস্তৃত, আকাশে কাকলী ধ্বনিতে সারস শ্রেণী, কুন্দের মূহুরাস্ত বনে বনে, শ্যামায়মান বন-শোভায় নয়ন উৎফুল্ল হইয়া উঠে, অলিকুলের গীতধ্বনি, শরৎ হৃন্দরীর স্রমধুর সম্ভাষণ, নিশীথ প্রকৃতি আজ বর্ষার ধোমটা ধুলিয়া নূতন সাজে বিশেষরী জগজ্জননীকে বরণ করিবার অস্ত্র প্রস্তুত। হে মাহুষ! তুমি কেন এখনও তল্লাস, জড়তাচ্ছন্ন, বিষন্ন। উদ্ভুদ্ধ হও। দেবী ভগবতীর আগমন সংবাদে তোমার প্রাণ উৎসাহে উদ্ভুদ্ধ, আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠুক। তুমি জাগাও তোমার মধ্যে সেই পূত পাবন-মূর্ত্তি জাতবেদাকে—যিনি তোমার অন্তরের হবন বহন করিয়া লইয়া যাইবেন বিশ্বজননীর চরণ তলে। জাতবেদা জাগ্রত না হইলে মায়ের পূজাবেদী প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বাধা স্বধা ববট্কার মস্ত্রে দেবী চণ্ডিকার আবাহন, সবই ব্যর্থ হইবে—কারণ হোমের একমাত্র হব্যবাহী যে তিনিই। তাই বলি হে মাহুষ—ক্ষণ হারাইও না। মহাক্ষণ সমাগত। অবহিত হও। আপনার মাঝে মহাশক্তির জাগরণ অনুভব কর। তুমি হও শক্তির বরপুত্র। তোমার শুভ শক্তির কাছে অশুভ শক্তি পরাজিত পশুদন্ত হউক। সতর্ক থাকিও, অতস্র হইয়া পাহারারত হও—হলে বলে কৌশলে অস্ত্র শক্তি না তোমার অন্তরের পাবন-মূর্ত্তি জাতবেদাকে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। মা আসিতেছেন, মায়ের আগমন কাল আসন্ন—বিশ্বের সকল অমঙ্গল বিদূরিত করিয়া কল্যাণী মাতৃশক্তির আবাহনে দিক মুখরিত কর। পবিত্র মাতৃ নামে জগতের যত কলুষ সব দূরে অপসারিত হউক। তুমি মাতৃব্রতী সন্তান—রক্ষা কবচরূপে অবিরত মাছু নাম জপ কর। জপিতে জপিতে অন্ধ যখন অবশ হইয়া আসিবে, তখনই মাতৃ করুণায় তুমি অভিষিক্ত হইয়া ধৃত হইবে, তোমার মধ্যে সত্যশিব-সুন্দরের আবির্ভাব হইবে। মা আর তুমি, তুমি আর মা—এক হইয়া যাইবে। বিশ্বজননী, জগজ্জননী, দেশজননী অভেদ মূর্ত্তিতে এক মহামহিমময়ী মাতৃ-মূর্ত্তিরূপে তোমার মধ্যে ফুটিয়া উঠিবেন। মর্ত্যের বৃকে এই মায়েরই চরণ চিহ্ন আঁকিয়া উঠে—প্রকৃতিরোগী তাই তাঁর শ্যামাকল বিছাইয়া ধরেন। আর তুমি মাতৃভক্ত সন্তান—তুমি কি করিবে! তোমার হৃদয়াসন পাতিয়া দাও—অলঙ্কৃত রঞ্জিত মায়ের চরণ স্পর্শে হৃদয় তোমার আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠুক। [সংকলিত]

ଅଫସରଙ୍କ ଦ୍ଵିୟତିନାମ

অনুচ্ছেদ

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ (প্রথমঃ অষ্টকং । সপ্তত্রিংশং স্কন্ধঃ ।) দ্বিতীয়া অঙ্ক

(সম্বৎসর শ্রীমতিলালের জীবন-ভাষ্য অনুসরণে)

শ্রীঅনিলবরণ তর্কবেদান্ততীর্থ

যে পৃথ্বীভিঃ ষ্টিভিঃ সাকং বাশীভিরঞ্জিভিঃ

অজায়ন্ত স্ব ভানবঃ ॥ ২ ॥

অর্থ—“যে” (যাহারা অর্থাৎ যে মরুদেবগণ) “পৃথ্বীভিঃ” (মেঘের দ্বারা) “ষ্টিভিঃ” (আয়ুধ অর্থাৎ বজ্রাদি দ্বারা) “বাসীভিঃ” (বাক্য অর্থাৎ শব্দের দ্বারা) “অঞ্জিভিঃ” (অলঙ্কার অর্থাৎ বিদ্যাতের দ্বারা) “সাকং” (সহ) “স্ব ভানবঃ” (স্বকীয় দীপ্তিতে দীপ্তিযুক্ত) “অজায়ন্ত” (জন্ম করি) ॥ ২ ॥

সরলার্থ—যে মরুদেবগণ মেঘ, বজ্র, শব্দ এবং বিদ্যাতের সহিত স্বকীয় দীপ্তিতে দীপ্তিযুক্ত-সেই মরুদেব-গণের আমরা জন্ম করি।

বিশদার্থ—সকলেই জানেন, সব বায়ুই বৃষ্টির কারণ হয় না। ঋষি তাই সেই মরুদেবগণের স্তুতি করিতেছেন, যে মরুদেবগণ বৃষ্টির কারণ। “যজ্ঞাং ভবতি পর্জন্ত” —যজ্ঞ হইতে মেঘোৎপত্তি তো হইল, কিন্তু সেই মেঘকে তো আবার বৃষ্টিতে রূপান্তরিত করিতে হইবে—কারণ সব মেঘেই তো আর বৃষ্টি হয় না। মেঘেরও তো আবার গুর ভেদ আছে। বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন ধরণের মেঘ দৃষ্ট হয়। কোন মেঘ শুধু আকাশের শোভা বৃদ্ধি করিয়া দল বাঁধিয়া ভাসিয়া বেড়ায়—কবির ভাষায় “দল বেঁধে চলে মেঘ ভেসে ভেসে”। কোন মেঘ আবার ঝির ঝির করিয়া বারিপাত হয়। কোন মেঘ আবার বিরাট দৈত্যের মত আকাশ কালো করিয়া ছুটিয়া আদে—সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাতের ঝলকানি ও তীব্র বজ্রনির্ঘোষে প্রবল বারি বর্ষণে পৃথিবী ভাসাইয়া দেয়। ইহাকেই বলে জলদ মেঘ। এই জলদ মেঘকেই মরুদেবগণ যখন আহ্বান করিয়া আনেন, তখন তাঁদের বলের পরিচয় পাওয়া যায় না কি? পূর্বে ঋকে ঋষি তাহারই পরিচয় দিয়াছেন। আবার নবীন জলদ মেঘে আকাশ যখন ঢাকিয়া যায়, তখন বাতাসের যে দাপাদাপি, যে শৌ শৌ শন্ শন্ আওয়াজ, তাহা কি আমরা শ্রবণ প্রত্যক্ষ করি না? পরবর্তী তৃতীয় ঋকে ঋষি বাতাসের এই শন্ শন্ শব্দের বর্ণনা প্রদান করিবেন। এই ঋকে ঋষি আধুনিক ভাষায় বাহাকে “মৌসুমী” বায়ু বলে, সেই বায়ুরই বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। বায়ু তো রূপহীন, তবে কাহাদের লইয়া সেই মরুদেবগণ “স্ব ভানবঃ”—স্বয়ং দীপ্তিমন্ত: হইতে পারেন? বড় চমৎকার ভাষায় ঋষি বলিয়াছেন “পৃথ্বীভিঃ” “ষ্টিভিঃ” “বাসীভিঃ” “অঞ্জিভিঃ” সহ। আমরা বায়ুকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিতে পারি না, কারণ সে অরূপ, কিন্তু মেঘকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করা যায়। এই মেঘ আসে কোথা হইতে? উহা কি বাতাসেরই বাষ্পকণা নহ? আচার্য সায়ন বলেন—পৃথ্ব্যো মরুতামিতি নির্বচ্যাবুত্ভাং—নির্বচ্যেতে মরুতাং অর্থাৎ বায়ুর পৃথ্ব্য বাহন এইরূপ পাঠ আছে। তারপর “ষ্টিভিঃ” শব্দে আয়ুধ: বুঝায়। জলদ মেঘের আয়ুধ যে বজ্র, তাহা সহজেই অনুমেয়। অতঃপর “বাসীভিঃ”—বাস্ত: শব্দবিশেষাঃ—বাঙ্ নাম সমূহ মধ্যে বাশী, বাগী এইরূপ পাঠ থাকায় “বাসীভিঃ” অর্থে বাতাসের শব্দকেই সূচিত করে। বিলক্ষণ শব্দে বায়ুর গুণীয়তে—বিশেষ লক্ষণযুক্ত শব্দের দ্বারাই বাতাসের অনুমান হয়, ইহা আমরা প্রতিনিয়তই অনুভব করিতেছি। সর্বশেষে “অঞ্জিভিঃ”—অঞ্জি শব্দে অলঙ্কার অর্থ স্ফোতনা করে। বিদ্যায় যে জলদ মেঘের অত্যুৎকৃষ্ট অলঙ্কার তাহা কি আর বলিতে হইবে? “সজল জলদ কোলে যেন স্থির সৌদামিনী”—এ-যুগের কবি-মনের এমন উৎকৃষ্ট উদাহরণ কোন অদূর অতীত আরণ্যক যুগের ঋষি মনেও উদিত হইয়াছিল—ভাবিতেও প্রচ্ছন্ন মন সরিয়া উঠে। পৃথিবীর কল্যাণের জন্ত সেই আদিম যুগের প্রণয় ঋষিকুল যজ্ঞান্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া সেই মরুদেবগণেরই স্তুতিমন্ত উচ্চারণ করিতেছেন—যাহারা পৃথ্বী—মেঘ, ষ্টি—বজ্র, বাশ্ত—শব্দ এবং অঞ্জি—বিদ্যায় প্রভৃতিব সহিত স্বকীয় দীপ্তিতে দীপ্তিযুক্ত হইয়া পৃথিবীকে দ্বারাবর্ষণে অভিষেক করিয়া শত্ৰুশালিনী করিয়া তুলিবেন ॥

স্বদেশচিন্তায় নজরুল

শ্রী আশুতোষ শর্মা

আজ আমরা খুব জোর গলায় একটা কথা বলার স্পর্ধা রাখি যে, সাহিত্যে ও সমাজে যত গলদই দেখা দিক, যত কুসংস্কারকেই আমরা মিথ্যার আবরণে ঢাকতে চেষ্টা করি না কেন, অন্তত, স্বদেশচিন্তার দিক দিবে আমরা এখনো খাঁটি। মোট কথা, আমাদের সাহিত্যে স্বদেশ-চিন্তায় কোন গলদ নেই। এবং, এ ব্যাপারে আমরা বিদেশী প্রভাবের তত ধার-ধারি না।

১৮২৩ সালে রামমোহনের কল্যাণে যে স্বদেশ-চেতনার উদ্বোধন হয়েছিল, বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তার সার্থক পরিণতির রূপ লাভ করে স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময়-কাল পর্যন্ত একটা উজ্জল ইতিহাস। এই সময় কাব্য-কথায়, গানে-নাটকে স্বদেশচিন্তার একটা নবযুগ সৃষ্টি হয়েছিল। এবং, এযুগে সকল বাণীদাতকই অল্পবিস্তর বিদ্রোহের নিশান উড়িয়েছেন। সকলেই বিদেশীর দাসত্ব থেকে আপন দেশকে উদ্ধার করার স্বপ্ন দেখেছেন, সকলেই হয়েছেন বিদ্রোহী। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে তাঁর অমুজ্জ্বলানীম কবিকুলের মধ্যে দেশাত্মবোধের উজ্জল দৃষ্টান্ত আছে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায়। এই দিক দিয়ে এই কবির সার্থক অমুসারী কবি হচ্ছেন নজরুল ইসলাম।

‘ধুমকেতু’তে ‘বিদ্রোহী’ কবিতা নিয়ে নজরুল যখন বাঙলা সাহিত্যের আভিনায় প্রথম প্রবেশ করেন, জাগ্রত রবীন্দ্র-প্রভাবের মধ্যেও এই উদীয়মান কবিটির দিকে সেদিন বাঙলা সাহিত্যের রসিক ব্যক্তির ফিরে তাকিয়ে-ছিলেন। পরবর্তীযুগে এই বিদ্রোহের অভিযানেই নজরুলকে বিশেষত্ব দান করেছে। এবং, বিদ্রোহের মধ্যেই নজরুলের স্বদেশচিন্তার তাৎপর্য উদ্ঘাটিত। তিনি স্বদেশমুক্তির স্বপ্ন দেখেছেন বিপ্লবের মধ্যে : জাতির বহু শতাব্দীর দীনতা দূর করার পক্ষে যে বিপ্লব ছিল অবশ্যস্বাভাবী।

নজরুল মুসলমান সন্তান। দারিদ্র্য জন্মগত অধি-কারের মত তাঁকে লালন ক’রেছে। জীবনে বহু ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য ক’রেছেন। মিশেছেন বিভিন্ন গাছের

সঙ্গে। হুতরাং, জগত ও জীবন সম্বন্ধে তাঁর যে অভিজ্ঞতা, তা’ তিনি কাব্য-কাহিনীর পৃষ্ঠা থেকে অর্জন করেন নি। তাঁর জীবনই সমাজ-ইতিহাসের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত। তাই, নজরুলের কবিতায় জ্ঞান পাই না, কিন্তু সত্যের প্রত্যক্ষ প্রকাশ দেখে বিস্মিত হই। তিনি সমাজকে যে-ভাবে দেখেছেন, সে-ভাবেই প্রকাশ ক’রেছেন। নিজের তিস্ত অভিজ্ঞতায় যা বুঝেছেন, তাই বলেছেন। নিছক পাণ্ডিত্যকে তিনি উপস্থিত করতে চান নি।

সাহিত্যে ‘জাতির’ বুঝি কোন প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু সাহিত্যে জাতির ছাপকেই বা অস্বীকার করা চলে কই? নজরুলের চোখে স্বদেশচিন্তা যে-ভাবে ধরা পড়েছে, জানি না, তিনি হিন্দু-সন্তান হ’লে সে-ভাবে ধরা পড়ত কিনা! কারণ, ইতিহাস বার বার এ কথা আমাদের স্মরণেছে যে, স্বদেশচিন্তাকে যদি জাতির গণ্ডির মধ্যে বেঁধে রাখা হয়, তা হ’লে সে-স্বদেশচিন্তার বুক্ষে স্বাধীনতার কোন ফল ফলে না। তাই, মুসলমান আমলে ঠিক এই কারণেই সমস্ত প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ ক’রে স্বাধীনতার ফলটি অকালে মাটিতে বরে পড়েছিল। সিরাজের মত স্বদেশ-চেতা বীরের পাশেই জন্মেছিল মীরজাফরের মত কীটের দল। কিন্তু ইতিহাসের এই অমোঘ পরিণতির কথাকে আমরা মনে রাখতে পারি নি। তাই জাতির কাণ্ডারীকে আমরা প্রশ্ন ক’রেছি : ‘হিন্দু না ওরা মুসলিম?’

এ প্রশ্নে নজরুল মর্মাহত হয়েছেন কি? বরং সোজা কথায় বলা চলে তিনি ব্যথিত হয়েছেন। আর এর পর তিনি যে উত্তর দিলেন, স্বদেশচিন্তায় সেটিই নজরুলের যথেষ্ট প্রমাণ। ছুর্যোগ রাজ্যে তিনি তুচ্ছ করেছেন সমস্ত পরিচয়কে। বড় হয়ে উঠেছে এক পরিচয় : সন্তান মোরা মার।

কাজেই, নজরুল স্বদেশচিন্তাকে কোন জাতির গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চাননি—এ কথা যেমন সত্য, তেমনি, তিনি স্বদেশচিন্তায় যে বিপ্লবের পক্ষপাতী ছিলেন—এ’ কথাও যথার্থ। তাঁর এ বিদ্রোহের অভিযানকে সকলেই যে সহজভাবে মেনে নিয়েছিলেন—এ’ কথা বলার দুঃসাহস

আমাদের নেই। এমন কি রবীন্দ্রনাথও নজরুলের সম্বন্ধে কিছুটা আশংকাই যেন পোষণ করেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আশংকার মূলে যে কারণই থাক, নজরুলের নির্ভীক স্বদেশচিন্তার কল্যাণে সে-যুগের যুব-হৃদয় যে আত্মচেতনার পথ ধুঁজে পেল, স্বদেশকে যে-ভাবে জানবার শক্তি অর্জন করল, স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পূর্ব-মুহূর্তে তার মূল্য কম ছিল না। রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞেয়লালের গান ছাড়া সে-সময় আর যিনি দেশের যুব-বক্ষে আঙনের ছোঁয়া দেওয়ার সার্থক অধিকারী ছিলেন তিনি নিঃসন্দেহে কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর গান ও কবিতা সে-কালের যুবকদের মুখে মুখে ধ্বনিত হ'ত। কঁাসির মধ্যে গিষে দাঁড়বার যোগ্য মস্ত ছিল তাঁরই কবিতা-গান। এবং, আজো আমরা যখন স্বদেশচিন্তার পরিধিতে ফিরে আসি, তখনো মনে পড়ে বিদ্রোহী কবি নজরুলকে।

কিছু প্রেমের কবিতা ছাড়া নজরুলের অল্প সমস্ত কবিতার মধ্যেই ছড়িয়ে আছে উগ্র দেশাত্মবোধ। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্র সমসাময়িক কবি বিজ্ঞেয়লাল ছাড়া বাঙালার কাব্য-ভাণ্ডারে এ উগ্রতা অল্পপস্থিত। এটা নজরুলের কবিতার দোষ গুণ দুই-ই। দোষ এই দিক দিয়ে, তাঁর কবিতা সার্বভৌমত্বের দাবী ঘোষণা করতে পারে না। কিন্তু, এই উগ্র স্বভাব নজরুলকে বিদ্রোহী বাঙালীর হৃদয়ের অন্তঃপুরে টেনে আনতে সাহায্য করেছে—গুণ এইটাই। উগ্র দেশ-প্রেম যে সর্বক্ষেত্রে বৈশাখিক নয়, বরং কোন-কোন ক্ষেত্রে দেশের গরিমাকে বিশ্বসকাশে তুলে ধরে, আমাদের দেশে তার প্রমাণ আছেন চারণ-কবি বিজ্ঞেয়লাল রায়।

এত স্নিগ্ধ নদী কাহার ?

কোথায় এমন ধূস্র পাহাড় ?

কোথায় এমন খেলে তড়িৎ এমন কালো মেঘে ?

হেথাষ পাখির ডাকে ঘুমিয়ে পড়ি পাখির ডাকে জেগে।

(—বিজ্ঞেয়লাল রায়)

আর নজরুলের—

সত্যি কিন্তু তাই !

যখন মোদের বক্ষে বাঁধা ভাইগুলির এই মুখের
পানে চাই—

কেমন সে এক ব্যাথায় তখন প্রাণটা কাঁদে যে সে !

কে যেন দুই বজ্রহাতে চেপে ধ'রে কলজের খানে পেঁষে।

নিজের হাজার ঘায়েল জমিন ভুলে' তখন ডুকরে
কেন কেঁদেও ফেলি শেষে !

নজরুলের প্রভাব সে-কালের যুবকদের যে কতখানি প্রভাবিত ক'রেছিল, তার দৃষ্টান্ত রয়েছে যথেষ্ট। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁর 'নারায়ণ' পত্রিকায় নজরুলকে স্বাগত জানিয়ে আর একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করে গেছেন। তিনি বুঝেছিলেন, নজরুলের মত আবেগ ঝরানো গান, একটা জাতির নবজাগরণের পক্ষে বিশেষ কল্যাণকর। বিশেষতঃ যে-জাতিকে তার আপন স্বাধীনতা অর্জন করতে বিদেশী-দের সামনে দাঁড়াতে হবে বিদ্রোহের ভূমিকা নিষে। দেশমাতৃকার সেবায় যেখানে সব চেয়ে বড় প্রয়োজন হয়ে উঠেছে জীবন উৎসর্গের সেখানে জীবন দানের আবেগকে গ্রহণ করতেই হয়। এবং, নজরুল নিঃসন্দেহে আবেগের কবি; আর সে-আবেগ, মাষের ডাকে জীবনকে তুচ্ছ করার আবেগ।

ধূস্র সমালোচকগোষ্ঠী নজরুলের এ ধরনের কবিতা ও গানের যে সমালোচনাই করুন, তাঁদের সমালোচনার অণুবীক্ষণে নজরুলের কবিতার যত ক্রটিই ধরা পড়ুক না কেন, স্বদেশচিন্তার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে একথা স্বীকার করতে হবে যে, নজরুল এদিক দিয়ে একজন সার্থক স্রষ্টা। কারণ, স্বদেশচিন্তার ক্ষেত্রে আমাদের দেশের কবির। চিরকালই বড় বেশী আবেগের পক্ষপাতী। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এই দোষে ছুট। বাঙলা মাকে সন্মোদন ক'রে যখন তিনি ব'লেছিলেন, 'আমার সোনার বাঙলা তোমায় ভালবাসি'—তখনো সোনার বাঙলার অর্ধেক লোক ছু'বেলা পেটভরে খেতে পেত না। দৈব গুণের যে-কবিতা 'অশ্লীল' ব'লে আমাদের নাসিকা কুঞ্চিত করতে হয়, স্বদেশচিন্তার খাতিরে সেই কবিতাকেই তো আমাদের আদর করে তুলে নিয়ে মাপতে হয় তাঁর দেশাত্মবোধের গভীরতা।

স্বদেশচিন্তার ভূমিতে দাঁড়িয়ে আমরা যে-ভাবটাকে সহজে গ্রহণ করি—যার শ্রোতে গা ভাসিয়ে দিই,—তার নাম আবেগ। এবং, দেশমাতৃকার আত্মানে যখন সারা



শিল্পীমন

— শ্রীধর লোকে স্বর্গ —

(পূর্বাহ্নবৃত্তি : ভাত্র সংখ্যার পর)

দেবকুমার খজুরপুরীর পথ ধরলো। কোন কিছু মনস্থি কবে দেবকুমার পথে নামেনি, নিরালার আকর্ষণ ছেড়ে বেরিয়ে পড়া দরকার বলে মনে করেই সে পথে নেমেছিল। সাধনার পথ ত্যাগের পথ।

নর্মদার কাঠের সাঁকো পার হয়ে সে ভুট্টার খেতে পড়লো, ক্ষেতের পিছনে প্রান্তর, তারপর বন, সবুজ গাছের রেখা আকাশের গায় গিয়ে গিশেছে।

ক্ষেতের পথে গাছের ছায়া নেই। প্রান্তরে দ্বিপ্রহরের উনবতী, রুক্ষ নীরস কঙ্করময় প্রান্তর রৌদ্রে তপ্ত হয়ে ওঠে। পায়ে কাঁকর বেঁধে না যে তা নয়, তবে খালি পায়ে চলা আজন্মের অভ্যাস, পদক্ষেপ শ্রুত হয় না।

প্রান্তর ছোট ছোট আগাছা ও কাঁটা গাছে আকীর্ণ।

দেশ উন্মুখ হয়ে ওঠে, জীবনটাকে মনে হয় অতি তুচ্ছ তখন নিশ্চয় আমরা সমালোচনার চশমা এঁটে দেশাস্ত্র-বোধক কবিতা ও গানের সমালোচনা করতে বসি না। সুতরাং, যখন আমাদের দেশপ্রীতির মহাপরীক্ষা দিতে

গ্রীষ্মের ছপ্পুরে এই পথে পা বাড়াতে পথিক ভয় পায়। শীতের ছপ্পুরের দম্কা হাওয়ায় গ্রীষ্মের খরভাব থাকে না। তবু একটা জলপাত্র সঙ্গে থাকলে ভাল ছিল। দেবকুমার ঘটিটা সঙ্গে না এনে ভুল করেছে। কিন্তু এখন আর সে কথা ভেবে লাভ নেই। কাঁকরের কণাগুলো রোদ লেগে হীরার মত চিকমিক করে। আগাছার বিস্তার দৃষ্টিকে আড়াল করে দেয়। কতক্ষণে এই প্রান্তরের শেষ হবে জানা নেই, দেবকুমার শুধু এগিয়ে চলে।

ছপ্পুর অবধি রোদ যদি বা সহ্য যায়, ছপ্পুরের পরে রোদের রুক্ষতা যেন বৃদ্ধি পায়। শীতের দিনে এই পডন্ত বোদটাই পথিকদের ব্যাকুল করে। দেবকুমার ক্ষুধা-ভুক্ষায় এবার সত্যিই অবসন্ন হয়ে পড়ে। এতো পথ জীবনে সে অতিক্রম করে নি, এপথে সে আসেও নি কোনদিন। সে শুনেছে পথের মাঝে ইঁদারা আছে, ধর্মশালা আছে। কিন্তু সে আর কতদূর?

কিন্তু দেবকুমার তখন এসে পড়েছে, সামনেই গাছের আড়ালে পথের পাশে ছোট ঝোপড়ি তার নজরে আসেনি। ছাদটা নেহাৎ নীচু। সামনেই একটি ইঁদারা। ইঁদারার সামনে টেকিষন্ত্র লাগানো আছে। কিন্তু জলপাত্র?

দেবকুমার ঝোপড়ির পানে তাকালো। কে যেন শুয়ে আছে সেই ঝোপড়ির মধ্যে, দেয়ালের আড়ালে গেরগা বসনের কিছুটা দেখা যাচ্ছে। দেবকুমার ঝোপড়ির মধ্যে প্রবেশ করলো।

ভিতরের মানুষটি দ্বারের পানে তাকিয়েই শুয়ে ছিল, বললো—কে? কোথা থেকে আসা হলো?

—আমি একজন ভাস্কর, আসছি যোগিনী ঘাট থেকে। আপনার ঘটিটা একবার দেবেন?

—পথে বেরিয়েছ আর একটা ঘটি সঙ্গে নাও নি?

—অতো খেয়াল ছিল না।

—খেয়াল করিয়ে দেবার মত মানুষ বুদ্ধি কেউ নেই বাড়ীতে?—শায়িত লোকটি ঈষৎ হাসলো, হাতের

জীবন বলির প্রয়োজন সামনে এসে দাঁড়াবে, তখন আমরা স্মরণ করব নজরুলকে। বিদ্রোহী কবিকে। কারণ, নজরুল আমাদের রক্তে আগুন জালাবার ক্ষমতা রাখেন আজো। আমরা জানি তিনি চির বহুমান।

পাশেই ঘটিটি ছিল, এগিয়ে দিল। ঘটি নিয়ে দেবকুমার আর দাঁড়ালো না, তৃষ্ণায় তখন তার বুক শুকিয়ে গেছে।

জলপান করে, এক ঘটি জল হাতে নিয়ে দেবকুমার ফিরলো। যুবক বললো—বসো, আহার হয়েছে।

—না, প্রত্যুষেই বেরিয়েছি—দেবকুমার বললো।

—হাতু আর শুড় আছে আমার খোলার মধ্যে, বের করে নাও।

এই ধরনের অতিথি সংস্কার সে যুগে প্রচলিত ছিল। একজনের কাছে খাওয়া থাকতে আরেকজন ক্ষুধার্ত থাকবে একথা তখন হিন্দুর মনে স্থান পেতো না। স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি ছিল ঘরে ঘরে। সম্রাট শ্রিয়দর্শী অশোকের কাল থেকে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা যে ধর্মভাব ও আদর্শ জীবন গ্রামে গ্রামে প্রচার করে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মহাশূন্যের উদ্বোধন করেছিল তাতে মানুষ আত্মসম্মতির উপরে চরিত্রের পবিত্রতা ও দৈব সঙ্গুণে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল, হিন্দুস্থানের জনপদবাসীরা তখন দেবত্ব উন্নীত হয়েছিল। মানুষ মানুষকে আত্মীয় বলে মনে করতো, সবাই ছিল মমূর বংশধর, অমৃতশ্রু পুত্রাঃ, বসুধৈব কুটুম্বকম্। মানুষকে মানুষ নারায়ণ জ্ঞান করতো—অপরিচিত অনাহুত ছিল দেবতা, অতিথি নারায়ণ, আসমুদ্র হিমাচলে আশ্রয় ও আহার্যের অভাব হতো না কারও। দারিদ্র্যের কোন অপমান ছিল না। বিহুর এক থালা খুদ নিয়ে দ্বারকার রাজা শ্রীকৃষ্ণকে আপ্যায়িত করতে সঙ্কোচ পাননি।

হাতু শুড় ধোয়ে, জলপান করে দেবকুমার তৃপ্ত হলো, এবার আলাপ হলো মানুষটির সঙ্গে।

কল্যাণকুমার শ্রেষ্ঠী। খজুরপুরীর পথে দেব-তাল্লাও বলে যে জনপদ আছে, সেইখানে তার বাস। সদাগরি করার চেয়ে সঙ্গীত-চর্চার দিকেই তার আগ্রহ বেশি, খজুরপুরীর সঙ্গীতাচার্য সুরসেনের কাছে কয়েক বছর ধ্রুবপদ সঙ্গীতের সে সাধনা করেছে, ভালো বীণ্কার বলে খজুরপুরীতে তার খ্যাতি আছে। সুরসেনের মৃত্যুর পর উজ্জয়িনীর নাটশাস্ত্রী ভাস্কর্য্যাস্তির খ্যাতি শুনে সে সেখানে যাবার জন্ত পথে বেরিয়েছিল, কিন্তু সহসা কাল থেকে জরে শয্যাগ্রহণ করেছে। কাল বিকালে যখন গ্রাম ছেড়ে চলে আসে তখনও এতটা বোঝেনি, কিন্তু

আজ প্রত্যুষে এখানে আর মাথা তুলে দাঁড়াবার অবস্থা নেই। একক এই ধর্মশালায় বড় নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছিল, এখন দেবতার আশীর্বাদের মত দেবকুমার এসে পড়েছে।

কল্যাণ ভিজ্ঞাসা করলো—তোমার কি তাড়াতাড়ি যাবার কোন ব্যস্ততা আছে?

দেবকুমার বললো—না, কোন উদ্দেশ্য নিয়ে আমি বেরোয়নি। পথে ঘুরতে বেরিয়েছি—তীর্থ করতে।

—বাড়ী থেকে ঝগড়া করে চলে এসেছ বুঝি?

—না, ঝগড়া করার মত কেউ নেই।

—কেউ নেই? মা বাবা তাই বোন?

—না, আমি একা।

—গৃহিণী?

—আমি কুমার।

—ওঃ, তাই গৃহে কোন আকর্ষণ নেই, গৃহিণীম্ গৃহম্ উচ্যতে। যার গৃহিণী নেই, তার গৃহ তো সর্বত্র—যেখানে থাকবে সে-ই তোমার বাড়ী। তুমি তাহলে এখানেই থেকে যাও, দু-একটা দিন, আমি তোমার সঙ্গেই যাব। তোমাকে নিয়ে যাবো খজুরপুরী। তুমি তো ভাস্কর। দেখবে ভাস্কর্য্য কাকে বলে। খজুরপুরীর মত ভাস্কর্য্য এ তল্লাটে আর কোথাও নেই। সঞ্চয়ী ও বিদিশাস্য কিছুটা দেখতে পাবে। গেছ সেখানে?

—না।

—তাহলে তো খজুরপুরী তোমাকে বিস্মল করে দেবে। তুমি থাকো, তোমাকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাবো। খজুরপুরীর মঠ-মন্দির দেখলে তুমিও মূর্তি খোদাই করতে বসে যাবে। বলবে থালা বাটি আর কাটবো না, আমি দেবদেবীর মূর্তি কাটবো। ভাস্কর পাথর কেটে কি করতে পারে সে খজুরপুরী না দেখলে বোঝা যায় না।

দেবকুমার বললো—ভাল, আপনার সঙ্গেই যাবো।

যাবো বললেও সেই ছাউনি থেকে বেরতে দেব-কুমারের দুটো দিন লাগলো। কল্যাণের অর ছাড়লো, পরদিন রাতে। তৃতীয় দিন প্রত্যুষে দু'জনে ছাউনি ছেড়ে পথে নামলো।

পথ চলতে চলতে কল্যাণ খজুরপুরীর নানা কথা

বলে—ওখানে দেখবে শুধু খেজুর গাছ। এই আগাহার জল শেষ হয়ে যেই খেজুর গাছের বন দেখা দেবে। তখনই জানবে খাজুরাপুরীতে পৌঁছে গেছি। খেজুরের জলই এখানকার নাম খজুরপুরী। এরা খেজুর রসের যা সরবৎ বানায়, এক পাত্র খেলেই মন তাজা হবে যাবে। তোমাকে আগি খাওয়াবো, তুমি চল।

দেবকুমার বললো—খেজুর রস থেকে তো মাদক তৈরী হয়।

—মাদক হলো অশু জিনিষ। এ সরবৎ, এ খেলে নেশা হয় না, শরীরে শক্তি হয়। রাত্রে একপাত্র খেয়ে শুলে, সকালে উঠে দেখবে শরীর চঞ্চল করছে। এই যে তিনদিন জ্বরে ভুগলাম, এক পাত্র পেটে পড়লে প্রথম দিনেই জ্বর পালিয়ে যেতো।

খেজুর রসে তাড়ি ছাড়া যে আর কিছু হয়, দেবকুমার তা বিশ্বাস করে না, চুপ করে থাকে।

কল্যাণ খাজুরাপুরীর মন্দিরগুলির কথা বললো।
এখানকার চণ্ডী মন্দিরে চণ্ডীমাতা বড় জাগ্রত। কত সাধক এই মন্দিরে সিদ্ধিলাভ করে গেছেন। যে একান্তভাবে এখানে বসে দেবীকে ভাকতে পারেন তিনি দেবীর সাক্ষাৎ পান। মগধের গুপ্তরাজারা এই মন্দিরটি তৈরী করে দিয়েছেন। এমন উঁচু যে চুড়াটা যেন যেবে গিয়ে ঠেকেছে। পাথরের এতো বড় মন্দির এ অঞ্চলে আর নেই। আর দেখবে মরকত মহাদেব আর নীলকান্ত মহাদেব। মরকত মহাদেব একখানি পুরো পাল্লার তৈরী শিবলিঙ্গ, ভিতর থেকে সবুজ আভা বেরুচ্ছে। তাঁর পাশেই আছেন—নীলকান্ত মহাদেব, আসল নীলকান্ত মণির শিবলিঙ্গ নীলরঙের ভিতর থেকে একটা বেগুনে জ্যোতি বেরিয়ে আসছে। সেই বিগ্রহ স্পর্শ করলে সারা দেহ শিউরে উঠবে, একটা দৈবশক্তি চন্ চন্ করে উঠবে মাথার মধ্যে।
এই সব মন্দিরের ভিতরে ও বাহিরে দেখবে পাথরের কাজ। সেসব দেখলে তুমি আর সেখান থেকে নড়তে চাইবে না। বলবে সারাদিন বসে বসে দেখি। সাধারণ মানুষই চোখ ফেরাতে পারে না, আর তোমরা তো ভাস্কর, পাথর খোদাই করাই তোমাদের পেশা।

কল্যাণ কথা বলতে ভালবাসে, সাবাস্থ্যই সে কিছু

না কিছু বলে। দেবকুমার শোনে, যত শোনে খাজুরা-পুরী সম্পর্কে তার ততই কৌতূহল হয়। কথায় কথায় মন অগ্রমনস্ক থাকে, পায়ে চলা পথের ক্লান্তি সহজ হয়ে আসে।

পথের অচেনা সাথী যাকে প্রথম নজরে মনের মাহু বলে মনে হয় না, সমতল পথ তাকেই এক সময় মনের সমভূমিতে এনে পৌঁছে দেয়। যাকে প্রথমে অজানা বলে মনে হয়েছিল, তারই মধ্যে আবিষ্কৃত হয় নিজেরই মত আর একটি মাহু। হাসি-অশ্রু, ভালো-মন্দ, বুদ্ধি-প্রীতি, বিচার-বিরাগ, কঠিন-দুর্বল অমুভূতির সামগ্রিক সমন্বয়ে নিজেরই এক প্রতিরূপ। সৌম্যবদ্ধ পদক্ষেপে, ছোট ছোট কথায় অপরিচয়ের প্রাচীর কখন সমতল পথের মতই সমভূমি হয়ে যায়, পথের স্বীকৃতি নিয়ে সহগামী তখন পথিক-বন্ধু রূপে ধরা দেয়। দেবকুমারের পাশে কল্যাণও অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে ওঠে।

কল্যাণ দ্রুত পথ চলতে পারে না, তা না পারুক, দীর্ঘ পথে গতির চেয়ে সঙ্গ কাম্য। নীরব পথে কথার সাথী বড় প্রয়োজন। কল্যাণ কথা বলে, দেবকুমার শোনে আর পথ চলে। মহাকোশলের কঙ্করময় পথ। জলহীন খর্বাকার বৃক্ষবহুল প্রান্তর, কণ্টকাকীর্ণ ঝোপ-ঝাড় সমাকীর্ণ ছায়াহীন প্রান্তর, রৌদ্রতপ্ত দ্বিপ্রহরের ক্লান্তিকর চরণ-চিহ্নে হুই বন্ধু এগিয়ে চলে। আদিগন্ত দীর্ঘ পথে ক্ষুদ্র ছুটি চলমান মাহুঘের ছুটি নগণ্য বিন্দু। দেবকুমার ও কল্যাণ। একটি শাদা পাগড়ী আর একটি হলুদ পাগড়ী।

কল্যাণকুমারের সেদিন বেশী পথ চলা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়লো। ছপুরে বিশ্রাম নিয়ে অপরাহ্ন বেলায় তারা এসে পৌঁছালো গোবিন্দগড়ে।

মন্দিরকে কেন্দ্র করে একটি ছোট জনপদ।

মন্দিরের পাশেই যাত্রী-নিবাস।

যাত্রী-নিবাসে এক সন্ন্যাসী খড়ের উপর কঙ্কল বিছিয়ে বসেছিল বললো—স্বাগতম। কোথা থেকে আসা হলো ?

দেবকুমার বললো—যোগিনী ঘাট।

কল্যাণকুমার বললো—দেওগাঁও।

সন্ন্যাসী বললে—বেশ, বেশ। পিছনেই ইঁদারা আছে। মুখ হাত ধোও, সন্ধ্যারতি দেখ, দেবতার প্রসাদ গ্রহণ কর, শান্তিতে নিদ্রা যাও।

একজন সন্ন্যাসী এত বেশি কথা বলে দেখে দেবকুমার বিম্বিত হলো। কুশাতলায় গিয়ে কল্যাণকে বললো— সন্ন্যাসী যে বড় বেশী কথা বলে।

কল্যাণ বললো—আমি এরকম সন্ন্যাসী আরো দেখেছি। ওর হাতের পাশে ছোট কল্কেটি দেখেছ ? সারাদিনে ক’ছিম শেখ হয়েছে তা কি তুমি জানো। গঞ্জিকার ধোঁয়া যত মাথায় গিয়ে জমবে, ততো মুখে থৈ ফুটেবে। রাতে শুয়ে শুনে সারারাতই বকছে।

—তাহলে ঘুম হবে কেমন করে ?

—আমরা ঘুমবো, ও বকবে। এতটা পথ হাঁটার পরে আমাদের ঘুমের কোন ব্যাধাত হবে না।

কুশাতলা থেকে এসে, যাত্রী-নিবাসের বারান্দায় তারা দু’জনে পা ছড়িয়ে বসলো। সূর্য তখন অস্ত গেছে, দিন শেষের শেষ আলোটুকু মিলিয়ে যাচ্ছে। সেই আলোর রেশটুকু এসে পড়েছিল দুই বন্ধুর মুখের উপর। মুখের পানে ধানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে সহসা সন্ন্যাসী উঠে এলো। অতর্কিতে দেবকুমারের চিবুক ধরে বললো—ভালো করে তাকা দিকি একবার আকাশের পানে, তোর মুখখানা একবার ভালো করে দেখি।

দেবকুমারের কপালের উপর ডান হাতখানি বুলিয়ে নিয়ে পরক্ষণেই বলে উঠলো—তোর কপালে রাজত্বদিক রে, তুই মন্ত শিল্পী ! তুই পথে পথে ঘুরছিস্ কি ? তোর আসন রাজার দরবারে। তুই বাবি আমার সঙ্গে—আমি তোকে রাজশিল্পী করে দোব।

দেবকুমার হুত হাসলো, কল্যাণের কথাটা তার মনে পড়লো।

—কি হাসলি যে, আমার কথা বিশ্বাস হলো না বুঝি ? ভাবছিস্ গাঁজাখোর সন্ন্যাসী, আবোল-তাবোল বকছে। পরে দেখিস্ আমার কথা সত্যি হয় কি না।

—আপনি কপালের রেখা পাঠ করতে পারেন বুঝি ?

—আগে জানতাম না, পরে শিখেছি। আগে জানা থাকলে নিজের কপালটা অনেকটা পরিষ্কার রাখতে পারতাম। আজ এই গেক্সা পরে পথে বেরতে হতো না।

—কেন, সন্ন্যাসীর জীবন তো ভালো জীবন।

—সবাইকার মনের ধর্ম সমান নয়। সবাই এক রকম হলে এই দুনিয়াটা বৈচিত্র্যহীন হয়ে পড়তো। থাক্ গে, তুই চল আমার সঙ্গে, বাবি ?

এবার কল্যাণ বললো—আগে খজুরাপুরীটা দেখে নিব্।

সন্ন্যাসী কল্যাণের মুখের পানে তাকিয়ে শাস্ত কণ্ঠে বললো—তা ভাল, তাই দেখে আস। পরে এই পথে তোর সঙ্গে আবার আমার দেখা হবে, তখন যাস্।

সন্ন্যাসী আবার নিজের জায়গায় ফিরে গেল, বসে গেল কন্ডে সাজতে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই উগ্র গঞ্জিকার একটা মিঠে গন্ধ ছড়িয়ে পড়লো।

সেই গন্ধে এখনি মাথা ধরে যাবে, উঠে এসো— বলে কল্যাণ দেবকুমারকে নিয়ে নাটমণ্ডপের সামনে উঠে গেল।

বহর দশেকের এক বালক আগুন নিয়ে এলো। একট কাঠির মাথায় একটা ধূঁচির আগুন থেকে কাঠি ধরিয়ে সে মন্দির মধ্যে পিদিম জ্বলে দিল, তারপর ধূঁচিতে কিছু ধূনা দিয়ে দেবকুমার ও কল্যাণের সামনে এসে দাঁড়ালো, বললে—আপনারা আজ এসেছেন বুঝি ?

—হ্যাঁ।

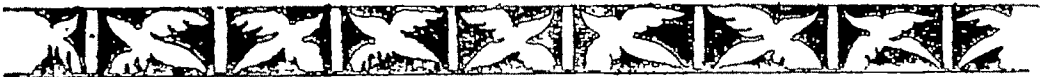
—ক’জন ?

—দু’জন।

—রাতে ভোগ পাবেন তো ?

কল্যাণ মাথা নেড়ে সায় দিল। বালক চলে গেল।

(ক্রমশঃ)



গ্রাম উন্নয়ন ও খাদ্যের সংস্থান

ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস

বাঙলাদেশে গ্রামের লোক অধিকাংশই কৃষিজীবী। পশ্চিম বাঙলায় হিন্দু কৃষকের সংখ্যাই সর্বাধিক। এঁদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকই হীনস্বাস্থ্য—আয়ুষ্কালও এঁদের বেশী নয়। এখন গ্রামে গ্রামে নলকুপের প্রসারবশতঃ এবং সংক্রামক রোগে টিকা নিবার নিয়মিত ব্যবস্থা হওয়ায় গ্রামে পূর্বের তুলনায় সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ হ্রাস পেয়েছে এবং সে কারণ কৃষকদের মধ্যেও মৃত্যুর হার কমে গেছে। তবে তাদের শারীরিক পরিশ্রমের অল্পপাতে অনেকেই বারমাস পেটপুরে খেতে পায় না, প্রোটিন ও ভাইটামিন সংযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য প্রাপ্তি ত দূরের কথা। তাই এখন বলিষ্ঠ কৃষক যুবকের সংখ্যা বিরল। অনেক স্থলে কল্ভাপণ প্রচলিত থাকায় দরিদ্র কৃষককে অধিক বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত থাকার ফলে অনেকের শরীরে অলক্ষিতে যৌনব্যাধিবীজ বাসা বেঁধে তাদের অন্তঃসারশূন্য করে ফেলে, তাই সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণ প্রতিরোধ করা তাদের পক্ষে সচরাচর সম্ভব হয় না। যাক, এদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকে তারা অনেকেই প্রৌঢ়ত্বের সীমানায় পৌঁছে অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যে বিয়ে করে বড়জোর দু'একটি সন্তান রেখেই ইহলোক থেকে বিদায় নেয়। তখন তার যুবতী বিধবা নাবালক পুত্রকন্যা নিয়ে নিদারুণ দারিদ্র্যে নিপতিত হয়।

একথা সর্বথা স্বীকার্য যে, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবই গ্রামের লোকের রোগপ্রবণতার জ্ঞাত প্রধানতঃ দায়ী। পশ্চিমবঙ্গের অনেক কৃষিজীবীই নিরাশ্রিতাশী; যারা আশ্রিতোজ্ঞী তাদের মধ্যেও শতকরা প্রায় নব্বইজনই ডিম বা মাংস স্পর্শ করেন না। এদিকে মাছ ত হয়ে গেছে ডুমুরের ফুল! দামোদরের উদরেত শুধুই বালি, নদীয়া জেলার চুর্ণী, জলঙ্গী, মাধাভাঙা, ইছামতী প্রভৃতি নদীতে অপরিপাক পাট পচানোর ফলে সেগুলিতে আর মাছ জন্মাচ্ছে না। চাপড়ার বিল ও অন্ত যে সব বিলে আগে বারমাস জল থাকত, প্রচুর মাছ জন্মাত, এখন তারও অধিকাংশই আবাদী জমিতে পরিণত হয়েছে। তার গ্রামের ভিতরের ও আশ-পাশের ডোবা নালা পাট পচাবার দূষণ এখন পুঁটি টেংরাও প্রসব করে না। সুদূর

পল্লী অঞ্চলে চালানী মাছ গিয়েও পৌঁছায়-ই না। শুটুকি মাছ খাবার এঁদের অভ্যাস নাই কাজেই প্রাপিক প্রোটিনের (মাছ মাংস ডিম ছানা) দারুণ অভাববশতঃ এইসব লোকের উৎসাহ উদ্যম শক্তিবৃদ্ধি ও ব্যাধি-প্রতিষেধক শক্তি যে দিনদিনই লোপ পাবে তাতে আর বিচিৎ কি? এঁদের প্রত্যেকের বাড়িতেই হাঁস মুরগি পোষার যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সংস্কারের বশে উহা ক'রে উঠতে পারেন না। এঁরা ডিম মাংস খেলে এঁদের গ্রাম্য পুরোহিত-ই হয়ত সে বাড়ি মাড়াবেন না। গ্রামের মোড়লের ভয় ত আছেই। সুতরাং সংস্কাররূপী প্রচ্ছন্ন মৃত্যুদূতের কবল থেকে এদের মুক্ত না করতে পারলে এদের কাছ থেকে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি তথা খাদ্যশস্যে আমাদের স্বয়ং-সম্পূর্ণতা লাভের আশা সূদূরপর্যাহত। আর এই বিধবাসী সংস্কার স্বর্ধোদয়ে তমোরাশির মত তখনই অপস্থত হবে যখন এদের মধ্যে সত্যিকারের শিক্ষাদীক্ষা বিস্তার লাভ করবে। তবে বাংলার তথাকথিত ভদ্রসমাজ যতদিন হাতের কাজকে শ্রদ্ধার চক্ষে না দেখতে শিখবেন—যতদিন না তাঁরা কৃষক, স্বতন্ত্র ও মনস্তত্ত্বজীবী-দের মাছবের মর্যাদা না দেবেন ততদিন শুধু শিক্ষাদান বিকলতায় পর্যবসিত হবে বলেই বিশ্বাস। এদের চিরদিনই হয়ে অপাংক্ত্যে করে রাখলে এঁদের ছেলেরা সামান্য একটু লেখাপড়া শিখলেই 'ভদ্র' হবার আশায় পৈতৃক ব্যবসা পরিত্যাগপূর্বক শহরে ছুটবে—সেখানে মিল-মজুরের দলপুষ্টি করবে নয় ত সামান্য কেরানীর কাজ নিয়ে 'ভদ্র'ত হবে পেটে তাত পড়ুক আর নাই পড়ুক! তাই মনে হয় গোটা সমাজের মনের আমূল পরিবর্তন ব্যতিরেকে শুধু বর্ণপরিচয়ের দ্বারা ফ্যাসাদ কাটবে না।

সত্যিকারের শিক্ষার প্রভাবে সংস্কার কিরূপ পরাস্ত হয়, কিঞ্চিৎ অবাস্তব হলেও মিল্লিখিত সত্য ঘটনাটি তার সাক্ষ্য দেবে—

১৯১৮ সালে কুষ্টিয়া হাই স্কুলের হঠেলে আমার সহ-পাঠী মনোজ সেন (এখন আসামের একটি চা-বাগানের ম্যানেজার) ঠোণ্ডে ডিম রাখা করে খায়, আমাকেও

দেয়। হঠেলেয় সুপারিন্টেন্ডেন্ট মহাশয় টের পেয়ে আমাদের প্রত্যেককে ১০৮ বার হরিনাম জপ করবার নির্দেশ দেন।

সুপারিন্টেন্ডেন্ট শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় ছিলেন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ, অত্যন্ত ছাত্রবৎসল ও আদর্শ শিক্ষক। স্বদেশপ্রীতি, সংগঠন-শক্তি ও নিরলস কর্মোদ্যম ছিল তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। মুখ্যতঃ তাঁরই চেষ্টায় প্রতি-বৎসর সরস্বতী পূজার সময় কলকাতার কোনও খ্যাতনামা ব্যক্তি আমন্ত্রিত হয়ে গিয়ে আমাদের বক্তৃতা শোনাতেন। ঐ উপলক্ষে প্রবন্ধ রচনারও প্রতিযোগিতা হ'ত। সুসাহিত্যিক প্রবন্ধ শিক্ষক শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সেনগুপ্ত ছিলেন এর প্রধান উদ্যোক্তা। 'সহজ মাহুষ রবীন্দ্রনাথ' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা শচীন অধিকারী প্রতি বৎসরই পুরস্কার পেতেন—লেখকের বাংলা লেখার হাতে-খড়িও এখানেই। প্রায় সমসাময়িক কালে বর্তমান 'প্রবর্তক' সম্পাদক শ্রীরাধারমণ চৌধুরীও তাঁর উদার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্ত যতীনবাবুর প্রিয় ছাত্র ছিলেন।

এখন আসল কথাই আসা যাক। পুঙ্জনীয় মাষ্টার-মহাশয় শ্রীযুক্ত রায় দেশ-বিভাগের পরে টালিগঞ্জ ছাড়িয়ে বংশদ্রোণী কলোনিতে বাড়ী করেছেন। খবর পেয়ে তিন বছর আগে সাউথ সুবারবন স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীগোপীপদ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে বড়দিনের বন্ধে দেখা করতে গেলাম। শ্বেতশ্রুঙ্গসমুজ্জল উজ্জলকাস্তি ঋজুদেহ মাষ্টারমহাশয় (৮০) আমাদের দেখে যারপর নাই উজ্জসিত হলেন। অনেক কথা হল। গোপীবাবু সহাস্তে উঠানের দিক লক্ষ্য করে বলে উঠলেন—“দেখ হর-গোপাল, মাষ্টার মহাশয়ের স্নেহ কাণ্ড দেখ!” দেখে সত্যই অবাক হলাম যে, সেই গোঁড়া যতীন মাষ্টারের উঠোনে চরে বেড়াচ্ছে তাঁরই সযত্নপালিত সুপুষ্ট কয়েকটি মোরগ-মুরগি! মাষ্টার মহাশয় বললেন—“ওরা বেশ ডিম দিচ্ছে, বাড়ির ছেলেমেয়েরা খাচ্ছে—আমিও বাদ যাই না।”

এই যে এত বড় পরিবর্তন এ শুধু সম্ভব হয়েছে তাঁর শিক্ষার দরুণই। কোথায পাবনা-কুঠের অফুরন্ত মাছ-মুখ, আর কোথায চিংড়িমাছের কাঙাল টালিগঞ্জ বংশদ্রোণী!

স্থানকাল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীবনে ভদ্রমুখ্যায়ী পরিবর্তন প্রবর্তন না করলে মাহুষ কি বাঁচতে পারে?

এখন গ্রামে মাছ-চাষের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক।

পাট যখন ভাল দরেই বিক্রী হয় তখন তার মূল্যফা থেকে জাতীয় সরকারের চেষ্টায় ও গ্রামের পাটচাষীদের সহযোগিতায় মাঠের মধ্যে অপেক্ষাকৃত নিকট জমির উপর উঁচু ভিত করে নীল পচানো হোসের মত সারি সারি অনেকগুলি পাকা চৌবাচ্চা করে বড় পাশ্প সাহায্যে জল তুলে চৌবাচ্চা ভর্তি করে তার মধ্যে পাট জাগ দিলে স্থির জলে মাঠের রৌদ্র পাওয়াতে শীঘ্র শীঘ্র পাট পচবে—পচন বা rotting জন্ততর করার জন্ত রাসায়নিক পদার্থও ব্যবহার করা যেতে পারে। দু'একটি চৌবাচ্চায় শুধু জল রাখলে পাট ধোওয়াও সহজে এবং অক্লেশে হতে পারে। কার্ষাস্তে ঐ পাট পচানো জল গ্রামের মাঠে ছেড়ে দিলে উহা উত্তম সারের কাজ করবে। এদিকে নদী নালা ডোবা পুকুর প্রভৃতিতে পাট না পচানোর দরুণ প্রাক-পাট যুগের মত গ্রামে মাছ পাওয়া সহজ হবে।

এখন পাটচাষীর পুঁজাঙ্কলে দাঁড়িয়ে (কোমর অবধি ডুবিয়ে) ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাট ধোয়ার দরুণ প্রায়শঃ অসুস্থ হয়ে পড়েন সেটা বন্ধ হবে। তারপর পরিকার জলে ধোয়ার দরুণ পাটের চেহারা উৎকৃষ্টতর হওয়ায় ভাল দামে বিকাবে। নদীর স্রোতের জলে (ঠাণ্ডার দরুণ) পাট জাগ আসে অনেক দেরীতে। তার পর চূর্ণা প্রভৃতি নদীর জল আখিন মাস অবধি ঘোলা থাকায় ঐ জলে ধোত পাটের রং ও 'কোয়ালিটি' ধারাপ হয়ে থাকে। কাজেই প্রস্তাবিত চৌবাচ্চা নানাদিক থেকে অবশ্য স্থাপনীয় সন্দেহ নাই।

গ্রামের মাছ-চাষ সম্বন্ধে আর একটি বিষয়ের প্রতি-দৃষ্টি আকর্ষণ বাঞ্ছনীয় মনে করি। গ্রামের চাষী আমরা টিনের বা খড়ের ঘর তৈরিতে উঁচু ভিত বা পোতা তৈরিতে এবং ধান মাড়াই, ধান শুকানো প্রভৃতি কাজের জন্ত অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত উঠোন তৈরিতেও বসন্ত-বাটার এক প্রান্ত থেকে মাটি কেটে সেই মাটি সাধারণতঃ

ব্যবহার করি। ফলে অবস্থা ভেদে একই গৃহস্থের বাড়িতে একাধিক ডোবা দেখা যায়। আমাদের বাড়িতে ছোট বড় দুই তিনটি ডোবা ছিল। এখন সরকার পক্ষের নির্দেশে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের তত্ত্বাবধানে যদি পাড়ার সল্লিকটবর্তী তিন চার বা ততোধিক পরিবারের ক্ষমত নির্দিষ্ট একটি জায়গা থেকে মাটি তোলায় ব্যবস্থা হয় তবে সেই ডোবাটি ছোটখাটো পুকুরের মত হবে এবং তার মধ্যে ছোট বড় মাছের চাষেরও সুবিধা হবে। অবশ্য এর মধ্যে ভাগাভাগির প্রশ্ন আছে এবং উহার জটিলতা অনেক সময় মনোমালিন্যের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তবে মানুষ অবস্থার চাপে ক্রমশঃ উদারভাবাপন্ন হবে ও হচ্ছে। সুতরাং এই বাধা তেমন প্রতিবন্ধক হবে না বলেই ধারণা। যে গ্রামে এরূপ একজমালি পুকুর সৃষ্টিভাবে চলবে সে গ্রামের লোকদের সরকার পক্ষ থেকেই উৎসাহিত করবেন। আজকাল নাচ গানওয়ালারা যদি সরকারের সদয় দৃষ্টিলাভে সমর্থ হয় তবে জাতিগঠনের গোড়ার কাজে জাতীয় সরকার সাড়া না দিবেন, মনে হয়না। তারপর যে গ্রামে নতুন মাটিকাটার তেমন দরকার নাই সে স্থলে গরীব চাষীর ঘরের সংলগ্ন ডোবা থাকলে সেগুলি বুজিয়ে ফেললে মশা, সাপখোপের ভয় কমবে; বেচারী দুটো লক্ষ বেগুন লাগাবারও আয়গা পাবে। পুরাতন গ্রামে এইভাবে নতুন একজমালি পুকুরের পত্তন হতে পারে। মাছের সম্বন্ধে একটি কথা—এই ছোট মাছগুলি উপকারিতার দিক থেকে কম নয়। বরং এ সব মাছ থেকে উপকারী ভাইটামিন ‘এ’ বেশী পাওয়া যায়। আর একটি কথা ভাইটামিন ‘এ’ দিনকয়েক বা মাসাবধি প্রত্যহ খেলে পরে অনেকদিন না খেলেও শরীরে সঞ্চিত ভাইটামিনে কাজ চালিয়ে নেয়। ভাইটামিন এ চোখ ভাল রাখে, শরীরের ব্যাধি প্রতিরোধক শক্তি জন্মায়। তারপর ছোট মাছ অনেক সময় কাঁটা শুদ্ধ চিবিয়ে খাওয়া যায় বলে ইহাতে উপকারী ক্যালসিয়াম ও ফস্ফেট লবণ পদার্থ পাওয়া যায়।

এরপর তরিতরকারির কথা। আমরা দূর থেকে কল্লনার চশমায় দেখি গাঁয়ের চাষীভাইরা কত না তরি-

তরকারী, টাটকা শাক-সবজী খাচ্ছেন। সাধারণ চাষীরা বেশীর ভাগই গরীব, বসন্তবাটি সংলগ্ন জমি কারো বিশেষ তেমন থাকে না। যেটুকু জমি আছে তার মধ্যে হয়ত ঠাকুরদার লাগানো দুই তিনটি আম কাঁঠাল গাছ দাঁড়িয়ে আছে—বৎসরে, সব বৎসরে নয় হয়ত, ২।৪ ধান আম ও গুটিকয়েক মাত্র কাঁঠাল পাওয়া যায়। অথচ এই গাছের ছায়াতে বাড়িতে হয়ত ধান শুখানো যায় না। ছেলেপিলের সর্দি কাশি সারতে চায় না—তবু এই গাছ কেটে যে পরিবেশ একটু স্বাস্থ্যসঙ্গত করে তুলবেন, জায়গাটা ফাকা হলে লাউ কুমড়া বা লক্ষা বেগুন লাগাবেন তার উপায় নেই, কারণ ঠাকুরদার হাতে লাগানো গাছ। এই গাছের উপর সকলেরই অসম্ভব মায়ী। সংস্কারের মত এই মায়ীও বিসর্জন না দিলে উপায় নেই। শাক-সবজী বার-মাসই প্রত্যহ খাওয়া দরকার। কারণ উহা নানাবিধ ভাইটামিন ও লবণ পদার্থের আধার। লবণ কথা থেকে লাভণ্য, সুতরাং নানাবিধ ফল মূল টমাটো কলা বাভারি প্রভৃতি লেবু ও শাক-সবজীর মাধ্যমে লবণ পদার্থ না পেলে ছেলেমেয়েরা লাভণ্য লাভ করবে কিসে? টমাটো প্রত্যেক গৃহস্থই গৃহ-প্রাঙ্গণে লাগাবেন ও ছেলে-মেয়েদের খাওয়ানবেন। টমাটো গাছ গরুতে খায় না, সুতরাং কৃষকের বাড়ীতে উহা সহজেই ফলানো যায়।

এখন গ্রামের দুধের ব্যবস্থার কথা ধরা যাক। পর্যাপ্ত দুধ খেলে মাছ মাংস না হলেও শরীর রক্ষার অহবিধা হয় না। আমাদের ছেলেবেলায় ৫০।৫৫ বৎসর আগে প্রত্যেক চাষী গৃহস্থ বাড়ীতেই হালের বলদ ছাড়া তিন চারটি বা সাত আটটি গাভী ছিল। তখন পাটের দর ছিল মণ প্রতি দুই তিন টাকা মাত্র। কাজেই পাট চাষের প্রসার না হওয়ায় উঁচু ডাঙ্গা ও পতিত জমি প্রতি গ্রামেই বিস্তার ছিল। কিন্তু আজ রিতন্তু পশ্চিম বাংলায় চাষীর পক্ষে হালের বলদ পোষাই দায় হয়ে পড়েছে। গাভী পালন ত দুরের কথা। গরীব চাষী দামে পড়ে এবং অর্থ লোভে ও ধানের খড় বেশী দামে বিচালীরূপে বিক্রী করে বলদগুলিকে অর্ধাশনে অনশনে রেখে দেয়। অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন চাষীরা দু’ একটি গাভী গরু হয়ত গুহতে পারেন, কিন্তু সেরূপ পরিবারের সংখ্যা খুবই অল্প।

কাজেই চাবীর গ্রামে এখন দুধ ছুপ্রাপ্য, দুমূল্য; ফলে শিশু স্বাস্থ্যও সেখানে শোচনীয়। শহরে নানা প্রতিষ্ঠান থেকে দুগ্ধপোষ্য শিশুদের দুগ্ধ বিতরণের ব্যবস্থা দেখা যায়, কিন্তু গ্রামের দিকে কে দৃষ্টি দেবে? নেতারা ভোট নেবার প্রাক্কালে শীত গ্রীষ্মের শুকনোর সময় দু'চার-দিন গ্রামে পদার্পণ করে মিঠে বুলি আউড়িয়েই তাঁদের কাজ হাসিল করে আসেন মাত্র। কাজেই এই মুচ মুক অগণিত নরনারী শিশু-বৃদ্ধ-বৃদ্ধার নিদাক্ষণ কষ্ট কল্পনার নেত্রে দেখবারই বা লোক কোথায়? নিতান্ত ভরসার কথা, আজ যিনি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী গ্রাম্যজীবনের সঙ্গে তাঁর বহুদিনের নিবিড় পরিচয়। স্বতরাং তিনি সাধ্যমত সাহায্য দানে গ্রামের প্রকৃত উন্নতিবিধান দ্বারা সারা বাংলার কল্যাণসাধনে আত্মনিয়োগ করবেন বলেই মনে হয়।

অবশ্য আজকাল পাট এবং অধিকাংশ খাম্বশস্তের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষকেরা একটু হিসাব করে চললে অনেকেই পূর্বাপেক্ষা ভালভাবে থাকতে পারেন। তাঁদের মধ্যে উৎসাহ উত্তমের অভাব না হলে অল্প আয়্যাসেই

নিম্নলিখিত কবিতার যাথার্থ্য বাস্তবে রূপায়িত করে তুলতে পারেন :

“গরমের কালে লিচু আম জাম জামরুল ধরে ধরে
বেল পেঁপে লেবু কলা আনারস আমার বাগানে ধরে।
পুকুরের পাড়ে নারিকেলশ্রেণী বহে শিরে বারমাস
লিমনেত চিনি সুপেয় পানীয় কত সুমিষ্ট শাঁস।
বেগুন লক্ষা পালং টমাটো কপি আলু করি চাষ
প্রতিদিন ঘরে ডিম পাড়ে গোর সুপুষ্ট পাতিহাঁস।
বরবটি লাউ পুঁই কিঙা শশা কুমড়া মাচায় ফলে
লক্ষীর বাস আমার আবাসে তাইত সকলে বলে।
পুকুরে আমার ফটকের মত জল বারমাস থাকে
কাতলা রোহিত পুঁটি খরসলা খেলা করে ঝাঁকে ঝাঁকে।
ফেন ভূষি খেয়ে নধর কান্তি আমার শ্রামলী গাই
তাইত জগতে তাহার ঘুঘর তুলনা কোথাও নাই।”

বস্তুতঃ এইরূপ বসতবাটির অধিকারী হলে পুষ্তিকর খাদ্যের অভাব কোথায়। আর স্বাস্থ্য-সমৃদ্ধ শান্তিময় দীর্ঘজীবন লাভও এরূপ পল্লীবাসীর পক্ষে আদৌ অসম্ভব নয়।



ছায়া মিছিল

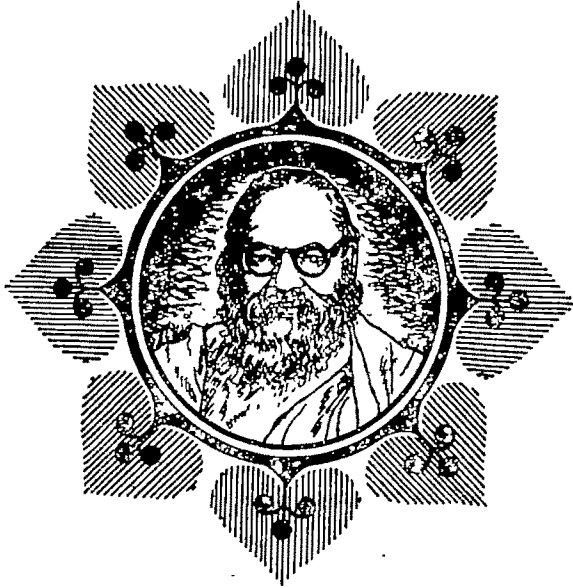
শ্রীরাজকুমার লাহিড়ী

ইতিহাসের ছায়া মিছিল থেকে
একটা চেনা মুখ বারে বারে উকি মারছে।
আশ্চর্য স্নান নিম্ভ্রস্ত দৃষ্টি তার
যেন অতিকায় মুক এক সামুদ্রিক প্রাণী
অপলক চোখে চেয়ে আছে।
কে—কে—কে
কার এ মুখ চেনা চেনা
ছায়া, প্রেম, স্থির মূর্তি ?
দীর্ঘবাস, অমুরাগ, অমুনয় ?
আশ্চর্য আশ্চর্য বিরহের উজ্জল স্মৃতি ?
ঘুলিয়ে ঘুলিয়ে যাওয়া নীল নদের ধারে
মিশরের মমি কি ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠলো ?
ইলোরা-অজস্রতার ক্রেন্ডো পেটিং কি সজীব হ'য়েছে ?
ফেরাউন কি শিশু রক্তের জন্ত পাগল হ'য়ে উঠলো ?

গাঁইতিতে ভাঙ্গা মহেঞ্জোদাড়োর সুপ্রাচীন ভাস্কর্য
আঘাতে ২ ভর্জর হ'য়ে চোখের লোনা জল ফেলেছে কি ?
কোনারক সূর্য মন্দিরের কোন গোপন প্রাণী।
উগুরু বেলভূমিতে অতিসারে চলেছে কি ?
হাঙ্গার হাঙ্গার বছর আগে হারিয়ে যাওয়া হিমালয়ের বৃকে
বিজয়ী পর্বত বীরের স্পর্শে
ঘুমন্ত রাজকুমারী চোখ মেলে চাইল কি ?
অশোকের শিলা লিপি কথা বলছে ?
কোথায়—কোথায়—কোথায় ?
যেদিকে তাকাই ধোঁয়াটে আকাশ আর ধোঁয়াটে আকাশ
তারারা সব মরে আছে—
কবরের ছাউনি তুলে উকি মারছে একটি মুখ
চিনেছি, চিনেছি, চিনেছি, চিনেছি এতদিনে
এ আমার, আমার মনের ; আমার ছায়া।



সজ্জগুরু শ্রীমতিলাল : জীবনস্মৃতি সংরক্ষণ



বিপ্লবী বাংলার যুগসন্ধিক্ষণে যে কয়জন বীর সন্তান ভগ্নরথের মত শত্ৰুধ্বনি করিয়া এবং সব্যসাচীর মত উভয় হস্তে সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া জাতীয়তার সজ্জশক্তিকে স্বাধীনতার সাগর-সঙ্গমে প্রবাহিত করেন, শ্রীমতিলাল তাঁহাদেরই প্রথম পঙ্ক্তির একতম। প্রবর্তক সঙ্ঘের তিনি প্রবর্তক। তাই তিনি একাধারে জাতীয় যুদ্ধের সেনানী, প্রবর্তকের সজ্জগুরু, দ্রষ্টা, তপস্বী, ঋত্বিক্ এবং ঋষি। তিনি জাতীয় মুক্তিসাধনার ক্ষাত্র-বীর্যের এবং আধ্যাত্মিক মুক্তি-সাধনার ব্রাহ্মণ্য-তপস্তার সমন্বয় সাধন করেন। তাই বিপ্লবী বাংলার অগ্নিযুগের যুব-শক্তির নেতৃত্বে হাঁহাকে আমরা গণাগ্রামী যুগপতিকপেই প্রাপ্ত হই।

তাঁহার অসামান্য জীবন-জীবনের প্রথম হইতেই বিধাতা পুরুষ মনের মত করিয়াই তাহা গঠন করেন। পঞ্চদশ-বর্ষীয় কিশোর মতিলাল নবম-বর্ষীয়া বালিকা বধু রাধারাণীর পাণিগ্রহণ করেন। এই বালিকা বধুই পরে যৌবনে যোগিনী হইয়া তাঁহার যোগী স্বামীর শক্তিসঞ্চারিণী সহধর্মিণী হইয়া সজ্জজননী-রূপে পুজিতা ও প্রতিষ্ঠিতা

হন। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে যথাক্রমে ২৪শ ও ১৮শ বর্ষ বয়সে বিধাতারই অমোঘ নির্দেশে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত গ্রহণ করেন। মাণিকতলায় মুরারিপুকুর বাগানে গোপনে গঠিত বিপ্লব-কেন্দ্র তাদিয়া গেলে, চন্দননগরে নূতন বিপ্লব-সঙ্ঘ গঠন করিলেন শ্রীমতিলাল, শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও বাবুরাম পরারকর, এই চারি জনে।

এই সন্ধিক্ষণেই ১৯১০ খৃঃ ফেব্রুয়ারী মাসে চন্দননগরে শ্রীঅরবিন্দের আকস্মিক আবির্ভাব হয় এবং শ্রীমতিলালেরই গৃহকক্ষে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেন। সজ্জগুরুকে শ্রীঅরবিন্দ যে জিম্মা দেন, তাহা জ্ঞান, শক্তি ও প্রেমের ত্রিমার্গের যোগসাধন। অন্তর্জীবনে সত্য, সৎসঙ্গ ও সংবন-ব্রতের দ্বারা অধ্যাত্মমার্গে আত্মসমর্পণ-যোগসাধন ও বহির্জীবনে প্রেমৈক্যে বদ্ধ সমষ্টিগতভাবে শিক্ষা, সংহতি ও অর্থের কর্মযোগসাধনা, এই উভয় ক্ষেত্রেই প্রবর্তক সঙ্ঘ অত্মপি এই মহাজাতির ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রগঠনের সেবায় নিযুক্ত আছে। সজ্জগুরু এই শিক্ষাই দিয়াছেন যে, হৃদমন্ডনোদ্ধৃত নবনীতের মত বিস্তৃত প্রেম ও ঐক্যবুদ্ধি যদি কোথাও কিয়ৎপরিমাণে লব্ধ হয়, তবে সেই ঐক্যবুদ্ধি জাতির শিরায়-শিরায় শক্তি সঞ্চার করিবে ও উহাই জাতীয় সংহতি-সাধনার (National Integration) পরম রসায়নস্বরূপ হইবে।

শ্রীঅরবিন্দের অমুপ্রেরণায় সজ্জগুরু 'প্রবর্তক' পত্রিকা প্রকাশ করেন ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে। শ্রীঅরবিন্দ বলেন—“আমি স্বহস্তে লিখি বা না লিখি, আমারই মধ্য দিয়ে ভগবান্ মতিকে শক্তি দিয়ে প্রবর্তক লেখাচ্ছেন।” জাতিনির্মাণের জন্ত, জাতীয় সংগঠনের জন্ত, প্রেম এবং ঐক্যের বাণী লইয়াই 'প্রবর্তকের' আবির্ভাব। আজ প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরিয়া প্রবর্তক সেই ব্রত যথাসাধ্য পালন করিতেছে।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দে সঙ্ঘের মাতৃশক্তি দেবী রাধারাণীর তিরোধান হয়। তিনি সঙ্ঘের তরুণ-তরুণীদের মাতৃস্নেহে

অভিযুক্ত করিয়া সজ্জজননীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তর্দ্বানে মহাত্মাজী সজ্জগুরুকে তারযোগে জানাইলেন—“You have not lost but gained your wife—being disembodied, she will greater affection.”

হুজুঙ্গ সংগ্রামের মধ্য দিয়া—সৃষ্টি ও সংগঠনের পথে সজ্জগুরুকে চলিতে হইয়াছে। সমাজের অন্ধতা, ইংরাজ ও ফরাসী দুই প্রবল রাজশক্তির প্রচণ্ড বিরোধিতা, আর্থিক ক্লান্ততা প্রভৃতি সকল প্রকার বাধা দূর হইয়াছে তাঁহার অসামান্য শক্তি ও সঙ্কল্পের প্রভাবে। সজ্জগুরু ছিলেন যুগন্ধর পুরুষ—উদীয়মান যুগের ভাবধারার ভগীরথ এবং আলোকের দিশারী। বিভিন্ন বিষয়ে প্রাচীন অর্দ্রশত গ্রন্থের তিনি প্রণেতা। তাঁহার অজস্র রচনা এখনও অপ্রকাশিত রহিয়াছে। তাঁহার সমস্ত রচনাকেই দেশ-পূজার বিবিধিধান এবং অর্থোপচার দুইই বলা চলে। সজ্জগুরুর বাগ্-বিভূতিতে ছিল মন্ত্রশক্তি—লেখনীতে ছিল বিদ্যাদীর্ঘ্য।

তাঁহার প্রতিভা ছিল বহুমুখী, গিরিগর্ভোৎসৃত সহস্র-ধারায় তাহা দিকে-দিকে প্রবাহিত হইয়া এক দিগন্তপ্রাণী গদ্যোদ্যম প্রপাত সৃষ্টি করিয়াছিল। শাস্ত্রে-শাস্ত্রে, ধর্ম্মে-কর্ম্মে, অর্থে-রাষ্ট্রে স্তম্ভসম সমন্বয়বুদ্ধি তাঁহার ছিল। ‘অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়’ এক নিঃস্বার্থ সেবা-সামের মহানু ব্রত তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পূর্বতন মহাজনগণের প্রদর্শিত পন্থার সশ্রদ্ধ অনুসরণ করিয়াও, তিনি স্বকীয় প্রতিভার বৈশিষ্ট্য দেশের ঐতিহাসিক যুগসন্ধিক্ষেত্রে এক বলিষ্ঠ জীবনাদর্শের ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন এবং তাহারই মূলক্ষেত্রে প্রবর্তক সজ্জ। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, ভারতের স্বধর্ম্ম ও স্বাধীনতা যুগনন্দ হইয়া চলিলে তবেই পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ হইবে;—তাহা ব্যতীত শুধু পাশ্চাত্য দেশের অন্ধ অনুকরণে মানুষ যথেষ্টাচারী হইলে, সে স্বাধীনতার দ্বারা দেশের শান্তি বা শৃঙ্খলা রক্ষিত হইবে না এবং তাহা স্বার্থপর, আদর্শহীন, অর্থমাত্রনিষ্ঠ বিজাতীয় রূপ পরিগ্রহ করিবে। সনাতন ভারত-সংস্কৃতির মৌল ভিত্তির উপর যুগসঙ্গত যে ভারতজাতির অভ্যুত্থানের প্রয়াস তিনি

করিয়া গিয়াছেন, তাহাই বিশ্বাসীকে শান্তি, আলো ও অমৃতের পথ দেখাইতে পারিবে বলিয়া সজ্জগুরু প্রত্যয় করিতেন।

জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে, ব্যক্তিস্বার্থের উর্দ্ধে, নবীন সাম্যবাদের অভিনব আদর্শের রূপায়ণ তাঁহার জীবন-বেদের এক মূল্যবান অবদান। আত্মপ্রতিষ্ঠ, স্বাবলম্বী বলিষ্ঠ, প্রেমিক্যবদ্ধ মহাজাতিগঠনের স্বপ্নই তাঁহাকে সারা জীবন কর্ম্মপ্রেরণা দান করিয়াছিল।

এই স্বপ্নের সাফল্যের জন্ত সংগঠন এবং সৃষ্টিই ছিল তাঁহার নিত্যকার ব্রত। ‘প্রবর্তক’-নামের বোগে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানসমূহ, মন্দির, আশ্রম, বিদ্যালয়, মুদ্রাযন্ত্র, পত্রিকা, নারীকর্ম্মশালা, কুটীর-শিল্প, যৌথ অর্থপ্রতিষ্ঠান, অথবা বাংলার নানাক্ষেত্রে নানাস্থানে গঠিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত এই সংস্থাগুলি তাঁহার অমর সৃষ্টি এবং অবিস্মরণীয় কীর্ত্তিস্বরূপ।

শ্রীঅরবিন্দের অমোঘ বাণী তিনি সর্বাস্তঃকরণে শুনিয়াছিলেন—“Revolutionize the brain of the nation”—এই প্রজ্ঞাবান ধর্ম্মগুরু ও অক্লান্ত কর্ম্মযোগী শ্রীঅরবিন্দ, মহাত্মা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের অব্যবহিত অমুর্বর্তী কালে তাঁহাদের প্রেরণার ঘনীভূত মূর্ত্তি এক অভিনব সমষ্টিসাধনার প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রবর্তিত এই জীবনতত্ত্ব, তথাকথিত গণতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব বা সাম্যতত্ত্ব নহে, পরন্তু ভারতীয় ব্রহ্মতত্ত্বেরই ধূগাহুবাদ। ইহা মানবজীবনে এক অথবা ব্রহ্ম-চৈতন্য বা পরমাত্ম-চৈতন্যের উপলব্ধি এবং অবধারণের উপর প্রতিষ্ঠিত। এক শাস্তিময় প্রেমিক্যপ্রাণ ভারতের তথা বিশ্বমানবের আধ্যাত্মিক আন্দোলনেরই ইহা নবজাত অঙ্গুর। শক্তি ও ভক্তিসাধনার পীঠস্থান ব্রহ্মসঙ্গ ভারতবর্ষে যেন এক অথবা ব্রহ্মতত্ত্বী, উদার ও ঐক্যবদ্ধ সজ্জশক্তির অভ্যুদয় হয়—ইহাই ছিল তাঁহার ঐকান্তিক কামনা।

সজ্জ কি করিবে? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ নির্দেশ দেন—“To reconstitue the cultural, social and economic life of the Nation on the spiritual basis and in larger lines than in the past.” সজ্জের এই ত্রিবর্গসাধনার সম্মিলিত

প্রয়োজনায় স্বাধীন ভারত স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে এক অখণ্ড ভারত-জাতীয়তার সংগঠনে সমর্থ হইবে (আজিকার দুর্ভল, আত্মপ্রত্যাহারা, বিচ্ছিন্ন, বিভ্রান্ত বাংলাকেই জাতিনির্মাণের এই ধ্রুব আদর্শ স্বয়ং গ্রহণ করিয়া অস্ত্রকেও পথ-প্রদর্শন করিতে হইবে) বলিয়াই সজ্জগুরু প্রত্যয় করিতেন। সজ্জের আদর্শ ও লক্ষ্যাহুয়ায়ী জাতির কর্মবুদ্ধি ও চিন্তাধারাকে এই স্মৃতিস্থিত সংগঠনপথেই চলিবার প্রেরণা প্রবর্তক সজ্জ দিয়া চলিয়াছে।

এমন ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ, গভীর-তাৎপর্যগর্ভ, জাতীয় সাধনায় উৎসর্গীকৃত এই মহামানবের জীবন-স্মৃতি-সংরক্ষণের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। ভারতবর্ষকে যদি ভারতবর্ষ হইয়াই বিশ্বের দরবারে স্বকীয় মহিমায় মণ্ডিত হইয়া গৌরবের আসন গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে সজ্জগুরুর দ্বায় মহাপুরুষের জীবনদৃষ্টান্তের অমুখ্যান, অমুশীলন ও অমুসরণ অপরিহার্য। আগামী কালের যাত্রাপথে এইরূপ আদর্শোজ্জ্বল জীবনস্মৃতিই জাতির পাথেয়। সজ্জগুরুর স্বরূপ-নস্তার আরতিতেই এই ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনার মর্ম আবার উদ্ঘাটিত হইবে, এইরূপ আশা করার যথেষ্ট কারণ আছে।

আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ও আশাশ্রিত হইলাম যে, সজ্জগুরুর স্মৃতিরক্ষাকল্পে একটি স্মৃতিমন্দির-নির্মাণ ও তন্মধ্যে তাঁহার মূর্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ আয়োজন করা হইতেছে তাঁহারই জন্ম-কর্মের, সাধনসময়ের পীঠভূমি চন্দনগরের পুণ্যতোয়া তাগীরধীর তীরে। এই স্মৃতি-মন্দিরসংলগ্ন ভারত-সংস্কৃতির স্মারক ও ষাঁটি জাতীয় চেতনার প্রদীপনমূলক একটি প্রদর্শনীগৃহ-প্রস্ততি এবং সেই সঙ্গে সজ্জগুরুর কল্পস্বপ্ন ও সজ্জ-জীবনের পরম লক্ষ্যস্বরূপ জাতীয় সংহতিবোধের সৃষ্টি ও পুষ্টিকল্পে এক অতিনব অমুশীলনকেন্দ্র-রচনার পরিকল্পনাও তাঁহাদের আছে।

সজ্জগুরু শুধু সজ্জেরই নহেন, তিনি সমগ্র দেশের এবং সমগ্র জাতির শাশ্বত সম্পৎ। তাই আমরা আশা করি, আমাদের আদর্শনিষ্ঠ দেশবাসীর স্বতঃপ্রণোদিত সহযোগিতা ও বদান্ততা সজ্জের এই মহৎ সঙ্কল্পসিদ্ধির সাধনায় সহায়ক হইবে এবং ভারতবর্ষের এই উজ্জ্বল

জ্যোতিষ্কের জীবনাদর্শ জাতির উদীয়মান বংশধরগণের সম্মুখে চিরদিন জাজ্জল্যমান থাকিবে।

শ্রী অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, আচার্য্য

(প্রাক্তন অধ্যক্ষ, গোরক্ষনাথ মন্দির : গোরক্ষপুর)

শ্রী অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

(সাহিত্যাচার্য্য : কলিকাতা)

শ্রী অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়

(চেমারমান, দার্জিলিং মিউনিসিপালিটি)

শ্রী অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়

(সেচমন্ত্রী : পশ্চিমবঙ্গ)

শ্রী অতুল্য ঘোষ।

(সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস : কলিকাতা)

শ্রী শ্রীঠাকুর অম্বকুলচন্দ্র

(সংসদ : দেওঘর)

শ্রী অমরেন্দ্রকৃষ্ণ ভাট্টা

(উকিল : মালদহ)

শ্রী অমিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(হাপি ভ্যালি টি এস্টেট, দার্জিলিং)

শ্রী অমূল্যরতন আচার্য্য, এম. বি.

(নিয়ামতপুর : বর্ধমান)

শ্রী অর্কেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

(শিল্প-সমালোচক : কলিকাতা)

শ্রী অশোককুমার সরকার

(সম্পাদক, আনন্দবাজার পত্রিকা ও দেশ)

শ্রী আত্মব্রত সান্যাল

(প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি, বিশ্ব-সংস্কৃতি সজ্জ : কলিকাতা)

শ্রী উদয়শঙ্কর

(নৃত্যকলাচার্য্য : কলিকাতা)

শ্রী উপেন্দ্রচন্দ্র রায়

(ভূতপূর্ব এড্‌মিনিষ্ট্রেটর : চন্দননগর)

শ্রী এ্যালিক ম্যাকইন্স

(ভূতপূর্ব ম্যানেজার, গ্রাশনাল ব্যাঙ্ক অব্‌ ইণ্ডিয়া)

শ্রী এ্যালেন চালমার্স

(কাটলিছড়া টি এস্টেট : কাটলিছড়া, কাছাড়)

শ্রী করুণাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

(সেক্রেটারী, মোহনবাগান ক্লাব ; ফুটবল বিভাগ)

- শ্রীকানাইলাল গোস্বামী
(শ্রীরামপুর : হুগলী)
- শ্রীকালিদাস নাগ, ডক্টর
(ইতিহাসাচার্য : কলিকাতা)
- শ্রীকালীকিঙ্কব সেনগুপ্ত, এম. বি., কবি
(কলিকাতা)
- শ্রীকালীগতি বন্দ্যোপাধ্যায়
(ডাক্তার : সিউড়ী, বীরভূম)
- শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত
(তদ্রকাশী : হুগলী)
- শ্রীকিশোরীলাল কণ্ডু
(ডাক্তার : কাটিহার, পূর্ণিমা)
- শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, কবি
(কোগ্রাম : বর্ধমান)
- শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সাধু
(বস্তীর : বর্ধমান)
- শ্রীকৈদার ঘোষ
(সভাপতি, ভারতীয় সাংবাদিক সম্মেলন : কলিকাতা)
- শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
(পূর্বমন্ত্রী : পশ্চিমবঙ্গ)
- শ্রীগঙ্গাধর চক্রবর্তী
(জঙ্গলপাড়া : হুগলী)
- শ্রীমৎ গঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী
(প্রতিষ্ঠাতৃ-সভাপতি, সঙ্গীত-সাধনসম্মেলন : কলিকাতা)
- শ্রীগুরুপদ চন্দ্র
(সাঁইখিয়া, বীরভূম)
- শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, ডক্টর,
(কাশীধাম : উঃ প্রঃ)
- শ্রীগোপেন্দ্রভূষণ সাংখ্যতীর্থ, পণ্ডিত
(সম্পাদক, বঙ্গবিবুধজননী সম্মেলন : নবদ্বীপ, নদীয়া)
- শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য, এম. পি.
(সম্পাদক, জনসেবক : কলিকাতা)
- শ্রীমদ্বিষ্ণুস্বামী জগন্নাথপ্রমোদ, পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য
(ভূতপূর্ব মোহান্ত, তারকেশ্বর-মঠ : কাঁকো, বিহার)
- শ্রীজগন্নাথ কোলে
(প্রচারমন্ত্রী : পশ্চিমবঙ্গ)
- শ্রীজি. ডি. কোঠারি
(কলিকাতা)
- শ্রীজীবনকৃষ্ণ মৌলিক
(প্রেসিডেন্ট, মণ্ডল-কংগ্রেস কমিটি : বেলঘরিয়া, ২৪ পঃ)
- শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী
(সভাপতি, হুগলী বার এসোসিয়েশন : হুগলী)
- শ্রীমৎ তারানন্দ ব্রহ্মচারী
(প্রেমমন্দির : রিষড়া, হুগলী)
- শ্রীতারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
(উকীল : কাটোয়া, বর্ধমান)
- শ্রীতারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
(সাহিত্যিক ও চিত্র-পরিচালক : কলিকাতা)
- শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
(সম্পাদক, অমৃতবাজার পত্রিকা : কলিকাতা)
- শ্রীত্ৰিগুণা সেন, ডক্টর
(রেজিষ্টার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় : কলিকাতা)
- শ্রীজৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী
(প্রাক্তন বিপ্লবী : পূর্ব পাকিস্তান)
- শ্রীদিলীপকুমার রায়
(সাহিত্যিক ও সঙ্গীতাচার্য : হরিকৃষ্ণ মন্দির, পুণা)
- শ্রীদেবনাথ দাস
(বিপ্লবী—আজাদ হিন্দ ফৌজ : কলিকাতা)
- শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, অধ্যক্ষ
(সভাপতি, নিখিল ভারত জনসম্মেলন : কলিকাতা)
- শ্রীদেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
(বর্ধমান)
- শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
(প্রাক্তন অধ্যক্ষ, চন্দ্রনগর কলেজ : চন্দ্রনগর)
- শ্রীনগেন্দ্রনাথ চন্দ্র
(প্রতিষ্ঠাতৃ-সম্পাদক, পালিকাস ফ্রান্সেস, চন্দ্রনগর)
- শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
(প্রাক্তন বিপ্লবী : চন্দ্রনগর)
- শ্রীমৎ নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী
(সভাপতি, দেবসম্মেলন : দেওঘর)
- শ্রীনলিনীরঞ্জন ঘোষ এম. পি.
(এডভোকেট সুলীম কোর্ট : জলপাইগুড়ি)

শ্রীনলিনচন্দ্র দত্ত

(সভাপতি, প্রবর্তক সঙ্ঘ : চন্দ্রনগর)

শ্রীনলিনীকিশোর গুহ

(প্রাক্তন বিপ্লবী ও সহ-সম্পাদক, জনসেবক)

শ্রীনারায়ণচন্দ্র দে

(ভূতপূর্ব মেম্বর : চন্দ্রনগর)

শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বার-এট-ল

(কলিকাতা)

শ্রীনিশীথনাথ কুণ্ডু

(উকীল : পশ্চিম দিনাজপুর)

শ্রীপি. সি. সরকার, যাদুসম্রাট

('ইলুজাল' : কলিকাতা)

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে

(প্রাক্তন বিপ্লবী : চন্দ্রনগর)

শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

(সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ : কলিকাতা)

শ্রীমৎ স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী

(কলিকাতা)

শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দ পিতাজী মহারাজ

(সভাপতি, মাতৃকাস্রম, প্রণব সঙ্ঘ : কলিকাতা)

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, ডক্টর

(সভাপতি, পি. এস. পি. : কলিকাতা)

শ্রীপ্রকৃষ্ণচন্দ্র সেন

(মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ : কলিকাতা)

শ্রীপ্রবোধকুমার গুহ

(স্বাস্থ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ)

শ্রীপ্রবোধকুমার সাম্যাল

(সাহিত্যচার্য : কলিকাতা)

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র নায়ক

(সেক্রেটারী, শ্রীশ্রীমহাপ্রভু মন্দির : তমলুক)

শ্রীপ্রভুদয়াল হিমতসিংকা, এম. পি.

(কলিকাতা)

শ্রীপ্রমথনাথ ভট্টাচার্য

(সম্পাদক, হিমাদ্রি : কলিকাতা)

শ্রীপ্রাণকিশোর গোস্বামী, বিদ্যাবূষণ, প্রভুপাদ

(সভাপতি, নিখিল ভারত বৈষ্ণব সম্মিলন : হাওড়া)

শ্রীমৎ মহর্ষি প্রেমানন্দ

(প্রতিষ্ঠাতৃ-সভাপতি, গীতাভারতী মিশন : পুঃ পাঃ)

শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দ গিরি

(শ্রীশ্রীভোলানন্দ আশ্রম : কলিকাতা)

শ্রীফণিভূষণ বর্মণ

(উকীল : বর্ধমান)

শ্রীফণীন্দ্রনাথ দে

(চেয়ারম্যান, কামারহাট মিউনিসিপালিটি : ২৪ পঃ)

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

(সম্পাদক, ভারতবর্ষ : কলিকাতা)

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন, ভক্তিতারতী-ভাগীরথী

(ভূতপূর্ব 'দেশ'-সম্পাদক : কলিকাতা)

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

(সভাপতি, প্রবর্তক সঙ্ঘ : চট্টগ্রাম, পুঃ পাঃ)

শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য

(অধ্যাপক : কলিকাতা)

শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

(প্রাক্তন বিপ্লবী : চন্দ্রনগর)

শ্রীশ্রীঠাকুর বালক ব্রহ্মচারী

(কলিকাতা)

শ্রীমৎ স্বামী বিনয়ানন্দ গিরি

(প্রতিষ্ঠাতৃ-সভাপতি বিনয়ানন্দ সম্মাস্রম : ২৪ পঃ)

শ্রীবিনয় মুখোপাধ্যায়

(সম্পাদক, ভাগীরথী পত্রিকা : কালুনা, বর্ধমান)

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

(সম্পাদক, দৈনিক বহুমতী : কলিকাতা)

শ্রীবিভূপদ কীর্তি

(অধ্যক্ষ, হার্বার্ট কলেজ : কলিকাতা)

শ্রীবিমলানন্দ তর্কতীর্থ, এম. এল. এ., কবিরাজ

(কলিকাতা)

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার, ডক্টর

(পাটনা : বিহার)

শ্রীবীজেশচন্দ্র সেন

(রাষ্ট্রমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ : কলিকাতা)

শ্রীবীরেশচন্দ্রকুমার মল্লিক

(কালুনা, বর্ধমান)

শ্রীবীরেশকিশোর রায়চৌধুরী

(গৌরীপুর, মধনসিংহ : কলিকাতা)

শ্রী১০৮ স্বামী ব্রহ্মানন্দ পরমহংস

(প্রতিষ্ঠাতৃ-সভাপতি, ভক্তিকানন আশ্রম : বাঁকুড়া)

শ্রীব্রজপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

(ডাক্তার : জামশেদপুর, বিহার)

শ্রীভীমজী নারায়ণজী

(রায়পুর : মধ্যপ্রদেশ)

শ্রীভূগতি মজুমদার

(প্রাক্তন বিপ্লবী ও মন্ত্রী, পশ্চিম বঙ্গ : হুগলী)

শ্রীমহুজচন্দ্র সর্দাবিকারী

(সেক্রেটারী, নিখিল ভারত হিন্দুমহাসভা)

শ্রীমৎ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, ডক্টর

(উদ্ধারণ মঠ : কলিকাতা)

শ্রীমণীন্দ্রনাথ দাস

(ষ্টেট ভোলানাথ দাস : চন্দননগর)

শ্রীমাধনলাল সেন

(প্রাক্তন বিপ্লবী : কলিকাতা)

শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দ

(সভাপতি, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন : বেলুড়)

শ্রীমুরারিমোহন ঘোষ, ডক্টর

(অধ্যাপক, কবিরাজ : কলিকাতা)

শ্রীযমুনাকিশোর ঘোষ

(ডাক্তার, জামশেদপুর : বিহার)

শ্রীযত্নগোপাল মুখোপাধ্যায়

(প্রাক্তন বিপ্লবী রাঁচি : বিহার)

শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দ সরস্বতী

(অধ্যক্ষ, গারো হিল ও যোগেশ্রী নিকেতন : কলি:)

শ্রীরণজিৎকিশোর সিংহ সাহস রায়

(রামগড়ের রাজা : রামগড়, মেদিনীপুর)

শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়

(প্রাক্তন এম. এল. এ. : বালী, হাওড়া)

শ্রীমাপ্রসাদ মুখার্জি

(ভূতপূর্ব বিচারপতি, কলিকাতা হাইকোর্ট : কলি:)

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, ডক্টর

(ইতিহাসাচার্য : কলিকাতা)

শ্রীরাধহরি চট্টোপাধ্যায়

(বাকুড়া)

শ্রীরাজমোহন নাথ, বি. ই., তত্ত্ববৃষণ

(শিল্প : আসাম)

শ্রীরাধাকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, পদ্মভূষণ, ডক্টর

(কলিকাতা)

শ্রীরাধাবিনোদ পাল, ডক্টর

(জাতীয় অধ্যাপক, মেম্বর ইন্টারজাশনাল ল কমিশন
ইউ. এন. ও : কলিকাতা)

শ্রীরামমলিনী চক্রবর্তী

(সভাপতি বাকুড়া জেলা কংগ্রেস কমিটি : বাকুড়া)

শ্রীরাসবিহারী সেন

(প্রাক্তন এম. এল. এ. : কালনা, বর্ধমান)

শ্রীশচীন্দ্রমোহন নন্দী

(চেয়ারম্যান, নবদ্বীপ মিউনিসিপালিটি : নবদ্বীপ)

শ্রীশান্তিভূধা ঘোষ

(প্রিন্সিপাল, হুগলী মহিলা কলেজ : হুগলী)

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী

(প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি, উমাচল আশ্রম : আসাম)

শ্রীশ্রীকুমার ব্যানার্জি, ডক্টর

(অধ্যাপক : কলিকাতা)

শ্রীশ্রীজীব ভায়তীর্থ

(অধ্যাপক : ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা)

শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়

(স্বয়ংজ্ঞান মন্ত্রী : পশ্চিমবঙ্গ)

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

(ডাক্তার : বর্ধমান)

শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত

(খাদি প্রতিষ্ঠান : কলিকাতা)

শ্রীসত্যগোপাল রায়

(কোষাধ্যক্ষ, সাক্চী কালীবাড়ী : জামশেদপুর)

শ্রীসত্যচরণ কর্মকার

(প্রাক্তন বিপ্লবী : চন্দননগর)

শ্রীসত্যবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

(লালকুঠি : চন্দননগর)

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ জ্ঞান

(উকিল : তমলুক, মেদিনীপুর)

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

(ধাত্রীগ্রাম : বর্ধমান)

শ্রীশ্রীমৎ ঠাকুর সীতারামদাস ওকারনাথ

(ডুমুরদহ আশ্রম : হুগলী)

শ্রীশ্রীকুমার মিত্র, বার-এট-ল

(কলিকাতা)

শ্রীসুদর্শন চক্রবর্তী (ব্যাণ্ডেল, হুগলী)	শ্রীমৎ স্বামী সমাধিপ্রকাশ আরণ্য মহারাজ (প্রতিষ্ঠাতৃ-সভাপতি, সমাধি মঠ : দিনাজপুর)
শ্রীসুধাংশুকুমার বসু (সম্পাদক, হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড : কলিকাতা)	শ্রীমৎ স্বামী সোমানন্দ (সভাপতি, মাহেশ রামকৃষ্ণ মঠ : রিষড়া, হুগলী)
শ্রীসুধীরচন্দ্র লাহা : (কলিকাতা)	শ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব, অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর (প্রতিষ্ঠাতা ও গুরু : অঘাচক আশ্রম, বারাণসী)
শ্রীসুনীলবরণ রায় (কমিশনার কলিকাতা কর্পোরেশন : কলিকাতা)	শ্রীহরিহর শেঠ, দেশপ্রী (চন্দননগর : হুগলী)
শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার, সাহিত্যরত্ন (ভাগলপুর, বিহার)	শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী (এডভোকেট স্প্রীম কোর্ট : বারাকপুর, ২৪ পঃ)
শ্রীসুবিমলচন্দ্র রায়, বি. এল. (উকীল, দঃ পুঃ রেলওয়ে : ব্যাণ্ডেল, হুগলী)	শ্রীহরেন্দ্রনাথ মজুমদার (সেক্রেটারী, ভারত-সভা : কলিকাতা)
শ্রীসুশীলপ্রসাদ সর্মাধিকারী, বার-এট-ল (কলিকাতা)	শ্রীরায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী (শিক্ষামন্ত্রী : পশ্চিমবঙ্গ)
শ্রীস্বর্ধ্যানারায়ণ তর্কতীর্থ, পণ্ডিত (অধ্যক্ষ, শ্রীকালিদাস চতুষ্পাঙ্গি : চন্দননগর)	শ্রীহেমন্তকুমার বসু, এম. এল. এ. (সভাপতি, সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লক, কলিকাতা)
শ্রীসোহনলাল মল : (কলিকাতা)	শ্রীমৎ সাধু হেমভাই (সভাপতি, দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, আত্মাধীঠ)
শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী (সম্পাদক, 'আর্য্যদর্পণ' দঃ বাং সারস্বত মঠ : ২৪ পঃ)	

সজ্জগুরু

শ্রীআরাধনা গুণ্ড

হে গুরু, সমর্পণের মন্ত্র-প্রদীপ জ্বলে'
এ তবু প্রতি অণুর ঘুম ভাঙতে এলে।
বিচিত্র সুরে চাইলে কি যে আমার কাছে
এই যে হেথা, মৃত্যুহরণ, বহি-চরণ ফেলে'।
নিশার মেঘে' দিশারী নেবে
এলেই যদি তরী বেয়ে' এ জীবনবেদের ভাষা নূতন
মানবতার মর্মবাণীর অটল ধারা ঢেলে'।
তখন কেন বিদায় নিলে এই আমাদের ফেলে ?
ধূলির ধরার প্রতি কণায় অমর তোমার ছায়া
মৃত্যু কোথায় অমৃত হে, ভীষণ মধুর মায়া।

হৃদয়তলের গোপন দলে
জাগরণেব জোয়ার চলে বিরহের অতল ভলে
আনন্দের ঐ শিখর বাহি' পর্দাখানি ঠেলে'।
ধরলে বুঝি মহাকালের বিরাই খুঁধি মেলে'।
আমরা তোমার কিইবা জানি আকাশ ঘন নীলে
তাইতো তুমি ঠাইটি তোমার সেধায় খুঁজে' নিলে।
জ্বলে আলো হৃদয়-মাঝে
শুনছি মহাশঙ্ক বাজে
শক্তি ঢেকে' শক্তি তোমার নৃপুত্র বাজায় সন্ধ্যা-তারায়
যেধায় তুমি ছিলে—
দিব্য গুরু সঙ্ঘ-সখা এই নিখিলের মিলে।

গুরু দক্ষিণা

স্বামী বিশ্বরূপানন্দ

‘বৎস, তোমার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে। তুমি এখন বাড়ী ফিরে যাও।’ বললেন আচার্য দিব্যাজ পদতলে প্রণামনত চন্দ্রধরের মাথায় হাত দিবে। চন্দ্রধরের চোখ দুটি জলে ভরে এলো। বলল, ‘গুরুদেব, আদেশ করুন, কি দক্ষিণা আপনাকে দিতে পারি?’ চন্দ্রধরের প্রতিভা ও গুরুভক্তি আচার্য দিব্যাজ মুগ্ধ। বাৎসল্যভরা কণ্ঠে তিনি বললেন, ‘বৎস, গুরু দক্ষিণা আমি পেয়েছি। তুমি এখন প্রসন্ন চিত্তে নিজের বাড়ী যাও।’ এ কথায় চন্দ্রধরের হৃদয় শান্ত হল না। খুব আগ্রহের সঙ্গে সে আবার বলল, ‘না গুরুদেব, দক্ষিণা না দিতে পারলে আমার হৃদয় শান্ত হবে না। আপনি আমার দয়া করুন।’

চন্দ্রধরের এই দৃঢ়তা দেখে ভাবে ভরপুর হয়ে উঠল দিব্যাজের হৃদয়। তিনি বললেন, ‘বৎস, আমি তোমার ভক্তি ও সেবায় অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। এ বিষয়ে তুমি বিমুগ্ধ সংকোচ কোর না।’

সবিনয় করজোড়ে চন্দ্রধর বললে, ‘না গুরুদেব, আপনার অমুগ্ধ থেকে দয়া করে আমাকে বঞ্চিত করবেন না। দয়া করে আমায় যে কোন আদেশ করুন।’

দক্ষিণা দানে চন্দ্রধরের এই বিপুল আগ্রহ দেখে আচার্য দিব্যাজের মুখমণ্ডল গভীর হয়ে উঠল। তাইতো কি দক্ষিণার কথা একে বলা যায়? অল্প ছাত্র হলে কথা ছিল না। কিন্তু এ তো সেরকম সাধারণ ছাত্র নয়। বিজ্ঞান বুদ্ধিতে এরকম ছাত্র মেলে খুব কমই। কিছুক্ষণের জল্প গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন তিনি। গভীর ঔৎসুক্যের সঙ্গে তাকিয়ে আছে চন্দ্রধর আচার্যের মুখের দিকে। ‘আচ্ছা চন্দ্রধর’, বললেন আচার্য: ‘দক্ষিণা আমি নেব তোমার কাছ থেকে।’ চন্দ্রধরও গুরুদেবের চরণে মাথা নত করে বলল, ‘আদেশ করুন গুরুদেব।’ ‘তুমি অধ্যাপনা কর, এই হবে তোমার উপযুক্ত দক্ষিণা’: গভীর কণ্ঠে বললেন আচার্য।

দক্ষিণা শুনে চন্দ্রধর কিছুক্ষণের জল্প হতবাক হয়ে গেল। যে দায়িত্ব আজ গুরুদেব তাকে দিলেন তাতে সে যেন নিজেকে বেশ ভারগ্রস্ত মনে করল। কেননা,

আজকের মত সে যুগে অধ্যাপনা কার্য এত সোজা ছিল না। অধ্যাপক হবার পূর্বে তখন রীতিমত তপস্বী করতে হত। বিজ্ঞান ও চরিত্রে তাঁকে হতে হত আদর্শস্থানীয়। বিজ্ঞান চেষ্টে চরিত্রের উপরই বেশী জোর দেওয়া হত তখন। চরিত্র গঠনের জন্মই শিক্ষা, কেবল মাত্র বুদ্ধি-বিকাশের জন্ম নয়, এ কথাটা প্রায় সকলেই বুঝত তখন। গুরুদেব তখন ছিলেন শিষ্যের একাধারে মাতা ও পিতা। গুরুগৃহে থেকে শিষ্যদের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে স্বাবলম্বী হতে হত। আজকের মত শিক্ষা শেব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গুরুর সঙ্গে শিষ্যের সম্পর্ক শেষ হয়ে যেতো না। জীবন-ভোর শিষ্যের প্রতিটি কর্মের জন্ম গুরু রীতিমত দায়ী থাকতেন।

চন্দ্রধর তাড়াতাড়ি কোন উত্তর দিতে পারলো না। আচার্যের অধরে তখন মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠেছে। তিনি বললেন, ‘কি বৎস, দক্ষিণাটা কি খুব গুরুতর মনে হচ্ছে?’ চন্দ্রধর লজ্জিত। অবশ্য মুখে সেরকম কোন ভাব প্রকাশ না করে শান্তকণ্ঠে বলল, ‘না গুরুদেব, দক্ষিণা আমি নিশ্চয় দেব।’ প্রসন্ন হাস্তে দিব্যাজের মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। স্নেহে প্রাণভরে তিনি চন্দ্রধরকে আশীর্বাদ করলেন, আর চন্দ্রধরও শ্রীগুরুর পদতলে মস্তক অবনত করল।

* * *

নির্জন নর্মদা তীরে চন্দ্রধর একটি আশ্রম স্থাপন করেছে। আশ্রমের একধারে কলাগাছ, তুলসীগাছ প্রভৃতি সারি সারি লাগানো হয়েছে। আর একধারে যজ্ঞকুণ্ড। আশ্রমের একটু দূরেই গোশালা এবং শিষ্যদের পর্ণকুটীর। হোম ধূমের পবিত্র গন্ধে সেখানকার আকাশ বাতাস ভরে ওঠে প্রতিদিন। সেই পবিত্র নর্মদা তীরে একটি বিরাট অখণ্ড গাছ ছিল। তার চারিদিকে মাটি লেপে বেদীর মত করে তার উপর বসে চন্দ্রধর রোজ ছাত্রদের পড়াতে। এইভাবে ধীরে ধীরে বেশ কয়েক বৎসর কেটে গেল। আর তার সঙ্গে সঙ্গে তার অধ্যাপনার খ্যাতিও রটে গেল দেশ দেশান্তরে।

রোজকার মত সেদিনও বসেছে চন্দ্রধর ছাত্রদের নিয়ে। আলোচ্য প্রসঙ্গ, ‘একোহং বহুশ্চাম্।’ এই তত্ত্বটি তিনি তন্ময় হয়ে ছাত্রদের বোঝাচ্ছিলেন। এমন সময় একজন শিষ্য, যে এতক্ষণ গুরু চবাচ্ছিল, হস্ত দস্ত্র হাথে সেখানে ছুটে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, ‘গুরুদেব, গুরুদেব, আজ শ্বেতকেতু দুইজন পথিককে মেঝে সর্বস্ব লুণ্ঠ করে নিয়েছে।’ ভয়ে তার কণ্ঠস্বর তখনও কাঁপছিল।

বছর চারেক আগে শ্বেতকেতু চন্দ্রধরের শিষ্যত্ব স্বীকার করেছিল। তার মত প্রতিভাবান গুরুতন্ত্র শিষ্য চন্দ্রধরের ছিল না বললেই হয়। তাই তার প্রতি মায়াও পড়েছিল চন্দ্রধরের খুব। ভেবেছিল, এই শ্বেতকেতুই হয়ত তার মুখ রাখবে একদিন। কিন্তু বিধি বিধান অত্যন্ত রকম। প্রায় বছর দুই হল সে পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে ডাকাতি শুরু করেছে। নিত্য নতুন অত্যাচারে দেশবাসী অতিষ্ঠ। চন্দ্রধরের মনে হয়, সেই বুঝি দায়ী এর জন্ত। আজও সে হতে পারেনি আদর্শ শিক্ষক। নইলে শিষ্য তার এককম হবে কেন? তাই চন্দ্রধরের অন্তরে দুঃখের অন্ত নেই। তার উপর আজকের এই সংবাদ। মরমে মরে গেল চন্দ্রধর। এই কি তার গুরু দক্ষিণা!

* * * *

শ্রাদ্ধ মাসের রাত। আকাশ শনৈশ্বে ঢাকা। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝিলিক। চৌচির হয়ে যায় অস্থানীন আকাশের কালো বুকখানা। আবার সেই ঘন ঘোর অন্ধকার। বিজ্ঞান বনবীথি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। এমন সময় বেরিয়ে পড়েছে চন্দ্রধর তার কুটির ছেড়ে। স্থচীভেদ্য অন্ধকার ভেদ করে চলেছে চন্দ্রধর সতর্ক পদসঙ্কারে। এই পথেই শ্বেতকেতুর গত্যাত চলে রাতভোর। এই পথেই নীরব হয়েছে কত পথিকেব কণ্ঠস্বর চিরদিনের জন্ত। তবে চন্দ্রধরের সে ভয় নেই আর। ‘কে যায়?’ নিবিড় নীরবতার বুক চিরে কর্ণশ কণ্ঠস্বর বজ্রের মত ছড়িয়ে পড়ে বনে প্রান্তরে।

‘একজন পথিক’, অবিচল প্রত্যাঙ্গি চন্দ্রধরের।

‘দাঁড়াও।’

দাঁড়িয়ে পড়ল চন্দ্রধর।

‘যা আছে, সব রেখে যাও’, বলতে বলতে বেরিয়ে এল এক বিশালকায় দস্যু।

‘আমার কাছে তো কিছু নেই’। নম্র অথচ নির্ভীক কণ্ঠে উত্তর দিল চন্দ্রধর।

‘এরকম কথা সবাই বলে প্রথমে’, ক্রোধে ফেটে পড়ল দস্যু, ‘মার না খেলে কি আর কেউ কথা শোনে?’ সপাং সপাং করে কয়েক ঘা বেত পড়ে গেল চন্দ্রধরের গায়ে। চন্দ্রধর নীরব। বাধা দিল না একটু, আর সরেও গেল না এক পা। নির্মম হাতে চলেছে দস্যুর বেজাঘাত। গায়ের চামড়া কেটে রক্ত বেরচ্ছে, মুখে কিছ্র সেই অটুট প্রশমতা। এমন সময়ে আকাশে বিদ্যুৎ চমকালো, আলো হয়ে গেল অন্ধকার বন মুহূর্তের জন্ত। সঙ্গে সঙ্গে শ্বেতকেতুর হাতও থেমে গেল, মুখখানি হয়ে গেল ছাইয়ের মত নিমেষের মধ্যে।

‘কি থেমে গেলে কেন? ক্রান্ত হয়ে পড়েছ বুঝি।’ প্রশান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল চন্দ্রধর। শ্বেতকেতু ততক্ষণ লুটিয়ে পড়েছে চন্দ্রধরের পদতলে। ‘গুরুদেব, আমি মহাপাপ করেছি। আমায় কঠোর দণ্ড দিন’ অমৃতগুণ্ড স্বরে বললে শ্বেতকেতু।

‘ওঠো শ্বেতকেতু’, হ’হাতে শ্বেতকেতুকে উঠাতে উঠাতে বলল চন্দ্রধর, যা হয়েছে তা ভালই হয়েছে। তোমাকে শিষ্য করে আমি তোমার অমূল্য জীবন নষ্ট করেছি। তোমার প্রতিভাকে ঠিকমত পরিচালিত করতে পারিনি। তাই অপরাধ আমারই শ্বেতকেতু, তোমাব নয়। শাস্তি আরও হওয়া উচিত ছিল আমার।’ শ্বেতকেতুর দুই গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়েছে অমৃতাপের অশ্রু। মুখ দিয়ে কোন কথাই বেরল না তার। সম্মুখে তাকে বৃক্ ঝড়িয়ে ধরল চন্দ্রধর। তার চোখেও জল। ‘শ্বেতকেতু’, অশ্রুস্রব কণ্ঠে বলল চন্দ্রধর, ‘এর চেয়েও বেশী কশাঘাত আমি সইতে পারি প্রত্যেক শিষ্যের কাছ থেকে, যদি তারা ঠিক ঠিক মানুষ হয়।’

এমন সময় সেখানে আবিভূর্ত হলেন এক বৃদ্ধ। মাথায় লম্বা লম্বা জটা, একেবারে সাদা হয়ে গেছে, মুখভর্তি দাড়ি, প্রশান্ত দৃষ্টি।

‘গুরুদেব, আপনি!’ সবিস্ময়ে চন্দ্রধর তাঁর পাখের তলায় লুটিয়ে পড়ল। ‘হ্যাঁ, আমি’, বলতে বলতে আচার্য্য দিব্যাজ চন্দ্রধরকে উঠিয়ে আলিঙ্গন করলেন। ‘সার্থক তোমার অধ্যাপনা চন্দ্রধর। তোমারই মত অধ্যাপকের প্রয়োজন দেশে এখন সব চেয়ে বেশী। অপূর্ব গুরু দক্ষিণা তুমি আজ আমাকে দিলে, কথাগুলি বলতে বলতে দিব্যাজের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

এরপর শ্বেতকেতু আর ডাকাতি করেনি।*

* শ্রীশংকরদয়ালজী গাঙ্গে এম. এ. লিখিত ‘গুরু দক্ষিণা’ নামক হিন্দী গল্পের ভাবানুবাদ। গল্পটি প্রসিদ্ধ হিন্দী মাসিক ‘বল্যান’র ১৯৩১ মে সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

অসার বুনয়াদ

শ্রীকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বিদ্যাবিনোদ

শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য—জ্ঞানবুদ্ধি, সে-ই জ্ঞান, যা মানুষকে ক্রমবিবর্তনের পথে চালিয়ে দেবতা করবে। ভারত এই শিক্ষার আলো কোনদিন দেখেনি বললে ভুল বলা হবে না; কারণ মুষ্টিমেয় জ্ঞানী লোক নিয়ে বিরাট জনসংখ্যার ভারত নয়। ভারত কবে সত্যিকারের স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল, তা ঠিক ক'রে বলা হযতো সম্ভবপর নয়। মোগল পাঠান আদি বিদেশী শক্তি ভারতে এসেছে নিজেদের স্বার্থের সিঁদুক ভারতের ভাগ্য দিয়ে ভরিয়ে তুলতে। তাঁদের মধ্যে কোন কোন শাসক উদারতা দেখালেও, বক্তৃভেজা মাটিকে তাঁরা চন্দন-সিক্ত করতে পারেন নি। শেষের ইংরেজের হাতেও ছিল তুল্যদণ্ড। ভাবত তাই চিরকালই অজ্ঞানতার নিবিড় অন্ধকারে।

স্বাধীনতার যুগকাঠে বহু প্রাণ বলিদান দিয়ে, বুকের তাজা রক্তে পথের অনেক জঙ্ঘাল দূর ক'রে শেষে আনা হ'ল স্বাধীনতা। যুগ যুগ-ব্যাপী পরাধীনতার অভিশাপ কাটিয়ে ওঠা কয়েকদিনের কাজ নয়, কিন্তু সাফাই কাজে অস্ত্রের দরদ থাকা চাই। ফোটা তোলানোর জঘ্ন ঝুড়ি কোদাল ধরলে তো হবে না।

মোট ভাত কাপড়ের সংস্থান ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গেই চাই—জ্ঞান-উন্মেষকারী শিক্ষা; কাবণ “মানবতাহীন মানুষ মেঘ” নিয়ে দেশের কী হবে? আর, ঐ উভয় দায়িত্বই প্রধানতঃ জাতীয় সরকারের। কিন্তু দেখা যাচ্ছে—জাতীয় শিক্ষার বনিয়াদ ঠিকভাবে গড়া হচ্ছে না।

অধিকাংশ দেশবাসীরই শিক্ষা নেই, নেই তাই শৃঙ্খলা ও শালীনতাবোধ। এজ্ঞে অবশ্য দেশবাসী দায়ী নন, দায়ী পরাধীনতা। মানুষের দেহ নিয়ে জন্মানো যায়, কিন্তু যত্নসহ লাভ করতে হয় কর্মের দ্বারা। দেশ-বাসীকে সেকপ শিক্ষা ও অযোগ্য কে দিচ্ছে অতীতে? তাই দেশময় বিশৃঙ্খলা ও দুর্নীতি। মা-বাবা নিজেদের কর্তব্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন থেকেই সন্তানদের নিয়ে আসেন। অনেকে ছুঃখবোধ করলেও, সে ছুঃখ সাধারণতঃ গিয়ে পড়ে—ভগবান বা ভাগ্যের ঘাড়ে। উত্তরাধিকার সূত্রে এই ভাবধারা জীবনে নিয়ে সন্তান পৃথিবীর বুকে পাড়ায়। এদেরই মানুষ হবার শিক্ষা দিতে হবে।

এসে পড়ে প্রাথমিক শিক্ষার কথা। শিক্ষার তথ্য মনুষ্য লাভ করার শক্তির বনিয়াদ এখানেই হবে গড়া। চারাকে অব্যবস্থার মধ্যে রেখে পূর্ণাঙ্গ গাছের আশা করা যেমন বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই হ'তে পারে না, তেমনি কার্যকরী হ'তে পারে না—উচ্চ-শিক্ষা যদি

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা অল্পপযুক্ত হয়। বাংলার অনেক গ্রামে গিয়েছি, দেখেছি সেখানকার প্রাথমিক বিদ্যালয়, বুকেছি—কী ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় সেখানে। শহর, উপশহর বা বিশিষ্ট পল্লীরও উচ্চ, উচ্চতর ইত্যাদি বিদ্যায়তনের কাছে গ্রামের অধিকাংশ প্রাথমিক স্কুল-বাড়ি একেবারে ‘ছোটনোক জাতের’। অথচ এখানেই মানুষ গড়ার প্রথম কাজ। কোন ঘরে জানালা দরজা যদিও থাকে, তেতরে দেখা যায় না—দেশ গড়েছেন যারা, তাঁদের কারো ছবি। রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দের ছবি দেখেও অনেক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী তাঁদের চিনতে পারে না।

শিক্ষক।—স্বাধীন-রাষ্ট্রের নাগরিক তৈরীর দায়িত্ব পালনে ক'জন তাঁরা সত্যিই যোগ্য—তা এক ন্যায্য প্রশ্নের বিষয়। পাস করলেই যদি শিক্ষক হওয়া যায়, তা হ'লে মানুষের দেহ নিয়ে জন্মিয়ে মানুষ হওয়া যায় না কেন? সার্টিফিকেট গুরু করে না, বিশেষ শিক্ষাই গুরু তৈরী করে, এটা শিক্ষা বিভাগের আজকের চিন্তার বিষয় হওয়া দরকার। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষককে হ'লে হবে এই গুরু দায়িত্বপূর্ণ কাজ চালানোর যোগ্য শিক্ষায় শিক্ষিত, শৃঙ্খলা ও শালীনতাবোধসম্পন্ন সুস্থ ব্যক্তি এবং সংস্কৃতিপ্রায়ণ। এই গুণগুলি না থাকলে, অল্পস্থ পরিবেশ থেকে আসা শিশুদের কিছুতেই দেহে ও মনে, স্বাস্থ্যবান্ করা যাবে না। বর্তমানে বহু শিক্ষক ও শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থিনীকে দেখলে সত্যিই চমকে উঠতে হয়—এঁরা মানুষ গড়বেন, এরাই হবে মানুষ! পঁকে নিশ্চয়ই পদ্মফুল ফোটে, কিন্তু পঁকে তো পদ্মের কন্ড পুঁতে হবে! যে ভাবে আজ জনশক্তিকে বিপথে চালনা করা হচ্ছে, তা বড়ই দুঃখের বিষয়।

পাঠ্যপুস্তক।—এখানে একটামাত্র প্রশ্ন—জীবের হজমশক্তি কী সীমিত নয়? তা ছাড়া, সকল পড়ার বই কী শিশুমন ও বুদ্ধির নাগালে পড়ে? ক-খ সেয়েই একেবারে “সীতার বনবাস”! তাজ্জব ব্যাপার! তৃতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনাকালে বাংলাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন যদি হয়, দেশের স্বার্থে যেন শিক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কার করেন শিক্ষা-বিভাগ! আর না হলেও শিক্ষার বনিয়াদের দিকে দৃষ্টি রাখুন—সতর্ক দৃষ্টি। তা না হ'লে সাক্ষর লোকের সংখ্যা নিশ্চয়ই বাড়বে, কিন্তু অভাব থেকেই যাবে জ্ঞানী মানুষের। এতো কাম্য নয়।

ডাঃ পঞ্চানন চ্যাটার্জী

শ্রীলক্ষ্মী মজুমদার

সেই কোন বিশ্বৃত অতীতে মানুষ জন্ম নিয়েছিল পৃথিবীতে। তারপর কেটে গেছে কত কাল। পৃথিবীর পথে পড়েছে কত পথিকের পদচিহ্ন। সেই পায়ের ছাপ ধীরে ধীরে ঢাকা পড়ে গেছে কালের ধুলোয়। মহাকালের নাচের তালে তালে পৃথিবী বদলিয়েছে তার রূপ। পুরাতনকে নিশ্চিহ্ন করে স্রু হয়েছে নবীনের জয়যাত্রা। তবু আশ্চর্য্য, মহাকালের ঐ ভ্রুকুটিকে তুচ্ছ করে কালের ধুলোকে হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে কেমন করে যেন জীবন-পথের কোন কোন পথিক রেখে যায় তাদের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ পৃথিবীর বুকে, লিখে যায় তাদের নাম অলস্ত অক্ষরে ইতিহাসের পাতায়।

১৮৯২ সনে হাওড়া জেলার বালিগ্রামে কেশবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে যেদিন শীথ বেজে উঠল নব-জাতকের আগমন ঘোষণা করে, সেদিন কেউ ভাবেনি এই নতুন প্রাণের কুঁড়িটি একদিন পূর্ণ বিকশিত হয়ে তার সৌরভ ছড়িয়ে দেবে চারধারে। সেদিনের সেই অসহায় শিশু একদিন অনেকের সহায় হবে—এ কথাও কেউ ভাবেনি। নবজাতকের নামকরণ হল ‘পঞ্চানন’। শিশু পঞ্চানন বড় হল—পদার্পণ করল কৈশোরে। বালির রিতার্শ টেম্‌সন মিশন স্কুল (বর্তমান শান্তিরাম বিদ্যালয়) হতে এন্ট্রান্স পাশ করলেন ১৯০৮ সালে। ১৯১০ সালে উত্তরপাড়া কলেজ হতে আই. এ. পাশ করে তিনি তত্ত্বি হলেন কলকাতা মেডিকেল কলেজে। অধ্যয়ন করলেন তপস্বীর মত। দুষ্কর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলেন পঞ্চানন। কৃতিত্বের সাথে এম. বি. ডিগ্রী লাভ করে মেডিকেল কলেজে তিনি হাউস সার্জন পদে নিযুক্ত হন। চিকিৎসা-বিদ্যার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় দিকেই ছিল তাঁর বিশেষ দক্ষতা। ১৯২০ সাল। ডাঃ পঞ্চানন চ্যাটার্জী বাংলা সরকারের আহুত্ব্যে যাত্রা করলেন ইংল্যান্ডের উদ্দেশে। এক বৎসরের মধ্যে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় হতে এফ.আর.সি.এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯২১ সালে তিনি ফিরে এলেন স্বদেশে। দেশে ফিরে তিনি কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে (বর্তমান আর.



ডাঃ পঞ্চানন চ্যাটার্জী

জি. কর মেডিকেল কলেজ) সুপারিন্টেন্ডেন্টের পদ গ্রহণ করলেন; এই পদে কাটল ছ’টি বছর। তাঁর কর্তব্যনিষ্ঠা আর কঠিন পরিশ্রম এই নতুন কলেজটির গঠনের পথে যে সাহায্য করেছে তার ভুলনা নেই।

১৯২৮ সনে ডাঃ চ্যাটার্জী কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রথম অনারারি সার্জন নিযুক্ত হলেন। ক্রমে তিনি ঐ কলেজে ক্লিনিকাল সার্জারী ও সার্জারীর অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হন। বিদেশে যখন ছিলেন তখন সেদেশের হাসপাতাল পরিচালনার নানাবিধ সুব্যবস্থা, লোকের সময়নিষ্ঠা, পরিশ্রম আর এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবর্গের নিপুণ অধ্যাপনা, ছাত্রদের প্রতি মনোযোগ ও যত্ন তাঁকে মুগ্ধ ও অহুপ্রাপিত করে তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই প্রভাবের ফলশ্রুতি দেখা যায় পরবর্ত্তীকালে। ছাত্রদের প্রতি ছিল তাঁর একান্ত মনোযোগ ও যত্ন। এরই ফলে শল্য-চিকিৎসার অধ্যাপক পদে থাকা কালে তিনি ছাত্রদের আন্তরিক শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসা অর্জন করেছিলেন। কত ছাত্র যে তাঁর অর্থাহুত্ব্যে শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে তার ইয়ত্তা

নেই। ১৯৫২ সালে কলিকাতা মেডিকেল কলেজের কার্যভার হতে অবসর গ্রহণ করার পরও বহু ছাত্র তাঁর বাড়ীতে এসে শিক্ষা গ্রহণ করতো। বন্ধুবৎসল, পরদুঃখ-কাতর ও হৃদযবান এই মানুষটির গোপন দানও ছিল যথেষ্ট। বাইরে ছিল তাঁর পাশ্চাত্যের আবরণ, অন্তরে ছিল করুণার কল্যাণ। চিকিৎসার ব্যাপারে ধনী-দরিদ্রের কোন পার্থক্য ছিল না তাঁর কাছে। যখনই প্রয়োজন হয়েছে রোগীর কাছে ছুটে গেছেন। এমন কি পতীর রাতেও রোগীর চিকিৎসা করতে তিনি কুষ্ঠিত হতেন না। প্রখ্যাত সার্জন ও চিকিৎসক আরও কত আছেন, কিন্তু বিনা পারিশ্রমিকে শত শত দরিদ্র রোগীকে যেভাবে তিনি চিকিৎসা করতেন মানী ও নামী চিকিৎসকের ক্ষেত্রে তা' এক বিরল ঘটনা। কোন চিকিৎসক তাঁর কাছে পরামর্শ ও উপদেশের জন্য এলে তিনি অকুণ্ঠে সাহায্য করতেন। আর এই সাহায্যের মূলে থাকতো না আর্থিক লেন-দেন। ডাঃ চ্যাটার্জী অনেকদিন ধরে মেডিকেল কাউন্সিল অফ রেজিষ্ট্রেশনের সদস্য ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটর ও সিন্ডিকেটের সদস্য হিসাবেও তিনি কিছুকাল অতিবাহিত করেছেন। একবার তাঁকে দেখা গেল 'এসোসিয়েশন অফ সার্জন্স, ইণ্ডিয়া'র সভাপতিরূপে।

ডাঃ চ্যাটার্জীর স্বদেশের প্রতি অহুরাগের কথা না বললে তাঁর চরিত্রের একটি দিক অপ্রকাশিত থেকে যাবে। ১৯০৬ সাল। বাংলাদেশে তখন স্বদেশী আন্দোলনে উদ্দীপনার যুগ। দেশে যুগান্তরের স্বচনা দেখা দিয়েছে। অহুশীলন সমিতি ছিল বাংলায় স্বাধীনতার সাধক ও উপাসকগণের মিলনস্থল। বিপ্লবের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করা ছিল অহুশীলন সমিতির একমাত্র লক্ষ্য। বিপ্লব প্রচেষ্টাকে পুষ্ট ও বর্দ্ধিত করার জন্য স্থাপিত হয়েছিল শাখা-সমিতিগুলি। কিশোর পঞ্চানন অহুশীলন সমিতির বালি শাখার সাথে সংযুক্ত ছিলেন। এই সমিতির প্রভাবে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হল তাঁর মধ্যে। স্বদেশপ্রেমিক এই মানুষটি স্বাধীনতা আন্দোলনে সাহায্য করেছেন নানাভাবে। একদিকে অধীত বিজ্ঞা দিয়ে রোগ মুক্তি ঘটিয়েছেন বহু দেশকর্মীর, অন্যদিকে সহায়তা করেছেন গ্রামকর্মী। নিজ গ্রাম বালির প্রতি ছিল তাঁর অকৃত্রিম মমত্ববোধ।

মানব দরদী ও সমাজসেবী ডাঃ চ্যাটার্জীর অর্থ সাহায্যে পুষ্ট হয়েছে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও মন্দির। অথচ তাঁর নামটি থাকতো অহুল্লিখিত। লীলাগানের প্রতি তাঁর অহুরাগ তাঁকে যুক্ত করেছিল কলকাতার রাধারমণ কীর্ত্তন সমাজ, হাওড়া নদের নিমাই নাট্যসমাজ ও বারানসীর কীর্ত্তন সমাজের সাথে।

এ ছাড়া বালির আর্থ্যধর্ম সংরক্ষণী সভার সাথেও তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন।

ডাঃ পঞ্চানন চ্যাটার্জী ছিলেন ধার্মিক,—ঈশ্বরে বিশ্বাসী। যৌবনেই তিনি অধ্যাত্ম-জীবনে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর মন্ত্রলাভের ঘটনাটি চমকপ্রদ। যখন তিনি মেডিকেল কলেজের ছাত্র, সেই সময়ে একদিন রাতে স্বপ্নে তিনি মন্ত্র পেলেন। সেই সময় হতেই তিনি আকৃষ্ট হলেন ধর্মপথে। ১৯৬৫ সনে তিনি মগরায় শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারাম ওঙ্কারনাথের নিকট সঙ্গীক দীক্ষা গ্রহণ করেন।

নামগান ও নামজপ করা ছিল তাঁর নিত্যদিনের কাজ। আর এ কাজে ছিল তাঁর আন্তরিক অহুরাগ। পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত এই চিকিৎসক ক্রমে পরিণত হলেন ভক্ত বৈষ্ণবে। প্রতি একাদশীতে তাঁর গৃহে অমুষ্ঠিত হত নামকীর্ত্তন। গৃহে স্থাপিত হল রাধাবল্লভের বিগ্রহ। বহু বৈষ্ণবগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর সহায়তায়। দীক্ষিত হবার পর নানাতাবে তিনি জয়গুরু সম্প্রদায়ের সেবা করে এসেছেন। এই স্বত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়ের তবনটি দ্বিতল করার কাজে তাঁর বদান্যতা আর কণ্ঠকুশলতা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পুষ্টিকর আহারের জন্য প্রতি মাসে একশত টাকা তিনি দান করতেন। এ ছাড়া আরও কত যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাঁর সাহায্যে পুষ্ট হয়েছে তার সীমা নেই। সামাজিক ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য লোকহিতৈষণা আর চিকিৎসার ক্ষেত্রে অসাধারণ মনীষার জন্য তিনি ছিলেন অরণীয় আর শ্রদ্ধেয়।

পৃথিবীতে একদিন সকলেরই দিন ফুরায়। পথ চলতে চলতে একদিন ডাক আসে সব কিছু ছেড়ে যাবার। ডাঃ চ্যাটার্জীর জীবনেও একদিন এলো সেই কালের আহ্বান। একান্তরটি বৎসর এই পৃথিবীতে কাটিয়ে মানবদরদী এই মানুষটি যাত্রা করলেন পরপারের পথে। সেদিন ১৯৬৩ সালের ২২শে মে। বুধবার। রাত ৩-২০ মিনিট। ডাঃ চ্যাটার্জী তাঁর বিডন স্ট্রীটের বাড়ীতে ত্যাগ করলেন শেষ নিঃশ্বাস। পিছনে ফেলে গেলেন অগণিত পরিবার পরিজন। তাঁর মৃত্যুতে ছিন্ন হল উনবিংশ শতাব্দীর আরেকটি যোগসূত্র। হল অপূরণীয় ক্ষতি। এ কথা সত্যি সর্ব্ব ভারতীয় খ্যাতিসম্পন্ন শল্যচিকিৎসক ডাঃ পঞ্চানন চ্যাটার্জী আর এ পৃথিবীতে নেই, নিমতলার মহাশ্মশানে তাঁর নশ্বর দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেছে; কিন্তু যে কীর্ত্তি রেখে গেলেন তিনি তা রইল অম্লান। ইতিমাসের পাতায় যে স্বাক্ষর রেখে গেলেন তা রইবে চির প্রোজ্জ্বল।

জাতিসংঘে এখন,

A black and white portrait of a man with dark hair, wearing a suit jacket, white shirt, and a patterned tie. He is looking directly at the camera with a neutral expression. The background is dark and out of focus.

8

অল্প আবাসেই মোটে দুটি উইকেট হারিয়ে এই রাণ-সংখ্যা অতিক্রম করে গেল ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল। তাদের Hunte ও Kanhai দলের দুটি সেরা ব্যাটসম্যান, এই রাণসংখ্যা প্রায় তুলে দিলো। Hunte করলো ১০৮ রাণ আউট না হয়ে এবং Kanhai করলো ৭৭ টি চমকুপ্রদ বাণ। বাকি ক'টি রাণ Rodriguez ও Butcher দুজন মিলে করে দিলো। ওয়েস্ট ইন্ডিজের জয় হল আট উইকেটে। এই টেষ্ট পর্যায়ে তারা জিতল তিনটি; ইংলণ্ড একটি। বাকি খেলাটি (দ্বিতীয়) সমান সমানভাবে পূর্বেই শেষ হয়েছে। একবাক্যে সকলে স্বীকার করলো ওয়েস্ট ইন্ডিজের অপূর্ণ ক্রীড়া-কৌশলের, দলগত সংহতির ও ফ্রাঙ্ক ওরেলের নেতৃত্বের। দ্বিতীয় ইনিংসে ইংলণ্ডের Trueman আহত হয়ে খেলতে না পারায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাজ খানিকটা সহজ হয়েছিল সত্যি, কেননা Trueman ছাড়া Worrell-এর দলের অসমসাহসিক খেলোয়াড়দের সহজে আউট করা ইংলণ্ডের আর কোনও বোলারের ক্ষমতার বাইরে। এই খেলায় আর একটি রেকর্ড ভাঙল নবীন ওয়েস্ট ইন্ডিজ উইকেট কিপার Murray। সে এই টেষ্ট পর্যায়ে ২৪জন বিপক্ষদলের খেলোয়াড়কে আউট করে বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী হল। তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সকলেই একবাক্যে বললো—বিশ্বের সেরা উইকেটকীপার হবে সে শীঘ্রই। এইবারের সফরে চমকুপ্রদ খেলা দেখালো ওয়েস্ট ইন্ডিজের বোলার Griffith এবং ব্যাটসম্যান Kanhai, Hunte, Butcher, Sobers ও উইকেটরক্ষক Deryck Murray। ইংলণ্ডের উল্লেখযোগ্য খেলোয়াড় বলতে গেলে একমাত্র Trueman-এর নামই মনে হয়। বিখ্যাত ব্যাটসম্যান Worrell-এর এই শেষ টেষ্ট খেলা। বয়স কারও খাতির করে না। ফ্রাঙ্ক ওরেলের খেলা ছাড়ার সময় হল। কিন্তু সোনার অন্ধরে তাঁর নাম লেখা থাকবে ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে, তার পূর্ব-পূর্বকার বিখ্যাত ক্রিকেটারদের পাশে।

ক্রিকেটের আর একটি বড় খবরের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। সেটা হল আগামী বৎসরের স্কুটেই ইংলণ্ডের ক্রিকেট দলের ভারত সফর। Collin

Cowndey-র নেতৃত্বে ১৫ জন খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছে এরই জন্ত। এদের নাম:

১। এম. সি. কাউড্রে—ক্যাপ্টেন ২। এম. জে. কে. শ্বিথ—ভাইস ক্যাপ্টেন ৩। কে. এফ. ব্যারিংটন ৪। জে. বিক্স ৫। জে. বি. বোলাস ৬। জে. এইচ এড্রিচ ৭। বি. আর. নাইট ৮। ডি. উইলসন ৯। পি. জে. শার্প ১০। আই. জে. জোন্স ১১। জে. বি. মর্টিমোর ১২। জে. লার্টার ১৩। এফ. জে. টিটমাস ১৪। এস. ই. প্রাইস ১৫। জে. এম. পার্কস।

এদের মধ্যে সকলেই ইংলণ্ডের হয়ে খেলেছে কেবল চারটি খেলোয়াড় বাদ দিয়ে। এই চারজন হল বিক্স, জে. জোন্স, জে. প্রাইস ও ডন উইলসন। বাকী সকলেই টেষ্টে খেলেছে এবং এর মধ্যে কয়েকজন খেলোয়াড়, যথা—Brian Bolus, John Edrich, Phil Sharp, Gim Parks অল্প কয়েকটি টেষ্টে মাত্র খেললেও যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের সঙ্গে খেলায়। Colin Cowdrey, Barrinton Mike. Smith, Knight, Larter Titmus প্রমুখের পরিচয় ত আমরা আগেই যথেষ্ট পেয়েছি। আশা করছি আমরা যে এঁরা আমাদের এখানে এসে খেললে আমাদের খেলোয়াড়দের উপকার হবে এবং আমাদের খেলোয়াড়রাও তাদের উপযুক্ত খেলা দেখিয়ে দেশের মান বজায় রাখবে। আমাদের খেলোয়াড়দের জোর বলের বিরুদ্ধে খেলা অভ্যাস করাটাই এখন সর্বাগ্রে প্রয়োজন। আজকালকার ক্রিকেট খেলার হারজিৎ অনেকাংশে নির্ভর করে দলের Fast বোলারদের উপর। এই অভ্যাসের প্রচেষ্টাই এখন চলছে। গত বৎসর ক্রিকেট বোর্ড ওয়েস্ট ইন্ডিজের চারটি Fast বোলার এখানে এনেছিল আমাদের খেলোয়াড়দের তাদের বিরুদ্ধে খেলার অহুশীলন ও অভ্যাস করানোর জন্য। ইংলণ্ড-দলে তাদের শ্রেষ্ঠ fast বোলার Trueman যদিও নেই, তথাপি তার বদলে Larter, Jones, Price আর Knight এই চারজন আছে যারা জোর বল দেওয়ায় সিদ্ধহস্ত। কাজেই আমাদের খেলোয়াড়রা যথেষ্ট সুযোগ পাবে এই শ্রেণীর বলের বিরুদ্ধে খেলার।

দেখা যাবে, ওয়েস্ট ইন্ডিজের চারজন বোলার আমাদের খেলোয়াড়দের এই বিষয়ে সত্য সত্যই কিছু জুশিকা দিতে পেরেছে কি না।

*

কলকাতার লীগ ফুটবলের নিষ্পত্তি হয়েছে। মোহনবাগান লীগ-চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এবং ইষ্টবেঙ্গল হয়েছে রাণাস আপ্। মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গলের শেষ খেলা পর্যন্ত হারজিৎ মূলতুবী ছিল এ বৎসরেও।

গত বৎসরও শেষ খেলার ফলাফলের ক্ষত আপেক্ষা করতে হয়েছিলো আমাদের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির ব্যাপারে। কিন্তু গত বৎসর মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গল ছাড়া আর কোনও দল লীগ বিজয়ের প্রতিদ্বন্দিতায় শেষ পর্যন্ত ছিল না, এই বৎসর আরও একটি দল অনেকদিন ধরে এই লড়াইয়ে ছিল। এরা হল বি. এন. আর. দল। এটা একটা জুববর ফুটবলের দিক দিয়ে। কেননা, কলকাতার মাঠে মহমেডান স্পোর্টিংয়ের প্রাধান্য চলে যাওয়ার পর, মোহনবাগান ও ইষ্ট

বেঙ্গলের লীগবিজয় যেন একটা একঘেয়েমি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এবারে প্রথমে বি. এন. আর. ও পরে ইষ্টবেঙ্গল মোহনবাগানের সঙ্গে ঘোর প্রতিদ্বন্দিতা করেছে চ্যাম্পিয়নশিপ কাপের লড়াইয়ে। ইষ্টবেঙ্গল অনমনীয় দৃঢ়তা দেখিয়েছে তাদের খেলার লীগের দ্বিতীয়ার্দ্ধে। এক সময়ে মোহনবাগানের থেকে ৫ পয়েন্ট পিছিয়ে পড়েও দ্বিতীয়ার্দ্ধে একটাও খেলায় না পরাজিত হয়ে তারা শুধু নাগালই ধরেনি, তিন চারটি খেলা বাকি, এই অবস্থায় ১ পয়েন্টে মোহনবাগানকে এগিয়েও গিয়েছিলো। বি. এন. আর.-ও বরাবর হুঁচকার পয়েন্টের তফাতেই এই দুটি দলের নীচেই ছিল এবং তাদের শেষ খেলায় ইষ্টবেঙ্গলের সঙ্গে জয়ী হলে রাণাস আপও হতে পারতো। উম্মাভীর সঙ্গে অপ্রত্যাশিত

ভাবে ড্র করার ইষ্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের সমান সমান পয়েন্ট হল। তারপর এখন ছুটি করে খেলা বাকি এই দুই দলের। ইষ্টবেঙ্গল আবার অপ্রত্যাশিতভাবে ড্র করলো ইষ্টার্প রেলের সঙ্গে। মোহনবাগান এক পয়েন্ট এগিয়ে গেল এরিয়ামকে পাঁচ গোলে হারিয়ে। বাকি রইলো ইষ্টবেঙ্গলের সঙ্গে বি. এন. আর.-এর খেলা আর মোহনবাগানের সঙ্গে মহমেডান স্পোর্টিংএর খেলা। একই দিনে দুই মাঠে দুটি খেলা। ইষ্টবেঙ্গল দলের সমর্থকেরা তখনও আশা রাখে মহমেডান স্পোর্টিংএর সঙ্গে মোহন-



এবারকার লীগ-চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান দল

বাগানের পরাজয় এবং বি. এন. আর.-এর সঙ্গে তাদের দলের জয়। মোহনবাগানের সমর্থকেরা আশঙ্কা করে মহমেডানের সঙ্গে পরাজয়ের এবং সমান সমানভাবে খেলার নিষ্পত্তির মনের অন্তরতম কোণে আশা পোষণ করে জয়ের এবং লীগ-বিজয়ের। প্রথমার্দ্ধে মোহনবাগান ও মহমেডান স্পোর্টিং দুই দলই একটি করে গোল দেয় কিন্তু ইষ্টবেঙ্গল এক গোলে এগিয়ে থাকে বি. এন. আর. দলকে। এই শেষ খেলার প্রথমার্দ্ধেও আশা-আশঙ্কার ঝড় ওঠে উভয় দলের সমর্থকদের মনে। দ্বিতীয়ার্দ্ধে মোহনবাগান আরও দুটি গোল দিয়ে মহমেডান দলকে ৩-১ গোলে পরাজিত করে লীগ-বিজয়ী হল পর পর দুই বৎসর এবং সর্বসম্মত এগারো বৎসর। পাঁচ পয়েন্টে

এগিয়ে থাকার সুযোগ হেলায় হারিয়ে এককালে তার সমর্থকদের নিরাশ করেছিলো যে মোহনবাগান, সেই মোহনবাগানই আবার ইষ্টবেঙ্গলের শেষ মহড়ায় আত্ম-ঘাতী পয়েন্ট হারানোর পূর্ণ সুযোগ কাজে লাগিয়ে এরিষাণ ও মহমেডান দলকে নিশ্চিতভাবে পরাজয় করে লীগবিজয়ী হয়েছে। খেলার এই গৌরবময় অনিশ্চয়তাই বোধহয় খেলার একটি প্রধান আকর্ষণ। খেলা শেষে হিসেব নিকেশ চলছে এখন ক্রীড়ামোদীদের মুখে মুখে এবং খবরের কাগজের পাতায় পাতায়। গত তের চোদ্দ বছরের হিসেব নিলে দেখা যায়, মোহনবাগান লীগবিজয়ী সন্মান পেয়েছে ১৯৫১, ১৯৫৪, ১৯৫৫ ১৯৫৬, ১৯৫৯, ১৯৬০, ১৯৬২, ১৯৬৩ সালে। মাঝের কয়েক বৎসর এই সন্মান লাভ করেছে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব ১৯৫০, ১৯৫২ ও ১৯৬১ সালে; মহমেডান স্পোর্টিং ১৯৫৭ সালে এবং ইষ্টার্ন রেল ১৯৫৮ সালে। মোহনবাগানের এগারো বৎসরের লীগ-বিজয়ের ইতিহাস নীচে দেওয়া হোলো—

গোল দিয়েছে এবং অল্প সংখ্যক গোল খেয়েছে। কাজে কাজেই অতিশয় সঙ্গতভাবেই চ্যাম্পিয়নশিপ যুদ্ধে জয়ী হয়েছে মোহনবাগান। সকলে এখন উল্লসিত হয়ে অপেক্ষা করবে এরা গত বৎসরের মত ফুটবলের 'ডবল' জিতের সম্মান লাভ করবে কিনা। আই. এফ. এ. শীল্ড ও লীগ একই বৎসরে জিতে পারলেই এই সম্মানে সম্মানিত হয়। আই. এফ. এ. শীল্ড-এর খেলা সবে স্নর হয়েছে। ভারতবর্ষের সেরা ফুটবল দল প্রায় সকলেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। এই খেলা শেষ হবে সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে। এর মধ্যে লীগের খেলার জের টেনে আরও অন্ত্যস্ত রকমের চিন্তাধারা প্রকৃত ক্রীড়ামোদীদের মনকে আগ্রত করে তুলেছে। স্থানীয় veterans football club হতে কয়েক বৎসর হল শ্রেষ্ঠ 'footballer of the year' মনোনীত করে আসছে। এ বৎসর মোহনবাগানের স্ক্রফ ফরোয়ার্ড অরুমাইনিয়াগম এই সম্মানে ভূষিত হয়েছে। অরুমাইনিয়াগম গত তিন বৎসর যাবৎ মোহনবাগানে খেলে এই অল্প সময়ের মধ্যে

	খেলেছে	জিতেছে	ড্র করেছে	হেরেছে	গোল দিয়েছে	গোল খেয়েছে	পয়েন্ট
১৯৫২	২৪	১৬	৭	১	৩১	৯	৩৯
১৯৪৩	২৪	১৬	৭	১	৫৫	৬	৩৯
১৯৪৪	২৪	১৮	৪	২	৩৯	৮	৪০
১৯৫১	২৬	২০	৪	২	৪৭	৫	৪৪
১৯৫৪	২৮	১৯	৮	১	৩৮	৭	৪৬
১৯৫৫	২৬	১৫	৮	৩	৩৯	১২	৩৮
১৯৫৬	২৬	১৯	৫	২	৫৫	৯	৪৩
১৯৫৯	২৮	২১	৪	৩	৫৪	১৫	৪৬
১৯৬০	২৮	২৫	৫	১	৬১	১০	৪৯
১৯৬২	২৮	১৬	৮	৪	৪৭	১৮	৪০
১৯৬৩	২৮	২১	৫	২	৫৯	৮	৪৭

হিসেব-নিকেশ আরও চলছে কোন দল কত গোল দিয়েছে, কোন দল কত গোল খেয়েছে। কতগুলি ছাট্‌টিক হয়েছে। কত পেনালটি থেকে গোল হয়েছে আর কত থেকে হয়নি এইসব। এ বৎসরের খেলায় এইসব হিসেব-নিকেশ থেকে দেখা যায় যে, লীগ-চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান অল্প সকল দলের অপেক্ষা অধিক সংখ্যক

এই সম্মানের অধিকারী হতে সক্ষম হয়েছে বলে সে সকলের প্রশংসাতাজন হয়েছে। বিশেষ করে বলা প্রয়োজন যে, এই সম্মান তাকেই দেওয়া হয় যে শুধু স্ক্রফ খেলোয়াড় নয়, তার সঙ্গে তার খেলার মাঠের এবং মাঠের বাইরের আচার, ব্যবহার ইত্যাদি অন্ত্যস্ত খেলোয়াড়োচিত গুণসম্পন্ন হয়।

এই নির্বাচন হয় এখানকার লীগের খেলোয়াড়দের মধ্য থেকে।

ফুটবলের কথা আরও অনেক ভাবেই আলোচিত হয়ে থাকে। বিশেষভাবে যে আলোচনা হয় সেটা হল আমাদের খেলার মান সম্বন্ধে। এটা সর্ববাদীসম্মত যে আমাদের ফুটবলের মান অর্থাৎ ভারতীয় ফুটবলের মান এখন পাশ্চাত্য ফুটবলের মানের তুলনায় অনেক নীচে। ১৯৬২ সালে জাকার্টায় অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমসে ভারত অত্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাজিত করে এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন হয়ে আমাদের আশাব্যস্ত করেছে ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। এর পূর্বে গত রোম অলিম্পিকস্-এ ভারত-হাঙ্গেরী, পেরু ও জাপানের সঙ্গে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজয় স্বীকার করেছে। স্বভাবতঃই মনের কোণে আশার উদয় হয় যে, আগতপ্রায় টোকিও অলিম্পিকস্-এ আরও উন্নত মানের খেলা দেখাতে সক্ষম হবে আমাদের জাতীয় ফুটবল দল। সেই সঙ্গে মনে হয়, ভারতীয় ফুটবল কোচ (coach) মহম্মদ রহিমের শিক্ষানবীশির চালনার কথা। তিনি গত জুলাই মাসে হায়দারাবাদে দেহরক্ষা করেছেন। রোম অলিম্পিকস্ এবং জাকার্টার এশিয়ান গেমস্-এর সাফল্য অক্লান্তকর্মী রহিম সাহেবের সুনির্দিষ্ট পরিচালনার সাক্ষ্য দেয়। এই শূন্য স্থান পূরণ করার মত কোচ ভারতে আর নেই। কাজেই ফুটবলের কর্মকর্তাদের উচিত এখন বিদেশ থেকে কোনও সুনক কোচ নিয়ে এসে তারই শিক্ষাধীনে আমাদের খেলোয়াড়দের অনুশীলনের আয়োজন করা। সুপরিচালিত শিক্ষা ও নির্দেশের অভাবে স্বর্গত রহিম সাহেবের মাধ্যমে

অর্জিত গত তিন চার বৎসরের সাফল্য ব্যর্থ না হয় তার ব্যবস্থা করা ভারতীয় ফুটবল কর্তৃপক্ষদের একটি পুণ্য কর্তব্য বলে আমি মনে করি। সিংহল ও লেবাননের সঙ্গে খেলতে হবে আমাদের 'pre-olympic round'-এ।

এই খেলার জয়ী হলে তবেই টোকিও অলিম্পিকস্-এ খেলার ছাড়পত্র পাবে আমাদের দল। সে খেলাও আগত-প্রায়। ডিসেম্বর মাসেই এই খেলা হবে। প্রথমে সিংহলের সঙ্গে দুটি, পরে লেবানন-এর সঙ্গে দুটি। লেবানন-এর খেলোয়াড়রা উন্নতপ্রণালীর খেলা আয়ত্ত করেছে, সম্প্রতি এই আমাদের ধবর। সুতরাং আর বিলম্ব না করে আমাদের বাছাই করা খেলোয়াড়দের যথাযথ অনুশীলন শুরু করার সময় হয়েছে। কিন্তু সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু ব্যবস্থার কথা এখনও জানা যায়নি। আই. এফ. এ. শীল্ড, রোভার্স কাপ ও ডুরান্ড কাপ প্রতিযোগিতা এখনও বাকী। আমাদের জাতীয় দলের নির্বাচিত খেলোয়াড়রা সকলেই এইসব প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে বিভিন্ন রাজ্যের দলের পক্ষে। যত শীঘ্র সম্ভব এই সকল খেলোয়াড়দের শিক্ষা-শিবিরে এখন থেকেই তাদের যথাযথ শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। দরকারমত নির্বাচিত খেলোয়াড়দের উপরিউক্ত সকল প্রতিযোগিতাতেই অংশ গ্রহণ করতে না দেওয়াই সমীচীন। জাতীয় মান-সম্মান তাদেরই রক্ষা করতে হবে। কাজেই বেশী খেলে আগেই তাদের শারীরিক শক্তির অপচয় না করতে দেওয়া আমাদের ফুটবল কর্তৃপক্ষদের পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করি। (১৪।৯।৬৩)।

ফোন :
৪৪-৪৩৬৯, ৬২



গ্রাহ্য :
রাইসকিংস

পশুপতি দাম এণ্ড সন্স
প্রাইভেট লিমিটেড

ভারতের সর্ববিধ চাউলের প্রথম জাতীয় প্রতিষ্ঠান

৪৩/২ ও ৩৭এ, সুব্রহ্মনাথ ন্যাশনাল রোড, কলিকাতা-১৪।
বাড়িতে চাউল পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা আছে।

গান ও স্বরলিপি

কথা : রণজিৎকুমার সেন

স্বর ও স্বরলিপি : দ্বিতীশ দাশগুপ্ত

কে তুমি মোর জন্মদিনের
দিলে গো দীপ জ্বলে !
ভুবন যে আজ আলোয় ভরা
দেখি নয়ন মেলে ।
এই পৃথিবীর মাটির 'পরে
এসেছিলেম কোন্ প্রহরে,
সেদিন বুঝি শাওন মেঘে
বাদল গেল খেলে !
কে তুমি আজ জন্মদিনের
দিলে গো দীপ জ্বলে ?

শঙ্খরবে আনলে মালা
চন্দনেতে মেখে ;
ললাট জুড়ে দিলে আমার
জয়ের টিকা একে ।
শিশুকালের সূর্য ক'খন
ভরে যে দেয় মধ্যগগন,
জাগে মনে জয়ের সাধন
আগল ভেঙে ফেলে ।
কে তুমি আজ জন্মদিনের
দিলে গো দীপ জ্বলে ।

II মা মা -া | জমা -পণা | পা -মা I জমা -পা মা | জমা -জমা | সা -া I
কে তু ০ মি ০ ০০ মো র্ জ ০ ন্ ম দি ০ ০ নে র্

ণা -সা -া | জমা -পা | জমা -মা I জমা -মা -া -া -া -া I
দি লে ০ গো ০ দী প্ জে লে ০ ০ ০ ০ ০

মা -পা -া | পা -পা | পা -া I পা -সা -া | গ'সা -র'সা | গা -দা I
ত্ব ব ন্ যে ০ আ জ্ আ লো য্ ভ ০ ০০ রা ০

দণা -দা -পা | পা -মা | মা -জমা I মা -পা -া | -া -া | -া -া II
দে ০ থি ০ ন ০ য় ন্ মে লে ০ ০ ০ ০ ০

II মা -পা পা | গা -দা | দা -পা I গা গা -সা | রা -গ'সা | সা -সা I
এ ই পৃ থি ০ বী র্ মা টি র্ প ০০ রে ০

সা রা -া | রা -া | রা -রা I মা -জমা মা | রা -রা | সা -সা I
এ সে ০ ছি ০ লে ন্ কো ন্ প্র হ ০ রে ০

গা -গা -সাঁ | সাঁ -াঁ | সাঁ -াঁ I গা সাঁ -রাঁ | গসাঁ -রসাঁ | গা -দা I
সে দি ন্ বু ০ ঝি ০ শা ও ন্ মে ০ ০ ০ বে ০

দগা গা -াঁ | পা -মা | মা -জা I মা পা -াঁ | -াঁ -াঁ | -াঁ -াঁ I II
বা দ ল্ গে ০ ল ০ খে লে ০ ০ ০ ০ ০

II জা -াঁ মা | জাঝা -জা | সা -াঁ I গা -সা সা | গ্দা -গা | পা -াঁ I
শ ং খ র ০ ০ বে ০ আ ন্ লে মা ০ ০ লা ০

গা -সা সা | জা -ঝা | জা -মা I জা মা -াঁ | -াঁ -াঁ | -াঁ -াঁ I
চ ন্ দ নে ০ তে ০ মে খে ০ ০ ০ ০ ০

মা মা -পা | পা -াঁ | পা -াঁ I গা দা -গা | পা -াঁ | মা -াঁ I
ল লা ট্ জু ০ ড়ে ০ দি লে ০ আ ০ মা র্

জা -মা -াঁ | জা -ঝা | ঝা -জা I ঝা -সা -সা | -াঁ -াঁ | -াঁ -াঁ I
জ বে র্ টি ০ কা ০ এ কে ০ ০ ০ ০ ০

মা -পা -াঁ | গা -দা | দা -গা I গা -াঁ সাঁ | রাঁ -গসাঁ | সাঁ -াঁ I
শি শু ০ কা ০ লে র্ স্ব র্ য ক ০ ০ খ ন্

সাঁ -রাঁ -াঁ | রাঁ -াঁ | রাঁ -াঁ I মাঁ -জাঁ মাঁ | রাঁ -রাঁ | সাঁ -াঁ I
ভ রে ০ যে ০ দে য্ ম ০ ধ্য গ ০ গ ন্

গা গা -সাঁ | সাঁ -াঁ | সাঁ -াঁ I গা -সাঁ -াঁ | গসাঁ -রসাঁ | গা -দা I
জা গে ০ ম ০ নে ০ জ য়ে র্ সা ০ ০ ০ খ ন্

দগা -দা -গা | পা -মা | মা -জা I মা -পা -াঁ | -াঁ -াঁ | -াঁ | -াঁ I II#
আ গ ল্ তে ০ ঙে ০ ফে লে ০ ০ ০ ০ ০

* দ্বিতীয়বার যুখে ফিরে আসবে 'কে তুমি মোর' স্থলে 'কে তুমি আছ' গাইতে হবে।

সম্মাদকাব্য

আদর্শবাদ বনাম ব্রহ্মবাদ :

বিশ্বস্তির আদিকাল থেকে মানুষ তার সুখ শান্তি স্বস্তি বিধানের জন্য নানা চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। আদিম অরণ্যচারী মানুষ প্রাকৃতিক উপজীব হইতে আত্ম-রক্ষার স্বতাবপ্রেরণার পথেই বুদ্ধির বিকাশ সম্ভবপর করিয়া তুলিয়াছিল। এই পথেই সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি উপনীত হইয়াছে। সভ্যতার উদ্ভব হইয়াছে। আজকের বিভিন্ন বাদ, আদর্শ, মত, পথ, পরিকল্পনা সবই এই উন্নয়ন প্রচেষ্টারই ফলশ্রুতি। এই স্রব্ববাদের গোড়ার কথাটি প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি। প্রত্যেকটি মানুষের না হোক, অন্ততঃ অধিক সংখ্যক মানুষের অবাধ আত্মবিকাশের অর্থাৎ খাওয়া-পরা স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থার পরীক্ষা-নিরীক্ষা, রাষ্ট্র, সমাজ, অর্থনীতি, শিক্ষার হেরফেরের মধ্যে দৃষ্ট হয়। যুগে-যুগে সর্বত্র সমাজমানুষের এই মহতী প্রচেষ্টা-সমূহকে আদর্শবাদের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। আদর্শবাদ মূলতঃ কল্পনাভিত্তিক। মানুষের অসংস্কৃত মন-বুদ্ধির পরিকল্পনামূলক উপায় দ্বারা কখনও সত্য উপেক্ষা লভ্য হইতে পারে না। এ ক্ষেত্রে অন্ধকারে হাতড়ানোর ব্যর্থতা ও ক্রান্তি বার বার উপাস্তুর বা পরিকল্পনার পরিবর্তন খুঁজিতে বাধ্য করে। ইহাই দ্বন্দ্বিক (dialectio) পন্থা।

এই সব মতবাদীরা বিশ্বাস করেন যে, সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক বা অর্থনৈতিক পরিবর্তন করিলেই মানুষের প্রকৃতিরও পরিবর্তন আসিবে। অর্থাৎ সমাজের ভেদ-বৈষম্য দূর করিলে, রাজনৈতিক অধিকার সবাইকে দিলে অথবা অর্থ-সাম্য আনিতে পারিলেই সব মানুষ প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ হইবে। এক কথায় মানুষের প্রকৃতির পরিবর্তন হইবে। মানুষ অহং-অভিমান-আসক্তিমুক্ত হইবে। ক্ষমতাপর লোভ থাকিবে না। আপন কোলে কোল মাখাইবে না। প্রত্যেকে পরের তরে জীবন ও কষ্ট উৎসর্গ করিবে। এই ধরণীতে স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইবে। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, সাম্য-বাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ঋষি তাঁদের নেতৃস্থানীয়ের মনের স্বপ্ন মোটামুটি ইহাই।

ভারতবর্ষে কিন্তু এইরূপ মত-পথে বিশ্বাস করে না। ভারতের জীবন ও জগৎ দর্শনের অভিজ্ঞতা অন্তরূপ। তার নীতি ও পদ্ধতিও তাই ভিন্ন। সর্বপ্রায়ে মানুষের অন্তঃপ্রকৃতির রূপান্তর না ঘটাইতে পারিলে বাহ

জীবনের স্তূর্ধু সঙ্গতি সম্ভবপর নহে। তার মন প্রাণ অহঙ্কার আসক্তি কামনা বাসনা ও প্রবৃত্তির পরিবর্তন না হইলে বাহ্য জীবন ও পরিবেশেরও পরিবর্তন আশা করা যায় না। ইহা করিতে হইলে ভূগার সঙ্গে, বৃহত্তর সঙ্গে ত্রুণের সঙ্গে যুক্তির প্রয়োজন। ইহাই ব্রহ্মযুক্তি। গীতার সেই 'তস্মাৎ যোগী ভবাজ্জুন' হওয়ার প্রয়োজন। এখানে বিশ্বাতীত চৈতন্যের অমোঘ সর্বনিয়ন্তৃ শক্তির স্বীকৃতি আসিয়া পড়ে। আদর্শবাদীদের সাধনাষ ও অভিজ্ঞতায় এখনও এই সত্যটি ধরা পড়ে নাই। এই নিরীশ্বর সভ্যতাকে ভারতবর্ষে আসুর সভ্যতা নামে অভিহিত করিয়াছে। একান্ত বস্তুগত, নিছক জড়ীয় দৃষ্টিতে এই বিচিত্র বহুমণ্ডল জগতে আত্মীয়তা বোধের সম্ভাবনা কোথায়? মনের চিন্তা, হৃদয়ের ভালবাসা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যের রূপসর সন্ধান সে ক্ষেত্রে মানুষকে আত্মকেন্দ্রিক করিয়া তুলিতে বাধ্য। সর্বব্যাপী বিশ্বচৈতন্যের সঙ্গে এক্যবোধই বিচিত্রকে একের বোধে প্রবোধিত করিয়া তুলিতে পারে। আত্মকেন্দ্রিক অহংবাদী ব্যক্তি জীব চৈতন্যকে উজ্জীবিত উন্মোচিত করিয়া ভৌম চৈতন্যে সমুদ্রীত ও সংযুক্ত করিয়া তুলিবার লক্ষ্যেই ভারতের সকল রাষ্ট্র, অর্থ, সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তিত। ভারত বস্তুতঃ ব্রহ্মবাদী। ভারত-সভ্যতার ইহাই বৈশিষ্ট্য। সুদীর্ঘ রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার মধ্যেও ভারত যে নিজেই হারায় নাই তার একমাত্র হেতু সে ভাবনার জগতে কখনও এই মূল স্রব্ব হইতে সরিয়া যায় নাই।

স্বাধীনতার পরে ভারতরাষ্ট্রের চলার পথে গতি আছে, আছে পরিকল্পনা, কিন্তু কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নাই। আজকের পারিপার্শ্বিক আদর্শবাদের চমৎকারিত্ব তাকে মোহাচ্ছন্ন করিয়াছে। ভারতরাষ্ট্রের ভাগ্যান্বিত্যারা ভারতবর্ষের এই মর্শ্ব চাওয়াকে আমল না দিলেও, ভারতীয় প্রজা কিম্বা বার বার বহুকাল সেবিত এই ব্রহ্মতান্ত্রিকতারই দিগদর্শন দিয়া আসিতেছেন। সাম্প্রতিক কালের বিজয়কৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, রবীন্দ্র প্রমুখের কল্পনাপ্রায়ে এই অমিশ্র ভারতবর্ষই উদ্ভাসিত। ভারতবর্ষের পরিচয় পাঠ গ্রহণ করিতে হইলে আমাদের এই সব ঋষিমনীষীই আশ্রয়ণীয় হইবে।

বিগত শতকে ভারতের নব জাগরণের সঙ্গে ভারতের আত্মসমীকার যে সূচনা, বর্তমান বিংশ শতকের মধ্যাঙ্গে তারই একটা পরিণত রূপ আমরা লক্ষ্য করি সঙ্ঘাতক শ্রীমতিলালের মধ্যে। আজ সাড়ে চারি বৎসর হইল তিনি বিদেহী হইয়াছেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের গতির যে দাপট তা আজ আর নাই। ইতিমধ্যেই তাঁর বাহ্য ব্যক্তিরূপটি মানুষের মন হইতে মুছিয়া গিয়া ক্রমশঃ ভাবরূপটি পরিস্ফুট হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ভারতের

অমিশ্র মনীষার আলোকে তাঁর সত্যকার স্বরূপটি যে ধরা পড়িয়াছে তা বর্তমান সংখ্যা প্রবর্তকে প্রকাশিত সঙ্ঘগুরু সম্পর্কিত আবেদন পত্রেরই বুঝা যায়। সর্বশ্রেণীর, সকল রকম মত-পথ, বিভিন্ন মনীষা ও সম্প্রদায়ের জ্ঞানী গুণী মহাজনেরা এই ভাববিগ্রহের রূপাশ্রয়ী মূর্তি ও মন্দির নির্মাণে শুভেচ্ছা পোষণ করিয়াছেন।

শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন, হিন্দু ধর্মই সনাতন ধর্ম — ভারতজাতীয়তা। বহু সম্প্রদায়, বিভিন্ন মত-পথ ও বাদকটকিত হিন্দু ধর্মের সার্বভৌম রূপটি হঠাৎ চোখে পড়ে না। জীব, জগৎ ও ব্রহ্ম সম্পর্কে ভারতে বহু দার্শনিক বাদ ও সাধনধারার উদ্ভব হইয়াছে। এই সকল মত ও পথের একটি সমাহৃত স্বত্র আছে যাহারই আভাস সঙ্ঘগুরুর সাধনা ও সিদ্ধির মধ্যে আমরা পাইতে পারি। সকল অতীত সাধনার উত্তরাধিকারী স্বেচ্ছাই ইহা প্রাপ্ত। জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে সঙ্ঘগুরু সম্পর্কে সকল স্বীকৃতির মূলে ইহাই বর্তমান বলিয়া আমরা প্রত্যয় করি। আগামী কালে সঙ্ঘগুরুর ব্যক্তি-স্মৃতি যতই অপসৃত হইবে ততই তাঁর মাহুঘী দেহাশ্রয়ে যে ভারত-ধর্মটি প্রকট হইতে চাহিয়াছিল তাহা স্পষ্ট লোকগ্রাহ্য হইবে।

আবেদনে বলা হইয়াছে “সঙ্ঘগুরু ছিলেন যুগধর পুরুষ, উদীয়মান যুগের ভাবধারার ভগীরথ এবং আলোকের দিশারী।” ভারতের আত্মস্থ হইতে হইলে ভারতাত্মার যুগ-প্রকাশের এই সাম্প্রতিক উত্তরাধিকারী সঙ্ঘগুরুর শরণাপন্ন অনাগত-যুগের পক্ষে অবশ্যই অপরিহার্য্য হইবে। ভারতের স্বধর্ম ও স্বাধীনতা যুগনন্দ হইয়া না চলিলে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা আসা সম্ভবপর হইবে না। সঙ্ঘগুরু বিশ্বাস করিতেন যে, এই অপূর্ণ অস্বহীন স্বাধীনতার দ্বারা কখনই দেশের শান্তি বা শৃঙ্খলা রক্ষিত হইতে পারে না এবং শেষ পর্য্যন্ত এই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা স্বার্থপর, আদর্শহীন অর্থমাত্রনিষ্ঠ বিজাতীয় রূপ পরিগ্রহ না করিয়া পারিবে না। সঙ্ঘগুরু আজীবন তাই সনাতন ভারত সংস্কৃতির মৌল ভিত্তির উপর যুগসঙ্গত যে ভারতজাতি তাহারই অভ্যুত্থানের জন্ত শুধু সাধনা করিয়া যান নাই, সেইরূপ জাতীয়তার জন্মমূর্তি হিসাবে প্রবর্তক সঙ্ঘকে গঠন করিতে চাহিয়া-
ছিলেন। তিনি অগণিত শিষ্যমণ্ডলী করার দিকে দৃষ্টি দেন নাই, কোন সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন নাই, আত্মপ্রতিষ্ঠা চাহেন নাই, পরন্তু নিজেকে ক্ষুদ্র সঙ্ঘমণ্ডলীর মধ্যে বিগলিত করিয়া দিয়া দিব্য ভারতজাতীয়তার কাম্যবৃহৎরূপ একটি অমিশ্র শুদ্ধ প্রতীকের অভ্যুত্থানকল্পে

সমগ্র জীবনব্যাপী প্রয়াস করিয়া গিয়াছেন। এই সঙ্ঘমণ্ডির বিদ্যুৎগৃহ হইতে নিখিল জাতির মধ্যে বিস্তৃত প্রাণসঞ্চার তিনি চাহিয়াছিলেন। কতদূর সফলকাম তিনি হইয়াছেন তাহা বর্তমানে বিচার্য্য নহে। সঙ্ঘগুরু ছিলেন অগ্রদূত, দিব্য জাতীয়তার বাণীমূর্তি। প্রচলিত সংস্কারাচ্ছন্ন সমসাময়িক কাল তাঁকে ঠিক ঠিক ধরিতে পারিয়াছে, এ কথা বলা চলে না। কোন যুগেই তা দৃষ্ট হয় না। এমনকি যে সঙ্ঘমণ্ডলীকে তিনি সর্ব অতীত সাধন-সংস্কারমুক্ত করিয়া পরিচ্ছন্ন-চিন্তা করিতে চাহিয়াছিলেন তাহার সাফল্যও ধর্তব্য নহে। যে ঘটনা ভবিষ্যতে ঘটবে তার আভাসমাত্রকে হৃদয়ঙ্গম করিয়া জীবনে অনুবাদ করার অবিকারই বা ক'জনের থাকে! তথাপি তিনি জাতি-নির্মাণের যে বিজ্ঞান, যে বাস্তব পরীক্ষা নিরীক্ষার আদর্শ সঙ্ঘ-সৃষ্টিকল্পে করিয়া গিয়াছেন তাহাই আগামী কালে দিকদিশারী হইয়া থাকিবে। সঙ্ঘগুরুর যে ভারত-জাতি-স্বপ্ন তাহাই ভারতের সর্বজনীন স্ব-ধর্ম। ইহা আদর্শ-কল্পনাবাদীর জন্ত নহে— পরন্তু জীবনব্রতীর ধর্ম—শাশ্বত সনাতন ধর্ম। ইহাই ভারত-ধর্ম নামে ভারতের ত্রিপ্রস্থান, ভারতের ঐতিহ্যবাহী প্রসিদ্ধ হইয়া আজও নিগূঢ়ে অবস্থিত। ব্রহ্মবাদী ভারতের এই গূঢ় ভাবটিই পরিপূর্ণ দিব্য জাতীয়তারূপে যুগে-যুগে প্রকট হইতে চাহিয়াছে। সঙ্ঘগুরু সেই এক ও অখণ্ড শৃঙ্খল-ক্রমেরই যুগপ্রকাশ। নব ভারত-রচনার যুগমাহুঘ ছিলেন তিনি। স্মরণ্য আবেদনে সত্য কথাটিই বলা হইয়াছে যে, “এমন ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ, গভীর তাৎপর্য্যগর্ভ, জাতীয় সাধনায় উৎসর্গীকৃত এই মহামানবের জীবন-স্মৃতি সংরক্ষণের অনস্বীকার্য্য। ভারতবর্ষকে যদি ভারতবর্ষ হইয়াই বিশ্বের দরবারে স্বকীয় মহিমায মণ্ডিত হইয়া গৌরবের আসন গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে সঙ্ঘগুরুর গ্রাম মহাপুরুষের জীবন দৃষ্টান্তের অনুধ্যান, অনুশীলন ও অনুসরণ অপরিহার্য্য। আগামী কালের যাজ্ঞাপথে এইরূপ আদর্শোজ্জ্বল জীবনস্মৃতিই জাতির পাথেয়। সঙ্ঘগুরুর স্বরূপ সত্তার আরতিতেই এই ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনার মর্ম আবার উদ্ঘাটিত হইবে।”

আজকের বিভিন্ন আদর্শবাদের মানস অরাজকতার মধ্যে এই সত্যটি ঠিক ঠিক অবধারণ করাটা সাধারণে সম্ভব না হইলেও, ব্রহ্মবাদী ভারতের মর্মী যাত্রা তাঁরা নিশ্চয়ই অনতিদূর আগামীকালে ‘আবেদন’-এর এই বক্তব্য বুঝিবেন।

সহজ জার্মান

Easy German Course for Arts & Science Students : By Dr. Hara Gopal Biswas.
World Press, 37 College St., Calcutta-12

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্মান ভাষার অধ্যাপক ও বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রধান রাসায়নিক ডঃ বিদ্যাসের আলোচ্য পুস্তকখানি প্রথম জার্মানভাষা শিক্ষার্থীদের স্বর্ণমুদ্রা দান করিয়াছে। জ্ঞানবিজ্ঞানের জ্ঞান জার্মান ভাষা। ভারতে বর্তমানে বিজ্ঞান ও কৃষিগরী শিক্ষা প্রচার ও প্রসার হইতেছে। এই সময় জার্মানভাষা শিক্ষার ব্যাপক প্রসার হওয়া বাঞ্ছনীয়। দেশদরদী ডঃ বিদ্যাস জিজ্ঞাসু শিক্ষার্থীদের অতি সহজ পন্থায় জার্মানভাষা শিক্ষা নিজেই দিবা থাকেন। এদেশের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা-উপযোগী করিয়া ডঃ বিদ্যাস এই 'সহজ জার্মান শিক্ষা' 'Easy German Course' পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন। জাতীয় অধ্যাপক ডঃ মহোদয়নাথ বসু এক পত্রে (৪.২.৩০) এই পুস্তকখানির ক্ষমতা ডঃ বিদ্যাসকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছেন। পত্রখানি এখানে উদ্ধৃত হইল :

Dr. H. Biswas has recently revised and enlarged his Book, and the result the new 'Easy German Course' has exceeded even my highest expectation. In a graduated series of reading lessons Dr. Biswas has sought to make the learner familiar with the German language. Scientific lessons abound here as well as topics of general interest. Grammar and Composition have also not been neglected. I venture to predict a great popularity of the book among the serious students who wish to learn German as an aid to their higher studies. This should be used everywhere the language is taught together with the linguaphone records which are now easily available. Thus it would supply all which a learner would need to make his knowledge accurate and thorough. I congratulate Dr. Biswas on his untiring efforts for a noble cause and its outcome.

বন্দনা—অধ্যাপক ব্যারিস্টার শিশিরকুমার দাস চিত। প্রকাশক : শ্রীহৃদীকুমার দাস, পি. ২৫২।২, পূর্ণ দাস রোড, কলিকাতা—২২। মূল্য—তিন টাকা।

এইটি কয়েকটি শৈল্পিকচিত্রের সমষ্টি। এ যুগে যখন কবিতা, এমন কি শৈল্পিকচিত্রও মননপ্রধান হয়ে উঠেছে তখন সহজ অমুস্তবের সবল প্রকাশ দেখলে আবার একটা নতুন স্বাদ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের শৈল্পিকচিত্রগুলি, বলা বাহুল্য, আবেগপ্রধান এবং সেই হিসেবেই তাদের সাজ-সজ্জায় তেমন জাঁক লক্ষিত হয় না। হয়তো কোথাও কোথাও তাতে ওদোদোই দেখা যাবে। ছন্দের কড়া বিচারে বিচারপীল

ছান্দসিকের নিকট কোন-কোন রচনার গঠনকল্পও অমুস্তব হতে পারে। কিন্তু রসগ্রাহীদের পক্ষে ইহারই মধ্যে রসনীরতা উপলব্ধ হবে বলে বিশ্বাস। তা ছাড়া, এই গ্রন্থে এমন কতকগুলি কবিতা আছে যা পাঠকসমাজের একটা অংশকে অন্ততঃ ভাববৃদ্ধ দেবে। গ্রন্থের ১৮টি শৈল্পিকচিত্রের মধ্যে ১৩টির ছবি ও স্বরলিপি দেওয়া আছে। গ্রন্থদপট ও বাধাই চমৎকার—উপহার দিবার মত।

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

(১) মহাকাশ ও নক্ষত্র জগৎ (২) ওপন বোট ও অন্যান্য গল্প—মুদ্রক ও প্রকাশক : ইউনাইটেড ষ্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিস, কোলকাতা ইণ্ডিয়া প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা ১৩ থেকে মুদ্রিত।

মানুষ মহাকাশে প্রথম পরীক্ষামূলক অভিযান শুরু করে ১৯৫৭-৫৮ সনে। সেই সময় আন্তর্জাতিক ভূ-পার্থক্য বিজ্ঞান বৎসরের কর্মসূচীর অংশ হিসাবে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে নিক্ষেপ করা হয়। সেই প্রথম প্রচেষ্টার পর দীর্ঘ কয়েক বৎসর অভিযাহিত হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে মহাকাশের অনেক রহস্য বৈজ্ঞানিকদের কাছে ধরা দিয়েছে। সেই সব প্রত্যয় বহুস্ত সাধারণ লোকের উপযোগী করে সবলভাবে প্রকাশ করার চেষ্টা হয়েছে এই বইটিতে। নানা চিত্র দিয়ে বিষয়টিকে আরো সরল করা হয়েছে। মহাকাশ জয়ের বিশ্ময়কর স্রবযাত্রার একটা ধারাবাহিক ইতিহাসও এই গ্রন্থে খুঁজে পাওয়া যাবে। এই ধরণের পুস্তক সাধারণ লোকের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

পীতেন জেন-এর সাহিত্যজীবন যাত্রা কয়েক বৎসর। জেন মাত্র আটশ বৎসর পর্যন্ত বেঁচেছিলেন। এই অল্প সময়ের সাহিত্যজীবনে তিনি আমেরিকার সাহিত্য-ইতিহাসে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করেছেন। তাঁর লিপিকুশলতা ও আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্যে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম শ্রেণীর কথা-সাহিত্যিকদের মধ্যে নিজেকে স্বার্থকল্পে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। মাত্র বাইশ বছর বয়সেই তিনি লেখনা গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর প্রথম লেখা, যেটি : পথের মেরে' নামক গল্প বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে। লেখার বিষয়বস্তু বাস্তব ঘটনা থেকেই নেওয়া। নিজের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতাই তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। তাঁর ধারণা ছিল যে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকলে কোন ভাল সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে না। এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য জেন পশ্চিম প্রেরারী অঞ্চলে ভ্রমণ করেছেন। এই পর্যটনের অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি লিখেছেন "দি ব্লু হোটেল" ও "দি ব্রাইড কামস টু ইথোলো ক্রাই"।

জেন বার বার বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জীবনকে বিচার ও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। স্বৈরাচার ও অপ্রয়োজনীয় নিজেদের জীবনকে বিপন্ন করতেও দিবা বোধ করেন নি। মেক্সিকোর দহাবের দলে যোগ দিয়ে, আবার কিউবার বা গ্রীক কামার মৌল্যব মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। এতে তাঁর প্রতিভার অপচয়ও হয়েছে।

জেন রচিত প্রতিটি উল্লেখযোগ্য ছোট গল্প একটিমাত্র গেষ স্বাক্ষর ঘটনাবলি ভিত্তিতে ও বিপরীতমুখী ঘটনাপ্রবাহে সার্থকল্পে প্রতিষ্ঠিত।

এই আমেরিকান রিপোর্টার প্রোড্রুগজে পীতেন জেনের তিনটি কথা জ্ঞাপ্য হয়েছে—দি ব্লু হোটেল, দি ব্রাইড কামস টু ইথোলো ক্রাই, দি ওপন পেট।

শ্রীহৃদেব চক্রবর্তী

সাময়িক

আর্য্য শাস্ত্র :

ভারতবর্ষের মর্ম-বৈশিষ্ট্য এই যে, যুগে যুগে মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া ভাবতকে স্বাধীন প্রতিষ্ঠা করার ও তার মূল স্বরটিকে স্বাধীন বৈশিষ্ট্যে ফিরাইয়া আনার দাবি পালন করেন। বর্তমান যুগে শ্রীশ্রীদী তারাম ওকারনাথজী এম.নি একজন মহাপুরুষ যিনি নিখিলভাবত ঘুরিয়া আপন স্বকঠোর তপস্কায়িতে ভারতবর্ষ বর্তমান কলুষিত আবহাওয়াকে শুদ্ধ করার ক্ষমতা ব্রতী হইয়াছেন। তাঁরই অনুপ্রেরণায় গত বৎসরের রথ-যাত্রার দিন হইতে ৩০ নং বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে আর্য্যশাস্ত্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। পত্রিকাখানির উদ্দেশ্য লুপ্তপ্রায় আর্য্য শাস্ত্রের পুনরুদ্ধার এবং ভারতীয় শাস্ত্রদলের সহজবোধ্য ভাষায় সর্বজনগ্রাহ্য করিয়া প্রকাশ। আমরা এই মহতী প্রচেষ্টার সাফল্য ও ভারত-দেবীদের সহযোগিতা কামনা করি।

মহাজাতি সদনের চতুর্বিংশ প্রতিষ্ঠা দিবস :

গত ১২শে আগষ্ট মহাজাতি সদনের চতুর্বিংশতিতম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। সভাপতি শ্রীশৈলকুমাৰ মুখোপাধ্যায় বলেন, সদন হইল নেতাজীর আদর্শ, কবিকঙ্কর আশা ও বিধানচন্দ্র রায়ের প্রচেষ্টার বাস্তব রূপ। শ্রী কে. এন. দাশগুপ্ত সদনের ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ণনা করেন। তিনি এই আশা প্রকাশ করেন যে, সদনের অছিন্ন নেতাজী হৃদযচন্দ্র বহু যে আশ্রয়ের পবিত্রজনা করিয়াছিলেন তাহা রক্ষা করিতে যত্নবান হইবেন।

বীরবলের ৯৫-তম জন্ম-জয়ন্তী :

গত ১০ই আগষ্ট ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন পরিবেশের মধ্যে বর্গত প্রমথ চৌধুরী (বীরবল) মহাশয়ের ৯৫-তম জন্ম জয়ন্তী উবসব জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ বহুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। বহু পণ্যমাধ্যম যুক্তি-এই সভার উপস্থিত ছিলেন। সভায় বিভিন্ন বক্তা বাংলা সাহিত্যের এই ত্রিকালের উদ্দেশ্যে তাঁদের প্রকা জ্ঞাপন করেন। ডঃ হুমিতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের উপর

প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সুবুজ পত্রের' প্রভাবের কথা উল্লেখ করেন। সভাপতি অধ্যাপক বহুও সুবুজ পত্রের অবদানের কথা উল্লেখ করেন। শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের সমুদয় রচনাবলীর প্রকাশের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। অন্তান্ত বক্তাদের মধ্যে ছিলেন ডঃ কালিদাস নাগ ও ডঃ রত্নীন বায়। সঙ্গীত ও আবৃত্তিতে অংশ গ্রহণ শ্রীশ্রুত বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ গোবিন্দলাল মুখোপাধ্যায়, বনানী চৌধুরী প্রভৃতি। শ্রীতারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নীরব প্রসঙ্গ এই উৎসব সাক্ষ্যের অন্ততম হেতু।

শিক্ষাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ :

গত ১২ই আগষ্ট সোমবার ছিল শিক্ষাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিরানব্বইতম জন্মতিথি। এই উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও অবনীন্দ্র-পরিষদ যুগ্মভাবে রণীন্দ্রভাবতী হলে তিনদিন ব্যাপী সম্মেলনের আয়োজন করে। সভায় বিভিন্ন বক্তা, লেখক ও শিল্পী হিসাবে আচার্য্যের প্রকৃত মূল্য নিরূপণের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, আচার্য্য ছিলেন অতীত ধারা ও নব যুগের মধ্যে যোগসূত্র। তিনি অতীতচরী ছিলেন না। তিনি চাহিয়াছিলেন অতীত ঐতিহ্যকে স্বীকার করিয়া নতুন কিছু সৃষ্টি করিতে। অধ্যাপক অমরেন্দ্র বহু মহাশয় অবনীন্দ্রনাথের লেখক সত্ত্বার আলোচনা করেন ও তাঁর কাব্যধর্মী গল্পের ভূমণী প্রশংসা করেন। আরও কয়েকজন বক্তা অবনীন্দ্র-প্রতিভার বিভিন্ন দিক্‌দর্শন তাঁদের বক্তৃতায় দেন। রবীন্দ্র-পরিষদ এই উপলক্ষ্যে চিত্রাঙ্গী প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন।

প্রবর্তক-সুহৃদ শ্রীশুশীল প্রসাদ :

বহুকাল পূর্বের কথা। প্রবর্তক সজ্জক প্রবর্তক দেবী-সজ্জের প্রতিষ্ঠা করেন এবং শ্রীশুশীলপ্রসাদ সর্বাধিকারী বার-এট লং সম্পাদক পদে বৃত্ত করেন। দেবী-সজ্জ অনেক কাল পূর্বেই লুপ্ত হইয়াছে কিন্তু শুশীলপ্রসাদ আজও প্রবর্তকের দেবী হইতে বিরত হন নাই। বিশেষ প্রবর্তক পত্রিকাখানির তিনি চির সুহৃদ, লেখক ও পৃষ্ঠপোষক। এখনও তাঁর লেখনীশক্তি ও স্মৃতির প্রখরতা ব্লাস এবটুও হয় নাই। সে-কালের কথা শুনাইবার মত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক শুশীলপ্রসাদ হাঁড়া আর কে আছেন? পতিপরায়ণ নারীর কথা ভাবতবাসীর অধনা নহে, কিন্তু শুশীলপ্রসাদের মত এমন পত্নীনিষ্ঠ পুরুষের কথা কদাচিৎই শোনা যায়।

ভারত শিল্প নিকেতন

আধুনিক ; সম্পূর্ণ ; নির্ভরযোগ্য
বুক বাইন্ডিং কারখানা।

পুস্তক, পত্রিকা ও ছাপার বাবতীয়
বাইন্ডিং কাজ সজ্জ ও স্থলভে সম্পন্ন হয়।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৬৬ নং সূর্য্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

ডি.রতন ঙ্গ কোং

ফটোগ্রাফার্স

ফাটা

২২১, কণওয়ালিস ট্রীট, কলিকাতা

ফোন: ৩৪- ৩৭১১

বিপরীত হইয়া হুশীলপ্রসাদ তাঁর সাম্প্রতিক প্রকাশিত 'সতীরাণী' গ্রন্থে দাম্পত্য জীবনের যে উন্নত উচ্চল চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা বাংলা সাহিত্যে চির সমাদৃত হইয়া থাকিবে। বর্তমান আশ্বিনে হুশীলপ্রসাদ ৮৭ বর্ষে পদার্পণ করিলেন। এই স্বর্ণনিষ্ঠ প্রবর্তক-সঙ্কলনের আমরা নিরাসয় শতায়ুঃ প্রার্থনা করি।

সতীরাণীর ৭৪তম জন্মোৎসব :

পুণ্যলোক শ্রীহুশীলপ্রসাদ সর্বাধিকারী ব্রহ্মোণী সহস্রাব্দী বর্ণিত সতীরাণীর ৭৪তম জন্মতিথি গত ১২শে শ্রাবণ তারিখ বালিগঞ্জ সানি পার্কস্থ বাসভবনে অনাড়ম্বর যৌন স্মরণ-মননের মধ্য দিয়া পারিবারিকভাবে প্রতিপালিত হয়। হুশীলপ্রসাদ দেবীর আসনে বসাইয়া সতীরাণীর চিত্রপট পূর্ণমাণ্ডে ভূষিত করেন ও বেদনাকুল হারারতির ঘাণা তাঁকে জীবন্ত করিয়া তুলেন। এবারকাব উৎসবের সার্বক বৈশিষ্ট্য ছিল সম্মার শ্রীমৎ বালক ব্রহ্মচারীর আগমন। সতীরাণীর সুসজ্জিত টেবিলের সামনে শ্রীশ্রীকুর বানিকটা ধ্যান করেন ও পরে হললিত কণ্ঠে শুভবাণী উচ্চারণ করিয়া সকলকে আশীর্বাদ করেন। সনিষ্ঠ পুণ্য আবহাওয়ার তার প্রসন্ন চিত্তের পরিহৃতির কথাও শ্রীশ্রীকুর বাস্তব করেন।

কিশোরী-কবি মিনতি নাথ :

গত ২৫-এ জ্যৈষ্ঠ অপরাহ্নে কুমার সিংহ ধলে বর্গতা কিশোরী-কবি মিনতি নাথের ২২তম জন্মতিথি পালিত হয়। সম্মার পৌরোহিত্য করেন শ্রমব্রতী বিজয়সিং নাথার ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন কবি শ্রীনরেন্দ্র দেব। সম্মার বহু সাহিত্যিক, কবি ও সঙ্গীতজ্ঞের সমাগম হয়। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কেন্দ্রীয় শিক্ষাব্রতী হুমায়ুন কবীর প্রমুখ

গুডেজ্জা বাণী পাঠন। সম্মার মিনতির স্বরচিত কবিতা ও গান আবৃত্তি ও গীত হয়। কৈশোরের সীমা অতিক্রম করিতে না করিতেই মিনতির জীবনলীলা সাজ হয়। অখ্যাত সাধারণ ঘরের মেয়ে ছিল সে, কিন্তু স্বাভাবিক মাধুর্য ও অসাধারণ প্রতিভার ঘেঁহাণ মিনতি রাখিয়া গিয়াছে তাহাতে মনে হয় সত্যি তার অকাল মৃত্যু বাংলার কাব্য-গীত ক্ষেত্রে একটি হুণ্টনা।

উগাণ্ডার স্বাধীনতা উপলক্ষ্যে ভারতীয়ের দান :

সম্প্রতি উগাণ্ডাহিত ভারতীয় শিল্পপতি বর্গত মূলজিভাই পি মদভাজির পরিবারের সদস্তগণ উগাণ্ডার স্বাধীনতা উপলক্ষে ২০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের কয়েকটি অট্টালিকা দান করিয়াছেন। তাঁহারা কাম্পালা হইতে ঘোষণা করিয়াছেন যে, মদভাজি ট্রাষ্ট কাউন্সিলন-বিস্তিঃ বৈজ্ঞানিক গবেষণা উৎসাহিত করার জন্য ব্যবহৃত হইবে এবং এই দান যেন নতুন স্বাধীন "রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁহাদের আন্তরিক বিশ্বাসের প্রতীক" হিসাবে গণ্য হয়।

বর্ধমানের বিজ্ঞান সংস্থা :

বিজ্ঞান মন্দিরসমূহের উদ্ভোগে বর্ধমান জেলায় বাহাট বিজ্ঞান সংস্থা স্থাপিত হইয়াছে। দেশের বিভিন্ন জাতীয় বৈজ্ঞানিক প্রয়োগশালায় লব্ধ জ্ঞান গ্রামীণ নরনারীর কাছে সহজবোধ্যভাবে এবং আঞ্চলিক ভাষায় পরিবেশন করাই ইহার মূল উদ্দেশ্য। ভারতে মোট ৪০টি বিজ্ঞান মন্দির আছে। তাহার মধ্যে পাঁচটি পশ্চিম বঙ্গে অবস্থিত। এই ধরনের মন্দির যত অধিক পরিমাণে স্থাপিত হইবে দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল।

—শ্রীলক্ষ্মী মজুমদার

আর মিত্রের

মহার মার্কা

তিল তৈল



বিশুদ্ধ ও সুপরিষ্কৃত তিল তৈল হইতে প্রস্তুত
যাকডায় শিরোগ্রাহ্য উপযুক্ত

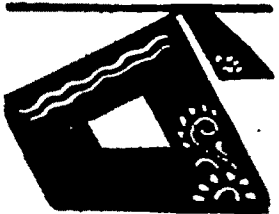
রানি ভাতারী জগৎপতির উপর প্রতিষ্ঠিত

রুচির রূপায়ণে কিনন

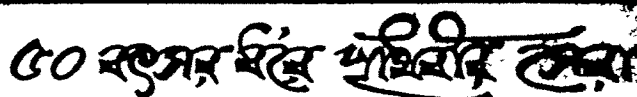
- বিজ্ঞাপনের নমুনা
 - প্রচ্ছদ ও অলঙ্কার
 - তাবচিত্রণ ও ব্যঙ্গচিত্র
 - হাতে আঁকা সায়েন্টিফিক চার্ট
- ৷ বহুমুখী বিভাগল ও বল্লভের অন্তঃ।
এক রঙ ও বহু রঙের
- রায়রাজাতলা গুপ্তন বোড,
ডাক : সাতরাগাছি, হাওড়া
কলিকাতার টিকানা :
C/o গীতাভারতী প্রেস
১১৭/১ বি, বি, গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলি-১২

সম্পাদক : শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৩১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি. এ. কর্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত।
প্রবর্তক প্রিন্টিং এন্ড হাফটোন লিমিটেড, ৫২৩ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীকৃষ্ণব্রহ্মচারী কর্তৃক মুদ্রিত।



[অক্টোবর, নভেম্বর '৬৩



2. ଡ଼ା. ପାରିସଲୀନାମ୍

‘आहुतं’ • ‘वीनसु’ • ‘माद्राडु’ • ‘अशालिहाहुतं’

প্রস্তুতকারক: মেসার্স, এ. ডে. সাহিব

ଡି.ସି.ଏସ୍. ୧୧୬୬ • ଡି.ସି.ଏସ୍. ୧୧୬୬ • ୧୦୦୦ • ଡି.ସି.ଏସ୍. ୧୧୬୬ • ଡି.ସି.ଏସ୍. ୧୧୬୬ •



With Puja Greetings

M/s. S. K. Bhattacharjee & Co.

ELECTRICAL & MECHANICAL ENGINEERS

138, CANNING STREET, . .

CALCUTTA-1



Authorised Agents :

M/s. G. E. C.

for Electric Motors, Starters,
Generating Sets, etc,

Authorised Agents :

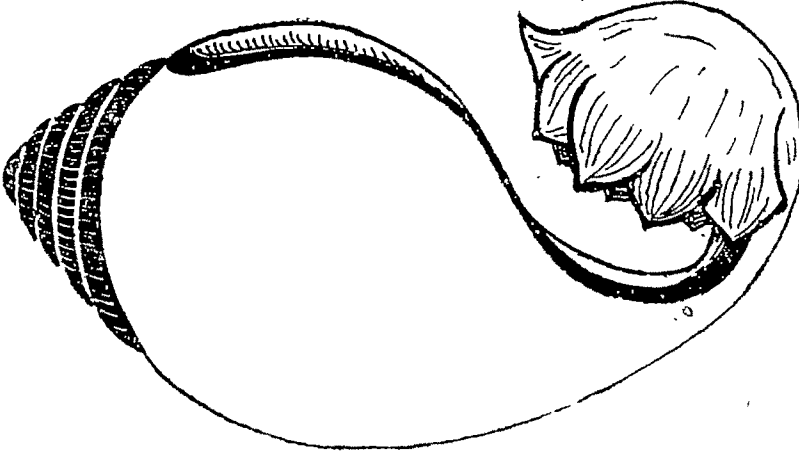
M/s. BALMER LAWRIE & CO. LTD.

for Lister, Black Stone Engines,
Spare Parts and pressing Sets.

Grams : MACHINARIS

Proprietor's Residence 47-2915

Office : { 22-5275
22-7372



কাঙ্ক্ষিক, ১৩৭০

এবর্তক

৪৮ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা

আগমনী সন্দেশ

মা আসিতেছেন! সুদূর কৈলাস-শিখর হইতে বাতাস সে আগমনী-সংবাদ বহিয়া আনে। বিশ্বপ্রকৃতি তাই পুলকমগ্ন! আকাশের বৃকে ধরে ধরে মেঘের মালা। বাতাসে আগমনী সুর। নদীর তটে কাশ-কুম্বের টেউ। মাটির বৃকে-ঝরা শেফালির হাসি। তুমি চাও আর নাই চাও, তুমি তাকাইয়া দেখ আর নাই দেখ, প্রকৃতিরঙ্গির সেদিকে ক্রক্ষেপ নাই। সে বিশ্বজননীর আদরিণী ছহিছ। আপনার আনন্দে আপনি তরপুর। আপেক্ষিকতা তাহার নাই। বথানিয়মে আসন সাজাইয়া মাঘের আগমনী-বার্তা ঘোষণা করিতেছে। আর তুমি ধরার মাহুঘ, মাঘের এই আগমনীর সুর কাণ পাতিয়া শুনিয়াছ কি? কাণের ভিতর দিয়া মরমে তাহা প্রবেশ করিয়াছে কি? যদি করিয়া থাকে তবে নয়ন মুদ্রিত করিয়া মাঘের আগমনের শুভ সূচনা সর্বাগ্রে তোমার হৃদয়রাসমন্দিরে সম্পন্ন কর। মা, মা বলিয়া আকুল কণ্ঠে ঐ দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরের মত মাটিতে মুখ ঘসিয়া রক্তাক্ত হও। তবে তো মা জাগিবেন। তবেই তো জটাছুট সমায়ুক্তা, অর্ধেকশুকতশেষরা, ত্রিলোচনা, অতঙ্গী পুষ্পবর্ণাভা, নবযৌবনসম্পন্না, মহিষাসুরমর্দিনী মাতৃপ্রতিমাকে নয়ন মুদ্রিয়া সন্মর্শন করিতে পারিবে। মাঘের এই রূপ দেখিয়া মাতৃপ্রেমে পাগল হইতে পারিবে। মাতৃভাবে বিভোর হইয়া ভাবমুখে অবলোকন করিতে সমর্থ হইবে, তোমারই দেহের দক্ষিণ শীর্ষ-কৈলাস শিখর। তখন হইতে বৃকের মধ্য ভাগে গুর বিম্বস্ত যে হৃদপিণ্ড তাহাই তোমার হিমালয় প্রদেশ—শীর্ষদেশ হইতে হিমালয় প্রদেশে মাকে নামাইয়া আন। হৃদয়-রাস-মন্দিরে মাঘের বোধন বসাও। রত্নবেদী রচনা করিয়া তত্বপরি মাতৃমূর্তিকে প্রতিষ্ঠা কর। তারপর বাপীজলে কলসী ভরাইয়া, বিন্দু বিন্দু শিশির সংগ্রহ করিয়া শত সহস্র পুষ্প ছানিয়া সুবাসিত বারিতে ঝারি পূর্ণ করিয়া, সর্কৌষধি জল, সমুদ্র ঝারি, স্নগন্ধি সলিল, রত্নোদক তিল ও তৈল সংযুক্ত স্নানজল পাত্র ধরে ধরে সাজাইয়া মাঘের মহাস্নান-পূর্ব সম্পন্ন কর। মাতৃপ্রেমে অভিযুক্ত হও। তোমার রক্তকণ্ঠিন হৃদপিণ্ডরূপ হিমালয় প্রদেশ মাঘের আবির্ভাবে রসসিক্ত হউক। তোমার হৃদয়-কন্দরে স্তম্ভ সিংহ হস্তার দিয়া উঠুক। শৃঙ্গে শৃঙ্গে কণক কিরণের মালাশোভা, গুচ্ছে গুচ্ছে বসন্তের ফুল, মধু গন্ধে হৃদয় তোমার মাতোয়ারা হউক। মাতৃপ্রেমে বিভোর হইয়া অবলোকন কর, তোমার হৃদয়রাসমন্দিরে আর কেহ নাই—শুধু তুমি আর তোমার মা। সন্তান-মায়ে এক হইয়া নয়ন উন্মীলন কর, বিশ্ব প্রকৃতির দিকে তাকাইয়া দেখ—দেখিবে বিশ্ব জুড়িয়া মাঘের বিরীচি মূর্তি শরতের সোনালী রৌদ্র-কিরণে ঝলমল করিতেছে। এমন না হইলে কি পূজা? এমন না হইলে কি পাবাণী কথা কয়?

[শ্রীশ্রীসঙ্কটর পুরাতন রচনা হইতে]



শ্রীগুরুঃ

শ্রীমৎ স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী

সহস্রপাদ-গুরোরজিৎ ব্যাপ্তবদ্বিগ্নি সৰ্বতঃ ।
 অন্ধারূপা হি যা আপস্তাস্বেব কমলায়তে ॥ ১
 কর্ণিকাজিৎ সরোজস্ত হৃহেতুককুপাঘনা ।
 মাধবীসুখা তৃষামূলং ভবহেতুং জিহীৰ্ষতি ॥ ২

সহস্রপাৎ পরমপূমান্ !

নিত্য তব অহেতুক অমুগ্রহ ধরিয়া বিগ্রহ,
 সাধকহৃদয়ে, সংবেদনে, ভাবে অমুভবে,
 আপনাকে মিলাইতে হ'লে আপনি আগ্রহ !
 সৰ্বব্যাপী চরণ তোমার

ওত প্রোত নিখিল অস্তরে, করিয়া সংগ্রহ,
 প্রপন্নের অন্ধাসরসীর, থির নিশ্চল সলিলে,
 শ্রীগুরুর “পাদপদ্ম”রূপ কর পরিগ্রহ !
 গুরু-অজিৎ সরোজের

কর্ণিকায়, ঘনরূপা কুপারস অহেতুক,
 সে রসের পরশে আবেশে, পরিত্যক্ত কর প্রতিগ্রহ,
 ভবহেতু ভূষামূল সমুচ্ছেদে, হে চির উৎসুক !

সহস্রাস্তো ন চষ্টে যৎ পঞ্চাননঃ ষড়াননঃ ।
 রহস্ত্যাস্তোজ্জস্রুয্যশ্রীঃ খ্যাপয়তি গুরোঃ কুপা ॥ ৩
 সংগ্রহাখ্যাতিপঞ্চানাং গঙ্গানামুদ্ভবো যতঃ ।
 তদভজ্যে তৎপ্রপন্নোহহং শ্রীগুরোঃ পরমং পদং ॥ ৪

সহস্রাস্ত্র স্বয়ং অনন্ত,
 পঞ্চানন কিম্বা ষড়ানন, মুকমৌন যে রহস্ত্র খ্যাপনে,
 শুধু গম শ্রীগুরুর কুপা,
 উদ্ভাসিতা হৃদয়শ্রীসমা, সে রহস্ত্র-শতদল
 উন্মীলনে ।

সংগ্রহ-বিগ্রহ-পরিগ্রহ,
 প্রতিগ্রহ-অমুগ্রহ—এই পঞ্চ গঙ্গাধারা,
 শ্রীগুরুর পরম পদে হ'য়ে সমুদ্ভব,
 প্রপন্নের আগ্রহের সৰ্ব আশ্রিতরা ;
 ভজি সেই পাদপঞ্চগঙ্গা সারাৎসারা ॥

দেবী বরণ

শ্রীচিন্তরঞ্জন চক্রবর্তী



ওগো! হৃগতিনাশিনী এসো মা—
 দূর করো হৃৎ-স্বাস্ত,
 আনো প্রশান্তি দিক্-দিগন্তে
 আজি হেসে স্নানকাস্ত।
 নীলাকাশে ঐ স্নিগ্ধ শরণ—
 স্তম্ভ মেঘেরা ভাস্ছে,
 মন্দ সমীরে শেফালি গন্ধ
 মঞ্জুল ছুটে আস্ছে।

স্বচ্ছ শ্রামল মাঠ-ময়দান
 নিশির শিশিরসিক্ত,
 বাতাসে মত্ত ধানমঞ্জরী,
 শাখা শাখে সম্পৃক্ত।
 দীঘি-সরোবরে তব আগমনী,
 বাঞ্ছে কঁকণের ছন্দে,
 পুঞ্জে পুঞ্জে ভুঞ্জে ভোমর
 শুভনে মকরন্দে।
 গ্রীষ্মের কোথা তপ্ত সূর্য্য?
 বিদায় সিক্ত বর্ষা,
 আজি এ-শরতে এসো তুমি মাতা,
 এসো মন্দির-হর্ষা!
 রোগজঙ্ঘর মাহুবে বহাও
 জীবনের মহাবত্মা,
 হিংসা-কুটিল-কালকূটে নাশ
 কর মা মেনকা-কন্ডা!
 মহামিলনের মহান্ ছন্দে
 হোক ছন্দিত বঙ্গ,
 ভুবন ভরিয়া তুমি এসো মাতা
 ছড়ায়ে মনের রঙ্গ।
 শক্তিবিহীন বঙ্গে তোমার
 দেখা দিক্ নবশক্তি;
 তব আগমনী বাহু আহুত্
 হৃদয়ে পরম তক্তি।
 কে বলে মাতৃবিহীনা বঙ্গ,
 মা-হারা যাতনা বঞ্চে!
 বরষে বরষে তব আগমন
 ঘুচাক্ ভ্রান্তি চক্রে।
 ক্ষুধার অন্ন নাই থাক—তুই
 এলে মা অন্নপূর্ণা
 ক্ষুধার বালাই ঘুচাতে স্বয়ং
 হ'বে দেশ সম্পূর্ণা।
 ওগো মঙ্গলা আনো মঙ্গল—
 বাজুক বিজয়-ডঙ্কা,
 অভয় হস্ত প্রদারি' তোমার
 বলো, "ওরে নাই শঙ্কা!"
 সকল জীবন ধৃত করিয়া
 নাও পূজা মহানন্দে,
 পুষ্পের থালি, অর্ঘ্যের ডালি
 সাজাবেছি মধু গন্ধে।

শ্রীশ্রীচণ্ডী ও সত্যপ্রতিষ্ঠা : ধ্বনিলোচন বধ

মহর্ষি প্রেমানন্দ

শক্রাদি স্তুতিতে উক্ত হয়েছে—

“সংস্বতা সংস্বতা স্বং নো হিংসেথা পরমাপদঃ” ॥ (৩৫)

আমরা স্মরণ করিলে আপনি আমাদের পরম আপদসকল নাশ করিবেন।

সাধকের মন ও অন্নময় কোবস্থিত দৈবী তেজ সত্ত্বা (চিং সত্ত্বা) আত্মিক শক্তির সম্বিত পেলেই নিরন্তর স্তুতি বা প্রার্থনা জাগে এই ধারায়; তখনই নিরন্তর নাদ-সাধনায় রত সাধকে প্রকাশিত হয় আত্মিক শক্তির তেজোগর্ভ রূপ। তিনিই শ্রীচণ্ডীর শক্রাদি স্তুতিতে বর্ণিত—

“পুনশ্চ গোৱীদেহা সা সমুদ্ভূতা যথা ভবৎ।

বধাষ দ্বষ্ট, দৈত্যানাং তথা শুভ নিশ্চিন্তয়ো ॥” (৪১)

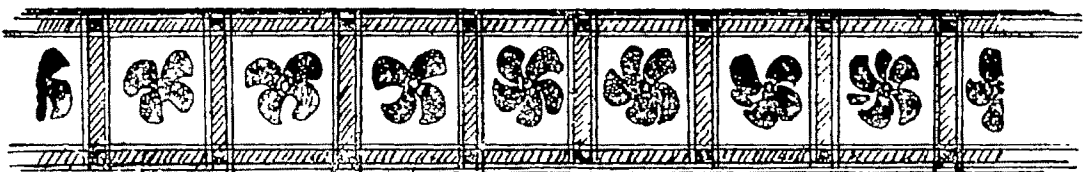
গোৱী = গোর + ঈপ্। শুভ (বেষ্টন করা) বা শু (শব্দ করা) থেকেই গোৱী শব্দ। সকল বেষ্টন করে বা শব্দাশ্রয় করে আছে বলেই গোৱী। শক্তিরূপে কম্পিতা বলেই জ্বলিছে “ঈপ্” করে গোৱী। এই “গোৱী” প্রকাশ নিচ্ছে ধ্বনি থেকেই। যোগশাস্ত্রও বলে— “ধ্বনেরস্তর্গতং জ্যোতিঃ”। তিনিই যোগীর আনন্দময় কোষের দ্রষ্টব্য “প্রহ্লাদ জ্যোতিঃ”। তাঁর সম্বন্ধেই শ্রীগীতা বলেছে—“দৈত্যানাং প্রহ্লাদচাম্বি”। সকল পাশ ছেদনকারীগণের মধ্যে প্রকৃষ্টরূপে অহ্লাদদানকারী এই জ্যোতিই প্রধান। (দিত্তি + ক = দৈত্য। দিত্তি = “দো”—ছেদন করা অর্থে)। তাইত নিশ্চয় ও শুভ বধের জন্ত গোৱীর প্রকাশ। সাধকে গোৱীর প্রকাশ হয় গভীর ধ্যান সমাধি-স্তরে। তাইত শ্রীচণ্ডী তাঁর দেব্যাদৃত সংবাদে বলেছেন—

“ইতি কৃষ্ণা মতিং দেবা হিমবন্তং নগেশ্বরম্।

দ্রুমুত্তর ততো দেবীং বিষ্ণুমায়াং প্রভৃষ্টবুঃ ॥” (৭)

—এই স্তরে এসে সাধকের দেহ এবং ইন্দ্রিয়গ্রামে যদিও আত্মত্ব ভ্রম থাকে না তথাপি মনের রৈবত বৃত্তির ক্রিয়ার কিছু রেশ অবশিষ্ট থাকে। অল্পভূত মহাশক্তিকে নিয়ে স্বেচ্ছাভ্রম করে খেলতে চায় সাধক। অহংটি জৈবোত্তর লোকে বায় বটে কিন্তু শিবত্ব তখনো সুপ্রতিষ্ঠিত হয় না। একটি অতি-স্বপ্নের ভান নিয়ে সে সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধির আড়ালে অবস্থান করে। এমন কি সাধক নিজেও তা’ অনেক সময় অহুভব করতে পারে না। অবচেতনে এরি পরিচর্যা করে করে অনেক সিদ্ধ যোগী কালক্রমে বিপর্যস্ত হ’য়ে পরম পুরুষার্থ হ’তে বিচ্যুত হন। এই অসঙ্গ জনময় স্পন্দ সদৃশ দোষ, দ্বষ্ট অহংই শুভ নিশ্চিন্তের দৃষ্টরূপে ক্রিয়াশীল। সেই প্রলুব্ধ ও প্ররোচিত করতে চায় সাধককে তার যোগবিভূতি নিয়ে খেলতে।

কিন্তু নাদে সুপ্রতিষ্ঠা ও প্রহ্লাদ জ্যোতির দর্শন আত্মিক সম্বিতলব্ধ সাধকের সহায়ক হয় অন্তরের গভীরে ডুবে যেতে। দেহের নব দ্বার বন্ধ হ’য়ে ব্রহ্মরজ্জ্বস্থিত দশম দ্বারের হ’তে থাকে উন্মোচন। বহির্দৃষ্টি আসে কমে, ক্রমে দৃষ্টি পায় অন্তর-চক্ষুর। সঙ্গে সঙ্গে পরব্রহ্মের অন্বেষণ—অতীন্দ্রিয় লোকের অন্বেষণ। আন্তর অতি-নিবেশের ফলে সাধকের বহির্দৃষ্টি হ’য়ে উঠে ধূমায়িত। এ অবস্থায়ই সাধকের চক্ষু “ভিমে তা’ দেওয়া” পাখীর মতন। এটিই সাধনার ধ্বনিলোচন অবস্থা। এ অবস্থাকেও অতিক্রম করে যেতে হয় সাধকের স্নগভীর নাদানুভূতির বলে। তাইত এ স্তরটি স্বলোক বা সুরলোক।





আমাদের কালের শারদোৎসব

শ্রীমূলীলপ্রসাদ সর্বাধিকারী

সহোৎসবের মস্ততায় আমরা মেতেছি আমাদের দুর্গাপূজা ও দোলোৎসবে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও, শ্রীকৃষ্ণস্বামী দেবীর পূজার্ননায় শিক্ষিতেরা প্রাণমন ঢালিয়া দিয়াছে। বাণী-সাধনার বঙ্গদেশের সর্বশ্রেণীর বালক কিশোরের পক্ষপাতিত্বের সীমা পরিসীমা থাকে নাই। সমারোহের সহিত উৎসবাদি পালনের প্রধান প্রধান অঙ্গ সর্বত্র লক্ষিত হয়, দরিদ্রনারায়ণের সেবা ও অস্বাদীভাবে আত্মীয়বন্ধুর সোজা মিলনে।

বঙ্গদেশে বাঙালী রাজা ও তাঁহাদের রাজ্যপাট বধন ছিল, সে সময়ে এ সকল উৎসবদির কথা বাহা আমরা পড়ি বা শুনি, তদপেক্ষা বিদেশী বিশেষতঃ ব্রিটিশ-শাসনাধীনকালে, এ সকল উৎসবদির মান যে কোনও অংশে ন্যূন কোনকালে হইয়াছে প্রত্যক্ষদর্শী আমরা কিছুতে বলিতে প্রস্তুত নহি। বরং আমরা বলিব বিদেশী শাসকবর্গ দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে উদ্দীপনা, স্বদেশে ও বিদেশে সকলের প্রাণে পরমানন্দের সৃষ্টি করিয়াছে। অতঃপর কা' কথা। অয়ং হেষ্টিং বৈঠকখানা সাক্ষাৎ হইয়া বেশভূষা হইতে বাঙালীর সামাজিক উৎকর্ষতার সকল নিদর্শন প্রত্যক্ষীভূত করাইয়াছেন নিজের বৈঠকখানায়। হেষ্টিংসের বিশাল বৈঠকখানার স্থান এখন বৈঠকখানা বাজারে পরিণত।

মাতৃ-আগমনে বিদেশীদের বড় বড়দেরও এই সমারোহ। আর সপ্তমসর পরে মাকে পেয়ে আত্মলাভে আটখানা হব না আমরা! কত্মরূপেই মাকে যে আমাদের ধ্যান জ্ঞান। পিত্রালয়ে কত্মর সন্তানাদি সহ

আগমন। মরা গাঙে জোয়ার বহিবে না। আরাধনা ক'রে মাকে তিনদিনের জন্ত আনা। কত্মর রাজ-রাজেশ্বরীরূপে শুভাগমন। রাজরাজেশ্বরী-যোগ্যা সমাদর সর্গদ্বারের জন্ত আমাদের অন্তর অতুল শোভনীয় হ'য়ে ত' উঠবেই। সে রূপ দেখে বিদেশী বিধর্মীও চমৎকৃত হয়েছে। এ দেখে, মনেপ্রাণে উৎফুল্ল আমরা হয়েছি। কত্ম আবাহনের সার্থকতা অহুত হ'য়েছে মরমে মরমে।

মাতৃ-আরাধনা উপলক্ষ্যে ভায়ে ভায়ে একপ্রাণতার দৃশ্যে আশা-দীপ প্রজ্জ্বলিত হয়েছে মাতৃভূমিকে একমুখে বাঁধার প্রেরণায়। মনে হয়েছে দেশের একতা সাধনের এ পরম পন্থা একাগ্রচিত্তে অমুখাবন যদি আমরা করি তবেই 'বঙ্গ আমার, জননী আমার

ধাত্রী আমার আমার দেশ—'

গাওবার সার্থকতা প্রতিফলিত হবে দিকে দিকে। কাহার সাধ্য তখন আমাদের প্রতি কনিষ্ঠ অঙ্গুলি হেলনের দুঃসাহসিকতা বর্জ্য।

ধনী, মধ্যবিত্ত, দরিদ্র, কত্মরূপিণী মাতৃ-সমাদরে ভাববজ্র প্রাবিত হয়েছে সমভাবে। ভাবের বান ডাকিয়াছে দেশময়। সাধো কুলায় নাই কাহারো তাহা এড়াইয়া বসিয়া থাকিতে। প্রাণভরা আকুতিতে জ্ঞাপিত হয়েছে এখানে ওখানে সেখানে—

'শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী,

নারায়ণী নমোহস্তুতে—'

গৃহস্থ ঘরের দাসদাসীরাও তাহাতে যোগদান করেছে আগ্রহভরে। তাহাদের মধ্যে তত্র বা পশ্চিমবঙ্গ বহল

শক্তিদায়িনী জাগো

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ঘোষ

শক্তিরূপিণী, শক্তিদায়িনী
পরমা প্রকৃতি-রাণী ।
নিধন করিতে দৈত্য-দানব
এস মা, অভয় দানি' ।
দূর-দিগন্তে উষার তোরণে
আনন্দ বোধনে আজি
অযুত প্রাণের পাথারে উঠিছে—
শঙ্খ-ঘণ্টা বাজি' ।
শরতের সোনা-সৌধ আকাশে
শ্রাব-পল্লীর কোলে

তটিনার নব-নৃত্যে, হাওয়ায়
পত্র-পুষ্প দোলে ।
শিশির সিক্ত : ভূগ, কাশবন,
স্তম্ভ বলাকামালা
স্বাগত জানায় : 'জননী, জীবের
জুড়াও জীবন জালা ।'
বিদ্যা, বিস্ত, শক্তিদায়িনী
পতিতপাবনী মাগো,
রক্ত-বীজের বিনাশিনী দেবী,
জাতি-অন্তরে জাগো !



পরিমাণে থাকিলেও মাতৃপুঞ্জার আনন্দ হইতে বঞ্চিত
হইবার কল্পনাও কুত্রাপি কেহ করে নাই। বেশভূষা
সকলেরই বাঙালী ধরণের। আমাদের শারদোৎসবে
আমরা তাহাদিগকে আমাদের করে নিয়েছি। নানা
বর্ণের প্রতিবেশীরা জাতি-ধর্ম-বর্ণ ভুলিয়া একাকার হয়ে
গেছে আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দ করিতে। ভিখারিণীর
মুখেও আনন্দশ্রোতের নিঃস্বলতায় হাসি ফুটেছে। মা
মা, জয় মা রব ক্রত হয়েছে আকাশে বাতাসে। মাতৃ-
আশীর্বাদে সংসার আমাদের স্বর্গে পরিণত হয়েছে।
বিদেশিনীরা দে স্বর্গের মাধুর্য্যে পুলকভরে জানিবেছে
জনতাকে মাটির পৃথিবীতে স্বর্গ দেখতে যদি চাও, যাও
বঙ্গদেশে, যাও বাঙালীর অন্তঃপুরে—যেখানে বাঙালীর
মা রাজরাজেশ্বরীরূপে বিরাজ ক'রছেন। আমাদের
শারদোৎসবে বাঙালীর প্রাণে সেই মর্ম্মবাণী সপ্ত সুরে
ঝঙ্কত হ'য়েছে। শারদোৎসবে বাঙালী মেতে উঠুক
বাঙালীর সেই ভাবধারা মন্বন করিয়ে। তাহলেই বিজয়
ডঙ্কা বাজিবে আবার স্বস্থানে তার আসন সুপ্রতিষ্ঠ হবেই
হবে। দস্ত তরে তখন অনাম্মাসে সে ব'লবে :

‘শিবে সর্কার্ধ সাধিকে—’

জয় হউক, জয় হউক দেবী, আমাদের শারদোৎসব

ফলপ্রসূ হওয়াতে। যাও দেবী যাও, আবার আসতে
হবে, আবার আসতে হবে। শোনো দেবী ভক্তের সদর্প
আহ্বান :

‘যাওয়া আসা কেমন মায়া
ভাঙ্গব তোমার জারিজুরি ।
ওমা তোর মায়াতে বাঁধব তোকে,
তোরাই চরণ শিরে ধরি ॥
যাবি যা মা যেথায় খুসি,
ব'সে হেথায় টানব রশি ।
মহামায়ার মেয়ের মায়া,
দেখবে সবাই কারিগরি ;
ওমা বিজয় ডঙ্কা বাজবে তখন
যাওয়া আসার পথ ঘুরি ।
নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং নমো নমো ।

শ্রীনাথ দাস গিয়াছেন কিন্তু তাঁর বংশধরেরা আছে ।
শোভাবাজার রাজবংশ, মরা হাতি লাখ টাকা ।
শারদোৎসবের উদ্‌যাদনায় বাঙালীকে এঁরা মাতিয়ে দিল,
বাংলা ধন্ব হইল । ‘সার্বজনীন’, বারোয়ারি করুক গুণ
ভরিয়া । মূল নড়িয়া বসিলে কলিকাতা তথা সমগ্র বাংলার
রূপ-জ্যোতিতে দেশ নাচিয়া উঠিবে । নাস্তি সংশয় ।



সাহিত্য জগতে নারী

শ্রীজ্যোতির্ময়ী দেবী

সাহিত্যের ক্ষেত্র যে কত বড় বিস্তৃত ও গভীর সে কথা সবাই জানেন, আমার বলার অপেক্ষা রাখে না। তার মধ্যে কথা-সাহিত্যে, কাব্যক্ষেত্রেই সাধারণ লেখক-লেখিকার ভিড়। গুরুতর বিষয়ে, প্রবন্ধ নিবন্ধ বা নাটকের ক্ষেত্রেও তাঁরে সফলতা কম বা নেই। মেয়েদের বেশীর ভাগ কথা-সাহিত্যে ও কাব্যেই দেখতে পাওয়া যায়। এককথায় কথা-সাহিত্যেই মেয়েরা বেশী জমেছেন। মননশীল চিন্তাগভীর প্রবন্ধ-নিবন্ধেব ক্ষেত্রে তাঁদের কমই দেখতে পাওয়া যায়। তারও কারণ আছে। প্রথমতঃ আমাদের বাংলা-সাহিত্যের আসরে মেয়েদের আগমন মাত্র একশত বছরের ইতিহাস। দ্বিতীয়তঃ শিক্ষার জগতেও তাঁদের স্বেচ্ছায় সময় এসেছে তার চেয়ে অনেক পরে। বলতে পারি ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের আগে অবধি তাঁদের স্কুল কলেজের শিক্ষাভ্যাস নগণ্য ছিল। এমনকি লেখিকা, সাহিত্যিক হিসেবে যারা নাম করেছেন তেমন স্বনামধন্য লেখিকাদের বেশীর ভাগই ঘরোয়া পরিবেশেই শিক্ষিতা, অস্তঃপুর ও পদার আড়ালের নারী। যেমন প্রথম নারী-ঔপন্যাসিক স্বর্ণকুমারী দেবী, অমূল্য দেবী, নিরুপমা দেবী, শৈলবালা ঘোষ প্রমুখ। কাব্যজগতে মানকুমারী, গিরীন্দ্রমোহিনী, প্রসন্নময়ী, রাধারাণী দেবী এঁরাও এই অস্তঃপুর-শিক্ষিত দলের। কিন্তু এঁদের মাঝে আমরা ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে শিক্ষিত স্বনামধন্য কবি ও লেখিকাদের পেয়েছি যেমন কাব্যক্ষেত্রে কামিনী রায়, প্রিয়দর্শনা দেবীকে, এখন সাহিত্যে দীপ্তা দেবী, শান্তা দেবী। পরবর্তী যুগে উমা রায়, রাশ্মি রায়, চিত্রিতা গুপ্ত এঁদেরও পেয়েছি। কিন্তু কাব্য বা কথা-সাহিত্য শিক্ষা অশিক্ষার ধার ধারে না। উচ্চশিক্ষাতে বিদগ্ধতার কিছু সাহায্য হয় বটে, কিন্তু তার জন্ত সত্যকারের কথাকার সাহিত্যিকের সৃষ্টিশক্তি বাধা পায় না।

অস্তঃপুরশিক্ষিত ও উচ্চশিক্ষিত সব তাই আমাদের কথা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে এখনো বিপুল সংখ্যক মহিলা

সাহিত্যিক ও কবি ঐ দিকেই রয়েছেন দেখতে পাচ্ছি। কথা-সাহিত্যের নানাদিকে তাঁদের খ্যাতিও কম নেই। যেমন আশাপূর্ণা দেবী, প্রতিভা বসু, রাজলক্ষী দেবী, মহাশেতা ভট্টাচার্য্য, বারি দেবী প্রমুখ এঁরা। চিন্তাশীল প্রবন্ধ নিবন্ধের ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি খুব কমই কয়েকজন। তার মাঝে দীপ্তি ত্রিপাঠি একজন চিন্তাশীল লেখিকা।

তবে বিপ্লবাত্মক সাহিত্য জগতে পুরুষদের নানামুখী নানা ভঙ্গীর বিচিত্র সাহিত্যের কাছে (আমি মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়েই বলছি) সৃষ্টির ঐশ্বর্য্যের কাছে আমাদের নারী-রচিত সাহিত্য এখনও পৌঁছতে পারেনিই বলে মনে হয়।

হয়তো সঙ্গ সাহচর্য্য বৈদগ্ধ্যের অমূল্য স্বেচ্ছায় তাঁদের নেই, কিম্বা গৃহিণী জননী কল্লার কর্তব্যের চাপে তাঁরা উপযুক্ত অবসর পান না। নিজের সাধনাকে সময় দিতে পারেন না।

তবু এযুগে সাহিত্য এসেছে আমাদের মেয়েদের কাছে একটা বিপুল আনন্দ ও সম্ভাবনা নিয়ে—একটা অজানা আশ্চর্য্য অপরিমেয় জগত নিয়ে—যা এক চর্লভ কল্পলোকের জগতের ছায়ার খুলে দিয়েছে। সেখানে আমাদের ছোটবেলায় ঘর-করনার খেলাঘরের সঙ্গেই বলুন, আর বড়বেলাকার নিজের কর্মক্ষেত্রে মাঝেই বলুন, আর একটা অজানা কল্পনারাজ্যের সিংহাসন খুলে দিয়েছে। হয়ত কোনো পরম সম্ভাবনার ইঙ্গিতও তাতে পাওয়া যাবে কোনো সময় এমন আশাও আমাদের মনে জাগছে।

বদিও স্বদেশী বিদেশী সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত কালেও আমরা দেখতে পাই সেখানেও পুরাণের সেকাল থেকে একাল অবধি (ব্যাস, বাল্মিকী, কালিদাস, ভবভূতি থেকে একা আধুনিক কাল অবধি সেক্সপীয়ার, গেটে, টলষ্টয়, ডিক্টর হিউগোদের মত) এ দেশের বা অন্য দেশের মহাকবি মহৎ স্রষ্টাকুশলী লেখকদের মত জীবন-দর্শন, মহৎ ও বৃহৎ সাহিত্য নারীর হাতে সৃষ্টি

হয়নি। বিদেশের মহিলা সাহিত্যিক জগত আমাদের মত তেমন সীমাবদ্ধ না হলেও সৃষ্টি তাঁদেরও মহৎ বা বিরূপ হয়নি। ছোট স্বপ্ন ছোট দুঃখ ক্ষুদ্র সংসার ক্ষুদ্র আনন্দ রসই আমাদের মত তাঁদেরও সাহিত্যের উপজীব্য। যদিও সেই সমস্ত ক্ষেত্রেই বিদেশের এবং এদেশেরও লেখিকারা মাঝে মাঝে গভীর রস সৃষ্টি করেছেন। কখনো চোখে চমক লেগেছে, কখনো মনে দাগ কেটেছে।

কিন্তু পাঠক-পাঠিকাদের গোপন অন্তরের কোন অন্তরে বেশ একটু ক্ষোভ অস্তাব অভিযোগ লুকোনো রয়ে যায়। মনে হয় আরো যেন কিছু চেয়েছিলাম। কালোস্তীর্ণ কিছু, আনন্দময় কিছু, লোকোত্তর কিছু আমরা চাই। যা গভীর গম্ভীর বা চিরকালের কথা। যেটা আমাদের সৃষ্টিতে এখনো রূপ ধরেনি। কারো অমূল্যত্ব, উপলব্ধিতে আমাদের মনের চোখের সামনে নতুন সৃষ্টি নিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেনি।

সে বস্তু কি? হয়ত অনেকে জিজ্ঞাসা করবেন। হয়ত অনেকে ক্ষুণ্ণও হবেন এই সত্য বলাতে। কিন্তু সে বস্তু হ'ল সৃষ্টির অপার বিস্ময়, প্রচুর আশ্চর্য আনন্দবোধ—তা এখনো দেখা দেয়নি। কবি যেখানে বলেছেন ‘আমার ভুবন ভুলানো এলে কি দেখিলাম নয়ন মেলে।’ ‘এই লতিহু সদ তোমার স্মরণ হে স্মরণ।’ যিনি ঘরের ছয়ারের একটা ভূণ দেখেও আনন্দময় সৃষ্টি করেছেন। যিনি ‘অপকল্পকে দেখেছেন দুটি নয়ন মেলে।’ সে আনন্দেরসের স্বাদ এখনো নারী-রচিত সাহিত্যে আমরা পাইনি। হয়ত বা নারী-রচিত সাহিত্যের অমোঘ নিয়তি এই। এর বেশী দান করার ঐশ্বর্য তাঁদের ভাগ্যে নেই। তবে নারী-রচিত সাহিত্যের ইতিহাসে একবার একখানি মাত্র বই সমসাময়িক বিষয় নিয়ে রচিত হলেও জগতকে আশ্চর্য করে দিয়েছিল। বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল। তা হচ্ছে “আঙ্কল টম্‌স্‌ কেবিন” (টম্‌স্‌কার কুটীয়) নরনারীর সমাজের বা প্রেমের কোনো সমস্যাই তাতে ছিল না। ছিল শুধু মানবতা-বোধের একটা অপূর্ণ আশ্বাদ, যা এ পর্যন্ত কোনো নারী সৃষ্টি করতে পারেন নি। এমন কালোস্তীর্ণ বা

রসোত্তীর্ণ লেখা আর কোনো নারীর লেখাতে আছে কিনা আমার জ্ঞান নেই।

হয়ত বলা যায়, হয়ত সাহিত্যের জগতে তাঁদের সৃষ্টির পারিপার্শ্বিকে অনেক বাধা আছে। হয়ত সব সময় সত্য-শীল হতে তাঁরা পারেন না। হয়তো তাঁদের স্বভাবগত লজ্জা সঙ্কোচ আছে সত্য কিছু বলতে, যা তাঁদের সাহিত্যে অন্তরের অব্যব নৈব্যক্তিক মুক্তি এনে দিতে পারে নি। পুরুষ যেখানে অবলীলাক্রমে দর্শক হয়ে সমাজকে, যাহুবকে তার ক্ষুদ্রতা মহত্বকে দেখেছেন—নারী সেখানে দর্শক হতে পারেন নি। এই কথাই বার-বার মনে হয়েছে। এ সত্ত্বেও কিন্তু তাঁদের ধর্মজগত ও তার উপলব্ধিকে যদি এই সাহিত্য-এলাকায় মিলিয়ে দেখি তাহলে তাঁদের ও আনন্দময় উপলব্ধি অমৃতের অন্বেষণ দেখতে পাওয়া যাবে। নটিকেশ্বর মতই মৈত্রেয়ীর অমরত্ব সন্ধান, গার্গীর বিপুল জ্ঞানের ভাণ্ডার, মদালসার সন্ধানদের আশ্রয়দর্শনের অপূর্ব উপদেশে সেই জননী গৃহিণী সহধর্মিণী নারীদের মনে করলে মন অভিভূত হয়ে যায়। জনকের রাজসভায় ব্রহ্মচারিণী শুলতাও অরণীয়।

এবং এ নারী পৌরাণিক কালেই শুধু ছিলেন না। ইতিহাস নিজের মুখে বারু বারে অবগুণ্ঠন টেনে দেয়। মাঝে মাঝে কেউ যখন খোলে তখন দেখা যায় বিদ্যুৎ-চমকের মত কারকে কারকে। যে নারী ছিলেন বুদ্ধমাতা মহাপ্রজ্ঞাবতী গৌতমী। অসংখ্য ধেরী বা স্ববিরা বুদ্ধশিষ্যা। অশ্রুদিকে দেখেছিলেন জ্যোতি-বিজ্ঞানী ধনা। ছিলেন গণিতজ্ঞা লীলাবতী।

মধ্যযুগে দেখা দিয়েছিলেন কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল উন্মাদিনী চিতোরের রাজরাণী অমরকবি মীরাবাদী। ভগবৎপ্রেমের সঙ্গীতে গানে কাব্যে তিনি নিজস্ব পৃথক একটা ধারাই সৃষ্টি করে গেছেন বৈষ্ণবকবিদের মত। যে ধারা তাঁরই সৃষ্টি।

তারপর সহসা দেখি একেবারে এযুগে শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণের নারীশূর যোগেশ্বরী ভৈরবীকে। যিনি সর্ব প্রথম ধর্মোন্মাদ ঐ কিশোর ভক্তকে আত্মস্বরূপ বুলিয়ে দেন। গভীর জ্ঞানে ও স্নেহভালবাসায় তাঁর ঠাকুরকে পথ-নির্দেশের সহায়তায় বিচার-সভা আস্থানে সকলের

অম নিরসন করার তুলনা মেলে না। ঠাকুর বলেছিলেন যিনি রূপে ও জ্ঞানে সাক্ষাৎ সরস্বতীর মত। মায়ামমতায় জননীর মত তাঁকে রক্ষা করেছিলেন ঐ সময়ে।

ইনিও নারী। এবং একালেরই। কোথায় এত শিক্ষা পেয়েছিলেন? কোথায় সাধনা করেছিলেন? কেমন করে এত গভীর জ্ঞান সেকালে অর্জন করেছিলেন? তখন লোকে মেয়েদের পড়াশুনাকে জুযোগই দিত না। অপূর্ব বিষয় সৃষ্টি করে মনে।

এইসঙ্গে পেয়েছি প্রায় নিরক্ষর। খ্রীশ্রীমায়ের অপূর্ব চরিত্র। আশ্চর্য্য করণী-কৃপা-মমতা-দয়া। এবং আশ্চর্য্য তাঁর লোকব্যবহার ও উপদেশ। শুধু শিক্ষায় কি এইরকম চরিত্র গড়ে ওঠে? কে বলতে পারে সে কথা। তারপর আবার পেলাম আশ্চর্য্য এক নারী যিনি বিদেশিনী হয়েও আমাদেরই পরম আপনার জন।

রামকৃষ্ণ নারীগুরু গ্রহণ করেছিলেন। এবং তাঁর প্রধান শিষ্য গ্রহণ করলেন প্রধান শিষ্য এক নারী।  যে নারী বিদেশিনী, যে নারী অল্প ধর্ম্মাবলম্বিনী, যে নারী রূপে, বিজ্ঞায়, প্রতিভায় সরস্বতীর মত। ঠাকুরের নারী-গুরু ভৈরবীর মতই অতুলনীয়। যিনি ঠাকুরকে স্বরূপ দর্শন করিয়ে আর ফিরে তাকাননি। স্বামীজীর শিষ্যা এই ভারতে আত্ম-নিবেদিতা। নিবেদিতাও তাঁর গুরুর মতই আশ্চর্য্য প্রতিভাবে ভারতের মাধুর্য্য ধর্ম্ম সাহিত্য পুরাণ দেশকে আপনার করে কতদিক দিয়ে যে তাঁর উপলব্ধির ভারতবর্ষকে নিজের সাহিত্যে প্রকাশ করেছেন—তাও এক অলৌকিক ব্যাপারই মনে হয়।

এবং আত্মভাবে একেও স্বামীজী তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করিয়েছিলেন।

এধুগে এই দুটি ইঙ্গিতময় ঘটনা নারীগুরু ও নারী-শিষ্যা এই কি আমাদের ধর্ম্মের ও সাহিত্যের জগতের নতুন সন্ধান দিচ্ছে না? একটা বলিষ্ঠ নারীর দ্বারা স্বরূপদর্শনের ইঙ্গিতের মত? দুজনেই মহীয়সী ব্রহ্ম-চারিণী। আশ্চর্য্য বলিষ্ঠ জ্ঞানদৃষ্টিশালিনী। লোকোত্তর প্রতিভার ভাস্কর, নিষ্কাম কর্ম্মযোগিনী। অতুলনীয় ত্যাগশীল। একজন শিষ্যের আত্মস্বরূপদর্শনের পর বিমুক্ত মনে নিরুদ্ধেণ যাত্রা করলেন। অজ্ঞান জগৎ-বিষ্ময়ত প্রতিভাশালিনী সর্ব্বত্যাগিনীরূপে নিজের সম্ভার বিশেষত্ব রেখেও যেন সব শুদ্ধই নিজেেকে গুরুর আদর্শে উৎসর্গ করে দিলেন। আর জন্মভূমি স্বদেশে ফিরে গেলেন না। যেন নিজেকেই গুরুদক্ষিণা দান করলেন।

মনে হয়, তাহলে তো নারীর সত্য দর্শন হয়। হতে পারে। যখন ধর্ম্মের জগতে হয় তখন সাহিত্যে সেই বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বময় নৈব্যক্তিক গভীর দৃষ্টির স্রষ্টি ফুটে ওঠে না কেন?—যা সাহিত্যে পুরুষের দৃষ্টি ও স্রষ্টিতে পাই। এবং ত্যাগশীল নরনারীর ধর্ম্মজীবনেও পাই। এবং একালে মেয়েদের কত সুযোগ শিক্ষায় জ্ঞানের।

যাক। আমাদের এই অসার্থকতায় ক্ষোভের বা হঃখের কিছু নেই। সাহিত্যের এক অমর কবির অমর উক্তি মনে করে ভাবতে পারি, ‘কাল অসীম পৃথিবী অনেক বড়’। হয়ত একদিন আমাদের মধ্যে দ্রষ্টাশ্রষ্টা মহামানবীর আবির্ভাব হবে।

আবার এস

শ্রীরবীন্দ্রনাথ দাশ, বিহারত

সাধু মোহান্ত নামের গুণে

এই বিশ্ব চরাচরে,

সমুদ্র তরঙ্গ-ভঙ্গ

হয় যে মরুর অন্তরালে।

শুধু প্রাণে বস্তা বহে

সদানন্দ-হংকমলে,

ভক্ত আর ভক্তি-রসে

মূর্ত্ত হৃদি পারাবারে।

সজ্জগুর তোমার বিনা

অঙ্ককার এ হৃদয় কারা,

আবার এসো সজ্জগুর,

ডাকছে তোমায অশ্রুধারা।

আতি শ্রীশুনীল চৌধুরী

পাখীর ডাকে ঘুম ভাঙল খোকনের।

বিছানায় শুয়েই দক্ষিণের জানলাটা হাত বাড়িয়ে
খুলে দিল।

এক ঝলক্ ঠাণ্ডা হাওয়ার সঙ্গে মিষ্টি এক টুকরো
সকাল ছড়িয়ে পড়ল গুলোটা ঘরটায়। খোকন হুঁচোখ
রগড়ে তাকাল সামনের শিউলী গাছটার মাথায়।
ধানিক একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস
ফেলল। —নাঃ, আজো এলোনা পাপিয়াটা।

চমৎকার ডাকত পাখীটা—পিউ-পিউ করে। ঘুম
ভাঙত খোকনের ঐ ডাকে। আজও ভাদে, তবে
পাপিয়াটার ডাকে নয়—এমনি।

পাখীটা হয়ত আজও আসে। কিন্তু কোথায়, কোন
পাছটায় বসে আছে, তা জানে না খোকন। কেন যে
আসে না, তা ওর সামান্য বুদ্ধির পুঁজি উজাড় করে
দিয়েও হদিশ পায় না।

যেদিন প্রথম ঘুম ভেঙ্গে দেখল পাখীটা আসেনি,
সেদিন কেন যেন ওর মনটা বেজায় ভারী হয়ে উঠল।
ক'দিন অভিমান করে জানলা খোলেনি। পরে, মনটা
উদাস হয়ে ওঠায় আবার জানলা খুলে যথারীতি খোঁজে
পাখীটাকে।

পাশ ফিরল খোকন। বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা করছে
না আজ। যদিও এ সময়টা উঠতে ইচ্ছা করেনা কোন
দিনই। কিন্তু উঠতে হয় রোজ বাবার ভয়ে। বাবাকে
ঘরের মত ভয় করে খোকন।

পাশফিরেই দেখল খোকন, পাশের ঘরে মা তখনও
সুমোচ্ছে। কি মনে হ'তে খাট থেকে শুটি শুটি নেমে
পরদা সরিয়ে মার কাছে এল খোকন। ঘুমন্ত মা'কে
চমৎকার দেখাচ্ছে, রাশীকৃত কাল কুঁচবর্ণ চুল গুণের মত
সাদা নরম বালিশটায় ছড়িয়ে পড়ে আছে। ইচ্ছে
করলে খোকনের মায়ের গলা জড়িয়ে বৃকের ওপর একটু
চোখ বুজে ঘুমোয়।

স্পষ্ট মনে পড়ে খোকনের, মায়ের বৃকে এমন করেই
সুমোত। মা ওকে বৃকে চেপে ধরে চুমোর পর চুমো একে

দিত। বহুত ভাল লাগত ওর। কিন্তু এখন! মা যেন
কত পর হয়ে গেছে। অনেক অনেক দূরে সরে গেছে।

সেদিন ঠিক এমনই, মায়ের গলা জড়িয়ে শুয়ে পড়ে
ছিল বৃকের কাছে। হঠাৎ মায়ের ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ার
ধমকে ওঠে—বেলা হয়ে গেছে কত, এখনো পড়তে
বসি নি?

মায়ের এই রুঢ় ধমক খেয়ে নিজের ঘরে এসে ভেবে-
ছিল, মা বকলো কেন? এমন কি আর বেলা হয়েছে!
একদিন একটু বেশী ঘুমলেই কি আকাটা মুখ্য হয়ে যাবে?
মনটা ভীষণ ভার হয়ে উঠেছিল। —না, মা আর তেমন
ভালবাসে না তাকে।

কত কথাই না আজ মনে পড়ছে খোকনের। মা
কিন্তু এমন ছিল না। মায়ের কোলে বসে দুধ-ভাত খেত।
বেশ মনে আছে খোকনের, খুব বায়না করত ও। মা
তখন কত না সাধ্যসাধনা করত বাকি খাবারটুকু খেয়ে
নেবার জন্তে। মায়ের কোলের মধ্যে সুমোত। খুব
ভোরে পাখী ডেকে উঠলে খোকনের ঘুম ভাঙত। আর
তখনই মায়ের গলা ধরে টানটানি করত ঘুম ভাঙানোর
জন্তে! মা কিন্তু একটুও রাগত না। বরং ওকে বৃকের
মধ্যে টেনে নিয়ে বলত খোকন সোনা, আর একটু ঘুমো
বাবা। সকাল হ'তে অনেক দেৱী।

খোকনের দৌরাস্রা কিন্তু একটুও কমতো না। শেষে
বাবার ধমক খেয়ে চুপটি করে থাকত। মা তখন ওর
মুখের পানে তাকিয়ে মৃচকি হেসে বলত—কেমন জন্ম?

সন্ধ্যাবেলায় মা গান না গাহিলে ঘুম আসত না
খোকনের। মা তাই রোজ সন্ধ্যা বেলায় কত কি সব
গান গেবে ঘুম পাডাত। অজানা পর্রীর দেশে পাড়ি
জমাত খোকন।

হঠাৎ মায়ের ঘুম ভেঙ্গে গেল। খোকনকে খাটের
পায়া ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে প্রশ্ন করল—কিরে
খোকন? এমন দাঁড়িয়ে কেন? কিছু বলবি—

—না, এমনি। কি আর বলবে খোকন। অভিমানে ওর
ছোট্ট বৃকের কাছে যেন মন্ত এক পাথর চাপা পড়ছে।

মায়ের কাছ থেকে সরে এল পড়ার ঘরে।

বাবা খবরের কাগজ মুখে নিয়ে ঢুলছেন। খোকনের পায়ের শব্দে বাবা চোখ চেয়ে প্রশ্ন করলেন—‘বামুনদি’ এসেছে রে খোকন?

—না।

বাবা আবার চোখ বোজেন কাগজের আড়ালে।

সময়মত চা না পেলে এমনভাবেই ঢোলেন বাবা। এটা অবশ্য আজকাল ওর নজরে পড়েছে। আরও একটা জিনিষ বেশ বুঝতে পারে, বাবা মার সঙ্গে যেন আগের মত ভাল ভাবে কথাও বলেন না।

টেবিলে বই খোলাই পড়ে আছে। পড়তে ইচ্ছে করছে না আজ, বারে বারে মনে পড়ছে—সব কেমন যেন পাল্টে গেছে। মায়ের চাকরী নেওয়াটা কেউই যেন ভাল চোখে দেখছে না। কিন্তু কেন? জানে না খোকন।

ক’দিন আগে দিদিমা আর মাসী এসেছিল। ওঁরা এরকম প্রায়ই আসেন। কিন্তু আর বোধহয় আসবেন না। তেমন কথাই শুনেছে খোকন। দিদিমাকে বলতে শুনেছে—তুই চাকরী ছাড় তরু। সংসারের হালটা কি হয়েছে দেখেছিস। না হয় একটু কষ্ট করলি তবু তাতে শান্তি আছে।

—অশান্তিটা কি দেখলে? —মা বলল।

—অশান্তির কথা নয়। জীলোক সংসারের লক্ষী। ঘরকন্নার দরকার আছে। সারাদিন অফিসে কাটিয়ে কি আর সংসারের কাজ সুস্থভাবে করা যায় মা? না আরার কাছে দুধের শিশু মাহুঁষ হয়।

দিদিমার এই কথায় মা বেশ চটে উঠে কি সব যেন বলল। খোকনের সামান্য বুদ্ধির অগম্য সে বক্তব্য। তবে এটুকু বুঝল, দিদিমার সঙ্গে মায়ের মতের মিল হয়নি।

আর ঠিক এরপর থেকে দিদিমা, মাসীমণি ওদের বাড়ী আসা ছেড়েছেন। পাশের বাড়ীর মাসীমা মায়ার খুব বন্ধু ছিলেন। তিনিও আসেন না। অনেক ভেবেছে কেন—হৃদয় পায়নি।

ওঁদের সাথে সাথে মা’ও যেন অনেক দূরে সরে গেছে। কিন্তু আশ্চর্য, এই বাড়ীতেই তো আছে মা। আছে খোকনের ঠিক পাশের ঘরটায়। ব্যবধান মাত্র

একটা পরদার। তবু যেন কত দূর। এ দূরত্বটা বোঝে খোকন বিশেষ করে খাবার টেবিলে।

সকালে বাবা-মা খেতে বসেন টেবিলে। সে সময়টা ওর কাটে মাষ্টারমশায়ের কাছে। মায়ের পাশে বসে খেতে ইচ্ছে করে খোকনের, কিন্তু রাতে ছাড়া তা সম্ভব নয়। কেবল মাত্র রবিবার বা অল্প ছুটির দিন ওরা এক সাথে বসে যায়।

রাতে খাবার টেবিলে মাকে খুব ক্লান্ত দেখায়। কোন রকমে চাট্টি খেয়ে বিছানায় এলিয়ে পড়ে। খোকনের খাওয়া হল কি না, তা মোটেই জিজ্ঞাস্য করে না। মা অমন করে যখন উঠে যায়, খোকনের বুকের মধ্যে অভিমান হাহাকার করে উঠতে চায়, কিন্তু বাবার নির্বিকার মুখের দিকে তাকিয়ে ভয় পায় খোকন। কান্না—অভিমান চাপা পড়ে থাকে।

সারাদিনের মধ্যে সকালটা খোকনের কাছে বড় মধুর। এ সময় মা অফিস যায়। খাবার সময় ওর গালে ছোট্ট একটু চুমু দিয়ে যায় রোজ। কখনো কখনো মাষ্টারমশায়ের কাছে আটকা পড়ে এ সময়। সেদিনটা ওর কাছে বড় ছুদিন। কি যেন একটা না পাওয়ার বেদনায় মন ভার হয়ে থাকে।

দেখতে দেখতে ঋতুর পরিবর্তন হল শীত বিদায় নিচ্ছে কুয়াশার ধোঁয়াটে চাদর গুটিয়ে নিয়ে। মৃতপ্রায় ঘাসগুলো শিশির-স্নানে সজীব। গাছের পাতা-করা শাখা-প্রশাখায় সবুজের হাতছানি। নীল আকাশ মেঘ-মুক্ত দক্ষিণা হাওয়ায় প্রাণের স্পন্দন।

নানা জাতের পাখী দলে দলে উড়ে যায় নীল আকাশের বুকে—দিগন্ত রেখার দিকে। খোকন তাকিয়ে থাকে ওদের দিকে। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় পাখীগুলোর মত নীল দিগন্তে ডানা মেলে ভেসে বেড়ায়।

বামুনদিকে প্রশ্ন করে—মাসী, ঐ পাখীগুলোর মা আছে।

—হ্যাঁ! মা ওদের সঙ্গেই থাকে।

—সত্যি!

—হ্যাঁ গো। মা-ই তো ওদের উড়তে শেখায়—খেতে শেখায়।

শ্রীঅরবিন্দের দিব্য জীবন-দর্শন

অধ্যাপক শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য্য

আর্য্য প্রজ্ঞার পূর্ণ আধার আচার্য্য-পুরুষ শ্রীঅরবিন্দজী। অনেক স্থলে উপনিষদ্ বাক্য উদ্ধৃত করে তিনি দেখিয়েছেন যে, জড় হতে চেতন উদ্ভূত হয়েছে—জড়বাদিগণের এরূপ সিদ্ধান্ত হলেও—চেতন যে অচেতন হতে উৎকৃষ্ট—এ বিষয়ে কোন বিবাদ উঠতে পারে না। জড়ের পূর্বে বা তার মূলে যে চেতন ছিল তা প্রত্যক্ষবাদী স্বীকার করেন—কিন্তু এই ভ্রান্ত মতবাদের উপর প্রচণ্ড আঘাত এসেছে ‘দিব্যজীবন’ দর্শন হতে। ক্রান্তির বাণী—হিরণ্যগর্ভ অগ্রে বিরাজ করেন—তিনি জাত হয়ে সকল সৃষ্ট পদার্থের একমাত্র প্রভু হন। চৈতন্য স্বপ্রকাশ, জড়ের প্রকাশক—ইহা স্বীকার করলেও, উহা যে জড়ের প্রভু এবং উহা আগে হতে না থাকলে জড়বিবর্ত অসম্ভব হত—এখানেই জড়বাদীর আপত্তি। এ আপত্তি যে হঠকারিতা বা dogmatism মাত্র তার অখণ্ডনীয় বৃত্তি রয়েছে। বিবর্তের অর্থ অপকৃষ্ট হতে উৎকৃষ্ট রূপের উদ্ভব—কিন্তু অপকৃষ্টের ভেতর যদি পূর্ব হতে এটি না থাকত তাহলে উৎকৃষ্টের আবির্ভাব কি সম্ভব হত ? “The higher emerges from the lower because it is eternally present in the lower, is immanent in it”—নিম্ন স্তরের ভেতর উচ্চস্তর চির-

বিদ্যমান, তাতে অমুখ্যত—তাই এর আবির্ভাব সম্ভব হয়েছে। জীব-বিবর্তের ধারা বা ক্রম হ’তেও এটা প্রমাণ হয়। চৈতন্যের প্রেরণা বা নির্দেশ না থাকলে জড় হতে উদ্ভিদ, উদ্ভিদ হতে প্রাণী, স্থূল হতে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় আর পরিশেষে মনের সৃষ্টি—এটা কি সচেতন পরিকল্পনা ভিন্ন সম্ভব হ’ত ? বৈজ্ঞানিক বিবর্তবাদে যে অসংগতি বা paradox তার স্বরূপ এই—“No intelligent cause, no aim, no raison d’etre but simply an automatic deployment, a combination, a self adaptation of means to ends without any intention in the adaptation”—বুদ্ধিপ্রযুক্ত কোন কারণ নেই, কোন লক্ষ্য, কোন ঘটনার হেতু নেই অথচ আপনা আপনি যন্ত্রপ্রায় উপাদান নিযুক্ত ও মিলিত হচ্ছে, উপায়টি উদ্দেশ্যের আপনা হতে উপযোগী হচ্ছে, অথচ এই খাপ খাওয়ানোর ব্যাপারে কোন বোধ বা অভিপ্রায় নেই। জড় প্রকৃতির যে পরিণাম বিজ্ঞান বিবৃত করে—তাতে যে পর্বভেদ, যে ক্রম, যে নব নব রূপ এসে দাঁড়িয়েছে—চিৎসক্তির প্রবর্তনা এবং teleology লক্ষ্যাত্মিমুখী গতি বাদ দিলে তা বুঝা যায় না। এই পরম্পরায় বরাবর প্রাণের একটা

—মা ওদের খুব ভালবাসে, তাই না মাসী ?

—ঠিক বলেছ।

হঠাৎ মা’র কথা মনে পড়ে। ওরও মা আছে। কিন্তু তবু যেন নেই। কেমন যে ফাঁকা ফাঁকা মনে হয় সব।

সেদিন ঘুম ভাঙল খোকনের অনেক সকালে। বাড়ীর কেউ জাগেনি। বাইরের বাগানে পাখীর কলকাকলি। বিছানায় উঠে বসে দক্ষিণের জানলা খুলে দিল। এক ঝলক আলো আর মিষ্টি ঝিরুঝিরে হাওয়ার সাথে পরিচিত পাখীর গান নিঃসঙ্গ ঘরের কোণে কোণে ছড়িয়ে পড়ল।

উৎসুক খোকন ঘুম জড়ান চোখ রগড়ে জানলার

গরাদ ধরে তাকাল নোতুন পাতা-গজ্ঞান শিউলী গাছটার মাথায়। পাতার ফাঁকে পাপিয়াটা বসে ডাকছে—গান গাইছে। অবাক হল খোকন! পাপিয়াটা তবে ফিরে এলো! নিশ্চের চোখ দু’টোকেও বিশ্বাস হয় না।

ভাল করে কান পাতলো খোকন। আর একবার চোখ রগড়ে তাকাল। হ্যাঁ, সত্যিই তো গান গাইছে পাপিয়াটা! এতো, পাতার ফাঁকে ফাঁকে ল্যাজ নেড়ে লাফিয়ে উঠছে যগ ভালটায়!—পিউ।

অদ্ভুত আনন্দে মনটা ভরে উঠল খোকনের!

হঠাৎ কেন যেন মনে হ’ল—আঃ অমন করে মা’ও

যদি আবার ফিরে আসত!

প্রথম প্রমাণ হয়—সেটা হচ্ছে চিংশক্তি ও তার ক্রিমার অহঙ্কুল দেহবস্ত্র বা নাড়ী তন্ত্রের নির্মাণের দিকে। Human Destiny (মানব নিয়তিতে) Dr. Nony পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করেছেন যে, man was willed—মাহুয়ের আবির্ভাব প্রথম হতে সংকল্পিত ছিল। জড়বাদ আর প্রত্যক্ষবাদ পুরাতত্ত্ব ছেড়ে দিয়ে শুধু দিগ্‌মাত্র দেখার দুরাগ্রহবশে মানবচিন্তাকে যে বিভ্রম, যে আঁধার, যে অসত্যে নিয়ে যায়—শ্রীঅরবিন্দের বাণী তার বলিষ্ঠ প্রতিবাদ ও সংশোধক।

শুধু প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করা অসম্ভব—মহুয়া সমাজের ব্যবহারই এর বিপরীত। ভাবনা (Ideation), কল্পনা (Imagination), অহুমান (Inference) এবং স্মৃতি (memory)—মনের চারটি বৃত্তি—অতীন্দ্রিয়। শিল্পবোধ (Aesthetic), তত্ত্বজিজ্ঞাসা (Intology), আত্মোন্নতির আশ্পৃহা (Sipritual Aspiration)—এ সকলের ভিত্তি প্রত্যক্ষ নয়—অতীন্দ্রিয়। বৈজ্ঞানিকেরও কাম্য—জড়ের সম্বন্ধতা বা সাযুজ্য পাওয়া নয়—কিন্তু চেতনার পুষ্টি। বিপ্লবী ও সমাজ সংস্কারকের মনোভাব ও প্রচেষ্টা অপ্রত্যক্ষ আদর্শের আকর্ষণে জন্মে। চৈতন্তের প্রাধাত্য সর্বজনের স্বীকৃত—কারণ জড়ের সাধে পরিচয়, জীবনের মূল্যায়ন (Sense of Values), সৃষ্টির অর্থ, সংসারের উদ্দেশ্য এর মাধ্যমেই নিষ্পন্ন হয়—তা না হলে নিখিল বিশ্ব কে জানত, কে প্রয়োজনে লাগাত? জগতের তাৎপর্য ও সার্থকতাই হল চেতনার স্ফুরণ। এর মূলে আছে চিং এবং প্রপঞ্চের উজ্জ্বল চিদ্বিলাসের সাধন। এই তথ্যের বনিয়াদে অধ্যাত্মবিচার, রহস্যবিজ্ঞান (Occultism), ধর্ম সাধনার প্রতিষ্ঠা। উপনিষৎ এই তত্ত্বের উদ্বোধক—যন্মিন বস্তাঃ পৃথিবী চাস্তারক্ষমেতেং মনঃ সহ প্রাণেশ সর্বেঃ। তামবৈকং জানথ আত্মান মচ্চা বাচো বিমুক্তং অমৃতম্যেব সেতুঃ। যাহাতে ছালোক, পৃথিবী, অস্তরীক্ষ, মন এবং প্রাণের সকল প্রকাশ প্রবিষ্ট, সেই আত্মাকে জানো, অস্ত্র কথা পরিহার কর—অমৃতত্বের এই সেতু। যুগে যুগে বিজ্ঞানবন পুরুষের আবির্ভাব হয় এই আত্ম-মহিমার প্রতিষ্ঠার জন্তে। যোগিপ্রবর শ্রীঅরবিন্দের

সিদ্ধি—চিংশক্তির বিজয়-বার্তা মানব পরিবারের অন্তর উদ্ভুদ্ধ করেছে। ব্রহ্ম অগম্বুল, মায়ার রচনা এই নিখিল—ব্রহ্ম পরিণাম। তাঁর আত্মজীবন সারস্বত সাধনার সারতত্ত্ব প্রতিপন্ন করেছে—ঐতদাত্ম মিদং সর্বং—অখিল বিশ্বের এই আত্মা, আত্মাই সর্বভূত—সর্বভূতে আত্মা এবং আত্মাতে সর্বভূত। এই জীবন দর্শনের বিশেষত্ব হচ্ছে—এর ব্যাপকতা ও সমগ্রতা। তাই একে বলা হয় সম্যকদর্শন, চিদ্বৈতবাদ, পূর্ণাঙ্গতবাদ, পূর্ণপ্রজ্ঞা। অধ্যাত্মচিন্তার ইতিহাসে এটি অপূর্ব—কারণ পূর্বতন সকল মতবাদের এখানে পরিপূর্তি। দৈশার উক্তি—আমি এসেছি পূরণ করতে, বিলোপ করতে নয়—তারি এ প্রমাণ। কোন মতের উচ্ছেদ নয়, প্রত্যেকের অন্তরে বা সত্য সে সব মিলিয়ে অধ্যাত্ম-সিদ্ধান্তের এক বিশাল সৌধ—a house of many mansions—অনেক মহলের প্রাসাদ এখানে দাঁড়িয়েছে। নিগম ও আগম, সাংখ্য ও যোগ, শুক্তবাদ ও মহাবান, মরমিয়া সাধনা হতে মনোবিকলন ও মনস্তত্ত্ব পর্যন্ত অন্তর্জগৎ ও অধ্যাত্ম সন্ধানের সমীক্ষা ও জুয্যার এটি রচনা। অস্ত্র সিদ্ধান্তের যেখানে পার্থক্য দেখান হয়েছে—সেখানেও তার মধ্যে যে সার সত্য ও তার প্রাপ্য যে জ্ঞাত্য মর্যাদা, তা প্রতিপাদন করে একটি প্রশস্ত পথ দেখান হয়েছে। যুগের পর যুগ অগণিত তার যাত্রী, জ্যোতির্ময় তোরণের পর তোরণ পার হয়ে তারা চলেছে। অগম্য রহস্যের ভেতর হ'তে হাতছানি দিয়ে ডাক আসছে—এর অন্ত কোথায়? আত্মবিদ্যা, বিশ্বপরিচিতি, ব্রহ্মজ্ঞানের হেথা সমন্বয়। এই বিজ্ঞানে মনোজগতের যত দ্বৈত ও স্বন্দের নিরাস। এক-ও বহু, সত্ত্ব ও নিষ্ঠুর, বিদ্যা আর অবিদ্যা, জড় ও চেতন, মোক্ষ ও সংসার, মূর্ত ও অমূর্ত, যোগ এবং ভোগ, সাধনা ও শরণাগতি ইত্যাদির সমাধান ও সমন্বয় স্বচ্ছ দৃষ্টি ও উদার বীশক্তি দ্বারা নিষ্পন্ন হয়েছে। চিদ্বৈতবাদ সেই সিদ্ধান্ত যার মুক্ত স্বদয়পটে সকল তত্ত্বের অবিরোধে স্থান হয়—এখানে যুক্তিপূর্ণ চিন্তা আপনার সত্যস্বরূপ জেনে প্রসার ও প্রসাদ লাভ করে। পরমাত্মার পরাপ্রকৃতি—জীবভূতা যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ এটি মাহুয়ের প্রকৃত স্বরূপ—মনোময়ঃ প্রাণ শরীর নেতা।

কিন্তু সচরাচর এর স্বরূপ নয় বিরূপই চোখে পড়ে। এর সকল অহুতব খণ্ডবোধে জর্জরিত। চেতনার খণ্ডতায় এ অপূর্ণ, বিদ্যার খণ্ডতায় এ অন্ধ, আনন্দের খণ্ডতায় এ ছুঃখী, শক্তির খণ্ডতায় এ পঙ্গু, ঐক্যবোধের ক্ষমতার এ বিরোধ-কটকিত। এ অবস্থার তখনই পরিবর্তন হতে পারে যখন আপন বুদ্ধির ক্রটি বোধি (Intuition) এর সাথে মিলিয়ে ও পূরণ করে মানুষ বিস্তার প্রত্যয়ে অবিদ্যার আধার দূর করবে। মনকে সম্পূর্ণভাবে বুঝলেই দিবজীবনে উর্ধ্বারান (Sublimation) সম্ভব হয়। ব্যক্তিচেতনা সমুদ্রে নিমজ্জিত তুষার শৈলের মত—এর অধিকাংশ জলের তলে—সেটা অন্তঃচেতনা। সেই অন্তঃচেতনার বেশীর ভাগ দখল করে আছে অধি-চেতনা স্বপ্নপুরুষ, অর্ঘ্যপুরুষ এবং মনোময়পুরুষের আশ্রয়। এই অধিচেতনা শক্তির আধার ও যন্ত্র—বিশ্ব-সত্যের বাহন। অধিচেতনা আর জাগ্রত চেতনা—এ দুয়ের মাঝে অবচেতনা—এতেই জাগ্রত স্বপ্নের নানা বিকার দেখা যায়। এই তুষার স্তূপের সকল দিকে এবং উপর ও নীচে এক অতল সমুদ্র—সেটি দৈবী মায়ী বা অদ্বিতি চেতনার পরিমণ্ডল। ব্রহ্মোক্তি পরমাত্মেতি, ভগবানিতি শব্দ্যতে—যার নির্দেশক—সেই ব্যাপ্তিচৈতন্য তুষার শৈলের শৃঙ্গে সংহত—Concentrated—এটি হচ্ছে আত্মা। জীব হল অদর্শ মায়ী—অজ্ঞান বা অবিজ্ঞা দ্বারা আচ্ছন্ন—কারণ এর দৃষ্টি সনস্তুটা দেখে না। খণ্ড-দর্শন বা ভেদদর্শন টুটে যায় সম্যকদর্শন বা অদ্বৈতদর্শন হলে। অবিদ্যার সাত প্রকার—তাই সপ্তপর্বা এর নাম। দিব্য দর্শনে মনোময় মানুষকে স্পষ্টভাবে বিভাজন করা হয়েছে। এবং খণ্ডিত চেতনার উর্ধ্বায়ণ কল্পে সম্ভব—যোগিচিন্তের নিপুণ অহুতবের দ্বারা দেখান হয়েছে। উর্ধ্বায়ণ বা উৎকর্ষ জীবের নিজ প্রযত্ন এবং অতিমানসের অবতরণে নিষ্পন্ন হয়। এই পরিণাম হচ্ছে সৃষ্টির নিয়তি-নির্দিষ্ট অভিপ্রায় বা তাৎপর্য। অবিদ্যার ভেতরই বিদ্যার দিকে উন্নত হবার বেগ রয়েছে। জড়ের চিন্ময় রূপান্তর ব্রহ্ম পরমাত্মার সংকল্পিত—যেমন বিবর্তের মধ্যে উহার চেতনায় পরিণত হবার ক্রিয়া চলেছে। এই যে পাশাপাশি আরোহ ও অবরোহের ক্রম—কন্স-

রেখার মত যোগিচিন্তের অহুতবে আসে। এই spiralling—উর্ধ্বাবর্ত দ্বিধাযুক্ত বিশেষ। মানুষ দেবতার উদ্দেশ্যে করছে উৎসর্গ—দেবতাও বিশ্বস্তি আনন্দে মানুষের দিকে নেমে আসছেন। বৈদিক পরি-ভাষায় এটি অগ্নিসোম নীলা—অগ্নিশিখা উপরে উঠছে—সোমের ধারা নীচে পড়ছে। এই বিনিময় হতে চেতনার Sublimation বা উর্ধ্বায়ণ। সত্তার দুটি বিভাগ—তুই গোলাধের মত—উত্তর ও অবর। উপর গোলাধে—সং, চিং, আনন্দ আর অতিমানস বা Supermind। অধোগোলাধে—দেহ, মন, প্রাণ এবং অধিমানস বা Subliminal mind। অধিমানস ভূমিতে মানব-চিন্তের পরমোৎকর্ষ। মনের উত্তরায়ণ চার সোপান—চারটি স্তর দিব্যজীবনে নির্দেশিত হয়েছে—উত্তর মানস (Higher mind), বোধিমানস (Intuition), প্রভাস মানস (Illumined mind), অধিমানস (Over mind)।

অশ্রুত বলা হয়েছে—উৎকর্ষের ক্রম হচ্ছে—চৈতন্য (Psychic), অধ্যাত্ম (Spiritual) আর অতিমানস (Supramental)। অতিমানস দশার এই বিবরণ সাধনা ও সূক্ষ্ম অহুতব-সাপেক্ষ যোগশাস্ত্রের প্রতিভা সংবিলম্বিত কেবল শব্দ জ্ঞান বা সাহিত্যবোধের দ্বারা সম্ভব নয়। যোগীভ্যাস হতে নাড়ীতন্ত্রের সূক্ষ্মতা ও বিভূতি উদ্ভূত হয়। চিন্ময় রাজ্যের এই অগম রহস্য অপূর্ব বৌদ্ধিক বিচারশক্তি এবং সাহিত্যপ্রতিভার বলে প্রকাশ করেছেন শ্রীঅরবিন্দ। এই অতিমানস উপলব্ধির বর্ণনায় তাঁর মনীষা দিব্য বোধের সাথে কবিত্বের উল্লাসের চরম স্তরে পৌঁছেছে। হিরণ্যমেন পাক্ষেণ সত্যস্বাপিহিতং মুখম্। মানব বিজ্ঞান এবং পরমার্থতত্ত্ব এ দুয়ের মাঝে যে স্বচ্ছ স্বর্ণময় পাত্র বা পরদা ক্রটিতে বর্ণিত হয়েছে—তার উন্মোচন করেছেন অল্পম অধ্যাত্মশক্তি দ্বারা। মদাত্মা সর্ব ভূতাত্মা। এই অতিমানস সত্তাকে বলা হয়েছে ঋতচিং—কারণ এতে দৃষ্টি ও সৃষ্টি অভিন্ন হয়ে যায়—সংকল্প আর সিদ্ধির মাঝে ব্যবধান থাকে না। নিরঞ্জন সাথে পরম সাম্য লাভ হয়। সকল বৈত এই দশায় ঘুচে যায়। অন্ধকার চলে যাওয়ায় নিরন্তরমমো ন দিবা ন

রাত্রিঃ ন সন্ ন চাসন্ শিব এব কেবলঃ—দিনও থাকে না রাত্রিও থাকে না—সজ্ঞা ও অসজ্ঞা দুই সেরে যায়—শিব মাত্র অমৃতবে জাগে।

অধ্যাত্ম বিচার তিন বিভক্ত বা facets প্রাচীনকাল হতে লক্ষ্য হয়েছে—ধর্মসাধনা (religious discipline), রহস্য বিজ্ঞান (mysticism) এবং অধ্যাত্মবিচার (spiritual inquiry)। অধ্যাত্ম বিচার অপর দুটিকে সাধারণ বুদ্ধির গোচর করে। অধ্যাত্ম বিচার এই তিন বিভাগের সমন্বয়ের জন্ত বরাবর এদেশে প্রযত্ন হয়ে এসেছে। পূর্ণাঙ্গ যোগমার্গ এবং মাহুয়ের চিন্ময় বিবর্তনের এক সুস্পষ্ট ধারা ভারতবর্ষে এইভাবে দেখা দিয়েছে। এরই সম্পূর্ণ এবং অপূর্ণ পরিণতি যোগিপ্রবর শ্রীঅরবিন্দের চিদৈক্যবাদ এবং দিব্য জীবনদর্শন। বর্তমান যুগে নতুন ধরণে জীবন সমস্তার চিন্তা-চর্চা আবশ্যক হয়েছে। কারণ আধুনিক সভ্যতা দক্ষ প্রজাপতির সামর্থ্য দেখাতে পারলেও শিব বা মঙ্গলের সাথে বিযুক্ত হওয়ায় এবং অধিনায়কগণ ছাগবুদ্ধি হতে নিমুক্ত নন—বৈষয়িক কল্যাণ (economic welfare) দাঁড়িয়েছে মানবের পরম পুরুষার্থে। তার এই প্রকৃতি বদলাবে না অথচ জীবনের রীতি পদ্ধতি পরিবর্তিত হবে—এটা জড়বাদীর বিশ্বাস।

এই পরিস্থিতিতে শ্রীঅরবিন্দের বাণী ভারতের শাস্ত্র প্রজ্ঞার বাণী। তাঁর প্রাণ হিন্দুস্থানের হৃৎ স্পন্দন। যুগে যুগে প্রাহুভূত ভারতের মহামনস্বী সন্তান পরম্পরায় তাঁহার মহোচ্চ স্থান। পাশ্চাত্য কোন কোন মনীষীর মতে আর্থ সংস্কৃতির ভেতরে বরাবর জগৎ ও জীবনকে অস্বীকার করার, ত্যাগ করার প্রবল বেগ দৃঢ়বদ্ধ হয়ে রয়েছে। দিব্য জীবন দর্শন সংসার ও প্রাণ স্ফুর্তি (world and Life) সম্পর্কে affirmation স্বীকার এবং negation প্রত্যাখ্যান—এই দুই প্রেরণার সামঞ্জস্য দেখা যায়। কারণ তাঁর দৃষ্টি ছিল উষাকালীন শিশির-বিস্মর মত স্বচ্ছ এবং দিব্য আলোকে উজ্জ্বল। অসীম গগনের প্রতিচ্ছবি এতে বিদ্যুত। ভারত চিরদিনই ভূমার দেশ—যুগে যুগে প্রাহুভূত এর মহাপুরুষগণ জগৎ সমক্ষে সর্বাপেক্ষা মহৎ ও বৃহৎ তত্ত্ব উপস্থিত করেছেন। সম্যক দর্শন (Integral vision), যোগ সমন্বয় (Yoga

of synthesis), পূর্ণব্রহ্মবাদ, চিদৈক্যত সিদ্ধান্ত,) অতি-মানসের প্রেরণায় উর্ধ্বায়ন (supramental sublimation)—সেই চিরন্তন জাতীয় প্রতিভারই নিদর্শন। এই ভূমার জিজ্ঞাসা ও স্বীকার গীতার বিবৃতিতে পুরুষোত্তম তত্ত্ব ও আত্মসমর্পণ যোগে উপনীত হয়েছে। বাহুদেব-ময়ং জগৎ এবং জগৎ ব্রহ্মপরিণাম—অভিন্ন তত্ত্ব। ক্ষর ও অক্ষরের অতীত যে পুরুষোত্তম তত্ত্ব তিনি প্রতিপাদন করেছেন সেখানেও মহাশয় মনের বর্দ্ধমান ঐক্য ভাবনার অগ্রে ও উপরে পর তত্ত্বে ব্রহ্মশক্তির ক্রিয়া ও নিষ্ক্রিয়া, নিষ্পন্দ ও উল্লাস দুয়ের মিলন সিদ্ধ হয়েছে।

এই ব্রহ্মশক্তিকে শ্রুতিতে তপঃ বলা হয়েছে। সৃষ্টির আদিতে ঋত ও সত্য জলন্ত তপস্জ্বা হতে উৎপন্ন হয়েছিল—এটি নিত্য অরণীয় মন্ত্র। নিখিল বিশ্বে যা-কিছু ঘটে তা ব্রহ্মের চিন্ময় তপঃ-এর পরিণাম। যেমন সূর্য ভগবান হ'তে সৌরমণ্ডলের সমস্ত ব্যাপার নিষ্পন্ন হয়—তেমন অগণিত ব্রহ্মাণ্ডের মূলে এক সবিভা এবং তাঁর তপঃশক্তি সাবিভী। বিরাট কল্পনা ও বাগ্‌বিস্তৃতি সাবিভী মহাকাব্যের হিম্মোলহরীতে এই মহাভাসকে মূর্ত করে তুলেছে। এইভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির সকল অবদান—শ্রুতি, তত্ত্ব, পুরাণ, দর্শন—যিনি আশ্রয় করেছেন এই বিপুল ঐতিহ্যের যিনি উত্তরাধিকারী—তিনি এই মহাভারতের বরণ্য সন্তান। ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি—ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মস্বরূপ হন—এই হয়ে জানাই বিজ্ঞান—এতেই অভেদ বা তাদাত্ম্য আনে। মহামনাঃ শ্রীঅরবিন্দ সেই মানসপুত্র—যাঁর সম্বন্ধে বলা যায়—অপাদজাং প্রভবসি হৃদয়াদভিজ্ঞায়সে আত্মা বৈ পুত্রনামাসি। এজন্ত ভারতের অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি ছিল স্বচ্ছ ও অত্রান্ত। চীনের অভিযান এবং তার অভিসন্ধি বিষয়ে সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর ভবিষ্যৎবাণী এর প্রমাণ। আর প্রমাণ তাঁর উক্তি—জাতীয়তা আমাদের ধর্ম আমি বলি না—বলি সনাতন ধর্ম আমাদের জাতীয়তা।

শ্রীঅরবিন্দের বাণী শুধু ভারতের মাহুয়ের জন্ত নয়—এর উদ্দেশ্য বিশ্বমানবের উর্ধ্বায়ন। আত্মাতীক্ৰম self transcendence—এর আত্মান চারদিকে ধ্বনিত হচ্ছে। বৈজ্ঞানিকগণও Transhumanism বা অতিমানবতার

বৈদিক প্রার্থনা মন্ত্র

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী

ও আপ্যায়ন্ত মমাজানি বাক্ প্রাণশক্ষুঃ শ্রোত্রমথো
বলমিচ্ছিয়ানি চ সর্বানি, সর্বং ব্রহ্মোপনিষদং মাহং ব্রহ্ম
নিরাখুৰ্য্যং মামা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরনমন্তনিরা করণং
মেহন্ত, তদাঙ্গানি নিরতে য উপনিষৎসু ধৰ্ম্মান্তে ময়ি সন্ত
তে ময়ি সন্ত। ও শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ও ॥

আমার সমস্ত অঙ্গ—বাক্, প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ ও মন
প্রকৃতি সমুদয় অঙ্গের ও সমুদয় ইন্দ্রিয়গুলির আপ্যায়ণ
হউক, পরিপুষ্ট হউক। উপনিষদে যে ব্রহ্মের জয়গাথা
আছে সেই ব্রহ্ম হইতেই সৃষ্টির সমস্ত কিছু উদ্ভব
হইয়াছে। আমি যেন ব্রহ্মকে নিরাকরণ না করি অর্থাৎ
হৃদয়ে যেন তাঁহাকে অমু্ভব করিতে পারি। ব্রহ্মও
যেন আমাকে প্রত্যাখ্যান না করেন, আমার হৃদয়ে
আবেশরূপে সদা জাগ্রত থাকেন, আমাদের পরম্পরের
সম্বন্ধ যেন চিরস্থায়ী হয়। ব্রহ্মে নিয়তযুক্ত আমার
মাঝে ওপনিষদিক ব্রহ্মবিদ্যা স্ফুরিত হইয়া উঠুক।
ও শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিস্তম্।

আপ্যায়ন্ত মমাজানি ইচ্ছিয়ানী চ সর্বানী—বৈদিক
সাধনার দুইটি ধারা। একটি আপ্যায়ণ আর একটি
নিরোধ। একটি বেদান্তের সাধনা আর একটি সাংখ্যের

সাধনা। প্যায় ধাতু হইতে আপ্যায়ণ শব্দের উৎপত্তি।
প্যায় ধাতুর অর্থ—জাগ্রত করা, রূপান্তরিত করা,
মহিমান্বিত করা। আমাদের সীমিত দেহ মনে আছে
অসীমের ব্যঞ্জনা। আমাদের এই দেহই হইবে দেব দেহ।
এই দেহের দ্বারা আসিয়া মদন ভণ্ড হইয়া যাইবে,
দেহটি হইবে তখন মদনমোহনের লীলাভূমি। দেহের
প্রত্যেকটি অঙ্গপরমাণুতে, দেহের প্রত্যেকটি শিরা উপ-
শিরায় প্রবাহিত হইবে প্রেমের মন্ডাকিনী। এমন
ভাবেই মর্ত্য দেহ রূপান্তরিত হয় দেব দেহে।

আমাদের এই দেহটীও একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। এই
দেহের মাঝেই আছে উর্ধ্বলোক ও অবরলোক, পার্শ্ব
লোক, দেবলোক ও ব্রহ্মলোক। হুতরাং আমাদের
দেহও ব্রহ্মপুর, ব্রহ্মের আবাসস্থল। এই দেহের মাঝেই
ঘটে দেহাতীতের আবির্ভাব। এই মূন্ড দেহ ভূমান্বুরূপ—
ব্রহ্মের সংস্পর্শে ভাবদেহ চিম্বয় দেহে রূপায়িত হয়।
কায়ন্তক দ্বারা এই কায়ান্তেই ব্রহ্মের আবেশ, ব্রহ্মের
আবির্ভাব অমু্ভব করিব। ব্রহ্মের সংস্পর্শে দেহও হইবে
ব্রাহ্মীতম্। এই তম্ হইবে শুদ্ধম্, অপাপবিদ্ধম্—ইহারই
নাম অঙ্গের আপ্যায়ণ।



আগম প্রয়োজন নির্দেশ করছেন। কিন্তু দিব্যদর্শী মহা-
মানবের লেখনীমুখে প্রকাশ পেয়েছে ভারতীয় প্রজ্ঞার
বিশেষত্ব—অতিমানসের আশ্রয় afflatus বা অবতরণে
বা নিষ্পন্ন হয়—তাকেই যথার্থ অধ্যাত্ম অভ্যুদয় বলিয়া
স্বীকার। দিব্যজীবন তারই আচ্ছান। জ্ঞান বুদ্ধি
(Logical Reason)-এর উল্লে'বোধি (Intuition)
এবং শুভ বুদ্ধি (Redemptive Sanity)-র স্থান এ
দুয়ের বনিয়াদের উপর মনুষ্যসমাজের জীবন ও তার
সংহতির প্রতিষ্ঠা প্রকৃত কণ্যাণের নিদান। এই আচ্ছান
১৯২৬ সালের ২৪শে নভেম্বর যোগিরাজ অধিমানস
চেতনার অবতরণ ব'লে ঘোষণা করেন। এবং ১৯৫৬
সালের ২৯শে মার্চ তাঁর পূর্ণ বিজয় দিবস বলে গণ্য হয়।

এই দেবজন্মের আদর্শ বিশ্বজন অঙ্গীকার করবে এবং এর
জ্ঞান সাধনা সারা পৃথিবীতে সমৃদ্ধ ও ফলপ্রসূ হবে—সেই
বিরাট জাগরণের এই প্রথম পর্ব। উৎকর্ষ Perfection
প্রকৃতি পরিণামের নিয়তি। সৃষ্টি রহস্যের উদ্ভেদ ও
উদ্বোধ এর উপায়। এই পারার্থবাদ শুধু প্রকৃতি
পরিণামেই লক্ষিত হয় না। ইতিহাসের অগ্রগতি সম্পন্ন
হয়েছে পরার্থে ত্যাগী তপস্বীর জীবনের ধারা নিয়ে।
শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মবিহার, ঈশার আনন্দোৎসর্গ, শ্রীচৈতন্যের জীব
প্রেম, শ্রীরামকৃষ্ণের ঐক্যবাণী এই ভগীরথ ধারাকে বিশ্ব-
মানব সমুদয় তীর্থের দিকে এগিয়ে দিয়েছে। আন্তিঃ
প্রপত্তে খিল ভাজ্যমন্তঃ স্থিতো যে ভবত্য দুঃখাঃ—এই
মন্ত্র ও তার বিজয়বার্তা। শ্রীঅরবিন্দ দর্শনের মূল মর্ম্ম।

সজ্জগুরু

শ্রীকুম্ভদরঞ্জন মল্লিক

গুহা তক্তি, গুচিতা শক্তি
এনে দিলে বাঙলায়,
তোমার মতন মানুষ এখন
গোটা এ ভারত চায়।

নিষ্ঠা এবং সুদূর দৃষ্টি
তাবের ভগ্ন করেছেন স্রষ্টি,
রস ভূষিষ্ঠ কপ্তজীবন
নতুবা কি গড়া যায়।

হে মহাপুরুষ, হে প্রবর্তক—
তোমাকে নমস্কার,
কর্ম এবং পূজায় তুমি যে
প্রভেদ রাখনি আর।

তুমি বাঙলাকে করিয়াছ বড়,
বিশুদ্ধতর উন্নততর
লৌকিক সাথে অলৌকিক
করিয়াছ একাকার।

স্বামী-স্ত্রী সংবাদ

শ্রীনরেন্দ্র দেব

মানুষকে যদি অবতার ভেবে চরণ ধরি,
অপরাধ বলে মনে করো কেন হে স্তম্ভরি।
মানুষকে আমি পূজা করি সখি, ঠাকুর জেনে;
প্রাণ আছে তার, ভাষা আছে মুখে, ভক্তে চেনে।
তুমি যদি ভাবো মাটির প্রতিমা ঠাকুর তব,
প্রাণ নেই যার, ভাষা নেই কিছু—জরদগব।
কাতর কণ্ঠে ডেকে ডেকে তারে পাও কি সাড়া,
কী লাভ তোমার হয় বলে তাকে—হতাশা ছাড়া।
আমার দেবতা বলে কত কথা, স্তনিয়া স্বামী,
তোমাকে তো দেখি ভাসো আঁখিজলে নিয়ত স্থানী।
দেখা না পাওয়ার বেদনা তোমায় কঁদায় নিতি,
আমি তো ধনু সজীব প্রভুর লভিয়া প্রীতি।
আমার দেবতা চাক্ষুষ সদা সামনে থাকে,
কৃপা পায় তাঁর ভক্ত যে জন জানায় তাকে।
তোমার ঠাকুরে দেখা দাও বলে যতই ডাকে
বধির তোমার মাটির দেবতা শুনবে নাকো।
কাঠ খড় মাটি পাথরে গড়া মূর্তি ছাড়ো,
জড়পদার্থ জড়িয়ে তো প্রেম হয় না গাঢ়।
সাক্ষাৎ মোর ঠাকুরকে প্রিয়ে তক্তি করো
পূর্ণ হবেই মনোরথ যদি চরণে ধরো।

নীলাকাশের পাখী

শ্রীকালিদাস রায়

কুলায়ে যে শুনছ কলধ্বনি,
তা'ত পাখীর ভোরের জাগরণী;
শাবকদের সোহাগ করে তায়,
ওকে পাখীর গান বলা কি যায়।
মুকুণিত রসাল শাখায় থেকে
সকাল হতে ক্লাস্ত ডেকে ডেকে,
ভুল করে তায় আমরা বলি গান,
ওতো পাখীর প্রিয়ারে আস্থান।
খাঁচার পাখী ডাকছে অনিবার,
কুণ্ডায় কিনা ঝোঁক কে রাখে তার।
সে ডাকে তো জুড়ায় নাকো কাণ,
আর্দ্রনাদেই আমরা বলি গান।
শরৎ প্রাতে নীলাশ্বরের তলে
কলকণ্ঠে ডাক দিয়ে সে চলে।
দিগ্দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে সুর,
তাইত পাখীর সঙ্গীত মধুর।
খাঁচার পাখী পরের তকুমাধারী—
তরুর শাখায় প্রেমিক বা সংসারী,
নীল আকাশে পথের বাউল বৃষ্টি,
গান ছাড়া তার নেইক কিছুই পুঞ্জি।

মিলন-তৃষিতা

শ্রীদিলীপকুমার রায়

হরির মিলন চাই, কে আমারে এনে দেবে শ্রামরায় ?
ছিলাম ঘুমায়ে অভাগিনী—এসে ফিরে গেছে নাথ হায় !
আমার বাগানে ছিল ফুটে ফুল, দিত পিক বন্ধার,
কেন সব ফুল ঝরে গেল দখী ? গায় না কোকিল আর ?
হয় না বা কোনোদিন কেন হ'ল—প্রভাতে আঁধার ছায় ?
হরির মিলন চাই—কে আমারে এনে দেবে শ্রামরায় ?
রূপের গুণের কত অভিমান—ধন জন যৌবন।
সব ভেসে গেছে—সব গেছে তার না পেয়ে শো দরশন।
তারে যে তৃষিতে পারে শুধু সেই স্তম্ভরী এ-ধরায়
হরির মিলন চাই—কে আমারে এনে দেবে শ্রামবাস ?
আমি ভাবিতাম—ভালোবাসি, বলিতাম তুমি যে আমার।
প্রেম কী—জানিলে বলিতাম—আমি তোমার, শুধু তোমার
ফুল ভেবে আমি, অক্ষ, কেবল বুনেছি ঘর কাঁটার।
হরির মিলন চাই—কে আমারে এনে দেবে শ্রামরায় ?
মীরার ভক্তবৎসল বঁধু গিরিধারী, হে কৃপাল !
আমার মতন কে দীন—তোমার মত কে দীনদয়াল ?
তুমি বিনা আর কে চরণে ঠাই, বন্ধু, দেবে আমায় ?
হরির মিলন চাই—কে আমারে এনে দেবে শ্রামরায় ?*

* ইন্দিরা দেবীর সমাধিস্তম্ভ (২৭. ৮. ১৯৬২) গানের অন্তর্ভুক্ত।

কয়েকটা ঘটায়

হাসিরাশি দেবী

উৎসবটা অল্পপ্রাশনের, কিন্তু, অমুঠামটা চলবে বোধ হয় দুইটি মতে। এর একটি সনাতনী প্রথায়—ছপুঁরে রোদে,—বিশুদ্ধ পঙ্কিকার স্ন-সময় দেখে,—অমুটি সন্ধ্যায়।

হাক্-সাহেবী কায়দায়,—ডুইং রুমের রংপালিশে ঝক্‌ঝকানির মধ্যে।

মোরী-সিংহ,—অর্থাৎ মিসেস সিনা নিজে এসেই আন্সার জানিয়ে গেছে আজ সকালে। বলেছে—“আসা চাইই—কিন্তু। নইলে ভীষণ রাগ ক’রবো। আর, রাগ



“এই ইন্ট্রোডিউন্স করিয়ে দেওয়ার ভার আমার।”

না ক’রবোই বা কেন? তুমি হ’চ্ছ আমার বেবির মা-সু। কাব্যে এই মা-সু মানে বাংলাদেশের মাসীদের স্নেহের কত নজীরই তো আছে। আর বাস্তবে যদি আজকের দিনে না যাও,—তাহ’লে—”

মাঝপথে কথা থামিয়ে মিচের রঙিন ঠোঁটটা অতিমানে একটু কাঁপিয়ে তোলে। বলে—“তা-ছাড়া আমার বন্ধুরাও আসছে সন্ধ্যায়। তোমার সঙ্গে ইন্ট্রোডিউন্স করিয়ে দেবার ভার আমার। আসা কিন্তু চাই—দীর্ঘ,—খুঁদি—”

ডাম্পু করা চুলে ঢেউ-তুলে, আর সূর্যটানা চোখের চাউনিতে চমক লাগিয়ে শ্রীমতী মোরী তো বিদায় নিলে, কিন্তু আমি পড়লাম মুন্ডিলে।

মাত্র কয়েক ঘণ্টার তফাৎ! এর মধ্যে তেবে ঠিক করতে হবে লৌকিকতার প্রয়োজন মেটানো যায় কিসের বিনিময়ে? বাজারের কেনা উপহার দেওয়া এখানে অচল। তার বদলে কি দেই? টাকা? বই? ফুল? শিল্পকাজ? না, এসব কিছুই অভাব নেই মোরার সংসারে। সাজানো গোছানো সংসার স্বামী আর জীৱ। অভাব নেই, অসচ্ছন্দ্যও দর্শককে ব্যথা দেয় না। তার বদলে আগায় গৃহকর্তার শিল্পকৃতিবোধের প্রতি বেশ একটা আগ্রহ, একটু ভৃগুণ্ড।

মনের মধ্যে এই ভাবনাগুলোই মিলেমিশে ভাল-গোল পাকাতে শুরু করেছে। হাতড়েও যেন কুল-কিনারা পাচ্ছি না খুঁজে—সুতরাং কাগজ-কলমের শরণ নেই।—প্রশস্তিকা রচনা করতেই হবে,—এবং সেটা শুধুমাত্র মোরী সিনার কন্ডার জন্মই। অতএব উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের ভাবার অনুসরণই আগের কাজ। যথা—

কি শুভ লগনে হইল তব আগমন,
আনন্দ-সুধায় তরি ভুবন-ভবন।
কচি মুখে মধু হাসি, আধ আধ সুরে ভাসি
কণে কণে কর মন সুখ বরিষণ।

প্রায় একশো বছর আগের কবি যেভাবে কথা সাজিয়ে মনোভাব প্রকাশ করেছিল, সেইভাবেই আজকের এ আনন্দ বিতরণের পর্কটা মেটানো যায় কিনা, এ শুধু তার ক্ষীণ প্রচেষ্টা! আর চেষ্টার পক্ষে এইখানেই যে শেষ, তাও নয়। তাই আবার লিখি:

“মন ভরানো মানিক রে তুই
বুক জুড়ানো সোনা,
বিহানকালের স্বরজ রে আর
রাতে চাঁদের কোণা।
গল্প-বী কালের বিষ্টি রে তুই
শীতের দিনে রোদ্-
অরের মুখে আমের আচার
মিষ্টি পানের দোনা।”

এমন একটা স্নেহের অভিব্যক্তির মধ্যেও কোথা থেকে
যেন রসিকতার অল্পমধুর স্বাদটা মিশে যায়। স্মৃত্যং
আবার কলমের ডগায় ধোঁটে—

“চোখের বাহিরে তোমা কে রাখিতে চায় বল
কে রাখিতে চায়—

সকল সময়ে শুধু দেখিব তোমায় আমি
দেখিব তোমায়।

অথবা

উদ্ভিলা কি উষাদেবি স্মিত হাসিমুখে
তিমিরাবস্তুরনের যবনিকা ছেদি'
নবীন আলোকে ; তেমতি হে বালা
তুমিও করিল। সবে পুলকিত চিত্ত,
বিতরিল। আমন্দ আলোক।”

না হয়,—

মাথের মুখের হাসি
ছুইটি নয়ন তারা,
মনের বাসনা তুমি
জীবনে স্বপনপারা।
কত রজনীর ঘুমে,
নীরবে গিয়াছ চুমে,
আজ রূপ বরি এলে,
বহায়ে অমির ধারা।

সন্দেহ জাগছে। ভাবা সাজাবার সনাতনী কায়দায়
তারিক হয়তো করা চলে,—কিন্তু মনের সুর যেন ঠিক
এক পর্দায় চলছে না। কাজেই ভাবার সঙ্গে স্টাইলটার
একটু রকমফের করলেই বা ক্ষতি কি? যেমন—

কোতু'হ, কহত তমারে
হিয়াপর রাখই, মধুবাণী শুনত,
তবহু' নিরখি' বারে বারে।

তবুও যেন কোথায় একটা বড় কঁাক থেকে যাচ্ছে।
যার পার্থক্যমনের মধ্যে স্বস্তি আনতে পারছে না।
অথচ সেই স্বস্তিটুকুর পাবার আশা নিয়েই আবার লিখে
চলি—

তোমারে দেখেছি স্বপ্নে যেন কোন উজ্জ্বলিনীপূরে
দীপের আলোর খেল অন্ধকার রাতে গভীরে
লীলাকমলের
দল হিম্ন করো।

একে একে
অকোমল অঙ্গুলী পরশে।

কিছা হাস
শুক-সারিদের
পুচ্ছে দিয়া টান।
করে দাও করতালি—

ময়ূর ময়ূরী যবে পুচ্ছে তুলি নাচে।’

খামি। মনে হয়—মনের কথাটা বোঝাবার আগ্রহে
সম্পূর্ণ না হোক—খানিকটা এগিয়েছি। যদিও বর্তমানের
গভীরেখা পর্যায় পৌঁছাতে পারিনি, তবু কাব্য-রামধনু
রংয়ের চমকটা লেগেছে দৃষ্টিতে। সাহিত্যের আসরে
সে রংয়ের আলো বিস্ময়কর না হ'লেও একেবারে অসহ
নয়। তাই আর একটু ভরসা নিয়ে শুরু করি—



“তুমি” কী?

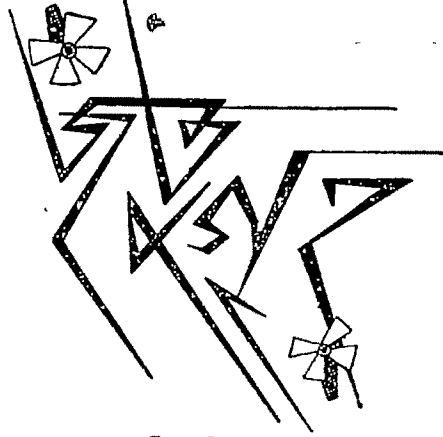
“তুমি কি আটলান্টিকের উন্মত্ত ‘হ্যারিকেন’?
তুমি কি প্যাসিফিক ওসেনের তরঙ্গায়িত ফেনপুঞ্জ?
তুমি কি বিস্তুত্বিয়সের পুনরুদ্ধার
আর সাহারার মরু ঘূর্ণীকড়?
কিছা—

আগবিকের নবতম সংস্করণ?

কী তুমি বালা? যার প্রশস্তি-পত্র রচনায়
ঝড় তিনঘণ্টা কেটে গেল আমার!
গড়িয়ে গেল ছপ্তরের রোদ,—
টেবিলের ওপর খাবার গেল ঠাণ্ডা হ'য়ে!
স্বামের অল তো বহুকণই চ'লে গেছে কল থেকে।
কী তুমি?—যার জন্তে,—

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য

চোখের সামনে সাদ্রানো অক্ষরগুলো যেন পিঁপড়ের মত সার বেঁধে হাঁটাচাটি শুরু করেছে। অসহ্য! অসহ্য... কলম ফেলে চুপ করে থাকি। তারপর তুলে নেই টেলিফোনের রিসিভারটা। ডায়ালটাকে ঘুরিয়ে বলি,—মোরী তো! হ্যাঁ তাই,—আমি খুসি—কথা বলছি। মানে অ্যাক্সিডেন্টলি আটকে প'ড়েছি, তাই তোমার মেয়ের শুভ কামনা জানাচ্ছি এখান থেকেই। এক্সকিউজমী... প্রীত...



শ্রীপ্রবীর বিশ্বাস

কে বলে জতুগৃহ ব্যর্থ?
ছাই হ'য়ে গিয়েছে শুধুই।
হিংসার দাব-দাহে
হুৰ্বোধন পুড়েছে নিজেই।
শকুনি-বিকর্ণ-কর্ণ
ভীষ্ম-দ্রোণ-রথী-মহারথী;
অথবা সে দ্বুতরাষ্ট্র
দৃষ্টি অন্ধ, স্নেহাঙ্গ সস্ত্রাট
আপন বংশের চিতা
নিজ হাতে জ্বালালো সেদিন।
এ রটনা—
এই ব্যর্থ জতুগৃহ-কথা . .
সোচ্চারে গিয়েছে বয়ে
সময়ের সমুদ্র অনেক।

এ ধ্রুপদী মিথ্যার মহীৰুহ
অবিশ্বাসের ভাঙনে ভাঙনে—
তীরের মাটির থেকে নড়ে নড়ে গিয়েছে হতভবা,
তবু তার লাখ লাখ শিকড়ের জালে
তুমি কি গ্রাসিত হলে?
হে আমার কালের ঐতিহাসিক
হে আমার ভবিষ্য দিশারী?
আজ শুধু জিজ্ঞাসা তোমাকে:
ব্যর্থ জতুগৃহ?
ব্যর্থ তার ধূমেলী বিকাশ,
অগ্নির বৃত্তিকা?
যদিও পাণ্ডব-কুন্তীর ছাই
বারণাবতে মেলেনি কখনো।
কিন্তু—
ওরা কারা—পুড়ে হল ছাই,
মা-ছেলে—

ভাই-বোন,
প্রিয়-প্রিয়া—
ঐতিহাসিক
সে জবাব চাই!

একটি জতুগৃহ না হয় ব্যর্থ হ'য়ে
গিয়েছে কখনো—
মিছে পুড়ে
নির্জন আকাশে রেখে ব্যর্থ ধূত্র-ছায়া,
কিন্তু যে নতুন লাভা বর ছেয়ে গেছে
সমস্ত পৃথিবী,
ঐতিহাসিক!
সে খবর রাখো কি?
আমি জানি,
বিহুরেরা বিজিত এখানে
শঠতার কোন স্থান রাখেনি বিধাতা;
অতিথির স্বত প্রাণে
পাণ্ডবের জয় উপাখ্যান
এখানে রচে না কেউ।

এই জতুগৃহে
মুঠো মুঠো পাণ্ডবের ছাই—
উড়ে উড়ে ছেয়ে গেছে নিখিল আকাশ
সে খবর তুমি কি শোননি?
দেখনি সে আগুনের শিখা?
বি-দগ্ধ আম্মার সেই
মর্যকদ হৃদয়ের স্বর!
ওদের পুর্ণিমা-প্রেম মিথ্যা হল,
মরণ-চিতায় ওরা পোড়ালো যে
অথের বাসর।
ওরা মালা ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছড়ালো যে

পথের ধূলার
কুটিল ষাট্টিক ঘন্থে নিপেবিত
হৃদয়-শরীর;
নিহু নিহু আশ্রায় প্রদীপ।
হুতরাষ্ট্র, অন্ধের প্রতীক—
অন্ধকারের স্বয়ম্বু-সম্রাট!

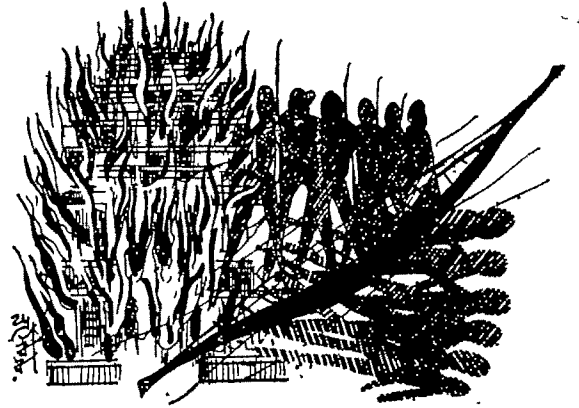


আমার পৃথিবী সে
চণ্ডাল জননী
আপন পুত্রের সহ
লাখ লাখ বারণাবত
কান্নায় ভরাব।
এ বেদনা
এ কারুণ্য
এ মনের মল্লার রাগিনী
তুমি কি শোননি বহু।
লিখেছো কি এদের কাহিনী?

নতুন অতুগৃহ যারা রচে
যারা তাতে লাগার আগুন
পোড়ায় বসন্ত-দিন
এ জীবন-বোবন-ফাঙন—
তাদের সে
নির্ভয় আচার
কমার জাহ্নবী তোমার
পাপমুক্ত করেছে তাদের?

দুর্বলের রক্ত রঙে
রাঙা কিগো তোমার নায়ক,
কমা-বীর্ষ-বীরত্বের শ্রেষ্ঠ রূপ
দুর্জয় কান্ডনী?

আমি আজ কৃদ্ধ স্বর
কলঙ্ক-বহুণায় অস্থির
নিখিল-হৃদয় জুড়ে
নির্বলের আতির স্বমন্
বন্ধনার প্রতিবাদে
ঝড় তোলে—
চেতনার ঝড়
তাই আজ উচ্চারণ:
স্বার্থহীন দৃষ্ট কণ্ঠস্বর।
অব্যর্থ অতুগৃহ
শবর-আশ্রায় ভিতে
পাণ্ডবের সাম্রাজ্য প্রস্তর
পবিত্র ভারতবর্ষে উঠে গেছে উদ্ধত সীমায়।



ক্রপদী মিথ্যার প্রবাহে
যে নাম গিয়েছে তেমে,
যে উন্নত হৃদয় হারানো,
তাদেরই স্বপক্ষে আজ বদ্ধ মূর্তি,
বিদ্রোহ চেতনা,
তোমার নির্ভীক নিরপেক্ষতার চেয়েছে যাচাই।
এ অব্যর্থ অতুগৃহ
মিছে পুড়ে হয় নাই ছাই।

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার ঐতিহ্য

ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার

দুর্গাপূজা বাংলাদেশে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। অতীত শক্তিপূজা বাংলাদেশে এত জনপ্রিয়তা অর্জন করে নাই। কারণ বাঙ্গালী তার মনের মাদুরী মিশাইয়া এই জগজ্জননীকেই তার ঘরগৃহস্থলির নিত্য-আপনজন করিয়া লইয়াছেন। বাঙ্গালীর এই বাৎসল্য স্নেহরস নানা ভঙ্গীতে বাংলার কথা-সাহিত্যকেও একদা সমৃদ্ধ করিয়াছিল। বাংলার বহু কবি মায়ের বিচিত্র চিত্র আঁকিয়া পাঁচালী আকারে গ্রথিত করিয়া সারা বাংলার পল্লীকে মুগ্ধিত করিয়াছিল। বর্তমানে বাঙ্গালীর জাতীয় উৎসব এই দুর্গাপূজা—মহাপূজা। ভারতের অল্প কোন প্রদেশে এইরূপ মূম্বয়ী মূর্তির সাড়ঘর পূজা দৃষ্ট হয় না।

দুর্গাপূজার প্রাচীনত্ব সন্দেহে কিছু জ্ঞানার উপায় নাই। ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে রাজা গণেশ গোড়বড়ে, তৎপর মহারাজ কুম্ভচন্দ্র বঙ্গদেশে দুর্গাপূজার ব্যাপক প্রচার করেন। কিন্তু বঙ্গদেশে তাহার পূর্বেও যে দুর্গাপূজার প্রচলন ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বৈষ্ণবকবি বিষ্ণুপতি তাঁহার দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিনী গ্রন্থে (১৪৭৯ খৃঃ) বঙ্গদেশের প্রচলিত মূম্বয়ী মূর্তির পূজা-পদ্ধতি বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমসাময়িক বিখ্যাত বাঙ্গালী স্মৃতি-নিবন্ধকার রঘুনন্দন পঞ্চদশ শতকে জীবিত ছিলেন। তাঁহার রচিত দুর্গোৎসব-তত্ত্ব ও দুর্গাপূজা-তত্ত্ব নামক গ্রন্থেই দুর্গাপূজার সম্পূর্ণ বিধি-প্রকরণ লিখিত আছে। রঘুনন্দন নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, তিনি পূর্বতন পণ্ডিতগণ ও নানা পুরাণ শাস্ত্র হইতে গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। মিথিলার প্রসিদ্ধ আর্ড-পণ্ডিত বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার “ক্রিয়া চিন্তামণি” গ্রন্থে মূম্বয়ী প্রতিমার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। রঘুনন্দনের গুরু শ্রীনাথের দুর্গোৎসব-বিবেক, শূলপাণি তাঁহার দুর্গোৎসব বিবেক, বাসন্তী বিবেক এবং জীমূতবাহন তাঁহার দুর্গোৎসব নির্ণয় গ্রন্থে, বঙ্গদেশে প্রচলিত মূম্বয়ী দুর্গাপূজার উল্লেখ করিয়াছেন। বাংলার অতি প্রাচীনতম স্মৃতি নিবন্ধকার ভবদেব ভট্ট তাঁহার গ্রন্থে জীকন, বালক

ও শ্রীকনরের বহু শ্লোক-বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। জীকন ও বালক বাংলার সেনরাজাদেরও পূর্ববর্তী ছিলেন। ভবদেব ভট্ট ছিলেন একাদশ শতকের রাজা হরিবর্ম দেবের প্রধানমন্ত্রী। এই সকল প্রমাণ হইতে বুঝা যায়, বাংলাদেশে দশম শতাব্দীতে দুর্গাপূজার প্রচলন ছিল।

গীতা যেমন মহাভারতের অংশবিশেষ, চণ্ডীও তেমন মার্কণ্ডেয় পুরাণের অংশ বিশেষ। মার্কণ্ডেয় পুরাণে অষ্টম মন্ত্র সাবণির উৎপত্তি-প্রসঙ্গে দেবী-মাহাত্ম্যের বর্ণনা আছে। এই দেবী-মাহাত্ম্যই দুর্গা সপ্তশতী বা চণ্ডী নামে প্রসিদ্ধ। কুরুক্ষেত্র সমরঙ্গনে বিবাদশ্রুত ও স্বজনমুগ্ধ অর্জুন যুদ্ধবিরত হইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হন। সেই উপদেশই গীতা নামে অভিহিত। সেইপ্রকার রাজ্যভ্রষ্ট ও পরিজন-চিন্তায় নিমগ্ন রাজা অরুণ, এবং শ্রী পুত্রাদি দ্বারা অপমানিত ও গৃহ হইতে বিতাড়িত সমাধি বৈষ্ণব শ্রীপুত্র-মায়ার জড়িত ও শোকমগ্ন হইয়া মেধস মুনির নিকট দেবী-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছিলেন। যে-মাহাত্ম্য শ্রবণে তাঁহাদের উত্তরের শোক ও মোহ অপনোদিত হইয়াছিল সেই মাহাত্ম্যই চণ্ডী। এই চণ্ডী-গ্রন্থ হিন্দুদের ঘরে ঘরে প্রচার হইয়াছিল। চৈত্র মাসে বাসন্তী পূজা এবং আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজার সময় চণ্ডী বিশেষভাবে পঠিত হইয়া থাকে। এতদ্বিধি স্মৃতি, সৌভাগ্য-বুদ্ধি এবং বিপদ নিবারণের জন্ত চণ্ডীপাঠ হইয়া থাকে। হিন্দুগণের বিশ্বাস, বিপদকালে ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং সুরাধি মানবগণ মহামায়ার প্রভাবে সর্বাভীষ্ট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। “কলৌ চণ্ডী বিনায়কৌ” সূত্র অনুসারে বর্তমানকালেও সঙ্কট হইতে উদ্ধারের জন্ত, রিপু. রোগ, ও রাজতম নিবারণের জন্ত, শ্রী-পুত্র ও সৌভাগ্যাদি পাইবার জন্ত, এবং বিজয়শ্রী লাভের জন্ত হিন্দুগণ চণ্ডী পাঠ করিয়া থাকেন। চণ্ডীতে নারীশক্তির মহিমা কীর্তিত আছে। নারী-শক্তি সমগ্র বিশ্বের আধার, প্রাণস্বরূপা—চণ্ডীতেই তাহা দেখা যায়, আর অল্প কোন ধর্মে বা শাস্ত্রে নারীর এমন মহিমা-কীর্তন দেখা যায় না।

এই দুর্গা বা চণ্ডীর পূজার প্রাচীনত্ব প্রমাণ করা কঠিন।

হিন্দুগণের বিশ্বাস দেবীর যুদ্ধ সত্যযুগের আদি ঘটনা। কিন্তু বেদে তাহার উল্লেখ নাই। পণ্ডিতগণ অহুমান করেন ভারতে যখন আর্য উপনিবেশ স্থাপিত হয় তখন এ দেশের আদিবাসীদের মধ্যে চণ্ডীপূজার প্রচলন ছিল। আর্যগণ প্রথমে এই পূজা স্বীকার করেন নাই বলিয়া বেদে উল্লেখ দেখা যায় না। তারপর দেশবাসী এই পূজার প্রচলন হয়। মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা সত্যতাও এই পূজার প্রাচীনত্ব স্বীকার করে। বৌদ্ধগণও প্রথমতঃ চণ্ডীপূজা স্বীকার করেন নাই। হিন্দুগণ কর্তৃক দেবপূজা গৃহীত হওয়ার বহু পরে, ১ম শতাব্দীতে, নাগার্জুনের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মহাযান বৌদ্ধ-সম্প্রদায় শক্তিপূজা স্বীকার করিয়াছিল। বৌদ্ধভিক্ষু লিখিত থুঃ পুঃ পঞ্চম শতাব্দীর চণ্ডীর পুঁথি নেপালে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

দ্রাবিড়ী বা শকগণ বা অপর কাহারো চণ্ডীর আদিপূজক ছিলেন তাহা নির্ণয় করা স্বকঠিন। কিন্তু এই মহাপূজার বহু প্রাচীনত্ব সন্দেহে কোন সংশয় নাই।

চণ্ডীগ্রন্থ রচনাকাল সন্দেহে কোনপ্রকারে নিদর্শন পাওয়া যায় না। খৃষ্টের জন্মের দেড়শত বৎসর পূর্বে রাজা পুষ্যমিত্র কর্তৃক মৌর্যবংশের ধ্বংস সাধিত হয়। এই রাজা বৌদ্ধদিগের প্রবল শত্রু ছিলেন। ইনি রাজা অশোকের ৮৪০০০ ধর্মরাজিকার উচ্ছেদসাধনে বদ্ধ-পরিকর হন এবং অশ্বমেধাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা বৈদিক ধর্মের পুনরুদ্ভাবনের সহায়তা করিয়াছিলেন। চণ্ডীতে শুভ্রনিশুভ্র পক্ষ আশ্রিত দৈত্যগণের মধ্যে মৌর্যগণের উল্লেখ দেখা যায়। তৎকালে মৌর্যারা প্রবল হিন্দু-বিদ্বেষী ছিল। পণ্ডিতগণ অহুমান করেন মৌর্যবংশ ধ্বংসের অব্যবহিত পরে এই চণ্ডী বিরচিত হয়। তাঁহাদের ধারণা থুঃ পুঃ দ্বিতীয় শতকে চণ্ডী রচিত হয়।

কলিঙ্গাধিপতি সুপ্রসাদি রাজা খারবেল চৈত্রবংশসম্বৃত ছিলেন। বিখ্যাত হাতিগুফার কার্তিকরাশি ইহারই কৃত।

ইনি একদা মগধ হইতে গঙ্গাম, এমনকি গোদাবরী পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন। রাজা খারবেল খৃষ্টের জন্মের দুইশত বৎসর পূর্বে বর্তমান ছিলেন। রাজা সুরথ এই চৈত্র বংশেরই উদ্ভবতন পূর্বপুরুষ।

চণ্ডী-বর্ণিত মেঘসাপ্রম সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। কেহ কেহ মনে করেন মেঘসাপ্রম চট্টগ্রামে অবস্থিত (প্রবর্তক, আখিন, ১৩৬৮), কাহারও মতে বিদ্যাচলের নিকটবর্তী কোনস্থানে শুভ্র-নিশুভ্রের যুদ্ধ প্রকৃতি দেবীলীলা ঘটয়াছিল; ইহা চিরপ্রচলিত জনশ্রুতি। কেহ কেহ অহুমান করেন কুমিল্লার সন্নিকট চণ্ডীমূড়া পাহাড়ে আজও অতিকায় অমুরের অস্থি-সকল অতীতের সাক্ষ্য বহন করিতেছে (প্রবর্তক ১৩৬৭ সাল), কেহ কেহ অহুমান করেন বিদ্যা পর্বতের দক্ষিণে কোনদের প্রধান কেন্দ্র ছিল। কোন কোন পণ্ডিত অহুমান করেন পার্বত্য ত্রিপুরা, আগরতলায় কোলদের প্রধান কেন্দ্র ছিল। এই কোলদের দ্বারা সুরথ রাজার রাজ্য ধ্বংস হয়।

চণ্ডীপাঠে মনে হয়, ইহা দেশের শান্তির সময়ে রচিত হয় নাই। দেশবাসী কোন রাষ্ট্রের বিপ্লবের সময়েই চণ্ডী উদ্ভব হইয়াছিল। আজ ভারত-সীমান্তে চীনা অক্রমণ ঘটিয়াছে। এ সময়ে শ্রীচণ্ডীর ভাবানুশীলন বাঞ্ছনীয়।

শ্রীচণ্ডী মহাগ্রন্থের আলোকে আমরা প্রকৃত পথের সন্ধান পাইতে পারি। মহাপূজার প্রধান আঙ্গিকই এই চণ্ডী। শ্রীচণ্ডীর উপর ভিত্তি করিয়াই বস্তুতঃ শ্রীচণ্ডীপূজা প্রতিষ্ঠিত। সম্মানত্রয়ী বাঙালীর দেশান্ন-বোধের উৎসমূল গীতা ও চণ্ডী। চণ্ডী মোহনিদ্রা ভাঙ্গাইয়া জ্ঞান, ধর্ম, শক্তি ও ভক্তির পথে যুমন্তকে উদ্ধৃত করে। চণ্ডীপাঠে শক্তি ও কর্মের প্রেরণা চিন্তে জাগে, জাতীয়তাবোধ উদ্দীপ্ত হয়। বাঙালীর জাতীয় জীবনের চণ্ডী তথা চণ্ডীপূজা বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

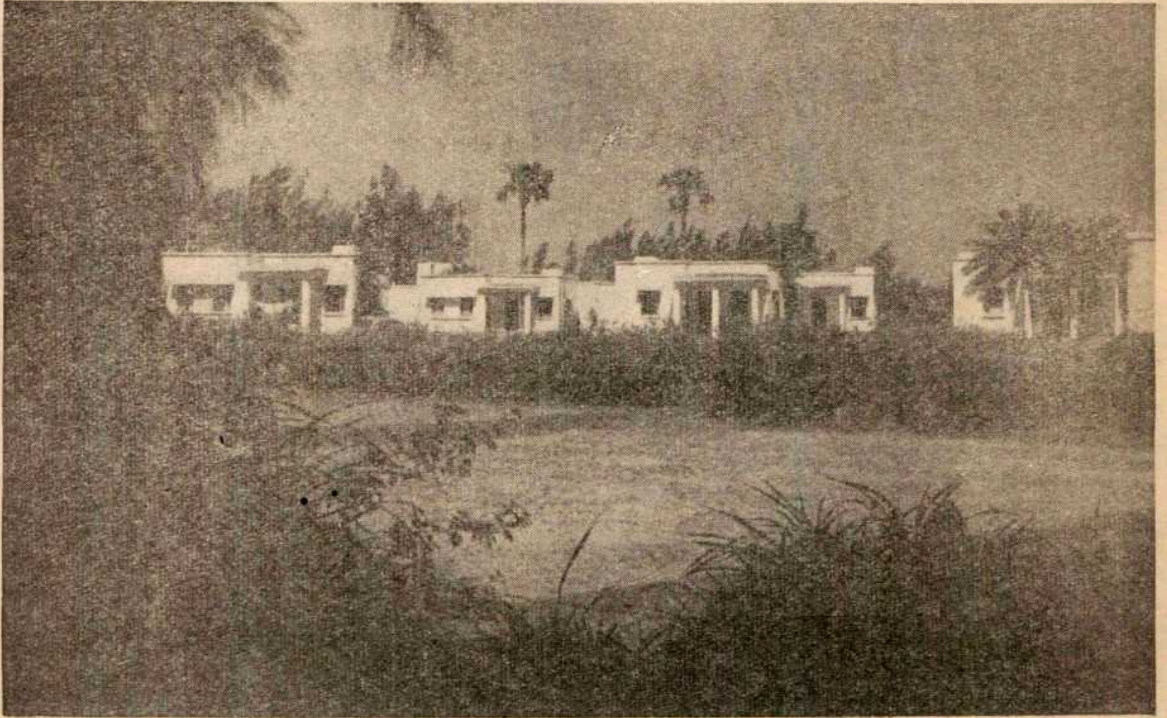


দীঘা

ডাঃ শিশির জানা

বঙ্গোপসাগরের নীল জলধি উপান্তে সোনালী বালুকারাশির গা ঘেঁষে মাইলের পর মাইল ধরে দেউদার শ্রেণী চলে গিয়েছে—সেই সমুদ্র তীরভূমি আজ দীঘা নামে পরিচিত। বহু বৎসর ধরে ম্যাপ খুঁজলে দীঘা নামটি পাওয়া যেত কিন্তু সেখানে শুধু সময় সময় পদার্পণ করতো রোমাঞ্চ অন্বেষণকারীগণ। সীমাহীন বালুকাভূমির ওপর উড়োজাহাজ অনায়াসে নামতে বা উঠতে পারে, ঘণ্টায় অব্যবধি পঞ্চাশ মাইল বেগে গাড়ী চালিয়ে যাওয়া যায়। যুগ যুগ ধরে মাইলের পর মাইল ব্যাপী

অমৃতে স্বাস্থ্যোদ্ধার, পশু অথবা মৎস্য শিকারের জন্য বিয়ারকুল গিয়াছেন। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ‘দি বেঙ্গল গেজেট’ এই স্থানকে আধুনিক নগরীতে পরিণত করবার জন্য এক পরিকল্পনা পেশ করে। এই স্থানের একটি বিশেষ সুবিধে ছিল এই যে, এই সুদীর্ঘ সমুদ্র তীরভূমি গাড়ী চলাচলের জন্য পৃথিবীর প্রকৃষ্টতম যায়গা ছিল এবং এখানে কাকড়া ছাড়া অন্য কোন হিংস্র প্রাণীর উৎপাত ছিল না। বিয়ারকুল পরগণায় বর্তমান দীঘা অবস্থিত, সেই সময় বিয়ারকুলে বহু ডাকবাংলো ছিল।



ভ্রমণার্থিগণের জন্য সরকারী আবাস : দীঘা

বালিয়াড়িগুলো যেন সতর্ক প্রহরীর মত দাঁড়িয়েছিল। এতদিনকার অবজ্ঞাত দীঘায় যেন অনন্তকাল ধরে কেয়াকুঞ্জ নিজ মৌরভে মত্ত ছিল। যদিও দীঘার উন্নয়ন শুরু হয় মাত্র গত শতাব্দীতে তাহলেও অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই দীঘার নাম কলিকাতায় এসে পৌঁছেছিল। সিড্‌নি গ্রীয়ারের বইতে (ওয়ারেন হেস্টিংসের জীবন নিকট লিখিত পত্রাবলী) উল্লেখ আছে হেস্টিংস তাঁর পত্নীর কাছে লিখেছিলেন—“বিয়ারকুলকে স্বাস্থ্যনিবাস হিসেবে প্রাচ্যের ‘বাইটন’ বলা হয় এবং সংবাদপত্র বা কাউন্সিল প্রায়ই উল্লেখ করে—‘অমৃকে

পুরানো খবরে পাওয়া যায় ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে একমাত্র ওয়ারেন হেস্টিংস নির্মিত বাংলো ছাড়া অন্য সব গৃহাদি পরিত্যক্ত হয়।

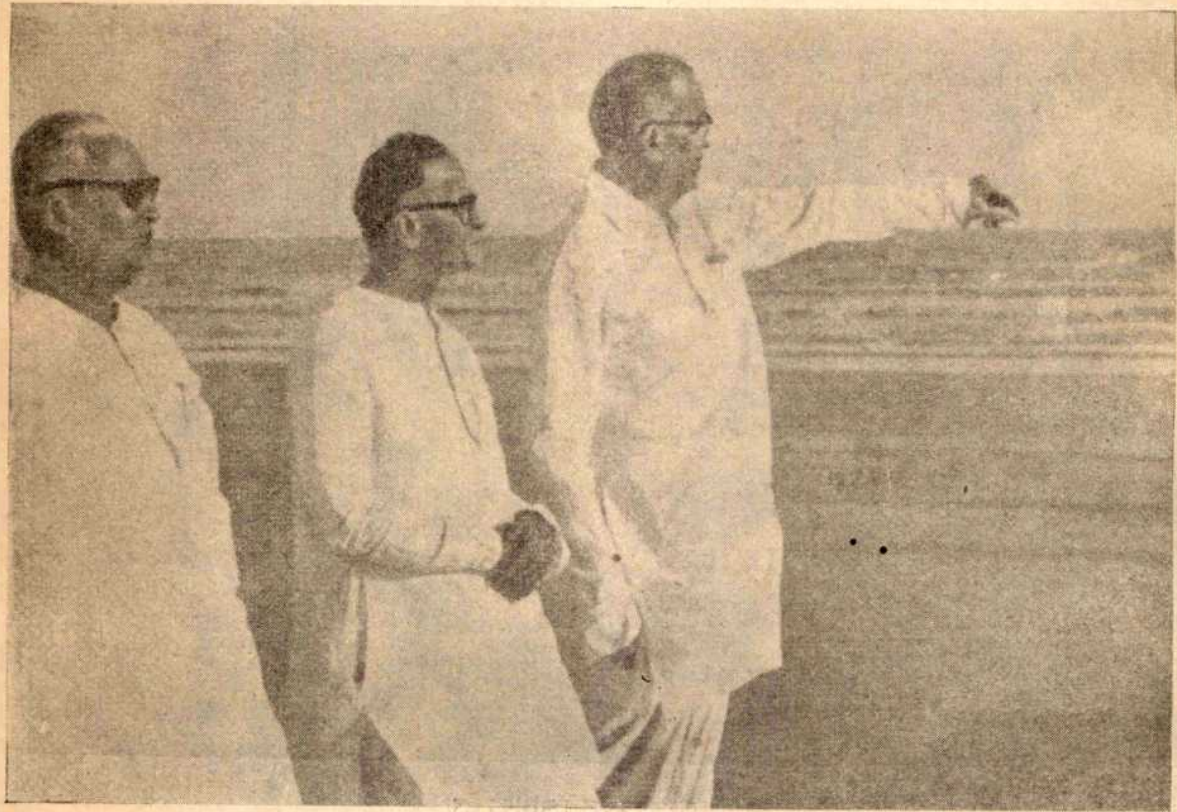
দীঘাকে প্রাচ্যের বাইটন বললেও, দীঘার এক নিজস্ব সৌন্দর্য রয়েছে—এর নিঃসঙ্গতা। বহুদূরব্যাপী ঢালু তীরভূমি স্নানার্থিগণের পক্ষে নিরাপদ। এর উচ্চ বালিয়াড়ির উপর থেকে স্বর্ষ্যোদয় এবং স্বর্ষাস্ত দর্শন এক অপূর্ব ব্যাপার। ভ্রমণকারীদের পক্ষে দীঘার আবহাওয়া প্রায় সারা বৎসরই মনোরম থাকে। পশ্চিম বঙ্গে অবস্থিত দীঘা কলিকাতা থেকে ১৪৯ মাইল এবং কাঁচি

সহর থেকে মাত্র ২৩ মাইল দূরে। নিঃসঙ্গ এবং সপ্তাহান্ত অবসর যাপনের পক্ষে দীঘা এক মনোরম সমুদ্রতীর। এখানে স্নানাথীদের হাঙ্গর, গভীরতা বা চোরা শ্রোতের কোন ভয় নেই।

দীঘার উন্নয়ন পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ছিল এক স্বপ্ন। ১৯৫৩ সালে পশ্চিম বঙ্গ সরকার এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং ডাঃ রায় স্বয়ং দীঘাকে এক মনোরম আধুনিক সমুদ্রকূলবর্তী নগরীতে পরিণত করবার জন্ত বিশেষ আগ্রহা হন। বর্তমানে দীঘাতে

(dormitory) এবং খাবার জন্ত স্বল্পমূল্য হোটেল স্থাপন করেছে। সরকার আসবাবপত্র সজ্জিত স্নানস্থ বৈশিষ্ট্য কিছু সংখ্যক বাংলো নির্মাণ করেছে। প্রত্যেকটি বাংলোতে বিদ্যুৎ এবং ভল্লের ব্যবস্থা রয়েছে। এই বাংলোগুলোতে পরিমিত ভাড়ায় ভ্রমণার্থীদের থাকতে দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া দীঘা পরিকল্পনা উন্নয়ন বোর্ড ও সরকারের অন্যান্য সংস্থা আরও বাংলো বা গৃহাদি নির্মাণ করেছে।

দীঘা কলিকাতা থেকে ৭৩ মাইল দূরে। কলিকাতা-বোম্বাই বা কলিকাতা-মাদ্রাজ সাউথ ইষ্টার্ন রেলওয়ের



“কী এক আকর্ষণে হেথা আদি বার বার”—দীঘা রূপায়ণে ডাঃ বি. সি. রায়

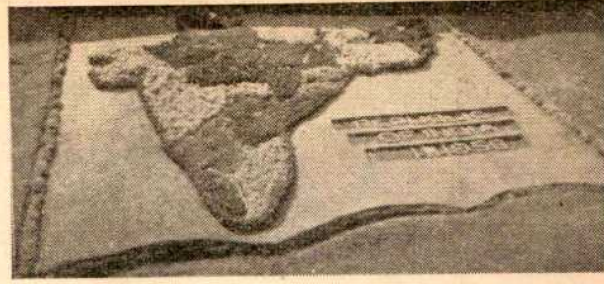
একটি আধুনিক সহরের সমস্ত সুযোগ সুবিধাই পাওয়া যাবে, যেমন—বিদ্যুৎ, বাজার, হোটেল, ক্যাফে, রেস্টোরাঁ, পোস্ট অফিস, পাবলিক টেলিফোন, বুথ ইত্যাদি। সেখানে একটি সরকারী মেডিকেল ইউনিটও রয়েছে। পিতা ও মাতার নামানুসারে “অঘোর কামিনী চিকিৎসালয়” স্থাপনের জন্তে ডাঃ রায় দুই একর জমি দান করে গেছেন।

ভ্রমণকারিগণ দীঘায় গিয়ে ক্যাফেটেরিয়ায় উঠতে সরকার সস্তায় সেখানে থাকবার জন্তে ডর্মিটরি

প্রধান রেলপথের হুগলীপুর্ শ্টেশনের সাথে ৭৬ মাইল দীর্ঘ পাকা সড়ক দিয়ে যুক্ত। কন্টাই রোড শ্টেশন থেকেও দীঘা যাবার ৫৬ মাইল পাকা সড়ক রয়েছে। কলিকাতা থেকে যাতে সোজা গাড়ীতে দীঘা যাওয়া যায় সরকারের সেক্ষেপ পরিকল্পনাও রয়েছে। আশা করা যায় ৩৪ বৎসর ভেতরেই আমরা তিন ঘণ্টার ভেতরে কলিকাতা থেকে দীঘা পৌঁছে হুগলীপুর্ সমুদ্রস্নান এবং খাওয়া সেরে সন্ধ্যার ভেতরেই আবার কলিকাতা ফিরতে পারবো।

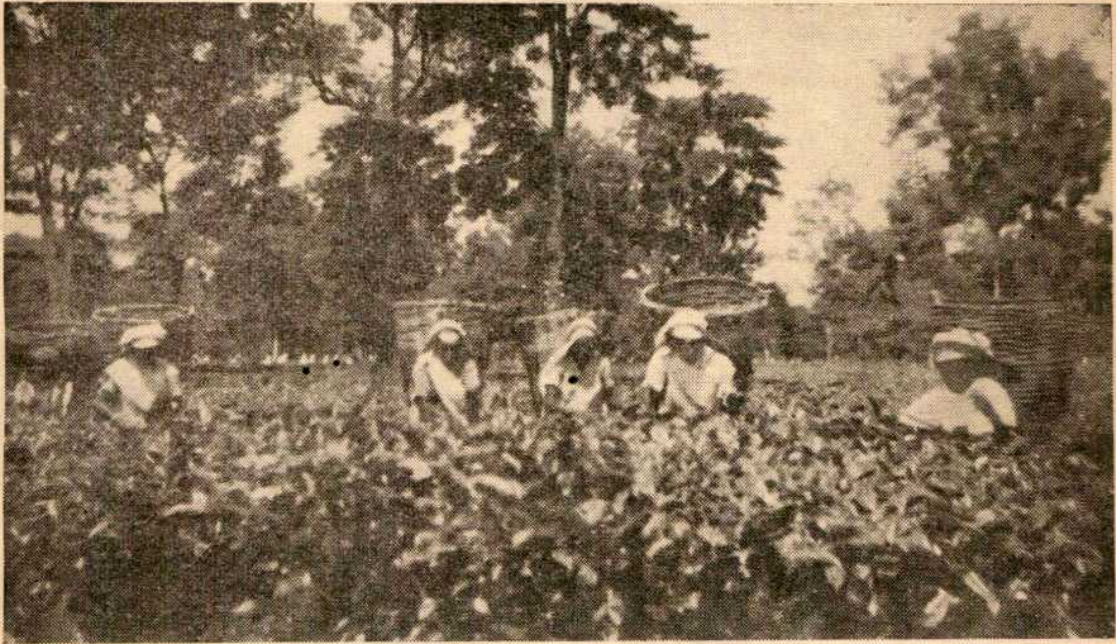
জৈবগাঁও

শ্রীমতী দাস



কথায় বলে “যাহা নাই ভূভারতে তাহা আছে ভারতে।” বলা হতে পারে ইহা ভারতবাসীর সদম্ভ উক্তি, কিন্তু আমি বলব—‘মোটাই তা নয়।’ কালের গতিচক্রে আমরা নৈতিক বা আধ্যাত্মিকতার পথে

তিনদিকে সাগরবেষ্টিত ও উত্তরে মহান হিমালয় পর্বত দ্বারা সুরক্ষিত ভারত অনাদিকাল ধরে পৃথিবীর লোকদের কাছে এক রহস্যময় ও আকর্ষণীয় বস্তু হিসেবে ছিল। সম্পদের লোভে এখানে পদার্পণ করেছিল বিবিধ



আমাদের চা বাগানের দৃশ্য

নিষ্পিষ্ট হতে পারি, কিন্তু প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির দ্বারা আজও মহাকালের হাত এড়িয়ে বর্তমান, ভারতের নৈসর্গিক সৌন্দর্যরাশি আজও জগৎবাসীকে আনন্দ দানের জন্ত প্রবাহিত, ভারতের প্রাচীন কারু-শিল্প ও অত্যাশ্চর্য শিল্পকলা ও ভাস্কর্য আজও বৈদেশিক জুর্গনকারীদের করাল গ্রাস থেকে নিজেকে রক্ষা করেছে, ভারতের যুগ যুগান্তরের প্রাচীন শিক্ষা, সভ্যতা, কৃষ্টি ও প্রাকৃত সম্পদ আজও ভারতেরই বৈশিষ্ট্য।

জুর্গনকারীগণ, জ্ঞান-আহরণের জন্ত এসেছিলেন হিউ এন্ড সান্, মেগাস্থিনিস প্রভৃতি পর্যটকবৃন্দ। ভারতের শৌর্য পরীক্ষার জন্তে এসেছিলেন গ্রীকরাজ বীর আলেকজেন্ডার। কিন্তু তাঁর পরাক্রমের অহংকার বাধা পেল এক নগণ্য নৃপতি পুত্রর কাছে।

যদিও ভারতের উপর বহুকাল ধরেই নানাভাবে জুর্গন চলেছে, পারস্যীয় সম্রাটগণ বার বার ভারত আক্রমণ করে’ অনেক মূল্যবান সম্পদ অপসৃত করেছে, মোগল

আমলেও ভারতের অনেক মহামূল্য সামগ্রী বাইরে চলে গিয়েছে, যদিও বৃটিশ শাসকগণ গত আড়াইশত বৎসর ধরে ভারতকে নির্মমভাবে শোষণ করেছে তবুও তারা

এখনও কাল বিলীন করতে পারেনি—তাকেই ভারতের প্রাকৃত সম্পদ বলেই আখ্যা দেব।

ভারতের পূর্বতম প্রদেশ আসাম ও মণিপুর এক

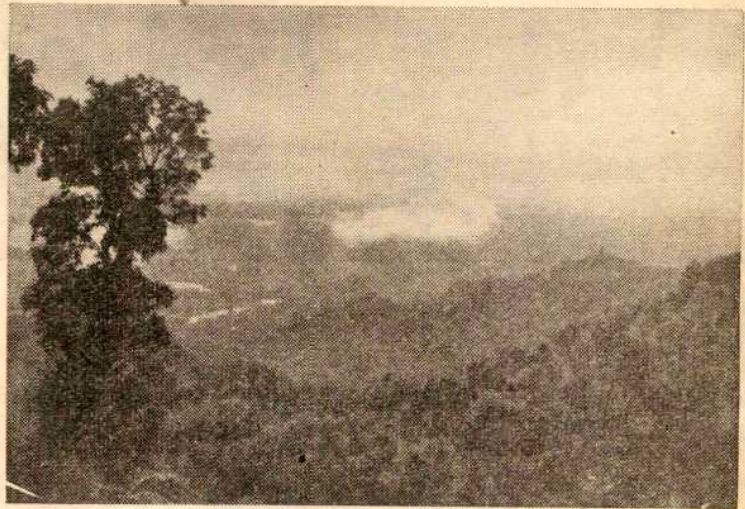


বেগবতী তিস্তার উপরে রেলসেতু

বিচিত্র ভূমি। যেমন বিচিত্র এর অধিবাসীরা তেমন বিচিত্র এর ভৌগোলিক প্রকৃতি। এর উপর একদিকে যেমন বর্ষার অক্লপণ দান অতীতকে তেমন খরশ্রোতা ব্রহ্মপুত্রের অজস্র জলবাহিকা এর দেহে শিরা-উপশিরার মত প্রবাহিত হয়ে একে শ্রামলিমা করে রেখেছে। তাই মণিপুরীরা নৃত্যচঞ্চল, খাসিয়া মেয়েদের রং-এর লালিত্য, নাগাদের এত শৌর্য, চাঁ বাগানের মেয়ে-কুলিদের মন মাতোয়ারা সঙ্গীত-নির্ব্বার। গাঙ্গেয় মোহনার পলিমাটিতে উর্বর বাংলাদেশ

ভারতকে তার অজস্র দৌলত থেকে একেবারে রিক্ত করতে পারেনি।

ভারতের প্রধান সম্পদ হল এই ভারতভূমিই। এই ভারতভূমির অনাবিল সৌন্দর্য একদিকে কাশ্মীর হতে কত্থাকুমারিকা ও অপরদিকে দ্বারকা থেকে কামাখ্যা ভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সৌন্দর্যের আকর্ষণ আজও লক্ষ লক্ষ বিদেশীকে মুগ্ধ করে দেয়। আমি প্রাচীন ভারতের শিল্প-কলা ও ভাস্কর্য—যার কাছে



হিমালয়ের তরাই অঞ্চলের দৃশ্য

বর্তমান ভারত তথা সমগ্র বিশ্বের শিল্পকলাবিদদের নৈপুণ্য জ্ঞান হয়ে যায় সেই সব শিল্পের যা কিছু অংশ

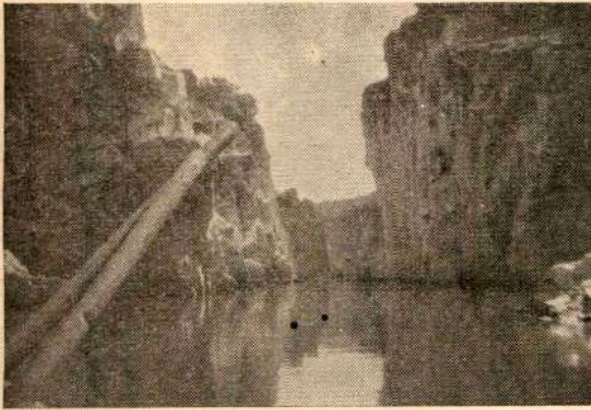
“ধনেধাত্তে পুষ্পে ভরা”, জ্ঞানের চর্চায় ভারতের শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে বললেও অত্যাুক্তি হবে না।



কাসীর রানী লক্ষ্মীবাইয়ের কেল্লা



কেদারবরী পথে পাতাল গঙ্গা



মার্বেল পাথরের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত নর্মদা নদী : জব্বলপুর



দূর থেকে কেদারনাথের মন্দির

মন্দিরময় উড়িয়া। ভাস্কর্যের যাহ্নবর। কেশারকের সূর্যমন্দির আজও এক পৃথিবীর বিস্ময়কর বস্তু। তা ছাড়া জগন্নাথদেবের মন্দির ও ভুবনেশ্বরের মন্দির না দেখলে ভারত দর্শন অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

বুদ্ধের দেশ বিহারে ছড়িয়ে রয়েছে নানা বুদ্ধপীঠ। তার মধ্যে গয়া, নালন্দা ও রাজগীর দর্শনীয়। নালন্দা ভারতের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়। এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলেও সেকালের শিক্ষাদান পদ্ধতির এক চমৎকার নিদর্শন পাওয়া যায় এখানে। এ ছাড়া ঐতিহাসিক রাজধানী পাটলিপুত্রে (বর্তমান পাটনা) গেলে প্রাচীন দিন মানসপটে ভেসে ওঠে। হাজারী-

বাগের জঙ্গল রাজ্য ও রাঁচীর ছড় জলপ্রপাত না দেখে বিহার ছেড়ে আসা যাবে না।

উত্তর প্রদেশ বহু পার্বত্য-নিবাসের জন্ম যে গর্ব অহুতব করতে পারে তেমনি পারে এর বিস্তৃত রমণীয় তরাই অঞ্চলের জন্মে। বিখ্যাত ও দর্শনীয় তীর্থ কাশী বা বারাণসী ধাম এই প্রদেশের অন্তর্গত। কাশীর পাশেই রয়েছে বুদ্ধ স্তূপ সান্নাথ। আগ্রার আশেপাশে রয়েছে তাজমহল ও মোগল আমলের বহু স্থাপত্যের নিদর্শন। যিনি এই পুণ্য ভারতভূমিকে ভূ-স্বর্গ বলে আখ্যা দিয়েছেন তিনি ঠিক ভারতের মর্মটিকেই ব্যক্ত করেছেন।



মহাপ্রাণ ধর্মপাল

শ্রীমতী রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভগবান বুদ্ধ ভারতবর্ষকে বিশ্বের তীর্থভূমিতে পরিণত করেছেন। বৌদ্ধজীবনদর্শন ও সংস্কৃতি ভারতবর্ষের অমূল্য সম্পদ। অথচ সেই ভগবান বুদ্ধ ও তাঁর জীবনদর্শনকে ভারতবাসী প্রায় বিস্মৃত হয়েছিলেন। এই স্বপ্ন থেকে ভারত ও ভারতবাসীকে উদ্ধার করেছেন মহাপ্রাণ ধর্মপাল। প্রায় এক হাজার বছরের বিস্মৃতপ্রায় বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতিকে তিনি ভারতবর্ষে পুনরুজ্জীবিত করেছেন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে। অবহেলিত ও প্রায়ধ্বংসপ্রাপ্ত বৌদ্ধতীর্থ বুদ্ধগয়া, সারনাথ প্রভৃতি ধর্মস্থানগুলির পুনরুদ্ধার ও পুনরুন্নয়ন করে' তিনি শুধু ভারতবর্ষই নয়, সমগ্র সাংস্কৃতিক জগতের কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন।

মহাপ্রাণ ধর্মপাল জাতিভেদের সুদূর প্রাচ্যের জাপান, কোরিয়া, চীনদেশ, ক্যাম্বোডিয়া, ফিলিপাইন্স, হাওয়াই দ্বীপ, যাতা দ্বীপ, মালয়, ব্রহ্মদেশ, ভারতবর্ষ, সিংহল থেকে শুরু করে প্রত্যেকের আমেরিকা, ইংলও ফ্রান্স, হল্যান্ড, ইটালী প্রভৃতি দেশের উল্লেখযোগ্য সমস্ত সহরে নগরে ঘুরে ঘুরে সারাটা জীবন বৌদ্ধজীবনদর্শনের মহিমা প্রচার করে বেড়িয়েছেন। যে যুগে তিনি এইভাবে বারং বার ভারতীয় ধর্ম সংস্কৃতি প্রচারের উদ্দেশ্যে বিশ্ব-পরিভ্রমণ করে বেড়িয়েছেন (১৮৮৮-১৯৩১ খৃঃ) সেটা আজকের মতো এরোপ্লেনের যুগ ছিল না। পুরানো আমলের জাহাজ আর রেলগাড়ীর সাহায্যে তাঁর এই পুনঃপৌনিক বিশ্ব-পরিভ্রমণ তাই বিস্ময়কর অভিযান ছিল বৈকি। তিনি যে দেশেই গেছেন সেখানকার বিদগ্ধ-সমাজ তাঁকে অভাবনীয় স্বাগত ও সম্বর্ধনা জানিয়েছে।

এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে শিকাগোর ধর্মমহাসভায় নিমন্ত্রিত হ'য়ে তাঁর যোগদান। এইখানে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়। সে পরিচয় পরবর্তীকালে গভীর ভ্রূপ্রমে পরিণত হয়েছিল। প্রাচ্যের এই দুই প্রতিভাধর পুরুষ পরস্পরের প্রতি শুধু আকৃষ্টই নয়, রীতিমত মুগ্ধ হন। কথিত আছে যে, স্বামীজীর শিকাগোবাসকালে ধর্মপাল বহু ক্ষেত্রে তাঁকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন। ১৮৯৩ সালে প্রাচ্যের এই যুগল সন্ন্যাসী ভারতীয় ধর্মের মর্মবাণী বিশ্বের দরবারে প্রচার ক'রে যেভাবে বিধর্মীদের • শাসন-লাঞ্ছিত তদানীন্তন ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন বহুর ইতিহাসে তার বিতীয় তুলনা নেই। শিকাগোর ধর্মমহাসভায় ধর্মপালের বক্তৃতা সমগ্র ধর্মজগতকে সৈদন আলোড়িত করেছিল। ষষ্ঠধর্মের দেশ আমেরিকার বিখ্যাত পত্র-পত্রিকায় মহত্বের দিক দিয়ে এই বুদ্ধভক্তের তুলনা করা হয়েছিল স্বয়ং যীশুখৃষ্টের সঙ্গে। এর চেয়ে বড় সাফল্য বা সার্থকতা আর কী কল্পনা করা যেতে পারে?

শুধু ধর্মই নয়, স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রেও ধর্মপালের অবদান কম ছিল না। তদানীন্তন ইংরাজ-শাসকদের সাম্রাজ্যলোভ শোষণনীতির প্রতিবাদেও তিনি ছিলেন মুখর। য'র জন্ম বহু ক্ষেত্রে তাঁর বিদেশ ভ্রমণের সময় ব্রিটিশ গোয়েন্দা তাঁকে ছায়ার মতো অহুসরণ করে বেড়াত। এমনকি প্রথম মহাযুদ্ধের সময় (১৯১৪-১৯১৮ খৃঃ) তদানীন্তন ভারতবর্ষের ইংরাজ শাসন-কর্তৃপক্ষ তাঁকে অন্তরীণাবদ্ধ করে রাখতে কুণ্ঠিত হয় নি।

ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির মাধ্যমে খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কলিকাতা মহাবোধি
এশিয়ার সমস্ত দেশগুলিকে একসূত্রে বেঁধে দেয়ার যে সোসাইটি হলের প্রতিষ্ঠাতা এই জনহিতব্রতী, দেশ-
ছঃসাহসিক প্রচেষ্টা আজ থেকে দীর্ঘ সত্তর বছর আগে সেবক, ধর্মপ্রাণ, যুগন্ধর পুরুষের ১৯৬৪ সালে জন্মশত-



ভারতের যুগল সন্ন্যাসীঃ ১৮৯০ খ্রষ্টাব্দে শিকাগোয় অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্ম-সম্মেলনে মহাপ্রাণ অনাগারিক ধর্মপাল এবং তাঁর বামে স্বামী বিনেকানন্দ
করে গিয়েছেন ভবিষ্যদ্রষ্টা ধর্মপাল, তা'রই আশ্চর্য সাদৃশ্য বার্ষিকীর প্রাক্কালে তাঁকে ভক্তিবিবস্র চিত্তে স্মরণ করি
কি আমরা আজকের স্বাধীন ভারতবর্ষের পররাষ্ট্র- ও সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।
নীতিতেও প্রতিফলিত দেখি না ?



পাশ্চাত্য ঠাকুরদের বাণী

- ১। সং চিন্তা করা মানেই সং হওয়া।
- ২। সং চিন্তাই সং কর্মের জননী।
- ৩। যা ভাল নয় তা মহৎ নয়; সত্যই চিরস্থায়ী।
- ৪। কাহাকে তোষামোদ করো না, কারও কাছে তোষামোদ প্রত্যাশা করো না।
- ৫। যা জানো তার সবটাই প্রকাশ করো না, কিন্তু যা বলবে তা যেন কখনও তোমার অজানা না হয়।
- ৬। সর্বদাই মহৎ হতে চেয়ো না কিন্তু ছায়াবান হবে সত্যতাই।
- ৭। ধনী লোকের গলগ্রহ হতে চেয়ো না।
- ৮। অপরের বিষয় নিয়ে আলোচনা বা তাতে হস্তক্ষেপ কদাচ করবে না, কিন্তু নিজের কর্তব্য পরিশ্রম করে করবে।
- ৯। মনে সর্বদাই কোনও না কোনও উচ্চ চিন্তা রাখবে।
- ১০। নিজে শিক্ষিত না হয়ে অপরকে শিক্ষা দিতে যেয়ো না।
- ১১। কিছু না কিছু তৈরি করতে শিখবে যা সমাজের উপকারে আসে।
- ১২। কর্মের বাড়া পবিত্র কিছু নাই। কর্মই আসল—যশ কিছু নয়।
- ১৩। চিন্তা ও কাজ, কাজ ও চিন্তা—এই হচ্ছে সকল জ্ঞানের মূলধার।
- ১৪। জাতি হচ্ছে মানব সমষ্টি যারা একই ভাষায় কথা বলে।
- ১৫। আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জাতিমাত্রেরই নিজেদের ভাষার জন্তু সবচেয়ে বেশী গর্ব অনুভব করে এবং তাকে সবচেয়ে আপনার বস্তু (asset) মনে করে।
- ১৬। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জাতীয়তার সীমারেখা লোপ পায় এবং ইহা সমগ্র পৃথিবীরই সাধারণ সম্পত্তি।

- ১৭। তার চেয়ে সাহসী কেহ নাই—যে সাদাকে সাদা এবং কালোকে কালো বলতে ইতস্ততঃ না করে।
- ১৮। আমরা একটা ‘মিশন’ (মহৎ উদ্দেশ্য) নিয়ে জন্মেছি—পৃথিবীকে নতুন করে গঠন করার জন্তুই আমাদের জন্ম।
- ১৯। এটা কি বিচিত্র নয় যে মানুষ ধর্মের নামে এত হানাহানি করে, অথচ ধর্মের অনুশাসন মানতে নিতান্তই উদাসীন?
- ২০। মানুষ কত সুখী হতে পারত যদি সে অপরের বিষয় নিয়ে যতটা মাথা ঘামায় তার চাইতে নিজের করণীয়ের প্রতি বেশী মনোযোগ দিত।
- ২১। জগতে প্রতিভার চাইতে ‘শো’-ই অর্থাৎ দেখানো-ভাব বেশী সম্মান পায়।
- ২২। অধিকাংশ লোকই অপরকে বিচার করে তার ধনসম্পত্তি দেখে অথবা সে লোককে কতটা চমক লাগিয়ে দিতে পারে তা দেখে।
- ২৩। আত্মার সর্বোচ্চ বিকাশ হচ্ছে আনন্দ করার শক্তির উপর। আমরা অপরের ছুঁখে সহজেই ছুঁখ বোধ করি, কিন্তু অপরের সুখে সুখী হতে, অপরের সাফল্যে আন্তরিকভাবে গর্ব অনুভব করতে কয়জন সক্ষম?
- ২৪। যে অপরের ক্ষতি করতে প্রয়াসী সে সাধারণতঃ এমন ভাব দেখায় যেন সে তার ভালো করার জন্তু কত না ব্যগ্র!
- ২৫। যিনি প্রকৃত মহৎ ব্যক্তি তিনি অপরের ক্রেশ দেখলে তার ঐ কষ্টের জন্তু নিজেকেই দায়ী মনে করেন।*

* ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাসের সদ্যপ্রকাশিত জার্মান বই এবং (Easy German Course for Arts & Science students—World Press Calcutta-12) সংগ্রহ থেকে গৃহীত ও অনূদিত।



শিল্পীঘন

—শ্রী বীরেন্দ্র নোবে স্বর্ষ

(পূর্বাহ্নবৃত্তি : আশ্বিন সংখ্যার পর)

তাহলে সম্মাসীকে নিয়ে আপনারা তিনজন। মাকে বলি গে—বালক চলে গেল।

সম্মাসী এবার ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, বললো—ছেলেটা চলে গেল না? একটু আলাপ করতাম। ওকে যতবার দেখেছি, ততবারই অবাক হয়েছি। আশ্চর্য্য মিল। মানুষ মরে গেলে কি আবার ফিরে আসে? নাহলে ও এলো কেমন করে?

হুজনে বিষয়ে সম্মাসীর মুখের পানে তাকালো।

সম্মাসী বললো—পুনর্জন্ম। ভগবান তথাগত বলেছেন জন্মান্তরের কথা, শ্রীমদ্ ভাগবদ্ গীতাতেও তাই বলে। ছেলেটা জাতিস্মর কিনা আলাপ করে দেখলে মন্দ হতো না।

কল্যাণ সদাগরী করে, সহজেই সে অনেক কথা ইঙ্গিতে ধরে নেয়। বললো—এই রকম কাউকে আপনি দেখেছেন বুঝি এর আগে?

—দেখেছি? সম্মাসী বললো—কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি।

—সে কে?

—আমার ছেলে।

—তাকে বুঝি এই রকম দেখতে ছিল?

—দেখতে মানে? এ-ই তো সে-ই।

সম্মাসীর হুচোখ জ্বলে উঠলো।

কল্যাণের ভয় হলো, এই সম্মাসীর মাথায় বোধ হয় কিছু গোলযোগ আছে। কথার মোড় ফিরিয়ে দেবার জন্ত বললো—আপনি তাহলে পূর্ব জীবনে গৃহী ছিলেন?

—গৃহে থাকলে হয় গৃহী, আশ্রমে থাকলে আশ্রমী, পথে থাকলে কি হয় পথী আর বনে থাকলে বনী?—হা হা করে সম্মাসী হেসে উঠলো।

অদ্ভুত হাসি। হাসির এক একটা লহর যেন বুকে এসে ধাক্কা দেয়। হাসি স্তনলে বুক কাঁপে। মনে হয় কে যেন সারা দেহটাকে ছুলিয়ে দিচ্ছে। হাসি থামলেও হাসির ধাক্কা সামলাতে আরো কয়েক মুহূর্ত সময় যায়। সম্মাসী ততক্ষণে আবার ঘরে ফিরে গিয়ে কক্ষে সাজতে বসেছে।

সন্ধ্যারতির পর দেবতার ভোগ দিয়ে পুরোহিত সমাগত অতিথিদের প্রসাদ বিতরণ করলেন। অতিথিদের আহার শেষ না হওয়া অবধি সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। আচমন শেষে বালক মুখস্তদ্ধি এনে দিল। পুরোহিত বললেন—এবার তাহলে আপনাদের অমুমতি নিয়ে আমি যাই।

হরিতকিঞ্চু মুখে দিয়ে সম্মাসী বললো—দেখ কুপারাম!

পুরোহিত ধমকে দাঁড়ালো। বললো—আপনি আমাকে চেনেন?

—গোবিন্দগড়ের চণ্ডিকাদেবীর পূজারী কুপারাম শর্মার নাম এ অঞ্চলে কারও অজ্ঞাত নয়? যাক সে কথা, তোমার পুত্রটি কিন্তু বড় সৎ, আমি এর আচরণে অতীব প্রীত হয়েছি।

—আমার ওই একটিমাত্র সন্তান। আমি ওকে ভাল করে মানুষ করার জন্ত চেষ্টা করছি।

—ওই ছেলে কি জাতিস্মর?

—না। এ কথা বলেছেন কেন?

—ঠিক দশ বছর আগে অমনি একটি ছেলেকে আমি জানতাম। অবিকল ওই চোখ-মুখ। এক অমাবস্তার

রাত্রে এই চণ্ডিকা মন্দিরে তাকে উৎসর্গ করা হয়।
তোমার মনে আছে সে কথা?

পুরোহিত কোন জবাব দিতে পারলেন না।

সন্ন্যাসী বললো—সেই ছেলে এবার তোমার ঘরে অন্ন গ্রহণ করেছে। ঘর বদলেছে, কিন্তু আকৃতি বদলায়নি। তখন আমি ছিলাম তার বাবা, এবার আমি তাই ওকে নিয়ে যেতে এসেছি।

পুরোহিত এবার আর্ত কণ্ঠে চীৎকার করে উঠলো—না না!

সন্ন্যাসী হেসে উঠলো। প্রচণ্ড ছুঁবার নির্মম অট্টহাসি। সে হাসি আর ধামে না, স্বর যেন উত্তর-উত্তর তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। সূচের মত সে ধ্বনি বুকে এসে বেঁধে, মাথার মধ্যেও ঝিম্ ঝিম্ করে ওঠে। একটা শ্বাসরোধী অবসাদ যেন অন্ধকারের ভিতর থেকে এসে চেপে ধরে। দেহের আর ঠিক থাকে না। মাথা ঘুরে যায়।

কখন যে হাসি ধামে দেবকুমার তা টের পায় না, কানের কাছে আর্তনাদ শুনে চোখ মেলে। দেখে পুরুত ঠাকুর সন্ন্যাসীর ছুঁপা জড়িয়ে ধরেছে, আর্তকণ্ঠে বলছে—আমি আপনার ক্রমা প্রার্থী, ক্রমা করুন। আমার ওই একমাত্র সন্তানকে আপনি গ্রহণ করবেন না।

সন্ন্যাসী বললো—তুমি তো ব্রাহ্মণ—আত্মবৎ সর্বভূতেষু। পরের ছেলেকে ষপকাঠে তুলে দিয়ে যে পাপ করেছে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

—আপনি যা বলবেন, তাই করবো।

—বেশ কাল প্রত্যুষে তোমাকে আমি ইতিকর্তব্য নির্দেশ দোব।

পুরোহিত মন্দির দ্বার বন্ধ করে পুত্রের হাত ধরে বিদায় নিল।

প্রথমে সন্ন্যাসীকে যত সহজ গজিকাসেবী মানুষ বলে মনে হয়েছিল এখন আর তা মনে হয় না। এখন মানুষটির এতো কাছে থাকতে কেমন যেন গা ছম্ছম্ করে। পিদিমের স্নান আলোয় দেবকুমার সভয়ে সন্ন্যাসীর মুখের পানে তাকিয়ে থাকে।

সন্ন্যাসী বিনা বাক্যব্যয়ে গীজা সাজতে বসে।

কল্কেতে রীতিমত একটা টান দিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললো—এখন আমাকে দেখে খুব ভয় করছে না?

কল্যাণ কথা বললো। বললো—আপনার হাসি শুনলে সত্যিই ভয় করে।

—ওই হাসি যে ভয় করানোর জন্তই। সন্ন্যাসী বললো—আমি শব্দতত্ত্বের সাধনা করেছি দীর্ঘকাল। এই তত্ত্বের শ্রেষ্ঠ সাধক ছিলেন হুমান, বায়ুতত্ত্বকে তিনি আত্মস্থ করেছিলেন, করে মহাশক্তি লাভ করেছিলেন, তাই তার নাম পবননন্দন মহাবীর। বায়ুতত্ত্বেরই আংশিক সাধনা শব্দতত্ত্ব। শব্দকে আমরা দেখি না, শুনি। বাতাসে ঢেউ ওঠে, সেই ঢেই আমাদের কানে এসে বাজে, কান থেকে সঞ্চারিত হয় মনে, শব্দের ভাবাভুযায়ী ক্রোধ ভয় দুঃখ আনন্দ সঞ্চারিত হয় হৃদয়ে। সেই মনোভাব তখন দেহকর্মে প্রকাশ পায়। “ক্রোধ অপরকে আঘাত করে। ভয় দেহকে বিকল করে, দুঃখ চোখে জল আনে, আনন্দ মুখে হাসি ফোটায়। এই শব্দ-তত্ত্বের মাত্রা আছে, কতকটা আমরা সহিতে পারি, তার বেশি হলে আর সহ্য না। বজ্রপাতের শব্দ অসহনীয়, আমাদের জ্ঞান হরণ করে। সেই শব্দ দুর্বল হৃদপিণ্ডকে শুষ্ক করে দেয়। শব্দ দিয়ে মানুষের দেহ ও জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করা চলে। পুরাকালে মুনিগণেরা তপোবনে এই শব্দতত্ত্ব সৃষ্টি করতেন, তা শুনে বনের পশুরা পালিয়ে যেতো। আমি সেই শব্দতত্ত্বের সাধনা করেছি, এই হাসি তারই প্রকাশ। ওই হাসি আরো উচ্চস্থানে তুললে তোমরা মারা যেতে। তাই আমি শেষে সংযম করলাম। একেই পুরাণে বলেছে শব্দভেদী বাণ।

সন্ন্যাসী আবার কল্কে ফুঁকতে শুরু করলো।

দেবকুমার ও কল্যাণ তার মুখের পানে তাকিয়ে রইল।

ছিলিম শেষ করে সন্ন্যাসী বললো—রাত হলো, এবার শুয়ে পড়। আলোটা নিভিয়ে দিই।

সন্ন্যাসী ফুঁ দিয়ে আলোটা নিভিয়ে দিল।

কল্যাণ দেবকুমারের হাতে একটু চাপ দিয়ে বললো—শুয়ে পড়ো।

ঘুম ভাঙলো শেষ রাত্রে। ভাঙলো আকস্মিক। রাজির অন্ধকার তখনও হালকা হয়নি, এমন সময় ঘুম

ভাঙার কথা নয়। দেবকুমার অন্ধকারে চোখ মেলে তাকিয়ে রইল। মুক্ত দ্বারপথে এক আকাশ নক্ষত্র চোখে পড়ে।

পরক্ষণেই সে শুনে গেল, কে যেন কাকে ডাকছে—
শিবরাম! শিব-রাম! শিব-রাম!

কয়েক মুহূর্ত পরেই দেখা গেল, দ্বারের সামনে দিয়ে দুটি মানুষের ছায়া চলে গেল।

কল্যাণ দেবকুমারের হাতখানি চেপে ধরে ডাকলো—
দেবকুমার!

—কী?

—ঘুম ভেঙেছে।

—অনেকক্ষণ।

—শুনেছ নিশির ডাক?

—হ্যাঁ।

—সন্ন্যাসী পুরুতের ছেলেটাকে ডেকে নিয়ে চলে গেল।

—দেখলাম।

—চল, আমরা ওয় পিছনে যাই, যদি ছেলেটাকে
রক্ষে করতে পারি।

—ওই হুঁদাস্ত সন্ন্যাসীর সঙ্গে পেরে উঠবে?

—আমরা দুজন আর ও একা। ভয় কিসের চলো।

—চলো!

দুজনে শয্যা ত্যাগ করলো, তারপর মাথাধ পাগড়ী
বৈধে, কাঁধে ঝুলি ঝুলিয়ে হাতে লাঠি নিয়ে বেরিয়ে
পড়তে তাদের দু' মিনিটের বেশী লাগলো না।

কিছু পথের অন্ধকারে কাউকে তো দেখা গেল না।
কল্যাণ বললো—এই দিকেই গেছে, তোবের আলো
ফুটলেই আমরা ওদের ধরে ফেলবো।

দুজনে সেই অন্ধকারেই অগ্রসর হলো।

রাত তখন তৃতীয় প্রহর শেষ হয়েছে। প্রহরখানেক
পথ চলাব পর উবালোক ফুটলো, দু'পাশের বনভূমি ধীরে
ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। সামনে যতদূর দেখা গেল
কোথাও আর কোন পথিক তাদের নজরে পড়লো না।
প্রভাতের পথ নীরব জনহীন। কল্যাণ বললো—যাক
এগিয়ে তো যাই, শেষ অবধি খাজুরাপুরে পৌঁছাবো।

অপরাহ্ন বেলায় এক জনপদের প্রান্তে এসে তাঁরা
পৌঁছালো।

কল্যাণ বললো এসে গেছি, এই গ্রামের পিছনেই
নিলোরা তালো, ওপারে খাজুরাপুর।

সোজাপথ ছেড়ে একটি ভূটা ক্ষেতের পাশ দিয়ে
কল্যাণ একটি শাখা পথ ধরলো।

ক্ষেত পার হয়েই দু'তিনখানি মেটে বাড়ী। তারপর
বাগান। তারপর পর পর কয়েকখানি পাকা বাড়ী। প্রথম
বাড়ীখানির দ্বারে গিয়ে কল্যাণ হাঁক দিল—বিন্দন!

পরক্ষণেই একটি মেয়ে এসে দাঁড়ালো দ্বারে, কি যেন
বলতে যাচ্ছিল, দেবকুমারকে দেখেই থমকে গেল।
কল্যাণ হেসে বললো—অতিথি এসেছে, অনেক দূর থেকে
সঙ্গে কবে এনেছি। যোগিনীঘাটের গোষ্ঠী মণ্ডলের পুত্র
দেবকুমার। ভাস্কর, এসেছে খাজুরাপুরের মন্দির দেখতে।

ভরুণী পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো দেবকুমারের মুখের
পানে। দেবকুমার এতক্ষণ তার মুখের পানেই তাকিয়ে-
ছিল, এ মুখ তার একান্ত চেনা, এ যে নিরালা।

ভরুণী আর দাঁড়ালো না, বাড়ীর মধ্যে চলে গেল।

কল্যাণ বললো কি থমকে দাঁড়িয়ে গেলে যে,
ভিতরে চল।

—অবাক হয়ে গেছি—দেবকুমার বললো।

—কেন?

—একে দেখতে অবিকল আমার এক প্রতিবেশী-
কন্তার মত।

—তাতে আর বিষয় কি আছে, হুঁজুন মানুষকে কি
একরকম দেখতে হয় না? এর পিতৃগৃহ খাজুরাপুরে,
যোগিনীঘাট এ কখনও দেখেনি।

দেবকুমার সে কথায় কোন সাড়া দিল না, তার মন
তখন নিরালার কাছে ফিরে গেছে। যে মেয়েটিকে
এড়িয়ে চলার জন্ত সে গৃহত্যাগ করে চলে এলো, এতো
দূরে এসেও তার সান্নিধ্য থেকে মুক্তি নেই। এখানেও
তার অহরূপ তার চোখের উপর তুলে ধরলো।

অশ্রুট স্বরে দেবকুমার বললো—এখানে আমি
বেশীদিন থাকবো না ভাই, কালই খাজুরাপুর যাবো।

—আরে এক ক্রোশ তো পথ, তুমি রোজ যাবে,
ভাবনা কী! যতদিন তোমার ইচ্ছা, দেখবে। সেই
দেখাতেই তো এনেছি।

দেবকুমারের মনের কথাটা কল্যাণ বুঝলো না, দেবকুমারও খুলে বলতে পারলো না।

বাড়ীতে ছুটি মাত্র প্রাণী, কল্যাণ ও বিন্দন। স্বামী-স্ত্রী। সদাগরি করে কল্যাণের পিতা উপার্জন করেছিলেন। মাটির বাড়ী ভেঙে তিনি পাথরের বাড়ী তৈরি করিয়ে ছিলেন। তবে বাড়ী বড় করেননি, পিছনে বাগান রেখেছিলেন। চারখানি ঘরের ছোট বাড়ী। বাইরের ঘরখানিই ছিল অতিথি অভ্যাগতদের জন্য, দেবকুমার সেই ঘরেই আশ্রয় পেল।

পিতা একমাত্র পুত্রের জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত সংস্থান করে গিয়েছিলেন, সদাগরি করার তাগিদ পুত্রের ছিল না। সে হয়ে উঠেছিল সৌখীন স্বরকার। তার এই স্বরের সঙ্গিনী বিন্দন।

রাত্রে আহার শেষে কল্যাণ বললো—আমার আসল পরিচয়টুকু তুমি এখনও জানো না—সেই পরিচয় এবার পাবে।

—কী ?

—স্বর। আমি বাণী গাঁথি বিন্দন তাতে স্বর দেয়। ওর কণ্ঠে বাগদেবী আছেন। যতই শোনো, আশ্চর্য মিটেবে না।

—আমি সঙ্গীত ঠিক বুঝি না, আমি তো পাথর কাটি।

—বুঝতে হবে না, স্বর ঘুমিরে আছে সবাইকাব মনে, সারা জগৎ স্বরে বাঁধা; কেউ সেই স্বরকে জাগিয়ে তোলে আবার কেউ সেই স্বরকে জাগিয়ে ফেলে। তোমার স্বরকে তুমি জাগিয়ে ফেলেছ, স্বরকার আবার তাকে জাগিয়ে তুলবে।

—তাহলে আমাকে আবার গান শিখতে হবে বল ?

—শিখতে হবে না, তোমার মধ্যেই স্বর আছে, স্বর ছাড়া শিল্প হয় না, পাথরের মূর্তি যদি বেহুঁরো হয়, তাহলে তা আর চোখে লাগে না। খাজুরাপুরীর মন্দিরে দেখবে প্রতিটি মূর্তি এক স্বরে বাঁধা। আল্লা একেছে তাতে স্বর আছে, ছন্দ আছে। তবে সে হলো পাথরের কঠিন স্বর আর আমার হলো শব্দের কোমল স্বর। একটা চোখকে আনন্দ দেয়। আরেকটি কানকে আনন্দ দেয়। স্বরের সৃষ্টিই হলো আনন্দের জন্ম। ঋষিরা বলে গেছেন শগবান আনন্দময়। বিন্দনের কণ্ঠ শুনেলে তুমি বুঝবে স্বরের আনন্দ কী ? এই পৃথিবীতে তোমার আর মন থাকবে না। মন হারিয়ে বাবে গানের স্বরের সঙ্গে।

বিন্দনকে দেখে দেবকুমার জন্ত হয়ে উঠেছিল, চেয়েছিল এড়িয়ে চলতে, কিন্তু তা আর হলো না।

আহারাদির পর কল্যাণ একটা স্বরবাহার নিয়ে বসলো, কিছুক্ষণ ধরে রাগ রাগিনীর আলাপ করলো, তারপর ডাকলো বিন্দনকে বললো—অতিথি তোমার গান শুনতে চায়।

বিন্দন হাসলো, বললো—আজ্ঞেই ?

কল্যাণ বললো—আজ নয় এখনই। সন্ধ্যাচের কোন কারণ নেই, অতিথি নারারণ, তুমি অসন্ধ্যাচে গাইতে পার।

বিন্দনের মুখে পানে তাকিয়ে দেবকুমার বিব্রত বোধ করলো, বললো—এইমাত্র আহার শেষ করেছেন, এখন...

বাধা দিয়ে কল্যাণ বললো—এতো আজ নতুন নয়, প্রতি রাত্রেই এই সময় আমাদের গানের আসর বসে। এই সময়টাই সঙ্গীতের প্রশস্ত সময়, চারিপাশের শুদ্ধতার স্বরের লহর জমে ভালো।

বিন্দন আর কিছু বললো না। সামনের জলচৌকি-খানির উপর বসলো। মুহূর্তে বসে বললো—তোমার নতুন গানে স্বর দিয়েছি, সেইটাই তাহলে আগে গাই।

পরক্ষণেই বিন্দনের কণ্ঠ শুন্ শুন্ সাড়া তুললো। কল্যাণ ধরলো স্বরবাহার।

ধীরে ধীরে স্রমিষ্ট কণ্ঠ জোয়ারের ঢেউয়ের মত সমস্ত মনকে ডুবিয়ে দিল। ভাসিয়ে দিল সব চিন্তা। স্বর আর স্বর। মুহূর্তের বন্ধারে একটা অব্যক্ত আনন্দ বোধ মনের কূলে কূলে ছাপিয়ে উঠলো। দেবকুমার মুগ্ধ বিশ্ময়ে তাকিয়ে রইল বিন্দনের মুখের পানে। বার বার তার মনে হতে লাগলো, নিরালাকে এমন করে তার সামনে এনে বসিয়ে দিল কে ! যে নিরালাকে ছেড়ে সে পালিয়ে এল কবেক যোজন পথ, অদৃষ্ট তারই দ্বারে এনে পৌঁছে দিল !

পর পর দুখানি গান গেয়ে বিন্দন উঠে পড়লো, বললো—আজ আর নয়, আপনারা পরিশ্রান্ত, দীর্ঘপথ অতিক্রম করে এসেছেন, আজ বিশ্রাম করুন।

কল্যাণ বললো—কেমন শুনলে ?

দেবকুমার বললো—অপূর্ব।

—তবে যে বলেছিলে গান তুমি বোঝ না ?

—এ গান তো বোঝার দরকার হয় না, এতো অন্তরে আনন্দ সৃষ্টি করে।

(ক্রমশঃ)

বৈদিক সর্প

শ্রীরাজমোহন নাথ, বি. ই., তত্ত্বভূষণ

শতপথ ব্রাহ্মণ নামক গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মতাবলম্বী লোকেরা যজ্ঞস্থলে সমবেত হইয়া দশদিন ব্যাপী অস্থগ্ৰীত সাংস্কৃতিক সম্মেলনে বিভিন্ন বেদের আলোচনা করিতেন (১৩।৪।৩।২)। তন্মধ্যে একটি বেদের নাম ছিল সর্পবেদ, এবং ঐ বেদের আলোচনায়—“সর্পাশ্চ সর্পবিদাশ্চ উপসময়েতাঃ”—সর্পজাতীয় লোকেরা এবং সাপুঁড়গণ সমবেত হইত। ইতিহাস বেদের আলোচনায় “মংস্তাঃ” মংস্তহনাশ্চ—মংস্তজাতীয় লোক এবং মংস্তজীবীগণ, এবং পুরাণবেদের আলোচনায়—“বয়্যাসি বায়বিদবিকাশ্চ”—পক্ষীজাতীয় লোক এবং পক্ষী-শিকারীগণ যোগদান করিত।

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, সর্পবেদ, ইতিহাসবেদ এবং পুরাণবেদ নামক তিনটি বেদ তিনটি সম্প্রদায়ের দর্শন ছিল, এবং ঐ দর্শনের দুইটি ধারা ছিল :—একটি দর্শন-বিজ্ঞানমূলক সাধন ধারা, এবং অপরটি লোকায়তিক ধারা। সর্প, মংস্ত ও পক্ষীজাতীয় লোকেরা ছিলেন প্রথম ধারার অন্তর্গত, এবং তাঁহাদের বেদ-দর্শনামুযায়ী তাঁহাদের জাতির নামকরণ হইয়াছিল। বাস্তব সর্প, মংস্ত ও পক্ষী ধরিয়৷ জীবিকার্জনকারী নিম্ন-শ্রেণীর লোকেরা ছিল তত্ত্ব ও বেদ-দর্শনের লোকায়তিক ধারার অমুখ্য।

গোপথ-ব্রাহ্মণ নামক গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, পূর্ব-দেশে সর্পবেদের বেশী প্রচলন ও আলোচনা হইত—“সখলু প্রাচ্য এব দেশঃ সর্পবেদং নিরমিমস্ত” (১।১।১০)। ঐতরেয় আরণ্যক নামক গ্রন্থে “বয়্যাসি বজ্র-বগধাঃ চেরপাদা (২।১।৬)—বজ্র-বগধ, পক্ষী এবং সর্প (ইরপাদ) নামক তিন জাতি (তিন প্রজাতি) লোকের উল্লেখ আছে। পক্ষী ও সর্পজাতি লোকের উল্লেখ শতপথ ব্রাহ্মণেও পাওয়া গিয়াছে। বজ্রবগধ জাতি সম্পর্কে সায়নাচার্যের মত হইল—বজ্র বৃক্ষ, বগধ (অবগধ = নীচের দিকে শিকড় প্রবেশ করিয়া বাহ্য বর্ধিত হয়) = ওষধি (লতা-গুল্মাদি)। অর্থাৎ বজ্র-বগধ জাতি হইল বৃক্ষ-লতা-গুল্মাদির উপাসক। ঋগ্বেদে বলা হইয়াছে যে, কীকটদেশে (মগধ) বৈদিক অগ্নিহোত্র যাগ-যজ্ঞ ও দেবতাবাদবিরোধী এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতি ছিল, তাঁহারা ছিল “নৈচাশাধ” (ঋ ৩।৫০।১৪)—অর্থাৎ অগ্নিহোত্র (যার শাখা নিম্নদিকে মাটিতে নামিয়া) একটি বৃক্ষে পরিণত হয়) বৃক্ষের উপাসক। ভাগবত পুরাণের

মতে গৌতমবৃক্ষের জন্ম কীকটদেশে (১।৩।২৪)। গৌতম-বৃক্ষ বটবৃক্ষমূলে সাধনাকালে বোধি লাভ করিয়াছিলেন, এবং তৎপূর্ববর্তী কাশ্যপ-বৃক্ষ অগ্নিহোত্র বৃক্ষমূলে বুদ্ধ লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বোধি বা প্রজ্ঞার সহিত বৃক্ষের দর্শনমূলক ধারণা আদিবৈদিক যুগের ব্যাপার। যজ্ঞভূমির বৃক্ষালিঙ্গনে ক্ষাত্রগণসম্পন্ন এবং অশ্বথ বৃক্ষালিঙ্গনে বেদজ্ঞানসম্পন্ন পুত্রলাভের পৌরাণিক কাহিনী জবদগ্নি ও বিশ্বামিত্রের জন্মবৃত্তান্তের সহিত জড়িত।

যাহার মধ্যে বিশ্ব-প্রাণশক্তির প্রাথমিক জ্যোতিঃ (বসু, উষ্) অধিষ্ঠিত হইয়া প্রাথমিক জৈব-পদার্থরূপে প্রকটিত, তাহার নাম ওষধি। পৃথিবীতে নিম্নদিকে শিকড় মেলিয়া স্থিত হইয়া দ্যুলোকের দিকে মস্তকোত্তলন পূর্বক আরোহণ (রূহ) করা ইহার স্বভাব; সেই জন্ত ওষধি তথা বৃক্ষগুল্মতাদির অপর নাম বীক্শ্ব। অথর্ববেদে বলা হইয়াছে—যাহা দ্বারা বীক্শ্ব প্রাণশক্তি সম্পন্ন হয়, তাহা পৃথিবীতেও থাকে না, দ্যুলোকেও থাকে না; অন্তরিক্ষের সদা চাকলোর মধ্যে উহার অধিষ্ঠান—“ন তৎ পৃথিব্যাং নো দিবি যেন প্রাণস্তি বীক্শ্বঃ, অন্তরিক্ষ আসাং শ্বাম শ্রাস্ত সদামিব” (১।৩২।১-২), এবং উহাই সর্বভূতের জীবনীশক্তির উৎস—“আস্থান মস্ত ভূতস্ত”। বৈদিক ভাবনায় আবার দিবালোকের প্রাক-জ্যোতিঃ-তথা উষার (বসু, উষ্) বলকের সহিত বোধি বা প্রজ্ঞাপারমিতা বা প্রাতিভসংবিতের উপমা দেওয়া হয়। বৈদিক কবি উষার শুভিতে মুগ্ধ; তাঁর উষা জ্ঞান ও জীবনীশক্তির শুদ্ধ-স্বচ্ছ প্রতিমারূপিণী একটি অস্পৃষ্টা, সদাকাশ্য। কুমারী। পরবর্তী যোগশাস্ত্রেও ঋতন্তরা প্রজ্ঞা বা প্রাতিভ-সংবিন্দকে—“পূর্বরূপং বিবেকজ্ঞানস্য উষা যথা রবেঃ” বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই জন্তই অশ্বথের তথা বীক্শ্বের সহিত প্রাণ ও বোধিশক্তির সম্পর্ক।

প্রাক-মধ্যযুগীয় মগধাঞ্চলবাসী গুহসাধক সম্প্রদায়ের রচিত চর্যাপদে মানবদেহকে একটি বৃক্ষ বলিয়া বঙ্গনা করা হইয়াছে—“কায়্য তরুণর পঞ্চ বি ডাল” (চর্য্য-লুইপাদ-১)। শৈবদর্শনে শিবের সংজ্ঞা অহং, শক্তির সংজ্ঞা ঈদম্। তিব্বতী মহাযানে এই ঈদম্—য়িডম্, যিডম্-মা, ডমেমা, ওষা, ডোষী আদি নামে পরিচিত। উপরোক্ত চর্য্যাকার গুহসাধকদের নিকট তিনি ডোষী বা ডোষিনী, জীবনী-শক্তি ও প্রজ্ঞাপারমিতা স্বরূপিনী। বৈদিকযুগের সাধনপন্থার স্মৃতি অমুসারে আবার তাহার

নাম বি+রুহ্+আ বা বীরুবা। রুহবজ্ঞপাদনামক একজন সাধক তাঁহার চর্যায় ডোম্বীর প্রশস্তিতে বলিয়াছেন—

“কেহো কেহো ভোহোরে বিরু আ বোলাই
বিহুজন লোঅ তোরে” কণ্ঠ ন মেলই।”

—(চর্য—১৮।৪)

আর একজন চর্যাকার সাধকের নাম বিরু বা পাদ; তিনি তাঁহার চর্যাপদে (চর্য-৬) ঐ বীরুবা ডোম্বীকে কুস্তীর বা ঘড়িয়ালের (গরাহক, ঘড়ুলি) সহিত তুলনা করিয়াছেন।

বীরুহ তথা ওষধি একটি স্বভাব হইল এই—কুস্ত্র একটি বীজের কেন্দ্র-কোষে একটি বিশাল বৃক্ষ তাহার সর্বাঙ্গকে কুণ্ডলীকৃত সর্পের স্তায় শুটাইয়া অদৃশ্যভাবে স্তম্ভ থাকে। জল-বায়ু-উত্তাপ স্পর্শে ঐ সর্প প্রথম অকুরাকারে মুখটি নির্গত করে এবং তারপর ধীরে ধীরে ঋত ও ছন্দামুসারে সর্পের স্তায় লম্বিত গতিতে যেন ফণা উদ্ভিত করিয়া উর্ধ্ব দিকে আরোহণ করে। ওষধির এই স্বভাবটি জীবের প্রাণ, জ্ঞান এবং অগ্নি, জলপ্রোত ও বিদ্যুতেও সমভাবে লক্ষণীয়। সেই জন্ত অধর্ববেদের ঋষি একটি মন্ত্রে গাহিয়াছেন—

“যে অগ্নিঃ ওষধিঃ অহীনাং

যে অঙ্গুজা বিদ্যুত আবহুঃ।

যেবাং জাতানি বহধা মহাস্তি তেভ্যঃ

সর্পেভ্যো নমসাবিধেম ॥”

(১০।৪।২৩)

অগ্নি, ওষধি ও জলোদ্ভূত এবং বিদ্যুতে প্রকটিত যেন সকল অহিকুল, যাহাদের উৎপত্তিতে বহুবিধ মহাশক্তির বিকাশ হয়, সেই সর্পগণকে নমস্কারের দ্বারা স্তুতি করি।—ঋগ্বেদের ঋষির দৃষ্টিতে বায়ুর স্পর্শে অগ্নি সর্পকুণ্ডলীর স্তায় আকাশে উদ্ভিত হয়—“বিয়দস্তাদ্যজ্ঞতো বাতো চোদিতা-স্বারোন” (ঋ ১।১৪।১৭); গাভীর বাটস্থ দুগ্ধধারা বৃক্ষ-মধ্যে কুণ্ডলাকারে সঞ্চরমান সর্পের স্তায় শুচি—“অস্ত-র্ষধিনো বা যুতঙ্গু হবারো ন শুচি” (ঋ ১।১৮।১৩); লোমযুক্ত ভেড়ার চর্মনির্মিত ছাঁকনীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত সোমরস ও স্ত্রী ও চাকচিক্যময় সর্পের স্তায় দেখায়—“ঈক্ষেণ্যাসো অহ্যোহন চারবঃ” (ঋ ২।৭।১০)। সূর্যের

রশ্মি জীবনীশক্তি-বর্ধক এবং ধী-প্রচোদক। এই রশ্মি প্রবাহে স্পন্দন তথা শব্দ, স্বর বা রব ওতপ্রোতভাবে স্বভাবজ ধর্মরূপে ছড়িত; তাই সূর্য, রবি—নামকরণ। সূতরাং সূর্যরশ্মির অন্তর্নিহিতা স্পন্দনাত্মিকা শক্তি-সম্পন্নী বাক্ এবং তিনি সূর্যের হৃদিতা—“সম্পন্নী মতিং বাধমানা বৃহন্মিয়াম আসুর্ষস্ত হৃদিতা ততান” (ঋ ৩।৫৩।১৫)। এই সূর্যহৃদিতার বিবাহ হয় সোম-রাজার সহিত, তিনি দ্যুলোক চন্দ্রাতপযুক্ত মন-রূপরূপে আরোহণ করিয়া অগ্রবর্তী অগ্নির দ্বারা প্রদর্শিত পথে স্বামীর গৃহে গমন করেন (ঋ ১০।৮৫।১৫)।

বৈদিক ভাবনায় বাস্তব সৃষ্টিকারিণী আদ্যাশক্তি হইলেন স্পন্দনাত্মিকা শক্তি (dynamism in the spirit of vibration); বৈদিক সাহিত্যে তাহার নাম বাক্, বিরাজ, ধেমু, গৌ।—“ধাবৎ ব্রহ্মবিত্তং তাবতি বাক্” (ঋ ১০।১১।৪৮) এবং তিনিই স্রোতির্ময়ীরূপে জীবের প্রাণ ও অপান বায়ুর (স্বাস-প্রশ্বাস) গতির অন্তর্ভুক্তি হইয়া বিচরণ করেন—“অন্তশ্চরতি রোচনা অন্ত প্রাণাদপানতী” (ঋ ১০।১৮।২২); তিনিই দেবতা, মানুষ ও সর্বজীবের বাক্ শক্তিদায়িনী ও মেধাপ্রচোদন কারিণী (ঋ ১০।১২।৫); তিনিই বিশ্বভুবনময় সমভাবে বিরাজিতা এবং বিদ্যারূপিণী হইয়া প্রত্যেকটি জীবচিহ্নে স্বরূপে অধিষ্ঠিতা—“বিদ্যাস্তবন্তী প্রতি বত্ৰীমোহত” (ঋ ১।১৬।৪২২), তিনিই মর্ত্য ও অমর্ত্যকে যুগপৎ নিজের যোনির মধ্যে নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন “মর্ত্য ও অমর্ত্যেণ স যোনিঃ” (ঋ ১।১৬।৪৩০)। ঋগ্বেদ নামদীর স্কন্দমতে প্রাক-সৃষ্টিকালীন শাস্ত্রাতীত অবস্থায় পুরুষ ও তাহার ধারিকা শক্তি ‘স্বধা’ অব্যাক্তভাবে একীভূত হইয়াছিলেন। সৃষ্টির প্রাথমিক সংস্কার ক্ষোভে স্বধা পুরুষ হইতে বিমর্শা (এলাইয়া পড়া) হওয়ার সময় মনস্ প্রকটিত হয়, এবং মনসের রেতরূপে (Radiation) কামের (Cosmic elemental) উদ্ভব হয়—“কাম স্তদগ্রে সমবর্ততাধি মানসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ” (ঋ ১০।১১।২৪); অধর্ববেদের মতে এই কামের হৃদিতাই বাক্, যাহার অপর নাম ধেমু ও বিরাজ (২।২।৫)। বারাস্তরে ইহার তাত্ত্বিক দিক আলোচনা করার ইচ্ছা রহিল।

শুভঙ্করের

মন্দা'-নন্দা'র দেশে ৪-০০

(নূতন দৃষ্টি ও আলিকে উপভাসোপম ভ্রমণ কাহিনী)

শ্রীশ্রীলপ্রসাদ সর্বাধিকারীর

সতীরানী ৩-০০

(সমুন্নত দাম্পত্য জীবনের অল্পম আলেখ্য)

॥ প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৬১নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ॥

শ্রীমতী সৃজাতা রায়

শ্রীতারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

কালকের আউটডোর শূটিংয়ের জন্তে লোকেশ্বন স্থির করে ফিরছে চিত্রপরিচালক জয়ন্ত। ডায়মণ্ডহারবার রোড দিয়ে অবিশ্রান্ত ছুটে চলেছে ওর কালো রঙের ছোট স্ট্যাণ্ডার্ডটেন। অস্তপ্রায় সূর্য এলোমেলো রাঙিচ্ছ ছড়িয়ে দিবেছে পশ্চিমের আকাশে।

ক্রমে প্রান্তর পেরিবে, শহরতলী অতিক্রম ক'রে মহানগরীর সীমানায় এসে পড়লো ওরা। ক্যামেরাম্যান ও প্রোডাক্শন্-ম্যানেজার-এর গন্তব্যস্থল ওই দিকেই। ওরা একে একে বধ্যস্থানে বিদায় নিলো।

মধ্য কলিকাতার দিকে এগিয়ে চলেছে জয়ন্তর গাড়ী। ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলে ও : মিসেস্ রায়-এর বাড়ী চলো।

মিসেস্ রায় জয়ন্তর ছবির নবাবিকৃত নায়িকা। ছায়াছবিতে এই ওর প্রথম আবির্ভাব। প্রথম সাক্ষাতেই জয়ন্ত ওকে মনোনীত করেছিলো। আশ্চর্য দেহ-সম্পদের অধিকারিণী মিসেস্ রায়। স্বাস্থ্যের স্বাক্ষর ওর সর্বাদ্বে সুস্পষ্ট। সমুদ্রের গভীরতা ওর চোখের দৃষ্টিতে আর অলিভ-শ্যামল দেহ-বর্ণে ওর আকর্ষণীয় উজ্জ্বলতা।

প্রথম সাক্ষাতের দিনে ছবির কাহিনী ও নায়িকার চরিত্রের ব্যাখ্যা শুনে খুসীতে বলমলিয়ে উঠে বললে মিসেস্ রায় : কি অপূর্ব চরিত্র। আমার এতো ভালো লেগেছে যে বলবার নয়। আমি পারবো জয়ন্তবাবু। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমি পারবো।

মিসেস্ রায়ের সুবিভক্ত দেহের অঙ্কুরালে বলিষ্ঠ মনে যে আত্মপ্রত্যয়ের স্বর অহুরণিত হলো, অভিব্যক্ত হলো ওর কথায় আর ভঙ্গীতে—জয়ন্তকে তা স্পর্শ করলো। জয়ন্ত পাকা কথা দিয়ে দিলো।

তারপর মাত্র মাস তিনেক অতীত হয়েছে। শূটিং হয়েছে দিন বিশ বাইশেক! এর মধ্যে বহুবার যেতে হয়েছে জয়ন্তকে ওর বাড়ী। আলাপ হয়েছে মিঃ রায়ের সঙ্গে। প্রগাঢ় ভাব হয়েছে ওর একমাত্র মেয়ে সীমার সঙ্গে। মিঃ রায় হাসিখুসিতে উজ্জ্বল প্রিয়দর্শন যুবক।

শুধু শিক্ষিতই নয়, নামকরা সাহেবী কনসার্নের পদস্থ চাকুরেও। আর সীমার বয়েস বছর আড়াই—দেখতে একেবারে জাপানী ডল-পুতুলের মতো! ওদের ছোট্ট সংসারের অনাচে কানাচে যেন আনন্দ আর তৃপ্তি উকি-ঝুঁকি মারে। অদ্ভুত ভালো লাগে জয়ন্তর।

জয়ন্তকেও ওরা প্রত্যেকে শুধুই ভালোই বাসে না—রীতিমতো প্রজ্ঞাও করে। একদিন মিসেস্ রায় জয়ন্তকে বললে : কাল মিঃ রায় আপনার সম্বন্ধে কি বলছিলো জানেন?

—হ্যাঁ, জানি। আশ্চর্য নির্লিপ্ততা জয়ন্তর কণ্ঠে।

—কি করে জানলেন? বিস্মিত প্রশ্ন মিসেস্ রায়ের।

—এ তো জানা কথা। ফিল্ম-লাইনের লোক সম্বন্ধে অপরাধের সেই একই আদি এবং অকৃত্রিম ধারণা। অর্থাৎ সভ্য সমাজের বাইরের এলাকার বাসিন্দা আমরা।

প্রতিবাদের স্বর ধ্বনিত হ'লো মিসেস্ রায়ের কণ্ঠে : সেটাই নিয়ম নয়। তার মধ্যেও ব্যতিক্রম থাকে। মিঃ রায় বলছিলো, অভিজাত ও সাধারণ সমস্ত সমাজেই মেলামেশা করতে হয়। কলকাতার সহরে শিক্ষিত-অশিক্ষিত আত্মীয় বন্ধু আর পরিচিতের সংখ্যাও অসংখ্য।

কিন্তু তাদের মধ্যে আমার প্রজ্ঞা আকর্ষণ করতে পেরেছে যাত্রা ছ'চার জনই। আর জয়ন্তবাবু তাঁদেরই একজন।

নিরুদ্ভাপ উত্তর দিলে জয়ন্ত : তাঁকে আমার ধন্যবাদ।

মিসেস্ রায়ের একমাত্র অস্থবোগ : অদ্ভুত লোক আপনি জয়ন্তবাবু। আমার এখানে আপনাকে কোনো-দিন ওই মহাভারত মার্কী ডায়রী আর ফ্রিণ্ট-কাইল ছাড়া আসতে দেখলুম না। কিম্বা কাজের কথা ছাড়া অল্প কিছু বলতে শুনলুম না। আচ্ছা, কাজ ছাড়া কি কোনোদিন আমার বাড়ী আসতে নেই।

সেই কাজেরই তাগাদ। কাল প্রায় তোর রাজ্জেই শূটিংয়ে বেরোবার জন্তে তৈরী থাকতে হবে মিসেস্ রায়কে। এ সংবাদটা এখনও না দেওয়া হলে আর কখন দেবে? সেই ভাগিদেই আজও জয়ন্ত মিসেস্ রায়ের দরজায় উপস্থিত।

রাস্তার ওপরেই দোতলার পরিচ্ছন্ন ফ্ল্যাট। মোজাহকের সরু সিঁড়ি দিয়ে উঠেই দরজা। দরজা ডুইংকমের। অপারিসর ডুইংকমে সামান্য কয়েকটি আসবারপত্র। ঝটির প্রকাশ আছে তাতে, কিন্তু সম্পদের সাক্ষর নেই। চার পাঁচশো টাকার আয়ের সংসারে একছোড়া দক্ষ ও গোচালো হাতের স্পর্শ ছাড়া এতোখানিও সম্ভব নয়। একটি মাঝারি সাইজের তিন পিস সোফা সেট—সেন্টার টেবুল একটা আর ঘরের এক কোণে একটা স্ট্যান্ডের ওপর ছোট্ট একটা একোয়্যারিয়ম। এ ছাড়া ঘরে আর কোন আসবাব নেই। একটি মাত্র দেওয়ালে একখানি মাত্র ছবি। ইম্প্রেশনিস্টিক স্টাইলে আঁকা খ্রীস্টমসের।

দরজায় কলিংবেলের কোনো আয়োজন নেই। জয়ন্ত বরাবরই বন্ধ দরজায় বলিষ্ঠ হাতে কিল মেরে শব্দ তোলে। আঙ্গু তাই করলো। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ দরজা আকস্মিক সশব্দে খুলে গেলো।

নীল রঙের হাক্কা আলোয় ঘরের ভেতরে সারাজের অন্ধকার জ্যোৎস্নারূপ নিষেছে। মাঝের বড়ো সোফাটায় একদিকের হাতার ওপর মাথা রেখে আফিস-ফেরৎ ক্লাস্তদেহ মিঃ রায় সটান শায়িত। অপর কোনে মিসেস্ রায় বসে রয়েছে কোলের ওপর স্বামীর পা দুটি নিয়ে। ওর পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে শুনশুনিয়ে কোনো একটা গান গাইছিলো মিসেস্ রায় আপন মনেই।

দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে মিসেস্ রায় উঠে পড়তে যাচ্ছিলো। ঝকঝকে দাঁতের সাজানো সারি দিয়ে জিভ কেটে বলে উঠলো : এ মা—দরজাটা বন্ধ ছিলো না। লাজনব্র ভদ্রীতে ওর আশ্চর্য সুষমা।

নির্ধিষায় ব'লে উঠলো জয়ন্ত : না না না...উঠবেন না, উঠবেন না মিসেস্ রায়। বসে থাকুন দেখতে দিন। অভিনেতৃত্ব জীবনে এদৃশ্য অভাবিত।

—ছি ছিঃ...লজ্জায় আরো সঙ্কুচিত হ'লো মিসেস্ রায়।

স্বভাবসুলভ হাস্তরস মিশিয়ে মিঃ রায় উঠে বসতে বসতে বললে : তা এতে লজ্জা পাবার কি আছে?

এ তো আর অশ্ল পুরুষ নয়। স্বয়ং স্বামী-পরম-গুরু। কি বলেন জয়ন্তবাবু?

সত্যিই, মিসেস্ রায়কে এইরূপে দেখতে এতো ভালো লাগলো যে বলবার নয়। এ যেন “উর্কশীর” প্রতিবাদ করে অব্যক্ত ভাষায় অভিনেতৃত্ব মর্মস্পর্শী আবৃত্তি : আমি মাতা, আমি কন্যা, আমি বধু...

সুদীর্ঘ তিনটি বছর অতীত হয়ে গেছে।

এর মধ্যে কতো তারকার আবির্ভাব হয়েছে আকাশে, কতো গেছে খসে পড়ে—কেউ তার হিসেব জানে না।

তেমনি কেউ হিসেব রাখে না মিসেস্ রায় জীবনে কি হারিয়েছে আর কী পেয়েছে?

তথাপি স্ফুজাতা রায় আজ বাঙলার জন-গণ-মন-অধিনায়িকা চিত্রতারকা। ছবি পিছু তার চাহিদা প্রায় আকাশস্পর্শী।

সে ছোট্ট ফ্ল্যাটে আর ওরা থাকে না। দু'তিন বীর বাসা বদল করে অভিজাত পল্লীর বৃহৎ হতে বৃহত্তর আস্তানায় আশ্রয় নিয়েছে। সদরের পাশেই গ্যারেজে নতুন গাড়ী। ঘরে ঘরে একস্টেনশন্ টানা টেলিফোনের নানা রঙীন রিসিভার। এখানে রেডিযোগ্রাম, ওখানে বহুমূল্য বিচিত্র সামগ্রীতে ঠাসা কিউরিয়ো ক্যাবিনেট—সেখানে রেফ্রিজারেটর। কোনোদিন পাতা-না-ওন্টানো হাক্কা আর টয়েনবির টাটকা বই আলমারী আলো করে রয়েছে। মেঝে ঢাকা পুরু গালিচার অপূর্ব রাঙিত। বিরাট ডাইনিং টেবুল থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রতম পেপ-টেবুল পর্যন্ত সর্বত্র প্লেট-গ্লাস টেপের ঝলমলানি। প্রতিটি দরজা জানলায় পেডিমেন্ট থেকে ঝুলছে দামী পুরু পর্দা। ফ্রিজিডেয়ার ভরা এয়ারেটেড ওয়াটারের বোতল আর কক্ টেইন্স কেবিনেট ভর্তি রঙ বেরঙের দেশ-বিদেশের উত্তেজনাকর পানীয়।

মিঃ রায়ের চাকরী ও আয় যথাপূর্ব্ব। কিন্তু বেশ বাসের পারিপাট্য প্রায় প্রিন্সধর্মী, “ক্যাপ্‌স্ট্যান্”—এর ক্লাস থেকে লিফ্ট পেয়েছে মিঃ রায় “স্টেট এক্সপ্রেস্”—এ আর কদাচ-কখনোর হেওয়ার্ডন্ পরিণতি লাভ করেছে নিয়মিত হোয়াইট লেবন্-এ।

সীমা দার্জিলিঙে কন্ভেন্টের হাট্টেলে থেকে পড়ে।

সুজাতা রায়ের কর্মব্যস্ত জীবনে অবসর বলে কিছু নেই। প্রতিদিন শ্রুটিং। প্রতি রাতেই ককটেইন্ আর ডিনারের আহ্বান। মুখমণ্ডল কখনোই মেক্-আপ থেকে মুক্তি পায় না। মুক্তি পায় না ও পরিচালক, প্রযোজকদের নিরবচ্ছিন্ন সান্নিধ্য থেকে।

জয়ন্ত সাময়িক অবসর নিয়েছিলো চিত্রজগৎ থেকে। এ তিনটি বছর কোনো নতুন ছবিতেও হাত দেয়নি। দর্শনশাস্ত্রের অধ্যয়ন, নেশা-ভ্রমণ, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক অহুষ্ঠানে যোগদান আর সাহিত্যচর্চা—এই নিয়ে ও তিনটে বছর বেমালাম অহুপস্থিত থাকলো চিত্রজগতে। ওর এই অহুপস্থিতিকে নিয়ে বাঙলার ফিল্ম জার্নালগুলোতে অনেক প্রশ্নোত্তর বেরোলো। “সুজাতা রায়ের” আবির্ভূত পরিচালক জয়ন্তর পরবর্তী প্রচেষ্টা কী—এ সম্বন্ধে চিত্র-প্রিয়দের শুধু অহুসঙ্কিতসাই নয়, হয়তো খানিকটা আশাও আছে। আশা—নতুনতর কিছু পাবার। জয়ন্তর পরিচালক জীবনে ভারের অভাব থাকলেও ধার সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এই দীর্ঘ তিন বছরের মধ্যে দেখা নেই জয়ন্তর সঙ্গে সুজাতার একটি দিনও। কিন্তু শোনা আছে অশ্রাব্য অনেক কিছু। চিত্রজগতে কারো সঙ্গে দেখা হলেই সে মহা উৎসাহে সাম্প্রতিক সুজাতার কুৎসা-বিবরণী না দিয়ে পারে না জয়ন্তকে—কারণ, তাদের ধারণা, এর গুরুত্ব আছে জয়ন্তর কাছে। যেহেতু জয়ন্তই আর্টিস্ট সুজাতার আবির্ভূত। তাদের উৎসাহ কিন্তু অল্প সময়েই স্তিমিত হয়ে আসে। কারো নিন্দা-রটনায় ইচ্ছন জোগানো তো দূরের কথা, শুনতেও ভালো লাগে না জয়ন্তর। ও বলে : যে যাই বলুক, আমার সঙ্গে সে আগাগোড়া সদ্‌বহারই করেছিলো। কাজেই আমার কাছে সে সৎ। এর বেশী তার সম্বন্ধে কিছু জানবার আবশ্যক বা আগ্রহ কোনোটাই আমার নেই।

এতোদিন পরে আবার নতুন ছবির কাজে হাত দিয়েছে জয়ন্ত। বাঙলার দিকুপাল সাহিত্যিকের বিশিষ্ট কাহিনী। বরেন্য বাঙালী সংগীত-শিল্পীর এই প্রথম চলচ্চিত্রে সুরারোপ। কী পত্র-পত্রিকায় আর

কী মুখে মুখে সকলেরই এক কথা : জয়ন্তর ছবি কারখানার উৎপাদন নয়,—শিল্পীর সৃষ্টি। কিছু করে না তো করে না। কিন্তু বা করে তাতে অভিনবত্ব থাকবেই।

জয়ন্তর নবতম প্রচেষ্টা চলচ্চিত্রে জগতের আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। একদলের ধারণা, ওরই আবিষ্কৃত ইদানীংকালের সর্বজনপ্রিয় চিত্রতারকা সুজাতাই হবে ওর ছবির নায়িকা। অপর দলের বিশ্বাস, তারকা প্রধার বিরোধী নতুনতরের অহুসঙ্কানী জয়ন্তর এ ছবিতেও নিশ্চয়ই কোনো নতুন তারকার জন্ম হবে।

জয়ন্ত চিত্রনাট্য লেখায় আস্বস্ত। লক্ষ্য করেনি কখন সুজাতা ওর টেবুলের অপর দিকে এসে দাঁড়িয়েছে। ধ্যানভঙ্গ হলো ওর কথায় : নমস্কার জয়ন্তবাবু।

—মিসেস্ রায় আপনি? বিস্মত না হ’য়ে পারেনি জয়ন্ত।

—চমকে উঠলেন যে? মুহূ হাসির পটভূমিকায় বললে মিসেস্ রায়।

—অপরাধ কি বলুন! সান্‌ড্রান্সিস্কোর ভূমিকম্পও আমার কাছে এর চেয়ে বিস্ময়কর নয়। তারপর? বলুন! বলুন, কেমন আছেন?

উত্তর না দিয়ে পাণ্টা প্রশ্নই করে বসলো সুজাতা : আপনি কেমন আছেন?

—ফাইন্! স্বাভাবিক।

—তারপর, বলুন আপনি আমায় নেবেন কি না?

প্রশ্নটা যেন আকস্মিক ধাক্কা দিলো জয়ন্তকে। ও-ও প্রশ্নই করে বসলো : মানে?

—মানে, আপনার এই ছবিতে আমাকে নিচ্ছেন কি না? স্পষ্ট প্রশ্ন।

—সাহস হয় না। স্পষ্টই উত্তর দিলে জয়ন্তও।

—কারণ?

যখন আপনি মর্ত্যের মেয়ে ছিলেন তখন আপনাকে খুঁজে-পেতে বার ক’রে এমন এক ভূমিকায় নামালাম যা যে কোনো অভিনেত্রীর চিরদিনের কাম্য। যার পরিণতিতে আপনি রাতারাতি বাঙলার সর্বজনপ্রিয় শ্রেষ্ঠ নায়িকা ব’লে সমাদৃত হয়েছেন। কিন্তু এখন আর

সাহস হচ্চেনা—কারণ আপনি আজ ‘তারকা’—যার স্থান আকাশে না হ’লেও অ-নে-ক উঁচুতে। মানে, আমলি-মতো ছোটো খাটো ব্যক্তির নাগালের বাইরে।

—কিন্তু নাগাল পাবার ভুল আপনাকে তো সিঁড়ি বেয়ে তার কাছে ষাবার চেষ্টা করতে হয় নি। সেই নেমে এসেছে আপনার নাগালের মধ্যে।

—অ-নে-ক ধ্যবাদ। কিন্তু বলতে পারেন মিসেস রায়, চারিদিকে আপনার এতো অপবাদ কেন?

—ওটা বোধ হয় অর্থের অহুগামী। অনেক পরশা পেয়েছি। তাই অল্প অপবাদও। কোথাও সেটা হিংসের প্রতিক্রিয়া, কোথাও যাত্রা আমার চাহিদ মিটিয়ে ছবিতে নিতে পারে না সেই অক্ষমদের রটনা, আবার কোথাও যাদের ফিল্মের উপরন্তু “সাধ না মিটল আশা না পূরিল...” তাদের জ্বালাময় আক্রমণ।

একটু অপ্রস্তুতের সুরে বললো জয়ন্ত : আমি দুঃখিত। এ প্রশ্ন আমার করা উচিত হয় নি। তারপর বলুন, তিন বছর পরে তো এলেন গরীবের এখানে। সীমা কেমন আছে?

—খুব ভালো। দার্জিলিঙে হষ্টেলে থেকে কনভেন্টে পড়ছে।

—আর মিঃ রায়?

সুজাতা রায় নীরব।

—নিশ্চয়ই ভালো আছেন। জয়ন্তই আবার বললে। শরতের কলমল আকাশে যেন অকস্মাৎ কালো মেঘের আবির্ভাব হ’লো। আশ্চর্য পরিবর্তন অভিব্যক্তির। সুজাতার আরত চোখের দৃষ্টি নিম্নমুখী। ও নীরব।

—ষ্টেইন্জ্, আপনি কথাই বলছেন না।

এরপরও সুজাতা নিঃশব্দ, নিশ্চল।

জয়ন্তর পক্ষে বিশ্বয় বোধ করবার কারণ রয়েছে বৈ কি?

অবশেষে চোখ তুলে তাকালো সুজাতা। তাকালো সোজা সুজি জয়ন্তর চোখের ওপর।

একি? জয়ন্তর বিশ্বয় এবার এভারেটের চূড়া স্পর্শ করলো। আশ্চর্য ধূসরতা ওর আনীল চোখের দৃষ্টিতে।

অনেকটা বোকার ভদ্রীতেই শুরু করলো জয়ন্ত : দেখুন, বুঝতে পারছি না অন্তায় কিছু করে বসেছি কি না। যদি তেমন কিছুই ঘটে থাকে তো ক্ষমা চাইছি।

—কি আশ্চর্য! এ কথা ভাবছেন কেন আপনি? মিডিয়ামিষ্টিক্যালি বললে সুজাতা।

—বান্ধা! তবু ভালো যে আপনি কথা বলেছেন। পরিবেশকে হান্ধা করতে চাইলে জয়ন্ত। চীৎকার করে চাকরকে বললে ‘হু’ বাটা গরম চা দিয়ে যেতে।

জয়ন্তর ভাবভদ্রীতেই অথবা গরম চায়ের নামেই সুজাতা যেন খানিকটা ধাতস্থ হলো। শাস্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো : মিঃ রায়ের কথা জানতে চাইছিলেন, না?

—হ্যাঁ? কিন্তু আপনি যে তাতে এতটা এম্ব্যার্যামড্ বিচলিত হতে পারেন, তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি।

—রায়ের আর আমার সম্পর্ক নিয়ে কিছু শোনেন নি?

—বুদ্ধের সময় ইংরেজরা শিখিয়ে গেছে “ওজবে কান দিয়ে না।” আমি সেটা শিখেছি। বিশ্বাস করুন আমি স্বাভাবিক ভাবেই ও প্রশ্নটা করেছিলাম। নইলে আমার অন্ত কোনো মোটিভ ছিলো না।

—জানি, আপনি অতো ছোটো নন।

—ধন্যবাদ।

—আজ তাই আপনাকে সব কথা নিজে মুখে বলবো।

—না, না-না। যে কথার উল্লেখ মাত্রই আপনি অতোখানি বিচলিত আর বিব্রত হয়ে পড়েন—তার বিবরণ বলতে গেলে যে ব্যথিত হবেন—

—সেই সঙ্গে হান্ধা হবো। জয়ন্তর অসমাপ্ত কথার স্বত্র ধরে বললে সুজাতা : তাই বলতে চাইছি। এ বিষয়ে ঘটেছে যা, রটেছে তার চেয়ে অনেক বেশী। সত্য মিথ্যা মুখরোচক আলোচনাও ফিল্ম লাইনের সকলের মুখে মুখে। কিন্তু সরাসরি আমার মুখ থেকে একটি কথাও এ সংক্রান্তে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে কেউ শোনে নি। আপনিই প্রথম, শুধুন।

জয়ন্ত একটা সিগারেট ধরালো।

সুজাতা সহজ কণ্ঠেই বলতে শুরু করলো : এই মাত্র মিঃ রায়ের সঙ্গে লীগ্যাল সেপারেশনের দরখাস্তে সই করে এলাম।

বিশ্বয় উপচে উঠলো জয়ন্তর কণ্ঠে : এতো দূর ?

হ্যাঁ, এতো দূর। আপনার পক্ষে তো নয়ই, এমন কি বারা আমার সন্ধান আর সমালোচনা সন্ধ্যাত্ত তারাও ভাবতে পারে না যে, এই সামান্য কিছুক্ষণ আগেই আমি নিজে আমাদের স্বামী-স্ত্রী বিচ্ছেদের ভিত্তিপত্র স্বাক্ষর করে এলাম।

ব্যথিত স্বরে বললে জয়ন্ত : কিন্তু কেন মিসেস্ রায় ?

—উপায় ছিলো না জয়ন্তবাবু। প্রায় দু'বছর ধরে যে অমাহুতিক নির্বাসন সহ্য করে এসেছি, আর তা সইতে পারলুম না। রায়ের এখন ছোটো রূপ। দিনে ডাঃ জেকিল আর সন্ধ্যার পরই বেহিসেবী ড্রিঙ্ক করে সে মিঃ হাইড্। কিছুতেই এর ব্যতিক্রম ঘটানো গেলো না। আর এইখানেই শেষ নয়। প্রতি সন্ধ্যার পরই নেশায় উন্মত্ত হ'য়ে সে শুরু করবে অশ্লীল ভাষায় আমাকে গালাগালি, আর—ধেমো গেলো সুজাতা।

—আশ্চর্য। আহত কণ্ঠেই বলে বসলো জয়ন্ত।

দুসর কণ্ঠে ব'লে চললো সুজাতা : এইতেই আশ্চর্য হচ্ছেন ? তা'হলে শুনুন। তারপর তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে চলে আমার ওপর দৈহিক লাঞ্ছনা। বিশ্বাস করবেন, আজ আমার সারা শরীরে তার নির্বাসনের চিহ্ন ?

কল্পনা করতে পারেন, একদিন সে যতোকণ না ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ততোকণ চুলের মুঠি ধরে দেয়ালে আমার মাথা ঠুঁকে গেছে ? ফুলদানি ছুঁড়ে মেরে আমার মাথা কাটিয়ে দিয়েছে ? পেটে লাথি মেরে আমাকে তিন সপ্তাহ শয্যাশায়ী ক'বে ফেলেছিলো ? বিশ্বাস করবেন অর্ধেক রাত্রে কিচেন-নাইফ নিয়ে সে আমাকে তাড়া করেছে বুকে ছুরি বসাবে বলে ? তাড়া খাওয়া কুকুরের মতো সারা বাড়ী ছুটোছুটির পর অন্তোপায় হ'য়ে দরজা খুলে নিশ্চিন্তি রাত্রে আমি বাড়ির বাইরে পালিয়ে গেছি ?

সুজাতার কণ্ঠে অবরুদ্ধ হয়ে এলো।

—এতোদিন এই নিদারুণ নির্বাসন কী করে সহ্য করেছিলেন ?

একটা ঢোক গিলে নিয়ে বলতে শুরু করলো সুজাতা : নেশার ঘোর কেটে গেলেই রায় দুঃখ করেছে, কঁদেছে, আমার পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়েছে। সীমার নামে শপথ করে বলেছে সে আর কখনো অমন করবে না, সে ভালো হবে।—সেই আশায়...

আশাব্রিত কণ্ঠেই বলে উঠলো জয়ন্ত : সে আশার তাহলে এ ভাবে মূলোচ্ছেদ করলেন কেন ?

—উপায় ছিলো না জয়ন্তবাবু। তবু কণ্ঠ বলে উঠলো সুজাতা : বিশ্বাস করতে পারছি না আর ওকে। ওর মুখ থেকে এ কথা বেরতে এতোটুকুও আটককালো না যে আমার সীমাকে ও হস্টেল থেকে ছাড়িয়ে এনে খুন করবে। সুজাতার চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠলো।

—হোয়াট্? উদ্বেজনায় আভাষ জয়ন্তর অভি-ব্যক্তিতে

—হ্যাঁ। আমার কোনো চিহ্ন ও পৃথিবীতে রাখবে না, তাই আমার সীমাকে ও খুন করবে।

দু'হাতে মুখ গুঁজে হঠাৎ হুঁপিয়ে উঠলো সুজাতা। কী করা উচিত, কী নয়, বুঝতে না পেরে বিধাব্রান্ত ভঙ্গীতে জয়ন্ত শুধু বললে : ন-না-না, মিসেস্ রায় আপনি কাঁদবেন না—

দীর্ঘ দিনের অবরুদ্ধ শ্রোত বাঁধ ভেঙ্গে বেরিয়ে এসেছে। কান্নায় ফুলে ফুলে উঠেছে ওর স্বাস্থ্যাক্ত দেহ। সমলতে না পেরে অসহায়ের মতো টেবিলের উপর লুটিয়ে পড়লো সুজাতা। সর্বশাস্ততার কবরে যেন ও চাপা পড়লো।

জয়ন্ত নিম্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে অবলুপ্ততা ওই অভিনেত্রীর দিকে। অর্থে, সম্পদে, খ্যাতি আর জনপ্রিয়তার শিখরে সমাসীন ওই অভিনেত্রী সুজাতা।

হঠাৎ ফ্যাশ্ ব্যাকের মতো ওর মনের পর্দায় ভেসে উঠলো : তিন বছর আগেকার এক বিস্মৃত প্রায় সন্ধ্যার অসামান্য ছবি যে ছবির নায়িকা ছিলো গৃহস্থ-বধু শ্রীমতী সুজাতা রায়।*

* এ কাহিনী নিরূপক কল্পনাগ্রন্থ। কোনো বাস্তব চরিত্রের ছায়াসাদৃশ্যও এতে নাই

ভাষার আত্মতত্ত্ব

ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস

বৈষ্ণব বলেন, রাধা কৃষ্ণের লীলা। পদার্থ বিজ্ঞানী বলেন, ইলেকট্রন প্রোটনের খেলা। রাসায়নিক বলেন, idea crystallize করা, আশা ভরসা evaporate করে যাওয়া ইত্যাদি।

আমাদের গ্রাম্য নিরক্ষর চাষী ও মৎস্যজীবীরা কিরূপ কথাবার্তা বলেন, তার উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে।

গ্রাম্য চাষী চৈত্রের দুপুর রৌদ্রে লাঙ্গল কাঁধে বলদ দুটি নিয়ে গামছা কাঁদে বাড়ি ফিরে গরুদুটি বেঁধে লাঙ্গল নানিয়ে রেখে বাড়ির ভিতর ঢুকতেই দেখে, গুরুদেব এসেছেন। তিনি দাওয়ায় বসে শুকনো চিড়ে আঁখের শুড়ের সঙ্গে কড়মড় স্বরে চিবোচ্ছেন। কৃষক এই দেখে একটু রাগতঃ স্বরে জীকে (আহ্লাদির মাকে উদ্দেশ্য করে) বলছে—“হাঁগো আহ্লাদির মা, ঠাকুর মশায় শুকনো চিড়ে গরুর হাড়ের মত চিবোচ্ছে গোয়াল ঘরে মরা গাইটা আছে—টানে আনে দিলেও ত পারতে—একবারে আমাদের বড় দামড়াটার মত বোকা দেখছি তুমি!”

ছেলে বেলায় শোনা গল্প। স্মৃতির স্রোতে যুগের নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ এ কথা শুনে যে তেলেবেগুনে জলে শিষ্যের চৌদ্ধ পুরুষ উদ্ধার করতে করতে চম্পট দিবেন, ইহা আজ মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু গুরুদেব কিছু মনে করেন নি। কারণ তিনি চাষীর ভাষা বুঝতেন।

এখানে মরা গাই মানে কঙ্কালসার গাভী। টান দিয়ে আনা মানে দুখ দুয়ে আনা।

পাড়াপাঁয়ের মৎস্যজীবী। কলকাতা দেখতে এসে চৌরঙ্গির মোড়ে গিয়ে কিরূপ নাস্তানাবুদ হয়েছিল—তার বর্ণনা দিচ্ছে দেশে গিরে তার বন্ধুদের কাছে :

“আরে ভাই চৌড়ঙ্গীর মোড়ে যায়ে দেখি মাছুষ নয় ত পুঁটি মাছের ঝাঁক। হঠাৎ সেই ঝাঁকের মধ্যখানে পড়ে হয়ে গেলাম চিতল চেপ্টা তারপর অতিকষ্টে কই মাছের মত কানে হাঁটে পাকাল মাছের মত ফুট কাটে বাইরে আসে হাঁক ছাড়ে বাঁচি।”

এই হল ভাষার প্রাথমিক বিকাশ। সর্ব কালের কবিরা এইরূপ ভাষাই বেশী ব্যবহার করেন, তবে তাঁরা refined way-তে সে উপমা অলঙ্কারগুলি ব্যবহার করেন মাত্র। অবশ্য কবিরা এতদিন চাঁদ নিয়ে যে মাতামাতি করতেন তার মূলে কুঠারাঘাত করেছে রুশিয়ার ‘লুনিক’। চাঁদ যে একবারে শুষ্ক মরুভূমি যার চারপাশে বায়ুমণ্ডল বলেও কিছু নাই এবং চাঁদের একপিঠই আমরা চিরদিন দেখে আসছি এরূপ অনেক প্রমাণ রুশবিজ্ঞানীরা দিয়েছেন। চাঁদের অপর পিঠের ছবি পর্যন্ত তুলে নিয়ে তাঁরা বিশ্বের বিজ্ঞানীদের স্তম্ভিত করে দিয়েছেন। অবশ্য আমেরিকাও এ ব্যাপারে আর খুব বেশী পিছিয়ে নেই। পিছিয়ে আছি শুধু আমরা। খোঁড়া ভাষাকে টাটুঘোড়ার মর্যাদা দিতে গিয়েই আমরা advancement-এর বদলে re-trogression কায়েমী করার চেষ্টা আছি। মনীষী থেকে আরম্ভ করে মানবক পর্যন্ত সবাই এই কোলাহলেই সর্বশক্তি খোয়াতে বসেছি।

কোনও ভাষার বিকাশ কি শুধু ষ্টেটের সাহায্যেই হয়। Shakespeer ক্রি রাজসম্মান বা রাজার সাহায্যে লিখিছিলেন? জার্মানীতে ত অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ফরাসী ভাষারই চর্চাই প্রবল ছিল।

লেসিং, হার্ডার, ডিল্যাণ্ডও পরে Goethe Schiller-এর অভ্যুদয়ের ফলেই জার্মানির নিজের ভাষা world position লাভ করল। ভাষা বিশেষের রত্নধনিত্যে যদি জ্ঞানবিজ্ঞানের যথেষ্ট material বিদ্যমান থাকে, তবে হাজার হাজার মাইল দূরের দেশের লোকেও সেই ভাষা শিখা করে। রত্নমণ্ডিতে—! জোর করে কোন ভাষাকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা যায় না, এই সোজা কথাটা মহা মহাবখীরা যে কেন বোঝে না তা নিতান্তই আমাদের অবোধ্য। ভাষার সংপ্রসারণের সঙ্গে ঐ ভাষা-ভাষীদের স্বার্থগন্ধ বেখানে জড়িত সেখানে তাহাদের প্রচেষ্টা আঁখের অপচেষ্টাতে পর্যবসতি হবে বলেই আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস।

କରୀମ୍ମୁସ୍ତାଫା ଓହଲନ୍ତି

সম্মাদকাণ্ড

মহাপূজা প্রসঙ্গ :

এবারকার মহাপূজা প্রসঙ্গ-কথা লিখিতে বসিয়া কেন বা তেমন উচ্ছলিত হইতে পারিতেছি না। কেমন যেন মন অবসন্ন, চিন্তা উদাসীন। হয়তো বা আশে-পাশে বাঙালী জাতিটার নিদারুণ দৈহিক-দুর্দশাই ইহার হেতু। বাঙালী আজ স্বাধীনতার চিতাশয্যা শয়ন করিয়া ধুঁকিতেছে, কিন্তু তার কণ্ঠে বাগাডম্ব আর আচরণে বহাডম্বরের অন্ত নাই। ষাট বৎসরেরও অধিক কাল পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সমসাময়িক এই জাতিটার তামসিকতা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন : “There is too much talk, talk, talk ! We are Great ! Nonsense ! We are imbeciles. That is what we are ! We speak of many things parrot-like, but never do them. Speaking and not-doing has become a habit with us. This sort of weak brain is not able to do anything.” ১৯০২ সালে স্বামীজী বিদেহী হন। স্বামীজীর অগ্নিপ্রাণের পরশ বাঙালীর প্রাণকে উদ্ভূত করিয়াছিল। বাঙালীর প্রাণ জাগিয়াছিল—সে অগ্নিপ্রাণের কন্দুক-ক্ৰীড়া সারা ভারতকে রুহের তাণ্ডবমত্ত করিয়াছিল। স্বামীজী মায়ের মুগ্ধাধী মূর্তি গড়িয়া এই প্রাণোৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। বঙ্কিমের মাতৃধারণা বিবেকানন্দে সুস্পষ্ট পরিণতি লাভ করে। একটা অশ্বখ জাতির সমগ্র আশা-আকাঙ্ক্ষা, নিঃশ্রেয়স-অভ্যুদয়ের সামগ্রিক পরিপূর্ণ রূপ স্বামীজী এই সগণ দুর্গা-রূপ-পরিকল্পনার মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

এই স্মরণানুসম্মিত ঐশ্বর্য-মাদুর্যের উত্তরাধিকারী সম্মানব্রতী বাঙালী। দুর্গোৎসব বাঙালীর জাতীয় উৎসব। দুর্গাদেবী বাঙালীর জাতি-প্রতীক। সবাহন কান্তিক-গণেশ-লক্ষ্মী-সরস্বতী এবং যাবতীয় দেবদেবী অবতারের চালচিত্র সহ দশপ্রহরগধারিণী দুর্গাপ্রতিমার বৃষ্টি নিখিল বিশ্বে আর কোথাও তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। সমষ্টির পূর্ণাঙ্গ জীবন বিকাশের, তার ধর্ম-কাম-মোক্ষ, শিক্ষা-নীক্ষা, শৌর্য্য-বীর্য্য-সমাজ সাধনার এমন সূত্র প্রতীক-পরিকল্পনা মানবেতিহাসেই অতুলনীয় বলা চলে। বাঙালীর মনীষা যে কোন্ উচ্চগ্রামে উঠিয়াছিল দুর্গোৎসব তাহারই সাক্ষ্য বহন করে। বাঙালীর প্রেমৈক্যবস্ত্র সমষ্টি জীবন-ব্যঞ্জনার এমন পরিপূর্ণ প্রতীক সামনে থাকা সত্ত্বেও, আজকের দিনের বাঙালীর

শ্রমশান-শয্যা ও স্ব-ভাবচ্যুতি দেখিয়া মনে হয়, কোথাও আমাদের দেবী-আরাধনার ক্রটি রহিয়া যাইতেছে। আধিকার বাঙালীসাধারণের হালকা লক্ষ্যহীন আন্ত-কেন্দ্রিক দৈনন্দিন জীবনের চলার ছন্দ দেখিলে নৈরাশুই জাগে। মনে হয় কোথাও যেন এ জাতিটার জীবনের মূল্যায়ণে একটা বড় রকম ছন্দপতন ঘটিয়াছে। ধারণাই করা যায় না যে, বাঙালী বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-অরবিন্দ-রবীন্দ্রের উত্তরাধিকারী। প্রশ্ন জাগে, বৎসরের পর বৎসর সর্কৈশ্বর্য্যাদায়িনী দুর্গাদেবীর উৎসব করিয়া মাতৃব্রতী বাঙালী কেন আজ দুর্গতির অস্তিম-শয্যায় শায়িত। কেন এত দীনহীন কাঙাল ? কেন স্বাধীনতা লাভের পরে স্বাধীনতা-সংগ্রামে অগ্রপুৰোহিত যে জাতি তার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্তির সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে ? উৎসবের জমকালো আয়োজন আড়ম্বরের মাঝে আজকের অন্তঃসারশূন্যতা চাপা দিয়া বাঙালী লজ্জা নিবারণ করিয়া চলিয়াছে। জীবনবোধের মূল্যায়ণ আজ বাঙালীর ইতরতায় পর্য্যবসিত। অথচ আশ্চর্য্য বৎসরের পর বৎসর পূজার বহর বাড়িয়াই চলিয়াছে। অলি-গলি-পার্কে, ক্লাব-প্রতিষ্ঠান-মঠ-মিশনে দুর্গাপূজার অপ্ৰতুলতা নাই। দর্শকসমাগমও অভূতপূর্ব্ব। তথাপি শক্তির পূজারী বাঙালী ঐশ্বর্য্য-মাদুর্য্যে, বীর্য্য-বিক্রমে, মর্ত্য জীবন-বিকাশ-ব্যঞ্জনা কেন আপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে না, ইহাই প্রশ্ন। যদি তা না হয় তবে বুঝিতে হইবে শক্তিপূজার নামে অভিনয়ই চলিতেছে, নিসর্কার্য্য তামসিকতারই আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়া চলিয়াছি। বিবেকানন্দের দূরদৃষ্টিতে আজকের বাঙালীর স্বরূপ-চিত্রটি হুবহু প্রতিফলিত হইয়াছিল : “We are imbeciles, that is what we are.” ইহার কারণও স্বামীজীই নিরূপণ করিয়াছেন : “We speak of many things parrot-like but never do them.” আসলে পূজার নামে নিষ্ঠার পরিবর্তে চাঁদা তোলাই সার হইয়াছে। ঢাক-ঢোল-কঁাসিরা প্রতিঘন্ডিত উগ্রভর হইতেছে। মাইকের মাতাহীন মত্ততা প্রতিবেশীর অশান্তির হেতু হইয়াছে। বুজিবা কালোবাজারী মনোবৃত্তি ও নীতিভ্রষ্ট উচ্ছৃঙ্খলতা আমাদের পূজার মন্দিরেও অবাধ অহুপ্রবেশ লাভ করিয়াছে। দুর্গাদেবী ও দুর্গোৎসব হইয়াছে উপলক্ষ্য। অন্ততায় এমন মহামহিমময়ী মায়ের পূজক এত ছন্দছাড়া শ্রীহীন হইবে কেন ?

অত্যন্ত দুঃখে, অতিশয় বেদনার্জ হইয়াই আমরা পূজা-প্রসঙ্গে বাঙালীর সম্বন্ধে এইরূপ বিরূপ মন্তব্য করিলাম। কিন্তু তথাপি আমরা নিরাশ নহি কারণ আমরা বিশ্বাস করি যে, মানব সভ্যতার ইতিহাসে বাঙালীর তথা ভারতবর্ষের একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। মানব-চেতনার পরম সমুন্নয়ন, তার পূর্ণাঙ্গ সার্বক রূপায়ণের নিগূঢ় বীজ-

ধর্ম বাঙালীর সাধনা ও সিদ্ধির নিপুণে বিদ্যমান। এতবড় প্রত্যাশা পোষণ করি বলিয়াই আজকের অধঃপতিত বাঙালীর ছরবস্থায় এত মর্গবেদনা! আমাদের শুধু প্রত্যয় মাত্র নয়, দিব্যদর্শন এই যে, বিশ্বমাত্মকে অমৃতায়-মান করিয়া তুলিতে, তাকে দিব্যজ্ঞানের অধিকার দিতে এই বাঙালীই বিধিনির্দিষ্ট। বাঙালীর মনঃ-স্থিতিতে যে সব ধ্যান-ধারণা রসাতলিবেক করিয়াছে তার মধ্যে ভগবানের মাতৃরূপ-কল্পনা বিশিষ্টতম—দুর্গাদেবী তারই প্রতীক—সার্বভৌম মহিমামণ্ডিতা অতুলনীয় অধ্যাত্ম বিদ্যা। বোগী ভোগী ত্যাগী সকলকার আত্মিনায় এই মাতৃ-প্রতিমা সম্পূর্ণতা হইবার যোগ্য। দুর্গোৎসব জাতীয় উৎসব এই হিসানে যে ইহা সার্বভৌম সনাতন জীবন-দর্শনেরই অতিব্যক্তি ব্যঞ্জনা। এই সামগ্রিক দিব্য জীবন-দর্শন বাঙালীর সাধনার উত্তরাধিকারস্বত্বে প্রাপ্ত। রাতারাতি ইহা ভূমি ফুঁড়িয়া গজায় নাই। শ্রীঅরবিন্দের কথায়: “Because in this sacred land it (Sanatan Dharma) was given as a charge to preserve through ages.” দেশ-কাল-সম্প্রদায় অতিক্রম করিয়া এই পরম ভাব যাহা তাহাই বাঙালী। বাঙালী বলিতে একটা ভৌগোলিক সীমাসংগত বাংলা-ভাষাভাষী জনসমষ্টির সংঘট মাত্র নহে। ইহা তার বাহ্য দিক মাত্র। মুসলিম ঐতিহ্যে পরম সত্যের কোন “Mother concept” নাই। বাঙালীজাতি বলিতে যদি এই পরম ভাবটির স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ-ব্যঞ্জনা না হইয়া পোঁজামিলের খিঁচুড়ী হয় তবে তাহার দীর্ঘস্থায়ী হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। মানবতার পরম বিকাশের আনুকূল্যে বাঙালীর দেশ-ধর্ম, জাতি সমাজ শিক্ষা রাষ্ট্র অর্থ যদি প্রচলিত না হয় তবে মহাকাালের বাতাপথে তার অগ্রগতি অবরুদ্ধ হইতে বাধ্য—যাহাই আজকের দিনে বাংলা দেশে ও বাঙালীর জীবনে ঘটিয়াছে। পক্ষে আমরা পড়িয়াছি সত্য, কিন্তু তথাপি আমরা নিরাশ হইব না এই জন্ত যে, পূর্বে স্বল্পপন্থি মহাজনগণ আমাদের পৃষ্ঠ রক্ষা করিতেছেন এবং সেদিনও প্রবর্তক-সজ্জগুরু আমাদের ভরসা দিয়া গিয়াছেন: “এই দেশ আমার স্থান। বর্তমান

যুগ আমার কাল। আজিকাব ছদ্দিন আমার অবস্থা। তবুও আমি এই দেশের বুকেই নবীন যুগের জ্যোতির্ষ্ময় আলোকোদয়ের সম্ভাবনা দেখিতেছি।”

*

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ :

শ্রুৎ অল্প সময়ের মধ্যে এবার প্রবর্তক প্রকাশ করিতে হইয়াছে। প্রবর্তকের অমুরাগী পৃষ্ঠপোষক ও অনুদানের আন্তরিক সহযোগিতা ভিন্ন ইহা কখনই সম্ভবপর হইত না। অগ্নিযুগের ঐতিহ্যবাহী সংগঠনধর্মী এই পত্রিকা-খানির প্রতি লেখক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের সাহুবাগ পৃষ্ঠপোষকতা ইহার আয় ও ঐতিহ্য রক্ষার পরম সহায়ক হইয়াছে। এজন্ত আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

এবারকার প্রচ্ছদপটের শ্রীদুর্গার ছবি “প্রতিচ্ছবি টু ডিও” (যশীতলা, বরাহনগর), দীবা নিবন্ধের ব্লকগুলি “মল ইণ্ডিয়া মেডিক্যাল লাইসেন্সিয়েট এসোসিয়েশনের (পঃ বং শাখা), ব্রজেশ্বরী মন্দিরের স্ক্রেনোচিত্র ‘মনচল দেবভূমে’ পুস্তকের রচয়িতা ধ্যাতনামা আলোক-চিত্রশিল্পী শ্রীপ্রবোধ দে মহাশয়ের সৌজ্ঞে প্রাপ্ত। আনুযায়িক পরামর্শ ও সহযোগিতার জন্ত সহকৃতজ্ঞ অন্তরে স্মরণ করিতেছি প্রবর্তকের চিরঅনুদান শ্রীশীলপ্রসাদ সর্কাসীকারী, হৃদয়বান সাহিত্যিক মনোজ দাস, শুভকাম্বী হরিপ্রসাদ সাম্মাল, ক্রীড়াবিদ কল্পনাশঙ্কর শুট্টাচার্য, শিল্পী প্রবীর বিশ্বাস, সহকর্মী জীবন মুখার্জি ও বামাপদ দে সরকার প্রভৃতি বন্ধুবর্গকে।

ক্রটি স্বীকার :

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি, মহালয়ার অব্যবহিত পূর্বে ‘প্রবর্তক’ প্রায় সম্পূর্ণ হওয়ার মুখে প্রেসের অপ্রত্যাশিত শ্রমিক গোলযোগের জন্ত পত্রিকা বিজ্ঞাপিত মহালয়ার পূর্বে প্রকাশিত না হইয়া পরে হইয়াছে। কয়েকটি অনির্কীর্ণিত পূজা সম্পর্কিত কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প ও রঙ্গ-রচনা (ব্লক করা সত্ত্বেও) প্রকাশ করা সম্ভবপর হয় নাই। আমরা আশা করি আমাদের এই অপরিহার্য ক্রটি ক্ষমার্হ হইবে।

ভারত শিল্প নিকেতন

আধুনিক ; সম্পূর্ণ ; নির্ভরযোগ্য
বুক বাইণ্ডিং কারখানা।

পুস্তক, পত্রিকা ও ছাপার যাবতীয়
বাঁধাই কাজ স্ফুর ও মূলভে সম্পন্ন হয়।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৫৬ নং সূর্য্য সেন স্ট্রিট, কলিকাতা-৯

ডি. রতন ও কোং

ফটোগ্রাফার্স



২২১, কংগ্রেস ট্রাট, কলিকাতা

ফোন: ৩৪- ৩৭১১

সাময়িক

পৃথিবীতে প্রথম উদ্ভিদ জীবনের আবির্ভাব :

সম্প্রতি ওয়াশিংটনের কার্ণেগি ইনস্টিটিউশনের ডাঃ টি. সি. বোরিং-এর রিপোর্ট থেকে জানা গিবাচ্ছে, পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের আবির্ভাব সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের যে ধারণা, তাহা হইতে এক-শ কোটি বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ২৭০ কোটি বৎসর পূর্বে প্রথম উদ্ভিদ জীবনের আবির্ভাব হইয়াছিল। জলাশয়ে জ্বালাময় আকারে 'এ্যালগী' নামে যে এককোষী উদ্ভিদ দেখা যায়, সেইগুলিই হইতেছে এই আদিম কালের উদ্ভিদের নিদর্শন। আদিম যুগের এই উদ্ভিদের বাসায়নিক গুণাগুণের অবশিষ্ট এ্যালগী মধ্যে রহিয়াছে। কার্ণেগি ইনস্টিটিউশনের বর্তমান বার্ষিক বিবরণীতে এই সকল তথ্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, পৃথিবীর বয়স আর ৪৫০ কোটি বছরের কাছাকাছি।

জন্মকল্যাণে পারমাণবিক শক্তি :

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক দুইজন আনয়িককে বৈজ্ঞানিক বোধভাবে ১৯৬০ সালের 'এটমস্ ফর পিস' পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের একজন হইলেন রাশিয়ার ডঃ ড্যাডিমির ভেক্সলার, অপরজন আমেরিকার ডঃ এডউইলন ডব্লু ম্যাকমিলান।

পরলোকে ডঃ রাধাকৃষ্ণ মুখার্জি :

গত ৯ই সেপ্টেম্বর বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও শিক্ষাবিদ ডঃ রাধাকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ৭৯ বৎসর বয়সে তাঁহার একডালিয়া প্লেসিথিত বাসভবনে পরলোকগমন করেন। ১৮৮৫ সালে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত বহরমপুরে ডঃ মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। বহরমপুরেই তিনি বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করেন। ইহার পর তিনি কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। ১৯০১ সালে দুইটি বিষয়ে অনার্স সহ বি, এ, পাশ এবং ঐ বৎসরই এম, এ, ডিগ্রী ও অর্থনীতিতে কবডেন বৃত্তি পাইয়া শিক্ষাজীবনে নতুন রেকর্ড স্থাপন করেন। ১৯০২ সালে তিনি

ইংল্যান্ডে এম, এ পাশ করেন ও ১৯০৫ সালে প্রেমচাঁদ স্ট্রাটান বৃত্তি লাভ করেন। ১৯১৫ সালে পি, এইচ, ডি ডিগ্রী লাভ করেন। রিপন কলেজে তাঁহার অধ্যাপনা-জীবন শুরু হয়। ইহার পর তিনি বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ ও কাম্বী স্কুল বিশ্ববিদ্যালয়, মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় ও লক্ষ্মী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। ১৯৩৭ সালে তিনি কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থীকণে বঙ্গীয় ব্যাবস্থাপক সভার সদস্য এবং বিবেচী পক্ষের নেতা নির্বাচিত হন। ১৯৩৯ হইতে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত তিনি বাংলা সংসদে ক্লাউড কমিশনের সদস্য ছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জল রত্ন প্রথম প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠার অধিকারী ডঃ রাধাকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে পুরাতনব সঙ্গে নতনের যোগসূত্র ছিল হইল। ঐতিহাসিকপন্থের মধ্যে ধাঁহারা ভারতের অতীত ইতিহাস মন্বন করিয়া ভারতের শাস্ত পরিচয় উদ্ঘাটিত করিবাচেন ডঃ মুখোপাধ্যায় ছিলেন তাঁহাদের অন্ততম। ভারতের বরনীয় সম্ভানরূপে রাষ্ট্রপতি তাঁতাকে পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত করেন।

সম্প্রস্কর বিবেচী হইবাব কিছুকাল পূর্বে তিনি চন্দননগর প্রবর্তক সম্ভে তাঁর আবির্ভাবোৎসবে পৌরহিত্য করেন। বাংলার পৌরব করার মত যে মুষ্টিমেব বস্তুজন মনীষী অবশিষ্ট ছিলেন তন্মধ্যে ডঃ মুখোপাধ্যায় ছিলেন অন্ততম। তাঁর মৃত্যু বাংলার মানসাকাশ আরও তমসায়ন করিয়া তুলিল।

পৃথিবীর লোক সংখ্যা :

সম্প্রতি পপুলেশন রেকর্ডেস ব্যুরোর সংবাদে প্রকাশ পৃথিবীর বর্তমান লোকসংখ্যা ৩১১ কোটি ৫০ লক্ষ। তন্মধ্যে চীনের লোক সংখ্যাই সর্বাধিক। কয়েকটি দেশের লোকসংখ্যা (কোটি ও লক্ষ) এইরূপ : চীন ৭১ কোটি ৭০ লক্ষ, ভারত ৪৪ কোটি ৮০ লক্ষ; সোভিয়েট ইউনিয়ন ২২ কোটি ১০ লক্ষ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৮ কোটি ৭০ লক্ষ; পাকিস্তান ৯ কোটি ৪০ লক্ষ; ইন্দোনেশিয়া ৮ কোটি ৭০ লক্ষ; জাপান ৯ কোটি ৫০; ব্রাজিল ৭ কোটি ৫০ লক্ষ; পশ্চিম জার্মানী ৫ কোটি ৫০ লক্ষ, যুক্তন ৫ কোটি ৩০ লক্ষ। পৃথিবীর লোক সংখ্যার শতকরা ৫৭ জন এশিয়ায়, ২১ জন ইউরোপে ও সোভিয়েট ইউনিয়নে, ১৪ জন উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় এবং অবশিষ্ট ৮ জনের বেশীর ভাগই আফ্রিকায় বাস করে।

শ্রীলক্ষী মজুমদার

ফোন :
৪৪-৪৩৬১, ৬২



স্বাস্থ্য
স্বাস্থ্যবিদ্য

পশুপতি দাস এণ্ড সন্স
প্রাইভেট লিঃ

ভারতের সর্ববিধ চাউলের প্রথম জাতীয় প্রতিষ্ঠান

৪৩/২ ও ৩৭এ, সুরেন্দ্রনাথ ম্যাকার্জী রোড, কলিকাতা-১৪।
বাড়ীতে চাউল পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা আছে।

সম্পাদক : শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

প্রবর্তক পাবলিশার্স : ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি. এ. কর্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত।
প্রবর্তক প্রিন্টিং এন্ড হাল্ফটোন প্রিন্টিং, ৫২/৩ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীকমলেশ্বর কর্তৃক মুদ্রিত।

মায়ের কাছে আরজি

শ্রীউমাপদ নাথ

পাঁজির রূপে ছ'বার কবে দুর্গাপূজা দেখছি,
ছ'বার করে পূজার তরে বাজার করে মরছি।
ছ'বার কবে বোনাস পেলে তবেই আশা মিটত,
ছ'বার করে পূজার স্নেহে হৃদয় নেচে উঠত।
হুগী, তুমি ছ'বার এসে ডবল ভোগে পুষে,
কিন্তু মোরা হলাম কোথা তোমায় পূজে তুষে!
হৃদয়-দেহ দুই উপোগী, বাইরে-ঘরে দুঃখ
বাগ্‌বেসাদি এই জীবনে তবুও করি মুখ্য।
একটি সালে ঘটল ভালে অনেক বিধ তথা,
এমনি হাল-চালের দশা জোটে না আর পথ্য।
নিত্য আছি চিন্তাস্নেহে—কী যে ইমারতগুলি।
উপোস কবা উদর নিয়ে জীবন তবু ফেলি।
স্বপ্ন হলো বর্ণচোরা, ধনীর খনি-রাজ্যে
অধিক দামে বাজার বসে—এমনি দশা আজ যে।
দেশের তবে ত্যাগের বুলি ঝাড়ছে যারা নিত্য
খিড়কি পথে তারাই আবার বাডাব ঘরে বিত্ত।

ছেলেরা তোর শক্তি পূজে, তথাপি তার শক্তি
কোথায় গেল? নামের তরে তোমার প্রতি ভক্তি!
শত্রুরা সব শানায় খাঁড়া—আমরা তবু হাসছি
মাইক-মুখে ভাষণ দিয়ে বাল্যলীলা করছি।
এ দুদিনে আপন কালে চাউল-চিনি মাগগী,
দু-দু'বেলাই অন্ন জোটা নিরেট মহাভাগ্যি।
নেতারা সব লোককে বলে—কষ্ট করো ভাই গো!
রক্ত দেওয়া দেশের তরে—তার তুলনা নাই গো!
অথচ হায় স্বযোগ পেলে বিজলি, জল, কোনটি
হাজার টাকা বিলটি তোলে—তুচ্ছ হলো ফে নটি।
এই তো ছেলে তোমার মাগো, ছ'বার এলে ঘুচে
মনের এতো আবর্জনা? দুঃখ-ব্যথা মুছবে?
ছ'বার নহে, সহস্রবার ছেলের ঘরে আসতে
হবেই মাগো মজাগত ছুটিমিটা নাশতে।
যুদ্ধময়ী চণ্ডীমাতা, জাগাও জনচিন্তা!
পূর্ণ মিলিটারীর খাঁচে প্যারেড করা নিত্য।

চুল ওঠা এবং কেশের অকাল পক্কতা নিবারণে শ্রেষ্ঠ মহৌষধ

“রিস্কারস”

আনিকা হেয়ার অয়েল

২ আঃ শিশি—দেড় টাকা

(সর্বাধিক রোগের চিকিৎসার বৃহত্তর কেন্দ্র)

সি রিস্কার এণ্ড কোং

২৩নং লালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন : ২২-৪৭৪৭

টেলি : “রিস্কারস”

॥ পরিচিতি ॥



শ্রী জি, ডি, খাণ্ডেলওয়াল

প্রতিভা ও কর্মনিপুণ্যের পরিচয় দেন তাহা রেলপথের বিধি-ব্যবস্থা, বিকাশ ও সমুন্নতির বিশেষ সাহায্যক হয়। স্বাধীনতার পরে ভারতীয় রেলপথের পুনর্বিহাস (১৯৫২) পরিকল্পনায় শ্রীখাণ্ডেলওয়ালার সহ-যোগিতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৬ সালে তিনি রেলওয়ে বোর্ডে জয়েন্ট ডাইরেক্টর ট্রাফিক নিযুক্ত হন। আশা করা যায়, দঃ পূঃ রেলওয়ের সর্বময় কর্মী হিসাবে তিনি তাঁর বহু বিচক্ষণ অভিজ্ঞতার আলোতে এই রেলকে ক্রমোন্নতির পথে অগ্রবহ করিয়া লইবার অবাধ সুযোগ পাইবেন।

একদা একজন প্রতিভাধর মণীষী মন্তব্য করিয়া- ছিলেন, “Top is always vacant”, কথাটা সর্বকালের জ্ঞাত সত্য। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে ১৯৩৫-এ ভেইশ বৎসরের যুবক (জন্ম ১৯১২ সালে) শ্রী জি, ডি, খাণ্ডেলওয়াল যখন ই-আই-আর-এ ট্রাফিক বিভাগে কাজে যোগদান করেন তখন কে কল্পনা করিয়াছিল যে, তিনিই বিগত ৩১-এ অক্টোবর দঃ পূঃ রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজারের পদে উন্নীত হইবেন। মধ্যবিস্তৃত ঘরের সম্ভান ছিলেন তিনি। ১৯৩৫ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপরেই রেলওয়ের চাকুরীতে যোগদান করিয়া অল্প অধ্যবসায় ও কর্মনিষ্ঠায় রেলপথের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

চাকুরীর বিভিন্ন পর্যায়ের শ্রীখাণ্ডেলওয়াল যে মৌলিক

With the Compliments of ;

CHILDREN'S NOOK SCHOOL

11, BEPIN PAL ROAD,



CALCUTTA - 26

PHONE : 46-4574

Office : 46-4574

Work Shop : 47-3491

FOR QUALITY PRINTING

Visit

CHITRA RUPA

42A, HAZRA ROAD,

CALCUTTA-19

সফল জীবন

ছোট থেকে বড় হবার একটা রোমাঞ্চকর ইতিহাস মিলে শ্রীসন্তোষকুমার ভট্টাচার্য্যের জীবনে। এ অসামান্য সফল জীবন তাই আজকের দিনের পশ্চাৎমুখী বাঙালীর দৃষ্টান্তস্থল। একদা পাথের ফেরীওয়ালা আজ ক্লাইভ স্ট্রীটের একজন লক্ষপ্ৰতিষ্ঠ ব্যবসায়ী। স্বদেশী যুগ ছিল ভাঙার। স্বাধীনতা সংগ্রাম বাঙালী এক রোখা হইয়া করিয়াছে। স্বাধীনতা-উত্তরকালে বাঙালী নির্মাণের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইতে পারে নাই। যে মুষ্টিমেয় উদ্যমশীল তাহা পারিয়াছে তাহাদেরই অন্যতম “মেসার্স এস, কে, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং”-এর প্রতিষ্ঠাতা শ্রীভট্টাচার্য্য। কর্ম তাঁর পূজা। ব্যবসা তাঁর সাধনা। খুলনা-সাতক্ষীরার নৈষ্ঠিক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ বংশের ধার্মিক পিতা ভবভারণ ভট্টাচার্য্যের সন্তান সন্তোষকুমার। অতুল

ঐশ্বৰ্য্যের মধ্যেও উত্তরাধীকারীদের স্বর্ষসিঁচুত তিনি হন নাই। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অমায়িক, মিষ্টভাষী, বন্ধুবৎসল ও দরদী। মাত্র ৪৪বৎসর বয়সে তাঁর জীবনের যে সাফল্য, আমরা আশা করিব। আগামী কালে সেই সাফল্যকে আরও গুণাধিত করিয়া তিনি বৃহত্তর দেশ ও জাতির সেবায় চরিতার্থ করিয়া শুধু নিজেই কৃতকৃতার্থ হইবেন না, বর্তমানের শাসন-শয্যায় শায়িত বাঙালী জাতিটাকে বাঁচার পথ দেখাইবেন। স্কজলা সুখলা সোনার বাংলায় মস্তিষ্কের সাধনায় সিদ্ধি বাঙালীকে ভাবের ঘরে দিম্বিচ্ছরী করিয়াছে। বর্তমানে প্রয়োজন বিগুদ্ধ প্রাণের জাগরণ। শ্রীভট্টাচার্য্যের মধ্যে এই প্রাণের আভাস পাইয়া আমরা আশাবিহিত।

মেট্রোপলিটান ব্যাঙ্ক লিমিটেড

(শিডিউল্ড ব্যাঙ্ক)

কর্মদক্ষতা ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করে

সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং সুযোগ প্রদান করে

হেড অফিস :

৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা

শাখাসমূহ :

মিশন রো (কলিকাতা), উত্তর কলিকাতা, দক্ষিণ কলিকাতা

খড়গপুর, কোচবিহার এবং আলিপুরছার।

প্রবর্তক বিজ্ঞাপন—কার্তিক, ১২৭০

PRABARTAK COMMERCIAL CORPORATION LTD.

Gram : 'PRABARTAK' . Mg. Agents—PRABARTAK TRUST

Phone : 34-3088 & 89

IMPORT :
Machineries
Papers, Boards,
Synthetic Resin
Milk products
Casein and Chemicals
and Sundry Goods.

EXPORT :
Jute Manufactures
Shellac, Kapok,
Myrobalan,
Cattle foods.
Spices, Rosin and
other India Products

Expert Buying Service available at a very Moderate Charge.

61, Bepinbehari Ganguly Street

Calcutta-12

Codes used : A. B. C. 5th. 6th. & 7th. Edition; Bentley's Complete
Phrase, Western Union, Universal and 5-Letter, Acme
and Com. Phrase with Supplement; Schofields 3-Letter.

জাতীয় শিল্পের সংগঠন প্রচেষ্টায় আমরা আপনার সহায়তা কামনা করি।

টেলি :
প্রবর্তক

প্রবর্তক কোর্প লি:

ফোন :
৩৪-৩০৮৮

হেড অফিস : ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

অগ্রাঙ্ক শাখা : চট্টগ্রাম, চন্দননগর



"নিম্নল"

আয়ুর্বেদীয় দাঁতের মাজন

নিয়মিত ব্যবহারে অল্পজ্বরিত দন্তের
ক্ষয় নিবারণ করিয়া দন্ত ও মাড়ী
অদৃঢ় করে এবং মুখের দুর্গন্ধ বিদূরিত
হইয়া স্বাস-প্রশ্বাস সুবর্তিত হয়।

আর্য ওষধালয়, কলিকাতা-১৭

জাম্বসিক কবি

যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্যের

শ্রেষ্ঠ কবিতা সংকলন

মূল্য ৬-০০ (কাপড়ে বাঁধাই)

অধ্যাপক শ্রীযুক্ততোষ ভট্টাচার্য

এম এ, পি-এইচ ডি

কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত

প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্য

সাহিত্যাকাশের সমৃদ্ধ জ্যোতিষ্ক

সরোজেন্দ্রনাথ বসু চৌধুরী।

র্তাবই বাংলা উপস্থাপন

আজও ভুলি নাই ২-৫০

এশিয়া পাবলিশিং কোং

৩১-৬, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১।



জীবনের আলো

উত্তম খাওয়া-পরার জন্যই মানুষ বাঁচে না। সাধারণতঃ মানুষ বাঁচে তাহার নিজ নিজ গুণ ও কর্ম সমন্বিত বৈশিষ্ট্য লইয়া। প্রত্যেক ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য আমাদের চক্ষু এড়াইয়া যাইতে পারে, কিন্তু জাতির স্বাতন্ত্র্য বেশ জুস্পষ্ট হইয়া লক্ষ্য পড়ে। এই বৈশিষ্ট্য হারাইবার নহে। যদি এমন কোথাও হয়, তবে সে জাতি অল্প এক বিশাল জাতি-বৈশিষ্ট্যে সন্নিবেশিত হইয়া যায়। জগতের ইতিহাসে এ দৃষ্টান্তও বিরল নহে। যে সকল কারণে এক একটা বিশাল জাতি আত্মস্বাতন্ত্র্য হারাইয়া অস্ত্রের বৈশিষ্ট্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করে, সেই সকল কারণ ভারতবাসীর মধ্যেও ধীরে ধীরে উপস্থিত হইয়া মহাসঙ্কট সৃষ্টি করিয়াছিল। এই সঙ্কটের পথ ধরিয়াই পরবর্ত্তী পরাধীনতার দুঃখ আমরা ভোগ করিতে বাধ্য হইয়াছি। আজ ভাবতবর্ষ স্বাধীন হইলেও দুঃখের মাত্রা কিছু হ্রাস পায় নাই। তথাপি সহস্রবিধ দুঃখের মধ্যেও ভারত-সন্তানদের দেশ ও জাতির বৈশিষ্ট্য রক্ষায় যত্নবান হইতে হইবে। ইহার জন্য চাই কঠোর তপস্বী। তপস্বীর মধ্য দিয়াই আমাদের একমতাবলম্বী হইতে হইবে। কারণ মতভেদেই পথভেদ হয়। বুদ্ধিভেদ ও জাতিভেদে আমরা উৎসর্গের পথে অগ্রসর হই। তাই ভারত-সন্তানদের এমন একটি মতবাদ আশ্রয় করিতে হইবে, যাহা এখনও অবিকৃত আছে। আমাদের নিজস্ব আশ্রয় বস্তু বলিতে একমাত্র আছে আমাদের রক্ত। প্রতি ধর্মীর স্পন্দনে স্পন্দনে ইহাই আমাদের ভারতবাসী বলিবার শক্তি দেয় এবং এই রক্তধারার সহায়েই আমাদের স্মৃতিতে গৌরবময় অতীত নব জীবনের আশা সৃষ্টি করে, পুনরুত্থানের সঙ্কেত দেয়। এই রক্ত যে অতীতকে ভিত্তি করিয়া স্বীকার করে, তাহা ব্যক্তিবাদ নহে—অদ্বয় ব্রহ্মবাদ। প্রতি ভারতবাসীর রক্তধারায় এই অপৌরুষেয় ব্রহ্মবাদ এখনও পুনরুজ্জীবনের বিষণ্ণ বাজায়। বেদবাদ বলিতে ইহাই বুঝায় যে আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস, এবং জীবনবাদে আত্মা। যেহেতু জীবনের শেষ নাই, সেই হেতু জীবনে প্রকাশ পাইবে জ্ঞান, শক্তি, প্রেম ও সেবা এই চারিটি দিব্য গুণ। এই জন্ত ধর্ম্যে ভারতবাসীকে বর্ণাশ্রমী হইতে হইবে। এই বর্ণ জাতিভেদ নহে—উহা আত্মপ্রকাশের সুনির্দিষ্ট অনিবার্য প্রণালী। বেদ-বিশ্বাস ভারতবাসীকে দিবে আত্মজ্ঞান, পরলোকে বিশ্বাস ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্য। বেদ শ্রুতি নামেও প্রসিদ্ধ। এই শ্রুতিকে ভারতের স্মৃতি ও ঋষি সমর্থন করে বলিয়া ভারতের সংস্কৃতির মূলে প্রস্থানত্রয় প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে। শ্রুতি, স্মৃতি ও ঋষি—এই তিন প্রস্থানের উপর জাতীয় সংস্কৃতি আজিও সংরক্ষিত। এই সংস্কৃতিতে সংস্কৃতিবান হইয়া ভারতের উদীয়মান সন্তানমণ্ডলী জীবনের জয় দাও, জীবনকে সুসমাপ্ত কর—তোমার জীবনের আলোষ জগৎ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। (পুরাতন 'নবসম্ম' হইতে)

সজয়সুন্দর শ্রীমতিনাল

ঋগ্বেদ

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ (প্রথমঃ অষ্টকঃ । সপ্তত্রিংশৎ স্কন্ধঃ ।) তৃতীয়া অঙ্ক

(সজ্জবস্তুর শ্রীমতিলালের জীবন-ভাষ্য অমুসরণে)

শ্রীঅনিলবরণ তর্কবেদান্ততীর্থ

ইহেব শৃংখ এষাং কশা হন্তেষু যদবদান ।

নি যামক্ষিত্র মৃঞ্জতে ॥ ৩ ॥

অর্থ—“এষাং” (মরুদেবগণের) “হন্তেষু” (হাতে অথবা আয়ত্বাধীনে) “কশা” (যে শন্ শন্ শব্দ বা ধ্বনি) “যং” (যাহা) “বদান্” (বলে বা উখিত হয়) [তৎ] “ইহ এব শৃংখ” (তাহা এইখানে থাকিয়াই শোনা যায়) “যামন্” (সংগ্রামে) “চিত্রম্” (বিবিধ শৌর্য্যকে) “নি” (সম্যাক্রূপে) “মৃঞ্জতে” (অলঙ্কৃত করে) ॥ ৩ ॥

সরলার্থ—মরুদেবগণের হস্তে যে সকল কশা আছে, সেই সকল কশা যাহা বলে অর্থাৎ সেই সকল কশা হইতে যে ধ্বনি উখিত হয়, তাহা যজ্ঞক্ষেত্রে হইতেই শ্রুত হয়। সেই সকল কশার ধ্বনি যেন সংগ্রামে বিচিত্র শৌর্য্যকেই অলঙ্কৃত করে ॥ ৩ ॥

বিশদার্থ—কশা অর্থাৎ শাসনক্ষমতা মরুদেবগণেরই আয়ত্বাধীন। কারণ তাহারা দেবতা। মরুদেবগণেরই স্থূল শক্তির প্রকাশ বাতাস। বাতাস তাই মরুদেবগণের অধীন। মরুদেবগণের অমুশাসনকেই ভাষার মাধ্যমে প্রকট করিয়া মন্ত্রের প্রথমাংশে বলা হইয়াছে “যদ্ বদান্” যাহা বলে—কশার শপাশপ, শন্ শন্ শব্দ যাহা বলে, তাহা যেন ঋষি যজ্ঞক্ষেত্রে বা এই মর্ত্যভূমিতে অবস্থিত থাকিয়াও শুনিতে পান। অধিদেবতা মরুদেবগণ হইতেই বাতাসের প্রথম প্রকাশ বিয়দাকাশে, অন্তরীক্ষ লোকে। সেই বাতাস প্রবলতর হয়, যখন সে মেঘমালাকে তাড়না করে। ঋষি যেন দিব্য চক্ষে দেখিতেছেন—মানুষ যেমনভাবে কশার তাড়নে অশ্চালনা করে, মরুদেবগণও যেন ঠিক তেমনিভাবে মেঘমালাকে তাড়না করিবার জন্য বাতাসকে পরিচালনা করিতেছেন। সেই তাড়নের ফলে বাতাসেব যে শৌ শৌ, শন্ শন্ শব্দ তাহা কশারই সমতুল্য। তারপর, বৃষ্টির পূর্বে বাতাসেব যে প্রবল গতিবেগ, যে ভীষণ দাপাদাপি, যে প্রচণ্ড শব্দ তাহা কাল্পনিক বস্তু নয়—বাস্তব সত্য ঘটনা—প্রতিনিয়তই আমরা ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। আর সেই গতিবেগ, সেই বন্যনা, সেই দাপাদাপি কি সংগ্রামে বীৰ্য্য প্রকাশের সমতুল্য নয়? ভারতের আৰ্য্য ঋষি দুর্কসিদ্ধ সত্যকে শুধু গদ্যাকারেই প্রকাশ কবিয়া ক্ষান্ত হননি, অপূর্ণ কবিপ্রতিভার দ্বারা সাহিত্যসম্পদে মণ্ডিত করিষাই ব্যক্ত করিতেছেন—“নি যামক্ষিত্র মৃঞ্জতে ॥”



বিজয়া

মহর্ষি প্রেমানন্দ

জৈবী অহং যবে মানসের প্রশান্ত লগনে
জাগাথ জুযুপ্ত শিবে পরিচিতির কাদনে,
পার্শ্বিক বোধন মস্ত্রে
প্রবুদ্ধ করি প্রাণভূমি
জুগিত স্বরূপে হেরি
নির্বেদ পথরেখা চুমি
সিদ্ধির স্বশাস্ত্র ভালে অতুগ্ন হিয়ায়
সাধনার পরিক্রমা শুরু বিজয়ায় ॥

দানবের কলরোল হলে ক্লিষ্ট বি-জয়ায়
ক্ষণিগী বিলয়ে হেরি অমৃত অমোঘান্নায়
অভীক সাধক লভি
শিশির অভিজ্ঞা মহান্
বিশ্ব-প্রীতিছন্দে জাগি
সঙ্গীতে হষে প্রাণবান
বিভেদ পাষণ ভাদ্রি প্রেমের সমীরে
একত্বের আলিঙ্গনে সাজায় পৃথিবী ॥

সাহিত্যে দেশপ্রেম

শ্রীরবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

কোন বিশেষ যুগ বা দেশের কথা নয়। সকল দেশেই সকল যুগেই সাহিত্যিক তার কলম ধরেছেন দেশের ডাকে। মোগল শাসনের বিরুদ্ধে রাজপুতানার চারণরা গেয়ে বেড়াতো দেশাত্মবোধক গান, মহারাষ্ট্রের নব জাগরণের ক্ষণে কবিরা ধরেছিল শিঙা। একটি দেশকে জাগাতে দেশের সাহিত্য যতটা পারে অতটা পারে না রণদক্ষ সেনাপতিও। গর্কির মাদার, বঙ্কিমের আনন্দমঠ কি অষ্টটন ঘটয়েছে!

বাংলার কবি তাঁর কাব্যে, গানে, নাটকে গেয়ে বেড়িয়েছেন দেশের কথা, জাগার কথা। রামপ্রসাদ যে মার গান গাইতে গাইতে রোগ শোক ভুলে যেতেন সেই মায়েই গান গেয়েছেন বঙ্কিম, ‘মা’র সঙ্গে ‘টি’ যোগ করেছেন। আসমুদ্র হিমাচলের মাটি তাঁর সামনে দাঁড়িয়েছিল মা’র বেশে। তিনি বললেন—অন্ত মা’র কথা জানি না। তাঁর মা কে? তাঁর মা দেশজননী। আঁকলেন ছবি—মা যা ছিলেন, মা যা হয়েছেন, মা যা হবেন। মস্ত দিলেন বন্দেমাতরম। দেশ উঠল জেগে ধ্বির মস্ত পেয়ে। শুধু বঙ্কিম নয় মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, গোবিন্দদাস, দ্বিজেন্দ্রলাল, কাব্যবিশারদ, নজরুল প্রভৃতি বাংলার প্রণয় কবিদের রচনায় দেশ-প্রেমের প্লাবন বয়ে গেছে। সর্বোপরি গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন অজস্র কবিতা। দেশপ্রেমের গান গেয়ে কত কবি রাজরোষে পতিত হয়েছেন।

ইংরাজী সাহিত্য ও ইংরাজের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন রাজা রামমোহন। পত্র-পত্রিকা, রচনা-প্রবন্ধ দ্বারা তিনি দেশের শক্তিহীনতা ও পাদ্রীদের অপপ্রচারের প্রতিবাদ করলেন। ভারতের জাতীয় জাগরণের আদি পুরুষ তিনি। রামমোহন-বিদ্যাসাগরের রচনা সে সময়ে নতুন ভাবসঞ্চার করেছিল। রামমোহনের সতীদাহ নিবারণ, বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ এক মহান কীর্তি।

“মুজলাং মুকলাং মলয়জ-শীতলাং শম্ভুশ্যামলাং মাতরম্” একটি গান নয়, স্তোত্র। এই স্তোত্রমন্ত্র উচ্চারণ করে কত শহীদ প্রাণ দিয়েছেন।

হেমচন্দ্রের এমনি একটি গান—“বাজরে শিঙা বাজ এই রবে, জাগুক আবার সবে এ বিপুল ভবে, জাগুক আবার সবে মানের গৌরবে ভারত শুধু ঘুমিয়ে রয়।” ঘুমন্ত দেশকে কবি জাগাতে চেয়েছেন শিঙা বাজিবে। তাঁর প্রতিটি হৃদয় গতিশীল, বেগবান; মাহুকের মনে বিষম যা দিয়ে ভারতকে জাগাতে চেয়েছেন, শিশুর নিভ্রাভঙ্গ নয়, মানের গৌরবে। মাইকেলের মেঘনাদ বধ পৌরাণিক চরিত্র নিয়ে রচিত হলেও তার প্রতিটি ছন্দে বাজিবেছেন রণভেরী। ভাষা গাভীর্যাপূর্ণ, গুরুগম্ভীর। দেশের প্রতি কি গভীর শ্রদ্ধা আর দেশদ্রোহীর প্রতি কি ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে মেঘনাদের মুখে। “নিজ গৃহপথ তাত দেখাও তব্বরে চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে!” এই ছুটি ছন্দে নিজ দেশের প্রতি শ্রদ্ধা এবং দেশদ্রোহীর প্রতি কি অসীম ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে।

স্বামীজী অবসর সময়ে আবৃত্তি করতেন মাইকেলের কবিতা। বলতেন—কবিতা এই একজন। নবীন সেনের পলাশীর যুদ্ধও ঠিক এমনি একটি দেশপ্রেমমূলক কাব্য। তিনি যা বলেছেন খোলাখুলিভাবেই ব্যক্ত করেছেন। মোহনলালের যুদ্ধ ও সৈন্যদের প্রেরণা দানের জন্ত উদ্দীপনাময় ভাষণ পড়লে গায়ের রক্ত ফুটতে থাকে। সরকারী কর্মচারী হয়েও তাঁর এই দেশপ্রেমের জন্ত হয়তো তাঁর ক্ষতিও হয়েছে।

“স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়রে কে বাঁচিতে চায়!” রঙ্গলালের এই ছন্দটি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের যথেষ্ট প্রেরণা দিয়েছে। সরলা দেবীর “বন্দি তোমায় ভারতজননী, বিদ্যামুকুটধারিণী” গানটিও এখানে উল্লেখযোগ্য। গিরিশচন্দ্রও তাঁর “সিরাজদ্দৌল্লা” প্রভৃতি নাটকের সাহায্যে দেশপ্রেম প্রচার করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ দেশমাতৃকার সেবায় তাঁর ভাণ্ডার উজাড় করে দিয়েছেন। বাংলার যুবক যুবতী পথে পথে গেয়ে বেড়াত তাঁর গান—“বাংলার মাটি বাংলার জল।”

শুধু গান নয়—গল্প, প্রবন্ধ, নাটক ও কবিতাষ তিনি প্রকাশ করেছেন দেশপ্রেম। রাজপুত ও শিখ-বীরদের গল্পগুলি তিনি কবিতার আকারে প্রকাশ করেছেন। তাঁর “জীবন মৃত্যু পানের ভৃত্য” ছত্রটি বহু প্রাবন্ধিক উদ্ধৃত করেছেন।

কীরোদপ্রসাদের “প্রতাপাদিত্য” নাটকের ‘বিজয়া’ নারী জাগরণে বহু সাহায্য করেছে।

শক্তিধর কবি দ্বিজেন্দ্রলাল বহু অর্থে তাঁর দেশসেবার ডালি সাজিয়েছেন। “মেবার পতনে” ‘সত্যবতী’, ‘দুর্গাদাসে’ ‘মহামায়া’ এমনি জাগ্রতা নারী। “এমন দেশটি কোথাও বুঁজে পাবেনাক তুমি”, “ধাও ধাও সময়ক্ষেত্রে গাও উচ্ছে রণজয়গাথা” প্রভৃতি গানগুলিও উল্লেখযোগ্য। ঠিক এই সঙ্গে মনে পড়ে কাজী নজরুলের কথা। দৈনিক-কবি সারা জীবনটাই যুদ্ধ করে গেছেন। কারাবরণ করেছেন। ভাষাকে গভীর মাবে বাঁধেন নি। অপর ভাষাও ব্যবহার করেছেন। এত নির্ভীক কবি কাব্যবিশারদ ও মুকুন্দ দাস ছাড়া আর হয় নাই। তাঁর

রগসঙ্গীতে বলেছেন—“চলরে চলরে চল, উর্দ্ধ গগনে বাঞ্জে মাদল”, বলেছেন—“দুর্গম গিরি কাস্তার মরু” পার হতে।

অতুলপ্রসাদের বহু গানই দেশপ্রেমে ভরা। তাঁরই অমর গান—“বল বল বল সব, শত বীণাবেণু রবে, ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।”

“দেখে রক্তারক্তি, বাড়বে শক্তি কাঁসী কাঠে ঝুলিলে”—গেয়েছেন কাব্যবিশারদ। মুকুন্দ গেয়েছেন যাত্রা গান। বলেছেন “সাবধান সাবধান, আসিছে নামিয়া ছায়েরি দণ্ড, রুদ্রদীপ্ত মূর্তিমান।” এঁরা দুজনেই করেছেন কারা-বরণ। এমন কত আছেন। আছেন কত অজ্ঞাতনামা কবি, যাদের নাম জানি না কিন্তু কবিতা জানি। কয়েকটি লাইন এখানে উল্লেখ করছি—(১) “বাংলা মাগো জাগো জাগো। বিশ্ব রহে প্রতীক্ষায়, যুগান্তে যুগান্তে মুখ পানে চায়, বাংলা মা বাংলা মা জাগো।” (২) “আমার শ্রামলা বরণ বাংলা মায়ের রূপ দেখে যা আয়রে আম”। (৩) “বাংলা তোমাষ বৃষ্ণিনি না যুগে যুগে পূজা করি।”

গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাসে নানাভাবে দেশপ্রেমের অর্থ্য সাজিয়েছেন কবি, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক। বঙ্কিমচন্দ্রের “আনন্দমঠ” “রাঙ্গসিংহ” “সীতারাম”, নবীনচন্দ্রের পলাশীর যুদ্ধ, দীনবন্ধুর নীলদর্পণ, হেমচন্দ্র, মাইকেলের কবিতা, নজরুলের অগ্নিবীণা, “ভাঙার গান”, শরৎচন্দ্রের “পথের দাবী” দ্বিজেন্দ্রলাল, কীরোদপ্রসাদ প্রমুখের গান, নাটক আর পত্রিকা ‘সন্ধ্যা’, ‘যুগান্তর’ প্রভৃতি স্বাধীনতা-সংগ্রামে বহু প্রেরণা দিয়েছে। স্বাধীনতা লাভের পর বাংলা কাব্যজগতে এসেছে মন্দা। অগ্নিবীণা-বাজানো বাঙালীর সে প্রাণ স্তিমিত হয়ে পড়েছে। চীনের আক্রমণের পর দেশান্তরবোধে দেশের মানুষকে সচেতন করে তুলতে আমরা সেই স্বদেশী যুগকেই ভাঙিয়ে মান রক্ষা করছি। আজকের কবি-মানসের এই ব্যাপক অবসাদ, — সাহিত্যে স্বদেশচেতনার নিঃসাড় মুর্ছার মধ্যে যে ছ’ একটি ক্ষীণ কণ্ঠের আওয়াজ শোনা যায় তা আজকের ব্যাপক প্রাণ-প্রেরণাহীনতার মধ্যে নগণ্য বলা চলে। বাংলার কবি সাহিত্যিকদের ইহা নিশ্চয়ই চিন্তনীয়।

বিচার

ঋগ্বেদে বিশ্বাস

নির্মিত ও চিত্রিত

কৈলাস ধাম। বেলা অপরাহ্ন।

দেবাদিদেব মহাদেব সবোমাত্র একটু বিশ্রাম করে উঠেছেন। একটা হাই তুলে অলসভাবে তিনি নন্দীকে ডাক দিলেন, “নন্দী, ওরে ও নন্দী”। ছ’ একবার ডেকেও যখন নন্দীর সাড়া পেলেন না, তখন কিছু বিরক্ত হয়ে ডাকলেন ভূদ্বীকে। কিছুক্ষণ পরে ভূদ্বী হাজির হলেন।

“কোথায় থাকিস তোরা? আজকাল এক ডাকে সাড়া দিস না কেন বল দিকি? নন্দী কোথায়?”
—মহাদেব একটু রুষ্টস্বরে মন্তব্য করলেন।

আন্ততোষ আজকাল যেন কেমন হয়ে যাচ্ছেন। একটু খিটখিটে মেজাজ তা সবাই বুঝেছে। ভূদ্বী তাই বেশী কথা না বাড়িয়ে বললে, “প্রভু, নন্দীকে অনেকক্ষণ দেখছি নে, কোথায় গেছে বলতে পারবো না। কি আদেশ হয় বলুন।”

আন্ততোষ তিরস্কারের স্বরে বললেন, “তোদের আজকাল ছ’জনের মধ্যে কি হয়েছে বল দিকি, কেউ কারও খবর রাখিস না, নেশা করে করে সুব্যবহারটাও ভুলে যাচ্ছিস? বাঁড়টা শুদ্ধ আজকাল এক ডাকে সাড়া দেয় না; সবাই অবাধ্য, নিজের খেয়ালেই চলছে।”

ভূদ্বী বিনয় করে অথচ অভিমানের স্বরে বললে, “কেন চলবে না বলুন, আপনার কাছে থেকেও আমাদের স্বগোষ্ঠীর কি সম্মান আছে বলুন? গাঁজা খেলে, ভাঙ খেলে মর্ত্যের লোক নিন্দা করে। স্বাধীনভাবে ছ’বস্তা গাঁজা নিয়েও যাবার উপায় নেই, এমন দেবনেশার একটু প্রচার নেই, কোন প্রচার সমিতি নেই। আর

আপনার বাঁড়ের জাতি-গোষ্ঠীর কি অবস্থা মর্ত্যের সেই কলকেতা সহরে তা জানেন? কি সম্মান তাদের থাকছে? ধরে অজ্ঞ পাড়াগাঁয়ে পেঁজরাপোলে চালান দিচ্ছে। জম্বাদেবরা যথেষ্টা জবাই করছে। দেবতার বাহন বলে আজ আর কোন সম্মান আছে?”

দেবাদিদেব কথাগুলো শুনে একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বললেন, “হঁ।” শেষে কেমন অসহায়ের মত বললেন, “সবই শুনছি, সবই দেখছি। মর্ত্যের লোকের সে ভক্তি নেই, সে শ্রদ্ধা নেই, কিন্তু কিছুই আর ভাল লাগে না,



“কোথায় থাকিস রে! ডেকে সাড়া পাওয়া যায় না?”

দক্ষযজ্ঞের পর থেকেই যেন শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে।” দেবাদিদেব এতগুলো কথা বলে যেন ইঁপাতে লাগলেন।

এমন সময় নন্দী ব্যস্তভাবে প্রবেশ করলো। আন্ততোষ তাকে দেখেই কেমন রুষ্টস্বরে বললেন, “কোথায় থাকিস রে? ডেকে সাড়া পাওয়া যায় না।”

নন্দী ব্যস্তভাবে বললে, “প্রভু, একটু মায়ের কাছে গিয়েছিলাম। ‘সকালে মা বললেন, আমাব দিনে রাতে তেমন খুম হয় না। সব সময় শুনছি মর্ত্যের কতক লোক ডাকাডাকি করছে। প্রভু, মায়ের এই কথা শুনে আমি সত্য সংবাদ জানতে কিছুক্ষণের জ্ঞান ধ্যানে বসেছিলাম মর্ত্যের মানুষের কথা শুনবার জ্ঞান।”

আশুতোষ আগ্রহের সঙ্গে বললেন, “কি শুনলে?”

নন্দী তেমনি আগ্রহের সঙ্গে বললে, “শুনলাম মাকে এবার দু’বারে মর্ত্যে গিয়ে মোট আটদিন থাকতে হবে।”
“কেন?”



ভগবতী গণেশকে কোলে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন, বললেন ‘কি শুনলে নন্দী?’

নন্দী বললে, “তা জানি না।”

—“হঁ, বটে!”

এমন সময় দেবী ভগবতী গণেশকে কোলে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন, বললেন, “কি শুনলে নন্দী?”

—সংবাদ সত্য মা, একদল লোক ডাকছে।”

দেবী বললেন, “একদল লোক কেন? সকল লোকই তো আমাকে একসঙ্গে একদিনে ডাকে।”

নন্দী বিনয় করে বললে, “তা জানি না মা, মনে হয়

এবার কিছু গোল হয়েছে। মর্ত্যে দলাদলি বড় বেড়েছে। যদি যেতে চান তবে আদেশ করুন, প্রস্তুত হই।”

আশুতোষ হৃষ্কার দিয়ে উঠলেন, “কি? এখনও বর্ষা গেল না, শরৎ এল না, এই অসময়ে মর্ত্যে? ককনো না। খবরদার নন্দী, তুই যদি নিয়ে বাস তবে—”

বাধা দিলেন দেবী ভগবতী, “আহা তুমি এত চট্টছো কেন? ওর কি দোষ। আমি গেলে তো ও নিয়ে যাবে। তুমি বরং নারদকে একবার পাঠিয়ে মর্ত্যের সঠিক সংবাদটা জেনে নাও।”

কিঞ্চিৎ শাস্ত হ’লেন ভোলানাথ। তিনি তৎক্ষণাৎ নারদকে ডেকে পাঠালেন। নন্দী চলে গেল।

কিন্তু কিছুক্ষণ পাবে নন্দী ফিরে এসে বললে, “প্রভু, নারদ ধর্মি কৈলাসে নেই, তিনি মাসাধিক কাল পূর্বে মর্ত্যেই গিয়েছেন। শীঘ্রই ফিরবেন।”

কিন্তু এক সপ্তাহ অতিবাহিত হলো নারদ ফিরলেন না। এদিকে দেবী ভগবতীর অস্থিরতা আরও বেড়ে যেতে লাগলো, কারণ মর্ত্যের মানুষ তাঁকে অরণ্য করছে।

দেবাদিদেব মহাদেবও স্থির থাকতে পারলেন না, তিনি নন্দী ছদ্মকে সঙ্গে নিয়ে মর্ত্যে রওনা হবেন স্থির করলেন। হৃষ্কার ছাড়লেন, “চল বঙ্গে।”

—“কোন বঙ্গে প্রভু? পশ্চিম না পূর্ববঙ্গে?”

আশুতোষ বললেন, “কেন, বঙ্গ কি এখন দুটো?”

নন্দী বললেন, “হ্যাঁ প্রভু, অনেকদিন হ’লো ভাগ হয়েছে।”

—“কলকাতা কোন বঙ্গে নন্দী?”

নন্দী বললেন, “প্রভু, পশ্চিমবঙ্গে।”

—“চল পশ্চিম বঙ্গে।” দেবাদিদেব প্রস্তুত হচ্চেন এমন সময়ে নারদ এসে হাজির হলেন।

আশুতোষ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন, “একি চেহারা হয়েছে নারদ তোমার! মর্ত্যে কি অসুখ করেছিল?”

নারদ কিন্তু-কিন্তু ভাবে বললেন, “না প্রভু, ঠিক অসুখ নয়। চিন্তা, বিপদ।”

—“চিন্তা কিসের?” সাগ্রহ প্রশ্ন আশুতোষের।

নারদ অত্যন্ত সবিনয়ে নিবেদন করলেন, “একটু আড়ালে চলুন, সব কথা খুলে বলছি।”

আশুতোষ সকলকে বিদায় দিয়ে নারদকে নিয়ে কৈলাসের নির্জন স্থানে এক শিলাখণ্ডের উপর এসে বসলেন।

আশুতোষ বললেন, “বল, শুনি কি সংবাদ।”

নারদ বলতে লাগলেন, “প্রভু কি মনে করে মাস-খানেক আগে একবার মর্ত্যে গেলাম, ভাবলাম অনেকদিন যাইনি, মর্ত্যে তো কৌদঙ্গ লেগেই আছে, একবার দেখে আসি। তা ছাড়া মাকে তো একবার মর্ত্যে যেতেই হবে, খোঁজ-খবরগুলো ভাল করে নিয়ে আসাও



একটু বাদেই যম এসে হাজির হলেন

দরকার। কয়েক স্থান ঘুরে কলকাতায় গিয়ে একদিন পথে চলছি, এমন সময় দু'জন লোক এসে পাকড়াও করে রক্তস্বরে বললে, “তুমি ব্রাহ্মণ!” বললাম, “হ্যাঁ বাবা, আমি ব্রাহ্মণ, সাধু-সন্ন্যাসী মানুষ।” লোক দু'টা সজোরে একটা টান দিয়ে একটা গাড়িতে তুলে নিয়ে বললে, “ঠিক আছে চল।” তারপর তারা এক সভায় নিয়ে গিয়ে আমায় হাজির করলে। দু'দলে তুমুল তর্ক আরম্ভ হলো।

আশুতোষ জিজ্ঞাসা করলেন, “কিসের তর্ক?”

নারদ ঢোক গিলে বললেন, “পঞ্জিকা নিয়ে প্রভু, একদল মাকে নিয়ে যাবার তারিখ করেছে আশ্বিনে আর একদল করেছে কার্তিকে, দুই পণ্ডিতদলে হাতাহাতি, মারামরি। শেষে আমায় বললে—বল তোমার কি মত? খুব তো বড় টিকি রেখেছ, এখন মায়ের আসার দিন স্থির কর দেখি। প্রভু, বড়ই ক্যান্সাদে পড়লাম। যেমনি বললাম, কার্তিকে হলেই ভাল, বর্বাটা কেটে যায়।—কি বলবো প্রভু, কথা শেষ না হতেই একজন মুখ চেপে ধরে বললে, “চুপ, ফের ও কথা উচ্চারণ করেছে কি—” কি আর করি প্রভু, দম বন্ধ হয়ে যায় দেখে বললাম, তা বেশ, তবে আশ্বিনেই—আমার কথা শেষ না হতেই একজন এসে গলা টিপে ধরে বললে, বটে! পণ্ডিতগিরির আর জায়গা পাওনি? করুণ স্বরে বললাম, ছাড় ছাড় দম বন্ধ হয়ে যাবে যে! লোকটি মোটা গলায় বললে, “তা বাক, তোমার মত পণ্ডিতের মর্যাদা ভাল।” প্রভু, সে যে কি বিপদ! শেষে এক মুকুন্দি এসে বললে, ‘ঠিক আছে, একে ধরে পুরে বাখ, মত নিয়ে তারপর ছেড়ে দেবে।’ তারপর প্রভু তিন সপ্তাহের মত বন্দী থেকে গত কাল কোনরকমে কৌশলে পালিয়ে এসেছি।”

কথা শুনে আশুতোষ ক্রোধে কাঁপতে লাগলেন। বললেন, “বটে! শাস্ত্রধর্ম সব গোম্ভায় গেল! মর্ত্যালোকের এত স্পর্ধা, এত দস্ত।”

নারদ হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে বললেন, “প্রভু, স্বর্গে বাস করে আমাদের আজ এত অপমান, এত লাঞ্ছনা! এর প্রতিকার আপনাকে করতেই হবে।”

দেবাদিদেব হস্কাব ছাড়লেন, “নন্দী, নন্দী!—”

ছুটতে ছুটতে এসে নন্দী হাজির হলেন।

দেবাদিদেব আদেশ করলেন, “যমকে ডেকে আন। একটুও দেরী না করে যেন এখুনি আসে।”

একটু বাদেই যম এসে হাজির হলেন। বললেন, “প্রভু কি হুকুম?” আশুতোষ সব কথা খুলে বলেন। তারপর আদেশ করলেন, “এখন মর্ত্যের সব ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের ধরে নিয়ে এস। আর এই অত্যাচারের ব্যবস্থা কর।”

যম বললেন, “কিন্তু প্রভু, এখনও তো সকলের আসার সময় হয়নি।”

দেবাদিদের ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন। “তা না হোক, অকালেই নিষে এস। আজকাল অকালে মৃত্যু ঘটলে তোমার কোন দোষ নেব না। যাও, ব্যবস্থা কর।”

যম নীরবে প্রস্থান করলেন। তারপর যমপুরীতে এসে সকল দূতকে মর্ত্যে পাঠিয়ে দিলেন। বললেন, “যাও, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের ভেক যারা করে তাদের সবাইকেই ধরে আনবে।”

যে আদেশ সেইরূপ কাজ। যমপুরী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতে ভরে গেল। যমরাজ সকাশে সকলে জোট পাকিয়ে আরজি করলেন, “হজুর কি অপরাধে আমাদের অকালে নিয়ে এলেন? আমাদের সকলেরই এখন পরমায়ু আছে।”

যমরাজ গভীর স্বরে বললেন, “কি করে জানলে?”

উত্তর হলো, “আজ্ঞে ঠিকুজিতে লেখা আছে।”

“তা আছে জানি। কিন্তু স্বর্গের দেবদেবীর অশান্তি সৃষ্টি করা, অপমান করার যে অপরাধ তাতে আয়ু কমে যায় জানো?”

যমের কথায় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের হৃৎকম্প উপস্থিত হ’লো। করজোড়ে অনেকে বললে, “প্রভু, আমরা তো কোন দোষ করিনি। এ শাস্তি আমাদের প্রাপ্য কেন?”

যমরাজ হস্কার ছেড়ে বললেন, “আচ্ছা তোমাদের মুক্তি দিতে পারি যদি তোমরা সত্য পরিচয় দাও। বল, তোমরা কে কি গণনা কার্য ও ধর্মশাস্ত্র চর্চা কর?”

যমের কথায় পণ্ডিত-ব্রাহ্মণদের মধ্যে একটা কলরব উঠলো। সকলেই নিজের নিজের পরিচয় দিতে শুরু করলেন। যমরাজ একে একে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন—

“তুমি কি কর? গণনার কাজ কর?”

“আজ্ঞে না, কেরাণীগিরি করি।”

তারপর আর একজনের দিকে তাকিয়ে বললেন, “আচ্ছা, তুমি কি কর?”

“আজ্ঞে, জুতোর দোকান করি।”

যমরাজ একে একে অনেককেই প্রশ্ন করে জানলেন, কেউ মাছের ব্যাপারী, কারও মাংসের দোকান। কেউ মদ বেচে, কেউবা দালাল। কেউ কোন কথাই বললেন না। নীরব রইলেন।

যমরাজ চেপে ধরলেন। বললেন, “তোমরা যে বড় উচ্চবাচ্য করলে না, কি কর বল?”

—“স্মার, আমরা যে কি করি তা অনির্বচনীয়। এ ব্যবসার কোন সদর নেই। তবে কংগ্রেসী রাজ্যে বলা হয় কালোবাজারী।”

যমরাজ একটু কাঁপড়ে পড়লেন। প্রশ্ন করলেন, “তোমাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ কোথায়? কেউ কি শাস্ত্রচর্চা, পৌরোহিত্য বা গণনার কাজ করে না?”

তিন চার জনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল: “আজ্ঞে করি।”

—“একমত হতে পারনা কেন? সত্য এক। তোমরা কি শাস্ত্রমর্ম জান না?”

—“আজ্ঞে বিশেষ না। বৈশ্বযুগে পেট চালানোর এও এক রকম ব্যবসা।”

যমরাজ তো হতভম্ব। ঠগ বাছতে গাঁ ওজোড। কি করেন তিনি। সমস্তারই বা সমাধান কি? হুবহু সব ব্যাপার তিনি গিয়ে ভোলানাথের কাছেই নিবেদন করলেন।

আশুতোষ সবই নীরবে শুনলেন। একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, “দৃক্‌সিদ্ধ যা তাই তো বিসুদ্ধ। স্মরণে আশ্বিনেই তোমাদের মায়ের মর্ত্যে গমন বিধেয়।”

নারদ একটু আপত্তি জানালেন। মা তো কেবল প্রাকৃতিক নিয়ম শৃঙ্খল ছন্দবদ্ধ শক্তির নহেন, মাতৃস্নেহের একটা দাক্ষিণ্য কারুণ্যের দিকও আছে। মা ভাব-গ্রাহিণী। কার্তিক মাসেও মায়ের প্রতিমা বানিয়ে যদি কোন সন্তান আকুল ব্যাকুল হয়ে মাকে ডাকে তবে মা কি স্থির থাকতে পারবেন?”

সমস্তা আরও ঘনিষে এল। নারদের কথাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। শুদ্ধ অন্তরুপ বাই হোক, আমল কথাটা হচ্ছে সমবেত সন্তানের সমান আকৃতি ও মাতৃভাবনা যদি পরম ব্যোমে সধেগ-কম্পানী না তুলতে পারে তবে মায়ের পরিপূর্ণ রূপটি তো কোটে না। সবাই কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

মজলিসের একপাশে নন্দী-ভৃঙ্গী খোস মেজাজে হিলিম প্রস্তুত করছিলেন।

হঠাৎ নন্দী ফোডনু কেটে বসলেন: এ আর সমস্তা কি? মা এ বছর দুবারই মর্ত্যে গমন করবেন। ছেলের কাছে মা যাবেন তার আর অত বিধি টিধি কি? ধর্মার্থ পাপ-পুণ্যেরই বা বিচার কিসের। মা তো জগন্তারিণী, পতিতপাবনী, কলুষনাশিনী।”

ভৃঙ্গী আর চুপ করে থাকতে পারলো না। বললে, “তবে আমারও একটা কথা আছে। কথাটা এই যে, বজ্রের হতভাগারা বড়ই ছদ্মছাড়া হয়ে পড়েছে। মা দু’বারই যাবেন সত্যি, তবে চোখ খুলবেন না, আর কানেও চুলি দিয়ে রাখবেন।*

* বিগত পূজা সংখ্যা ‘প্রবর্তক’র মন্ত এই রস-রচনাটি বম্পোজ হইগছিল। প্রেসের শ্রমিক গোলযোগের মন্ত ইহা প্রকাশ হইতে না গায় বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হইল। এরম্ আমরা দুঃখিত। এঃ দঃ

বাঙালীর ভবিষ্যৎ

শ্রীচুনীলাল গঙ্গোপাধ্যায়

বাঙালীর দুর্দশা আজ চরমে উঠেছে। বঙ্গজনের দুর্গতি কোনো হঠাৎ ঘটনা নয়। বঙ্গবাসীর দুর্দৈব ঘটেছিলো কনৌজের অশুকরণে, দুর্ভোগ ঘনিবেছিলো কাবুলের অশুসরণে। দুঃস্বপ্ন অসহ্য হয়েছে দিল্লী ও করাচির অভিব্যবক্ষে। বিজ্ঞাতির রাজনৈতিক প্রহার; অর্থনৈতিক পীড়ন বঙ্গজনতার সকল দুঃখের কারণ।

বঙ্গশক্তিকে বিতরুণ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে হিন্দুর সংগে উর্দুর প্রভুত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ক্ষমতাভোগী নয়া সাম্রাজ্যবাদীরা যা দরকার বুঝেছে, তা বঙ্গসমাজের প্রতি অতীব নির্মমভাবে প্রয়োগ করেছে। বাঙালীজাতির বিদেশমুখী শাসককুল ধাত্রী বাঙালিকে সাধের স্বদেশ তাবে না; মানে বিজিত উপনিবেশ।

খলের ছলনে বঙ্গমন ভুললো ইতিহাসকে। ব্রিটিশের বিদায়-উষা বঙ্গপ্রাণে সমাচ্ছন্ন হলো সাম্প্রদায়িকতার কুশাশয়। সেনযুগের শেষে উচ্চবর্ণের অত্যাচারে, পাঠান-শাহীর অস্ত্রে কালাপাহাড়ী উৎপীড়নে, মোগল দিনের শেষ ভাগে হিষাস্তরের মঞ্চস্তরে, ইংরেজরাজের অন্তর্ক্ষেপে কুখ্যাত দাংগাং বঙ্গজীবন আহত হয়েছে, নিহত হয়নি। সেন-পাঠান-মোগল-ব্রিটিশ চলে গেছে, আজকের অবস্থারও অবলুপ্তি অনিবার্য; বঙ্গদেশের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে আন্তরিকতা কালপুরুষের কশাঘাতে আবার ফিরে আসতে বাধ্য।

বঙ্গভূমির বলিদানের দ্বারা ভারত মহাদেশ যখন স্বরাজ পেলে, তখন বঙ্গসত্তা বঞ্চিত হলো স্তম্ভময়কে সম্ভোগ করতে। ভারত-পাকিস্তানের শোষণকদল বঙ্গসম্ভানকে সংকীর্ণ বলে প্রচার করে থাকে। প্রকৃত পক্ষে তুচ্ছ প্রাদেশিকতার সংগে বঙ্গবুন্দির আকাশ-পাতাল প্রভেদ। আত্মজ্ঞানে আর অহংকারে যে গরমিল, বঙ্গবুদ্ধির সংগে ক্ষুদ্রতার ততোধিক পার্থক্য। ঢাকা কোলকাতা তিলে-তিলে বঙ্গাঙ্গাকে বিব্রত করে

চলেছে। তবু ধানবাদ থেকে শিলচর পর্যন্ত বঙ্গভাষাভাষী ভুবনের বারো কোটি অধিবাসী ভাবছে—স্বজাতির বিভিন্ন অংশের অচ্ছেদ্য আত্মীয়তা সম্বন্ধে। কূটনৈতিক বিরোধিতা প্রকৃতির নিয়মকে ব্যাহত করতে পারবে না। প্রতি-কূল্যায় নদীজলে অসংখ্য আবর্তের সৃষ্টি হয়; তথাপি সমুদ্রগামী গতি তার কদাপি অবরুদ্ধ হয় না।

বঙ্গহাটে আজ অর্থহীন কোলাহল। কপিলের দিবস হতে অরবিন্দের আমল অবধি বঙ্গচিন্তের গৌরবতাম্র পূর্ব পৃথিবীকে আলোক বিলিয়ে আত্মকে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে পৌঁছে চলে পড়েছে। গগনে অন্ধকার, তারামুখ নভোতলে খড়োতেরা অন্ধ করেছে নক্ষত্রের অভিনয়। আধারের আত্মজ বিষধরগণ এগিয়ে চলেছে শংকাহীন হয়ে। বঙ্গহৃদয়ের অনন্তের আরাধনা খণ্ডিত মনে বিনষ্ট হয়নি, খর্বিত প্রাণে বিলুপ্ত হবে না। বাঙালী শুধু মাটির দেশ নয়; বঙ্গভূমি মহাজীবনের এক চিরন্তনের পীঠস্থান। বাঙালী খালি মানুষজাতির একটি প্রশাখা নয়; বঙ্গবাসী একটি অভিনব ঐতিহাসিক মাধুর্য। যুগ থেকে যুগে বহু গ্রহণের, বহুল বর্জনের মাধ্যমে বিশ্ববীণায় মানবতন্ত্রীতে এক স্বতন্ত্র, কিন্তু সার্বিক স্রবের প্রয়োজনকে পরমভাবে প্রমাণ করেছে।

কোনো জীবন্ত সমাজকে যখন টুকরো-টুকরো করা হয়েছে, তখন সে রক্তক্ষরা বেদনার মধ্যে নিহিত রয়েছে শক্তির আগমনবার্তা। যিনি স্বার্থান্বেষের স্বজিত সমস্ত লোহ কপাট তেড়ে বাহির হয়ে গণমানসে নিজেই জাহির করেন। বঙ্গচরিত্রে সেই স্তলক্ষণ সজাগ এবং সচেতন। বর্তমানের প্রচণ্ড পংকে আগামী প্রকাণ্ড পদ্ম ফুটছে। আশান রূপান্তরিত হবে কৈলাসে। বঙ্গঅংগনে ডংকা বাজে নবজাগরণের। বাঙলাদেশের অকাল বোধনের মাহেন্দ্রলগ্নে জাগো জগজ্জয়ী মাতৃশক্তি, জাগো পুনরায় চিরজয়ী যৌবন।



সাধন-সঙ্কেত

সঙ্কল্পগুরু শ্রীমতিলাল

নারী ও পুরুষ উভয়েরই কথা। জীবন ভাগবত করার দার্শনিক কথা—ভগবানে আপনাকে তুলে ধরা। কিন্তু ইহা কথামাত্র—হয় কৈ? দিব্যজীবন না হয়ে ধর্ম-সাধনায় মানুষ হয় বিরক্ত অথবা একরোকা জন্তুর মত জীবন হয়ে উঠে। শাস্ত, শীতল, মধুময় চরিত্র লাভ করে না।

সাধনার প্রথম যুগে কি পুরুষ কি নারী ইষ্টকে পায় কামক্রীড়ারত সঙ্গীরূপে। ঠাকুর অপ্রাকৃত মদন, সন্তোষ-বৃত্তিকে নিরন্তর খেলিয়ে, নাচিয়ে, ছুটিয়ে আকুল করে, নাকাল করে তোলে। কামের উচ্ছ্বাস, সন্তোষের বৃত্তি একেবারে দৈবপ্রাপ্তি, ভাগবত অমুরাগরূপে তখন প্রতীত হয়। ইহা নব অমুরাগের কাল। কাম-চাঞ্চল্যই তখন এক অপার্থিব আশা ও আনন্দরূপে ইষ্টকে নিয়ে নানারূপ ক্রীড়া করে। বনে বনে খেলা, নদীতে ঝাঁপ খেয়ে পড়া, গাছের ডালে দড়ি বেঁধে ঝোলা, জ্যোৎস্না রাতে ছুটে বেড়ানো—সে কি প্রফুল্ল জীবনের উদ্দাম-লীলা! মনে হয়—এই তো জীবন, এই তো ভাগবত প্রেম, এই তো আনন্দ!

তারপর আসে কামের রূপান্তর, অহংকারের নবজন্ম লাভের সন্ধিক্ষণ। এই সঙ্কটকালে যার কাম-দাবানল রতিলান্দে শীতল না হয়, তাকে ব্যর্থ হতে হয়। কোথাও কেউ হয় desperate, কেহ পাগল, কেহ বা বিদ্রোহী; ব্যাধি কারও হয় জীবনের সঙ্গী, কেউ বা গঙ্গুল বৃষল জীবন নিয়ে নিরাশ হয়; কেহ ক্রোধী, কেহ অভিমানী, তিলে তিলে কারও ধর্মনার রক্ত শুকায়, কেহ যোগভ্রষ্ট হয়, কেহ বা আত্মহত্যা করে, কেহ মৃত্যুর শীতল ক্রোড়ে আশ্রয় নেয়।

কাম যদি রূপান্তরিত না হয়, অথচ ভোগস্থখে সাধনা না পায়, সে suppressed passion অর্থাৎ চেপে রাখা কাম নানা আকারে আপনাকে প্রকাশ করে। তোমরা কি মনে কর circumstance সৃষ্টি করে অর্থাৎ একটা বাঁধাধরা ব্যবস্থার ভিতর মানুষগুলিকে বন্দী করে' ভগবানে কামকে উপনীত করা যায়? এরূপ ক্ষেত্র

ক্রমে হয় ভীষণ অশান্তির ক্ষেত্র। আনন্দ অন্তর থেকে অন্তর্হিত হওয়ায় মানুষের রক্তমাংসের দেহটা হয় ক্রুদ্ধ ক্ষণকের ছায় শ্রীহীন, ভীষণ। ভাগবত সাধনার ক্ষেত্র জেলখানার ছায়া সর্বদাই দুঃখযন্ত্রণাময় হয়।

কাজের ঝগড়াট সৃষ্টি করে মানুষ চাম কামের প্রভাব ভুলে যেতে। নিজেকে নিরন্তর ব্যস্ত রেখে মনে করে চঞ্চল কাম স্থির শাস্ত, তপোময় হবে স্নান মস্তিষ্ক, প্রশান্ত হৃদয়, সতেজ প্রাণ, কমণীয় দেহ দিবে। ইহা আশ্রিত পথ, মনের চাতুরী। কামক্রীড়াকালে কাম-চাঞ্চল্য খেলায়-ধুলায় লীলামাধুরীতে একটা তৃপ্তি পায়, আশায় আনন্দে তার চাঞ্চল্য নেশাখোরের ছায়া বেশ প্রমত্ত থাকে, কিন্তু আসল শোধন ও রূপান্তরের যুগে যদি সে সাধন না পায়, পূর্বের লক্ষণস্বরূপ মানুষের চরিত্র রক্ষ ও শাস্তিহীন কদাকার হবেই।

কর্ম এ যুগের সহায় নহ। ক্রীড়াদি সাধন নয়। শাস্ত্রপাঠ, হবিষ্যভোজন, কৃচ্ছ্রতা, উপবাস কামকে শোধিত ও রূপান্তরিত করার বিধান নয়, ঐগুলি ক্রীড়া মাত্র, প্রথম যুগের সাধন।

কাম-দাবানল শীতল ক্রুরতে হবে। ভোগ দিয়ে যে শীতলতা, তা আশ্রিত নিত্যে দেওয়া, শরীর নাশের পন্থা—মৃত্যুর পথ। ভোগ রুদ্ধ করেও কাম শীতল হয় না, উচ্ছ্বল চরিত্র লাভ হয়। এই দায় অতিক্রম করে যে সাধক ও সাধিকা তারাই গোলোকবিহারী নারায়ণকে ঘিরে রাসমণ্ডলী সজ্জন করে। ইহা সহজ নয়, সত্যই এ সিদ্ধ জীবনের মানুষ কোটিতে গুটিকই মিলে। চঞ্চল কামের সঙ্গে রতির চাঞ্চল্য যেমন প্রথম যুগের সাধন, সে চাঞ্চল্যে যেমন সন্তোষগম্ভীরা ভুলায়, প্রেমোন্মাদে বিভোর করে রাখে, রতি স্থির করার যুগে তেমনি অন্তর সাধনায় পুরুষ নারীকে তন্ময় হয়ে থাকতে হয়। বুদ্ধি, হৃদয়, প্রাণ, দেহচেতনা ইষ্ট ব্যতীত দৃষ্ট অদৃষ্ট কোন বস্তুকে যেন আশ্রয় না করে—এদিকে খুব সতর্ক থাকতে হয়। “সতে”র হয়ে সাধনার কথা মনে রাখতে হবে। ব্রহ্মচর্য্য সিদ্ধ করা সহজ নয়। স্বামী-স্ত্রী

দুই তীর্থ-কথা

বেলাল মহম্মদ

আমি মনের এক চরম ভাবের রূপায়ে উদ্ভূত হয়েছি। আমার মনোভাবে ঠিক এই মুহূর্তে দু'টি ব্যাপারের মহাবির্ভাব সম্ভব হয়ে উঠেছে। একটি আজকালের, অপরটি দশবর্ষ-পূর্বকালের।

আজকালের মধ্যে ২৭শে আগষ্ট, '৬৩-তে আমি চট্টলের সীতাকুণ্ড-চন্দ্রনাথ ধামে তীর্থ করে এসেছি। এখন মেলার সময় নয়। আমি বেশ নিরিবিলিতে পাহাড়ের শীর্ষদেশে উঠে গিয়েছি এবং নেমে এসেছি। এজ্ঞে আমাকে সত্তা গজানো ঘাস ও লতাপাতা ফাঁক করে সিঁড়িপথ অতিক্রম করতে অনেক বেগ পেতে হয়েছে। আমি মনের আবেগে সকল অসুবিধাকে উপেক্ষা করে অতিক্রান্ত হতে পেরেছি।

বিরূপাক্ষ-মন্দিরের চত্বরে বসে যে কবিতাটি লেখা হয়েছে, তার গুরুত্ব স্বাভাবিকতাকে ডিঙিয়ে যায়নি। কিন্তু চন্দ্রনাথে বসে আমি অপর কবিতাটির শেষের দিকে এ কি লিখে বসলাম। আমি এখানে দু'টি কবিতাই উদ্ধৃত করছি :

“বিরূপাক্ষ-অঙ্কে”

মহাপ্রাণ-পরীক্ষা বশে, হে অভিমানিনী
মাতৃ-মৃত্তিকার ক্রোড়ে আশ্রয় কামিনী
জীবিশিষ্টাংশের অতিক্রমনের নামে
স্তুভাগম কর এই চন্দ্রনাথ ধামে।
সেই এক পবিত্রতা স্মৃতি পুরন্দর
তুর্গম পর্বতে হেন করেছে স্তম্ভর।

কাম চেপে রেখে, কুমারীকে সুবিধা না দিয়ে, তরুণকে চোখে চোখে রেখে ভোগবঞ্চিত হওয়া যায়, তাতে রসতত্ত্ব সিতা মিশ্রির রূপ ধারণ করে না। রসের জাল দেওয়ার সঙ্কেত ধরা চাই। এই ফিকির যে না পায়, সত্যই অস্বাভাবিক চরিত্র হয়। বটে, কিন্তু অপ্রাকৃত মদনের ছায় অপ্রাকৃত রতি হয় না।

আজ তোমাদের এই সাধনার সন্ধিকাল উপস্থিত। যে সাধনা তোমার, ঐ কচি কচি নূতনের তা নয়। তাদের ছুটতে দাও, উন্মাদ হবে লক্ষ দিতে দাও। তাদের তপস্তার আগুনে মুগ্ধ করো না। অন্তরের কাম চাঞ্চল্য নানা ভাবে ক্রীড়ারত হয়ে যত দীর্ঘ দিন প্রমত্ত থাকে, তবিশ্য সাধনার পথে ততই সুবিধা হবে।

আজ তুমি স্থির হও। কামকে স্থির কর। রতি-বিন্দু আলিত না হয়, তার জন্ত সতর্ক হও। ভুলে যেওনা ভাগবত ইচ্ছাকে চরিতার্থ করার জন্ত তোমার কাম আজ যে বিক্ষোভ সৃষ্টি করে, সে পরিশুদ্ধ কাম নয়, তাহা হইলে বীর্ঘ প্রকাশ হতো। কামই শক্তি—রতি রাগে তাহা প্রসঙ্গমুর্তি ধরে।

এই সাধনার যুগে তোমরা সমাহিত হও। সাধন-

চক্র নির্মাণ কর। অধ্যাপ্ত সাধন-সিদ্ধ স্বজাতির সঙ্গে আপনাকে সংহত কর, ভাব বিনিময়ে কৌশল আয়ত্ত কর। এই তো সাধনার সময়। অন্তরে মাধবের আসন—হিয়া যেন শূন্য মনে হয়। নিশ্চয় রুদ্ধ কাম তাঁর আসন ঘিরে মণ্ডল সৃষ্টি করে নাই। এই চাঞ্চল্য তোমার অনীশের পথে ছুটায়।

আজ সাধনার পঞ্চতপা, কৃচ্ছ্রতা নয়। রতির শীতল বর্ষণে তোমার কামকে অভিষিক্ত করতে হবে। ত্যাগ করলেই নবজন্ম হয় না, অন্তরে ভোগবতীর প্রবাহ স্বজন করতে হবে। তার আয়োজন আমি করছি। কিন্তু সঙ্কেত কেউ কান দিবে শুনে না। যে আমার ইঙ্গিত ধরবে সে সিদ্ধজীবন পাবেই। জানি না, দীক্ষিত কয়জন পুরুষ নারী এই নবজন্মে ভগবানকে মূর্ত্ত করবে আপনার সবখানি দিবে। আমি কাম-শোধনের সঙ্কেত দিলাম মাত্র; তোমরা উদ্বুদ্ধ হও। আজ সত্যই নবজন্ম লাভের আবার এক সুযোগ এসেছে। ওগো ভগবানের মাহুষ। এই নবজন্ম দিনে উৎসবের পুলকে তোমাদের রতি স্থির হোক। [প্রবর্তক সঙ্ঘের সাধক-সাধিকার উদ্দেশ্য পরিবেশিত সঙ্ঘগুরু প্রভাত-বাণী : ২০-এ জুন, ১৯৩৩]

তোমার জীবন যেথা পুনরুজ্জীবিত
তারি তীর্থযাত্রা, সর্বজননের বিদিত—
নিতান্ত সহজ সাধ্য নহে—সত্য অতি
প্রাপ্যন্ত দর্শক কবি, ওগো সীতাসতী ।
রামের বামের সাধী যথা সাধী হারা,
সেই নিরঞ্জন শৃঙ্গে কবি দিশেহারা ॥

“চন্দ্রনাথে”

কতো যুগযুগান্তের এই তীর্থস্থান
দুর্গম পর্বতশীর্ষে প্রতিষ্ঠিত চন্দ্রনাথ ধাম
মৃত্যুরে উপেক্ষা করি বিলুপ্তিরে অবজ্ঞাপ্রদান—
করে আজো রক্ষা করে স্মৃতি-পাদপদ্ম মহানাম,
এই একমানবাস্থা—প্রতিপাত্ত ভক্তি নিদর্শন
লগ্নে লগ্নে প্রেমমগ্ন জনসমাগম
রাসমণি চূড়ামণি যোগোস্তরাষণ
শিব-চতুর্দশী, দোল-পূর্ণি মনোরম ।
বিরূপাক্ষে শীর্ষে রাখি হর্ষোৎফুল্ল ভূমি
আর রচি চন্দ্রনাথ-মন্দির-ভবন
নিত্য এ জাগ্রত যেন মহাকাশ চুমি
কখনো ব্যত্যয় নাই একান্ত আপন ।
কে জানে কখনো যদি ভূ-কম্পন বশে
ধ্বংস আনে সমুদ্রত পর্বতের শীর্ষে,
প্রকৃতি সেদিন রুদ্র স্রীষ মহারোষে
নিজেরে সংযত করে রক্ষা করে কিসে—
সুন্দরত এই মহা-তীর্থের জীবন ।
কোথা তক্ত, তুমি কোথা, হে তত্ত্বিজ্ঞান ।

বিগত ২৮শে মে, '৬৩-তে এতদকালে সংঘটিত
ঘূর্ণিবাত্যার সমূহ চিহ্ন এখনো এই মহাতীর্থস্থানের
বুকে স্পষ্ট হয়ে রয়েছে; এই তিনটি মাসের
অতিবাহনের সাক্ষ্য হিসেবে দাঁড় করান যায় কেবলমাত্র
গাছের তাড়া ডালপালাগুলির শুকিয়ে যাওয়া এবং
সম্ভবস্থলে নতুন পাতা গজিয়ে ওঠাকে । এ অত্যন্ত

মর্শপীড়ক । কবিতার শেষ ছয় স্তবকের জন্তে এই
মর্শপীড়াই দায়ী ।

এই একটি ব্যাপার ।

এর অপর ব্যাপারটি বহুকালের এক স্মরণীয় দিনের
অমৃৎস্মৃতিবিশেষ । কবিতাবলীর পাণ্ডুলিপি থেকে নিম্নোক্ত
অসমাপ্ত একটি কবিতার তিন পংক্তিমাত্র উদ্ধৃত করছি :

উনিশশ' তিথ্যায় সাল, দিনকাল ঠিক মনে নাই ।

সম্ভবশ্রু মতিলাল পরিদর্শনে আসেন

চট্টগ্রাম প্রবর্তক সম্মেলন ।

দর্শন মানসে তাই গিয়েছিলাম একদিন

কতিপয় বন্ধুজন সঙ্গে ।

সম্ভবশ্রু ছ'ঘণ্টাকালের বাক্যালাপে সেদিনটিকে
সার্থক করে তুলেছিলেন । আমি hypnotism-এর
ছাত্রবিদ্যায় সর্বক্ষণ তাঁর চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে
ছিলাম । ফলে বিদায়কালে তিনি আমার চোখের
প্রশংসা করে বলেছিলেন : তোমার চোখ ছুটি তো
ভারী সুন্দর হে ! এ চোখ আমাকে পাগল করে দিলো ।
যদি কোনোদিন কোলকাতায় যাও, অবশ্যই চন্দ্রনগরে
আমাকে দেখা দিয়ে এসো ।

চন্দ্রনগরে গিয়ে দেখা দিয়ে আসবার সুযোগ একটি
মহাজীবনাবসানের সাথে সাথে ইতিপূর্বেই হাতছাড়া
হয়ে গেছে । কেবল বাকী রয়েছে, যে চোখের তিনি
প্রশংসা করেছিলেন, সে চোখে তাঁরই পরিত্যক্ত
চন্দ্রনগরের শোভা অবলোকনের আর একটি সুযোগ ।

ইতিমধ্যে আমি ছাড়পত্র নিয়ে রেখেছি । কিন্তু
আমুসঙ্গিক অপ্রস্তুতিব জন্তে দেবী হতে হতে না-জানি
উদ্ধৃত খণ্ড কবিতাটির শেষেও পূর্বোদ্ধৃত ‘চন্দ্রনাথে’
কবিতার শেষ ছয় স্তবকের ভাব-সংযুক্তির প্রয়োজন পড়ে
যায় । চন্দ্রনাথের জন্তে যেক্ষেত্রে দায়ী করা যাচ্ছে
সমসাময়িক কর্মতৎপরতার দোষকে, এক্ষেত্রে তখন
নিজের কর্মদোষকে দায়ী করা হবে ।



সবুজ সাথী

তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী

তরুণের স্বপ্ন, তরুণীর বসন্ত—সবুজ।

সত্যি ?

হেসে উত্তর দেয় স্নিগ্ধা—হ্যাঁ। সত্যি। আমিও ভালোবাসি সবুজকে। ও রঙ আমার প্রাণ, আমার মন, আমার আত্মা। আমার রক্তকণিকায় সবুজের ঢেউ বয় দিনেরাতো।

এরপর আর সবুজ-পর্ব নিয়ে কোনো প্রশ্ন তুলতে চায় না অমলেশ। জীর বেশভূষার দিকে মুগ্ধ নখনে চেয়ে থাকে শুধু।

স্নিগ্ধা হৃন্দরী নয়, তবু হৃন্দরকে হার মানায়। সবুজ রঙের শাড়ী-ব্লাউস—পায়ার ছল আংটি চুড়ি নেকলেস পরলে ওকে মানায় ভালো। সবুজের প্রতিমূর্তি হয়ে অমলেশের সামনে এসে দাঁড়ায় ও।

অমলেশ জানে স্নিগ্ধার কোন রঙ বেশী প্রিয়। তবু সে এলে, ওকে একবার শৌচা দেওয়া চাই অমলেশের। ওর কাব্যিক ছন্দের উত্তর না শুনলে মন ভরে না।

উত্তর দিয়েই হাসতে হাসতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় স্নিগ্ধা। রঙের ছোপ রেখে যায় বেড-কভার, টেবিল ক্লেথ, জানলা-দরজার পর্দায়। . .

ঘরের চারিদিকে বার বার চোখ বুলাতে থাকে অমলেশ। বাস্তবিকই তার জীর মার্জিত রুচি আছে, সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধও আছে।

জীর এই রুচিবোধ নিয়ে বন্ধুদের কাছে গল্প করে অমলেশ দিনের পর দিন। বন্ধুরা এ বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করতেও ছাড়ে না তাকে। বৌ-ভক্ত স্বামীর বৌজ্ঞতি আর শুনতে পারা যায় না! কানে তাল ধরবার যোগাড়! এসব কথা শুনেও, নিজের বক্তব্য শেষ না করে, কিছুতেই থামবে না অমলেশ।

সেই অমলেশ কালো রঙের বেড-কভারের ওপর গালে হাত দিয়ে বসে ভাবছে।—বিয়ের পর থেকে গত দশ বছরের কথা। মাস দু'য়েক আগের কথাও।

স্নিগ্ধার মুখেই শোনা। জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই, ওই একমাত্র রঙই প্রিয় হয়ে ওঠে তার কাছে। কিন্তু

সে প্রিয়র চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বাড়ীঘরে— দু' মাস ধরে।

সবুজ বিদায় নিয়েছে একেবারে স্নিগ্ধার মন থেকে— রুচি থেকে। সবুজের জায়গা দখল কবেছে মিশমিশে কালো। জানলা দরজায়ও কালো পর্দা ঝুলছে। কালো ঘেরা ঘরে ঢুকলে দাকণ অস্বস্তি বোধ করে অমলেশ।

জীরকে বলেছে অমলেশ তার মনের কথা।—সবুজ হলে তরুণ-তরুণীর মনের বসন্ত কি বেঁচে থাকবে ?

মুখখানা শাদা হয়ে গেছে স্নিগ্ধার। স্মিয়মাণ মুখে জবাব দিয়েছে—বসন্ত তো কোনো ফলই দিলে না। থেকে কি করবে আর ? তরুণ-তরুণী কি আর আছি আমরা এখনো ? আমার ছত্রিশ, তোমার বিয়ত্রিশ।

অমলেশ বোঝে জীর এ ব্যথাকরা কথা মর্ম। তবু পীড়াপীড়ি করে—তুমিই তো বলেছিলে একদিন—যত্ন অবধি সবুজে ছুপিয়ে রাখবে তোমার মনকে !

না বুঝে বলেছিলুম। গস্তীর কণ্ঠ স্নিগ্ধার।

অমলেশকে আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করার স্মরণ না দিয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে যায় স্নিগ্ধা।

স্নিগ্ধা দু'মাসে অনেক পাণ্টেছে। আগের হাসিখুশী মানুষ নেই আর সে। অমলেশকেও এড়াতে চায় বেশী করে। প্রথম প্রথম অমলেশের লক্ষ্য পড়েনি অতোটা। পড়ল রঙ বদলে।

স্নিগ্ধা একটা কিছু ভাবে—যেটা অমলেশের কাছে সম্পূর্ণ গোপন রাখতে চায় ও। অনেকবার, ঘরে এসে লক্ষ্য ক'রেছে—জানলার পর্দা সরিয়ে কি যেন দেখে ও। দেখার তত্পরতা এমনিই, ঘরে ঢুকে সে যে দাঁড়িয়ে আছে—এটাও জানতে পারে না। তার গলা পরিষ্কারের আওয়াজে চমকে ওঠে স্নিগ্ধা। সম্ভবতাবে জানলার পর্দা টেনে দিয়ে কাঁপা গলায় বলে—তুমি ! কতোকণ ?

আশ্চর্য হয়ে যায় অমলেশ জীর এই প্রশ্নে। আগে—ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে ফিরতে রাত হয়েছে অনেকদিন। এসে দেখেছে তার প্রতীক্ষায় জেগে রয়েছে স্নিগ্ধা। নিজে এসে দরজা খুলে দিয়েছে।

জ্ঞানতে চেয়েছে অমলেশ—কি ক'রে বুঝলে যে আমি এসেছি? যদি অস্ত্র কেউ হত—!

মুহু স্বরে বলেছে স্নিগ্ধা—তোমার পায়ের শব্দ চিনি আমি। বাতাসে শুনতে পাই।

সেই স্নিগ্ধা! ঘরে প্রবেশ ক'রে অমলেশ দাঁড়িয়ে থাকলেও অস্ত্রাত থেকে যায় ওর কাছে!

তুমি এতো অস্ত্রমনস্ক হয়ে গেছ কেন স্নিগ্ধা? অনেকবারই পুনরুক্তি করেছে অমলেশ এই একই প্রশ্নের। প্রশ্ন শুনে বিব্রত বোধ করেছে যেন স্নিগ্ধা। বলেছে—অস্ত্রমনস্ক! তুমি কিছু কি দেখেছো? কিছু বুঝেছো নাকি?

বিস্মিত বিষয়ে খুঁজতে চেষ্টা করেছে অমলেশ আগেকার স্নিগ্ধাকে। আগেকার স্নিগ্ধা যেন তার কাছ থেকে হারিয়ে গেছে।

সবচেয়ে তাচ্ছব বনে গেল অমলেশ সেদিন। ঘরে ঢুকতে দেখলে নিবিষ্ট মনে একখানা চিঠি পড়ছে স্নিগ্ধা। তাকে দেখতে পেয়েই ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। চিঠিটা ব্রাউসের বুক পুরে, শব্দব্যস্ত উঠে দাঁড়াল। জ্বায়ে ভরা ছুঁচোখ তার দিকে তুলে ধরে বললে—তুমি কতোকণ?

কোনো কথা না কয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল অমলেশ।

পরদিন। জ্ঞানলায় দাঁড়িয়ে আছে স্নিগ্ধা। অমলেশ ঘরে ঢুকল। স্নিগ্ধার ছাঁকো ধরে প্রচণ্ড কাঁকুনি দিলে। সমস্ত দেহের রক্ত মুখে উছলে পড়ল স্নিগ্ধার।

স্নিগ্ধা কাতর কণ্ঠে বললে, ছেড়ে দাও। আমি থাকতে পারবো না কিছুতেই তোমার এখানে।

মাথায় বাজ পড়ল অমলেশের। একি শুনলে সে স্নিগ্ধার মুখে?

ছেড়ে দিলে স্নিগ্ধাকে অমলেশ। জ্ঞানলার পর্দা টেনে দিতে যাচ্ছে স্নিগ্ধা, অমলেশের বজ্রমুষ্টি ওর হাত চেপে ধরলে। হিড় হিড় ক'রে টানতে টানতে তিনতলায় নিয়ে এলো স্নিগ্ধাকে অমলেশ।

তিনতলার পূর্বের ঘর সবুজে সাজানো। সবুজ বেড-কভারে ঢাকা বিছানায় জোর করে বসিয়ে দিলে। দৃঢ় কণ্ঠের নির্দেশ জ্ঞানালে অমলেশ।—দোতলার ওঘরে যাওয়া বন্ধ চিরদিনের জন্তে। এখানেই থাকতে হবে আজ থেকে।

ঝিলুঝিলিয়ে হেসে উঠল স্নিগ্ধা।

অমলেশ চলে যাবার পরও, স্নিগ্ধা সবুজ বেড-কভারে নিম্নেকে বিছিয়ে দিয়ে পড়ে রইল শানিক। অপরিণীত আনন্দে বুক ভরপুর হয়ে গেছে তার।

এইটাই মনে-প্রাণে চেয়েছিল সে। দূরে সরে যাওয়ার ছদ্ম অভিনয়ে অমলেশকে কাছে টানতে। অমলেশের নিখাদ ভালোবাসা। তার অভিনয় সার্থক।

কিন্তু অমলেশকে সত্যি কি শাস্তি দিতে পেরেছে, ওর আশা পূর্ণ করতে পেরেছে স্নিগ্ধা? না।

যখন বিয়ে হয়েছিল খুব গরীব ছিল তারা। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছে সে—না খেতে পেয়ে মরার জন্ত, এই দুঃস্থায়—দয়া করে কোনো সম্ভান যেন না পাঠান তিনি। সর্কণে শুনেছিলেন ঈশ্বর। - প্রার্থনা পূর্ণ করেছিলেন। পাঠাননি কোনো সম্ভানকে।

গরীব থেকে ক্রমে ক্রমে ভাগ্যচক্র ঘুরল তাদের। আমীর হ'ল তারা। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করল আবার সে—দয়া করে, বিষয় রক্ষার জন্ত একটি পুত্রসম্ভান দিতে। এ ক্ষেত্রে বধির হ'লেন ভগবান। তিনি আশ্রিত ভক্তের কোনো কথাই শুনলেন না। মনোবেদনাও বুঝতে চাইলেন না।

ঈশ্বরের অকরণ মনোভাবে চিকিৎসা-সাগরে ডুব দিতে হ'ল তাকে। চিকিৎসার কোনো ফ্রটি হয়নি স্নিগ্ধার। ডাক্তারবাবুরা হতাশ মুখে প্রত্যাখ্যান করে তাকে।

ভবিতব্য নিয়ে মন খারাপ করতে বারণ করেছে বার বার অমলেশ। সেও স্বামীর সহানুভূতি ও সান্ত্বনায় ব্যথা ভুলতে বসেছিল প্রায়—বাদ সাধল অমলেশের প্রিয় বন্ধু। তার গুপ্ত কৃতস্থানে ঘা মেরে জ্বালিয়ে তুলল।

অস্ত্রদিনের মতো সবুজ বেশে সেজেগুজে স্বামীকে দেখাতে যাচ্ছিল সে। থমকে গেল কথা শুনে। কানে গরম সীসে ঢালা কথা।

বেদ-পুরাণের প্রজ্ঞাপতি ও উষা

আচার্য্য ত্রীরাজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী

প্রজ্ঞাপতি ব্রহ্মা ও উষা সম্বন্ধে রূপকালঙ্কার দ্বারা বেদে কার্যকারণের উপদেশরূপী বিষয় বিদ্যমান আছে ; এই রূপকালঙ্কার পরিত্যক্ত হইয়া পিতাপুত্রীর সমাগম-রূপী শ্লেষপূর্ণ অপর একটা ইচ্ছামূরূপ ব্যাখ্যানযুক্ত গল্প-কথার বর্ণনা, ব্রহ্মাওপুরাণাদি গ্রন্থ হইতে প্রচলিত হইয়াছে ; ইহা অনেকেই জ্ঞাত হইয়া থাকিবেন। বেদোক্ত প্রজ্ঞাপতি ও উষা সম্বন্ধে রূপকালঙ্কারযুক্ত কার্যকারণের উপদেশ এই যে—

প্রজ্ঞাপতিবৈ স্বাং হৃহিতরমভ্যাদ্বিবিমিত্যন্ত-
মাছ ক্রবশা মিত্যন্তেতাযুশো ভূত্বা রোহিতং
ভূতমভ্যেৎ। তস্ম যদ্রেতসঃ প্রথমমুদদীপ্যত
তদসাবাদিত্যো ভবৎ—(ঐতরেয় আঃ ৩।৩৩।৩৪)।

স্বামীর প্রিয় বন্ধু বলছেন, এত বিষয় ! একটা ছেলে না হলে ঘর মানায় না। বৌদি খুবই ভালো স্বীকার করি, ওঁকে মাসহারার ব্যবস্থা করে দিয়ে, ওঁর মত নিয়ে ডিভোর্স করে অন্য একটা বিয়ে করা উচিত। না হ'লে তোমার বংশে বাতি দিতে থাকবে না আর কেউ ! জাড়তুতো ভায়েদের বংশে ভূতের সংসারে বাড়ী তরতি তোমার। ছুধের সাধ কি ঘোলেমেটে ?

এরপর থেকেই, ক্ষোভে দুঃখে সবুজ বিদায় দিলে স্নিগ্ধা। জীবনের অন্ধকার কালোকেই গম্বল করে নিলে সে। কালোর মধ্য দিয়ে অভিনয় চালাল অমলেশকে নতুন করে পেতে। আরো আঁকড়ে ধরতে—যাতে তার কাছ থেকে কেউ না ছিনিয়ে নিতে পারে ওকে। অমলেশকে ছাড়তে চায়নি সে—ছাড়তে পারবে না বলে।

অমলেশের মনে প্রতিহিংসার আগুন জ্বালাতে চেয়েছিল স্নিগ্ধা—নিজের মনের আগুন নেতাবার ক্ষেত্রে। স্নিগ্ধার মনের আগুন নিভেছে।

কিন্তু ?

কিন্তু নিজের জন্তু অমলেশকে এভাবে আটকে রাখা স্বার্থপরতাকেই কি বেশী করে প্রশ্ন দিচ্ছে না সে ? স্বার্থবিজড়িত ভালবাসা কি প্রকৃত প্রেম ?

প্রজ্ঞাপতিবৈষ্ণবপূর্ণোগপুরুষানেষ সবিতা” এই শতপথ ব্রাহ্মণের (১০।২।৭।৪) বচন অনুসারে প্রজ্ঞাপতি ও সবিতা এই দুই সূর্যের নাম এবং “তদ্বৈতং ব্রহ্মা প্রজ্ঞাপত্যঃ” এই ছান্দোগ্য উপনিষদ প্রমাণ তথা “বিবস্বান্ মনবেপ্রাহ” এই ভগবদ্গীতা বচন অনুসারে প্রজ্ঞাপতি-ব্রহ্মা অর্থে সূর্যকেই বুঝায়। “আদিত্য আদিতুতত্বাং ব্রহ্মা ব্রহ্ম পঠন্নভুৎ” এই যংস্তু পুরাণোক্ত বচন অনুসারেও আদিত্যের অর্থাৎ সূর্যের নামান্তরই ব্রহ্মা। গুণকর্মামুযায়ী ব্রহ্মা সংজ্ঞক সূর্য সম্বন্ধে বেদোক্ত মন্ত্রকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করা যায়। যথা—

“নুনং জনাঃ সূর্যেন প্রসূতা অন্নমর্ষানি কৃণবন্নপাংসি।

(ঋক্ ৭।৬৩।৪)

নিজের মনেই বলে উঠল স্নিগ্ধা—না, না, না।

সন্ধ্যায় অমলেশ এলে, সব কথা জানালে ওকে স্নিগ্ধা। অন্তের অপেক্ষায় জানালায় দাঁড়ানো, আকাংক্ষিতের চিঠি পাওয়া-পড়া—সমস্ত মিথ্যে, নিজেরই তৈরী করা নাটক।

অমলেশের দু'হাত ধরে অহুন্নয় করল স্নিগ্ধা—আমি মত দিচ্ছি তুমি বিয়ে কর। সত্যি আমি খুব সুখী হব এতে। অন্তত একটি ছেলের দরকার বংশরক্ষার জন্তে।

স্নিগ্ধার কথা শুনে হো-হো করে হেসে উঠল অমলেশ। ওর চিবুক ধরে আদর করে বললে, সবই জানি আমি। তোমার মতো কেউ ভালোবাসতে পারবে না আর আমার। আমার জন্তুই তোমার অভিনয়—বুঝতে পেরেই তো তিনতলায় নিয়ে এসেছি।

অবাক চোখে অমলেশের দিকে তাকিয়ে আছে স্নিগ্ধা।

ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে গেল অমলেশ। বারান্দায় খেলা করছিল জাড়তুতো ভায়েকের ছেলেমেয়ে ? ওদের দু'জনকে তুলে নিয়ে ঘরে এলো ? স্নিগ্ধার কোলের ওপর শুইয়ে দিল ছেলেটিকে। মেয়েটিকে বুকে চেপে ধরে পিঠ চাপড়াতে লাগল।

দৃষ্টি বিনিময় হল স্বামীস্ত্রীর। উভয়ের চোখের তারায় খুশীর সবুজ বিদ্যুৎ ঝিলিক মেরে গেল যেন।

প্রাণঃপ্রজ্ঞানামুদয়তোব স্বর্ষঃ (প্রশ্ন উঃ ১।৮)।

যত্র পবতে তত্রস্বর্ষঃ—(মুণ্ডক ২।১।৬)

শতপথ ব্রাহ্মণে ও নিরুক্তকার বাস্কমুনিয় 'সবিতা' শব্দের অর্থও ঐরূপ প্রমাণ হয়।

যস্মাদ্যদুপদ্যতে তত্তত্তাপত্যবৎ স তস্য পিতৃবদিতি
রূপকালঙ্কারোক্তিঃ

যে দ্রব্য যাহা হইতে উৎপন্ন হয় তাহাকে উক্ত দ্রব্যের সমস্তান বলা যায়।

'উষা' অর্থে যাহা তিন বা চারিঘটিকার সময় রাজি-শেষে পূর্বদিকে রক্তবর্ণ দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা স্বর্ষকিরণ হইতে উৎপন্ন হেতু উহার কল্পা বলিয়া অভিহিত হয়। জ্যোতিষ মতে স্বর্ষের ক্ষেত্র সিংহরাশি ; ইহারই দক্ষিণ পাশে সমরুপী কস্তুরাশি। স্বর্ষ হইতে উৎপন্ন উষার সম্মুখে যে স্বর্ষকিরণ পতিত হয়, তাহাতেই বীর্ষস্থাপন রূপ কার্য হইয়া থাকে ; এই দুইয়ের সংযোগ দ্বারা পর্জন্ত অর্থাৎ জলরুপী মেঘ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইরূপে নিরুক্তেও রূপকালঙ্কার বিষয় লিখিত আছে—

তত্র পিতা হুহিতুর্গর্ভং দধতি পর্জন্তং পৃথিব্যাঃ।

নিঃ ৪।২১

পিতার স্বরূপ স্বর্ষের যেমন কল্পা স্বরূপ উষা হয় ; তদ্রূপ পিতার স্বরূপ যে পর্জন্ত অর্থাৎ জলরুপী যে মেঘ আছে, তাহার কল্পা স্বরূপ পৃথিবী হইয়া থাকে। কারণ পৃথিবীর উৎপত্তি জল হইতে হয়। যখন ঐ মেঘ উক্ত পৃথিবীরূপী কল্পাতে বৃষ্টি দ্বারা জলরুপী বীর্ষকে ধারণ করে, তখন ঐ পৃথিবী গর্ভবতী স্বরূপ কিছুকাল থাকিয়া পরে ওষধাদি রূপ অনেক পুত্র উৎপন্ন করিয়া থাকে। জ্যোতিষ মতে কল্পা পৃথিবীরাশি এবং উহার অবয়ব মধ্যে একটি কল্পার হস্তে ওষধীরূপী শস্তগুচ্ছ ধৃত রহিয়াছে।

দ্যৌর্মে পিতা জনিতা নাভিরজ বহুর্মে মাতা পৃথিবী
মহীয়ম্।

উস্তানয়োশ্চাত্তোর্যোনিরস্তরজা পিতা হুহিতুর্গর্ভমাধাৎ।

ঋক্ ১।১৬৪।৩৩

(জ্যোঃ) স্বর্ষের প্রকাশ (মে পিতা) সর্বপ্রকার স্বর্ষের হেতু স্বরূপ হওয়ায় উহা আমার পিতার সমান

এবং পৃথিবী (মহীয়ম্) বৃহৎ স্থান বা ক্ষেত্রযুক্ত হওয়ায় মাতা হেতু মাননীয় বশতঃ আমার মাতৃত্বল্যা হইয়া থাকে। (উস্তানয়োঃ) উপরিভাগ ও নিম্নে যেরূপ বস্ত্রের চক্ৰাতপ এবং বসিবার আসন লাগাইয়া দেওয়া যায়। অথবা যেরূপ মুখোমুখী দুই সেনা একত্রিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ স্বর্ষ ও পৃথিবীর সম্বন্ধে রূপকালঙ্কার জানিতে হইবে। অর্থাৎ উপরিভাগের চক্ৰাতপের সমান স্বর্ষকে এবং নিম্নস্থ উপবেশন জন্ত আসন পৃথিবীর সমান হইয়া থাকে ; অথবা উভয় সেনা যেরূপ মুখোমুখী দণ্ডায়মান হয়, উহাদেরও তদ্রূপ পরস্পর সম্বন্ধ আছে। (যোনিঃ) গর্ভাশয়ের স্থান পৃথিবী এবং ঐ গর্ভ সকল স্থাপনকারী পতির স্তায় মেঘ হইয়া থাকে। যে নিজ বিন্দুরূপ বীর্ষ দ্বারা ঐ পৃথিবীকে গর্ভধারণ করাইয়া অন্ন ও ওষধাদি অনেক সমস্তান উৎপন্ন করাইয়া দেয়, যাহা দ্বারা সমস্ত জগতের পালন হইয়া থাকে।

শাসদ্বহনির্হুহিতুর্গর্ভাধিবাং ঋতস্যাদীধিতিং সপর্ষন্।

পিতা যত্রহুহিতুঃ সেকমৃজয়ন্ সংশথ্যোন মনসাদধস্তে।

(ঋক্ ৩।৩১।১)

(বহনি) সকলের বহন অর্থাৎ প্রাপ্তিকারী স্বর্ষ, কিংবা পরমেশ্বর মহুয়গণের জ্ঞান বুদ্ধি জন্ত রূপকালঙ্কার দ্বারা কার্যকারণের উপদেশ দিয়াছেন। (ঋতস্ত) পৃথিবী—জলরুপী মেঘ হইতে বৃষ্টি দ্বারা জলের (জলরুপী বীর্ষের) ধারণকারী জগতে মহুয়োরা (নপ্ত্যাদি) পুত্র-পৌত্রাদির পালনও উপদেশ করিয়া থাকেন ; যাহা সংসারী মহুয়ের অবশ্য করণীয়। (পিতা যত্র হুহিতুঃ) যে অল্প স্বরূপ ব্যবহারে স্থিত থাকিয়া পিতা হুহিতাতে বীর্ষ স্থাপন করিয়া থাকে, যিনি এইরূপ পদার্থ ও তাহার কার্যকারণ সম্বন্ধ রচনা করিয়াছেন, তাহাকে আমরা নমস্কার করি। এইরূপ প্রজাপতি-ব্রহ্মা বা স্বর্ষ ও উষা, মেঘ ও পৃথিবী বিষয়ে বলা হইল। এইরূপ ইন্দ্র ও অহল্যা এবং গৌতম আদির রূপকালঙ্কারযুক্ত কথা অতি পরিপাট্যরূপে বেদ, নিরুক্ত ও ব্রাহ্মণাদি সঙ্গ্রহে লিখিত আছে। এই প্রকার অলঙ্কারযুক্ত বাক্য না জানিয়া তদ্রূপ বিষয়ের বর্ণনা করিলে উহা ব্যভিচার দোষযুক্ত হইয়া বিবিধ প্রকার অসং কথা প্রচলিত হইয়া পড়ে।

পেটেন্ট ঔষধ

শ্রীত্ৰিপুরাশঙ্কর সেন

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন—মা পাঁচ ছেলের জন্ম পাঁচ রকম রান্না করেন, ‘যার যা ভাল লাগে, যার যা পেটে ময়।’ মানুষে মানুষে যে রুচিগত ও প্রকৃতিগত ভেদ আছে, শ্রীরামকৃষ্ণ এখানে তাহাই স্বীকার করিয়াছেন।

আমরা মানুষে-মানুষে ঐক্যের কথা বলি, কিন্তু মানুষের মধ্যে যে অকুরন্ত বৈচিত্র্য আছে, তাহাও অস্বীকার কবা যায় না। দার্শনিক জেম্‌স্‌ বলিয়াছেন, আমরা এক বিচিত্র জগতে বাস করি, ইহা universe নয়, multiverse, আমরা কিন্তু বলি, ইহা universeও বটে, আবার multiverseও বটে, কেননা, যিনি এক, তিনিই বহু হইয়াছেন। মাষাবাদী বহুকে অস্বীকার করেন, তাঁহার চোখে নাম ও রূপ দুইই মিথ্যা। কিন্তু লীলাবাদী জানেন, বহুকে না হইলে তাঁহার লীলা হয় না। সুতরাং একও যেমন সত্য, বহুও তেমনই সত্য।

সংসারে প্রত্যেক মানুষ যেন এক একটি স্বতন্ত্র জগৎ। মানুষ সমাজ রচনা করে, রাষ্ট্রগঠন করে, নানা প্রয়োজনে সম্ভব হয়, তথাপি সে তাহার ব্যক্তি-সত্তা বিদর্জনে দিতে পারে না, সমষ্টির মধ্যে ব্যষ্টিকে বিলুপ্ত করিয়া দেওয়া কল্যাণের পন্থাও নহে। যাহাকে আমরা সাম্য বলি, তাহার অর্থই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। এ কালের পাশ্চাত্য শিক্ষা-বিজ্ঞান মানুষের এই বৈচিত্র্যকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। শিক্ষার্থীদের ভেতর কেহবা অকালপক, কেহ তীক্ষ্ণবুদ্ধি, কেহ জড়বুদ্ধি (ইহাদের মধ্যেও শ্রেণী-বিভাগ আছে) আবার কাহারও বুদ্ধি বা পঞ্জিকার বয়স অহুসরণ করিয়া চলে। তাই নানা শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্ম বিভিন্ন শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। তিনিই যথার্থ শিক্ষাত্রণী যিনি ধীরে ধীরে বিদ্যার্থীদের মানস-মুকুলকে বিকশিত করিয়া তোলেন। তাঁহাকে অবশ্য কালের প্রতীক্ষা করিতে হয়। তিনি জানেন, কালের শক্তি অপরিমিত কিন্তু গতি মধুর। কাল মানুষের মনের গভীরতম ক্ষত-চিহ্নকেও মুছিয়া দিতে পারে। তাই একজন সুরসিক ইংরেজ লেখক কালকে ‘হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের’ সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন।

মানুষের মধ্যে অনন্ত বৈচিত্র্য থাকিলেও আমাদের শাস্ত্রকারেরা মানুষকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। একালে নৃতত্ত্ববিদেরা মানুষের মাথার খুলি প্রকৃতি পরীক্ষা করিয়া যেভাবে মানবের শ্রেণীবিভাগ করেন, ইহা সেরূপ নহে। এ কালের কোন কোন চিকিৎসক মানুষের আকৃতি দেখিয়া মোটামুটি বলিয়া দিতে পারেন, কাহার মধ্যে কোন অস্তঃপ্রাণী গ্রহিয়সের আধিক্য বা অল্পতা রহিয়াছে এবং তদনুসারে মানুষকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারেন, আমাদের শাস্ত্র-কারদের শ্রেণীবিভাগ সেরূপও নহে। ভারতের ঋষিগণ বিশ্বব মানুষকে প্রকৃতি অনুসারে অথবা গুণ ও কর্ম অনুসারে তিনটি অথবা চারটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, সংসারে কোন মানুষে সত্ত্বগুণের, কোন মানুষে রজোগুণের আবার কোন মানুষে বা তমোগুণের প্রাধান্য। অথবা আমরা বলিতে পারি, কোন মানুষে সত্ত্বগুণের আধিক্য, কোন মানুষে সত্ত্ব ও রজোগুণের আধিক্য, কাহারও মধ্যে রজ ও তমোগুণের আধিক্য, কাহারও মধ্যে বা তমোগুণের প্রাধান্য। ইহাই নৈসর্গিক চাতুর্য্য। এই ত্রিগুণতত্ত্ব যে ভারতীয় মনীষার একটি অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার তাহাতে সন্দেহ নাই। কথটি বলিয়াছেন মনসী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দার্শনিক প্লেটোর পরিকল্পিত আদর্শ রাষ্ট্রেও আমরা তিনিই শ্রেণী দেখিতে পাই। প্লেটোর মতে যথার্থ দার্শনিক হইবেন রাষ্ট্রের নেতা, ইহা ছাড়া রাষ্ট্রে থাকিবে যুদ্ধকুশলী মানুষ অথবা সমর-বিভাগের লোকেরা এবং হৃষিকর্ম ও শিল্পাদির সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে সংশ্লিষ্ট মানুষেরা। আমরা যদি বলি, প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রে যে তিন শ্রেণীর লোকের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারা হইতেছেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, তবে আমাদের নিশ্চয়ই কোন গুরুতর অপরাধ হইবে না। প্রাচীন রোমেও প্যাট্রিসিয়ানরা ছিল ব্রাহ্মণ আর প্লিবিয়ানরা ছিল শূদ্র। এরিস্টটল যে সমাজের পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহাও ছিল গুর-বিগ্রস্ত বা

hierarchical. এরূপ সমাজ-ব্যবস্থার অবশ্য দোষ ও গুণ উভয়ই বর্তমান।

আমাদের তন্ত্রশাস্ত্রে পশুভাব, বীরভাব ও দিব্যভাবের কথা বলা হইয়াছে। যাহারা তমোগুণী, তাহাদের জন্ত পশাচার ও যাহারা রজোগুণী তাহাদের জন্ত বীরাচার বিহিত। একমাত্র সত্ত্বগুণী লোকেরাই দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন। তন্ত্রের দৃষ্টিতে কোন মানুষই হয় নয, কারণ, সকলেরই সাধনায় অধিকার আছে। সকলেরই লক্ষ্য এক, কিন্তু পথ তিন্ন ভিন্ন। মহিয়ন্তবেও বলা হইয়াছে, ‘রুচির বৈচিত্র্য-বশতঃ যিনি যে পথই অবলম্বন করুন না কেন, তুমিই সকলের গম্যস্থান, যেমন নদীসমূহ ঋজুগামিনীই হউক, আর বক্রগামিনীই হউক, সকলেরই গম্যস্থান সমুদ্র।’

মানুষে মানুষে প্রকৃতিভেদ স্বীকার করিলে কর্তব্য-ভেদও স্বীকার করিতে হয়। গীতাষ ভগবান স্বধর্ম ও পরধর্মের কথা বলিয়াছেন, আর এই কথা দুইটিও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। যিনি প্রকৃতিনিয়ত কর্ম করেন, তিনিই স্বধর্ম পালন করেন। প্রকৃতিকে অহুসরণ করিয়াই তো প্রকৃতিকে অতিক্রম করিতে হয়। কারণ, ভয়াবহ পরধর্ম আশ্রয় করিয়া কেহ কখনও কল্যাণ লাভ করিতে পারে না।

আমাদের দেহটা একটা রন্ধনশালাও বটে, আবার একটা ল্যাবরেটরীও বটে। তবু একজনের দেহের সঙ্গে যে আর একজনের দেহের ভেদ আছে, সে কথা অস্বীকার করা যায় না। রাম ও শ্রাম সমবষস্ক, বলবীৰ্য্যেও উভয়ে উভয়ের তুল্য, আপাত দৃষ্টিতে উভয়েই একই ব্যাধিতে আক্রান্ত, তাই যে ঔষধে রাম আরোগ্য লাভ করিয়াছে, চিকিৎসক শ্রামকে সেই ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু রোগমুক্ত হওয়া দূরে থাকুক, ঔষধ সেবনের পর শ্রামের ব্যাধির প্রকোপ বাড়িয়া গেল। একালের ডাক্তারেরা ইহাকে বলিবেন, এলার্জি অথবা Idiosyncrasy of human constitution. আমাদের দেশী চিকিৎসাশাস্ত্রের মতে এরূপ হওয়ার কারণ মানুষেব ষাতুর্বেষম্য, অর্থাৎ সংসারে কোন মানুষ বাতপ্রধান, কোন মানুষ পিত্তপ্রধান আবার কোন

মানুষ বা শ্লেষ্মাপ্রধান। তাই চিকিৎসকের প্রথম কর্তব্য, রোগীকে পরীক্ষা করিয়া তাহার প্রকৃতি নির্ণয় করা। এ ক্ষেত্রে পারিবারিক চিকিৎসকের অনেকটা সুবিধা আছে। কিন্তু বর্তমান যান্ত্রিক যুগে চিকিৎসা জিনিষটাও অনেকটা যান্ত্রিক হইয়া পড়িয়াছে। রোগ-নির্ণয়ের জন্ত চিকিৎসককে যান্ত্রিক পরীক্ষার (clinical examination) ফলের উপর নির্ভর করিতে হয়, তারপর তিনি হয় তো কোন পেটেন্ট ঔষধের ব্যবস্থা করেন। এদিকে রোগীদের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের বশে পেটেন্ট ঔষধের সংখ্যাও দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইলে রোগীর পক্ষে এই ‘পেটেন্ট’ ঔষধ ‘পেটেন্ট’ বা কার্যকরী হয়, নতুবা রোগী হয় তো সকল দোষ গ্রহ-বৈশ্বণ্যের উপর চাপাইয়া দেন।

এ দেশের বিদ্যালয়সমূহে তথা মহাবিদ্যালয়ে (মহা অবিদ্যার আলয়ে অথবা মহাবিদ্যা বা চুরিবিদ্যার আলয়ে) যে শিক্ষা চলিতেছে তাহা পেটেন্ট ঔষধের মতো, কিন্তু সত্যিকারের আচার্য্য কোথায় মেলে। আবার শাস্ত্রগ্রন্থের প্রতি শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও বলিতে হয়, শাস্ত্রসমূহ যেন পেটেন্ট ঔষধ, কিন্তু তাঁহাকেই বলি সদৃশক যিনি আমার প্রকৃতি-অনুযায়ী ঔষধের ব্যবস্থা করেন। ভক্ত কবি তুলসীদাস বলেন—

‘সদৃশক পাওয়ে ভেদ বত্যাওয়ে

জ্ঞান করে উপদেশ।

তও কয়লাকি ময়লা ছোটে,

যব্ আগ্ করে পরবেশ’ ॥

সংসারে তিনিই ধন্য যিনি ষথার্থ আচার্য্যের নিকট দ্বিজ্ঞান ও শুক্রযু হইয়া গমন করিয়াছেন অথবা সদৃশকের আশ্রয় লাভ করিয়াছেন। ইহাদের একজন শিক্ষাগুরু আর একজন দীক্ষাগুরু। এই শিক্ষা ও দীক্ষার মধ্য দিয়াই পশু-মানব দেব-মানবরূপে নবজন্ম লাভ করে। এই নবজন্ম-লাভকে যাহারা জীবনের পরম কাম্য বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা শিক্ষাগুরু বা দীক্ষাগুরুর প্রয়োজনকে অস্বীকার করিতে পারেন না। তাঁহারা শ্রদ্ধাবান ও জিতেদ্রিয় হইয়া গুরুগত জ্ঞান অধিগত করেন।

জ্যোতিষের দৃষ্টিতে দুর্গাপূজা

শ্রীবনমালী রায় জ্যোতিষশাস্ত্রী

জ্যোতিষ শাস্ত্রের স্বল্প গণনা ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী ধর্মশাস্ত্রের ক্রমবিকাশ—নিবনের সময়ধা। ধরাবাঁধা কতকগুলি নিয়মে জ্যোতিষের ফল বিচারিত হয়ে থাকে। ফল মিলতেও দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে। মূল বিজ্ঞানটা জানলে তবেই জ্যোতিষ শাস্ত্রের জ্ঞান পূর্ণতা লাভ করে। স্বত্রগুলির সৃষ্টি হয়েছে কতকগুলি সিদ্ধান্তের ফলে মূল বিজ্ঞানকে আশ্রয় করে। তাই ফল বিচার নিষ্ফল হয় না। সব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই একই নিয়ম।

বস্তুতঃ দুর্গাপূজার মূল ভিত্তি জ্যোতিষ শাস্ত্র। দুর্গা-পূজা, বৈষ্ণবী শক্তি বা শাক্ত সত্ত্বগুণের উপাসনা একই জিনিষ। তথোগুণকে সত্ত্বগুণ দিবে জয় করা, অম্মুর শক্তিকে বিনাশ করা—এই হল দেবাত্মের যুদ্ধ। দেবতা সকল বৈষ্ণবী শক্তি দুর্গার নিকট প্রার্থনা জানালেন অম্মুর ধ্বংসের—জয়ং দেহি দ্বিষো জহি। দুর্গা অম্মুর ধ্বংস করে দেবতাবৃন্দকে রক্ষা করলেন।

জ্যোতিষ শাস্ত্রও জন্মপত্রিকা বিচার করে কোন লোকের মধ্যে অসৎ গুণের প্রাধান্য দেখলে দেবতার উপাসনাদি করে উহা বিনষ্ট করবার নির্দেশ দেন। অর্থাৎ সত্ত্বগুণগরী দুর্গারই উপাসনার নির্দেশ দেন।

জ্যোতিষ মতে মঙ্গল গ্রহ শক্তিব প্রতীক। শক্তি ছাড়া বা মঙ্গল গ্রহ ছাড়া আমরা চলতে পারি না। এই শক্তিকে ভালমন্দ উভয় দিকেই ব্যবহার করা যায়। আবার এই শক্তি দিয়ে নিজেকে এবং অজ্ঞকে ধ্বংস করা যায়। শক্তির প্রতীক মঙ্গলগ্রহের আসল রূপটা জানা থাকলে তাকে আমাদের আত্মিক ও জাগতিক উন্নতির কাজে লাগাতে পারি।

জ্যোতিষ শাস্ত্রে আছে, আদিম সৃষ্টির ক্রমবিকাশের ফলে উদ্ভূত হল এক একটি ব্যষ্টি পশু। আর তার থেকে ক্রমবিকাশের নিয়মে আবির্ভাব হল আদিম মানুষ। তার ভেতরে সবটাই ছিল পশুশক্তি। কাম, ক্রোধ, আর্ধ-পরতা, বিবেকহীনতা ইত্যাদি সবকিছুই পশুর প্ররুতি। মঙ্গল গ্রহ এই পশু শক্তির প্রতীক। অথও পশু শক্তি

খণ্ড খণ্ড হয়ে ব্যষ্টি রূপ পেল, তখন কোন রহস্যজনক-ভাবে তাতে মিশে গেল ঐশীশক্তির একটি ক্ষুদ্র কণা—এক তেজস্ক্রিয় অগ্নি স্ফুলিঙ্গ। এই স্ফুলিঙ্গ শুক্র গ্রহের গুণ—দয়া, বিস্তৃত প্রেম, নির্মল চরিত্র, স্বজন, পালন, শাস্তি, আত্মিক উন্নতি ইত্যাদি ঐশী গুণ। আর মঙ্গলের ক্রিয়া হল ধ্বংস, ক্রোধ, অবিবেক, হঠকারিতা, ইন্দ্রিয়াসক্তি ইত্যাদি। শুক্র গ্রহ প্রভাব বিস্তার করতে থাকলেন ক্রমে ক্রমে।

মঙ্গলগ্রহ একটি জ্বলন্ত গ্যাসের সমষ্টি। অম্ম শক্তির আধার। এ শক্তিকে একটা রূপ দিতে হবে। আর পরিণত করতে হবে একটা প্রয়োজনীয় পবিত্র শক্তিতে। এই কাজের ভার নিয়ে এগিয়ে এলেন শনিগ্রহ।

শনিগ্রহের স্বভাব শীতলতা, সঙ্কোচন, সংযম, সত্য, পবিত্রতা। শনির শীতলতায় মঙ্গলগ্রহের গ্যাসের সমষ্টি জমাট বেঁধে একটা রূপ পরিগ্রহ করল। শনির প্রভাবে স্থল শরীর আকার পরিগ্রহ করল। মঙ্গলের পশুশক্তিকে খাঁচায় পুরে পোষ মানাতে লাগলো শনির প্রভাব। একে নিয়ন্ত্রিত ও সংযত করতে আরম্ভ করলো শনি। শনিগ্রহ সত্ত্বগুণী বৈষ্ণবী শক্তি। শনির ইংরাজী প্রতি-শব্দ—Sat-urn. Sat শব্দটি সংস্কৃত সৎ শব্দের রূপান্তর। সৎ মানে সদা বিদ্যমান সন্তা; Urn অর্থাৎ যে সত্ত্বকে ধারণ করে। অর্থাৎ শনি নিত্য বিদ্যমান ঐশীশক্তি।

শুক্রগ্রহ ইচ্ছাশক্তি জগত মনের একটি অংশ। শুক্রের অর্থাৎ ঐশীশক্তির সঙ্গে মঙ্গলের পশুশক্তির চিরদ্বন্দ্ব। দেবতা ও অম্মুরের বিবাদ। অম্মুরশক্তি যখন হারিয়ে দিল দৈবীপ্রভাবকে তখনই এগিয়ে এলেন সত্ত্বগুণাশ্রয়ী অনন্ত বৈষ্ণবীশক্তি শনি। উদ্দেশ্য দৈবী শক্তির প্রতিষ্ঠা। শনির কাজই তো পশুশক্তিকে ঐশী শক্তিতে রূপান্তরিত করে আত্মিক উন্নতি সাধন করা। বৈষ্ণবীশক্তি দুর্গা পরাজয় করলেন মঙ্গলের অম্মুরশক্তিকে। প্রতিষ্ঠিত করলেন মানুষের মধ্যে আবার ঐশীশক্তিকে। আদিম

মাহুষ এগিয়ে চলল। পশুশক্তিকে পিছনে ফেলে—পূর্ণ মানবতার পথে। তাই জ্যোতিষ শাস্ত্রের মতে মঙ্গল-গ্রহের সহিত শনিগ্রহের চিরশত্রুতা। শনি ও শুক্র পরস্পর মিত্রগ্রহ।

যদি দেখা যায়, জন্মপত্রিকায অন্তত মঙ্গলের প্রভাব। তাহলে জপ, তপ, সংযম ইত্যাদি ঐশীশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে পশুশক্তির প্রভাব দূর করতে হবে। আশ্রয় করতে হবে শনির সন্তুষ্টি। নতুবা মঙ্গলের কুপ্রভাবে ধ্বংস অনিবার্য। খুনজখম ইত্যাদি করে বা দুর্ঘটনায় পড়ে প্রাণ হারাতে হবে।

রাশিচক্রের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, মেঘাদি বারটি রাশির প্রথম রাশি মেঘ। পশু মেঘের ধর্ম এক-স্বৈর্য। মেঘের অধিপতি মঙ্গলগ্রহ। মেঘলগ্নের স্বভাব কামুকতা, হঠকারিতা, ক্রোধ ইত্যাদি আদিম মাহুষের গুণ।

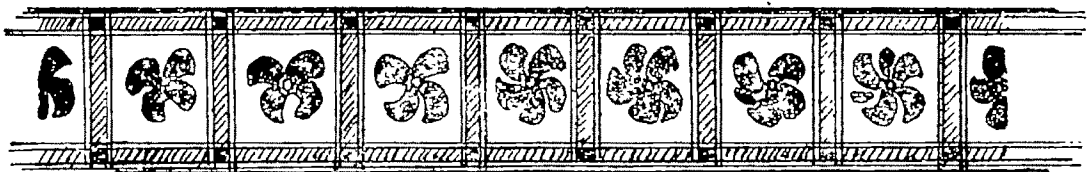
মেশরাশি অগ্নিরাশি। রাশিচক্রের প্রথম অগ্নি-রাশি। মেঘরাশির লোক নিজেদের হঠকারিতায় নিজেই ধ্বংস ডেকে আনে। তার বিবেক বুদ্ধি নাই। প্রবল অন্ধশক্তি নিজেকে ও অতকে ধ্বংস করতে সদাই উদ্যত। মধুকৈটভ সৃষ্টির আদিতে নিজেই ধ্বংস হল নিজেদের ছবুদ্ধিতে।

মঙ্গলের শক্তি যখন উপস্থিত হল রাশিচক্রের দ্বিতীয় অগ্নিরাশি সিংহরাশিতে তখন এই পশুশক্তি হল অনেকটা সংযত। উন্নতির পথে হল ধাবিত। এই রাশির প্রতীক সিংহ। সে পশুর রাজা। পশুশক্তি তার বশে। শক্তি তখন মাহুষের মস্তিষ্ক হতে হৃদয়ে স্থান লাভ করে। সিংহরাশির লোক শক্তিশালী অথচ হৃদয়বান ও বিবেকী। ইহাই সিংহবাহিনী ঐশীশক্তি। অর্থাৎ এখনও ঐশীশক্তির তলদেশে সিংহের পশুশক্তি। বেরিয়ে

এলো মহিষাসুর পশুশক্তির তলদেশ থেকে ঐশীশক্তির প্রতীক দেবীকে ধ্বংস করতে। এখন দৈবীশক্তিই শক্তিমতী—অনায়াসে বধ করলেন অসুরকে। মধুকৈটভ বধের সময় ঐশীশক্তি তেমন বলবতী হয় নি। তাই মধুকৈটভ বধ করতে ঐশীশক্তিকে বেগ পেতে হয়েছিল।

আবার এই শক্তি এল রাশিচক্রের তৃতীয় অগ্নিরাশি ধরুশাশিতে। এখন এই শক্তি বেশ উন্নত পক্তি। এই রাশির প্রতীক অশ্বের উপর উপবিষ্ট এক তীরন্দাজ। সে তীর নিক্ষেপ করছে অনন্ত আকাশের দিকে। সে চায় এখন মানবশক্তিকে ঐশীশক্তির অর্থাৎ অনন্তশক্তির সহিত মিলিত করতে। ধরুশাশি রাশিচক্রের নবম রাশি বলে বর্ষস্থানের বিচার করা হয় লগ্নের নবম স্থান থেকে। শুভনিশুভ দৈত্য চায় দেবীকে আলিঙ্গন করতে অর্থাৎ ঐশীশক্তির সহিত মিলিত হতে। এখনও অশ্বের পশু-শক্তি তার তলদেশে। মাহুষ এখনও পশুশক্তির কবল হতে সম্পূর্ণ মুক্ত হয় নি। তারা চায় জোর করে দৈবী-শক্তিকে লাভ করতে—দেবীর কেশাকর্ষণ করে। তাই শুভনিশুভ ধ্বংস হল। এর আসল মানেটা এই যে, লোকে পঞ্চমকার ইত্যাদি সাধনা করে রাতারাতি ঈশ্বর-লাভের পথে যেতে চায়। যোগ্যতা অর্জন না করে এ করতে গেলে অন্তর্নিহিত পশুর কামনা বাসনা জাগ্রত হয়ে তাকে ধ্বংস করে ফেলে। তাকে ধর্মের পথে অগ্রসর হতে দেয় না। এই হল জ্যোতিষের দৃষ্টিতে দুর্গাপূজা—ঐশীশক্তির আশ্রয় গ্রহণ। পশুশক্তির প্রতীক অন্তত মঙ্গলের হাত হতে মুক্তিলাভই দুর্গপূজার নিগূঢ় উদ্দেশ্য।*

* এই প্রবন্ধটি ইংল্যান্ডের বিশ্ববিদ্যুত জ্যোতিষী অ্যালান লিও এব জ্যোতিষ গ্রন্থ How to judge your nativity পুস্তকের দ্বারা অবলম্বনে লিখিত। এই বচনাটি গত পূজা সংখ্যায় প্রকাশিতব্য ছিল।





শিল্পীঘন

—শ্রীমদ্রামোদর দত্ত—

(পূর্বাহ্নবৃত্তি : কার্তিক সংখ্যার পর)

—আমি তাইতো বলি স্বর সবাইকার মনে স্পষ্ট আছে। বাইবের ধ্বনি তাতে শুধু স্বাক্ষর তোলে।

—স্বরের মত স্বর হওয়া চাই। ইনি তো সাক্ষাৎ মরস্বতী।

বিন্দন মুদ্র হাসিতে দেবকুমারকে 'অভিযুক্ত' করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কল্যাণ বললো—এই স্ত্রীরত্নটিকে আযত্ত করার জন্তু আমাকে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে। ঔর না ছিলেন মাণিকপুরের পুরমুখ্য নাগরিকা। প্রতিষ্ঠানের রাজদরবার অবধি তাঁর গানের খ্যাতি ছিল। হুণেরা যখন মাণিকপুর লুণ্ঠন করলো তখন তিনি একমাত্র কন্ঠাকে নিয়ে নগর ত্যাগ করে অরণ্য মধ্যে আশ্রয় নেন। তারপর আসেন এই খাজুরাপুরীতে। সেইখানেই বিন্দনের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। স্বাধীশ্বরে রাজকন্ঠার বিবাহ বাসরে ঔর মাকে যেতে হয়েছিল, ফেরার পথে পথিমধ্যে অসুস্থ হষে তিনি যারা যান। মণ্ডলেশ্বর নরোত্তমদেব তখন ঔকে নিজের অন্তঃপুরে নিয়ে যেতে চায়, আমি সেই চেষ্টা ব্যর্থ করে ঔকে নিয়ে আসি আমার গৃহে।

নাগরিকা-কন্ঠাকে গৃহে স্থান দেওয়ার জন্তু গোষ্ঠীপতি আমাকে সমাজচ্যুত করেছিল। কিছুটা অসম্মান আমাকে সহ্য করতে হয়েছে সত্যি, কিন্তু ঔকে আমি ছাড়তে পারিনি। সে ঔর রূপের জন্তু নয়, ঔর চেয়ে রূপবতী মেয়ে আমি অনেক দেখেছি, ঔর কণ্ঠ দেবকণ্ঠ, অমন কণ্ঠ আমি কখনও শুনি নি, স্থির করেছিলাম ঔকে নিয়েই উজ্জয়িনী চলে যাবো, সেই চেষ্টাতেই বেরিয়েছিলাম, ইতিমধ্যে আবার যুদ্ধের হাঙ্গামা বেধে গেছে শুনে পিছিয়ে এলাম।

দেবকুমার বললো—যুদ্ধ হবে তো রাজায় রাজায়, তাতে তোমার ভয় কি?

—ভয় আছে। যুদ্ধ যখন হয় তখন তো সে অঞ্চল অরাজক। পথে যদি কোন দুঃস্থ ভ্রমশ্রমী বিন্দনকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় আমি তার কোন প্রতিকার করতে পারবো না। জেনেও বিন্দনের বিপদের ঝুঁকি নিই কেন?

—তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে?

—শক্তি ও সুযোগ থাকলে কেন নেবে না? শ্রীরাম-চন্দ্রের সীতাকে হরণ করে নিয়ে গেছে, দেবকুমারের বিন্দনকে কেড়ে নেওয়া কি তার চেয়েও কঠিন?

—রাবণ তো হিন্দু ছিলেন না, এ দেশের মানুষও ছিলেন না। হিন্দু পরস্পরকে মাতৃজ্ঞান করে।

—ওসব শাস্ত্রবাক্য ছেড়ে দাও। শাস্ত্র মেনে চললে আজ এ দেশ স্বর্গ হয়ে যেতো। এই তো মেদিনের কথা, মহারাজ বিক্রমাদিত্যের বৌদি ধ্রুবা দেবীকে শকরাজা বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। তখন ধ্রুবা দেবীর স্বামী রামগুপ্ত মগধের সিংহাসনে। চন্দ্রগুপ্তের মত তাই ছিল, শকরাজাকে উচিতমত শিক্ষা দিল। সবাইকার তো অমন বিক্রমাদিত্য তাই থাকে না, আমার কে আছে বল? আমি আর ইচ্ছা করে বিপদের মাঝে পড়ি কেন? তবে যুদ্ধ তো আর চিরকাল চলবে না। একটা নিষ্পত্তি হয়ে গেলেই আমি চলে যাবো।

কল্যাণ আর কিছু বলে না। স্বরবাহারটি কাপড়ের ওঘাড়ের মধ্যে ভরে বাঁধতে শুরু করে। বাঁধা শেষ করে বললো—তোমার বাড়ী তো যোগিনীঘাটে, তুমিও তখন আমাদের সঙ্গে যোগিনীঘাটে যাবে। ততদিনে খাজুরাপুরের মন্দির তোমার রীতিমত দেখা হষে যাবে।

—এখান থেকেই ফিরে যাবো? আমার যে ইচ্ছা আছে বারাণসীতে যাবার। সেখানকার সারনাথের বৌদ্ধক্ষেত্র নাকি বিচিত্র ভাস্কর্যে ভরা বলে শুনেছি।

—ও, ধার্মিক গুপু আর মূলগন্ধকুটি বিহার? হ্যাঁ, সেখানকার পাথরের কাজও দেখবার মত, আমি দেখেছি, তবে খাজুরাপুরীর মন্দিরে যত বিচিত্র ভাস্কর্য আছে, এমন আর কোথাও নেই। এটা দেখলে সব দেখা হয়ে যাব।

—তবু আমি একবার বারাণসী যাবো।

—যেও, আগে খাজুরাপুরী তো দেখ।

সুরবাহার নিয়ে কল্যাণ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দেবগ্রামের পিছনেই নিনোরা তলাও। নামে ‘তলাও’ হলেও এটি পুষ্করিণী নয়, একটি হ্রদ। মাইল-খানেক বিস্তার নিয়ে মগু হ্রদ। চারিপাশে ঘিরে আছে খেজুর গাছের সারি। এখানকার মানুষ খেজুর গাছ ভালবাসে। সব রকম শুভকর্মে খেজুর পাতা ব্যবহার করে, খেজুর রস পান করে, খেজুরে গুড় ছাড়া দেবতার ভোগ হয় না। এইজন্যই এই অঞ্চল খাজুরাপুরী নামে খ্যাত।

প্রত্যুষেই কল্যাণ দেবকুমারকে নিয়ে এসেছিল নিনোরা হ্রদে। বলেছিল—এখানে স্নান করে আমার মন্দিরে যাবো।

নিনোরাও এসে দেবকুমার মুগ্ধ হলো, বললো—এ যেন আরেক যোগিনীঘাট, সে জলে স্রোত আছে, এখানে স্রোত নেই।

—আর এই খজুরবীধি?—কল্যাণ বললো—চারিপাশের এই খজুরবীধিই নিনোরাকে অপক্লপ করে তুলেছে, এ যেন কোন তরুণীর চোখে সবুজ গাছের কাজল টেনে দেওয়া হয়েছে।

হ্রদের ওপারে সারি সারি মন্দিরের চূড়া দেখা যায়। কল্যাণ বললো—ওই মন্দির, এক একটি দেখতে তোমার যদি একদিন করে লাগে তাহলেও এক মাসে ফুরাবে না।

—কতগুলো আছে?

—চল্লিশটা। আরো তৈরী হচ্ছে। এক একজন

রাজা এক একটি মন্দির তৈরী করে যান, এতো মন্দির উত্তরাপথে আর কোথাও নেই।

—বৌদ্ধ ও জৈন মন্দিরও আছে বলে শুনেছি।

—চল না, সব দেখাবো।

স্নান শেষ করে হ্রদের কিনারা দিয়ে হু’জনে অগ্রসর হলো।

হ্রদের ওপারে যখন তারা পৌঁছালো তখন সূর্য উঠেছে, শীতের সকালের মিষ্টি মুহূরোদ ছড়িয়ে পড়েছে, পথে লোক চলাচল শুরু হয়েছে।

হ্রদের কিনারা সারি সারি সুউচ্চ মন্দির। প্রতিটি মন্দিরের পিছন দিকে এক একটি বাধানো ঘাট। সামনে রাজপথ, বিপরীত দিকে সারি সারি বাসগৃহ, প্রতিটি গৃহেই এক একখানি বিপনি। অতো সকালেই দোকান-গুলির দরজা খুলেছে। মন্দির তোরণে ফুলওয়ালীরাও এসে বসেছে। পথে পূজার্থীর ভীড়ই বেশি।

কল্যাণ বললো—প্রতিষ্ঠান ও বারাণসী ছাড়া এতো বড় বাজার আর কোথাও নেই। আর ওদিকে আছে উজ্জয়িনীতে। আমি তো সব ঘুরেছি।

একে একে মন্দিরগুলির পরিচয় দিতে দিতে রাজপথ ধরে কল্যাণ এগিয়ে চললো। দেবকুমার বললো—বাইরে কি দেখবো, তিতরে চলো।

কল্যাণ বললো—এ বেলা আর মন্দির দেখবো না, নটরাজের পূজা করে চলে যাবো। তোমাকে সব চিনিয়ে দিবে গেলাম, তুমি আহালাদির পরে এসে সন্ধ্যা অবধি বসে বসে শিল্পচর্চা করো।

তিনটি তোরণ পার হয়ে কল্যাণ চতুর্থ তোরণে এসে দাঁড়ালো। সামনে এক ফুলওয়ালী বসেছিল, কল্যাণকে দেখেই বললো—ক’দিন দেখিনি যে?

—এখানে ছিলাম না। মণ্ডলেশ্বরে গিয়েছিলাম।

—এখানে থাকলে রাজদর্শন হতো। মহারাজ প্রতাকর বর্ধন স্বাধীশ্বরে দেহরক্ষা করেছেন, রাজকুমার রাজ্যবর্ধন ছিলেন আমার বাড়ীতে, এই পথ দিয়েই তিনি গেলেন।

—এতটা ঘুরপথে গেলেন কেন?

—জগদম্বা মন্দিরে গুরুদেব থাকেন, তাঁর আশীর্বাদ

নিয়ে গেলেন। বয়স বছর কুড়ির বেশি হবে না, নেহাৎ ছেলেমানুষ, কি করে রাজ্য চালাবে কে জানে।

—রাজা কি আর রাজ্য চালায় নাকি? মন্ত্রীরাই তো সব করে।

—যাক, রাজ্যাভিষেক উৎসব একটা হবে, এখান থেকে নিশ্চয়ই দল যাবে, তুমি দেখনা, স্বাস্থীশ্বর অবধি ঘুরে আসা যায় কি না। তাহলে তোমার সঙ্গে মথুরা বৃন্দাবনটা দেখে আসি।

—তুমি তো বৈষ্ণব, তাই মথুরা বৃন্দাবনের দিকেই তোমার আকর্ষণ বেশী। তা তুমি যখন বলছ, একবার চেষ্টা করে দেখবো'খন।

—তোমার চেষ্টা করলেই হবে। তোমার গৃহিণীর যে কষ্ট আছে, তোমার আর বেশী চেষ্টা করতে হবে না।

ফুলওয়ালী মিষ্টি হাসি ছুঁড়ে দেয়। হু'ঠোঙা ফুল নিয়ে হু'জনে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করে।

মন্দির মধ্যে বিরাট এক নটরাজ মূর্তি। পাথরের তৈরী হলেও যেন জীবন্ত। দুটি চোখে স্নিগ্ধ উল্লাস দৃষ্টি। মুখ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের লালিত্যে পাষাণের কাঠিন্দ্র কোথাও নেই। দেবকুমার বিগ্রহ থেকে চোখ ফেরাতে পারে না, বলে—অপূর্ব। মূর্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছে।

কল্যাণ হেসে বললো—এই তো একটা দেখলে, আরো সব দেখ, যত দেখবে ততো অবাক হবে। শেষ অবধি এই অঞ্চলেই থেকে যাবে হয়তো।

পূজা শেষ করে বাইরে এসেই তোরণের পাশের দেয়ালে দেবকুমারের চোখ পড়লো, চোখ পড়লো অলিন্দের খামগুলির উপর। নাগ-নাগিনী, অম্পরা, সুরসুন্দরী, সারি সারি শুধু মূর্তি। দেবকুমার থমকে দাঁড়ালো।

কল্যাণ বললো—খামলে কেন? এসব এখনি দেখে শেষ হবে না। এসো, মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর এসে সারাদিন বসে বসে দেখবে।

একরকম জোর করেই কল্যাণ দেবকুমারের হাত ধরে মন্দির থেকে বেরিয়ে এলো। তোরণে ফুলওয়ালী অরণ করিয়ে দিল, কঙ্কুরী সঙ্গে একবার দেখা করো।

—নিশ্চয়—কল্যাণ সাড়া দিল।

সেইদিন হুপুর থেকেই দেবকুমার মন্দির দেখতে স্নেহে উঠলো। মধ্যাহ্ন-ভোজন সমাধা করেই সে বেরিয়ে পড়লো। কল্যাণ বললো—একটু বিশ্রাম করে বেরুলে ভাল হতো না?

—হুপুরে ঘুমুনো আমার অভ্যাস নেই—বলে দেবকুমার নিনোরা হ্রদের পথ ধরলো। তখন মন্দিরের দেয়ালের বিচিত্র ভাস্কর্য তার চিত্তকে আকর্ষণ করছিল। সেখানে না পৌঁছানো অবধি সে স্তম্ভির হতে পারছিল না।

শীতের হুপুরের মিঠে রোদে গা মেলে দিয়ে সে ধীরপদে খজুরপুরীর রাজপথের মুখে এসে দাঁড়ালো। পর পর সারি সারি পাথরের মন্দির। যোগিনী ঘাটেও পাহাড়ের মাথায় একসঙ্গে চৌবাট যোগিনী মন্দির সে দেখেছে, কিন্তু সে সব মন্দির তো এতো বিশাল নয়। সে তো হরপার্বতী মন্দিরের একটা চত্বরের মধ্যেই সব। কিন্তু এ যে একটা মন্দির-নগরী। রাজপথের এই মুখ থেকে ওই মুখ পর্যন্ত শুধুই মন্দির। এতো মন্দির কি সে দেখে শেষ করতে পারবে? কতদিন লাগবে, হয়তো বছর ঘুরে যাবে কে জানে।

দেবকুমার প্রথম মন্দিরের চত্বরে গিয়ে উঠলো। পর পর পাঁচটি পর্যায়ে মন্দিরটি ভাগ করা। অর্ধমণ্ডপ, মণ্ডপ, মহামণ্ডপ, অন্তরাল ও গর্ভগৃহ। প্রতিটি পর্যায়ে একটি করে চূড়া। চূড়া থেকে নীচের ভিত্তি অবধি কারুকার্য। দেয়ালে এক পর্ব স্থান কোথাও শূন্য নেই। শুধু মূর্তি আর নকশা। দেবকুমার দেখতে শুরু করলো। পর পর চলে গেছে দশ অবতারের মূর্তি, তারপর অষ্ট দিকপাল, তার উপর ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, দশভুজা, চামুণ্ডা, ইন্দ্ৰাণী, সূর্য, কোণে কোণে নাগ-নাগিনী, অম্পরা, সুরসুন্দরী। নীচ দিয়ে চলেছে হাতী, উট, বৃষ, অশ্ব, বলাকা, উপরে পুষ্পস্তবক ও নক্সার কাজ। শিল্পী পাথর কেটেছে বলে মনে হয় না, এ যেন কুস্তকার মাটি দিয়ে গড়ছে সবকিছু।

(ক্রমশঃ)

অষ্টাদশ শতকের কয়েকখানি সাময়িক পত্রিকা প্রসঙ্গে

শ্রীশীতল বন্দ্যোপাধ্যায়

অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিক হইতেই বাংলা সাহিত্য এবং অন্তান্ত সংস্কৃতি বিষয়ক পত্র-পত্রিকাগুলি বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। এইসব সমৃদ্ধির মূলে যে সব মনিষীদের অবদান অবিস্মরণীয় হইয়া আছে, তন্মধ্যে প্রাচীন-স্মরণীয় রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি অন্ততম।

রাজা রামমোহন ১৮২০ খৃষ্টাব্দে “সংবাদ কোমুদী” প্রকাশ করেন। সংবাদ কোমুদী রামমোহনের মুখপত্র হইলেও তৎকালে ইহার সম্পাদনা করিতেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারারচরণ দত্ত মহাশয়। ঐ পত্রিকাখানি কিছুদিন নিয়মিত বাহির হইবার পর নানা কারণে বন্ধ হইয়া যাইবার পর বৎসর অর্থাৎ ১৮২১ খৃষ্টাব্দে রামমোহন পণ্ডিত শিবপ্রসাদ শর্ম্মার সহযোগিতায় “ব্রাহ্মানিক্যাল ম্যাগাজিন” নামে একখানি ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ইংরাজী মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।

এই সময় রামমোহনের অন্ততম স্ত্রী সিন্ধু বাকিংহাম পরিচালিত “ক্যালকাটা গেজেটের” বিরুদ্ধে “জনবুল” (১৮২১ খৃঃ) নামে আর একখানি ইংরাজী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাখানির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, ক্যালকাটা গেজেটের বিরুদ্ধাচরণ করা। যদিও ঐ পত্রিকাখানি দীর্ঘকাল স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে নাই।

রামমোহনের সময়ে (১৭৭২—১৮৩০) সর্ক ভারতীয় ভাষা ছিল পার্সিয়ান ভাষা। এই ভাষার তৎকালীন প্রভাব ও প্রসার সম্বন্ধে পাঠকবর্গকে নতুন করিয়া কিছু বলিবার আবশ্যক করে না। এই পার্সি ভাষাতেও রাজা রামমোহন একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা “গিরার উলবার” প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু আলোচ্য পত্রিকাখানি এক বৎসর নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইবার পর বন্ধ হইয়া যায়। “গিরার-উলবার” বন্ধ হইবার সঠিক কারণ জানা যায় নাই। তবে অনুমান হয়, গভর্নমেন্ট যে প্রেস অ্যাক্ট জারী করিবার মনস্থ করেন, সেই সংক্রান্ত কোন কারণে ঐ পত্রিকাখানি বন্ধ হইয়া যাইতে বাধ্য হয়।

“সংবাদ কোমুদী” বন্ধ হইয়া যাইবার পর এবং রাজা

রামমোহন রায়ের লোকান্তরের পরে অর্থাৎ ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় “সমাচার চন্দ্রিকা” নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্যে ১১ই এপ্রিল তারিখে গবর্নমেন্টের নিকট অমুমতি (লাইসেন্স) চাহিয়া পাঠান। কিন্তু গবর্নমেন্ট অমুমতি না দেওয়ায় ঐ পত্রিকাখানির প্রকাশ আর সম্ভব হয় নাই।

এই প্রসঙ্গে আর একখানি পত্রিকার নাম শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখযোগ্য। কারণ তৎকালে এই পত্রিকাখানিও যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। হুগলী জেলার চুঁচুড়া নিবাসী সুবিখ্যাত পণ্ডিত ও বহুভাষাবিদ নীলরত্ন হালদার মহাশয় এই আলোচ্য পত্রিকাখানি কলিকাতা হইতে প্রকাশনা ও সম্পাদনা করিতেন। “বঙ্গদূত” নামে এই সাপ্তাহিকখানি তৎকালীন সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সংবাদ পরিবেশনে যেমন স্নানাম অর্জন করিয়াছিল, তেমনি সম্পাদকীয় গুণে হালদার মহাশয়ের ক্ষুরধার লেখনীর গুণে এবং নিরপেক্ষ আলাপ আলোচনার গুণে তৎকালীন পাঠকসমাজে সবিশেষ মর্যাদা লাভ করিয়াছিল।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে টাংকী নিবাসী প্রসন্নকুমার ঘোষ ও অক্ষয়কুমার দত্ত একযোগে “বিদ্যাদর্শন” নামে এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা মাধ্যমে অক্ষয়কুমার বাংলায় মন্ত্রপাঠ সম্বন্ধে বহু তথ্যবহুল প্রবন্ধাদি প্রকাশ এবং ঐ বিষয়ে আলোচনা ও পরে সংস্কৃত হইতে বাংলায় মন্ত্রপাঠ প্রবর্তন করেন। বিদ্যা দর্শনের ছয়খানি সংখ্যা মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল এবং ঐ ছয়খানি সংখ্যা বহু সমৃদ্ধ রচনায় পূর্ণ ছিল। যে কারণে আজও বিদ্যাদর্শন বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ হইয়া আছে।

“বিদ্যাদর্শন” বন্ধ হইয়া যাইবার কিছুকাল পরে, অর্থাৎ ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ গবর্নমেন্ট ভারতীয় পত্রিকা-গুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার উদ্দেশ্যে ভার্ণাকুলার প্রেস অ্যাক্ট আইনে পরিণত করেন। এই আইনটিকে পাশ করাইবার জন্য ইংরাজ গবর্নমেন্ট অনেকদিন হইতেই চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন এবং এই নিয়ন্ত্রণের নামে

আচার্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ

স্বামী সদানন্দ

যুগের শাস্ত্র ক্ষুধা মিটাবার জন্য যুগে যুগে যুগাবতার মহামানবগণ ধরাধামে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন যুগধর্ম প্রবর্তনের জন্য। গ্লানি, মালিন্য থেকে ধর্মের প্রকৃত রূপ দান করাই তাদের প্রধান কাজ। রাম, কৃষ্ণ, শঙ্কর, কবীর, নানক, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি মহামানবগণ যুগধর্ম প্রচার করে জনগণকে সমূহ বিপদ থেকে রক্ষা করে গেছেন। এগনই একজন যুগমানব স্বামী প্রণবানন্দজী। বর্তমান বিংশ শতকে যখন ভারতের জাতীয় জীবন উচ্ছ্বাস, উন্মার্গগামী হয়ে পড়ে তখনই অটুট ব্রহ্মচর্য-পরায়ণ বীর সাধক আচার্য স্বামী প্রণবানন্দজীর আবির্ভাব ঘটে। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের পূণ্য মাঘী-পূর্ণিমা তিথিতে গোধূলি লগ্নে ফরিদপুর জেলার বাজিতপুর নামক গ্রামে শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী জন্মগ্রহণ করেন; তাঁর জন্মের পূর্বে ও পরে নানা প্রকার অলৌকিক ঘটনাবলী সংঘটিত হয়েছিল। প্রথম জীবনে তিনি ব্রহ্মচারী বিনোদ নামে প্রখ্যাত ছিলেন। গোরক্ষপুরে বাবা গম্ভীরানন্দজীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন, পরে প্রয়াগে কৃষ্ণমেলায় গোবিন্দানন্দজীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করে স্বামী প্রণবানন্দ নামে খ্যাত হন। স্বামী প্রণবানন্দের অধ্যাপন-সাধনা ছিল অত্যন্ত উচ্চ স্তরের। সাধারণের দৃষ্টিতে তাহা ধরা



গবর্ণমেণ্ট চাহিয়াছিলেন, ঐ সকল পত্রিকাগুলিকে সমূলে উচ্ছেদ করিতে।

এই আইনের কবলে প্রথম আত্মত্যাগ পড়ে, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় পরিচালিত “সোমপ্রকাশ” নামক পত্রিকাখানি। “সোমপ্রকাশ” বন্ধ হইয়া যায় ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে। তারপর পালা আসে বালগঙ্গাধর তিলক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত “কেশরী” নামক পত্রিকাখানির ভাগ্যে। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ঐ পত্রিকাখানির বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়। ভারতীয় পত্রিকাঙ্গণতে ধীরে ধীরে ঘনাইয়া আসে মহা দুর্দিন। বহু পত্র-পত্রিকা আইনের চাপে বন্ধ হইয়া যাইতে বাধ্য হয়। কেউ কেউবা আপনা থেকেই বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হন।

কতকগুলি পত্রিকা আবার রাতারাতি নামধাম বদলিয়ে নব কলমের ধারণ করিতে বাধ্য হয়। এই শেষের পথটি অনেকেই অবলম্বন করিতে বাধ্য হন, তন্মধ্যে মাদ্রাজের “হিন্দু” পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা জি, স্ক্রাফোর্ডিনাম হিন্দু তুলিয়া দিয়া সে স্থলে “স্বদেশ মিত্র” নামে আর একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। লাল লাক্ষপত্ৰ রায়ও এই পথ অনুসরণে বাধ্য হন। তৎকালীন মিশনারীগণের মুখপত্র “ফ্রেণ্ড ইণ্ডিয়া”তে দেশীয় ঐ পত্রিকাগুলির উদ্দেশ্যে এই বিষয়ে এক বিবরণী প্রকাশিত হয় এবং ঐ বিবরণে পত্রিকাগুলির সপক্ষে প্রশংসাও করা হইয়াছিল।

—“ফ্রেণ্ড ইণ্ডিয়া,” ২য় বর্ষ, ৩৮ পৃঃ, ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ।

পড়ত না। তিনি ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে বাজিতপুর প্রণব মঠে ৮মাসী পূর্ণিমা তিথিতে সিদ্ধান্ত করেন। সিদ্ধাসন ত্যাগ করে তিনি কলকাত্তে প্রচার করেন—“এ যুগ মহা জাগরণের যুগ, মহামিলনের যুগ, মহাসম্মেলনের যুগ, মহা-মুক্তির যুগ।”

সিদ্ধ-সমাহিত মহামানব হয়েও তিনি সাধারণের জায় বসবাস করতেন। তিনি ছিলেন নিরলস কর্মযোগী ও জনসেবাত্রী, তাঁর জীবনের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা হল শক্তিসাধনা। সমগ্র দেশের ও জাতির কল্যাণসাধনই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান ব্রত। এক স্থানে তিনি বলেছেন—“মাহুষ কাঠের মালায় জপ করে, আমি চির-জীবন জাতিগঠনের মালায় জপ করে এসেছি।” তিনি জাতিকে শক্তিমত্তে উদ্ভূত করার জন্ত আশ্রয় চেষ্টা করে গেছেন। তিনি বুঝেছিলেন দেশের অপমানিত অস্পৃশ্য মাহুষের মর্যাদা দিতে না পারলে কোনদিন দেশের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হতে পারে না। তাঁর সিদ্ধান্ত মানবসেবাই প্রকৃত দীক্ষা-সেবা। রাজনীতিতে তাঁর উৎসাহ থাকলেও বিপ্লব আন্দোলনকে তিনি স্বীকৃতি দিতে পারেননি। তিনি বলতেন, দেশে প্রকৃত মাহুষ তৈরী না হলে দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হতে পারে না। আমি দেশে প্রকৃত মাহুষ তৈরী করবো। মাহুষ তৈরী করাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য। দেশকর্মী ও আত্ম-ত্যাগীদের উপর তাঁর শ্রদ্ধা অস্ব ছিল না। তাঁর প্রথম জীবনে সারা পূর্ববঙ্গে বিপ্লবের ঝড় উঠেছিল। ব্রহ্ম-চারীজী সেই অগ্নিচক্রের বাইরে থাকতেন। পুলিশ তাঁকে এক সময় ভুল করে বিপ্লব-নেতা জ্ঞানে জেলে অন্তরীণ করেছিলেন, পরে নির্দোষ প্রমাণ হওয়ায় তাঁকে ছেড়ে দেয়। মত ও পথের অনৈক্য হলেও, যেখানে শক্তির বিকাশ-প্রকাশ দেখেছেন সেখানেই প্রণবানন্দজী আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করতে কুণ্ঠা বোধ করেন নি।

জনসেবা ব্রতের দিক থেকে তিনি এক অসামান্য ইতিহাস রচনা করে গেছেন। খুলনা ছাড়াও তিনি তাঁর অম্লরাণী কর্মীদের নিয়ে প্রাণান্ত পরিশ্রম ও নিঃস্বের জীবন বিপন্ন করে বহু দুঃস্থজনের প্রাণ রক্ষা করেছিলেন। দেশে যখনই যে কোন আকস্মিক বিপদ ঘটেছে তখনই তিনি

তাঁর সেবার হস্ত প্রসার করতে পশ্চাৎপদ হননি। উত্তর বঙ্গে যে ভয়াবহ বন্যায় সারা দেশে আতঙ্কের ও অশ্রুভাবের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছিল, তখন তিনি সেখানে ছুটে গিয়েছিলেন আর্ন্ত মানবের সেবার জন্ত। সেদিনের সেবাকার্যে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও সশিষ্য আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজী যে কর্মতৎপরতা দেখিয়েছিলেন, তা কেহ কোনদিন বিস্মৃত হতে পারবে না।

নানা প্রকার দুঃখকষ্ট বিপদ আপদকে বরণ করে আচার্য্যজী গড়ে তুলেছিলেন তাঁর পরম আদরের ভারত সেবাশ্রম সম্মত। জনসেবা ও মানব কল্যাণের আদর্শে গঠিত তাঁর এই প্রতিষ্ঠান ধীরে ধীরে সারা ভারতে ও বহির্ভারতে বিস্তার লাভ করেছে। জাতীয় জীবনকে সুগঠিত করে তুলতে হলে যত প্রকার চেষ্টাষত্বের প্রয়োজন তিনি তার কোনটি পরিত্যাগ করেননি। পূর্ববঙ্গের বিশাল নমঃশূদ্র সম্প্রদায়, ধীবর, কুমার, ভূঁইয়ালী, ঋষি, রজক, বাগ্দি যারা সামাজিক শাসনে অস্পৃশ্য, অপমানিত ও অনাদৃত, তাদের উন্নতির জন্ত তাঁর কর্মশক্তি পলে পলে তিলে তিলে নিয়োগ করে গেছেন। তিনি জানতেন মুষ্টিমেয় উচ্চ বর্ণের হিন্দুর অত্যাচারের ফলে বহু অস্পৃশ্য নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ধর্মাস্তরিত হয়ে সমাজের সর্বনাশ ডেকে আনছে। এই ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে সমাজকে উদ্ধার করে মাহুষের অধিকার দিতে না পারলে আমাদের দেশে কোন রাজনীতিই ফলপ্রসূ হতে পারে না। তাই তিনি সহর থেকে সহরান্তরে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বাংলা তথা ভারতের বহু স্থানে পরিভ্রমণ করে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু-দিগকে উন্নত করার মানসে নানা প্রকার সংগঠনমূলক কার্যের মাধ্যমে বিশেষভাবে চেষ্টা করে গেছেন। তিনি ভালভাবে জানতেন—নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে হিন্দু-সমাজের ক্ষত্রশক্তি নিহিত আছে, তাদের সংগঠিত ও সুসজ্জবদ্ধ করে তুলতে না পারলে দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধন হতে পারে না। এই বিষয়ে তিনি আরও বলেছেন—“হিন্দু বিদ্যাষ বড়, বুদ্ধিতে বড়, সামর্থ্যেও যে কাহারও অপেক্ষা কম নয়, কিন্তু নাই কেবল সংহতি শক্তি, এই সংহতি শক্তির অভাবেই হিন্দু আজ সর্বজ

লাজিত ও নির্যাতিত। সর্বপ্রকার ভেদ বৈষম্য, অতৈক্য, পার্থক্য, ঈর্ষা, ঘেঁষ বিদূরিত করিয়া এই শত ছিন্ন হিন্দু-সমাজকে যদি আবার ঐক্য, সখ্য, প্রেম-প্ৰীতি ও মিলনের সূত্রে গ্রথিত করিয়া সম্মিলিত ও সম্মবদ্ধ করা যায়, তাহা হইলেই হিন্দু আবার তার লুপ্ত শক্তির পুনরুদ্ধার করিয়া অজেয় হইয়া দাঁড়াইবে।” এই সংহতি শক্তির অভাবে অতীত কালেও আচার্য্য হিন্দু বহুবার অন্তর্বিপ্লব ও বহির্বিপ্লবের সম্মুখীন হয়ে বার বার পরাধীনতায় শৃংখলে শৃংখলিত হয়েছে। এই মূল সমস্যার সমাধানে অগ্রসর না হয়ে অশ্রু যত প্রকার সেবা ও সংস্কারের প্রচেষ্টা করা হোক না কেন, তার দ্বারা হিন্দুজাতির স্থায়ী কল্যাণ সাধিত হতে পারে না।

দীর্ঘকাল যাবৎ এই মূল সমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টা না করার জন্তই খণ্ড খণ্ড সমস্তা সমূহের সমাধানের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, তাই আচার্য্যদেবের কর্তে ঝড়ত হয়ে উঠেছিল, “আমি স্নদীর্ঘকাল পরে তাই আবার হিন্দুকে হিন্দু বলিয়া ডাক দিতে এসেছি। হিন্দুতে হিন্দুতে মিলন যত দ্রুত গড়ে উঠবে হিন্দুর সহিত অহিন্দুর মিলনও তত দ্রুততর সহজ হয়ে উঠবে।” তাই তিনি বাংলা তথা ভারতের বহু স্থানে মিলন মন্দির ও রক্ষিদল গঠন করে হিন্দুজাতির আত্মসম্বন্ধ ফিরিয়ে আনার জন্ত যথেষ্ট চেষ্টা করে গেছেন। তাঁর নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত পথে হিন্দুজাতি অগ্রসর হলে অনতিবিলম্বেই তাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান ঘটবে। আচার্য্যদেব বাল্যকাল থেকে অনাড়ম্বর জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। আলু ভাত অথবা তাতে-ভাতই তাঁর নিত্যকার খাদ্য ছিল। আর পরণে একখানি বহির্বাস ও একখানি উত্তরীষই তাঁর শীত গ্রীষ্মের সঙ্গী ছিল। কিন্তু তথাপি দেহ-মনে তাঁর অপরিণীত শক্তি ও সামর্থ্য ছিল। তিনি তাহা দেশের ও দেশের সেবায় তিলে তিলে দান করে গেছেন। এখন আচার্য্যদেবের তীর্থ সংস্কারের বিষয় কিছু আলোচনা করবো। মানুষ তীর্থে যায় ধর্ম অর্জনের জন্ত, তীর্থঙ্কর পাণ্ডারা তাদের ধর্মকার্যে সহায়তা করা দূরে থাক, যাত্রীদের শোষণ ও গুণ্ডামি করাই তাদের প্রধান কার্য্যে পরিণত হয়েছিল। তখনকার দিনে পাণ্ডাদের অত্যাচার যে কতদূর চরম

অবস্থা লাভ করেছিল তা সর্বজনবিদিত। আচার্য্যদেব যাত্রীদের তীর্থকার্য্যে সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা ধনপ্রাণ ও ইচ্ছা রক্ষার জন্ত ভারতের প্রধান প্রধান তীর্থক্ষেত্রে যাত্রীদের নিরাপদে তীর্থকার্য্য সম্পাদনের জন্ত বড় বড় যাত্রীনিবাস নির্মাণ করে গেছেন। তথায় তীর্থযাত্রীরা নিরাপদে তীর্থকার্য্য সম্পাদন করতে পারেন। ইহা ছাড়া তিনি ছাত্র ও যুবকদের চরিত্র গঠনকল্পে ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়, আদর্শ বিদ্যার্থী ভবন, যুবক সজ্জ প্রভৃতি গঠন করে গেছেন। তিনি জানতেন যুবকরাই দেশের ভবিষ্যৎ বংশধর, বাল্যকাল থেকে তাদের চরিত্র গঠনের ব্যবস্থা না করলে দেশের স্থায়ী কল্যাণ সাধিত হতে পারে না।

শুধু বাহ্য কল্যাণ সম্পাদন করলেই জাতির প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয় না; প্রয়োজন হয় তার অন্তর কল্যাণের। এখানে আচার্য্যদেবের অন্তর্জগতের সেবার বিষয় কিছু বলব। দৃষ্টি ছুই প্রকার—অন্তর্দৃষ্টি ও বহির্দৃষ্টি। এই পর্য্যন্ত যে সমস্ত কাহিনী লিপিবদ্ধ করলাম, ইহা সমস্তই আচার্য্যদেবের বহির্দৃষ্টির কার্য্যকলাপ। ইহা ছাড়া তাঁর অন্তর্জগতের কার্য্যকলাপ আরও উচ্চ স্তরের। শাস্ত্রকার বলেন—অন্ন দান, বিদ্যা দান, প্রাণ দান অপেক্ষা ধর্ম দান শ্রেষ্ঠ দান; তিনি ছিলেন একজন অন্তর্দ্রষ্টা মহামানব; শ্রদ্ধালু মানব তাঁর সংস্পর্শে গিয়ে তাঁর আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্যে আত্মত হয়ে জীবন-জন্ম ধস্ত করেছেন। অন্তর্জগতে তাঁর অজানা কিছুই ছিল না। কোন ভক্ত তাঁর কাছে কিছু প্রার্থনা জানালে তিনি বলতেন প্রার্থনা করতে হয় মনে মনে। বস্তুতঃ তিনি মানুষের অন্তরের সমস্ত কথা জ্ঞাত ছিলেন। একদিন তিনজন এক সঙ্গে তাঁর সাথে দেখা করতে আসলে তিনজনের মনের প্রশ্নই পরস্পরের নিকট ব্যক্ত করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর আশ্রিত ভক্তকে অভয় প্রদান করে বলতেন—“আজ থেকে আমি তোমার জীবনের সমস্ত ভার গ্রহণ করলাম; তুমি নিরাপদে নির্ভয়ে সংসারে বিচরণ কর।” জীবনের সমস্ত ভার গ্রহণ করলেন তিনি—কত বড় কথা। আমরা আমাদের নিজের জীবনের ভার গ্রহণ করতেই অক্ষম। আর তিনি সকলের জীবনের ভাব হাসিমুখে গ্রহণ করতেন, কত বড় শক্তিধর মহামানব হলে জোর করে

এতবড় কথা বলতে পারেন তাহা সহজেই অসম্ভব। এতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, তিনি অন্তর্জগতে কত উচ্চস্তরে অবস্থান করতেন।

বাল্যকালের পর হতে বহু বৎসর পর্যন্ত মাহুয ইন্ডিয়-বৃত্তির তাড়নায উদ্ভাস্ত হষে উন্নাদের গ্রাষ দিগ্দিগন্তে ছুটে থাকে, আচার্য্যদেবের দর্শন ও স্পর্শে বহু ব্যক্তির ইন্ডিয়বৃত্তি অনেকদিন পর্যন্ত শাস্তভাব অবলম্বন করেছে—এই কথা আমরা বহু লোকের মুখে শুনেছি এবং নিজের জীবনেও বার বার উপলব্ধি করেছি।

এক সময় কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্তার মন্মথনাথ মুখার্জী তিনজন আসামীর ফাঁসির হুকুম দিয়ে অসহ যন্ত্রণায় উৎপীড়িত হষে আচার্য্যদেবের নিকট আসেন। তিনি অনেক সময় পর্যন্ত আচার্য্যদেবের সঙ্গলাভ করেন। ফলে তাঁর অন্তরের সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা নিবৃত্ত হয়। বিচারপতি মুখার্জী নিজেও অনেকবার বলেছেন, ‘আমি বহুবার সংসারের নানা প্রকার অবস্থা-চক্রে পড়ে জ্বালামালায় অস্থির হষেছি কিন্তু যেমনি আচার্য্যদেবের নিকট ছুটে এসে তাঁর শ্রীচরণতলে লুটিয়ে পড়েছি, তখনই আমার জীবনের সমস্ত জ্বালা নির্বাপিত হয়ে গেছে।’

আচার্য্যদেব বলতেন—সতীর সতীত্ব ও সাধুর যোগৈশ্বর্য্য উভয়ই গোপনীয় জিনিষ, উহা কাহাকেও দেখাইতে নাই, কিন্তু দেখা যায় করুণাবতার, যুগাবতারগণ অনেক সময় লোকের হৃৎক্ষে হৃৎখিত হষে ককণা না করে থাকতে পারেন না। আচার্য্যদেবকে আমার স্বচক্ষে দেখা। একটা ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি—তখন সজ্জের কার্য্যালয় ছিল মির্জাপুর ষ্ট্রীটে। আচার্য্যদেব অনেক সময় তথায় অবস্থান করতেন। একদিন বেলা ৮টার সময় একটি লোক দেখা করবার মানসে তথায় উপস্থিত হয়। তাকে একটু রুগ্ন অবস্থা দেখে সজ্জ-সেবকগণ আচার্য্যদেবের সঙ্গে দেখা করতে আপত্তি জানায়। লোকটি চুপচাপ করে ছাদের উপর বসে রইল। সে সংকল্প করে এসেছে—তার শারীরিক অস্থিরতা কথা আচার্য্যদেবকে না জানিয়ে কিছুতেই বাড়ী যাবে না। আচার্য্যদেবের দর্শনপ্রার্থী একে একে সকলে চলে

গেল কিন্তু সে লোকটি কিছুতেই স্থান ত্যাগ করল না; বেলা প্রায় ১১টা বাজে এমন সময় হঠাৎ উক্ত লোকটির উপর আচার্য্যদেবের দৃষ্টি পড়ে। তখন আচার্য্যদেব নিকটস্থ একজন সেবককে জিজ্ঞাসা করেন—ঐ লোকটি কি জন্ত এসেছে? তত্বস্তরে সেবক বলল যে, লোকটি আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়। তখন আচার্য্যদেব বললেন যে, তাকে ডেকে আন। সেবক তাকে ডেকে আচার্য্যদেবের ঘরে পাঠিয়ে দিল। তখন উভয়ের মধ্যে কি আলাপ আলোচনা হযেছিল তা আমরা কিছুই জানতে পারিনি; তবে পরে উক্ত লোকটির নিকট শুনেছি যে তার জটিল রোগ নিরাময়ের জন্ত আচার্য্যদেবের নিকট প্রার্থনা জানিয়েছিল। লোকটি চলে গেল। বেলা প্রায় ১২টা বাজে। আচার্য্যদেবের আহার্য্য বস্তু সমস্ত প্রস্তুত হযে গিয়েছে, এমন সময় আচার্য্যদেব বললেন—“আমার জ্বর জ্বর বোধ হচ্ছে, একটা কফল লইয়া আয়।” দেখতে দেখতে ভীষণ কষ্ট দিয়ে আচার্য্যদেবের জ্বর উঠেছিল। গায় ৩৪টি কফল দিয়ে সেবকেরা তাঁকে চেপে ধরল। বেলা প্রায় ৬টা বাজে তখন আচার্য্যদেব বললেন—তোরা সরে যা আমার জ্বর ছেড়ে গেছে, এই বলে তিনি কফল ফেলে দিয়ে বসে পড়লেন এবং ভাত বাডতে নির্দেশ দিলেন। দৈনিক আহার্য্যের স্তায় তিনি আহার গ্রহণ করলেন। আমরা এই রহস্যের মর্ম্ম কিছুই বুঝতে পারলাম না। তারপর ৮।১০ দিন কেটে গেল, একদিন সেই লোকটি আচার্য্যদেবকে প্রণাম করতে এসেছে। আমরা তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলাম “তুমি আজ আবার এসেছ কেন?” লোকটি বলল—“আমার উৎকট ব্যাধি ছিল, আচার্য্যদেবের কৃপায় আমি সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হয়েছি, বর্তমানে আমার কোন রোগ নেই।”

আমরা অনেক ধর্ম্মগ্রন্থে পড়েছি, মহাপুরুষরা ইচ্ছা করলে অস্ত্রের রোগ নিজ শরীরে ভোগ করে তার ত্বর্ভোগ অল্প সময়ের মধ্যে ভোগ শেষ করে দিতে পারেন। মনে হয় ইহা তার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। আচার্য্যদেবের জীবনে এরূপ বহু ঘটনাবলী আমরা লোকমুখে শুনেছি। বাহ্যবোধে আর সে সমস্ত উল্লেখ করলাম না।

ହରିହର ଦେବ,



কলিকাতায় ফুটবলের মর্তুম শেষ হয়েছে। গত কার্তিক সংখ্যা প্রবর্তকে শীল্ড খেলার কথা বলেছি। জীগ ও শীল্ড খেলার অভিজ্ঞতা ও আনুভূমিক শিক্ষা কি সে বিষয়ে এবার আলোচনা করছি।

বর্তমানে খেলায় উৎসাহের অন্ত নেই—অন্ততঃপূর্ব।
প্রত্যেকটি দলেরই সমর্থক আছে। স্তবরাং খেলার
প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যেমন উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, তেমনি জিৎ-
হারও আনন্দ-নিরানন্দের বান ডাকে মাঠে। বসে বসে
দেখেছি এই দৃশ্য আর স্মৃতির পটে ভেসে উঠেছে পুরানো
দিনের দৃশ্য। তখন দেখেছি যে কোনও স্বাধীনতাসৈনিক দলের
অঙ্গে প্রত্যেক তারতীয়েরাই আনন্দিত হয়ে উঠেছে।
তখন ছিল কালা-ধলার খেলার যুগ। ধলারা বৎসরের
পর বৎসর লীগ ও শীল্ড বিজয়ী হত। দুর্ধর্ষ জোয়ান
দল এবং এখানকার বিখ্যাত অসামরিক দলরাই ফাইন্ডাল
বা সেমি ফাইন্ডালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করত। যদি কখনও
বিড়ালের ভাগ্যে সিকা হুঁড়ার মত সুরোপগ পেয়ে কোনও

ভারতীয় দল সেমি ফাইনাল বা ফাইনালে উঠতো সে একটা বিশেষ ঘটনা বলে গণ্য হতো এবং জাত, কুল, মান সব ভুলে গিয়ে সব ভারতীয়েরা মিলে সেই কালা-দলকে সমর্থন করতে এবং উৎসাহ দিতে এগিয়ে আসতো। সে যুগ চলে গিয়েছে বহুদিন। তারপর কলকাতার মাঠের এই রং বদলাতে শুরু করলো মহেন্দ্ৰডান স্পোর্টিং-এর জয়যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে। প্রায় ১৯৩৪ ইং থেকে শুরু হলো এই ক্লাবের জয়যাত্রা। সমর্থকদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে গেল। এখন থেকে হিন্দু ও মুসলমান সমর্থকেরা দুই দলে ভাগ হয়ে হিন্দু ও মুসলমান দলের সাফল্যে আনন্দিত ও পরাজয়ে নিরানন্দিত হতে আরম্ভ করলো। খেলার ফলাফল নিয়ে হাতাহাতি মারামারি চলতে লাগলো মাঠের মধ্যে ও বাইরে। শান্তিপ্রিয় ক্রীড়ামোদীদের আশ্বে আশ্বে খেলার মাঠ থেকে বিদায় নিতে হলো। ভাল খেলার তারিফ করতে ভুলে গেল দর্শকেরা—সাম্প্রদায়িক মনোভাবের উত্তেজনা। মহেন্দ্ৰডান স্পোর্টিং-এর প্রাধান্য সাত আট বছর পরে আশ্বে আশ্বে কমে কমে দেশবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেল, কিন্তু দর্শক ও সমর্থকদের ভাল মন আর জোড়া লাগলো না। বিভিন্ন ক্লাবের সমর্থকেরা আলাদা দল করে নিজেদের ক্লাব নিয়ে এক একটা গণ্ডী তৈরী করে ফেললো। সাদা চামড়া চলে গিয়েছে, সাম্প্রদায়িকতা আর মাথা তুলতে পারছে না—স্বাধীনতার পর, কাজেই এইসব দলীয় মনোভাব ক্রমশঃ মাথা তুলতে আরম্ভ করলো। এইসব ফুটবল দলের মধ্যে আবার মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গলের সমর্থকই সর্বাধিক। কাজেই রেবারেই এই দুই দলের সমর্থকদের মধ্যেই বেড়ে চলল। ইষ্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের লীগের যুদ্ধে ও শীল্ডের যুদ্ধে এমনকি বাংলার বাইরে অন্যান্য প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা আজ

কয়েক বৎসর ধরে যেন একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানকার মাঠের দলাদলির জের এখন দিল্লীর মাঠে ও বোম্বাইয়ের মাঠেও চোখে পড়ছে। খেলার মাঠের মধ্যে যত উত্তেজনা তার একশত গুণ বেশী দলীয় সমর্থকদের ভিতর। তাদের কাছে বিপক্ষদের খেলোয়াড়দের কোনও গুণ নেই। এরা ভাল খেলে তাদের প্রিয় দলকে পরাজিত করলে দোষী বলে সাব্যস্ত হয়। রেফারীর কোনও নির্দেশে নিজেদের খেলোয়াড় শাস্তি পেলে বা অতি ছায়সন্ধ্যাত ভাবে নিজেদের দলের বিরুদ্ধে গোল হলেও, এদের সহের দীমার বাইরে চলে যায়। অকথ্য ভাষায় গালাগালি শুরু হয় গ্যালারীতে। পান্টা জবাব অল্প পক্ষের সমর্থকদের নিকট থেকে এলেই খণ্ডযুদ্ধের অবতারণা হয়ে দাঁড়ায়। পুলিশ আসে লাঠি নিয়ে ও ঘোড়ায় চড়ে এসে এদের তাড়াই মাঠ থেকে। লজ্জায়গাহীন এই সব সমর্থকেরা আবার ফিরে আসে মাঠে। আবার সেই দৃষ্টের অবতারণা হয় মাঠে। এদের একমাত্র সন্তোষ তাদের ক্লাব লীগ বা শীল্ডজয়ী হলে। এই বিরুদ্ধ না হলেই আক্রমণ করে তাদেরই প্রিয় দলের খেলোয়াড়দের ও কর্মচারীদের। টিল ফেলে তাঁবুতে এবং সময় সময় খেলোয়াড়দের নাগালের মধ্যে পেলে মারতেও ছাড়ে না। ক্লাব-কর্তৃপক্ষেরা এখন এদেরই কবলে। স্তম্ভভাবে ক্লাব চালাতে হলে এখন একমাত্র উপায় সমস্ত প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করা এবং তারই অল্প তৈরী ভাল ভাল খেলোয়াড়দের ধরে আনার পর্ক শুরু হয় প্রস্তুতি-পর্ক হিসেবে বছরের পর বছর। বাংলার মাটিতে যে ফুটবল-এর জন্ম সেই ফুটবল এখন থেকে নির্বাসিত হতে চলেছে, কেননা এই প্রস্তুতি-পর্কের চেউয়ে উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম থেকে তৈরী খেলোয়াড়রা এসে এখানকার তবিত্তের আশা স্থল কলেজের ছেলেরদের বড় মাঠ থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। এরা বিভাডিত হয়ে অপেক্ষাকৃত কমজোরী দলে জায়গা পায় এবং সেখানে খেলাধুলায় উন্নতি করার বিশেষ কোনও সুযোগ না পেয়ে ছ'চার বছর বাদে দর্শকের দলভুক্ত হয়ে যায়।

পূর্বে দেখেছি বিভিন্ন ক্লাবের কর্তৃপক্ষদের বাংলার বিভিন্ন শহর ও গ্রামে এবং বলকাতার বড় মাঠের আশেপাশে ছোট খেলার আসরে ঘুরে ঘুরে উঠতি খেলোয়াড় চিনে বের করতে। এখন দেখি তৈরী খেলোয়াড় খুঁজতে ভারতের বিভিন্ন বড় বড় প্রতিযোগিতার খেলা দেখে একেবারে স্তম্ভ তৈরী খেলোয়াড়দের ধরে আনতে। এর একমাত্র কারণ সব প্রতিযোগিতামূলক খেলা তাদের ক্লাবকে জিততে হবে। একবার কোনও প্রতিযোগিতায় সফল হলেই চাহিদা আসে আর একবার, তারপর আর একবার। এই চাহিদার আর শেষ নেই। এই চাহিদা মেটাতে গিয়ে আমাদের উদীয়মান খেলোয়াড়দের আমরা অন্ধুরে বিনাশ করে দিচ্ছি। আমি একথা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি যে, বাংলার মাটি থেকে এখনও অনেক কৃতি খেলোয়াড় আমরা তৈরী করতে পারি যদি বিভিন্ন ক্লাব-কর্তৃপক্ষেরা এদিকে একটু নজর দেন। তাঁদের দৃষ্টি-তদ্বীর আমূল পরিবর্তন করতে হবে। তাঁরা লীগ বা শীল্ড হয়ত জিতবে না কয়েক বছর কিন্তু তবিত্তের কাঠামো দৃঢ় করার এই একমাত্র উপায়। স্থল ও কলেজে ফিরে যেতে হবে। সেখান থেকে সুযোগ্য তরুণদের ধরতে হবে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার জন্য। আজ যখন রাজ্য-সরকার খেলাধুলার ব্যাপারে সক্রিয় হয়ে উঠেছেন তখন এইটুকু আশা কি আমরা করতে পারি না যে, তাঁদেরই উৎসাহে গঠিত 'ওয়েষ্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অফ স্পোর্টস' এই ব্যাপারে মাথা ঘামিয়ে আবার সেই পুরানো অবস্থা ফিরিয়ে আনবে। আবার স্থল কলেজের ছেলেরা ও বাংলার গ্রাম ও অস্ত্রাঙ্গ সহরের তরুণরা তখন খেলা শিখবে বলকাতার বড় দলেদের হয়ে খেলার সুযোগ পাবে বলে। এই একমাত্র উপায় আমাদের এই খেলার স্বতর্গোরব-উদ্ধার করার। তা না হলে যে ছ'একটা কৃতি খেলোয়াড় সম্প্রতি হয়েছে তাদের সমকক্ষ একটিও খেলোয়াড় আর আমরা দেখতে পাবেনা না। একটা শৈলেন মান্না, একটা চুনী গোশ্বামী, একটা অরুণ ঘোষ ও আর থাকবে না।

সম্মাদর্শ

পূজাস্তে :

মহাপূজার উৎসবমুখর দিনগুলির স্মৃতি ইতিমধ্যেই স্মৃতির পটে মুছিয়া না গেলেও ম্লান হইবা আসিয়াছে। গতীর অমৃতবের ক্ষেত্রে যদি পূজা স্পর্শ না দিয়া যায় তবে আয়বিক উত্তেজনার পর অবসাদই ঘনাইয়া আসে। আজকে আমাদের ক্ষত ধাবমান সংগ্রামমুখর জীবন, সমাজ ও পরিবেশ এমনি যে, একটুখানি আশ্বস্ত হইয়া নিজের দিকে মুখ ফিরাইয়া ভাবিবারও অবকাশ নাই। যে পথে চলিয়াছি তাহা সত্যকার উন্নতির বাঁ অবনতির তাহাও চিন্তা করিবার অবসর বা প্রযুক্তি কোথায়? পেট ও প্রযুক্তির তাড়নাকে আজকের সমাজ-রাষ্ট্র-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এমনি গ্রহণ করিয়া তুলিতেছে যে তার তাল সামলাইতেই মানুষ দিশাহারা বিভ্রান্ত। তথাপি বিজ্ঞানকে উপলক্ষ্য করিয়া শত্রুমিত্র নির্বিশেষে সবাইকে একাত্মবোধে প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিবার বাঙালীর সমাজ-জীবনের এই শুভরুর রীতিটি আজও স্মরিত হইয়া আসিতেছে। সবারই সঙ্গে মিলিয়া নিশিখা আপনার নিত্যদিনের তুচ্ছতার উপরে উন্নয়ন-নিজেকে ব্যাপ্ত বৃহৎ করিয়া তোলায় মাঝেই বিজ্ঞানের জয়ন্তী নিহিত। মহাপূজার পরে আমরা প্রবর্তকের সম্পর্কিত-অসম্পর্কিত শুভাস্তভকারী সবাইকে আমাদের সর্কাস্তঃকরণের বথায়োগ্য প্রেমপ্রীতি, প্রগতি ও শুভেচ্ছ জানাইয়া সর্বমঙ্গলদায়িনী মহামাতৃকার কাছে প্রার্থনা করি—

‘দদাতু জীবনবৃদ্ধি নিরন্তরং স্মৃতিচিহ্নতে।’

এবারকার দুর্গাপূজা ও দুর্গোৎসবের ফলশ্রুতি :

প্রতিবারের মত এবারও মহাপূজা আসিল—সমাপ্তও হইল। কিন্তু আমরা জীবিতকালে এবারকার মত একই বৎসরে দু’বার দুর্গাপূজা অমুষ্ঠিত হইতে আর কখনও দেখি নাই। পঞ্জিকা বিভাটাই না কি ইহার কারণ। একটি যদি বিপ্লব মতে পূজা হয় অমুষ্ঠিত তাহা হইলে অবিপ্লব মতে হইয়াছে নিশ্চয়ই। বিপ্লব সিদ্ধান্ত মতে ম্লান সংখ্যক পূজাই অমুষ্ঠিত হইতে দেখা গিয়াছে। রামকৃষ্ণ মিশন, প্রবর্তক সত্য প্রভৃতি প্রায় ধর্ম প্রতিষ্ঠানে এবং কিছু কিছু

পারিবারিক ক্ষেত্রে এই দুর্গাপূজা বিপ্লব মতে আশ্বিনের প্রথমে সন্মপন্ন হইয়াছে। অধিকাংশ পূজাই অমুষ্ঠিত হইয়াছে একমাস পরে কার্তিকের প্রথমে।

প্রবর্তক সত্য বিপ্লব মতে কেন পূজা করা হইল তাহার সমর্থনে যে বক্তব্য তাহা সত্যের পার্শ্বিক মুখপত্র নবসম্প্রদায় হইতে এখানে উদ্ধৃত হইল :

“মহালয়ার তপর্ণাস্তে মহাপূজার কল্লাবস্ত। বিপ্লব-মতেই সত্য পূজা। বিপ্লব অর্থাৎ দৃক-সিদ্ধ মত। ঋষিরা প্রত্যক্ষদর্শী মন্ত্রদ্রষ্টাও তত্ত্বদ্রষ্টা ছিলেন। স-নিষ্ঠ গণনামূলক অন্ত মতে, জ্যোতিষশাস্ত্রের গ্রহ-নক্ষত্রাদি-গতিগণনার অঙ্কগুলি যদি প্রত্যক্ষদৃষ্ট জ্যোতিষ্কগতির অঙ্কপাতের সহিত না মিলে, তবে বুঝিতে হইবে যে, গোড়ায় গলদই কোথাও ‘রহিয়া’ গিয়াছে। দৃকসিদ্ধ গ্রহাদি-সঞ্চারের সহিত মিলাইয়া সকল দৈব ঘটনার তিথি-লগ্ন সময় নিরূপণ করাই প্রকৃত সত্যাসূচক। বস্তুতঃ ইহাই শাস্ত্রাসূচকও বটে। কারণ, ঋষিগণ কোথাও যুক্তি বা প্রত্যক্ষবিরোধী কোনও সিদ্ধান্ত শাস্ত্রসিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে নির্দেশ দেন নাই। প্রত্যক্ষ, যুক্তি বা অনুমান ও আপত্তি বা অপরোক্ষমত—এই ত্রিপ্রমাণসিদ্ধ তত্ত্বই সর্কশাস্ত্র-বিজ্ঞান-স্বীকৃত আর্থ তত্ত্বসিদ্ধান্ত। চিহ্নিত স্মরণে অমুষ্ঠিত দেব-দেবী পূজারই শুভফল অবশুস্বাবী। অতীত, বর্তমান হিন্দু-ভারতের জাতীয় জীবনে নিত্য-নৈমিত্তিক পূজা-পার্বণাদি ধর্মকৃত্যের অমুষ্ঠান সর্কধা ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে, এমন কথা যদি কেহ বলেন, তাহা কেহই খণ্ডন করিতে পারিবেন না। অমু মতে পিতৃপক্ষে মহালয়ার পিতৃ-তপর্ণ না থাকায়, দেবীপক্ষে দেবীপূজার অধিকার কেমন করিয়া জন্মিতে পারে—এ প্রশ্নের সমুত্তরও কোথাও পাওয়া যায় নাই।”

সর্কক্ষেত্রেরই বিপ্লবমতে পূজার যুক্তিযুক্ততার সারাংশ-টুকুই এখানে বিবৃত হইয়াছে। বাংলাদেশে পঞ্জিকা বিভাটের প্রধান কারণ হইল এই যে, বাংলায় স্মার্ত রঘুনন্দনের মতাসূচী পণ্ডিতের সংখ্যাই অধিক এবং তাহারা অধিকাংশই ঋষিদের মতসম্মত স্মার্তসিদ্ধান্ত অনুসারে চলেন না অথবা রঘুনন্দনের পরবর্তীকালে রাঘবানন্দের সংশোধনী সারগীর সিদ্ধান্ত সকলও আমলে আনেন না। গণিত জ্যোতিষের-যে মণ্ডিক শুদ্ধ সিদ্ধান্ত সেই অনুযায়ী যদি ফলিত জ্যোতিষের ফলাফল নির্ণয়

না হয় তাহা হইলে বিচারিত বিষয় নিভুল না হইবারই সম্ভাবনা থাকে। আজকের দিনের আর্থ ব্যবস্থাদাতাদের এই গাণিতিক জ্যোতিষের জ্ঞান অতি স্বল্প এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে নাই বলিলেও অত্যাক্তি হইবে না। প্রত্যক্ষ দৃষ্ট স্বর্ঘ্য বা চন্দ্রগ্রহণ দেখিয়া সাধারণ মানুষ বুঝিতে পারে যে পঞ্জিকার গণনা ঠিক হইয়াছে যাহা পূজা-পার্বণ শ্রাদ্ধ-উপনয়ন বা পরকাল সম্পর্কিত কোন অমুম্যে বিষয়ে সম্ভব নয়। কিন্তু আর্থ মতভিত্তিক পঞ্জিকাগুলিতে গ্রহণ ইত্যাদি প্রত্যক্ষ বিষয়ের গণনা প্রায়শঃই পাশ্চাত্য পঞ্জিকার অনুসরণে করা হইয়া থাকে। কিন্তু দুর্গাপূজার ক্ষেত্রে এই অনুসরণটি করা সম্ভব হয় নাই। এ বৎসরের মহাপূজার বিভ্রাটের মূল কারণ এই যে, বিভিন্ন মতাবলম্বী পঞ্জিকা-প্রণয়নকারী পণ্ডিতগণের স্ব-স্ব সংস্কার ও পাণ্ডিত্যভিমানের উপরে উঠিয়া সত্য সিদ্ধান্তের নিকট নতি স্বীকারে কার্পণ্যকূঠা। কালের বিবর্তনে পণ্ডিতগণের মধ্যে সে ত্যাগ তপস্যা ও সত্যনিষ্ঠা বর্তমানে প্রায় অস্তিত্ব হইয়াছে। সমাজ-জীবনের সর্ব স্তরের মত পণ্ডিত-সমাজেও লঘুতা, অর্ধলোভুতা, হীনতা, দীনতা, দুর্নীতির ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে। গণতান্ত্রিক দেশে বোগ্যতার মাপকাঠি ভোটাধিক্যে। সুতরাং পঞ্জিকার শুদ্ধাশুদ্ধ বিচারে মতাদ্বিক্যের প্রভাব সহসা নগণ্য হইবার নহে বলিয়াই অনতিদূর আগামীকালেও এই পঞ্জিকা বিভ্রাট নিরসিত হইবে এমন মনে হয় না।

*

শুদ্ধ অন্তর্ভুক্ত যাই হোক, দুইটি পূজার অনুষ্ঠানকেই আমাদের চোখের সামনে দেখিলাম, অনুভব করিলাম। দুইটি পূজারই বৈশিষ্ট্য আছে—আশ্বিনের দুর্গাপূজা আর কার্তিকের দুর্গোৎসব। প্রথমটিতে পূজা মুখা, উৎসব গোণ। দ্বিতীয়টিতে উৎসব মুখ্য আর পূজা গোণ হইয়া পড়িয়াছে। বলা যায় পূজা আর উৎসব পরস্পর পরিপূরক। দুইটি মিলিয়াই মহাপূজার অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ। ঘরে, কোণে, বনে ধ্যান-ধারণা এবং পূজা-অর্চনার মধ্য দিয়া সিদ্ধিলাভ আর যে কোন ক্ষেত্রেই সম্ভব হোক, দুর্গাপূজানুষ্ঠানের বোলায় কিছু স্বাভাব্য আছে। এই মহাপূজার ইতিহাস ও ইতিহাস অল্পরূপ।

ইহা যুগপৎ পূজা ও উৎসব—জাতীয় উৎসব। দুর্গা রাষ্ট্রীয় দেবী। ‘রাষ্ট্রী’—রাষ্ট্রের অধিশ্রী। ‘রাষ্ট্র সংগমনী’—রাজ্যরক্ষার্থে সম্পদের প্রয়োজন তাহারও তিনি বিধানকর্ত্রী। গণশক্তির সামগ্রিক প্রতীক দুর্গা। দুর্গাপূজার ইতিহাসে উৎসমূল মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত ত্রীশ্রীচণ্ডী। চণ্ডী গ্রন্থ-বর্ণিত তিনটি চরিতের মধ্যমটিতে মহিষাসুর বধ। মহিষাসুরকে বধ করিলেন মহালক্ষ্মী। এই মহালক্ষ্মীর স্বরূপটি কি? মধ্যমচরিতের দেবতা বিষ্ণু কুপিত হইলে প্রথম তাঁহার মুখ হইতে তেজ নির্গত হয়। তারপর অন্ত্যস্ত দেবতাগণের শরীর হইতেও তেজ নির্গত হইল। এই সামগ্রিক পুঞ্জীভূত তেজসমষ্টিই মহালক্ষ্মীর আবির্ভাব ঘটাইয়া তুলিল। এই মহালক্ষ্মীই শরৎকালে দুর্গা নামে অর্চিতা হইয়া আসিতেছেন। সুতরাং সমগ্রের সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া অন্ততঃ দুর্গপূজাকর্মটি সম্পূর্ণ হইবার নহে।

দুর্গাপূজা সম্বন্ধে আরও বিবেচ্য এই যে, দুর্গার প্রতিমা, পূজার পরিকল্পনা ও আদিক এমনি যে, ইহা যতটা না ব্যক্তিগত তার চেয়েও সার্বভৌম। দুর্গামূর্তির পারিবারিক রূপটিও দেবদেবীবর্গের মধ্যে অনন্ত-সাধারণ। দুর্গামূর্তির ঐশ্বর্য ও পরিবেশ রাজসিকতার রূপটিই উদ্ভাসিত করিয়া তোলে। এই বিরাট বিচিত্র সৌন্দর্য্যময়ী মূর্তির সামনে এককের পূজা যেন খাপ খায় না। বস্তুতঃ দুর্গাপূজা-পরিকল্পনার স্বকীয় স্বেচ্ছাই পূজাকে সার্বজনীনতায় পরিণত করিয়াছে—এবং করিতেছে। বহুমুখের চোখেই সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম এই দুর্গারূপ-কল্পনার মধ্যে জাতীয় সত্তার সর্বোদীন রূপটি ধরা পড়িয়াছিল। জাতীয়তা ও দুর্গাকে অভিন্ন রূপেই দেখিয়া তিনি জাতীয় সঙ্গীত ‘বন্দে মাতরম্’ রচনা করিয়াছিলেন। দুর্গা আর দেশমাতৃকা বহুমুখের কালে জন্মশঃ অভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। পরবর্তী কালে বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, প্রণবানন্দ, সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ বহুমুখের এই দুর্গা ও জাতীয়তার অভিন্ন দর্শনই পরিপোষণ ও পুষ্ট করিয়া গিয়াছেন। এবার ইংলণ্ডেও দুর্গাপূজা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। কালে কালে বাঙালীর যদি প্রাণশক্তি জাগে তবে ইহা বিশ্ব-

ভূবনে ছড়াইয়া পড়িবে এবং পড়িবার মত যোগ্যতা এই
 দুর্গামূর্ত্তি পরিকল্পনা ও পূজার মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে।
 ‘বাঙালী কালচারে’র এমন সর্বাঙ্গীন সুস্পষ্ট অভিব্যক্তিও
 সম্ভবতঃ আর কোথাও নাই। বাঙালীর উদার বিশ্বজঘী
 ভাবনার মূর্ত্তিই এই দুর্গা।

দুর্গার প্রতিমা, পূজা ও উৎসবের ইতিহাস ও ঐতিহ্য
 চিন্তা করিলে ইহাই মনে হয় যে, এই পূজা ও উৎসবের
 গতি ও প্রকৃতি কেবলমাত্র শাস্ত্র ও জ্যোতিষ-গণনার
 গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকে নাই। বাঙালীর ঐতিহ্য ও
 সাধনা, তার জাতীয়তার চিন্তা ও সঙ্গের দেবী দুর্গাকে
 সকল সীমার পারে বিশ্বমানবতার ব্যাপক অঙ্গনে
 মুক্তি দিয়াছে। এবারকার মহাপূজা-বিভ্রাটের ফলশ্রুতি
 রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়—“প্রতিদিন মানুষ ক্ষুদ্র
 দীন একাকী, কিন্তু উৎসবের দিনে মানুষ বৃহৎ; সেদিন
 সে সমস্ত মানুষের সঙ্গে একত্র হইয়া বৃহৎ, সেদিন সে
 সমস্ত মহুঘৃষের শক্তি অমুভব করিয়া মহৎ।” এবার পূজা
 ও উৎসবটি বিচ্ছিন্ন হওয়ায় এই বৃহৎ ও মহত্বের অমুভবটি
 ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। ইহা মন্থী নিশ্চয়ই অমুভব করিয়াছেন।
 সব পূজার্কনারই দুইটি দিক—অন্তবঙ্গ ও বহিরঙ্গ বা
 আনুষ্ঠানিক অঙ্গ। আনুষ্ঠানের উজ্জীবন সাধ্যের
 স্বরূপানুসারে হইয়া থাকে। ব্যক্তিগত ও সার্বজনীন

ভেদে অমুভূতিরও তারতম্য ঘটিয়া থাকে। শক্তির গতি
 একত্বাভিমুখীও হইতে পারে, আবার বহুত্বাভিমুখীও
 হইতে পারে। নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ বহুত্ব প্রকাশক শক্তির
 পরম প্রতীক দুর্গা। “যা দেবী সর্বভূতেষু চেতনেন্যডি-
 ধীয়তে”—সর্বভূতে চৈতন্ত্বরূপে বিরাজিতা মহাশক্তিই
 দেবী দুর্গার রূপপরিকল্পনার অন্তরালের মূল রহস্য।

বৈচিত্র্যহীন শক্তির একাকারিত্ব যেখানে সেই
 ভাবাতীত গুণাতীত অব্যক্ত অগম্য অনির্বাচনীয় তুরীয়
 জগৎকারণরূপী মাতৃতত্ত্বের ধারণা কোণে-বনে-মনেই
 সম্ভব। বিশ্বপ্রপঞ্চের মূল্যধার আত্মশক্তিই আবার
 রূপে-রূপে অগম্যুর্গি ধরিয়া বিশ্বরূপা হইয়া বিরাজিতা।
 এই ব্যক্ত ভাবটিই বস্তুতঃ মুখ্যরূপে দুর্গাপ্রতিমায়
 প্রকটিত।

দুর্গাপূজা বস্তুতঃই সার্বজনীন পূজা। স্মরণ্য মহা-
 মাতৃকার শাস্ত্রসম্মত পূজা ও ঐতিহ্যমুগ উৎসবানুষ্ঠান
 যাতে বিচ্ছিন্ন না হইয়া একই সঙ্গে অমুগ্ধিত হয় সেদিকে
 বাংলার জনগণ, গণনায়ক, মনীষী ও সরকারের সক্রিয়
 সচেতনতা বাঞ্ছনীয়। উৎসব সকল পূজারীকে একত্র
 করিবে আর সনিষ্ঠ পূজা একত্রিত সবাইকে একাত্ম
 করিবে। বাঙালীর সামগ্রিক সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য পরিপূর্ণতা
 পাইয়াছে এই দুর্গাপূজায়।

জগদ্ধাত্রী

শ্রীমুখীর গুণ

শ্মশান-কালীর কুহেলী-কুহকে রাতি
 মানব-জগতে যখনই অমায় ঢাকে,
 পথের দু'ধারে ভূভূড়ে মিছিল আঁকে,
 চলিতে চকিত হ'বে ওঠে যত যাত্রী।

দরশন দেয় তখনই জগৎ-ধাত্রী;
 যাত্রীরা পথে বাঁকে-বাঁকে বাঁকে-বাঁকে
 ভিড় করে তা'র স্নেহ-বিগলিত ডাকে;
 সমপ্রাণতার সে-ই তো প্রেরণাদাত্রী।

সমপ্রাণতাই সহযোগিতার মূল,
 সহযোগিতায় সভ্যতা পাষ প্রাণ;
 নিখিল-মানব কোটি-দল যেন স্কুল,
 কোটি-তার কোনো বীণাব ঐকতান,
 একই নাটকের অমৃত পাত্র-পাত্রী;—
 সবারই উৎস সে-ই তো জগৎ-ধাত্রী।

সহযোগিতা

ক্ৰীড়াসম্রাট নগেন্দ্রপ্রসাদ — শ্রীশৈরীশঙ্কর
বোধ প্রণীত। প্রকাশক: শ্রীশুশীলকুমার দত্ত; ১নং
ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ৪-০০।

ক্ৰীড়াসম্রাট যে নগেন্দ্রপ্রসাদ, নাস্তি সংশয়। আলোচ্য গ্রন্থখানি ব নামকরণ ধ্যাবোগ্য হইয়াছে। সম্রাটের প্রজ্ঞাবুদ্ধির মধ্যে আর সকলেই তাঁহার মর্যাদা রক্ষা করিয়াছে উপযুক্তভাবে। তিনিই একমাত্র ভারতীয় যিনি আই. এফ. এ.-র স্থাপত্য। তাঁহার শোভাবাজার ক্লাব বাঙালীকে হীরক মুকুট পরাইয়া দেয় আই. এফ. এ. প্রতিষ্ঠার পূর্বে। তাঁহারই বনেয়া হেরার স্পোর্টিং প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ খেলার দলগুলিকে অবাধে ঠেকাইয়া রাখে পূর্ব বিক্রমে। একবার মোহন-বাগানের ভান্ডারীদের দ্বারা পঞ্চাশ নিক্ষেপ করা হইয়াও আঘাতিত হয় আপনাই ৫-০ গোলে পরাজিত হইয়া। ইহার পরে হেরার স্পোর্টিং চিন্তারা টাইমকে সাধা কবিয়া মার মার কাট-কাট করিয়া যেতমৎ বজ্রাঘ ঘটাইয়া 'অবধা' হত ইতি গজ'ব হৈবালী'ব বিক্রমে পড়ে। সে হৈবালী ফাঁস করিয়া দেয় মোহনবাগান ইহার তিন বৎসর পবে এবং তাঁহার পরে অতি শীঘ্রই কুটবল লীগের লগায় স্থলাইবা দেয় যেতী ছোট-বড় সকলকে। পরমার্ধ্য ঘটনা এ সনের পূর্বে ডেভিড হেবাবের নাম কপচাইয়া স্থলেব শিশু রথীরা সে সময়ের হৃদয় কালকাটা ক্লাবের ঘাড়ে একটা গোল চাপাইয়া দেয় শীঘ্র প্রতিযোগিতায়। শোভাবাজারের ট্রেডন্ কাপে চক্রভের শিখ্র এমন ঘটনার জুড়ি কলিকাতার মুটবলের ইতিহাসে দ্রুতপ্য। আশ্চর্যের বিষয় 'ক্ৰীড়াসম্রাট'এ এ অপূর্ব ঘটনাব নামগন্ধ নাই। গ্রন্থ-সম্পাদকের এ ক্রটিতে ক্ৰীড়াসম্রাট সম্রাট লাভ করবেন না নিশ্চয়ই, কারণ সেই শিশু-রথীদের দেয়া-দেয়াদের সম্রাট যে নিজের কোলে টানিয়া লইয়া হেরার স্পোর্টিং ও মোহনবাগানকে দিবে ভেঁকি লাগিবে দেন। খেলাধুলার সংগ্রহে গ্রন্থকারের আসার সুযোগ কখনও ঘটয়াছিল কিনা জানি না। ঘটুক আর নাই ঘটুক ক্ৰীড়াসম্রাট-এর দায়ায় হেরকের তাঁর কিছু হবে আশা করি। গ্রন্থকার জানিবেছেন, এ ধ্যাব ছোট ছোট জীবনীই সম্পাদনা তিনি করেছেন, বড় জীবনীতে হাত দেওয়া এই তাঁর প্রথম আরম্ভ নিম্নার নহে।

বদেশে পূজাতে রাজা (সম্রাট) বিধান সর্বত্র পূজাতে। এ

সম্রাটের পূজা কিন্তু সর্বত্র হইয়াছে। তাঁর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে লর্ড হক্, ও সি. কে. নাথডুর স্বীকারোক্তিতে। আর পণ্ডিত হিনাবে তাঁর পূজা প্রাপ্তিব কথা হাইকোর্টে বিচারপতি ও প্রাদেশিক শাসনকর্তার মুখে মুখে ঘুরিয়াছে ও ঘুরিতেছে। সম্রাট যে কাণ্ড হইতে উদ্ধৃত সে কাণ্ডের পরিচয় দান ও গ্রহণ মহাপাতক নাশক—ভুল তাহাতে কিছুমাত্র নাই। সর্ববরেণা সর্বাধিকারীবাংশ জাগতিক ইতিহাসেব অমূল্যরত্ন। গ্রন্থখানি সচিত্র, বংশশ্রেষ্ঠদের অতিকৃতিশোভিত। 'ক্ৰীড়াসম্রাট'-এর সম্রাটের সর্বকালে, সর্বদেশে অবধারিত তুল্য মূল্য ভাবে। দেশ ও দেশের অতীতপূর্ব কল্যাণ করিয়াছেন নগেন্দ্রপ্রসাদ। 'ক্ৰীড়াসম্রাট'ও এখন তাই করিবে নিঃসন্দেহে।

ক্ৰীড়াভিষ্য

পূজার কথা—ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার, কাব্যাতীর্থ, সরস্বতী প্রণীত। প্রকাশক—মুখার্জি বুক হাউস, ৫৭ নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১-৭৫ নং পং।

শ্রীচন্দ্র-বর্ণিত উপাখ্যান অবগমনে কিশোর কিশোরীদের জন্ত 'পূজার কথা' বিশেষভাবে লিখিত। চন্দ্রের প্রতিপাদ্য তত্ত্বকেও মাঝে মাঝে গল্পছলে সহজবোধ্যভাবে পবিত্রেশন করা হয়েছে। ভাবা প্রাঞ্জল ও মাঝলীল। ছোটদের উদ্দেশ্যে লিখিত হলেও, বড়বাও 'পূজার কথা' পড়ে উপকৃত হবেন। গ্রন্থের ভূমিকাটা সাবর্ণ। ভূমিকায় চন্দ্রের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংক্ষেপে আলোচিত। শ্রীসরকার স্থলেখক ও চিন্তাশীল। বহু পত্র-পত্রিকায় তিনি প্রবন্ধাদি লিখিয়া থাকেন। শিশুপাঠ্য কল্পকথানি বইয়েরও তিনি রচয়িতা। আলোচ্য পুস্তকের উদ্দেশ্য প্রশংসনীয়। পুস্তকখানির বহুল প্রচার বাঞ্ছনা করি।

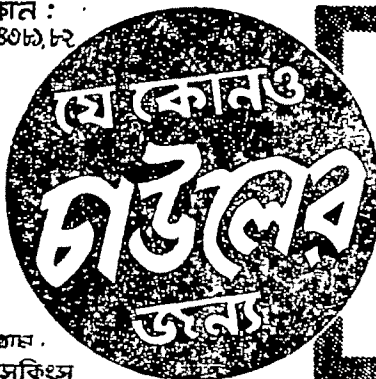
আকাশ গঙ্গা—ইন্দু গুপ্ত। প্রকাশক—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ পাল। ২-সি, নবীন কুণ্ড লেন, কলি-২। মূল্য—ছই টাকা আট আনা।

সাহিত্য বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি। কবিতাতেও তাই দেখি জীবনের নানা স্রের অনুরণন। আমাদের এই জীবনে আছে ভ্রম, মৃত্যু, আছে প্রতীক্ষা, যন্ত্র, প্রিয়জনদের জন্ত ব্যাকুলতা, আছে বন্ধন। জীবনে না-পাওয়ার মাঝে পাওয়ার যন্ত্র—যন্ত্রণার মধ্যে আছে জীবন। 'আকাশ-গঙ্গা'র কবি বলছেন—

"পত্রহীন গাছেই আছে পাতার স্বপ্ন,
জীবনের ভাষা আছে মরণের মাঝে।"

কবি ইন্দু গুপ্তের এই সাম্প্রতিক কাব্যগ্রন্থটি মানবিক জীবনের নানা ছবিতে সমৃদ্ধ।

ফোন :
৩৪-৪০৬৬, ৮২



স্বাস্থ্য
স্বাস্থ্যসিদ্ধি

পশুপতি দাস এণ্ড সন্স
প্রাইভেট লিঃ

৪৩/২ ও ৩৭এ, সুরেন্দ্রনাথ দাসাফী রোড, কলিকাতা-১৪।

বাড়ীতে চাউল পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা আছে।

আমবা চিঠি লিখি—চিঠি পাই। চিঠিকে প্রাত্যহিক জীবনের
একটি অঙ্গ বললে ভুল হয় না। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন রচিত হয়
যা প্রাত্যহিকতার উর্ধ্বে। যা পড়ে মনে হয়—

“অপূর্ব হরের আশ্চর্য আলাপ
গমকে মীড়ে অসীম নীরবতা
মরণ সাগরে স্মৃতি-দীপের
দিগন্ত প্রসার প্রাপ্তি।”

‘আকাশ-গঙ্গা’র ‘একখানি চিঠি’ কবিতাতে এমনই এক চিঠির কথা।
‘যন্ত্রণা-মৌন আত্মদীর্ঘ অসহ্য’ একটি মানুষের কথা এ চিঠিতে লেখা।
কবি বলছেন—

“এ চিঠিতে আপন অন্তরে বিচলিত হবাব
বিস্রত থাকার দাহ নেই,
নেই আত্মসম্বল হতে বেঁচে থাকার বিড়ম্বনা—
শুধু আছে ব্যক্তি ভাবনাময় নির্মল দীপে
মমতা-ঘন মেঘ ও রৌদ্র
ব্যাপ্তি-প্রাচুর্যের স্পষ্টিত স্বকৃতি।”

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ‘আকাশ-গঙ্গা’ কবিতাটি—যাব নামে পুস্তকটির
নামকরণ করা হয়েছে। কবি বলছেন—

“বড় স্বপ্ন, বড় নিবিড় মনে হল
ক্ষণ থেকে ক্ষণান্তরে
উধাও হয়ে যাওয়া
মুহূর্ত্তলি।

মাথাবিষ্ট হয়ে বসে রইলাম
যেখানে হিংস্র, সেইখানেই।

* * *
অজুত লাগল,
ধূ ধূ সময়ে শূন্য

আধো আলো, কটু গন্ধ,
জিজ্ঞাসার তিমিরে আবৃত শালবৃক্ষ। -
আর বিশ্বাসের পুঞ্জীভূত
বেদনামাখা
লতাশ্রেণি আলিঙ্গন।
ওরা যেন একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করছে
আকাশ-গঙ্গার মন্ত্র-লাগা
মানব-হৃদয়ের মৌল প্রযুক্তিকে।”

* * *
“আকাশ-গঙ্গা নেমে এল
নেমে এল সময়ের কাছে
মানুষের-বিষয় হৃদয়ের কাছে।
মাঠেব হলুদ পাতাব ভীড় তৈলে,
টেউ তুলে ধূসর ধপের দেশে।”

সেই মুহূর্ত্তে কবির সাথে আমবাও হৃদয় দিয়ে অনুভব করলাম এই
পৃথিবীর মোহিনী, মাথা।’ কিন্তু ঐ মোহিনী মাথাই তো পৃথিবীর
সব নব—এখানে যে সমস্তা—তার ধবর কে দেবে? ‘ধবর বলছি’
কবিতার আছে—যে ধবর

“ছাপা হয় না কোনদিনই,
—সেই ধবর।

মনেব গোপন অস্তিত্বের ধবর।
জীবনের মৌলিক সমস্তার ধবর।”

মধ্যবিস্তার জীবন-যুদ্ধের নানা ধবরে কবিতাটি মুখর। সহজ-সুন্দর
ভাবার মাধুর্যে আর সুন্দর উপমার হণে কাব্যগ্রন্থটি উপভোগ্য।
সাধারণ বিষয়বস্তুও উপস্থাপনাব ক্ষেত্রে সাধারণের উদ্দেশ্য স্থান পেয়েছে।
‘আকাশ-গঙ্গা’ বহু জনেরই অবকাশের সঙ্গী হবে। ছাপা ও বাঁধাই
ভাল। পুস্তকটির সমাদর কামনা করি।

লক্ষ্মী মজুমদার

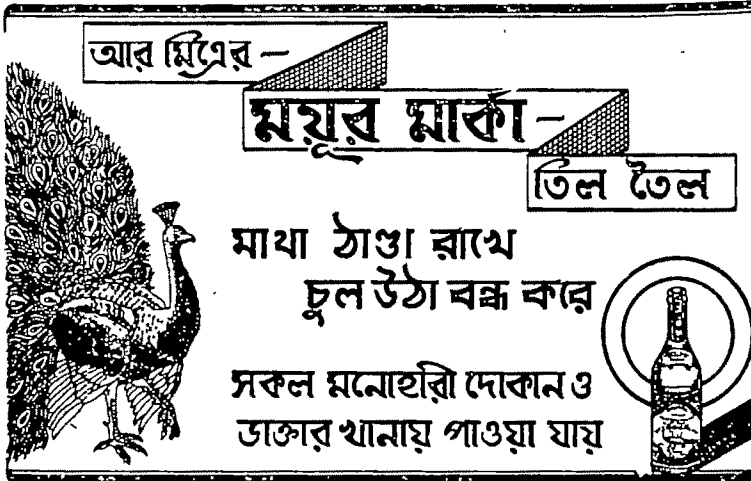
আর মিশ্রের—

ময়ূর মার্কা—

তিল তৈল

মাথা ঠাণ্ডা রাখে
চুল উঠা বন্ধ করে

সকল মনোহরি দোকান ও
ডাক্তার খানায় পাওয়া যায়



শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন ভক্তিভারতী প্রণীত
গীতামাধুরী—১২-০০

(শ্রীমদ্ভাগবতের মতামতসম্মত সর্বপ্রথম
গীতার বিশদ ব্যাখ্যা)।

জন্মস্থানের সন্ধিস্থলে—৩

প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্য।

এস. চন্দ্র এণ্ড কোং

সর্বরকম সঙ্গীতপুস্তক ও যাবতীয় বাস্তব-
যন্ত্রের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা।

৪, ওয়েলেসলি স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

সাময়িক

ফটোলাগের বদান্যতা :

জরাজীর্ণ অল্পবয়স্ক আনন্দের ফিড-মিক্সিং প্ল্যাণ্টের ক্ষয় ফটোলাগের অল্পবয়স্ক স্ট্রাসগো ও ব্লাইড উপত্যকা ১০৮,০০০ পাউণ্ড ব্যয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। ব্রিটিশ "ফুড হাইড্রে মাল্টি অডিটোর" অফ হিসাবে ফটোলাগের চেয়ারম্যান লর্ড পলওয়ার্থ উক্ত পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন। এই অডিটোনে ফটোলাগ মোট ব্যয় করিবে ৫০০,০০০ পাউণ্ড। এই কার্যক্রমটি উৎকৃষ্টতর দ্রুত সমবয়স্কে সাহায্য করিবে।

দুর্গাপুজার শালীনতা :

গত ১৭ই কার্তিকের আনন্দবাজার পত্রিকার প্রকাশিত শ্রীমন্তেন্দ্রনাথ বহুর পত্রখানি এখানে উদ্ধৃত হইল : "বলিকাতাব মত বিরাট শহরে শুধু সার্বজনীন দুর্গোৎসবের সংখ্যার প্রায় এক হাজার হবে। এই উৎসবের যে একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে এবং এটা যে বাঙ্গালীর জাতীয় উৎসব ও তার গুরুত্ব কতখানি তাহা বোধ হয় খুব অল্পদূরত্ব সার্বজনীন পূজা কতৃৎপক্ষই অনুভব করে থাকেন। সেই কারণেই বোধ হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই উৎসবের প্রকৃত শিক্ষণীয় ও ধর্মের দিকটা উপেক্ষণীয় হয়ে থাকে এবং এর ভাবগাম্ভীর্য অবহেলিত হয়ে একটা হাস্যকর আনন্দের বেনশাব মস্ত হয়ে ওঠে অনেকেই। বিসর্জনের শোভাযাত্রা দেখতে লক্ষ লক্ষ মানুষ পথে দাঁড়িয়ে থাকেন, তার মধ্যে অনেকেরই মা-বোন, ছোট ভাই সাক্ষীস্বজনও থাকেন। অথচ এই শোভাযাত্রায় অনেক ক্ষেত্রেই থাকে না ভাবগাম্ভীর্য, থাকে না শালীনতা-বোধ, নইলে বিসর্জনের শোভাযাত্রায় ব্যাঙের তালে তালে 'চিকা চিকা বুম' ও 'মন যে আমাব কেমন কেমন করে' এবং তার সঙ্গে অল্লীল ভঙ্গীতে কোমর বাঁকিয়ে বিদেশী টুইস্ট ন'চের অস্বকরণের হলু বাঙ্গালী কুচি যেন নিম্নগামী-তারই পরিচয় দেওয়া হচ্ছে। আইন করে এই রকম ব্যাধি করবে তাদের সাজা দেওয়া উচিত। অবশ্য সব সার্বজনীন যে এ রকম করেন এমন কথা আমি বলছি না। এমন সার্বজনীনও দেখছি যারা এসব থেকে অনেক উদ্ধেগ এবং সত্যি আদর্শস্থানীয়।"

প্রচার কার্যে সজ্জনকত্ব :

সম্প্রতি বারাকপুরে প্রবর্তক সজ্জের সহযোগী সজ্জ শ্রীশ্রী দাস ও শ্রীশ্রী দাসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত পূর্ণিমা সম্মেলনে সজ্জের উৎসর্গীকৃত অন্তরঙ্গ সজ্জা কুমারী রেণুকা ঘোষ বোণদান করেন। স্থানীয় সজ্জন বিশেষ মহিলারা এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। কুমারী রেণুকা এক ঘণ্টারও অধিক কাল সময় সজ্জ, সজ্জগুরু ও সজ্জননীর বিষয় বৈঠকীয়ভাবে আলোচনা করেন। উপস্থিত সকলেই বেশ ক্রীত হন এবং অনেকেই মন্তব্য করেন, যে, 'ইতিপূর্বে সজ্জগুরু কথা এমনভাবে আর কখনও শুনিনি।' সজ্জের একনিষ্ঠ ভক্ত শ্রী ও পরেশের আন্তরিক আপ্যায়ন, বিনম্র আচরণ ও ঐকান্তিক ভক্তভক্তি আবহাওয়াকে ভাব-গভীর মাধুর্যে প্রসন্ন ও চিন্তাগ্রাহী করিয়া তুলে।

উদ্ভিদ হইতে দ্রুত উৎপাদন :

উদ্ভিদ হইতে দ্রুত উৎপাদন পদ্ধতিটি উদ্ভাবিত হইয়াছে ইংলণ্ডের গ্যাপটনের স্টেজিটেরিয়ান নিউট্রিশনাল রিসার্চ সেন্টারের বিজ্ঞানীগণ কর্তৃক। তাহারা এই কাজে ব্যবহার করিয়াছেন বাঁধা কপির পাতা, মটর দানা ও অন্যান্য শাক-সবজি। নিয়ন্ত্রিত অবস্থার মধ্যে উদ্ভিদ জলে সবুজ পাতা চটকাইয়া লইয়া প্রোটিন বাহির করা হয়। এই প্রোটিনের সহিত মেশানো হয় ভিটামিন, মিনারেলস, উদ্ভিদ চর্বি ও কার্বোহাইড্রেট। ব্রিটিশ বিজ্ঞানীগণ শাক-সবজি হইতে দ্রুত উৎপাদনের যে পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহা ভারত এবং এশিয়ার অন্যান্য দেশেও করিতে পারেন। সবজি, চাষাবাদ এবং সরল শস্ত হইতে দ্রুত প্রস্তুত হইতে পারে। প্রকাশ, ইতোমধ্যে বিদীতে অনুকণ একটি বেঙ্গল নির্মাণের পরিকল্পনা লগুয়া হইয়াছে।

শ্রীলক্ষী মজুমদার

উৎসব অনুষ্ঠানে -

ইদ্র'র সন্দেশ

অপরিহার্য !

৮৬, আমহার্ট স্ট্রীট কলি: ৯ ফোন - ৩৫-১৩৮৩	৬, নটবর দত্ত রো, কলি: ১২ ফোন - ৩৪-২৫৩৩
---	---

সম্পাদক : শ্রী অরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৩১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি.এ. কর্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত।

প্রবর্তক প্রিন্টিং এণ্ড হাফটোন লিমিটেড, ২২৩ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীবিজয়ব্রাহ্মণ কর্তৃক মুদ্রিত।

তুবনে ছড়াইয়া পড়িবে এবং পড়িবার মত যোগ্যতা এই দুর্গামূর্তি পরিকল্পনা ও পূজার মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে। 'বাঙালী কালচারে'র এমন সার্বজনীন সুস্পষ্ট অভিব্যক্তিও সম্ভবতঃ আর কোথাও নাই। বাঙালীর উদার বিশ্বজ্ঞানী ভাবনার মূর্তিই এই দুর্গা।

দুর্গার প্রতিমা, পূজা ও উৎসবের ইতিহাস ও ঐতিহ্য চিন্তা করিলে ইহাই মনে হয় যে, এই পূজা ও উৎসবের গতি ও প্রকৃতি কেবলমাত্র শাস্ত্র ও জ্যোতিষ-গণনার গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকে নাই। বাঙালীর ঐতিহ্য ও সাধনা, তার জাতীয়তার চিন্তা ও সম্বন্ধে দেবী দুর্গাকে সকল সীমার পারে বিশ্বমানবতার ব্যাপক অঙ্গনে মুক্তি দিয়াছে। এবারকার মহাপূজা-বিভ্রাটের ফলশ্রুতি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়—“প্রতিদিন মানুষ ক্ষুদ্র দীন একাকী, কিন্তু উৎসবের দিনে মানুষ বৃহৎ; সেদিন সে সমস্ত মানুষের সঙ্গে একত্র হইয়া বৃহৎ, সেদিন সে সমস্ত মানুষের শক্তি অহুতব করিয়া মহৎ।” এবার পূজা ও উৎসবটি বিচ্ছিন্ন হওয়ায় এই বৃহৎ ও মহত্ত্বের অহুতবটি ক্ষুদ্র হইয়াছে। ইহা মর্মা নিশ্চয়ই অহুতব করিয়াছেন। সব পূজার্কনারই দুইটি দিক—অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ বা আনুষ্ঠানিক অঙ্গ। আনুষ্ঠানের উজ্জীবন সাধ্যের স্বরূপানুসারে হইয়া থাকে। ব্যক্তিগত ও সার্বজনীন

ভেদে অহুত্বেরও তারতম্য ঘটিয়া থাকে। শক্তির গতি একত্বাভিমুখীও হইতে পারে, আবার বহুত্বাভিমুখীও হইতে পারে। নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ বহুত্ব প্রকাশক শক্তির পরম প্রতীক দুর্গা। “যা দেবী সর্বভূতেষু চেতনেন্ত্যভি-দীয়তে”—সর্বভূতে চৈতন্ত্বরূপে বিরাজিতা মহাশক্তিই দেবী দুর্গার রূপপরিকল্পনার অন্তরালের মূল রহস্য।

বৈচিত্র্যহীন শক্তির একাকারিত্ব যেখানে সেই ভাবাতীত গুণাতীত অব্যক্ত অগম্য অনির্বাচনীয় তুবীয় জগৎকারণরূপী মাতৃতত্ত্বের ধারণা কোণে-বনে-মনেই সম্ভব। বিশ্বপ্রপঞ্চের মূলধার আত্মশক্তিই আবার রূপে-রূপে জগন্মূর্তি ধরিয়া বিশ্বরূপা হইয়া বিরাজিতা। এই ব্যক্ত ভাবটিই বস্তুতঃ মূখ্যরূপে দুর্গাপ্রতিমায় প্রকটিত।

দুর্গাপূজা বস্তুতঃই সার্বজনীন পূজা। স্মৃতরাং মহা-মাতৃকার শাস্ত্রসম্মত পূজা ও ঐতিহ্যমুগ উৎসবানুষ্ঠান যাতে বিচ্ছিন্ন না হইয়া একই সঙ্গে অহুত্বিত হয় সেদিকে বাংলার জনগণ, গণনাযক, মনীষী ও সরকারের সক্রিয় সচেতনতা বাঞ্ছনীয়। উৎসব সকল পূজারীকে একত্র করিবে আব সনিষ্ঠ পূজা একত্রিত সবাইকে একাত্ম করিবে। বাঙালীর সামগ্রিক সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য পরিপূর্ণতা পাইয়াছে এই দুর্গাপূজায়।

জগদ্ধাত্রী

শ্রীশুধীর গুপ্ত

শ্রীশান-কালীর কুহেলী-কুহকে রাতি
মানব-জগতে যখনই অঘাঘ ঢাকে,
পথের দু'ধারে ছুঁতুড়ে মিছিল আঁকে,
চলিতে চকিত হ'বে ওঠে যত যাত্রী।

দরশন দেয় তখনই জগৎ-ধাত্রী;
যাত্রীরা পথে বাঁকে-বাঁকে বাঁকে-বাঁকে
ভিড় করে তা'র স্নেহ-বিগলিত ডাকে;
সমপ্রাণতার সে-ই তো প্রেরণাদাত্রী।

সমপ্রাণতাই সহযোগিতার মূল,
সহযোগিতায় সভ্যতা পায় প্রাণ;
নিখিল-মানব কোটি-দল যেন ফুল,
কোটি-তার কোনো বীণার ঐকতান,
একই নাটকের অযুত পাত্র-পাত্রী;—
সবারই উৎস সে-ই তো জগৎ-ধাত্রী।

সহস্রাব্দ

ক্ৰীড়াসম্রাট নগেন্দ্রপ্রসাদ — শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার
বোষ প্রণীত। প্রকাশক : শ্রীশীলকুমার দত্ত ; ১নং
ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ৪-০০।

ক্ৰীড়াসম্রাট বে নগেন্দ্রপ্রসাদ, নাস্তি সংশয়। আলোচ্য গ্রন্থখানি ব
নামকরণ যথাযোগ্য হইয়াছে। সম্রাটের প্রজ্ঞাবুদ্ধির মধ্যে প্রায় সকলেই
তাঁহার মর্যাদা রক্ষা করিয়াছে উপযুক্তভাবে। তিনিই একমাত্র ভারতীয়
যিনি আই. এক. এ.-র স্থাপনিত। তাঁহার শোভাবাজার ক্লাব বাঙালীকে
হীরক মুকুট পরাইয়া দেয় আই. এক. এ. প্রতিষ্ঠার পূর্বে। তাঁহারই
বনোয়া হোয়ার স্পোর্টিং প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ খেলার
হলগুলিকে অবাধে ঠেকাইয়া রাখে পূর্ণ বিক্রমে। একবার মোহন-
বাগানের ভাড়াইয়ের দ্বারা পঞ্চাশ নিম্বপ করাইয়াও আঘাতিত হয়
আপনিই ৫-০ গোলে পরাজিত হইয়া। ইহার পরে হোয়ার স্পোর্টিং
চিন্তা টাইমকে সাধা করিয়া মাঝ মাঝে কাট-কাট করিয়া দ্বৈতমুখ
বজ্রাঘ ঘটাইয়া 'অবশ্য' হত ইতি পক্ষের ইয়ালীর বিক্রমে পড়ে।
সে ইয়ালী ফাঁস করিয়া দেয় মোহনবাগান ইহার তিন বৎসর পূর্বে এবং
তাঁহার পরে অতি শ্রীলই ফুটবল লীগের লগার ক্লাইয়া দেয় দ্বৈত ছোট-
বড় সকলকে। পরমাশ্রম ঘটনা এ সনের পূর্বে ডেভিড হোয়ারের নাম
কপচাইয়া ফুলের শিশু রথীরা সে সময়ের দুর্দান্ত কালকাটা ক্লাবের বাড়ে
একটি গোল চাপাইয়া দেয় শীঘ্র প্রতিযোগিতায়। শোভাবাজারের ট্রেডস্
কাপে চক্রান্তের ভিন্ন এমন ঘটনাবলি জড়ি কলিকাতার ফুটবলের ইতিহাসে
দুস্তাপ্য। আশ্চর্যের বিষয় 'ক্ৰীড়াসম্রাট' এ এ অপূর্ণ ঘটনাবলি নামগন্ধ
নাই। গ্রন্থ-সম্পাদকের এ ক্রটিতে ক্ৰীড়াসম্রাট সম্বোধ্য লাভ করবেন না
নিশ্চয়ই, কারণ সেই শিশু-রথীদের সেরা-সেবাদের সম্রাট বে নিজের
কোলে টানিয়া লইয়া হোয়ার স্পোর্টিং ও মোহনবাগানকে দিয়ে ভেকি
লাগিয়ে দেন। খেলাধুলার সংস্রবে গ্রন্থকারের আসার সুযোগ কখনও
ঘটিবছিল কিনা জানি না। ঘটক আর নাই ঘটক ক্ৰীড়াসম্রাট-এর
ছায়ায় হেরকের তাঁব কিছু হবে আশা করি। গ্রন্থকার জানিয়েছেন,
এ বাবৎ ছোট ছোট জীবনীই সম্পাদনা তিনি করেছেন, বড় জীবনীতে
হাত দেওয়া এই তাঁর প্রথম আরম্ভ নিদান নহে।

বদেশে পূজ্যতে রাজা (সম্রাট) বিধান সর্বত্র পূজ্যতে। এ

সম্রাটের পূজা কিন্তু সর্বত্র হইয়াছে। তার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে লর্ড
হফ্, ও সি কে. নাথডুর স্বীকারোক্তিতে। আর পণ্ডিত হিসাবে তাঁর
পূজা প্রাপ্তি বর্ণা হাইকোর্টের বিচারপতি ও প্রাদেশিক শাসনকর্তার
মুখে মুখে ঘুরিয়াছে ও ঘুরিতেছে। সম্রাট যে কাণ্ড হইতে উদ্ধৃত সে
কাণ্ডের পরিচয় দান ও গ্রন্থ মহাপাতক নাশক—ভুল তাহাতে কিছুমান
নাই। সর্ববরণে সর্বাধিকারবিশেষ জাগতিক ইতিহাসেব অনুসার।
গ্রন্থখানি সচিত্র, বংশশ্রেষ্ঠের প্রতিকৃতিশোভিত। 'ক্ৰীড়াসম্রাট'-এর
সমাদর সর্বকালে, সর্বদেশে অবধারিত তুল্য মূল্য ভাবে। দেশ ও
বিশ্বের অতীতপূর্ব কল্যাণ করিয়াছেন নগেন্দ্রপ্রসাদ। 'ক্ৰীড়াসম্রাট'ও
এখন তাই করিবে নিঃসন্দেহে।

ক্ৰীড়াভিজ্ঞ

পূজার কথা—ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার, কাব্যভীর্ষ,
সরস্বতী প্রণীত। প্রকাশক—মুখার্জি বুক হাউস, ৫৭ নং
কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১-৭৫ নং পঃ।

শ্রীচণ্ডী-বহিত উপাখ্যান অবলম্বনে কিশোর কিশোরীদেবের জন্ম
'পূজার কথা' বিশেষভাবে লিখিত। চণ্ডীর প্রতিপাদ্য তত্ত্বকেও মাঝে
মাঝে গজ্ঞাফলে সহজবোধ্যভাবে পরিবেশন করা হয়েছে। ভাষা প্রাঞ্জল ও
সাবলীল। ছোটদের উদ্দেশ্যে লিখিত হলেও, বড়রাও 'পূজার কথা' পড়ে
উপকৃত হবেন। গ্রন্থের ভূমিকাটি সাবগর্ভ। ভূমিকার চণ্ডীর ইতিহাস
ও ঐতিহ্য সংক্ষেপে আলোচিত। শ্রীসরকাব সুলেখক ও চিন্তাশীল। বহু
পত্র-পত্রিকায় তিনি প্রবন্ধাদি লিখিয়া থাকেন। শিশুপাঠ্য কয়েকখানি
বইয়েরও তিনি রচয়িতা। আলোচ্য পুস্তকের উদ্দেশ্য প্রশংসনীয়।
পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

আকাশ গঙ্গা—ইন্দু গুপ্ত। প্রকাশক—শ্রীঅমরেন্দ্র-
নাথ পাল। ২-সি, নবীন কুণ্ডু লেন, কলি-২। মূল্য
দুই টাকা আট আনা।

সাহিত্য বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি। কবিতাতেও তাই দেখি
জীবনের নানা সুরের অন্তর্গত। আমাদের এই জীবনে আছে জন্ম,
মৃত্যু, আছে প্রতীক্ষা, স্বপ্ন, প্রিয়জনের জন্ম ব্যাবলতা, আছে যন্ত্রণা।
জীবনে না-পাওয়ার মাঝে পাওয়ার স্বপ্ন—যন্ত্রণার মধ্যে আছে জীবন।
'আকাশ-গঙ্গা'র কবি বলছেন—

"পত্রহীন গাছেই আছে পাতার স্বপ্ন,
জীবনের ভাষা আছে মরণের মাঝে।"

কবি ইন্দু গুপ্তের এই সাম্প্রতিক কাব্যগ্রন্থটি মানবিক জীবনের নানা
ছবিতে সমৃদ্ধ।

ফোন :
৪৪-৪০৬১, ৬২



শ্রী
বাইসকিৎস

পশুপতি দাম এণ্ড সন্স
গ্রাইভেট লিঃ

৪৩/২ ও ৩৭এ, সুব্রহ্মনাথ ম্যানার্জী রোড, কলিকাতা-১৪।

বাড়ীতে চাউল পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা আছে।

আমরা চিঠি লিখি—চিঠি পাই। চিঠিকে ঐতিহাসিক জীবনের
একটি অঙ্গ বললে ভুল হয় না। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন রচিত হয়
যা ঐতিহাসিকতার উর্ধ্বে। যা পড়ে মনে হয়—

“অপূর্ব স্বরের আশ্চর্য আলাপ
গমকে মীড়ে অসীম নীরবতা
মরণ সাগরে স্মৃতি-দ্বীপের
দিগন্ত প্রদার প্রশস্তি।”

‘আকাশ-গঙ্গা’র ‘একখানি চিঠি’ কবিতাতে এমনই এক চিঠির কথা।
‘ঘম্মা-মৌন আত্মদীর্ঘ অসহায়’ একটি মানুষের কথা এ চিঠিতে লেখা।
কবি বলছেন—

“এ চিঠিতে আপন অন্তরে বিচলিত হবার
বিত্রত থাকার দাঁহ নেই,
নেই আত্মসম্মতি হয়ে বেঁচে থাকার বিড়ম্বনা—
শুধু আছে ব্যক্তি ভাবনাময় নির্মল দ্বীপে
মমতা-ঘন মেঘ ও রোজ
ব্যাপ্তি-প্রাচুর্যের স্পষ্টিত স্বাক্ষর।”

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ‘আকাশ-গঙ্গা’ কবিতাটি—বার নামে পুস্তকটির
নামকরণ করা হয়েছে। কবি বলছেন—

“বড় শুক, বড় নিবিড় মনে হল
ক্ষণ থেকে ক্ষণান্তরে
উধাও হয়ে যাওয়া
মুহূর্তগুলি।
মারাবিষ্ট হয়ে বসে রইলাম
বেথানে ছিলাম, সেইখানেই।

* * *
অজুত লাগল,
যুগ্ম সমবের শূন্য

আধো আলো, কটু গন্ধ,
জিজ্ঞাসার তিমিরে আবৃত শালবৃক্ষ।
আর বিশ্বের পুঞ্জীভূত
বেদনামালা
লতাশ্রেণীর আলিঙ্গন।
ওরা যেন একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করছে
আকাশ-গঙ্গার মন্ত্র-লাগা
মানব-হৃদয়ের মৌল প্রযুক্তিকে।”

* * *
“আকাশ-গঙ্গা নেমে এল
নেমে এল সমবের কাছে
মানুষের-বিষয় হৃদয়ের কাছে।
মাঠের হলুদ পাতার ভীড় তেলে,
চেউ তুলে বৃন্দব ঝপের দেশে।”

সেই মুহূর্তে কবির সাথে আমবাণ্ড ‘হৃদয় দিবে অশুভব করলাম এই
পৃথিবীর মোহিনী, মাথা।’ কিন্তু ঐ মোহিনী মাথাই তো পৃথিবীর
সব নয়—এখানে যে সমস্তা—তার খবর কে দেবে? ‘খবর বলছি’
কবিতার আছে—যে খবর

“ছাপা হয় না কোনদিনই,
—সেই খবর।
মনের গোপন অভিজ্ঞাবের খবর।
জীবনের মৌলিক সমস্তাব খবর।”

মধ্যবিভক্ত জীবন-যুদ্ধের নানা খবরে কবিতাটি মুগ্ধ। সহজ-সুন্দর
ভাষার মাধ্যমে আর হৃদয় উপহার তপে কাব্যগ্রন্থটি উপভোগ্য।
সাধারণ বিষয়বস্তুও উপস্থাপনার ক্ষেত্রে সাধারণের উল্লেখ স্থান পেয়েছে।
‘আকাশ-গঙ্গা’ বহু জনেরই অবকাশের সঙ্গী হবে। ছাপা ও বাঁধাই
ভাল। পুস্তকটির সমাদর কামনা করি।

লক্ষ্মী মজুমদার

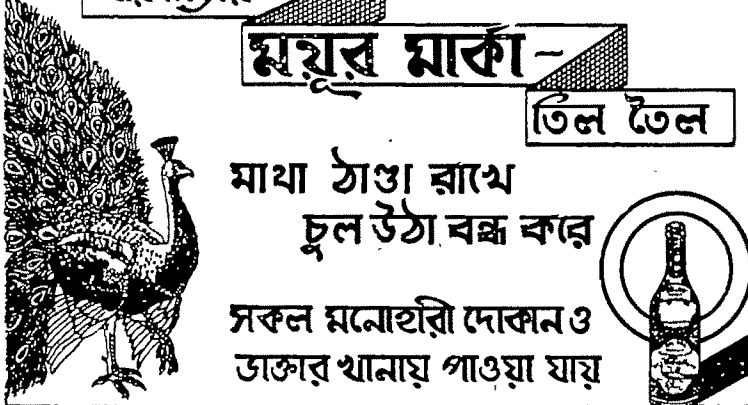
আর মিশ্রের—

ময়ূর মার্কা—

তিল তৈল

মাথা ঠাণ্ডা রাখা
চুল উঠা বন্ধ করে

সকল মনোহরি দোকান ও
ডাক্তার খানায় পাওয়া যায়



শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন ভক্তিমাত্রী প্রণীত
গীতামাধুরী—১২-০০

(শ্রীমদ্রামায়ণের মতামুযায়ী সর্বপ্রথম
গীতার বিশদ ব্যাখ্যা)।

জগদ্বিত্যুর সন্ধিস্থলে—৩

প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্য।

এস. চন্দ্র এণ্ড কোং

সর্বরকম সঙ্গীতপুস্তক ও যাবতীয় বাস্তব-
যন্ত্রের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা।

৪, ওয়েলসলি স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩



ফটোলাগের বদান্ধতা :

জন্মটি রাগের অন্তর্গত আনন্দের ফিড-মিসিং প্লাটের জন্ম ফটোলাগের অন্তর্গত গ্লাসগো ও ক্লাইড উপত্যকা ১০৮,০০০ পাউণ্ড ব্যয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। ব্রিটিশ "সুখা হইতে মুক্তি অভিযানের" অঙ্গ হিসাবে ফটো কমিটির চেয়ারম্যান লর্ড পলওয়ার্থ উক্ত পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন। এই অভিযানে ফটোলাগ মোট ব্যয় করিবে ৫০০,০০০ পাউণ্ড। এই কারখানাটি উৎকৃষ্টতর হুদ্র সরবরাহে সাহায্য করিবে।

দুর্গাপূজায় শালীনতা :

গত ১৭ই কার্তিকের আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীমন্তেন্দ্রনাথ বহুর পত্রখানি এখানে উদ্ধৃত হইল : "কলিকাতার মত বিরাট শহরে শুধু সার্বজনীন দুর্গোৎসবের সংখ্যার প্রায় এক হাজার হবে। এই উৎসবের যে একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে এবং এটা যে বাঙালীর জাতীয় উৎসব ও তার গুরুত্ব কতখানি তাহা বোধ হয় খুব অল্পাংশক সার্বজনীন পূজা কর্তৃপক্ষই অনুভব করে থাকেন। সেই কারণেই বোধ হয় অনিবার্ণ ক্ষেত্রেই এই উৎসবের প্রকৃত শিক্ষণীয় ও ধর্মের দিকটা উপেক্ষণীয় হবে থাকে এবং এর ভাবগাভীর্ষ অবহেলিত হয়ে একটা হালকা আনন্দের নেশা মস্ত হয়ে ওঠে অনেকেই। বিসর্জনের শোভাযাত্রা দেখতে লক্ষ লক্ষ মানুষ পথে দাঁড়িয়ে থাকেন, তার মধ্যে অনেকেই মা-বোন, ছোট ভাই আত্মীয়স্বজনও থাকেন। অথচ এই শোভাযাত্রার অনেক ক্ষেত্রেই থাকে না ভাবগাভীর্ষ, থাকে না শালীনতা-বোধ, নইলে বিসর্জনের শোভাযাত্রার ব্যাণ্ডের তালে তালে 'চিকা চিকা বুম' ও 'মন যে আমাব কেমন কেমন করে' এবং তার সঙ্গে অল্লীল ভদ্রোতে কোমর বাঁকিয়ে বিদেশী টুইস্ট নাচের অশুভ্রমের হুলা বাঙালী স্রুতি বেন নিয়গামী-তারই পরিচয় দেওয়া হচ্ছে। আইন করে এই রকম যারা করবে তাদের সাজা দেওয়া উচিত। অবশ্য সব সার্বজনীন যে এ রকম করেন এমন কথা আমি বলছি না। এমন সার্বজনীনও দেখছি যারা এসব থেকে অনেক উদ্ধেয় এবং সত্যই আদর্শমানীয়।"

প্রচার কার্যে সজ্জকণা :

সম্প্রতি বারাকপুরে প্রবর্তক সজ্জক সহযোগী সন্তা শ্রীশ্রী দাস ও প্রিয়রেশ দাসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত পূর্ণিমা সম্মেলনে সজ্জক উৎসর্গীকৃত অন্তরঙ্গী সন্তা কুমারী রেপুকণা বোম বোগদান করেন। স্থানীয় সজ্জক বিশেষ মহিলারা এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। কুমারী রেপুকণা এক ঘণ্টারও অধিক কাল সময় সজ্জ, সজ্জক ও সজ্জকনীর বিষয় বৈঠকীভাবে আলোচনা করেন। উপস্থিত সকলেই বেশ প্রীত হন এবং অনেকেই সম্মত করেন, যে, 'ইতিপূর্বে সজ্জকর কথা এমনভাবে আর কখনও শুনিনি।' সজ্জের একনিষ্ঠ ভক্ত শ্রী ও পরেশের আন্তরিক আপ্যায়ণ, বিনম্র আচরণ ও ঐকান্তিক গুরুভক্তি আবহাওয়াকে ভাব-গভীর মাধুর্যে প্রসন্ন ও চিত্তগ্রাহী করিয়া তুলে।

উদ্ভিদ হইতে দুধ উৎপাদন :

উদ্ভিদ হইতে দুধ উৎপাদন পদ্ধতিটি উদ্ভাবিত হইয়াছে ইংলণ্ডের গান্সটনের ভেজিটেবিলিয়ান নিউট্রিশনাল রিসার্চ সেন্টারের বিজ্ঞানীগণ কর্তৃক। তাঁহারা এই কাজে ব্যবহার করিয়াছেন বাঁধা কপির পাতা, মটর দানা ও অচ্ছাদিত শাক-সবজি। নিবৃত্তি অবস্থার মধ্যে উদ্ভুত জলে সবুজ পাতা চটকাইয়া লইয়া প্রোটিন বাহির করা হয়। এই প্রোটিনের সহিত মেশানো হয় ভিটামিন, মিনারেলস, উদ্ভিজ্জ চর্বি ও কার্বোহাইড্রেট। ব্রিটিশ বিজ্ঞানীগণ শাক-সবজি হইতে দুধ উৎপাদনের যে পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহা ভারত এবং এশিয়ার অচ্ছাদিত দেশেও করিতে পারেন। সবজি, চাষাবাদ এবং তরল শস্য হইতে দুধ প্রস্তুত হইতে পারে। প্রকাশ, ইতোমধ্যে দিল্লীতে অল্পরূপ একটি কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা লওয়া হইয়াছে।

শ্রীশ্রী মঞ্জুদাস

উৎসব অনুষ্ঠানে -

ইদ্র'র সন্দেশ

অপরিহার্য!

৮৬, আমহাষ্ট স্ট্রীট কলি: ৯
ফোন-৩৫-১৩৮৩

৬, নটবর দত্ত রো, কলি: ১২
ফোন-৩৪-২৫৩৩

সম্পাদক : শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি. এ. কর্তৃক পবিচালিত ও প্রকাশিত।

প্রবর্তক প্রিণ্টিং এন্ড হাক্টোন লিমিটেড, ৫২/৩ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রীকণিভূষণ রায় কর্তৃক মুদ্রিত।



জীবনের আলো

বেদ-প্রবর্তিত জ্ঞান ও কর্মে আত্মসম্পন্ন জাতির একটা নামকরণ করা হইয়াছে। কেননা, জ্ঞান থাকিলেই প্রতিষ্ঠান থাকিবে—সেই প্রতিষ্ঠানকে অতিহিত করার জন্য নামেরও প্রয়োজন থাকিবে। সেই নাম হিন্দু। হিন্দু বলিতে যদি কেহ মনে করেন যে ভিন্ন ধর্মের প্রতি বিদ্বেষী হইতে হয়, সে কথা মূল্যহীন। বেদ যেমন অপরোক্ষের সাক্ষরজনীন তত্ত্ব, হিন্দু নামটিও তাই, ইহা মানব মাত্রেই গ্রহণযোগ্য। বেদ-প্রতিষ্ঠ জাতির ভাষা বড় অপূর্ণ। প্রত্যেক বর্ণটি অন্তরঙ্গের আকৃতি স্বরূপ। প্রতি শব্দের ধাতুগত অর্থ সুনির্গত। হিন্দু বলিতে হিন্দু শব্দের উত্তর ছব খাত্ত ড প্রত্যয়-যোগে নিষ্পন্ন। অর্থাৎ হীনতাকে যে ঘৃণা করে সেই হিন্দু। মেক্সিকো আছে “হীনকে ঘৃণাতোব হিন্দুরিচ্যুচ্যতে”। বল তো ভারতবাসী বলিয়া গর্ব করা অপেক্ষা হিন্দু বলিয়া গর্ব করার গৌরব কি অধিক নয়? ভারতবাসী অপেক্ষা হিন্দুর মধ্যে বৃহত্তর সম্ভাবনা অধিক রহিয়াছে। হিন্দু তাই বৃহত্তর উপাসক। তাহার বেদান্তের ধর্ম ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য। অপরোক্ষের বেদবাদে হিন্দুমাঝেই আত্মশীল। হিন্দুই জাতীয় সংস্কৃতি ও সংহতির মূল ভিত্তি। আমাদের রক্তধারায় যে সনাতন সংস্কৃতি স্ফূট হইয়া আছে, তাহার প্রবাহ সৃষ্টি করার জন্য সংস্কৃতির মূল উৎস আবিষ্কার করাই আজিকার ভরুণদের একমাত্র ধর্ম ও কর্ম হউক। হিন্দুর সংস্কৃতি তাহার বেদ-ধর্ম শুধু হৃদয়ের বৃত্তির অশুশীলনকেই বড় করিয়া দেখে নাই, তাহার মস্তিষ্ক শক্তিরও অশুশীলন হৃদয়বৃত্তির অশুশীলনের সহিত তুল্য প্রয়োজন মনে করিয়াছে। প্রাণ ও দেহটাকেও হিন্দু বাদ দেয় নাই। তাহার পরিপূর্ণ মানবতাকেই প্রকাশ করিতে চাহিয়াছে ধর্ম-সাধনায়। হিন্দুর ধর্ম সংসারীকে বিরাগী করে না, বৈরাগ্যের উত্তরীষকে ধূলি ধূসরিত করে না। উহা সর্বাবস্থায় ঈশ্বরাত্মত্বের সঙ্কেত দেয়। ধর্মই হিন্দুর প্রাণ ও আত্মা। তরুণ হিন্দু সমাজ। স্বধর্ম-ভ্রষ্ট হইও না। আপনার মধ্য হইতে সকল হীনতাকে বিসর্জন দিয়া উন্নতশীল হইয়া বল—“অহং দেব ন চান্মোহস্মি।”

(পুরাতন ‘নবসজ্জ’ হইতে)

সজ্জগুরু শ্রীমতিলাল

ঋগ্বেদ

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ (প্রথমঃ অষ্টকং । সপ্তত্রিংশং যজ্ঞং ।) চতুর্থী ঋক্

(সম্বৎসর ত্রীমতিলালের জীবন-ভাষ্য অনুসরণে)

ত্রীঅনিলবরণ তর্কবেদান্ততীর্থ

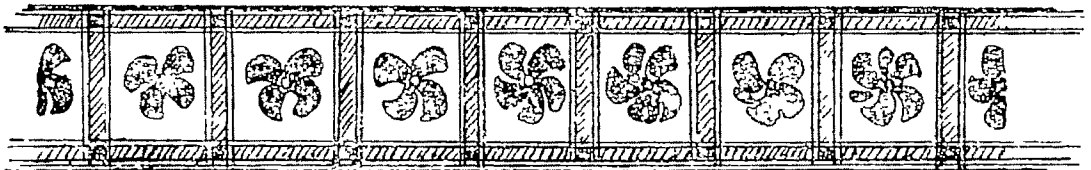
প্র বঃ শর্দ্বায় য্হায় হ্বেষ হ্যায় শুশ্বিনে ।

দেবন্তং ব্রহ্ম গায়ত ॥ ৪

অর্থ—“হে ঋত্বিজঃ (হে ঋত্বিকগণ) “বঃ” (তোমাদের) “শর্দ্বায়” (প্রহসনশীল) “য্হায়” (শত্রু ঘর্ষণকারী) “হ্বেষহ্যায়” (দীপ্যমান যশোবিশিষ্ট) “শুশ্বিনে” (অমিত শক্তিশালী) [মরুদেবগণের নিমিত্ত] “প্র-গায়ত” (প্রকৃষ্টরূপে স্তব কর) [যেহেতু] “দেবন্তং” (দেবাত্মগ্রহে লব্ধ বা প্রাপ্ত হওয়া) “ব্রহ্ম” (অম্বকে) ॥৪

সরলার্থ—হে ঋত্বিকগণ । তোমাদের প্রহসনশীল, শত্রুঘর্ষণকারী দীপ্যমান যশোবিশিষ্ট অমিত বলশালী মরুদেবগণের নিমিত্ত প্রকৃষ্টরূপে স্তব কর—কারণ মরুদেবগণ দেবতা—তাহাদের অম্বগ্রহেই আমরা অম্বব্রহ্মকে প্রাপ্ত হই ॥৪

বিশদার্থ—এই ঋগ্বেদের লক্ষ্যণীয় পদ “দেবন্তং ব্রহ্ম” । দেবন্তং পদটি—দেবগণ কর্তৃক দত্ত—এই বাক্যে সিদ্ধ । পূর্বেই বলা হইয়াছে—মরুদেবগণ দেবতা, সেই দেবতার আামাদের দান করেন “ব্রহ্ম” । ব্রহ্মপদের প্রতিবাক্য আচার্য সায়ন দিয়াছেন—“হবিস্করণং অম্বং” । মরুদেবগণের অম্বগ্রহেই আমরা অম্বব্রহ্মকে প্রাপ্ত হই । এবং সেই অম্ব হইতে ভূতসমষ্টির উৎপত্তি—“অম্বাং ভবন্তি ভূতানি” । সুতরাং যে মরুদেবগণ পৃথিবীতে অম্বস্রষ্টির উপাদান কারণ, তাহারা নিঃসন্দেহে উপাস্ত দেবতা । তাহাদের প্রকৃষ্টরূপে স্তব করা, বন্দনা করা প্রত্যেক ঋত্বিকেরই অবশ্য করণীয় কর্তব্য । এই মন্ত্রে ঋষি এই কথাই যজমানদের শ্রবণ করাইয়া দিতেছেন । মরুদেবগণের প্রকৃত পরিচয় ঋষি নিজেই পরবর্তী মন্ত্রে প্রদান করিবেন । এই মন্ত্রে শুষ্ “শর্দ্বায়, য্হায়, হ্বেষহ্যায় শুশ্বিনে”—এই বলিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন । ঋষির এই বিশেষণগুলি হইতেও মরুদেবগণ সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করা যায়—“শর্দ্বায়” পদের অর্থ “প্র-হসনশীল” । প্রকৃষ্টরূপে হাস্যশীল যিনি—যিনি আনন্দ দান করেন, তাহাকেই আনন্দময় পরম পুরুষ বলা হয় । “হ্বেষহ্যায়” পদের “হ্বেষ” ও “হ্যায়” দুই-ই দীপ্তির ভাব প্রকাশ করে । তাহা হইতে তাহারা যে দীপ্যমান তাহা অস্বাভাবিক করা যায় । আবার মহামতি বাস্তব মতে তাহারা অম্বদানকারীও—কারণ, তিনি বলেন হ্যায়ং দ্যোততের্শোবাম্বং বা—হ্যায় শব্দে দ্যুতি, যশ বা অম্বকে বুঝায় । “য্হায়” পদে শত্রুকে ঘর্ষণ বা বিমর্দন বুঝায় আর “শুশ্বিনে” পদের অর্থ হয় বলবিশিষ্ট । বল নামসমূহ মধ্যে শুষ্ক, শুষ্ক এইরূপ পাঠ আছে—“শুষ্কং শুষ্কমিতি বলনামস্তু পাঠাৎ” ॥ ঋষির এই বিশেষণগুলি হইতে পাওয়া গেল মরুদেবগণ ভূতসকলের আনন্দদায়ক, অম্বগ্রহকারী, তাহারা অম্ব দীপ্যমান, শত্রুঘর্ষণকারী এবং অমিত বলশালী ।



হে পুরাণ কবি !

স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী

ব্রহ্মসি যদি বহিস্ত্বং মন্দিরং পশ্যসীশং
মনসি তমহুপশ্যেৎ স্যাদ্ যদি ধ্যাননেত্রম্ ।
বহিরপি পুনরন্তঃ পশ্যতি ব্যাপিনং ত—
মখিলমহুবিশন্তং যঃ কবিঃ ক্রান্তদর্শী ॥

বিশ্বনাথ কোথা মোর ঘরে—

ভেবে যদি যাও ঘরের বাহিরে দেবতা মন্দিরে ;

মন্দির মাঝারে দেখি বিশেষরে,

অখণ্ড স্তুতদীপালোকে, কর নতি স্তবস্তুতি কত, করষোড়ে ॥

দেবতার নির্মাল্যের জল,

আর অশ্রুজলে, যদি ধুয়ে দেয় এ নয়ন কুহক অঞ্জন,

অখণ্ড সে দীপালোকে

সুটে ওঠে স্নিগ্ধ শুভ্র আলোময় ধ্যান নয়ন ।

তাহ'লে, আপন ঘরে একান্ত নিভুতে,

পুতোজ্জ্বল মানস আসনে হের দেবতার ভব, যত সাধ

জ্যোতীরস স্থান ॥

এ মানসপূজা তবু সাজহীন,

কোন মহাবিপুলের প্রতীক্ষায় !

অসীম সে ভূমা রসজ্যোতি,

বাহিরে অন্তরে, এখানে সেখানে, দিনযাম ভেদ কুঠাহীন ।

তাই সেই আরাধ্য পরমে,

অখিলের প্রাণের স্পন্দনে, অনন্ত পুলকে, অখণ্ড আলোকে,

স্বরে ছন্দে লয়ে, নিত্যলীলাপর,

নৃত্যপর, অমূল্য তোমা হেরিবারে,

সর্ব ভেদ সীমানার পারে,

হে পুরাণ কবি !

কবে দিবে কবিদৃষ্টি দান, ভুবনভরণ ভগবান !

স্বামীজীর সাহিত্যচিন্তা ও ভাষাসমীক্ষা

শ্রীমনীষীমোহন রায়

স্বামী বিবেকানন্দের সাহিত্যচিন্তা এবং ভাষাসমীক্ষার সার্বিক ভাবস্বরূপ সম্পর্কে আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণে সচেতন নই। সাধারণ মানুষ এবং স্বল্পবিস্তৃত মননশীল মানুষের চোহন্দির বাইরেও তাঁর পরিচয় মূলতঃ আধ্যাত্ম-উজ্জীবন যজ্ঞের অন্ততম প্রধান ঋত্বিক হিসেবে।

কিন্তু বাংলা গদ্যসাহিত্য যে তাঁর রচনাশৈলীর স্বচ্ছন্দ বর্ণিকান্ডজিতে এক পরিশীলিত রূপ পরিগ্রহ করবার অবসর পেয়েছে, সে সম্পর্কে আমাদের অনীহা গীমাহীন। যদিও এই অনীহার গভীরে কোন সচেতন প্রয়াস অল্প-প্রবেশ করেনি, তবুও জাতির জ্ঞানার্জনী চেতনায় এঘবিধ অনীহা আত্মহননের নিকটবর্তী। বাংলা সাহিত্যে চলতি ভাষা প্রবর্তনের প্রাথমিক ভিত্তি তাঁর দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত—যার ফলে বাংলা ভাষাশিল্পের মূহুয়

অবয়বে এক চিন্ময় সত্তা অধিষ্ঠিত হবার অবকাশ পেলো। আর উত্তরকালে তাঁর এই মৌল-প্রয়াসই বাংলা ভাষা-শিল্পে অগ্রগতির আলোকবর্তিকা প্রজ্জ্বলিত করলো।

তাঁর প্রচেষ্টাতেই সবার আগে বহির্বিশ্বের বিদগ্ধ-মানস ভারত-আত্মার মর্মবাণী সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত হন। তিনি শুধু বহির্বিশ্বই ভারতের অমহান আদর্শের বাণী শোনান নি, চিন্তানিষ্ঠ মনে তিনি প্রতীচীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের আত্মপূর্বিক অমূল্যলনের গভীরে ছিলেন অন্তর্লীন। রবীন্দ্রনাথের প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে, “বিবেকানন্দ পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিষাছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষকে সংকীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জড় সঙ্কুচিত করা তাঁহার

জীবনের উপদেশ নহে।.....তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবার ক্ষমতা নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।”

রবীন্দ্রনাথের এই প্রজ্ঞা-প্রদ্ব্যাপিত উক্তির মধ্যে স্বামীজীর সংস্কারমুক্ত এবং বিজ্ঞানময় মানসিকতার নিদর্শন নিহিত আছে। বিবেকানন্দ অমূল্য করেছিলেন, প্রতীচীর অনবচ্ছিন্ন বিজ্ঞানের অন্বেষণ পার্থিব অভাব-মোচন, অন্নবস্ত্রের সংস্থান এবং জাগতিক আধিব্যাধি হতে পরিত্রাপণ পাবার ক্ষমতা নানা জাতের ক্রিয়া-প্রকরণের উদ্ভাবন করেছে। আর পতনমুখী ভারতবাসীকে মাহুশের মতো বাঁচতে হলে প্রতীচীর কাছে অপরাবিচার শিক্ষা-নবীশী করতে হবে। এমন কি পাশ্চাত্যের টেকনলজি ও যন্ত্রশিল্পের উন্নয়নকেও তিনি অমূল্য প্রাণিত করেছিলেন, ভারতবাসীকে সোচ্চারে আহ্বান জানিয়েছিলেন তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে। তবে অবিকল অমূল্য নয়, সমস্ত চৈতন্য দিয়ে অর্জন করতে হবে পাশ্চাত্যের এই বৈজ্ঞানিক উন্নয়নকে।

ভারতীয় আত্মার জারক রসে তাকে করে নিতে হবে জারিত। তিনি বারংবার সাবধানবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন পরামুচিকীর্ষার আত্মঘাতী মোহে আমরা যেন আমাদের জাতীয় প্রাতিশ্রুতিকাকে বর্জন না করি। সমগ্র জীবন তিনি ভারতবাসীর জীবনচর্যা এবং মানসিকতার মান-উন্নয়নে বিনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর এই কর্মযোগী-মানসেরই একটি অমূল্য হিসেবে তিনি প্রথম বাংলা ভাষায় অনায়াস গতিচ্ছন্দের নান্দীপাঠ করেন। তাঁরই এষণানিষ্ঠ-চৈতন্য এবং যুক্তি আশ্রয়ী বোধিতে সবার আগে উন্মীলিত হ'ল ‘বুদ্ধ থেকে চৈতন্য’ রামকৃষ্ণ পরমহংস ষাঁরা লোকহিতৈষণায় এসেছেন তাঁরা সকলেই তাঁদের উপদেশ বাণীকে সর্বজনবোধ্য কথ্যভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করে এসেছেন।

এর কারণ স্বামীজীর মূদ-মানসবেগ আধ্যাত্ম-উজ্জীবন যন্ত্রের পৌরোহিত্যে নির্ধিকল্প হলেও কিশোর-কাল হ'তেই তিনি সাহিত্য এবং সঙ্গীতশিল্পের অমূল্য-সন্ধিৎসু অমুরাগী ছিলেন। যৌবনে তাঁর এই অমুরাগের ব্যাপ্তি আরও সুবিস্তৃত হয়েছিল বিচিত্ররূপে। তাঁর

রামকৃষ্ণদেবের উদ্দেশ্যে রচিত বন্দনাসঙ্গীত এবং অন্যান্য সঙ্গীতগুলি অলৌকিক আধ্যাত্ম-ব্যঞ্জনা এবং উচ্চ অঙ্গের কাব্যগুণের সায়ুজ্যে পরিশীলিত। তাঁর ‘নাহি সূর্য্য, নাহি জ্যোতি নাহি শশাঙ্ক সুন্দর’ গানটি শুনে একবার মহাকবি গিরিশচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভাই শ্রীযুক্ত অতুলবাবু উচ্ছ্বসিত হয়ে মন্তব্য করেছিলেন, ‘এই গানটা যে বাঁধতে পারে সে একটা বড়লোক—এই একটা গানের জন্ত সে জগতে বিখ্যাত হয়ে থাকবে।’

এ ছাড়া বিভিন্ন অবসর সময়ে বন্ধুজনের সঙ্গে তিনি প্রতিনিয়তই সাহিত্য সম্পর্কে যুক্তিনিষ্ঠ তথ্যবাহী আলোচনা করতেন। সেই আলোচনা যেমন সাহিত্য-বোধে জাহ্নবী, তেমনি ছিল নিরপেক্ষতায় অসীম সাহসিক। তাতে ভারতচন্দ্র, শ্রীমধুসূদন হতে শুরু করে বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত সকল কবি সাহিত্যিকের কথাই বিশদভাবে আলোচিত হত। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের বিস্তীর্ণ ক্রৌঞ্চবিচ্যুতির কথা তিনি প্রায়শঃই উল্লেখ করতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের সাহিত্যগুণগত বৈশিষ্ট্য এবং আধ্যাত্মব্যঞ্জনার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। শ্রীমধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের তিনি ছিলেন একজন রসবেত্তা সমালোচক। এই সকল সমকালীন বাংলা সাহিত্য ছাড়া ঋণদী সাহিত্য বিশেষ করে মহাকবি কালিদাসের মেঘদূতের এবং শকুন্তলার মধুর গম্ভীর ভাবকে তিনি সম্যকভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। সুধী এবং বন্ধুজনের কাছে এই অমূল্য কাব্য সৃষ্টির অলোকসামান্য কাব্যগুণ, বর্ণাঢ্য চিত্ররূপময়তা ও ভাব এবং অভিব্যক্তির সূনিপুণ ভাষা উপস্থাপিত করেছিলেন।

সুতরাং ভাষা এবং সাহিত্য সমীক্ষার অধিকার ছিল তাঁর স্বোপার্জিত। জন্মস্বত্বেরই তাঁর মৌল-মানসতার সঙ্গে এই দুর্লভ গুণটি ছিল অমূল্য। তিনি অমূল্য করেছিলেন জ্ঞানবিজ্ঞানের দুর্লভ জটিল গিরিপথে আলোকপাত করবার সময় যে ভাষায় আমরা মনে মনে অনুশীলন করি—মনের ভাবনা এবং অমূল্যতার লিখিত রূপাংগে সেই ভাষাই যথোপযুক্ত। তাছাড়া নানারকম অলঙ্কারের আতিশয্যে ভাষাকে অহেতুকী দুর্বোধ্য করে তোলাবার মধ্যে কোন সারবত্তাই থাকতে পারে না। তাতে

ভাষার অনার্যাস গতি হয় ব্যাহত, বক্তব্যে জটিলতা বেড়ে যায়। তাই সে ভাষা আমাদের কর্ণেল্লিয়কে ছন্দোবদ্ধভাবে অল্পরপিত করলেও মর্মের সূক্ষ্মত্বীতে আন্দোলন তুলতে হয় অসমর্থ।

তারপর বর্তমান যুগ কর্মব্যস্ততার যুগ। * পৃথিবী আজ ‘চরৈবেতি’ মহামন্ত্রে দীক্ষিত। রবীন্দ্রনাথের অলৌকিক কথায়, “...পৃথিবীতে যেখানে এসে তুমি থামবে, সেখান হতেই তোমার ধ্বংস আরম্ভ হবে। কারণ তুমি কেবল একলা থামবে আর কেউ থামবে না। জগৎপ্রবাহের সঙ্গে সমগতিতে যদি চলতে না পারো তো প্রবাহের সমস্ত সচল বেগ তোমার উপর এসে আঘাত করবে, একেবারে বিদীর্ণ বিপর্যস্ত হবে, কিংবা অল্পে অল্পে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে কালপ্রোত্তের তলদেশে অন্তর্হিত হবে। হয় অবিশ্রাম চলো এবং জীবনচর্চা করো, নয় বিশ্রাম করো এবং বিনুস্ত হও, পৃথিবীর এই রকম নিয়ম।”

তাই স্বামীজী ঘোষণা করলেন, ভাষাকে করতে হবে ইম্পাতের মতো ধারালো। তাকে করে তুলতে হবে সর্ব-সাধারণের বোধ্য। ডাকসাঁইটে সারস্বত সমাজের কুক্ষিগত আবেষ্টনীতে তাকে আর বন্দী করে রাখা চলবে না। তিনি নান্দীপাঠের মন্ত্র উচ্চারণের হলেন অগ্নি মুখ : ‘নতুন ভারত বেরুক। বেরুক লাঞ্ছনা ধরে চাষার কুটার ভেদ করে, জেলে-মালা-মুচি-মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হ’তে।’

বেরুক মুদীর দোকান থেকে, ডুণাওয়ালায় উহুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড়তল পাহাড় পর্বত থেকে।’

কি সূক্ষ্মাত্মক ব্যঞ্জনা আশ্রয়ী কুরখার ভাষা। প্রতিটি শব্দ যেন গতির মশাল জ্বালিয়ে এগিয়ে চলেছে—

যার প্রতিভাসে বক্তব্যের অন্তর্নিহিত সত্তা হয়ে উঠেছে বাস্তব। বাংলা ভাষাশিল্পের বিবর্তনের ইতিহাসে সম্পূর্ণ এক অনাবিষ্ট অধ্যায়ের প্রতি অল্পম আন্দোলকপাত। রবীন্দ্রনাথ বা প্রমথ চৌধুরী (বীরবল) আগে বাংলার



কোন কবি-সাহিত্যিক অথবা মননশীল মনীষী এই অনাবিষ্ট অধ্যায়ের প্রতি এতখানি ভোরালো হুরে গুরুত্ব আরোপ করেন নি। তাই তিনি গদ্যাশিল্পের জ্ঞানকর্তার মতো ১৯০০ খৃষ্টাব্দে “বাংলাভাষা” প্রবন্ধে ঘোষণা করলেন, ‘চলতি ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না ?

স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তৈয়ের করে কি হবে। যে ভাষায় ঘরের কথা কও, তাতেই তো সমস্ত পাণ্ডিত্য, গবেষণা মনে মনে করো। তবে লেখবার বেলায় ও একটা কিস্তিতকিমাকার উপস্থিত কর ?.....

স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ, দুঃখ, ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতেই পারে না।...ও ভাষায় যেমন জোর, যেমন অঙ্গের মধ্যে অনেক, যেমন ঘেদিকে ফেরাও সেদিকে ফেরে, তেমন কোন তৈরী ভাষা কোন কালে হবে না। ভাষাকে করতে হ'বে যেন সাক্ষ ইম্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে কে সেই—এক চোটে পাথর কেটে যায়, নীত পড়ে না।'.....

কিন্তু এখানেই স্বামীজী থেমে রইলেন না। সচেতন ভাষাবিজ্ঞানীর মতো বিজ্ঞানময় যুক্তিনিষ্ঠার সঙ্গে আরও আগ্রহান হলেন। “যদি বল”, “ও বেশ ও কথা বেশ ; তবে বাংলাদেশের স্থানে স্থানে রকমারি ভাষা, কোনটি গ্রহণ করবো ? প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে, সেটিই নিতে হবে ; অর্থাৎ এক কলকেতার ভাষা। পূর্ব পশ্চিম যেদিক হ'তেই আসুক না, একবার কলকেতার হাওয়া খেলেই দেখছি, সেই ভাষাই লোকে কম। তখন প্রকৃতি আপনি দেখিয়ে দিচ্ছেন যে, কোন ভাষা লিখতে হবে।”...বললেন “গ্রাম্য দৈর্ঘ্যটিকে এখানে জলে ডাসান দিতে হবে।”

তারপর নানা উপমার স্নানপুণ বিনিয়োগে আর বিভিন্ন উদাহরণের যথাযথ অল্পপানে তাঁর এই সূচিস্তিত মতকে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন—যা প্রত্যক্ষভাবে না হ'লেও অন্ততঃ পরোক্ষভাবে আগামীদিনের বাংলার সাহিত্যিক-মানসে নতুন চেতনার ফলবান উপকরণ হয়ে উঠলো।

স্বামীজীর অস্ত্রাত্মক রচনা, তাঁর এই মননশীল অল্পপানেরই অল্পম ফলশ্রুতি। “ভাববার কথা”র অস্ত্রাত্মক রচনা “প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য” এবং “পরিব্রাজক” তার প্রামাণ্য নথিপত্র। একাধিক খণ্ডে বিধৃত “পত্রাবলী” কোন কোন বাংলা চিঠিও এই মনোভঙ্গির বিধৃত স্বাক্ষর বহন করে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ স্বামীজীর “প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য” গ্রন্থের ভাব ও ভাষা সম্পর্কে

ছিলেন অপরিণীত সোচ্চারে পঙ্কমুখ। “প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য” গ্রন্থটি থেকে যে কোন অংশ উদ্ধৃত করা চলে। কিন্তু পংক্তি বিশেষ উদ্ধৃত করে প্রবন্ধের আকার দীর্ঘ করা নিপ্রয়োজন। প্রতিটি লাইনই ভাষাশিল্পের অনায়াস কার্যকর্মে প্রোক্ষল—আদ্যস্ত তাতে বাচনিক কৌশলের একটি সরস উজ্জল্য প্রতিবিম্বিত। প্রকাশভঙ্গির অগ্নি-গর্ভ বলিষ্ঠতার সঙ্গে কৌতুক এবং শ্লেষের এমন সরস দীপ্তির বিচ্ছুরণ তাঁর আগে কোন বাঙ্গালী কবি সাহিত্যিকের লেখনী হ'তে নিঃসৃত হতে দেখা যায় নি।

কিন্তু এখানেই শেষ কথা নয়। বিবেকানন্দ শুধু ভাষাশিল্পের সংস্কার সাধন অথবা ভাষা সমীক্ষকের দায়িত্বশীল ভূমিকাই গ্রহণ করেন নি, কবিতার আদিক এবং অদ্বিষ্ট সম্পর্কেও সংস্কারমুক্ত এবং শিল্পসম্মত নির্দেশ দিয়ে গেছেন। তাঁর কথায়, “দেখ, কবিতার পদ মিলানো যেন ছোট ছেলের মাথ আধ কথার মত। যেন নাকিস্তর ডাঁড়া—ভাবটা কবিতায় প্রকাশ করলেই হ'লো, রূপ নিয়ে অত মারামারি কেন।”

কিন্তু এখানেও শেষ কথা নয়। বিবেকানন্দ শুধু ভাষাশিল্পের সংস্কার সাধন অথবা ইঙ্গিত দিয়েই ক্ষান্ত ছিলেন না। তিনি চন্দ্ৰভি ভাষায় রসোত্তীর্ণ সাহিত্যও রচনা করে গেছেন। ‘পরিব্রাজক’ গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ সম্পদ। চিরকালীন সাহিত্যিক-মানস তাঁর এই ভ্রমণকাহিনী গ্রন্থটির মধ্যে অপরূপ লাভদাময় সাহিত্যরস আশ্বাদন করবেন। অলোকসামান্য শিল্পী-শোভা সম্বিত ভাষার সচ্ছন্দ গতিদৌন্দর্ভের একটি শুচি-স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ আমাদের চোখে এসে পড়ে—যা আমাদের সমস্ত চৈতন্যকে পৌঁছে দেয় আনন্দলোকে। স্বামীজী এখানে স্বজ্বাক, সংযতভাষ—অত্যন্ত শিল্পসম্মত এবং পরিমিত তাঁর পদচারণা ; অথচ বেশ বোঝা যায় তাঁর অন্তরে তীব্র আবেগের সামান্যতম দীনতাও অবশিষ্ট নেই। এ যেন বিদ্রুতে সিঁদুর ব্যাপ্তি। এখানেই বোধ হয় সার্থক সাহিত্য-সৃষ্টির চরম পরাকাষ্ঠা। এই শিল্পসম্মত পরিমিতবোধ নিঃসংশয় মহৎ সাহিত্যের লক্ষণাক্রান্ত।

এ ছাড়া স্বামীজীর প্রবন্ধগুলি বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের আকাশে এক নতুন আলোর রশ্মি এনেছে ; বাংলা



শিল্পীঘন

— শ্রী ব্রজলাল ঘোষ —

(পূর্নানুষ্ঠান : অগ্রহায়ণ সংখ্যার পর)

স্বাক্ষাতিস্বাক্ষ কাক, —বসন ভূষণের ভাঁজ, কঙ্কণ-কুণ্ডলের প্রতিটি দানা, আঙুলের নখের কোনটুকু, অস্পষ্টতা নেই কোথাও। পুষ্পস্তবকের প্রতিটি পাপড়ি, অপরটির সঙ্গে সমতুল। অশ্বঘৃষ্যবলাকা একটির সঙ্গে অষ্টটির কোন পার্থক্য নেই। এ যেন মাটির উপর ছাঁচ বসানো হয়েছে।

দেবকুমার দেখে, মাঝে মাঝে মূর্তিগুলির উপর হাত বুলায়। এমন নিখুঁত ও সমতুল রেখা কি করে খোদাই করা সম্ভব, তাই ভাবে, দেখে আর তন্ময় হয়ে যায়। বেলা বেড়ে চলে।

সাহিত্যের ভাণ্ডার সংবর্ধিত হয়েছে বিচিত্র সম্ভারে। ভাষার সুগন্ধীর শব্দ সঙ্গীতে সমুদ্রতরঙ্গের মতো হৃন্দের ধ্যানগঞ্জীর বাণী নিনাদিত হয়েছে। বুদ্ধদেবনির মতো সেই বাণীশিল্পের অলৌকিক ধ্বনি আমাদের মনলোকে, আত্মলোকে রসোত্তীর্ণ ব্যক্তনার এক চিত্ররূপনয় সৌর-মণ্ডলের সৃষ্টি করেছে। সেই আলোকময় সৌরমণ্ডল

অপরাক্ত বেলায় মোটামুটিভাবে অর্ধেকটা দেখে দেবকুমার মন্দিরের পিছনের ঘাটে এসে দাঁড়ালো। জলের উপর তখন সূর্যের শেষ রশ্মি এসে পড়েছে, আকাশে লাল আবিরের আভাষ। দেবকুমার সেইদিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়ালো, ভাবলো আজ এই অবধিই থাক, কাল আবার আসবো।

দেবকুমার ঘাটের চাতালে বসে পড়লো। আকাশে ক্ষণে ক্ষণে মেঘের রঙ বদলাচ্ছে, মীচে হ্রদের জলে তারই ছায়া। দমকা বাতাসে জলের উপর ছোট ছোট ঢেউ উঠছে। ওদিকে খেজুর গাছের রেখা একখানি সবুজ সীমানা টেনে দিয়েছে, এদিকে পর পর মন্দিরের চূড়া মাথা তুলেছে। মন্দিরের আড়ালে পড়েছে জনপদ। মন্দির, হ্রদ আর খজুরবীথি ছাড়া কোথাও কিছু নেই। গাছের মাথায শুধু পাখীর কাকলি জীবন্ত জগতের মুখরতা।

শীতের সন্ধ্যায় এই সময় ঘাটে কেউ থাকে না। এই নির্জনতাই দেবকুমারের কাছে প্রিয়। আবাল্য মাহুষের সঙ্গ তার ভাল লাগে না। একান্তে বসে মন নিয়ে খেলা করতে তার ভাল লাগে।

কোন একসময় ওদিকের এক ঘাটে এক গৈরিকধারী সন্ন্যাসীকে দেখা গেল। সন্ন্যাসী ঘাটে নেমে হাত পা মুখ ধুয়ে এদিকে তাকালো। দিনান্তের শেষ আলোয় সেই মুখ স্পষ্ট হয়ে উঠলো। দেবকুমার চমকে উঠলো— এ কি সেই ছেলেধরা সন্ন্যাসী। দেবকুমার তালো করে ঠাहर করতে চাইল, কিন্তু দেবকুমারকে এদিকে বসে থাকতে দেখে সন্ন্যাসী গামছায় হাত মুখ মুছতে মুছতে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করলো।

ঠিক সেই সময় দেবকুমারের কাছে সাড়া তুললো

আমাদের অজ্ঞানতার অন্ধকারে জ্ঞানের বহুশিখা জ্বালিয়ে দেয়। সংকীর্ণ জীবনের গাভী হ'তে মহৎ জীবনের ব্যাপ্তির মধ্যে, অশান্তি থেকে শান্তির কোমল গাছারে, অসত্য ও অসুন্দর থেকে সত্যসুন্দরের অমেঘ জ্যোতির্লোকে পৌঁছে দেয়। আমাদের বিবুদ্ধ-আত্মা মুক্তির মহামন্ত্রে উজ্জীবিত হয়।

কল্যাণ, মন্দিরের বারান্দা থেকে বলে উঠলো—তাই তো বলি মাহুঘটা গেল কোথায়? মন্দির ছেড়ে চলে যাবার মাহুঘ তো সে নয়।

কল্যাণ নেমে এলো। দেবকুমার বললো—সেই সম্যাসীকে যেন দেখলাম। এই মাত্র চতুর্থ মন্দিরের ঘাট থেকে সে উঠে গেল। সে-ই পুরুতের ছেলেধরা সম্যাসীটা।

কল্যাণের তখন সেদিকে মন ছিল না, বললো—সে এখানে এসেছে? হবে।

—চল না, একবার খবর নিই গে।

—সে খবরের জন্ত বেশী কষ্ট পেতে হবে না। আগে চল আমরা কঙ্কুরী কাছে যাই। এইটাই তার সঙ্গে সাক্ষাতের প্রশস্ত সময়।

দেবকুমারকে নিয়ে কল্যাণ সামনের রাজপথে এলো।

দোকানগুলিতে তখন আলো জ্বলছে। সকালের চেয়ে লোক চলাচল অনেক বেশী। সকালে রথ ও গরুর গাড়ী দেখা যায় নি। এখন রথেরই ভীড় বেশি। সৌখীন লোকেরা নিজেরাই রথ চালাচ্ছে। ঘোড়ার গলায় ঘুঙুর বাঁধা, ঝুম্‌ঝুম্‌ করে আওয়াজ তুলে ছুটেছে। গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানদের সাদা উঠছে—পথ ছাড়ুন, পথ ছাড়ুন! সন্ধ্যার এই অবকাশটুকু নাগরিকেরা উপভোগ করে, উত্তরাপথের সব বড় বড় জনপদেই এই রীতি। দিনের কাজ শেষে সন্ধ্যায় আরাম কর।

নটরাজ মন্দিরের তোরণে পানওয়ালী বসেছিল, করেকজন যুবক খরিদারকে হাসি ও পান একসঙ্গেই বেচছিল। এবেলা তার সাজসজ্জায় বেশ একটু চটক আছে, চোখে কাঁজল, কপালে টিপ, নীল ওড়না গলায় জড়ানো। চটকদার কমবয়সী পানওয়ালী তরুণ খরিদারদের জমিয়ে তুলেছে।

কল্যাণ একপাশে গিষে দাঁড়ালো, বললো—পান দাও।

পানওয়ালী তাকে দেখে বললো—বলে রেখেছি, এই সময় উনি আপনার জন্ত অপেক্ষা করছেন। কি হয় যাবার সময় বলে যাবেন।

পানের একটা দোনা হাতে নিয়ে কল্যাণ অগ্রসর হলো।

চতুর্থ মন্দিরের তোরণ পার হয়ে, ভিতরের প্রাঙ্গণে একটি অশ্বথ গাছ, গাছের নীচে ছুটি মাহুঘ বসে গাঁজা খাচ্ছিল। একজনের গায় রঙীন বুটদার চাদর আরেকজন গৈরিকধারী। চাদরধারীর সামনে পানের দোনাটি রেখে কল্যাণ বললো—নমস্ते।

মুখ থেকে কল্কেটা না নামিয়ে তিনি মাথাটা একটু দোলালেন, বসবার ইঙ্গিত করলেন বোধ হয়।

কল্যাণ বসে পড়লো, দেবকুমারকেও বসতে ইঙ্গিত করলো।

এবার দেবকুমার গৈরিকধারীর মুখের পানে ভালো করে তাকালো। ভুল নেই, প্রায় অন্ধকারেও স্পষ্ট চেনা গেল,—এ সেই সম্যাসী। দেবকুমার কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কল্যাণ তার হাতে একটু চাপ দিলে। দেবকুমার বুঝলো, কল্যাণ তাকে চুপ করে থাকার জন্ত ইঙ্গিত করছে। সম্যাসী তাদের দিক থেকে মুখ ফেরালো, সে যে তাদের চেনে এমন কোন ভাব প্রকাশ পেল না।

কল্কেটা সম্যাসীর দিকে এগিয়ে দিয়ে রক্তাক্ত চোখে চাদরধারী এবার বললো—কি সংবাদ, বল? তুমি তো এখানে ছিলে না বলে শুনেছিলাম।

—হ্যাঁ, মণ্ডলেশ্বর যাবো বলে বেরিয়েছিলাম, পথে অসুস্থ হয়ে ফিরে আসতে হলো। কাল ফিরেছি।

—এখন শরীর ভাল তো?

—হ্যাঁ, আপনার কাছে একটা নিবেদন জানাতে এলাম।

কঙ্কুরী মুখ তুললো।

কল্যাণ বললো—স্বামীশ্বর তো এবার রাজ্যাভিষেক উৎসব হবে, এখান থেকে নানা উপহার যাবে। আমরা সেই সঙ্গে নৃত্যগীতের একটা আনুষ্ঠানিক দল নিয়ে যেতে পারি না? অবশ্য এ সম্পর্কে আপনিই যথাযথ নির্দেশ করতে পারেন।

পানের দোনা থেকে ছুটি পান একসঙ্গে মুখে পুড়ে প্রসন্ন মনে কঙ্কুরী বললেন—কথাটা আমার মনে আছে। আজকালের মধ্যে একটা উপযুক্ত অবসর পেলেই রাজকুমারের কাছে আমি কথাটা তুলবো। তোমার শ্রীমতীকে সঙ্গে নিতে পারবে তো?

—শুধু শ্রীমতী কেন, আরও দু-একজনকে নিতে পারি।

—তা নাও, কিন্তু শ্রীমতী না থাকলে দলের মর্যাদা থাকবে না। তুমি ইতিমধ্যে একটা গানের পালা বেঁধে ফেলো।

—শুধু গানই নয়, কিছু নাচ দেবারও ইচ্ছা আছে।

—নাচ? তেমন নাচিয়ে কই যে তোমার শ্রীমতীর সঙ্গে ভাল রাখতে পারবে।

—চঞ্চলী গেলে কেমন হয়?

—পানওয়ালী? ও কি আর আগের মত আছে। ছেলে ছোকরার সঙ্গে অতো আমোদ-ফুর্তিতে মাতলে কি শরীর থাকে? নাহলে ওব সৌষ্ঠব ভাল ছিল, ওকে একটু শিখিয়ে পড়িয়ে নিলে হয়তো চলতো।

—কদিন আপনার কাছে রেখে তালিম দিন না কেন?

—ওকি আমার কাছে থাকতে চাইবে, কতবার তো বলেছি, গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না।

—এতো আর খেলার ব্যাপার নয়, এ স্বাধীনতার রাজদরবার, এখানে উপস্থিত হতে হলে প্রস্তুত হয়ে যেতে হবে। সেজ্ঞা যা করার দরকার করতে হবে।

কঞ্চুকীর চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, বললো—
ঠিক। সাধনার রীতিই তাই। লক্ষ্যটাই বড়, বিধি কিছু নয়। আমি যখন তত্ত্বসাধনা করেছি তখন ভৈরবী চক্রে বসেছি, ভৈরবীর চেহারা কি বয়সের কথা তো ভাবিনি, ভেবেছি মন্ত্রসিদ্ধির কথা।

কঞ্চুকী প্রায়ই কথায় কথায় তত্ত্বসাধনার কথা বলেন, প্রথম যৌবনে কোন সময় কিছুকাল তিনি তান্ত্রিক হবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু শেষ অবধি সেদিকে বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেন নি, এক ভৈরবীকে নিয়ে তিনি মরে পড়েছিলেন, লোকে বলে, সেজ্ঞা পরে সেই ভৈরবীর ‘ভৈরব’ কঞ্চুকীকে এমন প্রহার দেন যে জৈন আত্মর-শালায় দুটি মাস তাকে শুয়ে থাকতে হয়েছিল। সেই-
খানেই তত্ত্বসাধনার উপর যবনিকাপাত ঘটে। তবে সেই সাধনার দোহাই দিয়ে কঞ্চুকী এখন বিলাসী শ্রেষ্ঠী সম্ভানদের কাছে বশীকরণের কবচ বিক্রী করে। কবচের

ফল কি হয় জানা নেই, তবে সাক্ষাৎ ফলস্বরূপ কঞ্চুকীর অর্থাগম হয় একথা সত্য।

কল্যাণ সেইদিকটাই উল্লেখ করে—আপনার বশীকরণ কবচ তো অব্যর্থ। যে ধারণ করেছে সেই সফল হয়েছে।

—হেঁ হেঁ, তবু তো তুমি একটা খবর জানানো না। মগধের নটী চন্দ্রবর্ণা আমার কবচ নিয়ে দেখা করলো শশাঙ্কের সঙ্গে, বাস সেইদিনই রাজনর্ভকী। চন্দ্রবর্ণা এখন তাঁর মাধার মণি।

কল্যাণ জানে কথাটা মিথ্যা, কঞ্চুকী এই ধরনের অজস্র মিথ্যা কথা বলে, তা বলুক, নৃত্য-গীতসম্পন্ন মাহুশটি অসাধারণ ব্যাপন, সেইজন্মই কল্যাণ তার সব-
কিছুই সম্ব্ব করে, এবং এইজন্ম রাজ্যভবনে তার অবাধ গতি, এবং তারই সহায়তায় কল্যাণকে স্বাধীনতার যেতে হবে। কল্যাণ বললো—এখন তাহলে যাই, কাল আবার আসবো।

—আরে সে কি, সিদ্ধি ছাড়া কখনও কোন প্রস্তাব সিদ্ধ হয়? বসো, সিদ্ধি গ্রহণ কর। কি হে সিদ্ধিনাথ, সঙ্কর একটা ব্যবস্থা কর—এরা কি শুধুমুখেই চলে যাবে?

পাশের সম্মানী এবার উঠে দাঁড়ালো। সে মন্দিরের ভিতর চলে গেল। কল্যাণ এবার প্রশ্ন করলো—এই সিদ্ধিনাথটিকে নতুন দেখছি।

—হ্যাঁ। সিদ্ধির সর্ববৎ বানায় চমৎকার, এক পাড় খেয়ে যাও।

—তা খেতে আপত্তি নেই, কিন্তু শেষ অবধি বাড়ী গিয়ে পৌঁছোবো তো, না নিনোরা তালের পাশেই সারা রাত পড়ে থাকতে হবে।

—আরে, না না, এক চুমুক খেলেই বুঝতে, এ কি বস্তু। তাইতো আমি ওর নাম রেখেছি সিদ্ধিনাথ। ইতিমধ্যে ও আমার এক মস্ত উপকার করেছে, তোমাকে চুপে চুপে বলি। তুমিতো জানো, আমাদের এই শিল্প-বিদ্যার সহজে কেউ আসে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছেলে ধরে এনে শিক্ষা দিতে হয়। সম্প্রতি এই সিদ্ধিনাথ আমাকে একটা ছেলে সংগ্রহ করে দিয়েছে, তাকেই আমি এবার বিদ্যা দান শুরু করবো।

—বালক কি এখানেই আছে ?

—হ্যাঁ, অশ্রু আর কোথায যাবে ? তাহাড়া তাকে চোখের সামনে থেকে আড়াল করতে চাই না। ছেলেটির বয়স কম কিন্তু বেশ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। ছেলেটিকে সংগ্রহ করে আনার জন্য সিদ্ধিনাথ আমার কাছ থেকে একশত রজত মুদ্রা দাবী করেছে, পঞ্চাশটি দিয়েছি আর পঞ্চাশ পক্ষ-কালের মধ্যে দেবার কথা আছে। টাকা না পেলে সিদ্ধিনাথ এখান থেকে নড়বেন না, তাতে আমার লোকসান নেই, সেই কদিন সিদ্ধির সরবৎটা জমবে ভালো। ছোকরাকে দেখবে, ডাকবো ?

উত্তরের অপেক্ষা না রেখেই কঞ্চুকী ডাক দিল—
রঞ্জনী ! রঞ্জনী !

সিদ্ধিনাথ অলিন্দে বেরিয়ে এলো। কঞ্চুকী বললো—
রঞ্জনীকে পাঠিয়ে দাও। এঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দোব।

সিদ্ধিনাথ সে কথা গ্রাহ্য না করে সিদ্ধির কলসী ও পানপাত্র নিয়ে এলো। কঞ্চুকী বললো—রঞ্জনীকে ডাকলে না ?

—সে শুয়ে পড়েছে।

—এই অসময়ে শুয়ে পড়েছে ? না না, তুমি ডেকে নিয়ে এনো। বলবে আমি ডাকছি।

সিদ্ধিনাথ এবার অপ্রসন্ন মুখে আবার মন্দির মধ্যে চলে গেল, একটু পরেই যে বালকের হাত ধরে নিয়ে এসে সামনে দাঁড় করালো সে ছেলেটি কল্যাণ ও দেবকুমারের পূর্ব পরিচিত, গোবিন্দগড়ের রূপারাম পুরোহিতের পুত্র।

কল্যাণ শিবরামের মাথায় হাত বুলিয়ে বললো—
চমৎকার ছেলে, একে আপনি নিজের কাছে বেখে শিক্ষা দিলে ভবিষ্যতে আপনার জ্ঞান রক্ষা করতে পারবে।

—আমার তো সেই মতই ইচ্ছা, দেখি মা মহামায়া কি করেন।

রঞ্জনী কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়েছিল, কঞ্চুকী বললো—রঞ্জনীর কি ঘুম পাচ্ছ ?

শিবরাম কোন সাড়া দিল না। তার মুখের পানে তাকিয়ে কঞ্চুকী বললো—সিদ্ধিনাথ রঞ্জনীকে সরবৎ দিয়েছে ?

সিদ্ধিনাথ অলিন্দে দাঁড়িয়েছিল, বললো—দিয়েছি।

—যাও, রঞ্জনী ঘুমোও গে।

রঞ্জনী কাঠের পুতুলের মত চলে গেল।

কল্যাণ বললো—আমি তা হলে এখন উঠি।

কঞ্চুকী বললো—কাল আবার এসো, তা তোমার সঙ্গীটির তো পরিচয় দিলে না ?

—যোগিনীঘাটের এক ভাস্কর, কয়েকদিনের জন্য আমার গৃহে অতিথি হয়েছেন। নাম দেবকুমার।

—ভাস্কর ! এখানকার মন্দিরের শিল্পকর্ম দেখতে এসেছে বুঝি ? এমন পাথরের কাজ উত্তরাপথে তো আর কোথাও নেই। তা ওকে বলো না, আমাকে একটা পাথরের ছোট তৈরবী মূর্তি খোদাই করে দিতে।

—আপনার আবার মূর্তি কি হবে ?

—গৃহে প্রতিষ্ঠা করবো। তাজিকের ঘরে সবাই বিগ্রহ দেখতে চায়।

—আচ্ছা, সে পরে একটা ব্যবস্থা করবোখন, ইনি আর কিছুকাল আমার গৃহেই থাকবেন।

—বেশী পরে নয়, রঞ্জনীকে অমাবস্তার দিন দীক্ষা দোব, তার আগে হলেই ভালো হয়। ঘরের বিগ্রহের সামনেই কর্ম শেষ করতে পারি।

—বেশ, তাই হবে।

দেবকুমার এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল, এবার সে বললো—না, তা হবে না। দেবদেবীর মূর্তি খোদাই করতে আমি জানি না। আমি থালা-বাটির কাজ করি।

—কাজ চলা গোছ একটা বিগ্রহ হলেই আমার চলবে। ভাল নাইবা হলো। যেখানে যা কিছু গলদ থাকবে আমি রক্তচন্দন লাগিয়ে তা ঢেকে দোব।

—কিন্তু আমি পারবো না।

—পারবে পারবে। বিশ্বাস থাকলে পাথরের মূর্তি কথা বলে, আর এ তো সামান্ত কাজ। আশ্ববিশ্বাস রাখো। তুমিই পারবে।

—পারলেও আমি করবো না।

কঞ্চুকী বিশ্বয়ে দেবকুমারের মুখের পানে তাকালো। তারপর বললো—যুবককে তো দুর্বিনীত বলে মনে হয়। এতো শিল্পীর মত নয়।

কল্যাণ হেসে বললো—নেশা চড়লে ওর আর কিছু খেয়াল থাকে না, কাল সন্ধ্যায় আমার গৃহে খেজুর রস খেয়ে আমার সঙ্গে বিবাদ বাধিয়ে দিয়েছিল, প্রত্যুষে আবার আমার কাছ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করলো।

কঙ্কুকী হাসলেন—বুঝেছি, বহু প্রকারের মত্ততা আছে, এদের বলে উগ্র মত্ত।

কল্যাণ দেবকুমারের মুখের পানে একবার তাকিয়ে নিয়ে কঙ্কুকীর কাছ থেকে বিদায় নিল।

পথে এসে কল্যাণ বললো—তুমি একেবারে কাঠখোটা মানুষ। মূর্তি খোদাই কর আর না কর, ছোটো মিষ্টি কথা বললে যদি একটা মানুষ খুশি হয় তো ক্ষতি কি?

—অস্ত্রের ছেলে চুরি করে আনে এই ধরনের মানুষকে খুশি করার আগ্রহ আমার নেই।

—তুমি কি আজ নতুন এলে এই দেশে? ছেলেমেয়ে চুরির কথা তুমি জানো না? এখনি চল ফুলপটিতে, দেখবে নাগরিকাদের ঘরে ঘরে ছোট ছোট মেয়ে, সে কি

একটা তাদের গর্ভজাত কন্যা নাকি? সবইতো চুরি করে আনা, টাকা দিবে সংগৃহীত।

—সাধারণ চুরি করে ধরা পড়লে অজ্ঞেয় হয়। আর এসব চুরির বিচার হয় না?

—বিচার করবে কে? এক একজন নাগরিক এক একটি রাজপুরুষের, নযতো ধনাঢ্য শ্রেষ্ঠপুত্রের রক্ষিতা, তাদের বিরুদ্ধে রাজদ্বারে কোন অভিযোগ টিকবে কি? অভিযোগ তুলে কেউ রেহাই পাবে? পরদিন তার আর খোঁজ পাওয়া যাবে না।

—এতো মন্দির, এতো দেবতা, এখানেও এই রকম?

—পিদিয়ের নীচেই অন্ধকার বন্ধু, মন্দির এখানে বেশি আছে বলে মানুষগুলো তো সব দেবতা হয়ে যায়নি। মানুষ যা তাই আছে।

তার পাশপাশীর দোকানের সামনে এসে পড়লো, চকলী তখন দোকান বন্ধ করছে, বললো—একটা জরুরী কাজে যাচ্ছি, যুবকার, কাল কথা হবে, এগো।

(ক্রমশঃ)

ভক্তি-ভারতী

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

ভক্তি-ভারতী, ভাবের ভিখারী প্রাণের প্রণতি লহ;
ভাগবত-প্রেমে যুক্ত যে তুমি মুক্ত যে তুমি নহ।

প্রেম-উৎপল নয়নে তোমার
অপ-জড়িত পরম ভূমার,
জীব-চেতনায় মুক্তি কোথায়
ভূমার প্রকৃতি সহ।

ভাব-বস্ত্রায় 'গীতার মাধুরী' বিদগ্ধজন চিতে
বিষয়-ভ্রমার হ্রঃসহ তাপে এনেছো যে সিক্তিতে।

প্রজ্ঞা-আলোকে প্রাণের গভীরে
ভক্তি ভাবের রসের মদিরে
নিমগ্ন ধ্যানী ধ্বনি তপস্বী,
এসেছি যে পূজা দিতে।

সুগ-গঙ্গার ওগো ভগীরথ! বঙ্গ-বিবুধ মাঝে
তোমার চিন্তা, মনীষা তোমার প্রাণের গভীরে রাজে।

শুভ-জনমের এ স্মরণ ক্ষণে
এনেছি অর্ঘ্য তোমার চরণে,
দীন-বেদনায় সঁপিলাম তাহা
অতি সঙ্কোচে লাজে।*

একখানি পত্র

[স্বনামধন্য ডাঃ পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়ের একখানি পত্র এখানে প্রকাশিত হইল। পত্রখানি তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের (প্রবর্তক সম্বন্ধে সাধারণ সম্পাদক) পত্রোত্তরে লিখিত। ডাঃ চ্যাটার্জির জীবনোত্তর পর সম্বন্ধে কৃকবনবাবু সাস্ত্রনাঙ্কলে একখানি পত্র দাদাকে লিখেন। বক্ষ্যমান পত্রে পঞ্চাননবাবুর ভগবৎ শরণাগতি ও সমাহিত চিন্তের খানিকটা পরিচয় মিলে। তাঁর কর্মময় কৃতবিদ্য জীবনের শেষাংশে তিনি ভগবৎভাবে ও রসে মজিয়া ডুবিয়া একবারে ইষ্টময় হইয়া গিয়াছিলেন, এ পরিচয় দ্বারা তাঁর অন্তরঙ্গ সাহচর্যে গিয়াছেন তাঁরাই জানেন। সম্প্রতি ডাঃ চ্যাটার্জিও বিদেহী হইয়াছেন। গত আশ্বিন সংখ্যা প্রবর্তকে পঞ্চাননবাবুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে। অস্ত্রান্ত পত্রিকায়ও পঞ্চাননবাবুর জীবন-পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু কোথাও তাঁর অন্তরঙ্গ অব্যাহত-জীবনের নিগূঢ় পরিচয়টি উদ্ঘাটিত হইতে দেখি নাই। বর্তমান পত্রে তার একটুখানি আভাস মাত্র মিলিবে। এই প্রতিষ্ঠাতাবান কৃতী জীবনের মহিমা ও চরিতার্থতা বস্তুতঃ এইখানেই।—প্রঃ সং:]

জয়গুরু:

৩রা মে. ১৯৬১
কলিকাতা।

মহাপ্রভুদত্ত নাম ব্রহ্ম:

‘হরেন্নাম হরেন্নাম হরেন্নামৈব কেবলম্
কলৌ নাশ্বেব নাশ্বেব গতিরন্তথা’

কল্যাণীয় কেঠে,—

তোমার চিঠি পেলাম।

তোমার বৌদিদির মৃত্যুতে আমার মন কিছুমাত্র বিচলিত নহে। পৃথিবীতে জন্ম মৃত্যুর রীতি তো এই। আমাদের দুঃখ তো স্বার্থপরতা ও মোহাঙ্ককারের ভ্রম। মানুষের কর্মফল তাকে এই বাস্তব জগতে গতায়তি করায়, প্রারম্ভ শেষ হলে তাকে যেতেই হবে। মৃত্যুর মাধ্যমেই জীবাত্মার উৎকর্ষতা লাভ হতে পারে ও ভগবতোন্মুখ জীবের পরমাত্মার সঙ্গে যোগ হতে পারে। তোমার বৌদিদিকে তুমি কিছু কিছু জানতে। সুদীর্ঘ ৪৫ বৎসর তাঁহার সঙ্গে শ্রীভগবান যে বনিষ্ট সম্বন্ধের সুযোগ দিবেছিলেন তাতে এইটুকু আমার বিশ্বাস যে, তিনি কখনও কর্তব্যচ্যুত হন নি—আমাদের আদর্শ পিতার নিকট হইতে তাঁহার শিক্ষাদীক্ষা সার্থক হয়েছিলো। ভারতের আদর্শ রমণীর গুণাবলী তাঁর

মধ্যে জাম্বল্যমান ছিলো। এই জীবনে কার্য্য তাঁর শেষ হয়েছিলো। তাঁর সাধনায় ও ভগবৎপ্রেমে তিনি যে স্তরে উঠেছিলেন তাতে এই পরিবেশের পরিবর্তন না হলে তাঁর আত্মার উৎকর্ষ সাধনের বাধাই হইছিলো। তিনি যে এই জীবনের অব্যাহতি পেয়েছেন তা মৃত্যু নয়—সাধনোচিত পরিবেশ প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। কাজেই এতো আনন্দের কথা।

দেহাস্ত্রমুক্তি মোহপরবশ মানুষ নিজের কি হবে এই ভেবেই অস্থির। তাই-সে কেবল এই অবস্থাতে শোকই করে এই বলে কি হবে আমার! কিন্তু আমার কর্মফলে যদি আমাকে দুঃস্থ হতে হয় তা হলে তিনি থাকলেই কি আমি অব্যাহতি পেতুম? কাজেই সে ভাবনার প্রকৃত অর্থ কি হতে পারে? তুমি ভগবন্ত—বহুদিন সাধনা করছো। শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করো যেন আমার এই মনস্তত্ত্ব সুদৃঢ় হয় যে, তাঁহার রূপায় যে শক্তিমানের শক্তি আমায় নিরন্তর অনুপ্রাণিত করেছে সে শক্তি হতে যেন বঞ্চিত না হই। তাহলেই আমি ধন্য হবো।

আমার আশীর্বাদ জেনো। ইতি—

দাদা।



সুভাষচন্দ্রের জীবনে সাহিত্যের মূল্য

শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ ঘোষ

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সকল রাজনৈতিক মতবাদের উদ্দেশ্য আর একটি জীবন-সাধনার পরিচয় রয়েছে। সে পরিচয় তাঁর সাহিত্য-জীবনের মধ্যে নিহিত। সুভাষচন্দ্রের বাংলায় প্রদত্ত তৎকালীন অভিভাষণগুলি যারা শুনেছেন তাঁরা সুভাষচন্দ্রের সাহিত্য-ভাবাভুত্বের সর্বত্র নিশ্চয়ই নিঃসংশয়। এ ছাড়া ‘তরুণের স্বপ্ন’, ‘নূতনের সন্ধান’, ‘ভারত পথিক’ প্রভৃতি গ্রন্থ সুভাষচন্দ্রের সাহিত্য-ভাবনার প্রকাশচেন বা অবচেতন মনের আঙ্গিনায় অপূর্ণ রসাত্তিসিক্ত।

সুভাষচন্দ্রকে যখন আমরা পাই, তখন সংস্কৃতি জগতে চলেছে এক বিপুল আলোড়ন। রাজনীতি ক্ষেত্রে মতবৈধ জীবনের ব্যর্থতা আর মানবিক বা সামাজিক ক্ষেত্রে এক ভয়াবহ শূন্যতা। প্রাণহীন বস্তুর সচলতার মতই এক যান্ত্রিক তাড়নায়, লোলুপতা বীভৎসতার অন্ধতায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে বাংলা তথা ভারতের সমুজ্জ্বল অস্তিত্ব। সেই ভয়াবহ শূন্যতাকে ভরাট করার জন্তেই সংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে সামাজিক আলোড়নের প্রয়াস নিয়ে আবির্ভূত হলেন তিনি। ১৩২১ সালে অগ্রহায়ণ মাসে আর্থ সমাজ হলে নিখিল বঙ্গ যুব সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণে সুভাষচন্দ্রের সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গীর যে পরিচয় পাওয়া যায় তার এই উদ্ধৃতি—

“আজ পৃথিবীর সমস্ত আলো, সমস্ত বাতাস থেকে আমাদের প্রাণে অক্ষুরন্ত সংগীতের আনন্দধ্বনি আগছে, আমাদের বুকের মধ্যে আবেগের উল্লাসনৃত্য আজ সেই সুরের সঙ্গে পা বেলে চলেছে...আমার মনে হয় এই আনন্দই আমার জাতির আনন্দ, আমার নারায়ণের আনন্দ।

“তিনি কোন ওপার থেকে আনন্দে আজ এক সোনার স্তম্ভে কাটনা কেটে আসছেন—যা আজ রবির কিরণ হয়ে গাছের শামলতায় চিকমিক করে উঠছে—ভরানদীর উচ্ছ্বসিত জলে শতধা বিভক্ত হয়ে সে এক আনন্দ শ্রোতে ভেসে চলেছে, আবার সেই সোনার স্তম্ভেই যেন আজ আমাদের হাতে রাঙা রাখী হয়ে আমাদের সকলকে

সকলের সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছে—ভোগীর সঙ্গে ত্যাগীকে, প্রবীণের সঙ্গে নবীনকে, কর্মীর সঙ্গে ভাবুককে। এই সুরের জাল যখন সমগ্র দেশকে বেড়ে ফেলবে, তখন আজকের এই পুণ্য দিনের স্মরণসম্পাত আসন্ন ভবিষ্যতের সার্থকতার সমুজ্জ্বল হয়ে উঠবে; আর তখন, যিনি ওপারে ছ্যালোকে আকাশের চরকায় আলোকের স্তম্ভে কাটছেন এবং ভুলোকে কালের চরকায় কত বিভিন্ন জাতির বিচিত্র ইতিহাসের সূর্য্য স্তম্ভে গ্রথিত করে চলেছেন, আমার জাতির ভাগ্যবিধাতা বলে তাঁকে আমরা বরণ করে নেব।”

প্রথম জীবনে যাঁরাই সাহিত্য রচনায তীর্থী হয়েছেন তাঁরাই রোমান্সের আওতাধীন পড়ে অমৃত স্বপ্নবিলাসী হয়েছেন, তারপর পরিণত আবহাওয়ায় তাঁরাই হয়ে উঠেছেন বাস্তবধর্মী। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের সাহিত্যিক দৃষ্টির মধ্যে রোমান্স এবং বাস্তবতা পাশাপাশি কাজ করে গেছে। যেখানেই তিনি ভাষার স্বপ্ন দেখেছেন, সেখানেই তিনি গঠনের আদর্শও তুলে ধরেছেন যা একমাত্র প্রকৃত সাহিত্যসেবীর পক্ষে সম্ভব। তাই, স্বপ্নবিলাসী সুভাষচন্দ্র কল্পনাশ্রমী স্বপ্নের প্রহরী ন'ন বরং বাস্তবের মধ্যেই নিহিত রয়েছে তাঁর স্বপ্নের সাধনা। তিনি লিখেছেন—

“সাধনা বলিতে অনেকে অনেক রকম বুঝিয়া থাকেন এবং সাধনার বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যাও শুনিতে পাওয়া যায়। আমার ধারণা এই যে, ভগবানের উদ্দেশ্যে মনুষ্য জীবনের রূপান্তর করা। রূপান্তর সাধন করিতে হইলে বাহির হইতে চেষ্টা করিলে চলিবে না, মাহুষের জীবন নূতন আদর্শের দ্বারা অমুপ্রাণিত করিতে হইবে। আদর্শের চরণে নিজেকে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে ও ঐ আদর্শের অমুসরণে নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিতে হইবে। আদর্শের চরণে আত্মবলিদান করিতে পারিলে মাহুষের চিন্তা, কথা ও কার্য এক সুরে বাঁধা হইবে। তাহার ভিতর বাহির এক হইয়া যাইবে। তাহার সমস্ত জীবন এক আদর্শ স্তম্ভে গ্রথিত হইবে; সে তখন

তাহার জীবনে নূতন রস, নূতন আনন্দ, নূতন অর্থ খুঁজিয়া পাইবে। সমগ্র বিশ্বজগৎ তাহার নিকট নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে।”

প্রত্যেক ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া আছে যার মধ্যে লুকিয়ে আছে চরম বাস্তব। তাই রোমান্সের দেশে লালিত হয়েও সুভাষচন্দ্রের সাহিত্যিক মন চরম বাস্তববাদী এবং এই বাস্তববাদিতা যদি তাঁর মধ্যে না থাকতো তাহলে তিনি কখনই রাণী ঝাঞ্জী বাহিনী গঠন করতে পারতেন না। তাঁর এই বাস্তববাদিতার আরও একটা কারণ হচ্ছে, সমসাময়িক পরিবেশ আর সাহিত্যিকদের বাস্তবাস্তিধান। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ, ধ্বনি বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী আর রামানুজের বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ সুভাষচন্দ্রকে সাহিত্যিক মনের দিক থেকে বাস্তববাদী হতে প্রচুর সাহায্য করেছিল।

সাহিত্যিকের আরও একটি গুণ—প্রকৃতির সঙ্গে মাহুকের সায়ুজ্য রচনা করা। কিন্তু সুভাষ-মানস কি প্রকৃতির পূজারী ছিল না?

না বললে ভুল বলা হয়, কারণ তিনি তাঁর নিজের জীবনের মধ্যেই বলে গেছেন যে, ছাত্রাবস্থাতেই তিনি প্রকৃতির পূজারী হয়ে পড়েছিলেন। কেবল প্রকৃতির কমনীয়তা বা সৌন্দর্যবোধের খাতিরেই নয়, নৈতিক-বোধের দিক থেকেও। তবে এই অমুপ্রেরণার মধ্যে নৈতিকতার দাবিই ছিল অগ্রগণ্য। সুভাষচন্দ্রের নিজস্ব উক্তি দিয়েই বলি—

“তিনি (শিক্ষক বেণীমাধব দাস) আমাকে শেখান কি করে প্রকৃতিকে ভালবাসতে হয়; প্রকৃতির প্রভাবকে জীবনে গ্রহণ করতে হয়—শুধু সৌন্দর্যবোধের দিক থেকে নয়—নৈতিকবোধের দিক থেকেও বটে। তাঁর উপদেশমতো প্রকৃতির পূজা শুরু করে দিয়েছিলাম, নদীর ধারে কিংবা পাহাড়ের গায়ে অথবা অন্তর্গামী স্বর্ণের ছটায় রঙীন নির্জন কোন মাঠে ভাল একটা জায়গা বেছে নিয়ে বসে ধ্যান অভ্যাস করতাম।...একটা লাভ হয়েছিল—প্রকৃতির বিচিত্র ও প্রচ্ছন্ন সৌন্দর্য আমার চোখে ধরা দিয়েছিল; তা ছাড়া সহজেই মনে একাগ্রতা আনতে পেরেছিলাম। আর এই প্রকৃতি পূজার খাতিরেই যখন

সৌন্দর্যবোধ এল, তখন ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাব্য যেন আরও নতুন করে উপভোগ করতে শিখলাম।”

এই প্রত্যক্ষবোধ বা উপলব্ধিই বোধ হয় সুভাষচন্দ্রকে সাহিত্যিক পর্যায়ভুক্ত বা সাহিত্যিক আদর্শে অমুপ্রাণিত করেছিল। তা নইলে দীর্ঘকাল পরে সুদূর মান্দালয় জেলে থাকাকালীন দক্ষিণ কলিকাতা সেবক সমিতির সহঃ সম্পাদক শ্রীঅনাথবন্ধু দত্তকে ১৯২৬ সালে যে পত্র লেখেন তার মধ্যেও সেই বোধ প্রস্ফুটিত হতে দেখা যায়,—

“প্রাতে অথবা অপরাহ্নে ঋণু ঋণু শুভ্র মেঘ যখন চোখের সামনে ভাসতে ভাসতে চলে যায়, তখন ক্ষণেকের জন্তে মনে হয় মেঘদূতের বিরহী যক্ষের মতো তাদের মারফৎ অন্তরের কথা কয়টি বজ্রজননীর চরণপ্রাস্তে পাঠিয়ে দিই। অন্ততঃ বলে পাঠাই, বৈষ্ণবের ভাষায় “তোমারই লাগিয়া কলঙ্কের বোকা বইতে আমার সুখ।”

সুভাষচন্দ্রের চিঠিগুলিতে যেমন এই ধরনের কবিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়, তেমনি পাওয়া যায় ছোট ছোট কাহিনীর স্কেচ, যার মধ্যে গল্পের আমেজ রয়েছে, আর রয়েছে চরিত্র-চিত্রণের প্রয়াস। এই প্রসঙ্গে মান্দালয় কারাগার থেকে তাঁর মেজবৌদিকে লেখা চিঠিটি এবং হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে লেখা পত্রটি উল্লেখযোগ্য। এখানে জেলকষেদী মলয়, ম্যানেজারবাবু, আর ‘পুরানো চোর’ মণুর চরিত্রটি দু’আঁচরে বেশ স্ফুটে উঠেছে। এ ছাড়া গল্পরচনার বিষয় শুনেছি যে, তিনি মুখে মুখে শরৎচন্দ্রের মতো গল্প বানাতে পারতেন আর উপযুক্ত সময়ে তাঁর সহকর্মীদের বলে আনন্দ দিতেন।

বর্তমানকালে বাংলা ভাষায় অনেক লেখক কারাবাসের কাহিনী নিয়ে গল্প, উপন্যাস লিখে নাম করেছেন। সুভাষচন্দ্র বহুদিন আগেই এই কারাবাসের সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ সম্পর্কে তাঁর দিলীপকুমার রায়কে লেখা চিঠি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যেমন:—

“আমি যদি স্বয়ং কারাবাস না করতাম তা হলে একজন কারাবাসী বা অপরাধীকে ঠিক সহানুভূতির

চোখে দেখতে পারতাম না এবং এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ যে, আমাদের দেশের আর্টিষ্ট বা সাহিত্যিক-গণের যদি কিছু কিছু কারাজীবনের অতিজ্ঞতা থাকতো তা হলে আমাদের শিল্প সাহিত্য অনেকাংশে সমৃদ্ধ হত। কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা যে কতখানি ধ্বংস সে কথা বোধ হয় ভেবে দেখা হয় না।”

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে এই মন্তব্যটি যে কত সত্য, তা সতীনাথ ভাট্টারী “জাগরী” এবং জরাসন্ধের “লৌহকপাট” ও অন্যান্য আরও লেখকের রচনাসমূহ প্রমাণ করে।

সুভাষচন্দ্রের রচনাভঙ্গী অত্যন্ত বলিষ্ঠ; স্বচ্ছ এবং স্পষ্ট। তাঁর চরিত্রের মতই তাঁর রচনা উন্নত, দৃঢ় ও পৌরুষদৃষ্ট—স্বামীজীর দৃঢ়তা আর দেশবন্ধুর আবেগময়-তার সংমিশ্রণ। তাই “তরুণের স্বপ্ন” (২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০) প্রবন্ধে তাঁর জীবন-দর্শনের একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। এখানে তিনি সাহিত্যিক মন নিয়ে অপূর্ণ ভাষায় তরুণ সম্প্রদায়কে পুনর্জাগরণের আশার বাণী শুনিয়েছেন। আর একটি প্রবন্ধের কথা বলি। সেটি ১৩৩৭ সালে “বেগু” পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল “বাংলার মা ও বোনদের প্রতি” এই নামে। এই প্রবন্ধে তিনি “নারী নরকস্ত দ্বারং” একথা স্বীকার করেন নি। সেখানে সুভাষ-মানসের প্রজ্জ্বলিত নারীজাতি আমাদের সমাজের অধিক। তাই তিনি সংস্কারযুক্ত মন নিয়ে পুরুষের পাশে আত্মশক্তির অংশরূপিণী নারীকে আহ্বান জানিয়েছেন। এই সাহিত্যিক মনোভাব ছিল বলেই কংগ্রেসমণ্ডলী থেকে সভাপতির পদে ইস্তফা দেওয়ার আগেই এক সাহিত্যিক বৈঠক আহ্বানে তৎপর হন।

যদিও সেই বৈঠক সম্ভব না হওয়ায় পরে কবি যতীন্দ্র-মোহন বাগচীর বাড়ীতে বৈঠক বসে। আগেই বলেছি যে তিনি যখন ভাঙার স্বপ্ন দেখেছেন, তখন গঠনের আদর্শও তুলে ধরেছেন। তাই সুভাষচন্দ্র বিশ্বাস করতেন যে, সাহিত্যিক এবং কবিদের পক্ষেই সম্ভব জাতিকে বাঁচানো আর তার জন্তে প্রয়োজন বাস্তবধর্মী সাহিত্যিক মানসের সংগঠন। তিনি বলতেন, সাহিত্যিকদের তৈরী হতে হবে দেশের খাতির, মানুষের প্রয়োজনে। সুভাষচন্দ্রের এই আহ্বানে সেদিন ষাঁড়া সাড়া দিলেন তাঁরা হচ্ছেন—কথা-সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কবি কাজী নজরুল ইসলাম, কবিশেখর কালিদাস রায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, সরোজ রাবচৌধুরী প্রভৃতি। কথাশিল্পী তারা-শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ আদর্শে তাঁর প্রথম উপজ্ঞান “চৈতালী ঘুর্ণি” শ্রদ্ধার্থরূপে নিবেদন করলেন দেশগৌরব সুভাষচন্দ্রকে।

এই সংগঠনশীলতার মধ্যে রাজনৈতিক আদর্শ সুভাষাব্যবহৃত কতটা প্রভাবিত কবেছিল তার বিচার আমি করতে চাই না, তবে এটুকু জানি, রাজনীতিকে বাদ দিয়ে সাহিত্য বা সংস্কৃতি সম্পূর্ণ নয়। যাই হোক সুভাষাব্যবহৃত এই মৌলিকবোধ ও নৈতিক ক্ষেত্রে আর একটা প্রভাব পরোক্ষভাবে কাজ করেছিল তা হচ্ছে ধর্ম-বহিষ্করণের মতো তিনিও ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শ মানুষ রূপেই দেখতে শিখেছিলেন; আর সেই কারণেই তিনি ছিলেন আত্মসংগ্রামী—অভ্যাস, অত্যাচার, অবিচারের বিরুদ্ধে মূর্তিমান সুপুরুষ। (প্রবর্তক-সাহিত্যক্ষেত্রে পণ্ডিত)।

পিপাসা

শ্রীমধীর গুপ্ত

সুন্দর যদি আসে কোনদিন
আমার শয়ন-ঘরে,
শয্যাটি তাই পাতিয়া রেখেছি
অতীব যতন-ভরে।

মাটির প্রদীপ জ্বালায়ে রেখেছি
প্রাণের সলিলা দিয়া;
সুন্দর যেন এসে হেসে কয়,—
বাসরে এলাম প্রিয়া।

খোকার মাতৃভাষা

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ গুহচৌধুরী

“খোকার মাতৃভাষা” নামে বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত একখানা শিশুপাঠ্য পুস্তক পাঠ করিলাম। সাহিত্য ক্ষেত্রে কবিবর রবীন্দ্রনাথের, সুপ্রসিদ্ধ সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের এ যুগের মত করিয়া শিশুপাঠ্য পুস্তক বাহির হয়। কিন্তু তাহা যে ভাবের লেখা “খোকার-মাতৃভাষা” পুস্তকখানা সে ভাবের একেবারে লেখা নহে। ঐ পুস্তকে গ্রন্থকার ধ্বনিবিজ্ঞানকে প্রাধান্য দিয়া রচনা করিয়াছেন। ঐ বিষয় বস্তুটি বাঙ্গালা ভাষায় শিশুদের ভিতরে তেমন প্রসার নাই—বোধ হয় গ্রন্থকার কর্তৃক নূতন সম্মিষণ। ঐ ধরনের পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়াই গ্রন্থকারকে আমার সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করি। আমাদের শিশুদের বিজ্ঞাশিক্ষার সময়ে উচ্চারণ বিষয়ে মোটেও যত্ন লই না। ফলে, প্রথম হইতে বাহা শিক্ষা পায় বম্বোবুদ্ধির সঙ্গে যজ্ঞাগত হইয়া যাওয়ায় তাহা আর কদাপি সংশোধিত হয় না। প্রকৃত উচ্চারণের পদ্ধতি যদি শিশুদের মত করিয়া সহজ এবং সরল ভাষায় শিক্ষা দেওয়া যায় এবং তাহা যদি তাহাদের স্বদয়ঙ্গম করান হয়, তবে তাহার ফল অপূর্ণ দর্পে। বাঙ্গালা ভাষার ধ্বনিবিজ্ঞান বাঙ্গালার নিজস্ব সম্পৎ নহে। কেননা, ইহার বীজ সংস্কৃত ভাষা হইতে আসিয়া থাকিবে। এই সংস্কৃত ভাষা হইতেই সমস্ত “আর্য্য ভাষা”র উৎপত্তি। ডক্টর বালেন্টাইন্ এ বিষয়ে একমত—“Dr. Ballantyne is inclined to support the theory that Sanskrit is the mother of all Aryan (Indo-European) languages.” (Quoted in *Hindu Superiority*, p. 172). আবার “Bible in India” নামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থে Mons. Dubois বলেন—“Sanskrit is the original source of all the European languages of the present day.” জগতের সর্বত্র সংস্কৃত ভাষা ‘ব্যবহারিকী ভাষা’ ছিল। তাহার কথা Franz Bopp (1791-1867), the founder of Comparative

philology এর লেখার মধ্যে পাই—“At one time Sanskrit was the one language spoken all over the world.”—(*Edinburgh Review*, Vol. XXXIII, p. 43). বাঙ্গালার আবির্ভাব সংস্কৃত হইতে সরাসরি না হইলেও বাঙ্গালা যখন জন্মে, তখন সংস্কৃত প্রেত। অতি বিকৃত প্রাকৃতের অপভ্রংশের অন্তিম বিকারে হিন্দী, মরাঠী, বাঙ্গালা, প্রভৃতি আধুনিক ভাষাসমূহের আবির্ভাব হয়। ভারতবর্ষের আদিম “আর্য্য ভাষা” বিকৃত হইয়াই পালি, মাহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী, প্রভৃতি বহু প্রারম্ভ ভাষা জন্মে। সংস্কৃতের ইহারাই ছুহিত। ভাষাতত্ত্বের অরোহি প্রণালীতে (প্রকৃষ্ট প্রণালী) অল্প পর্য্যন্ত সহস্র বৎসরের অধিক বৎসরের কোনও বাঙ্গালা গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। কাজেই, বাঙ্গালার বয়স যে বড় একটা বেশী পুরাতন এমত সম্ভবে না। হিন্দী, মৈথিলী, উড়িয়া, বাঙ্গালা সহোদরা না হইলেও সপিণ্ডা, ইহাতে নিঃসন্দেহ। প্রকৃত বিষয় হইতে ইয়ত্ত কিছু বিপথে আসিয়া পড়িয়াছি। কিন্তু উহার প্রয়োজন বিধায় অবতারণা করিতে হইল। স্বরচিহ্নের বিষয়ে প্রাচ্য ও প্রাচীণ্যদেশীয় নানাতাষায় প্রগাঢ় পণ্ডিত আমার পরমারাধ্য পিতৃদেব শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গুহ, এম্-এ, বি-এন্ মহাশয় বলেন—“সকল ভাষায়ই বহুতর শব্দ তার একটা বা একাধিক নির্দিষ্ট স্বরবর্ণের উপর একটু বেশী জোর দিয়া উচ্চারণ করিতে হয়। শব্দোচ্চারণে এই প্রযত্নাধিক্যকে আধুনিক ইউরোপীয় ভাষায় Accent বা Tone বলে। সংস্কৃতে তারই নাম, স্বর।” (“নব্যভারত”, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫, পৃ: ২৪)। বাঙ্গালায় তাহাই ‘প্রশ্বন।’ ধ্বনি ব্যতিরেকে উচ্চারণ সিদ্ধ হইবে না—শুদ্ধ হইবে না। তাই, উচ্চারণের প্রধান সহায়ক ‘ধ্বনি’। এই ধ্বনিকে সহজ-সরল করিয়া শিশু-মনের উপযোগী করাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। মাতৃভাষায় তাহা হইতে পারিলে প্রকাণ্ড অভাব একটা দূর হয়।

গ্রন্থকারও মনে করেন তাহাই—“মাতৃভাষা শিক্ষা ধ্বনিত্বের উপরই প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত।” শব্দের বাহা প্রকৃত উচ্চারণ তাহা যেমন গ্রন্থের বর্ণনায় দেওয়া উচিত, তেমন আবার চলিত উচ্চারণ থাকারও আবশ্যকতা আছে। প্রকৃত-বিকৃত দুইয়ের সমন্বয় হওয়া সমীচীন। গ্রন্থের মধ্যে এমন অনেক শব্দ আছে, বাহা দেখিলে মনে হয় বাঙ্গালা শব্দ। কিন্তু তাহা মৌলিক বাঙ্গালা শব্দ নহে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—কাগজ্ (আরবী), গফুর (আরবী), মৌলবী (ফার্সী), জাদা (ফার্সী), জামা (ফার্সী), কলম্ (আরবী), মুন্সী (আরবী), মুরব্বী (আরবী) কুশ্‌তী (ফার্সী), ঈদ্ (আরবী), মুসলমান (ফার্সী), বাজার (ফার্সী), বাজী (ফার্সী), মনুজুর (আরবী), গুরু (আরবী), শহুর (ফার্সী), হাজী (আরবী), খুশী (ফার্সী), বাবু (ফার্সী)। মাতৃভাষার দৈন্ত সেখানে, যেখানে বৈদেশিক ভাষার সাহায্য লইতে হয়। মাতৃভাষা সেখানেই সম্পংশালিনী, যেখানে তাঁহাকে পর-মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় না। গ্রন্থকারের মৌলিকতার অভাব সেখানে, যেখানে তাঁহাকে অল্প ভাষা, কি ছন্দ, কি শব্দ অথবা কি ভাবের সাহায্য লইতে হয়। ধ্ব তুচ্ছার্থে, খোল্ তুচ্ছার্থে—সংস্কৃত ভাষার ধাতু (ক্রিয়া) যদি হয়, তবে ঐ ঐ ধাতু অর্থে ঐ অর্থ হয় না। গ্রন্থকার কি বলেন? ‘জলদি’

কথার অর্থ কি? গ্রন্থকর যদি ‘শীঘ্র’ বলেন, তবে উহার বাণান হইবে ‘জলদী’ (হিন্দী—জলদ্ শব্দেৎপন্ন) ‘জলদি’ নহে। উহার সমাধান কি? ‘বাঙ্গালা’ শব্দের প্রকৃত বাণান কি? আজকাল ‘দ’ তুলিয়া দিয়া তদ্ভব বাঙ্গালা শব্দে ‘ং’ অথবা ‘ঙ’র প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন, “বঙ্গ” হইতে উৎপন্ন “বাঙ্গালা” বঙ্গদেশের অধিবাসী তাই “বাঙ্গালী”—বাণানে অনেকে লেখেন ‘বাংলা’, ‘বাঙলা’। ‘ঙ’র ধ্বনিতে নিশ্চয়তা নাই—স্বতন্ত্রভাবে ‘ঙ’র প্রয়োগ একরূপ বিরল। কাজেই, ‘ঙ’কে বর্ণরূপে চালিত করার প্রচেষ্টাই যেন বিসদৃশ ঠেকে! “বাঙ্গালী,” “বাঙালী”তে উচ্চারণের প্রভেদ দেখা যায় না যাহার জন্য “বাঙ্গালী” রূপ ত্যাগ করার আবশ্যকতা হইবে! অতএব ‘ঙ’এর ব্যবহার অসমীচীন। তারপর, ‘ং’, ‘দ’এর উচ্চারণ ‘ং’এর মত কতকটা বটে। কিন্তু সম্পূর্ণ এক নহে। কেননা, “অকুহবিসর্জ্জনীয়ানাং কর্ণঃ” এই অঙ্কসারে ‘ঙ’এর উচ্চারণ স্থান কর্ণ (Guttural) এবং “নাসিকা অমুস্বারস্ত” এই অঙ্কসারী ‘ং’এর উচ্চারণস্থান নাসিকা (Nasal)। “বাংলা” অথবা “বাঙ্গলা” ইহাই বলা হয়। “বাঙ্গালা” শব্দটি প্রয়োগে সাধু এবং তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত সন্দেহ নাই। বিকল্পে “বাংলা” লেখার কোনও প্রয়োজন নাই। সংস্কারকদিগের ঐক্য প্রচেষ্টা উচিত বলিয়া মনে হয় না।



কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ

শ্রীশান্তলীল দাশ

তোমার মিষ্টি হাতের কবিতা পড়েছি, পড়ছি আজো :
কত তার স্মর, কত না ছন্দ, পড়ে মন ভরে ওঠে ;
কথা নিয়ে তুমি খেলা কর যেন ; তোমার লেখনীমুখে
নানান ছন্দ কী সহজ হয়ে বরণাধারার মতো
নেমে আসে আর বয়ে যায় হেসে, বিচিত্র তার লীলা—
পড়ি, উপভোগ করি, আর মনে মনে সাধুবাদ দিই।

বাংলা দেশের খাঁটি কবি তুমি, কোথাও নেইকো ফাঁকি,
মাটির মায়ের গন্ধ-জড়ানো ; মন-তোলানর ছলা
নেই কোনখানে, সহজ, সরল ; সুখ-দুঃখ, প্রেম-প্রীতি
সব নিয়ে গড়া তোমার কবিতা, হাসি-কান্নার ভরা ;
নেই তার মাঝে একটু কোথাও ধার-করা বেমানান
ভিন্ন মাটির মিশেল—তোমার কবিতা নিখাদ সোনা।

তুমি বাংলার, তুমি বাঙালীর কবি, তাই বারে বারে
দেখেছি তোমার কবিতা দেশের মাথা-মমতায় ভরা ;
কখনো কৈদেছ ব্যাঘ্র, কখনো অনাচারে, অবিচারে
গর্জে উঠেছে তোমার লেখনী শানিত রূপাণ সম
হেনেছে আঘাত অত্যাচারীরে নির্মম কষাঘাতে—
তোমার কবিতা, দেখেছি তখন, অগ্নি আখরে লেখা।

এমনি করেই তোমার কবিতা অবিচল, অবিরল,
কোথাও বিরতি নেই এতটুকু চলেছে আপন মনে ;
নানা ফুলে গাঁথা এক একটি মালা বাণীর বর্ষে শোভে ;
সে-মালায়াজির তুমি মালাকর হনিপুণ, নিরলস।
আরো শত শত মালা গেঁথে চল ; তোমার জীবন ঘিরে
আনন্দ শতটি শরৎ—করি এই প্রার্থনা। *

* প্রবর্তক সাহিত্য-চক্রের উদ্যোগে গত ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৬০ তারিখে অনুষ্ঠিত কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্যের স্মরণীয় সভায় গঠিত।

আত্মসমীক্ষা

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

আমি অদ্ভুত মানুষ একটি, বিচিত্র বিশ্বয় !
 রহস্যলোকে বসবাস করি, জীবন স্বপ্নময় ।
 লক্ষ্য পরম আনন্দ লাভ, আনন্দ বিতরণ ;
 যতটুকু পাই, ততোধিক পেতে চিরপ্রলুব্ধ মন ।
 পেলোও কখনো প্রমত্ত নই, নাহি পেলো নাই-দুঃখ ;
 দীর্ঘ বিরহে বাঁচিয়া রয়েছি, কোথা মিলনের সুখ !
 স্নেহ প্রেম প্রীতি তৃপ্তি দিলেও, ভবে আবদ্ধ নই ;
 লোকারণ্যের গভীর গহনে নির্জনে একা রই ।
 আমি বিচিত্র মানুষ একটি, আগাগোড়া ঋণছাড়া ।
 ধনসম্পদ প্রাদাদে কখনো হইনি আশ্রয়দাতা ।
 কাছের মানুষ দূরে চলে গেছে, স্তব্ধের এলো কাছে ;
 তাদের নিয়েই স্মৃতি হয়ে রই যাহারা নিকটে আছে ।
 আমি জনতার প্রবাহের তলে তলায়ে যাইনি ভবে ;
 গর্ভ করার কিছু নাহি তাতে, গর্ভিত ভাবে সবে ।
 বহু দুঃস্থের ঘূচায়েছি দুঃখ গচ্ছিত ধন দিয়ে ;
 গভীর শাস্তি পেয়েছি কয়টি বিষবার দিয়ে বিয়ে ।
 আমি অপক্লপ মানুষ একটি রূপময় সংসারে ;
 সুষমার মতো কদর্য্যতাও মন টানে বারে বারে ।
 নগরের বৃকে বাস করি তবু পল্লীকে বাসি ভালো ;
 শরৎ-মেঘের চেয়ে ভালো লাগে কালো মেঘ জন্মকালো !
 গোলাপ না পেলো বিলাপ করি না, জুঁইয়ের পক্ষপাতী ;
 কেকা-রব হ'তে কুহ-ভানে মন ক'রে থাকে মাতামাতি ।
 গজলের সুরে ব্যাথাভুর হয়ে বাউলের সুরে কাঁদি ;
 দুঃস্থ জনেরে দোস্ত জানিয়া প্রীতির স্বত্রে বাঁধি ।

আমি বিদূষুটে মানুষ একটি, চিরসবুজের সাথী ;
 বনান্নকায়ে হাসিমুখে চলি নিয়ে জোনাকির বাতি ।
 মানুষ যেখানে ঘোর অসহায়, কে টানে সেথায় মোরে !
 সমতল ছেড়ে পাহাড় প্রদেশে চিন্তা নিয়ত ঘোরে ।
 আমি দূর দিকচক্রবালের মাধুরীর অহুগামী ;
 নদীসৈকতে বালু-প্রান্তরে কারে খুঁজে মরি আমি !
 স্নাত্যতার বিনামার গুঁতো চাহি না সিনেমা-ঘরে ;
 ছায়ার চাইতে জ্যাস্ত কারারা মায়ায় মুগ্ধ করে ।
 আমি অধর্ম্মী মানুষ একটি সকল ধর্ম্ম মানি ;
 জাতিহীন প্রাণে মানবজাতিকে আমার স্বজাতি জানি ।
 আলোক বাতাস সলিলের মতো প্রেমের গুণী নাই ;
 সত্য পুণ্য সুষমার মতো বন্ধে সবারে চাই !
 ভক্তির চেয়ে কর্ম্ম অধিক সাধনা দেয় মোরে ;
 শত্রুর মাঝে উল্লাসে কেবা বিজয়ীর মতো ঘোরে !
 ঘৃণা উপেক্ষা প্রেরণা জোগায়, অপেক্ষা করে' আছি ;
 মরিয়া অমর হয়ে বেঁচে রবো, সে-আশে রয়েছি বাঁচি ।
 আমি অবোগ্য মানুষ একটি, কোনো যোগ্যতা নাই !
 বাহিবে প্রবীণ, ভিতরে নবীন, অভাজন ভাবে তাই ।
 তোষামোদ করা শিখিনি জীবনে, তাই উপেক্ষা করে ;
 সরস্বতীকে পূজিছ, তাহার সতীন এলো না ঘরে !
 করতালি আর যশ কুড়াবার বাসনা করিনি কছু ;
 চিরনূতনের দরবারে তবু ঠাই যেন দেন প্রভু !
 মহাকাল সেরা বিচারকর্তা ; জানি না টিকিব কিনা !
 বিশ্বাস আছে—তুলিবে না মোরে, করিবে না কছু ঘৃণা ।

এখন স্বর্ঘ্য অস্তোন্মুখ, নিতে হবে গ্রব ছুটি !
 ওগো বান্ধবী, প্রাণের বন্ধু, কমা কোরো দোষ-ত্রুটি !
 এখানে ভর্গ, তমিস্রা হেথা, স্বর্গ-নরক এই ;
 মুকোচুরি খেলা খেলিতে আবার আসিব এইখানেই !
 অনেক কথাই পেলো না প্রকাশ, অন্তরে ব্যথা পাই !
 প্রতীক্ষা করে' হেসে চলে' যাবো, সেই সম্মান চাই !
 তোমাদের স্নেহ প্রীতি ভালবাসা, দিলে যে-আলিঙ্গন,
 তাই নিয়ে আমি লভিব বিদায়—এ মোর আকিঞ্চন !*



সম্পিতা

সম্মাতা

মাতৃভাবময়ী সম্মাতা

শ্রীজ্যোতির্ময়ী দেবী

আমাদের দেশে মেয়েদের পর্দা, অশিক্ষা মানে নিরক্ষরতা, নানা রকম সামাজিক কঠোরতা যতই থাক না কেন আর লোকসমাজ সেই সব প্রথার সংস্কার ও সমালোচনা যতই করুন না কেন তারই মাঝে মাঝে মহীয়সী মহৎ চরিত্রা নারীর কিস্তি কখনো অভাব হয়নি।

সাধারণ সকলের কথা আমরা জানতে পারি না। হয়ত সঠিক কোনো মহৎ মহৎ লোকের জননী বা সহধর্মিণী অথবা সাধকপুরুষের সহধর্মিণী কিংবা ত্যাগশীলা, দানশীলা কোনো কোনো নারীর কথাই আমরা জানতে পারি। যেমন সেকালের রাণী ভবানী, তার পরের যুগে মহারাণী শরৎজন্দরী, মহারাণী স্বর্ণময়ী, মহারাণী অহল্যাবাদী প্রমুখ নারীরা। ধর্মজগতেও এমন নামের অভাব নেই—যেমন মীরাবাদী, দাক্ষিণাত্যের অণ্ডাল। প্রচার না থাকার জন্যই তবু অনেকের কথাই অনেকে জানেন না কিন্তু এমন যে সাধিকা ও মহীয়সী আমাদের আশেপাশেই থাকেন ও আছেন এ এই একালেও নিরক্ষর নারীসমাজে দেখা গেছে। ওপরে ঝাঁদের নাম করেছি তাঁরা

সেকালের ঘরোয়া পরিবেশের মাঝে মাঝে হওয়া নারী। অস্তঃপুরের বাইরের কোনো বিদ্যা শিক্ষা দীক্ষার ত্রিসীমায় আসবার সুযোগ পাননি, কিন্তু তাঁদের নাম শতাব্দী পার হয়ে গেলেও লোকে ভোলেননি।

শ্রীশ্রীশোধরা, শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া, শ্রীশ্রীসারদামণি দেবী, গৌরীমাতা এঁদের নাম আমাদের চেনা ও জানা। কিন্তু কত সাধক, কত মহৎ লোকের জননী, পল্লীর কত মহিমান্বিত চরিত্র কত আত্মত্যাগময় জীবনের কথা কেবা জানে, কেবা হিসাব রেখেছে।

এবং আশ্চর্য এইসব মহীয়সী নারীরা আপনাদের সজোপনে রাখতেই চেয়েছেন। লোকলোচনের আড়ালেই তাঁদের কাজ, তাঁদের দান ছড়িয়ে আছে। কখনো, সাধক বৈরাগী স্বামীর স্ত্রী, কখনো দেশপুজ্য সন্তানের মা, কখনো নিঃসন্তান বালবিধবার করুণাময়ী মাতৃমূর্তিতে তাঁরা সেই অন্তরালবর্তিনী জীবনেই আপনাদের জীবন উৎসর্গ করে গেছেন।

এইসব ধরনের নারীজগতে যে দৃঢ়চরিত্র মনস্বিনী

নারীও পাইনি তা নয়। যেমন রামমোহন-জ্ঞানী তারিণী দেবী, বিদ্যাসাগর-জ্ঞানী ভগবতী দেবী। আমাদের একালের কস্তুরবা, শ্রীমুক্তা বাসন্তী দেবী, সেউী অবলা বসু প্রমুখ অনেকে। এঁরাও নিজেদের আড়াল করেই রেখেছিলেন। রেখেছেন।

তবু দেখতে পেয়েছে লোকে এঁদের। পরমহংস-দেবের উক্তি আছে—‘বনের মাঝে ফুল ফোটে। কিন্তু গন্ধ তার ছড়িয়ে পড়েই। তখন লোকে জানতে পারে ফুলটির কথা। খুঁজে বেড়ায় কোথায় সে ফুল’। এমনি করেই আমরা এইসব আশ্রয় জীবনের আশ্রয় কথা জানতে পারি লোকের মুখে মুখে।

এবং এমনি ধরনের একটা আদর্শ নারীর জীবনের কথা এমনি করেই আমাদের চোখের সামনে এসে পড়েছে। ষাঁর অরণোৎসবে আমরা এসেছি। ইনিও সেই সেকালের মতই নম্র বছর বয়সে পনেরো বছরের কিশোরের সঙ্গে বিবাহিত হয়েছিলেন। খেলাঘরের শিশু মেয়ে একটা যোর-পুতুল খেলার বসন তখনো পার হয়নি। তবু সেই বয়সেও সেকালের ধরনের স্বস্তরবাড়ীতে নানা অত্যাচার-অবিচারও ভোগ করেন। সেকালে দশ বারো বছরের মেয়েদেরও বেশ বড় মনে করতেন পরিজনরা। অন্যায়সে তাদের ওপর বড় বড় কর্তব্যের দায়-বোঝাও চাপিয়ে দিতেন। অনেক সময় আবার নির্ভর কুটিল ব্যবহারও করতেন। এ কথা তখনকার কালের মেয়েদের জানা আছে। এবং এই মহিলার জীবন-কথাতেও ‘জীবন সঙ্গিনী’রও পাতায় পাতায় সে কথা পাই। দেখি কত ধৈর্য, কত সহিষ্ণুতা ও কর্তব্যপরায়ণ জীবনটা। আর মনে হয় একাধারে সহধর্মিণী ও সজ্জননীর (তখন অজ্ঞাত সজ্জনমাতার) ভূমিকা নিয়ে সে জীবন এক আদর্শ পথে চলেছে। এমন এক অজানা আদর্শ লোক!

মনে পড়ে যায় মহাভারতে যক্ষ-যুধিষ্ঠির সংবাদের কথা। অনেক প্রশ্ন। উত্তর দিতে না পারলে জল খেতে দিতে পারবেন না। কয়েকটা প্রশ্নের একটা হল, ‘পিতা কেমন? (কার মত, কিসের মত মনে করা উচিত!)’ এক মুহূর্তেই যুধিষ্ঠির বললেন, ‘পিতা আকাশের মত।’

সম্ভট ও আশ্রয় যক্ষ বললেন, ‘আর ‘মাতা’, ‘জ্ঞানী’?’

যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন, ‘মাতা পৃথিবীর মত।’

যক্ষ—‘আর ভাষা?’

ধর্মরাজ উত্তর দিলেন ‘ভাষা দৈবকৃত সখা।’

প্রশ্নোত্তর আরো আছে। সে কথা থাক। আমি মার কথাই বলছি।

তখনকার আধুনিক মনে পড়ে মনে হয়েছিল ‘পিতাকে আকাশের মত বলে যেন বেশী বড় করা হল’।

মা আর বাবা দু’জনের কেউতো কারুর চেয়ে কম নন (আমাদের সমান অধিকারের যুগ তখন)। এখন দেখছি আমার ভুল। না। যুধিষ্ঠিরের কথা ও উত্তরগুলি যে চিরকালের পরম সত্য বহন করে চলেছে তখন বুঝতে পারিনি। এখন মনে হয় সত্যিই তো জননী তো পৃথিবীর মতই বটে। তিনি ধরণী, ভরণী, লোক-পালিনী, ধারণী, ধাত্রী, মাতা, আশ্রয়দাত্রী, লালনপালন-কারিণী—একাধারে সব এবং এই মাতা ধাত্রী জননীরূপা ধরণীর মত সে আশ্রয়, সে লালনপালনশক্তি আকাশের কই? যত বড়ই হোক আকাশ। অসীম শূন্যের তো আধার নেই। সেখানে তো জননীর কোল নেই। মাতৃ-হৃদয় নেই। মাতৃস্বভাব নেই। তাই মাতৃশক্তিই আধারশক্তি। তাই জন্মমুহূর্ত থেকে মার আশ্রয় ছাড়া জীবের, মানুষের গতি নেই। তাই মা শক্তিরূপিণী। ধর্মরাজ কুন্তীতনয় তাই মাতৃরূপা ধাত্রীরূপা পৃথিবীকেই মার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। যে তুলনা অতুলনীয়। আর কোনো কেউ এমন প্রশ্নের এমন উত্তর এমন উপমা দিতে পারতেন না। যুধিষ্ঠিরের চার ভাই তখন জলাশয়ে অচেতন দেহে পড়ে আছেন।

মহীয়সী নারী-চরিত্র ছেড়ে দিলেও আমরা ঘরকন্নার মাঝেও ষাঁদের প্রতিদিন দেখি সেই সাধারণ জননী মাতাদেরও কি অপরিণীত ধৈর্য, সহ্য ও কাজ করার ক্ষমতা ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়।

যাঁরা একাধারেই কখনো বধূরূপে পরিজনের পরিচর্যা করেন। জননীকপে সন্তানদের লালনপালন করেন। আবার পত্নী সহধর্মিণীর সমস্ত কর্তব্যও অন্যায়সেই

আপনাকে নিয়োজিত করেন। আবার আর্ত রোগীর সেবাও তার মাঝে এসে পড়ে। সবই করেন। আর এই ধারিণীশক্তি নিয়ে যে কত ক্ষমতা তা জানেনও না। এমনি আশ্চর্য্যবিশ্বত কৃষ্টিত তাঁদের স্বভাব অর্থাৎ নিজের ভাব।

কিন্তু আসলে মাতৃভাবের মূল স্রবই তো তাই। নিজের কথা ভাবলে তিনি অত ত্যাগশীল হতে পারতেন না। মাতৃধর্মের স্বভাবে তাঁকে আশ্চর্য্যবিশ্বত হতেই হবে ভগবানের লীলায়।

এবং এই মাতৃমূর্তিতেই মেয়েদের পৃথিবীর মত ধারিণীশক্তি রয়েছে—যুধিষ্ঠির যেন তাই বলেছিলেন। যে কথার চীকার পর চীকা করা যায়। পণ্ডিতরা পারতেন। আবাবো তাই আশ্চর্য্য হয়ে শুনি, হজরৎ মহম্মদও বলেছেন—একজন মা কোথাও শতজন, কোথাও সাতজন পিতার মত। একটা বিদেশিনী মহিলা বলেছেন, ভগবান জীবজগৎ সৃষ্টি করে দেখলেন তিনি তো সব জায়গায় আশ্রয় দিতে থাকতে পারছেন না। তাই জীবের মাতৃ-হৃদয়ের তাঁর বাসভূমি নিকেতন হল! যেখানে করুণা, মমতায় ধৈর্যের সীমা নেই। এক কথায় জীবধাত্রী জননী না হলে সৃষ্টি রাখা যায় না।

আমাদের লৌকিক সমাজেও আবার অবাক হয়ে দেখি—আমাদের বাংলাদেশের সাধারণ লোকসমাজের প্রথাও যেন মাকে নিয়ে, মা ডাক নিয়েই অভিভূত। কন্যাকে আমরা মা বলে আদর করি। ডাকি। দুহিতাকে মা না বললে যেন পিতামাতার স্বজনের মন ভরে না। কল্যাণী নববধূ-বরণ করে ঘরে আমরা আনি—সে ক্ষুদ্র বালিকা পুত্রবধূই হোক, বা ভ্রাতৃবধূই হোক তাঁকেও কন্যা ও মার ভাবে মর্যাদা, করুণা স্নেহে বধুমাতা ‘বোমা’ বলাই প্রথা আমাদের। এবং চিরাচরিত প্রথা। পথের ভিখারী মুটে-মজুর পথিকও ‘মা’ বলে মেয়েদের ডাকে। মনস্তত্ত্বের দিকেও দেখা যায় এই ‘মা’ বলাতে মেয়েদের তাদের আর পুরুষভাবে ভয় হয় না। এমনকি আমরা পিসি-মাসী-পুড়ি-ছোট্টিকেও পিসিমা-মাসীমা-পুড়িমা বলে মা সংজ্ঞায় না এনে পারি না। যেন মা বলে ডাকাই আমাদের স্বাভাবিক ডাক।

এবং আশ্চর্য্য ভারতের অল্প প্রদেশে এ ভাবের আল্হান বধু-কন্যাকে বা পিসি-মাসীদের করতে দেখিনি। বর্ষীয়সীদের অবশ্য মা, মাতাজী তাঁরাও বলেন। সম্মানও খুব করেন।

সে যাক। আমার বলবার কথা হল যে, নারীর সব ভাবের সঙ্গে কন্যা-বধু-সখি-সহধর্মিণী ভাবের পরম ও চরম পরিণতি—গভীর আর মজ্জাগত ভাব হল মাতৃভাব। এবং আশ্চর্য্য এক নির্ভর আশ্রয়দাত্রী। তা তিনি জীবজন্মনী হোন বা না হোন। নিজের ছেলের সন্তানের মা না হযেও অন্নের ‘মা’ অহ্বানে অথবা করুণাতেই তিনি মাতৃভাবেই পূর্ণ হয়ে ওঠেন। এই ভাবের মহিমাই এমনি। এ আর দৃষ্টান্ত উদাহরণ দিবে কোনো দেশেই দেখাতে হবে না। এ তাঁর নিজেরই ভাব। নইলে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুমিত্র নির্বিশেষে সেবিকা হয়ে যেতে পারতেন না। এই চিরকালের সেবিকা-সজ্জ রেডক্রস সজ্জ গড়ে উঠত না। এও এ সেই অপার করুণাময়ী জগদ্ধাত্রীকৃপিনী তরুণী কুমারী মাতৃমহিমাময়ী নারীর দান। তাঁর আগে কে ভেবেছিল যুদ্ধক্ষেত্রে আহত পীড়িতের কথা। আমার জানা নেই। সে দেশে ‘মা’ সম্বোধন ছিল না হয়ত। কিন্তু মাতৃ-হৃদয় চিরকালের বুকে আছে। সে হল দেশকালাতীত।

বিদেশিনী নিবেদিতা দরিদ্র কুটীরবাসী ভারতবাসী প্লেগরোগিণীর সেবার জন্ত এক মুহুর্তে পথে নেমে এসেছেন মাতারূপে, জগন্মাতার মাতৃভাবের মহিমা বহন করে।

প্রায় দুশো বছর আগের কথা। এলিজাবেথ ব্রাই কিসের প্রেরণায় হৃদয়ে কোন্ ভাবের আবির্ভাবে বিলাতের কারাগারজীবনের কারাবাসীদের বেদনা দুঃখ অপরাধী জীবনের মাঝে সাস্থনা ও শান্তির বাণী নিয়ে যেতেন। যারা অনেকেই ঘোরতর অশিক্ষিত নির্ভর বর্বর স্বভাবের ছিল। পড়া যায় তারা বেশীর ভাগই বিরুদ্ধ ভাবের ছিল। কিন্তু তিনি তাদের মাতৃস্নেহে জয় করেছিলেন। তাঁর হাতে ছিল বাইবেল, হৃদয়ে ছিল করুণা, মমতা।

বিখ্যাত পর্যটক লিভিংষ্টোনের কথাও গল্প পড়েছি ছোটবেলায়। তিনি আফ্রিকার আদিবাসী জননীদে

আশ্রয়েই নিজের প্রাণ রক্ষা করতে পেরেছিলেন। তাই জানা ছিল না। দেশও অজানা। আশ্রয়হীন বিদেশীকে ওই মাতৃমূর্তিরাই আশ্রয় দেন।

আর এক মাতৃশক্তির আশ্চর্য মূর্তি শ্রীমতী হারিয়েট বিচার ঠোনে। আঙ্কল টমস্ কেবিনের টমকাকার কুটীরেব লেখিকা। ষাঁর করুণাময়ী মাতৃশক্তির লেখনীর অমর শক্তিতে আমেরিকায় ক্রীতদাস প্রথা উচ্ছেদ হয়ে গেল।

রাজা রামমোহন রাষ যখন কিশোর বালক—৫।১৬ বছর বয়স হন—তিব্বতে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে বলেছেন, সেখানে নানা বিপদ থেকে তিব্বতনারীর মাতৃ-মূর্তি ওই ভাষানভিজ্ঞ আচার-অনভিজ্ঞ তিব্বদেশী পর্যটককে রক্ষা করেছেন। তাঁর রক্তক্ষততার সীমা ছিল না তাঁদের উপর।

শিকাগো ধর্মসভার কর্তৃপক্ষের ঠিকানা হারিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ যখন সে দেশে অনাহারে নিরাশ্রয়ে নানাভাবে বিপন্ন তখনো পথের ধারের এক অট্টালিকা থেকে একটা করুণাময়ী দেবীই তাঁকে তাঁর ঘরে এনে আশ্রয় দেন।

এক কথায় সৃষ্টিরক্ষার গোড়াতেই এই করুণাময়ী মাতৃশক্তি রয়েছেন। যিনি মহীয়সী। ইন্দ্রিয়াতীত দেবী। মাতা মূর্তিতে বিরাজিত।

এবার আমি আমাদের পুজনীয়া সজ্জমাতার জীবনের কথায় আসি। আগেই আমি বলেছি আমি তাঁর মহৎ জীবনের কোনো কথাই জানি না। আমাদের তাঁর সম্বন্ধে বলতে হবে—পড়া কথা ও শোনা কথা।

কিন্তু পড়ে বা শুনে কি কোনো মহৎ জীবনের ধারণা হয় বা বলা যায়? সেও ভাববার কথা।

হঠাৎ মনে হল আমরা দেখেছি আর কজন মহামানবকে এবং দেখলেও চিনেছি বা জেনেছি, বুঝেছি এমন কথাই বা কে বলতে পারবে। হয়ত যাদের দর্শন লাভ হয়েছে, চিনি নি। বুঝি নি। যাদের দেখিনি পড়েও নেই এমন বা কি বুঝে নিয়েছি! তাও তো নয়। শ্রীশ্রীয়া সারদামণি তো কতদিন ছিলেন কলিকাতাতেই—কে আর দলে দলে তাঁর চরণপ্রান্তে গিয়েছি। প্রবর্তক

সজ্জজননীও যে দেশে ছিলেন সেখানেই বা তাঁর সান্নিধ্যে বা চরণের কাছে কজন এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

কাজেই দেখছি মহৎকে মানুষ দেখলেও চিনতে পারে না। চিনলেও যেতে ভালবাসে না। ব্যক্তিগত অঙ্কার আছে। সঙ্কোচ আছে। মূঢ়তা আছে। কত দুর্বলতাও আছে। শরণাগত আর ক'জন আমরা হতে জানি।

সুতরাং এ প্রসঙ্গে আমার ভরসা শুধু ‘দীর্ঘ-সঙ্গিনী’র কয়েকটি উক্তি। সজ্জমাতার তাঁর নিজের মুখের ছোট ছোট সরল উক্তি।

তিনি যথার্থ নির্মলতা সরলতায় অক্ষপ্রাণা ছিলেন। তাই অনায়াসেই বলেছেন :

আন্তরিকতা :—“আমি শাস্ত্র মন্ত্র কিছুই জানি না, আমি ঠাকুর হাবলা ফুল দিই খাবলা খাবলা—ঠাকুর তাই হাত পেতে নেন।”

বাহির ও অন্তরের নির্মলতা :—“যার ভিতর পরিষ্কার তার বাহিরও পরিষ্কার। ঘরে যে ওঁচলা ময়লা জমিয়ে রাখে সে যতই বলুক তার ভিতর শুদ্ধ নয়...”।

সত্যের আঁচ :—“সত্য কথা বলবে।...মন রেখে কথা বলা নিজেরও অনিষ্ট করা। সত্যের পথে মার নেই।”

অনলস মিষ্ঠা :—“যে কাজ করবে যোলো আনা খুঁটিয়ে করবে। কর্মের অঙ্গহানি ভাল নয়। ধর্ম চাও তো আচার ঠিক রেখো।”

বৃথা বাক্য :—“হাজারবার এক কথা বলার দরকার কি? মানুষ যে সে এক কথায় উঠে দাঁড়ায়। কথায় বলে ‘শাক হয় তো ‘সিদ্ধ’ মানুষ হয়তো বুঝ’। (সিদ্ধ হও)।”

অবিশ্বাসী প্রসঙ্গে :—“স্বার্থের জন্ত যে ভাগবত সঙ্ঘ ছাড়ে তাকে আর বিশ্বাস করতে নেই। সে ঘায়ের পোক। ফুলের গন্ধেও লোভ আছে। তাকে স্থান দিতে নেই।”

চরিত্রবল :—“ছেলেমেয়ের চরিত্রের জন্ত ভাবনা কেন? যে ভগবান চায় সে কি আর অশুদিকে চায়? সে নিজের ভাবনা ভেবে নেবে।”

রাহ

আরাধনা গুণ

বজ্রধার শরীরটা কদিন থেকেই ভাল ষাচ্ছিল না। কি যে তার হয়েছে কিছুই বুঝে উঠতে পারে না সে। কেবলই মনে হয় বুঝিবা একটা শক্ত অস্ত্র হবে। বজ্রধা অকারণে চিস্তিত হষে ওঠে। এর পর ঝামেলা। অনেক-দিন পর বীণি আসবে লিখেছে।—লিখেছে তোরা ওখানে কয়েকটা দিন থেকে আসব। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বজ্রধাকে লিখতে হয়েছে—বেশ তো আসিস।

শহরতলীর এক কামরা টিনের ঘর। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অল্প ভাড়াটেদের কিচিরমিচির। বাথরুম

নেই। বাঁশের খুঁটিতে চট টাঙ্গিয়ে একটা ঘরের মত করা হয়েছে—মাত্র সেইখানেই মেয়েদের লক্ষ্মানিবারণের প্রবাস। এ ছাড়া জলকল মাত্র একটা। অথচ ভাড়াটের সংখ্যা দশ ঘর। বাইরে থেকে কিন্তু বোঝার উপায় নেই। রেডিওর বিচিত্র কলরব লেগেই আছে।

বজ্রধার সবচেয়ে বিসদৃশ লাগে যখন গণ্ডাতিনেক উলঙ্গ নোংরা ছেলেমেয়ে এ বাড়ীটাকেও আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্র মনে করে গান জুড়ে দেয়। অর্থাৎ হৈ হৈ কান্না হাসি ঝগড়া করতে শুরু করে। এই বাড়ীতে

নিন্দাবাক্যের বিরুদ্ধে :—“যে ফাঁকি দেয় জবাব তাকেই দিতে হয়। তোমাদের তা নিয়ে তর্কাতর্কি কেন?...ভগবান তো কানা নয়।”

পরিচ্ছন্নতা :—“কাপড় পরবে ঝরঝরে। মাথায় চিরুণী দেবে। কিন্তু ভাবন করবে না....। ...ভগবান ‘ভাব’ দেখেন। লক্ষ্মীশ্রী না থাকলে ধর্মও টেকে না। উলিষে গুছিয়ে জুসার করবে সংসারের।”

এই ছোট ছোট উক্তি থেকেই তাঁর দৃঢ়তা, স্বল্পভাবিতা, নিষ্ঠাময় মনটুকু ধরা পড়ে যায়।

“ভগবানের পথে কাজ ‘ছোট বড়’ বলে কিছু নেই। যে তা মনে করে তাকে ফিরে যেতে হবে।

“সত্য মানুষকে বেশী কথা বলতে হয় না।”

এক একটা কথায় দেখি, যেন সাধারণ মানুষের কাজকে ফাঁকি দেবার ইচ্ছা—কারুর সততার অভাব, কারো নিন্দাশ্রবণতা, কারো কুঁড়েমী, অপরিচ্ছন্নতা, নিষ্ঠাহীনতা তখনি তাঁর চোখে ধরা পড়েছে। এবং যেমন ধরা পড়েছে অমনি ছোট ছোট কথায় সেটুকু ধরে দিয়েছেন....।

এই অস্ত্র:পুরচারিণী এখনকার হিসাবে অশিক্ষিতা মহিলাটির চরিত্রের দৃঢ়তা, ত্যাগের পরিমাণ, পাতিল্পত্যর জ্ঞান সর্বদুঃখস্বীকার তাঁর পতি সম্ব্যপ্রতিষ্ঠাতা রচিত “জীবন-সঙ্গিনী”র পাতায় পাতায় ছড়ানো আছে। এবং তাঁর সঙ্গে যেসব স্বামীর ও নিজের কর্মসঙ্গী ও কর্মসঙ্গিনী

ছিলেন, তাঁদের মনে উজ্জ্বল হষে আছে সন্দেহ নেই। অল্পদিনই জীবিত ছিলেন তিনি। নিজের সন্তানের অনন্য তিনি একবার মাত্রই হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সমস্ত জীবনটা পতিসেবা পতিপ্রাণতায় ও মাতৃভাবের এবং কর্তব্যের আদর্শে সমুজ্জ্বল ও পূর্ণ। নিজের সত্তা তাঁর ছিল। কিন্তু সেটা তাঁর সঙ্গোপন সত্তা। ভারতনারীর মত অথবা সকল নারীর মতই। তাই থেকেই দেখা যায় তিনি নিজের দৃঢ়তা দিয়েই কতবার পতিকে পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। যে পথে দৃঢ়তা নয়—নম্রতা ও প্রেমেরই জয় হয়।

তাঁর স্বামীর একটা উক্তি দিয়েই আমার আঙ্গকের কথা শেষ করি : “নারীর সত্যীমূর্তির বিগ্রহ হইয়াছে যুগে যুগে। পুরুষও সত্য ও তুষ্করের সাধনা করিয়াছে। তার সে সিদ্ধরূপ বৈরাগ্যের উত্তরীয় উড়াইয়া বিঘোষিত হইয়াছে। (কিন্তু) সংসারে ও সমাজের মধ্যে সত্যী-নারীর ভাষ সংপুরুষের আবির্ভাব আমি অতি দুর্লভ বলেই মনে করি।”

আমরা আশ্চর্য হয়ে দেখেছি পতিও দুর্লভ সত্যী-মহিমা উপলব্ধি করেছিলেন এবং সত্যীও আশ্চর্য পতির সহধর্মিণী হয়েছিলেন। আর দেখছি শিবময় সম্ব্যপ্রতিষ্ঠাতা যেন মহাশক্তি। যেন প্রতিষ্ঠাতার কল্পনা ও রক্ষা-শক্তির মাতৃমূর্তি।

নিজের থাকাই দায়, অপরকে আসতে বলা বিড়ম্বনা মাত্র। অথচ না বলে উপায়ই বা কি। সংসার করতে হলে এই রকম উৎপাত এসে পড়বেই। প্রিয়জনের সান্নিধ্যে যথেষ্ট আনন্দ আছে কিন্তু তার গভীরতায় যে দুঃখপ্রবাহ বয়ে চলেছে তাকে অস্বীকার করবে কি ক'রে সে? একি কম বড় ট্রাজেডি? ওর অন্তরের একটা অশ্রুসিক্ত ভাব বয়ে যায়। আজকের এই জুঁটিটুকু আঁকড়ে ধরতেই কি কম মূল্য দিতে হয়েছে তাকে?

বীথির অবস্থা মোটামুটি ভাল। ওর রুচিও অল্প জ্বাতির। কোথাও মিল নেই বসুধার সঙ্গে। তবু মিলনের আকৃতি কিভাবে এবং কেমন করে যে গড়ে উঠেছে তা কেউই বলতে পারে না।

সুজিত বলে ওসব কামেলার দরকার কি। লিখে দাও এখানে এলে তোমার অসুবিধাই হবে। বসুধা কথাটা মেনে নিতে কিছুতেই পারে না। যে আসতে চাইছে সে তো সবই জানে। সব ভেনেই আসবে। এ কি কাউকে বলা যায়? সুজিতটা যেন কি! সংসারে থাকতে গেলে সহজ সরল ভদ্রতা যেটুকু, সেটুকুর বলাইও ওর নেই। বসুধা অনেক কিছুই ভেবে দেখেছে। কোনমতেই সুজিতের সঙ্গে একমত হতে পারেনি।

বসুধার মাথাটা কেমন ভার-ভার লাগছে। সত্যিই ওর শরীরটা খুবই খারাপ যাচ্ছে। অবসন্ন বোধ করছে সে। যেন নিশ্চয় হবে আসছে তার সবকিছু। উৎসাহ উদ্দীপনা কোন কিছুই পাচ্ছে না সে। প্রথম বাচ্চাটা যখন হয় তখন সে বিরাট একটা দুর্ঘটনার মধ্যে পড়েছিল। বাঁচবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না, তবু বেঁচে উঠেছিল সে। মেয়েটার অবস্থাও তথৈবচ। ডাক্তার বলেছেন স্বাভাবিক হতে ওর অনেক সময় লাগবে।

বীথির ছুই ছেলে। ছেলে দুটি হয়েছে বেশ। বীথি তাই সব সময়ই তুলনামূলকভাবে বিচার করতে বসে, স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিকের মাঝখানের পার্থক্যটা।

সুজিত বলে, এইখানেই তো আমার আপত্তি। ঘটনাস্রোতের একটা গতি আছে। সে গতি স্বাভাবিকও হতে পারে, অস্বাভাবিকও হতে পারে। বিশেষভাবে তাঁর আকৃতি প্রকৃতি ও উৎসমূল প্রভৃতি নিয়ে মাথা

ঝামাঝার কিছু নেই। গতিটাই যেখানে সত্য, সেখানে এই সকলের তাৎপর্য নির্ণয় যারা করে তারা অসাধারণ তো নয়ই অতি সাধারণই। রহস্য-সৌন্দর্যের উপলব্ধি তাদের কোন মতেই আসতে পারে না।

বসুধার ধারণা, এ সবই তার ভাগ্য। নইলে মা তো সকলেই হয়। কারুরই তো এ সমস্তা দেখা যায় না! সুজিত এ কথা স্বীকার করে নিয়েই বলে—এ তোমার মনের বিকার বসুধা। প্রাণলীলার বৈচিত্র্যই সংঘাত। সেই সংঘাত যার নেই তাকে সুস্থ তো বলতে পারে না। বসুধা অত গভীরে যেতে কিছুতেই রাজী নয়। প্রাণ-লীলার যে তথ্যই থাক, দৃশ্যতঃ যা সেইটাই তার কাছে সবচেয়ে বড়। সুজিত জানে বসুধার এই মানসিকতা। ওর শরীরটা যে খারাপ হচ্ছে, তার মূলেও ঐ একই চিন্তা। তাই সুজিত বসুধাকে বড় একটা কারও সঙ্গে মিশতে দিতে চায় না। বিশেষ ক'রে বীথির সংস্পর্শে—কেননা, ও জানে বীথি দান্তিক। খোঁচা দিয়ে কথা বলাই ওর স্বভাব। নিজের মিথ্যা ঐশ্বর্য দেখিয়ে অপরের মনে আঘাত দেওয়ার একটা প্রবণতা ওর সহজাত।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুজিতকে মত দিতে হয়।

ওরা আসে।

• •

*

*

*

বীথি বলে—দেখ দেখ কেমন ছেলে। এরি মধ্যে ও সব শিখে নিয়েছে। আর ছোটটা সবে ছ' মাস বয়েস কিন্তু জানিস এরি মধ্যে এত ছুঁই হয়েছে, তা তোকে কি বলব? মিটসেকের ভেতর টিনের কোটা থেকে বিস্কুট বের করে নিয়ে আসে।

বীথি ধানিকটা গম্ভীর হয়। বলে—তোর টুকুন—কি আর করবি—পরে সব ঠিক হয়ে যাবে। বসুধা সহ্য করতে পারে না। তাবে কোথায় এর উপসংহার। বৃকের মধ্যে যেন একটা অব্যক্ত কান্না শুমরে ওঠে।

সুজিত পাশে দাঁড়িয়ে ওর মাথায় হাত রাখে। বলে—“এ আমি জানতুম।”*

* ১২ই মে ব্যাঙেল অবিবেশনে প্রবর্তক-সাহিত্যক্ষেপে পঠিত।

ঋষি মতিলালের স্মৃতিরক্ষা

শ্রীশুরেশচন্দ্র মজুমদার

মহামনীষী ঋষি মতিলালের গুণমুগ্ধ দেশবাসী এবং তাঁহার অগণিত ভক্ত ও শিষ্যগণ তাঁহার স্মৃতি-মন্দির নিশ্চিন্তে এবং সেই মন্দির-সংলগ্ন একটি সংস্কৃতি-ভবন ও একটি জাতীয় সংস্কৃতি অমূল্য-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতেছেন ইহা অত্যন্ত সুখের বিষয়। স্মৃতি-মন্দিরে তাঁহার মূর্তি প্রতিষ্ঠা ও তাঁহার স্মৃতিরক্ষার উপযোগী অস্ত্রাদি রক্ষিত হইবে; তবে সংস্কৃতি ভবন ও সংহতি অমূল্য কেন্দ্রের রূপটি ঠিক কি হইবে তাহা এখনও খুব স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। আমরা দৃঢ়কণ্ঠে বলিতে পারি যে, দেবভাষা বা সংস্কৃতিই ভারতবর্ষ ও ভারত-সংস্কৃতির মূলধার এবং দেবভাষাকে বাদ দিয়া দেবজাতি বা আশ্বস্ত ভারতীয় নব জাতি ক্ষণমাত্রও তিষ্ঠিতে পারে না। ঋষি মতিলাল ইহা সম্যক্রূপে উপলব্ধি করিয়াই ভারতীয় জীবনে শ্রুতি, স্মৃতি ও স্মারকের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন এবং দেবভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার আসনে প্রতিষ্ঠা না করিলে ইহা অসিদ্ধ হইতে পারিবে না বলিয়া নিখিল ভারতীয় দেবভাষা পরিষদের কার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমাদের বিনীত নিবেদন ইহাই যে, প্রস্তাবিত সংস্কৃতি ভবনকে একটি সংগ্রহশালা মাত্র না করিয়া যদি একটি জীবন্ত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয় তাহা হইলেই প্রতিষ্ঠাতৃগণের উদ্দেশ্য অধিকতর সুন্দররূপে সিদ্ধ হইতে পারে; আর সেরূপ করিতে হইলে ঐ সংস্কৃতি ভবনকে মূলতঃ একটি দেবভবনে অর্থাৎ দেবভাষা মহাবিদ্যালয়ে পরিণত করিতে হয়; আর অমূল্য কেন্দ্রকেও দেবভাষাকে ভারত রাষ্ট্রভাষায় পরিণত করার অস্বতন্ত্র প্রধান কেন্দ্ররূপে পরিণত করিতে হয়। ঋষি মতিলালের আন্তরিক ইচ্ছা অনেকটা এইরূপই ছিল। তিনি এই দীন লেখককে পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, নিখিল ভারতীয় দেবভাষা পরিষদকে প্রবর্তক সম্মেলন সহিত তিনি একই স্থানে পাঁচদিন দিবেন এবং পাটনায় ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত উক্ত পরিষদের কার্যকারিণী সমিতিতে এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনাও হইয়াছিল। যদিও

নানা কারণে তাহা কার্যে পরিণত করা সম্ভব হয় নাই। আমাদের বর্তমান প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইলে ঋষি মতিলালের আন্তরিক ইচ্ছাকেই যথার্থ রূপ দেওয়া হইবে; কেননা দেবভবনের শিক্ষক ও ছাত্রগণ স্বকীয় জীবনে ভারত-সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা করিয়া পরে উহা সমগ্র ভারতীয় জীবনে পরিব্যাপ্ত করিতে পারিবে এবং অমূল্য কেন্দ্রের সংস্কৃত-রাষ্ট্রভাষা বিভাগও ইহার জন্য আবশ্যিক প্রচার-কার্য করিয়া যাইতে পারিবে। ঋষি মতিলাল দৃঢ়কণ্ঠেই বার বার বলিতেন যে, দেবভাষা ছাড়া অস্ত্র কোন ভাষাই ভারতীয় দেবজাতির রাষ্ট্রভাষা হইতে পারে না। আজ যখন পবিত্র মহালয়ার ত্রয়োদশীতে আকাশবাণীর কলিকাতা, দিল্লী, পাটনা ও লক্ষ্ণৌ কেন্দ্র হইতে উদাস্ত স্বরে শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ হইতে দেখি তখন গর্ব ও আনন্দে বক্ষঃস্থল স্ফীত হইয়া উঠে, আর সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে হয় যে ঋষি-ভারতের দিব্য দৃষ্টিগত পন্থাই যে অস্বস্ত এ কথা অনেকেই এখন উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং এই পথেই যে ভারতের ঐক্য ক্রমতর ও দৃঢ়তর হইবে ইহাও দ্রুত সত্য। ঋষি মতিলাল কাহারও নিন্দা-স্বত্তিতে ক্রোধ না করিয়া নিখিল ভারতীয় দেবভাষা পরিষদের পুণ্যপীঠ হইতে এ কথা বার বারই ঘোষণা করিয়াছেন। অতরাং কেবল সংগ্রহশালা নহে, একটি জীবন্ত প্রতিষ্ঠানই যে এই দিক দিয়া তাঁহার স্মৃতিকে অমর করিতে পারে এ কথা দৃঢ়কণ্ঠেই আমরা বলিব এবং প্রস্তাবিত ঋষি মতিলালের স্মৃতি-মন্দির-সংলগ্ন সংস্কৃতি ভবনকে একটি দেবভাষা মহাবিদ্যালয়ে পরিণত করিবার জন্য উক্ত মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতৃগণকে সশ্রদ্ধ ও বিনীত অনুরোধ করিব। যিনি ব্রহ্মসুত্র, শ্রীমদ্ভাগবতগীতা ও শ্রীশ্রীচণ্ডীর ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন, একটি দেবভাষা মহাবিদ্যালয়ই যে তাঁহার পবিত্র স্মৃতিরক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় এ কথা আবার আমরা দৃঢ়কণ্ঠে বলিব। এই দেবভাষা মহাবিদ্যালয়ে বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া দেবভাষার যাহা কিছু ঐশ্বর্য ও মহিমাময় সে সমস্তই যদি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবার ব্যবস্থা হয় এবং

স্মৃতি-আলেখ্য

শ্রীমুশীলপ্রসাদ সর্বাধিকারী

[প্রগতিশীল জাগরণ-চঞ্চল বাংলার শতাব্দীর জীবন্ত ইতিহাস হিসাবে শ্রীমুশীলপ্রসাদ সর্বাধিকারী আজও বর্তমান। তাঁর বয়স ৮৫ বৎসর, কিন্তু মনীষা উজ্জ্বল, স্মৃতি অস্মান। বাংলা তথা সারা ভারতবর্ষে সর্বাধিকারী পরিবার সুপরিচিত।^১ বহু ঐতিহাসিক-রত্ন এই পরিবারের অবদান। এই দেশের ক্রীড়াক্ষেত্রের নাডী-নন্দন ক্রীড়াকুশলী মুশীলপ্রসাদের নথ্যদর্পণে। ক্রীড়া ছাড়াও বাংলার সামাজিক, সংস্কৃতি ও শিক্ষাক্ষেত্রের সহিত সর্বাধিকারী বংশ ঘনিষ্ঠভাবে সংজ্ঞাভিত ছিল। সুতরাং মুশীলপ্রসাদের আত্মজীবনীর স্মৃতি-আলেখ্য প্রসঙ্গে প্রায় শতবর্ষের ক্রমবিবর্তিত বিশ্বতপ্রায় বাংলার একটা ঘনিষ্ঠ চিত্র আঙ্গিকার বাঙ্গালীর নিকট উপস্থিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।—প্রঃসঃ]

মাঘের পেট থেকে পড়ি আমি Infentile Liver নিয়ে। যমে-মাহুঘে টানাটানি চলে আমাকে নিয়ে আমার পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত। তার রেশ চলে, যখন আমার দশ বৎসর বয়স তখনও। দশ বৎসর বয়সে আমার বাবা সর্বপ্রথম আমাকে স্কুলে পাঠানর সুযোগ পান। এসব কথা শুনা আমার মায়ের মুখে। বেশ কিছু আমারও মনে আছে।

যমের বিরুদ্ধে সদা সতর্ক প্রহরী ছিলেন একদিকে মা, অল্পদিকে বাবা। সজাগ ছিলেন বড়দা, বড় বৌদিও। মেডিকেল কলেজ খেঁটিয়ে বড় তাঁর বড় আই-এম-এস-এ-দের চিকিৎসা-নৈপুণ্য ঘটেছিল আমার ভাগ্যে। এদের সকলের দাপটে যম বেচারী শেষে রণে ভঙ্গ দিতে পথ পায় না।

যম কামড় দেয় একবার বেজায়। তখন আমি পাঁচ বৎসরের। বাবা কোথায় কতদিন চলে গেছেন কেউ জানে না। দিগ্গজ আই-এম-এস-এরা প্রাণপণ চেষ্টা

করে অসামাল হ'বে পড়েছে। অবশেষে একদিন আমাকে মৃত ধার্য্য ক'রে শুষ্কমুখে তাঁরা বিদায় নেন।

গৃহস্থ আমার শেষকৃত্যের জন্ত প্রস্তুত। গৃহপ্রাঙ্গণ হইতে শব লইয়া যায়-যায়। এমন সময়ে কোথা হইতে পিতা তথায় আসিয়া উপস্থিত। নিমেষে অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এবং 'মৃত'কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া দৃঢ়কণ্ঠে তিনি আদেশ করিলেন, খোকাকে ঘরে নিয়ে যাও। তখন সকাল প্রায় নয়টা।

ঘরে থোকর স্থবির চিকিৎসা আরম্ভ হইল। স্বর্ঘ্যাস্থের পূর্বে থোকর মার কোলে খোকাকে দিয়া পিতা বলিলেন, আমার কাজ আপাততঃ শেষ, তোমার কাজ নূতন করিয়া শুরু হ'ল। মাতৃদেবীর কাজের জের ভোগ করিতেছি এই ৮৫ বৎসর বয়সে।

সর্বকালে সর্বজনকর্তৃক ধন্যস্তরী জ্ঞানে অভিনন্দিত ও পুজিত পিতৃদেবের গুণপনার চরম নিদর্শন পাওয়া গেল মরা ছেলের দেহে প্রাণসত্তার সঞ্চারে। ইহার

ভারত-সংহতির অমুশীলন কেন্দ্রে যদি আমাদের জাতীয় ঐক্যের মূলমন্ত্র দেবভাষা সংস্কৃতকে রাষ্ট্রীয় ভাষা করিবার জন্ত সূচু ও কার্য্যকরীভাবে প্রচারকার্য্য চালান হয় তবে তাহা অপেক্ষা ধ্বি মতিলালের উৎকৃষ্টতর স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা আর কি হইতে পারে? অবশ্য প্রবর্তকের প্রকাশন বিভাগ হইতে তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর যথারীতি প্রকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থাও করিতে হইবে। তাঁহার প্রতিভা বহুমুখী, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সকল কথা বলা সম্ভব নয় বলিয়া আমি কেবল তাঁহার দেবভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষা করিবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টার কথাই এস্থলে

উল্লেখ করিলাম। আমাদের নিরতিশয় দুর্ভাগ্যক্রমে মহাভারত আজ খণ্ড ভারতে পরিণত; এই খণ্ড ভারত যাহাতে আরও খণ্ডিত না হয়, ভাষা লইয়া কলহের ফলে অমৃতের পরিবর্তে গরল উখিত হইয়া যাহাতে ভারত শরীরকে বিষময় করিয়া না তুলে তাহার জন্ত ভাবতের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ঐক্যের সুবর্ণ স্মৃত দেবভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করাই অবশ্য কর্তব্য এবং তাহাই হইবে অকৃত্রিম দেশসেবক ধ্বি মতিলালের স্মৃতিরক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা ইহা নিঃসন্দেহেই বলিতে পারা যায়।

বহুকাল পরে সতীরাণীকে হাসিয়া বলি—সত্যবানের পূর্ণ জীবনলাভ ঘটে নিশ্চয়ই স্বর্ধাকুমারী-নৈপুণ্যে, সতী সাবিত্রীর সভার মধ্য দিয়া। কোনও কিছু না বলিয়া হাতজোড় করিয়া কাহার উদ্দেশ্যে প্রণাম তিনি জানান। বোধহয় ঋষিতুল্য ঋক্বেদেব ও সতীকুলবাণী সাবিত্রী উভয়েরই উদ্দেশ্যে।

মৃতদেহে নবজীবনের সঞ্চার তো হল কিন্তু বিচারে আহার চলল হাটলী পামারের ধিন এরোরুট বিস্কুট। তাতে আমার কিছু এসে যায়নি, যদিও অপরের সমবেদনার আঁচ গায় লাগতে থাকে। মনে হয় আমার—
ওরা কি জানে।

একদিন একমুঠো গরম মুড়ি এনে আমার পকেটে দেয় লুকিয়ে। সে কি যন্ত্রণা। তা ফেলে দিষে তবে আমি স্থির হই। চোখ আমার জলে ভরে যায়, লুকোচুরির ক্ষত। বড়দা তখন এসে পড়েন। জিজ্ঞাসা করেন কি হয়েছে রে? সব শুনে তিরস্কার করেন ছোড়দিকে। তাতেও মন ধারাপ হয় আমার।

ধিন এরোরুট চলে আমার নয় বৎসর বয়স পর্য্যন্ত। দশমে অন্নগ্রহণের অনুমতি পাই। বিস্কুটের গাদা গাদা টিনের দিকে চোখ প'ড়তেই আমার কান্না পায়। মা তা বুকে আমাকে বুকে টেনে নিষে ব'ললেন, যখন ইচ্ছে বিস্কুট খাবি। বিস্কুটই ত'তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। বড় হয়েও বিস্কুট খাবার লোভ আমার থেকে যায়।

অক্ষম শরীরের দক্ষ লেখাপড়ায় তাগিদ বড় কেউ কবেনি, পড়বার আমার ইচ্ছা থাকলেও। সেজ্ঞদা (কৃষ্ণপ্রসাদ) মাঝে-মাঝে গল্পছলে কিছু-কিছু শোনাতেন মাত্র। আমার প্রধান কর্তব্য ছিল, মায়ের সঙ্গে সঙ্গে থাকা আর ডাক্তার আসবার সময়ে তৈরী থাকা।

বৈকাল ৪টা আন্ডাজ আমাদের ডাক্তারখানায় যাওয়া এবং সেখান থেকে ডাক্তারের সঙ্গে তাঁর গাড়ীতে মাঠে বেড়িয়ে আসা। এই বেড়িয়ে আসা ছিল আমার ডাক্তারীর প্রধান অঙ্গ।

আমার যখন সাত বৎসর বয়স, ডাক্তার আমার অবসর গ্রহণ ক'রে দেশে চ'লে যান। যাবার পূর্বেদিনেও আমাকে বেড়াতে নিয়ে যান তিনি যথারীতি। বাড়ীতে (ওয়েলিংটন স্ট্রীটে) নামিয়ে দিয়ে একটা বড় ব্যাগ ভর্তি বিলেত থেকে আনা ভাল ভাল খেলনা আমাকে দেন। তুলে নিয়ে আমাকে আমার শিরশ্চূষন করেন। দেগি তাঁর চোখ ভিজ্জে-ভিজ্জে। খুব কান্না আমার পায় তা দেখে। আমার পিঠ চাপড়ে তাড়াতাড়ি গাড়ীতে গিয়ে তিনি ওঠেন।

পরদিন তাঁর একখানা চিঠি পাই—থরে থরে বাংলাতে লেখা। লেখেন তিনি—আমার গাড়ি-ঘোড়া রইল তোমার জন্য, বেড়াতে যাবে ব'লে। সেই গাড়ী ঘোড়া হয় মায়ের খুবই প্রিয়। সেই গাড়ীতেই গঙ্গাস্নান করেছেন তিনি জীবনভোর। সেই গাড়ীতেই দাদারা ইউনিভার্সিটিতে গেছেন পরীক্ষা দিতে ও পরীক্ষা দিয়ে বাড়ী ফিরেছেন। সতীরাণীকে, আমাদের বিয়ের পরে, সিমলে তাঁর বাপের বাড়ী থেকে নিতে এসেছে সেই গাড়ী।

ডাক্তারের ছবি আমার বুকে আঁকা। তবু সতীরাণী তাঁর ফটো ধরে টাঙ্গান, ফুল দিয়ে সাজিয়ে নিত্য তাঁকে প্রণাম করেছেন। তাই দেখে তাঁর বাবা হেসে বলেছেন, ওসব আর কেউ করে না রে, পাজি বলেই ছেড়ে দেব।

(ক্রমশঃ)

বঞ্চনা

শ্রীকুলদারঞ্জন মজুমদার

চাওয়া পাওয়ার স্বপ্নে সদাই
হানাহানির মত্ততা।
স্বার্থ নিয়ে খেলায় কী যে
পাগল করা ব্যস্ততা!

সর্বনাশা চাওয়ার ক্ষিদে
পেলেও বাড়ায় আশার জিদে,
নইলে, তবু ভেকে আনি,
অসার আশার ব্যর্থতা!

বঞ্চনার এই খেলায় ফুলে,
কাটিয়ে জীবন অবহেলে,
অবশেষে, পেলাম কিবা,
হৃদয়-ঝোড়া শূন্যতা!



বাইশে পৌষ

ত্ৰীহিন্দু গুণ্ড

উৰ্দ্ধমুখী এটি শিখা, একদিন
উঁকার পরিক্রমার পথে
ছুঁয়েছিল এই মাটি ;
এই মাটির জীবন উৎসব
এনেছিল মজলের নিরাসক্ত আশীৰ্বাদ ।
সে আশীৰ্বাদ আদিগন্ত সৌন্দৰ্য্যের
আশ্চৰ্য্য নিৰ্ৱৰ, সজ্জগুৰুৰ আবিৰ্ভাব ।
সেই সজ্জগুৰু সজ্জ-স্বপ্নে বিভোর হয়ে
নিশীথ রাত্রির আকাশে
স্বৰ্য্যের মতন চেয়ে রইলেন
দৃষ্টির সীমাহীন উল্লাসের
উন্মল বাতাসে, নিজেরই সংযোগে ।

দিগন্তে বনানী রেখায় ফুটে উঠলো
মুহু মুহু অরুণের আভাষ
বিপুল সম্ভাসবাদের বিভীষিকা
স্তিমিত হয়ে এলো ।

যে ঝড় উঠেছিল, আকর্ষণ পিণাসায় আর্জ হয়ে
সে ঝড় স্থিতি পেলে রত্নির ক্রোড়ে ।
শতাব্দীর ঘুম ভাঙলো
সজ্জের বেদীমূলে উৎসর্গের রাগ-সঙ্গীতে ।
স্বষ্টিস্থিতিলাপিপতির রেখাচিহ্নহীন
মুক্ত হৃদয় গল্প ও গানে ।
দিব্য সমাজ গঠন সম্ভব হয়ে উঠলো
উৎসর্গের নৈবেদ্যে ।

বীতশোক উলজ ফকির আনন্দ আবিরে
রঞ্জিত করে দিলেন ধ্বংসস্তূপের দিগন্তরকে ।
স্নিগ্ধ আলোষ মধুর আশ্বে হেসে উঠলেন জননী
বরাভয়দায়িনী কন্যাময়ী মা ।

সজ্জতীর্থে চলো আরতি শৃঙ্গার ।
ভগবানের মাহুৰ ভাগবত হয়ে
নয়ন ভরে দেখলো তাদের গুরুকে
গুরুর পরাশক্তিকে ।
জীবন-গুণ শোধ করে নিম্নমুখী শিখাটি
আবার ধীরে ধীরে উঠলো উর্দ্ধে ।
অভিযুক্ত করে গেল আমাদের ।
রেখে গেল তপোবীৰ্য্য ।
সেই বীৰ্য্যের সুপ্তবীজ মস্তকের বৃন্ত কামায়
তন্ত্ৰের শরীরে প্রভবিষ্ণু প্রাণ হয়ে
জাগতে চায় ।

জাগাও হে সজ্জগুৰু, সে শক্তি তোমার
জাগাও আমাদের মধ্যে ।
অতীন্দ্রিয চেতনায় কর উদ্দীপন
অভিযুক্ত কর সমগ্র সত্তা
সর্বস্বত্ব হুঃ পাবে নিম্নে চল
উঁকারের পথে ।
আমরা তোমাকে ধ্যান করি
আমরা তোমাকে প্রণাম করি
তুমি আমাদের হও, বিধ মাহুৰের হও
সজ্জ হও ।

ও সজ্জ, ও সহঃ, ও শান্তি ।



சென்னை, 15.05.2022



ফুটবল খেলা সম্পর্কে আর একটি কথা যা আলোচিত হচ্ছে সেটা হোলো আগতপ্রায় টোকিও অলিম্পিকের প্রস্তুতি-পর্বের খেলা ভারত ও সিংহলের মধ্যে। আন্তর্জাতিক খেলায় যে তোড়জোড় হওয়া উচিত ছিল তার অভাব দেখা যাচ্ছে। কিছুদিন পূর্বে কয়েকজন বাছাইকরা খেলোয়াড়দের নাম দেখা গিয়েছিলো খবরের কাগজের পাতায়। তারা নাকি দিল্লীতে পরিচালিত এক শিক্ষাশিবিরে থাকবে মাসাধিক কাল এবং তারপর এদের মধ্যে থেকে বাছাই করা নির্দিষ্ট সংখ্যক খেলোয়াড় প্রেরিত হবে সিংহলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে। এই তালিকার ভিতর বাদলার ফুটবলের এবং ফুটবল খেলোয়াড়দের কোনও উল্লেখ নেই। আর ঐ উদ্যোগের ব্যাপারে দেখলাম যে, শিক্ষাশিবিরের সূর্য হওয়া ছাড়া আর সব কাজ স্তব্ধভাবে এগিয়ে চলেছে। আর সব কাজ যে কি সে বোধহয় পাঠকদের বুঝিয়ে বলতে হবে না। এখনও পুরাদমে রোডাস'ও ডুরাণ্ডে ভারতীয় নির্বাচিত খেলোয়াড়রা বিভিন্ন রাজ্যের ক্লাবগুলির হয়ে খেলছে এবং সূদূর ভবিষ্যতে অর্থাৎ নির্ধারিত দিন অর্থাৎ শিক্ষা-শিবির পরিচালনার শেষ দিন ১৫ই ডিসেম্বরের পূর্বে এইসব খেলোয়াড়রা একত্রিত হতে পারবে বলে মনে হয় না। আবার সেই পড়ি-মরি করে শেষ মুহূর্তে যোগাড় করা এগারোজন ভারতীয় খেলোয়াড়কে নিয়ে যথাকালে যুগ্মকাঠে তাদের বলিদান ব্যবস্থা হচ্ছে। এর ফল যে কি আশা করা যায় সে আর বলে দিতে হবে না। কোনরকমে সিংহলকে পরাজিত করতে পারলেই বাহবা নেওয়ার লোকেরা এগিয়ে আসবে, আর না পারলে খেলোয়াড়দের গালাগালি দিয়ে নিজেদের সাফাই গাইবে এরাই। আশ্চর্য্যবশিত হতে হয় যে, বছরের পর বছর অপরিবর্তন প্রণোদিত শিক্ষানুশীলনের অভাবের পুনরাবৃত্তি হয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের আজকের প্রায়

১৬ বছরের আন্তর্জাতিক খেলাধুলায় অর্জিত শিক্ষাবলীকে কোনও আমলই দেওয়া হচ্ছে না। যেখানে জাতীয় মান-অপমানের প্রশ্ন সেখানেই কর্মকর্তারা কি করে এমন আত্মহার্য্য হবো রোভার্স, ডুরাও ইত্যাদি খেলাকে অলিম্পিক-এর খেলার চেয়ে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে বসে থাকেন তা ভেবে ওঠা যায় না। এই দুইটি প্রতিযোগিতার সমাপ্তি না হলে শিক্ষাশিবির শুরু হবে না এবং প্রতিযোগিতা দুটি হতে না হতেই সিংহলের সঙ্গে খেলার দিন এসে যাবে। কাজেই শিক্ষাশিবিরের শিক্ষা ঘারাই খেলোয়াড়দের লড়তে হবে অলিম্পিকের খেলায়। একে বলে 'Putting the cart before the horse'। এর চেয়ে খেলাধুলা পরিচালনার অযোগ্যতার পরিচয় বোধহয় পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

এই একই জিনিষের পুনরাবৃত্তি হতে দেখলাম আমাদের টেনিস খেলায়। আমেরিকার সঙ্গে ভারতীয় ডেভিস কাপ ইন্টারজোন (Inter-Zone) ফাইনাল খেলার কথা বলছি। অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আমরা অপেক্ষা করছিলাম এই খেলায় সামগ্রিক জয়ের জন্ত নয়, কিন্তু আমাদের উষ্ঠতি খেলোয়াড় জয়দীপ মুখার্জি ও প্রেমজিৎ লালের উন্নত ধরনের খেলার জন্ত। সঙ্গে এ বাসনাও আমাদের হৃদয়ে ছিল যে, কৃষ্ণান (Krishnan) হয়ত দুটি সিঙ্গেলস জয়ের গৌরব অর্জন করবে ভারতের পক্ষে। কৃষ্ণান-এর পক্ষে যে এটা অসম্ভব নয় তা সকলেই জানেন। তার ওপর সকলেই আশা করছিল যে সুদক্ষ অষ্ট্রেলিয়ান কোচ (Coach) Stan Edwards-এর শিক্ষাধীনে তারা এই শেষটুকু করার কৌশলটাও আয়ত্ত করতে সক্ষম হবে। প্রথম দিনের প্রথম খেলা থেকেই শুরু হলো হা-হুতাসের পালা। ম্যাকিনলের কাছে প্রেমজিৎ পরাজিত হলো—৬-৪; ৬-৩ ও ৬-০ গেমে এবং একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে পরাজিত হলো কৃষ্ণান Ralston-এর কাছে ৬-৪, ৬-১ ও ১০-১১ গেমে। পরের দিন ডারলস খেলায় পরাজিত হলো জয়দীপ ও প্রেমজিৎ ম্যাকিনলে ও র্যালস্টন (Ralston)-এর কাছে ৬-৮; ৬-৩; ১২-১০ ও ৬-৪ গেমে। বাকী দুটি

সিঙ্গেলস খেলায় রাইসেন- (Reissen) হারলো ৬-৩; ২-৬; ৬-০ ও ৬-১ গেমে এবং কৃষ্ণান পরাজিত হলো ম্যাকিনলের কাছে ১০-৮; ৬-৮; ৬-২, ২-৬ ও ৬-০ গেমে। ভারতের পরাজয় হলো ৫-০ গেমে। আগের বছরের মেক্সিকোর সঙ্গে খেলার পুনরাবৃত্তি। হিসেব নিকেশের সময় দেখা গেলো যে, কোচের অধীনে আমাদের খেলোয়াড়রা মাত্র তিন সপ্তাহের শিক্ষালাভ করেছে। অথচ আমেরিকার খেলোয়াড়রা বিশেষ করে ম্যাকিনলে এবং ব্যালষ্টন, যারা আমাদের খেলোয়াড়দের চেয়ে অনেক দক্ষ বলে পরিচিত, বৎসরাধিকাল শিক্ষাধীনে থাকার পর এই প্রতিযোগিতায় খেলতে এসেছে। অতএব যা হবার তাই হয়েছে। আন্তর্জাতিক খেলায় বিশেষ করে প্রথম শ্রেণীর খেলায় খেলতে হলে যে শারীরিক যোগ্যতার অধিকারী হতে হয় তার অধিকারী আমাদের খেলোয়াড়রা নয়। সুদক্ষ কোচ Stan Edwards-এর মতে আমাদের খেলোয়াড়দের দক্ষতা কম নয়, কিন্তু শারীরিক ক্ষমতা বা Physical Fitness এবং Stamina-তে আমেরিকানরা আমাদের খেলোয়াড়দের তুলনায় শুধু শ্রেষ্ঠ নয়, অনেক শ্রেষ্ঠ। এই লেখা ষাঁরা দেখেছেন তাঁহাদেরও ঐ মত। আমি কেবল এই কথাই বলতে চাই, যদি আমরা এই সব প্রথম শ্রেণীর প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ইচ্ছা করি তাহলে সর্বপ্রথমে প্রয়োজন আমাদের দেখার যে খেলোয়াড়রা সেইভাবে নিজেদের তৈয়ারী করার সুযোগ সুবিধা পায় এবং তৈয়ারী হয়। কর্মকর্তা এবং খেলোয়াড় উভয়েই একান্ত সহযোগিতার প্রয়োজন। যথেষ্ট ভাল টেনিস খেলার সুযোগ আমাদের কয়েকজন উষ্ঠতি টেনিস খেলোয়াড় পেয়েছে আজ কয়েক বছর ধরে। যে অভিজ্ঞতাটুকু অর্জন করলে নিজেদের খেলা আরও ভাল করা যায় তা তাদের হয়েছে। এখন দরকার একান্ত মনে অশুশীলনের এবং অশুশীলনের ব্যবস্থা ও পরিচালনা করার। জাতির মান-মর্যাদা যাদের হাতে আমরা ছেড়ে দিচ্ছি তাদের প্রতি দৃষ্টি রাখা আমাদের পবিত্র কর্তব্য। ভাল খেলোয়াড়ের কাছে পরাজিত হওয়া লজ্জাজনক নয়, কিন্তু খেলার কৌশলে

সমৃদ্ধ হয়েও Physical Fitness-এর অভাবে পরাজিত হওয়ার চেয়ে লজ্জার আর কি আছে!

ফুটবল আর টেনিসের নৈরাশ্রজনক আবহওয়ার মধ্যে জীভামোদীদের মনে আশার আলোক দেখা যায় দুটি খেলায়—গত অক্টোবরে অষ্ঠিত Lyons Hockey Festival এবং সন্ত সমাপ্ত ব্যাডমিন্টন খেলায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া চ্যাম্পিয়নশিপ। গত রোম অলিম্পিক্স এবং তারপর এশিয়ান গেমস-এর খেলায় ভারতের হকি প্রাধান্য খর্ব্ব করেছিল পাকিস্তান। এই বছরের Lyons Hockey Festival-এর খেলায় প্রথম স্থান অধিকার করে ভারতীয় হকি দল আবার আমাদের আশাবিত্ত করেছে। এই খেলায় যদিও পাকিস্তান আমাদের দলের সঙ্গে খেলেনি তাহলেও সকলে একবাক্যে স্বীকার করেছে যে, ভারতই সবচেয়ে ভাল খেলে যোগ্যভাবেই প্রথম স্থান অধিকার করেছে। পৃথিবীর সেরা হকি দল যথা পশ্চিম জার্মানী, হল্যান্ড, পাকিস্তান, বেলজিয়াম, স্পেন, ব্রিটেন, জাপান, ফ্রান্স, কানাডা, ইটালী ও আমেরিকা সকলেই এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল। পশ্চিম জার্মানী এবং হল্যান্ড এত উন্নত পর্যায়ের খেলা দেখিয়েছে যে তা দেখে মনে হয়েছে ভারত ও পাকিস্তানের প্রাধান্য খর্ব্ব করার জন্য ইউরোপীয় দলেরা উঠে-পড়ে লেগেছে। আগে খারাপ মাঠেব সুযোগ এবং শারীরিক বলপ্রয়োগ করে এই সব দলেরা আমাদের মাঝে মাঝে জব্দ করেছে। কিন্তু এবার দেখছি হল্যান্ড যথার্থ ভাল খেলে পাকিস্তানকে পরাজিত করেছে এবং স্পেন ও জার্মানী যোগ্যভাবেই যথাক্রমে পাকিস্তান ও ভারতের সঙ্গে সমান সমান ভাবে খেলা শেষ করেছে। যারা খেলা বোঝেন, সকলেই একমত যে সামনের অলিম্পিকের খেলায় একটেকি ভারত ও

পাকিস্তানের ফাইনাল যে হবেই সে বিষয়ে আর জোর করে কিছু বলা যায় না। আমাদের দলের খেলায় নিঃসন্দেহভাবে উন্নতি দেখা গিয়েছে। এখন কেবল দেখা প্রয়োজন যে, এই খেলোয়াড়দের এবং বাছাইকরা আরও কয়েকটি খেলোয়াড়দের এখন থেকেই যথাযথ শিক্ষামূল্যের মধ্যে রেখে টোকিওতে পাঠানোর বন্দোবস্ত করা। এর কোন রকম ত্রুটি-বিচ্যুতি আমরা আর দেখতে চাইনা। এবং এ হলে কেউই তা বরদাস্ত করবে না।

কিছুটা আশা হয় ভারতের সেরা ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়দের খেলা দেখে। Malaysia থেকে সেরা খেলোয়াড়দের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে অতি যোগ্যভাবেই আমাদের নাম্ নাটেক ও নবীন খেলোয়াড় দীপু ঘোষ তাদের পরাজিত করে ভারতের মুখোজ্জ্বল করেছে। বহুবার পরাজিত হয়েছি আমরা মালয়েশিয়ার খেলোয়াড়দের কাছে। তাদের খেলার মান খুবই উচ্চ এবং পৃথিবীর সেরা দল এরা। সেমিফাইনালের খেলায় দীপু ঘোষ যেভাবে মালয়েশিয়ার এক নম্বর খেলোয়াড় Yew Cheng Hoeকে পরাজিত করেছে ১৫-৬ ও ১৫-৮ গেমে এবং নাম্ নাটেকার পরাজিত করেছে তাদের দুই নম্বর খেলোয়াড় Tan Yee Khan-কে ২-১৫; ১৫-৮ ও ১৫-১০ গেমে। এতে সত্যিই মন আনন্দে ভরে উঠেছে। এই খেলায় দেখছি, আমাদের ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়দের Physical Fitness ওদের থেকে শ্রেষ্ঠ। আমাদের খেলোয়াড়দের মাথা খাটিয়েও খেলতে দেখছি। এই দুইটি গুণ যাদের আছে তারা আরও একটু মনোযোগ দিলে পৃথিবীর সেরা দল হতে পারবে। আমাদের সকলের এই কামনা যে, সেদিন যেন শীঘ্রই আসে। সাবাস্, দীপু ঘোষ, সাবাস্ নাটেকার! ৫।১২।৬৩

ফোন :

৯৪-৪০৬১, ৮২



গ্রাম :
রাইসকিংস

পশুপতি দাম এণ্ড সন্স
প্রাইভেট লিঃ

৪৩/২ ও ৩৭এ, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড, কলিকাতা-১৪।

বাড়িতে চাউল পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা আছে।

সম্মাদর্শ

গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র ও ভারতবর্ষ:

ভূবনেশ্বরে অনুষ্ঠিত এবারকার কংগ্রেস অধিবেশনের দুইটি অবদান: পররাষ্ট্রনীতির দিক দিয়া জোট-নিরপেক্ষতা এবং গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের মধ্য দিয়া আভ্যন্তরীন সমাজ, অর্থ ও রাজনীতির সমন্বয় সাধন-প্রচেষ্টা। প্রথমটি অর্থাৎ ভারত রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক নিরপেক্ষ রাষ্ট্রনীতি আজ পর্যন্ত ভারতের পক্ষে অকল্যাণের হেতু হয়নি, ইহা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। পরন্তু ভারতের পঞ্চশীলসম্মত সহাবস্থান নীতি ও জোট-বহিষ্কৃত নিরপেক্ষতা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আদর্শস্থানীয় হইয়াছে এবং একটা নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করিয়া চলিতেছে। এই নীতি গান্ধীবাদী কংগ্রেস ও ভারতীয় প্রতিভার অনেকখানি অহুকুলই বলা চলে। অনেকখানি বলিলাম এই জন্ম যে, গান্ধী-উত্তরকালে অহিংসা-ধারণায় বিকৃতি-ব্যত্যয় থাকায় অহিংস-নীতির প্রয়োগ ক্ষেত্রে ইহার বলিষ্ঠতা ও বীৰ্য্যবস্তার অভাব ঘটিয়াছে। বস্তুত: এই অহিংস মনোভাবটি নীতি (morality)-ভিত্তিক—অধ্যাত্মভিত্তিক নহে। নৈতিকতার উর্দ্ধে আধ্যাত্মিকতা। এই আধ্যাত্মিকতা ‘হত্যাপি ইমান লোকান ন হন্তি ন বধ্যতে’ দৃষ্টিভঙ্গী দান করে। এবারকার কংগ্রেস অধিবেশনের বহুল আলোচিত ও প্রচারিত গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রমূলক নীতি ও আদর্শ সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ হইতে পারিনি। আশঙ্কা হয় এবং প্রশ্ন জাগে, শেষ পর্যন্ত ইহা ভারতীয় জীবন-বিকাশের কতখানি অহুকূল্য করিতে পারিবে?

॥ ভারতীয় সমাজতন্ত্রের ভিত্তি ॥

বিগত শতকে স্বামী বিবেকানন্দ দেশ ও দেশের ব্যাপক ক্ষেত্রে এই সমাজতন্ত্রের প্রবর্তন করেন মানবসেবার মধ্য দিয়া, কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীটি ছিল ভিন্ন। “জীবে প্রেম করে যেই জন্ম সেই জন্ম সেবিছে ঈশ্বর”—বিচিত্র মানুষের মধ্য দিয়া স্বামীজী সেই পরম একেরই সেবা করার

নির্দেশ দিয়াছেন। ঐশ্বাদশ শতকে পশ্চিমে যে মানবতার (humanism) ধারণা তারও মূলগত উদ্দেশ্য এই মানবসেবাই—সর্বমানবের জীবনবিকাশ। কিন্তু এই সেবার মধ্যে সমস্ত মানুষকে একত্র গ্রথিত ও একাত্ম করার যে পারমাণবিক সত্তা তা স্বীকৃত ছিল না। না থাকিলেও, পরবর্তীকালে হিউমানিজম পাশ্চাত্যের সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র প্রভৃতির জন্মদানের হেতু হইয়াছে। ইহার সঙ্গে আসিয়া মিলিয়াছে উনবিংশ শতাব্দীর যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী। এই পশ্চিমী নিরীশ্বরবাদী মানবধর্ম যুদ্ধ, অশান্তি, পরপীড়ন, শোষণ, প্রভৃতি নিবারণ করিতে পারে নাই। সাম্য, শান্তি, মৈত্রীর স্বপ্ন সেখানে স্বপ্ন হইয়াই আছে। বিগত শতকে ঠাকুর রামকৃষ্ণ ছিলেন এই নিরীশ্বরীয় মানবতা-আদর্শ-বাদের নির্বিকার অহুকরণের জীবন্ত প্রতিবাদ। ঠাকুরের কথায় এই ‘চাপরাশহীন’ মানবধর্ম কখনও সত্যকার হিত-সাধনের হেতু হইতে পারে না। বিবেকানন্দের বস্তুবাদী বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদের মর্মও ছিল ইহাই। এখানে উল্লেখ্য যে, চণ্ডীদাসের ‘সবার উপরে মানুষ সত্য’ হইতে বিগত পাঁচশো বছর ধরিয়৷ বাংলা দেশেই সুস্পষ্টভাবে এই দিব্য মানবতাবাদের জন্ম ও পুষ্টি সাধিত হইয়া চলিয়াছে। শ্রীগোরাঙ্গের তথা গোঁড়ীয় বৈষ্ণবাদের প্রেমধর্মে এই মানবতা-ধর্ম মণিকাঞ্চন সংযোগ হইয়াছে। বাংলা দেশে ক্রমশ: মন্দিরের দেবতার ঠাই মানুষই গ্রহণ করিতেছে। বিবেকানন্দ-বঙ্কিম-অরবিন্দ-রবীন্দ্র-গান্ধী-অভাষচন্দ্র-মতিলাল প্রমুখ বাংলার বিভিন্ন মনীষী, সাধক-নেতা ও ধর্মগুরুর মধ্য দিয়া এই দিব্য জীবনবাদী মানবধর্মই ক্রমবিকশিত ও অহুবাদিত হইয়া পরিণতির পথে চলিয়াছে। বাংলার বিবেকানন্দ হইতে মতিলাল এই প্রায় পঞ্চাশ বছরের ভাব, ভাবনা ও জীবনবিকাশের ক্রমটি লক্ষ্য করিলেই আমাদের বক্তব্য সুস্পষ্ট হইবে। সমসাময়িক কালের তামসিকতার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের মধ্যে কর্মপ্রেরণা আনিতে স্বামীজী মস্তব্য করিয়াছিলেন: “ধর্ম নয়, রুটি—রুটিই ভারতবর্ষের একমাত্র প্রয়োজন।... কি ধর্ম তুমি ভারতকে শেখাতে পার... সে এমনিতেই মহৎ ও পবিত্র।...দাও তাকে কর্মবিস্তারের সুবিধা।...কল-কারখানা বসাও জীবিকার ক্ষেত্রে ডাক দাও...তা যদি

না পার ধর্মের ধ্বজা আর তুলতে চেও না।” ধর্মপ্রতিষ্ঠানের পক্ষে একদিনেই কলকারখানা স্থাপন করিয়া নিষ্কাম কর্মসাধনা সম্ভব হয়নি। পাঠশালা আর দাতব্য চিকিৎসালয়ের মধ্য দিয়া বিবেকানন্দ-তাবনার যে রূপায়ণ শুরু হয় তাহাই কালের পথ বাহিয়া বর্তমান শতাব্দীর মধ্যাহ্নে ভারতজাতিগঠনে উৎসর্গীকৃত সর্বত্যাগী যোগ-প্রতিষ্ঠান প্রবর্তক সম্ভের জুটমিল, ব্যাক প্রভৃতি নানা শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বৃহত্তর জাতীয় জীবনে ব্যাপ্ত ও মুক্ত হইতে চাহিতেছে। প্রবর্তক সম্ম-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমতিলাল বন্যাত্মাণ প্রভৃতি চিরাচরিত লোকসেবার ক্ষেত্র হইতে সরাইয়া আনিয়া তাঁর সম্রাসী শিব্যকে জাতির অর্থনীতিসাধনার মর্মক্ষেত্রে বসাইলেন কামনাহীন কর্মসাধনার বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষার উদ্দেশে। স্বামীজীর নির্দেশ ছিল: “আমরা আমাদের শারীরিক তোগের জন্ত অনেক কিছু সংগ্রহ করিতে পারি। কিন্তু আমরা নিজের কর্মের দ্বারা যাহা উপার্জন করি তাহাতেই আমাদের প্রকৃত অধিকার।” ভিক্ষা ও পরামুগ্ধের উপর নির্ভরশীল না হইয়া সর্বত্যাগী সম্রাসীর স্বাবলম্বন বৃত্তিগ্রহণের প্রবর্তক প্রবর্তক-সম্ম বলিলেও বোধহয় অত্যাক্তি হইবে না। বাঙালীর অধ্যাত্ম সংস্কৃতির ঐতিহাসিক ক্রমেই ইহা সম্ভবপর হইয়াছে কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা ইহা নয় নিশ্চয়ই। ব্যক্তি ও সমষ্টিগত মানবজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাম্য আর সমাজতন্ত্রের মূল লক্ষ্য প্রায় এক হইলেও, সাধার সাধনা ও সিদ্ধির রূপস্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ বিপরীত। ‘আত্মযোক্ষায় জগদ্ধিতায়’ লক্ষ্যে যে সাম্য-সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা তা ভারতীয় জীবনবিকাশের আনুকূল্য করিবে। তাবিপরীত ‘বাদ’ ভারতীয় চির-পোষিত মানব উজ্জীবনের ধারাটিকে বিলম্বিত, বিপর্যস্ত ও বিকৃত করিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে এবারকার কংগ্রেস অধিবেশনের গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র বিচার্য।

॥ কংগ্রেসী সমাজতন্ত্রের গতি-প্রকৃতি ॥

কংগ্রেসের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়েই গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের ধারণা নেতাজী বিশেষভাবে নেহেরু প্রমুখ

কংগ্রেস-সংগ্রামীদের মনে স্থান পায়। বর্তমান শতকের চতুর্থ দশকে পর পর লক্ষ্মী ও ফৈজপুরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি হিসাবে পণ্ডিত নেহেরু সর্বপ্রথম ভারতের লক্ষ্য সমাজতন্ত্র বলিয়া সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি দেন। অবশ্য ইহা তখন আদর্শ হিসাবেই চিন্তার ক্ষেত্র মাত্র অধিকার করিয়াছিল, বাস্তবে কার্যকরী হইতে পারে নাই। স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার প্রাকালে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে নেহেরু তাঁর নিজের অভিপ্রেত দেন যে, “I stand for socialism and that India will go towards the constitution of a socialistic state.” কিন্তু নেহেরু অভিপ্রেত মাত্রই দেন, তাঁর মতকে তখন সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করিবার ক্ষমতা পীড়াপীড়ি করেন নাই। পূর্ণ গণতন্ত্রের বিকাশ লক্ষ্যেই ১৯৫০-এ ভারতের সংবিধান রচিত হয়। গত এক যুগেরও অধিক কালে কংগ্রেসী শাসনে গণতন্ত্রের মহিমা বচনে বিঘোষিত হইয়াছে প্রচুর, কিন্তু কার্যত: নির্বিকার ভোটের অধিকার দেওয়া ছাড়া জনগণের গণতান্ত্রিক চেতনা উদ্বোধনের বিশেষ কিছু করা হয়নি বলিলে এতটুকু অত্যাক্তি হইবে না। অপর পক্ষে ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের ক্ষমধারার মধ্যে সমাজতন্ত্রের বোধ ও প্রযোজন উগ্র হইয়া উঠিয়াছে। বিগত আট বছরে আবাদী কংগ্রেসী (১৯৫৫) অধিবেশনের সিদ্ধান্ত ‘Socialistic pattern of society’ ১৯৫৭ সালে পরিবর্তিত হয় ‘Socialistic Co-operative Commonwealth’-এ—বাহারই বর্তমানে নব সংস্করণ হইয়াছে ভুবনেশ্বরে “Socialist State based on Parliamentary Democracy” অথবা সংক্ষেপে “Democratic Socialism.” কংগ্রেসী মহলে চিন্তা ও প্রগতিশীলতার ক্ষেত্রে পণ্ডিত নেহেরুর দান ও স্থান অবিসংবাদী। গণতন্ত্রকে সম্বল করিয়া স্বাধীন ভারতের পথযাত্রার প্রারম্ভে নেহেরু ভরসা দিয়াছিলেন “We are not going just to copy a certain democratic procedure or an institution of a so-called democratic Country. We may improve upon it.” পণ্ডিতজী সেদিনও ঈশ্বরপুর কংগ্রেসের (১৯৬৩) প্রাকালে ভারতীয় প্রতিভা ও

পরিবেশের উপযোগী করিয়া ভারতীয় গণতন্ত্রের রূপাংগণের কথা বলিয়াছেন। সম্ভবতঃ ভুবনেশ্বর কংগ্রেসের গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রেরই ইহা ছিল ভূমিকা। নেহেরুরই কথা ‘Socialism must be aligned to democracy.’ চমৎকার! সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রকে এক জোড়ালে জুড়িয়া কোন্ তন্ত্রটির ভারতীয় নবীকরণ—গণতন্ত্র না সমাজতন্ত্রের? ১৯৫০-এ পণ্ডিতজীর যা ছিল ব্যক্তিগত অভিমত তাই জাতিগত হইতে চলিয়াছে ১৯৬৪ সালে। নেহেরু আজ ভারতের রাষ্ট্রকর্ণধার—রাষ্ট্র-তরুণীকে তিনি যে-ভাবে ও যে-পথে চালাইবেন তার অত্যাশা হইবার নয়। আজকের দিনের মানসিকতার মধ্যে অরণ্যরোদন হইলেও আমরা বলিব তাঁর লক্ষ্য সিদ্ধ হইলেও, এই নির্দিষ্টতার পরাহুতরণে, রবীন্দ্রনাথের কথায় ‘প্রকৃত ইউরোপ হবে না, বিকৃত ভারতবর্ষ হবে মাত্র।’ ঋষি কবিরই সাবধান বাণী “তাই আজ আমাদের অবহিত হয়ে বিচার করতে হবে যে, যে-সত্যে ভারতবর্ষ আপনাকে আপনি নিশ্চিত-ভাবে লাভ করতে পারে সে সত্যটি কি?”

আশ্চর্য্য, কংগ্রেসের গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র লইয়া বহু বাক্য-বিতণ্ডা হইয়াছে, ইহার সম্ভব-অসম্ভব দিকদর্শন হইয়াছে প্রচুর, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জিজ্ঞাসিত ‘সত্যটি কি’ এই প্রশ্ন প্রায় কোথাও উত্থাপিত হইতে দেখিনি। খাওয়া-পরা আর আত্মস্বার্থের তুচ্ছতায় আত্মবিশ্বাসেরই ইহা লক্ষণ। আজিকার ভারতের একচ্ছত্র রাষ্ট্রনায়ক নেহেরুর মধ্যে ভারতসত্তা উঁকি-ঝুঁকি মারিয়াছে, কিন্তু তার অপরিচ্ছিন্ন সন্মুর্তি প্রকাশ হইতে পারে নাই। ভারতের আত্মবিকাশের ধারা হিসাবে গণতান্ত্রিক সমাজ-তন্ত্রকে গ্রহণের সময়ে তিনি যে ইহার ভারতীয়করণ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না, এমন নয়। নেহেরুরই কথা—ইহা গ্রহণ করিতে হইবে “having regard to the circumstances that encompass us and to the genius of the people.” ভারতের এই নিজস্ব প্রতিভার দীপ্ত পরিমণ্ডলে জীবন-সমস্যার সমাধানকল্পে বাণিজ্য দ্রব্যের মত ভাবাদর্শের আমদানীও দোষের হয় না। আমদানীর ভাল মন্দ নির্ভর করে আত্মপাং করার শক্তির উপর। ইহা সত্য যে, দেশ কাল পাত্র ও

অবস্থানুযায়ী জাতীয় জীবনের সমস্যা সমাধানের উপায়ও পরিবর্তিত হয়। আমাদের মত করিয়া গ্রহণ করিতে না পারিলে পশ্চিমের কোন তন্ত্রই এ দেশের কল্যাণের হেতু হইতে পারে না। ইহার হুবহু অনুকরণ ও আমদানী তার বিষময় কুফল হইতে নিস্তার দিবে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কথায় এই “পরকে আপন করিতে প্রতিভার প্রয়োজন। অত্নের মধ্যে প্রবেশ করিবার শক্তি এবং অন্তকে সম্পূর্ণ আপন করিয়া লইবার ইচ্ছা, ইহাই প্রতিভার নিজস্ব। ভারতবর্ষের মধ্যে সে প্রতিভা আমরা দেখিতে পাই।”

আমাদের বক্তব্য এই যে, ভুবনেশ্বর কংগ্রেসের ‘গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে এই ভারতীয় প্রতিভা আমরা দেখিতে পাই নাই। জয়পুর ও ভুবনেশ্বর কংগ্রেসে গণতন্ত্রের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের মিলন ঘটাইতে গিয়া এ সম্পর্কে যে বক্তৃতার ঝড় বহিয়াছে তাহাতে মনে হয় সেতু নির্মাণের ধারণাটি এখনও স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। পণ্ডিত নেহেরু চিন্তা ও কর্মে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ এবং উৎপাদন ও বণ্টনের সাম্য স্থাপনের কথা বলিয়াছেন। কংগ্রেসের উগ্রপন্থীদের অনেকেই মার্কসীয় নীতি অনুসরণক্রমে প্রাইভেট সেকটরের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধন ও পাবলিক সেকটরের সর্বতোমুখী ব্যাপক সম্প্রসারণের দ্বারা সমাজতন্ত্র প্রবর্তনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা করা হইলে গণতন্ত্রকে সংস্কৃত ও উন্নত না করিয়া তাহার পরিবর্তে সমাজতন্ত্রকেই উপস্থাপিত করা হইবে যাহার অবশ্যাস্তাবী পরিণাম একনায়কতন্ত্র—তা ব্যক্তি বা দল যাই হোক। গণতন্ত্রের গোড়ার কথাটি হইতেছে সমাজ ও সমষ্টির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া ব্যক্তির চিন্তা ভাবনা মত বিশ্বাস প্রচেষ্টা-প্রয়ত্নের এক কথায় আত্ম-স্ফুরণের স্বাধীনতা—যাহাই সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে অভাব। ব্যক্তি বিকাশের নয়, প্রধানতঃ অর্থনীতিকে মুখ্য করিয়া পশ্চিমী সমাজতন্ত্রের অভিযাত্রা। গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র ‘ফ্রি ওয়ার্ল্ড’ নামে অভিহিত সমাজতন্ত্রবিরোধী মতবাদী দলের অভিভাবক করিতেছে এবং একচ্ছত্র মুক্ত হস্তও হইয়াছে। ভারত এতদিন মিশ্র অর্থনীতির কথা বলিয়াছে। এবং

এই মিশ্র অর্থনীতি-ভিত্তিক সমাজতান্ত্রিক সমাজ-সংগঠনের (socialistic pattern of society) অস্পষ্টতা বৈদেশিক সাহায্যের দ্বার, কুণ্ঠিত হইলেও, এতদিন অব্যাহত রাখিয়াছে। এ সম্পর্কে জয়পুর তথা ভুবনেশ্বর কংগ্রেসের স্পষ্টতা বৈদেশিক বিশেষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে তাহাও লক্ষ্যণীয়।

॥ ভারতেতিহাস ও ঐতিহ্যগামী তত্ত্ব ॥

আমাদের মনে হয়, স্বাধীনতা-উত্তর ভারত রাষ্ট্র কি গণতন্ত্র, কি সমাজতন্ত্র নির্বাচনে আপন ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অনুসরণ না করিয়া গোড়ায়ই ভুল করিয়াছে। অর্থসর্বস্ব রাষ্ট্রনীতি কংগ্রেস গ্রহণ করিয়াছে ভারতের বিচিত্র জাতিধর্মের মুখ চাটিয়া। এই অগভীর আপোষ পরিণামে কখনও সফলপ্রসূ হইতে পারে না যেমন হয় নাই ইউরোপে। ধর্মনিরপেক্ষ বৈষয়িক রাষ্ট্র বিষয়-বিষয়ের অবশ্যজ্ঞাবী পরিণাম-মুক্ত হইতে পারে না। ভারতবর্ষের ইতিহাস, ঐতিহ্য, ধর্ম, সংস্কৃতি হিন্দু নামের সঙ্গে সংজ্ঞায়িত থাকিলেও, ইহা সার্বজনীন বিশ্বমানবের বরণীয়। জন্মগত পশু-মামুষের পশুত্ব হইতে দেবত্বে উজ্জীবনের এমন উদার পন্থা আর কোথাও এত সুস্পষ্ট দেখানো ও পরীক্ষিত হয় নাই। শ্রীঅরবিন্দ হিন্দুধর্মকে বলিয়াছেন 'eternal religion, which embraces all.' রবীন্দ্রনাথ অল্পভব করিয়াছেন "ভারতবর্ষের ধর্ম সমস্ত সমাজেরই ধর্ম তাহার মূল মাটির ভিতরে এবং মাথা আকাশের মধ্যে। ধর্মের মূলকে ও মাথাকে স্বতন্ত্র করিয়া ভারতবর্ষ দেখে নাই। ধর্মকে ভারতবর্ষ হালোক-ভুলোকব্যাপী, মানবের সমস্ত জীবনব্যাপী একটি বৃহৎ বনস্পতিরূপে দেখিয়াছে।" মহাত্মাজীও এই ভারতবর্ষের

পরিচয় জানিতেন। ভারতের এই ভারতীয়ত্বের উপর দাঁড়াইয়াই তিনি নির্ভীক কণ্ঠে ঘোষণা করিতে পারিয়াছিলেন যে, "তিনি ভারতবাসী, হিন্দুসভ্যতায় ওতঃপ্রোতভাবে মজ্জিত এবং তিনি ভারতীয় সভ্যতার ভিতরেই সেই সুখ-সন্তোষ ও শান্তির সন্ধান পাইয়াছেন যাহার খোঁজ করিতে গিয়া বড় বড় রাষ্ট্রশক্তি আত্মঘাতী কলহে জগৎকে পীড়িত করিতেছে ও নিজেরা পীড়িত হইতেছে।" শুধু তাই নয়, মহাত্মাজী সুস্পষ্ট কণ্ঠেই ঘোষণা করিতেন যে, "তিনি সনাতনী হিন্দু, তিনি সত্য ও অহিংসাকে হিন্দুধর্মের পাদপীঠ বলিয়া জানেন।" তিনি বিশ্বাস করিতেন—"ভারতবর্ষের বিশিষ্ট অমূল্যত্ব জগৎকে দিবার মত এবং তাহা দ্বারা হিংসাপূর্ণ ভোগাশ্রয়ী পাশ্চাত্য অতিসভ্য সভ্যতা সংশোধিত হইতে পারে।" মহাত্মাজীর ভারতীয়ত্বের এই অন্ধান চেতনা ও গৌরববোধ তাঁর রাজনৈতিক উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ছিল না। ইহা অমূল্যব করিয়াই ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে গান্ধীজী সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন "We must recognise the fact that the socialism of our dreams cannot come through the Congress party." বস্তুতঃ বিগত ভুবনেশ্বর কংগ্রেসের গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের যে চেহারা আমরা দেখিলাম তাহা নিশ্চয়ই মহাত্মাজীর স্বপ্নের সমাজতন্ত্র নয়। কংগ্রেসী সমাজতন্ত্রের গতি-প্রকৃতি দেখিয়া ও কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের ত্যাগ-তপস্কার ধরণ দেখিয়া মহাত্মাজীর ভবিষ্যদ্বাণী যে কত সত্য তাহা কাহারও বুঝিতে বাকী থাকিবে না। তথাপি আমরা নিরাশ নহি। ইহা পর্যায় যাত্র। নানা বাধা-বিপর্যয়-বিপত্তির মধ্যে দিয়া আবার সনাতন ভারত-সভ্য অপরিচ্ছন্ন সন্মুর্তি পরিগ্রহ করিবেই শুধু ভারতভূমির জন্মই নহে—বিশ্বমানবের স্বচ্ছ স্বন্দর ছন্দোময় আত্মবিকাশের জন্ম।

সকল রকম বেনারসী সাড়ী, শাল, আলোয়ান ও হোসিয়ারী পোষাক বিক্রেতা।

রামকানাই আমিনীরঞ্জন পাল (প্রাঃ) লিঃ

২১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড (বড়বাজার) কলিকাতা ফোন : ৩০-২৩০৩

০

সর্বপ্রকার দেশী ও বিলাতী ঔষধের জন্ম

রামকানাই মেডিক্যাল ষ্টোর্স

১২৮/১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৪ ফোন : ৫৫-৩৭১১

সাহিত্যিক

শ্রীশ্রীসঙ্কল্পজননী :

প্রবর্তক সঙ্কল্পজননী পরমাংগা শ্রীশ্রীরাধারানী দেবীর ৩৪ বর্ষীয় ত্রিগোভাবোৎসব প্রতিবারেব মত এবারও চন্দননগর প্রবর্তক আশ্রমে সনিষ্ঠ/ভাবধন পরিবেশের মধ্যে গত ২১-এ অগ্রহায়ণ হইতে ৩০-এ অগ্রহায়ণ পর্যন্ত প্রতিপালিত হয়। এই উপলক্ষে মাতৃ-মন্দিরের সমুদয় প্রশস্ত অঙ্গন জুড়িয়া সুবৃহৎ মণ্ডপ নিশ্চিত হয়। সুসজ্জিত চন্দ্রোৎসব ২১-এ অগ্রহায়ণ সন্ধ্যার অমুপস্থিতিতে অধিবাস বাসরে উৎসবের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধক সন্ধ্যাচার্যের অমুপস্থিতিতে শ্রীমঙ্গলচন্দ্র দত্ত শাস্ত্রীমুর্তি পণ্ডিত পঞ্চানন তর্কতীর্থ মহোদয়ের মাঠের সম্পর্কিত একটি বাণী পাঠ করার পর মাতৃস্মননা করেন শ্রীকৃষ্ণন চট্টোপাধ্যায়। অতঃপর কুমারী বিমলা রাবের পুত্রালালসায় সঙ্কল্পজননী-কেন্দ্রিক ১২খানি মাতৃকীর্তন করেন। মাঠের তিরোস্তাব দিবস ২২-এ অগ্রহায়ণ সারাদিন মাতৃভাবনার পোষণমূলক ভজন, উপাসনা, গীতা-চণ্ডী বাধ্যায়, বোডশোপচারে পূজা, ভোগারতি, জপ-যজ্ঞ, অর্ঘ্যোস্ত হোম, উপবাস গালন প্রভৃতির মধ্যে তিরোস্তাবে মাতৃ আবির্ভাবময় করিয়া তুলি হয়। হোমোস্তে শ্রীগুরু বাণী পাঠ ও নবায় প্রসাদ বিতরণিত হয়। এই উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী গৌরীলা কীর্তন করেন সপার্বদ গীতরত্ন শ্রীমমিষগোপাল দাস কীর্ত্তনরসনিবি। অমরগোপালের মধুকীর্ত্তন অমৃত পরিবেশন সহস্র-সহস্র উপস্থিত শ্রোতাকে গৌরময় করিয়া তুলি। ২৩-এ অগ্র-অগ্রহায়ণ রবিবারের সভার সভানেত্রী বরেন সুসাহিত্যিক শ্রীমতী ত্যোতিপ্তরা দেবী। সভানেত্রীর চমৎকার ভাবগতি অন্তরে প্রকাশিত হইল। ৩০-এ অগ্রহায়ণ সন্ধ্যার মনমোহন লীলাকীর্তন সপ্তাহের নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমুদয় লীলা কীর্তনান্তে মাতৃস্মরণ ও পূর্ণ প্রশস্তি মন্ত্রে ৩৪ বার্ষিক উৎসব সমাপ্ত হয়।

ভক্তিশ্রারতী শ্রীবন্ধিমচন্দ্র সেন :

পরম ভাগবত শ্রীবন্ধিমচন্দ্র সেনের ৭২তম জন্মোৎসব উপলক্ষে গত ১৭ই ডিসেম্বর শিখ বৈষ্ণব সঙ্কল্পজননী ও অমুরানী ভক্তবৃন্দের উচ্ছ্বাসে ১নং নিবেদিতা লেনে এক বৈষ্ণব সম্মেলন অমুষ্ঠিত হয়। এই অমুষ্ঠানে শ্রীপুষ্টিভারত্নন মুখোপাধ্যায় পোরোহিতা ও শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। প্রভুপাদ পণ্ডপতিনাথ গোখামী সঙ্গলাচরণ করেন ও উদ্বোধন সঙ্গীত করেন শ্রীমতী সাধনা রাই। সভাষ শ্রীসেনের শিষ্য সম্মান ছাড়াও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন এবং অনেকেই শ্রীসেনের প্রবর্তিত ভক্তি-মহিমা ও তাঁর সামাজিক গ্রন্থাবলী 'গীতামাধুরী'র উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করেন।

২২শে পৌষ :

বাঁশে পৌষ প্রবর্তক সঙ্কল্পজননী। যে ভাব-বীজের রূপায়ণ প্রবর্তক সঙ্কল্পকলোকে হইতে মর্ত্যের বৃক্ক মাছুয়ী তমু আশ্রয়ে তাঁর আবির্ভাব এই পূর্ণায়ন। এই দিনটির ঐতিহাসিক গৌরবমহিমা আগামী কালে সুনিশ্চিত সুস্পষ্টতর হইবে এবং ভারতীয় মন্দিরে কয়-কয়নি মুখবিত হইবে। চন্দননগর ভাগীবধী তীরে কেন্দ্রসঙ্কেব অনাড়ম্বর নিবিড়তার মধ্যে এই মহানির্ভাবটি স্মরণিত হয়। পূর্ব-দিন সন্ধ্যায় উৎসব উদ্বোধন উপলক্ষে ভজন, সমবেত উপাসনা, গুরুধ্যান ও দীক্ষাক্ষেত্রে দীক্ষান প্রভৃতি অঙ্গগুলি যথারীতি পালিত হয়। ২২-এ পৌষ সারাদিনই নিরবচ্ছিন্ন অমুষ্ঠান চলে। প্রাতে ভজন, উপাসনা, গুরুধ্যান, গুরুধ্যান, বাধ্যায়, সঙ্কল্প-পরিভ্রমণ প্রভৃতির পর বেলা ২টা ব দীক্ষাষজ শুরু হয়। এবার নারীপুরুষ ১৪জন সঙ্কল্পীক গ্রহণ করেন। অপরান্ত ৩টার সহযোগী সভা ও ভক্ত-সম্মেলন এবং পাঁচটার বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীভ্রমকান্ত জৈ মহোদয়ের পোরোহিত্যে উৎসব-সভা অমুষ্ঠিত হয়। সভার সঙ্কল্পের চিত্রপটে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান মালদান করে। শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত, নিখিল-ভারত হিন্দু মহাসভার সম্পাদক শ্রীমমুজচন্দ্র সর্বাধিকারী ও অধ্যক্ষ কবিভূষণ ষোষ সঙ্কল্পের জীবন ও কর্ম সথকে বক্তৃতা দেন। সভাপতি শ্রীগুরু এক সংক্ষিপ্ত পরিচ্ছন্ন ভাষণে প্রার্থ্যা প্রদান করেন। অতঃপর উপাসনা ও পূর্ণ প্রশস্তি মন্ত্রে উৎসব সমাপ্ত হয়।

উৎসব অনুষ্ঠানে -

ইন্দ্র'র সন্দেশ

অপরিহার্য!

৮৬, আমহার্ট স্ট্রীট কলি: ১ ফোন-৩৫-১৩৮৩	৬, নটবর দত্ত রো. কলি: ১২ ফোন-৩৪-২৫৩৩
---	---

আন্তর্জাতিক বধির দিবস :

বিশ্ব-বধির সংস্থার পোষকতায় সম্প্রতি কলিকাতার 'ডব্লিউ. বি. জি. প্রেস' মাঠে বঙ্গীয় বধির সংস্থা একটি মনোজ্ঞ অমুষ্ঠানের মধ্য দিয়া আন্তর্জাতিক বধির দিবস পালন কবে। এই অমুষ্ঠানে পতাকা উত্তোলন এবং প্রাচীন ও নবীনদের প্রদর্শনী ফুটবল খেলার উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত মুক-বধির সাংকেতিক বিশেষজ্ঞ শ্রীমলিনীমোহন মজুমদার। অমুষ্ঠানটি নানাদিক দিয়া উল্লেখযোগ্য হইয়াছিল।

শ্রীলক্ষী মজুমদার

সম্পাদক : শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৩১ বিপিনবিহারী পাসুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি. এ. কর্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত।
প্রবর্তক প্রিন্টিং এন্ড হাক্‌স্টোন লিমিটেড, ১২৩ বিপিনবিহারী পাসুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীকপিলকৃষ্ণরায় কর্তৃক মুদ্রিত।



৪৮ বর্ষ ১০ম সংখ্যা

মাঘ, ১৩৭০

জীবনের আলো

উত্তরাধণ। ইহা চেতনার স্বাভাবিক জাগরণ যুগ। ১লা মাঘ হইতে ছয় মাস প্রত্যক্ষ জ্যোতির দেবতা স্বর্ঘ্যদেব উত্তরমুখে অভিধান সুর করেন। প্রতি জীবের স্বাভাবিক ক্রমে রক্তের উর্দ্ধগতি সুর হয় এই শুভদিন হইতে। দেবভূমি ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষ এই শুভদিন হইতে ভগবানকে জীবনের প্রতিত্তরে নামাইয়া আনার সাধনা গ্রহণ করুক—ইহাই আমার একমাত্র কাম্য। জীবনের স্তর তিনটি—প্রাণ, হৃদয় আর বুদ্ধি। এই তিন ক্ষেত্রেই ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠা দিতে হইবে। প্রাণের ধর্ম আসক্তি, হৃদয়ের ধর্ম সঙ্কল্প, বুদ্ধির ধর্ম অধ্যবসায়। প্রাণের সর্ব আসক্তি ঈশ্বরেই কেন্দ্রীকৃত হইবে। হৃদয় হইতে ঈশ্বরের সহিত যুক্তি ভিন্ন অস্ত্র সব সঙ্কল্পের বিসর্জন দিতে হইবে। বুদ্ধি সতত অধ্যবসায়শীল হইবে—“চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সংহত্যা মৎপরঃ” হওয়ার জন্ত। ইহার ফলে কর্ম হইবে যজ্ঞস্বরূপ, পরম জ্ঞান লাভেই ঘটিবে উহার পরিসমাপ্তি। এই সাধন-বিজ্ঞানের অমূল্যলব্ধি ফলে প্রত্যেকের জীবনে ফুটিয়া উঠিবে ভগবানের চতুর্ভুজ মূর্তি। বুদ্ধিতে বা ললাটে জাগিবে ব্রহ্মণ্য-প্রতিভা। হৃদয়ে ক্ষাত্রবীৰ্য্য, প্রাণে বৈশ্বশক্তি এবং দেহে শূদ্র বা সেবার শক্তি। এই সেবা ঘটে ঘটে যে নারায়ণ বিরাজ করেন, তাহারই সেবা, নর-নারায়ণের সেবা। আজিকার এই শুভ উত্তরায়ণের দিনে, আমি সুউচ্চ কণ্ঠে ইহাই ঘোষণা করি যে, যতদিন ভারতের ব্রহ্মণ্য-প্রতিভা, ক্ষাত্রবীৰ্য্য, বৈশ্বশক্তি ও শূদ্রের সেবা জাগ্রত থাকিবে, ততদিন ভগবানও ভারতের প্রতি জীবের হৃদয়ে সদা জাগরুক থাকিবেন। ভারতে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করার জন্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের যে আকৃতি, তাহার মর্মকথা ইহাই যে, প্রতিটি মানুষ হইবে ধর্মের বিগ্রহ। ধর্ম শুধু শাস্ত্র-বাক্য হইয়াই থাকিবে না—আহারে, বিহারে, জীবনের সর্বাচারের মধ্য দিয়া ঈশ্বর-চেতনেরই প্রকাশ হইবে। ইহা আমার শুধু প্রত্যয়েরই বাণী নহে ইহা অমূল্যতীক্ষ্ণ কথা। কারণ ধর্ম অমূল্যতীক্ষ্ণ, যুক্তিসিদ্ধ। ধর্ম অভ্যুত্থান দেখ, নিঃশ্রেয়স দেয়। ধর্ম অমূল্যসংগে ফলে ঈশ্বরকে জীবনের সর্বস্তরে অনুভব করা যায়। ঈশ্বরই মানবের কর্তা, অমূল্য ও ভোক্তা। অসংশয় কণ্ঠে বলি—ভারতের প্রতি মানুষ যদি নারায়ণের বিগ্রহ হয়, ধর্ম-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা কেন স্বপ্ন-মাত্র হইবে? বাঙালীর রক্তধারা উর্দ্ধমুখী হউক—বাঙালী ঈশ্বরপবায়ন হওয়ার সাধনায় সিদ্ধ হউক—ইহাই আমার আকৃতি। (পুরাতন ‘নবসংজ্ঞা’ হইতে)।

সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল

আবেদন

তৃতীয়াধ্যায়ঃ ॥ (প্রথমঃ অষ্টকঃ । সপ্তত্রিংশঃ সূক্তঃ ।) পঞ্চমী ঋক্
(সম্বৎসর শ্রীমতিলালের জীবন-ভাষ্য অনুসরণে)

শ্রীঅনিলবরণ তর্কবেদান্ততীর্থ

প্রঃ শংসা গোষপ্পাং ক্রীলং যচ্ছদো মারুতং ।

জন্তে রসস্য বাবুধে ॥ ৫ ॥

অর্থ—“গোষু” (পুশ্ণি—কিরণসমূহ) “অগ্ন্যাং” (অজ্ঞেয়, অব্যাহত) “ক্রীলং” (সর্বত্র বিচরণশীল) “মারুতং” (মরুৎ সম্বন্ধীয়) “যং” (যে) “শর্দঃ” (তেজ) [অস্তি—আছে, তং সেই তেজকে, হে ঋষিঃ—ঋষিকগণ] “আ” (সর্বতোভাবে) “প্র-শংস” (স্তব কর) [কারণ সেই তেজের] “জন্তে” (মুখে বা উদরে) “রসস্য” (রসের) “বাবুধে” (বৃদ্ধি হইয়াছিল) ॥ ৫ ॥

সরলার্থ—কিরণসমূহ অর্থাৎ জ্যোতির্ময় মরুদেবগণ অজ্ঞেয়, অব্যাহত, সর্বত্র বিচরণশীল । কিরণসমূহের মধ্যে মরুৎ সম্বন্ধে যে তেজ আছে, সেই তেজকে হে ঋষিকগণ সর্বতোভাবে স্তব কর । কারণ সেই তেজের উদরেই রস বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল ।

বিশদার্থ—এই ঋক্সে ঋষি মরুদেবগণের স্বরূপ, উহা হইতে তেজ এবং সেই তেজ হইতে রস অর্থাৎ অপের উদ্ভব প্রকৃতি সম্বন্ধে বলিতেছেন ।

পূর্বে ঋষি বায়ু সম্বন্ধে বলিয়াছেন—“বায়ুঃ স্পর্শাদি লিঙ্গকঃ” অর্থাৎ বায়ু শব্দ ও স্পর্শগুণজাত । কিন্তু মরুৎ স্পর্শাদির অতীত উহা বায়ুভূত সূক্ষ্ম তান্মাত্রিক গুণ মাত্র । সেইজন্তই ঋষি এই মন্ত্রে “গোষু” পদ ব্যবহার করিয়াছেন । গো শব্দের অর্থ কিরণ । গোষু—কিরণ সমূহেই । আচার্য্য সাযন গো শব্দের অর্থ করিয়াছেন “পুশ্ণি” । পুশ্ণিও অপর অর্থ রশ্মি । তাহা হইলে মরুৎ বলিতে “গোষু” পদের দ্বারা ঋষি ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, মরুৎ বায়ুর অধিদেবতা—আকাশের শব্দগুণকে মাত্র আশ্রয় করিয়া যে সূক্ষ্ম তেজোময় উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক-স্বরূপ বায়ু-কণিকাসমূহ—যাহা বায়বীয় তত্ত্বহীন অথচ যাহাদের দীপ্যমান অমিত বল-সম্বিত বীৰ্য্যেই বায়ুর উৎপত্তি, তাহাদেরই মরুৎ বলা হয় । ইহারা অশরীরী গুণহীন, স্পর্শাদি বিবর্জিত স্তবরাং ইহারা দেবতা । এই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক-স্বরূপ তেজোময় কিরণসমূহকে ঋষি বলিতেছেন “অগ্ন্যাং”—অহস্তব্যং, অজ্ঞেয়ং—ইহাদিগকে কেহ কখনও জয় করিতে বা হনন করিতে সমর্থ হয় না অথচ ইহারা “ক্রীলং” সর্বত্র বিচরণশীল এবং ইহাদের মধ্যে যে “মারুত শর্দঃ” মরুৎ সম্বন্ধীয় তেজ নিহিত আছে, সেই তেজের “জন্তে”—মুখে বা উদরে যে ঘনীভূত “রসমাত্রম্” আছে, যাহা আচার্য্য সাযনের ভাষায় গোক্ষীর সদৃশ—তাহাই ক্রমে “বাবুধে” বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় । সেই বাবুধ রসই অপেক্ষে পৃথিবীতে পতিত হইয়া ভূতসমূহের সৃষ্টির কারণ হয় ।

“জন্তে” পদটি নাশনার্থ “জন্তি” ধাতু হইতে নিষ্পন্ন । ভক্ষণ করা যায় ইহার দ্বারা এই ব্যাস বাক্যে “জন্তে” অর্থে আত্ম (মুখ) বুঝায় । “জন্তে” পদে মুখ অথবা উদর যাহাই প্রতীয়মান হউক না কেন, উহার প্রতিবাক্যের একটি সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য পাওয়া যায় । যথা—মুখে অথবা উদরে যে কোন আহাৰ্য্য দ্রব্য প্রদত্ত হইলে, তাহা তৎক্ষণাৎ অল্প বস্তুতে রূপান্তরিত হব । শরীরের মেদ, মজ্জা, রস, রক্ত সবই আহাৰ্য্য পদার্থেরই রূপান্তরিত রূপ । সেইরূপ তেজের “জন্তে” বা উদরে আকাশের শব্দগুণ এবং বায়ুর স্পর্শগুণের যখন সংমিশ্রণ ঘটে, তখন উহা এক নূতন রূপ বা আকার প্রাপ্ত হয়—যাহার নাম রস । ঐ রসেরই পরিণত রূপ অপ বা জল ।

সৃষ্টিতত্ত্বের কি গভীর জ্ঞানই না দৃক্‌সিদ্ধ আৰ্য্যঋষিগণ অর্জন করিয়াছিলেন—যাহার কণিকা মাত্র গ্রহণেই আধুনিক বিজ্ঞান-জগৎ স্ফীত ।

গীতা কি মহাভারতের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত ?

শ্রীঅজরচন্দ্র সরকার

১. এই বিষয়ে বহু আলোচনা, অল্পসন্ধান, গবেষণা হইয়াছে। মাত্র মহাভারত-অবলম্বনে ইহার উত্তর পাওয়া যায় কিনা দেখাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

কথেকজন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পণ্ডিতগণের বিশ্বাস যে, গীতা মহাভারতের মধ্যে সংযোজিত একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ—মহাভারতের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত; আবার কোন কোন বিদ্বজ্জন বলেন যে, না—সমগ্র গীতাই মহাভারতের প্রকৃত অংশ—প্রক্ষিপ্ত নয়। আমরা কিন্তু প্রথম মতের পক্ষপাতী। এই পক্ষপাতিত্বের দুই-চারটা কারণ উল্লেখ করিতেছি।

উদ্যোগ-পর্ব অধ্যায় ১০৫-এ লিখিত আছে—সঞ্জয় কহিলেন—মহারাজ, রজনী প্রভাত হইলে (যুদ্ধের প্রথম দিনের প্রভাত) আপনার পুত্র পিতামহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যুধিষ্ঠিরের অসীম সৈন্য-সাগর আপনি কত কালে ক্ষয় করিতে পারেন। দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, কর্ণ, অখ্যামা—ইহারাই বা কে কত কালে পারেন। ভীষ্ম ইহার বিশদ উত্তর দিয়াছিলেন। উদ্যোগ-পর্ব অধ্যায় ১০৮-এ শেষ হইয়াছে—কৌরব সৈন্যের যুদ্ধযাত্রা ও শিবির-সন্নিবেশে এবং পাণ্ডব সৈন্যের যুদ্ধযাত্রা।

উদ্যোগ-পর্বের পরেই ভীষ্মপর্ব। ১ম অধ্যায়ে দেখিতে পাই, মহর্ষি বৈশম্পায়ন (যিনি অভিমহ্যুর পৌত্র পরীক্ষিতের পুত্র রাজা জনমেজয়কে সমগ্র মহাভারত শুনাইয়াছিলেন) বলিলেন, একবথে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন যোদ্ধাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া স্ব স্ব দিব্যশক্তি ধ্বনি করিতে লাগিলেন। ২য় অধ্যায়ে ব্যাসদেব সঞ্জয়কে দিব্যচক্ষু প্রদান করিলেন। ৩য় অধ্যায়ে ব্যাসদেব-কর্তৃক অমঙ্গল বর্ণনা, এবং ধৃতরাষ্ট্রের অমুরোধে ব্যাসদেব-কর্তৃক শুভনিমিত্ত-বর্ণনা। অধ্যায় ৪-১২ ভূমিকপর্ব—ধৃতরাষ্ট্রের ফরমাস-মত সঞ্জয়-কর্তৃক পৃথিবীর গুণবিবরণ বর্ণিত হইল। অধ্যায় ১৩-র প্রথমই দেখিতে পাই—

অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র চিন্তায় নিমগ্ন আছেন এমন সময় সঞ্জয় যুদ্ধক্ষেত্র হইতে তাঁহার নিকটে সহসা দ্রুতবেগে আসিয়া পিতামহ ভীষ্মের পতন-সংবাদ দিলেন।

সঞ্জয় উবাচ—

সঞ্জযোহং মহারাজ নমস্তে ভরতর্ষভ।

হতো ভীষ্মঃ শাস্তনবো ভারতানাং পিতামহঃ ॥ ১৩।৩

পরিরক্ষ্য স সেনাং তে দশরাজমনীকহা।

জগামাস্তমিবাদিত্যঃ কৃতা কর্ম স্তুত্করম্ ॥ ১৩।১১

—আমি সঞ্জয়। হে মহারাজ ভরতশ্রেষ্ঠ, আপনাকে নমস্কার। পিতামহ ভীষ্ম হত হইয়াছেন। তিনি দশদিন আপনার সৈন্য রক্ষাপূর্বক অতিহুঙ্কর কর্ম করিয়া আদিত্যের তায় অন্তগত হইয়াছেন।—

১৩ হইতে ২৪—এই ১১টি অধ্যায় ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয়ের কথোপকথন।

অধ্যায় ১৪—ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্মের পতন-সংবাদ বিস্তারিত জানিতে চাহিলেন। এইখানে ৭২-র শ্লোকে ১৪শ অধ্যায় শেষ হইয়াছে। অধ্যায় ১৫—ভীষ্মের বিস্তারিত পতন-বর্ণনা দিতে সঞ্জয় স্বীকার করিলেন, এবং ভীষ্মকে রক্ষা করিবার জন্ত 'হুর্যোধন, দুঃশাসনকে আদেশ দিলেন। অধ্যায় ১৬—শ্রীকৃষ্ণ শত্রুবর্ষের জন্ত অর্জুনকে দুর্গাস্তোত্র কীর্তন করিতে বলিলেন; অর্জুন কীর্তন করিলেন এবং দুর্গা আবিস্কৃতা হইয়া বলিলেন, হে পাণ্ডব, তুমি অল্পকাল-মধ্যেই শত্রুদিগকে জয় করিবে। অতঃপর দেবী অন্তর্হিতা হইলে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন একত্রে অবস্থিত হইয়া দিব্যশক্তি ধ্বনি করিতে লাগিলেন। ভীষ্মপর্বের অধ্যায় ২৩-এর শেষ শ্লোক ২৮ হইতেছে—

সঞ্জয় উবাচ—

যত্র ধর্মোদ্ব্যতিঃ কাস্তির্ যত্র হ্রীঃ শ্রীস্তথা মতিঃ।

যতো ধর্মস্ততঃ কৃষ্ণো যতঃ কৃষ্ণস্ততো জয়ঃ ॥

—যেখানে ধর্ম, ত্যক্তি ও কাস্তি, যেখানে লজ্জা, শ্রী ও মতি, এবং যেখানে ধর্ম সেখানেই কৃষ্ণ, আর যেখানে কৃষ্ণ সেখানেই জয়।—

অধ্যায় ২৪-এ মাত্র ৭টি শ্লোক আছে। ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নের উত্তরে, কোন্ পক্ষ অগ্রে যুদ্ধ করে এবং কোন্

পক্ষের গন্ধ ও মাল্যের প্রাচুর্য্যাব বেশি ইত্যাদি অবাস্তব বিষয় সঞ্জয় বর্ণনা করেন।

উদ্যোগ পর্বের অধ্যায় ১৯ হইতে আরম্ভ করিয়া ভীষ্মপর্বের ২৩ পর্যন্ত অধ্যায় হইতে যে সকল সংবাদ সংগৃহীত ও উদ্ধৃত হইল, সে সকল হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, গীতার প্রথম শ্লোকে ধৃতরাষ্ট্র-কর্তৃক সঞ্জয় যুদ্ধ-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইবার বহুপূর্ব হইতেই অর্থাৎ যুদ্ধের প্রারম্ভের বহুপূর্ব হইতেই ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধের বিবরণ, এমন কি ভীষ্মের পতন-সংবাদ হস্তিনাপুরে বসিয়া সঞ্জয়ের মুখে বিস্তারিতভাবে শুনিয়াছিলেন। এই বিষয়ে আমাদের বিম্ব-বিসর্গ সন্দেহ নাই। আবার স্মরণ করাইয়া দিই, অধ্যায় ১৪ হইতে ২৪ ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয়ের কথোপকথন—শুধু যুদ্ধ সম্বন্ধে।

মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অধ্যায় ২৫-এর ১ম শ্লোক এবং গীতার অধ্যায় ১-এর ১ম শ্লোক একই। আবার বলি, মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অধ্যায় ২৫ হইতে অধ্যায় ৪২ গীতার ১ম হইতে ১৮শ অধ্যায়।

এইবার গীতার ১ম অধ্যায়ের ১ম শ্লোক উদ্ধার করিতেছি।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ—

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।

মামকাঃ পাণ্ডবাস্চৈব কিম্ অকুর্বত সঞ্জয় ॥

—অধ্যায় ১৩-র প্রথমেই সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে ভীষ্মের পতন-সংবাদ দিলেন। অধ্যায় ১৪-য় ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্মের পতন-সংবাদ বিস্তারিত জানিতে চাহিলেন। তারপর অধ্যায় ১৫ হইতে অধ্যায় ২৪ যুদ্ধের নানা কথা ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয়ের মধ্যে আলোচিত হইল—ইতিমধ্যে যুদ্ধের ১০ দিন অতিবাহিত হইয়াছে। এখন কি আর জিজ্ঞাসা করা যায় যে—হাঁ হে সঞ্জয়, আমার ছেলেরা আর পাণ্ডুর ছেলেরা কুরুক্ষেত্রে জড় হ'য়ে কি করলে বলা ত শুনি:—

সময়োচিত প্রশ্ন বটে!

গীতার দুইজন প্রসিদ্ধ টীকাকার এবং তাঁহাদের দেখাদেখি, দুইজন আধুনিক ব্যাখ্যাকার ‘কিমকুর্বত’ (কিম অকুর্বত)—‘কি করিল’র ওপর টীপনী করিয়াছেন যে স্থানমাহাত্ম্যে ধর্মপ্রভাবে তাহারা কি যুদ্ধ হইতে

বিরত হইয়াছিল?—ধর্মক্ষেত্রের প্রভাবে দুর্ধোদন কি পাণ্ডবদিগকে গ্রায্য রাজ্য ফিরাইয়া দিল?—যুগিষ্ঠিরাদি কি সন্ধি কবিষা করিয়া গেলেন? শ্রীপদশোপরি বিক্ষোভকম্! বলা ভাল, গীতার প্রধান ভাষ্যকার আচার্য শঙ্কর গীতার ১ম অধ্যায়ের ভাষ্য লেখেন নাই।

তারপর গীতার ২ হইতে ২-এর শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, দুর্ধোদন দ্রোণাচার্যের নিকটে গমন করিয়া পাণ্ডবদের ও কৌরবদের প্রধান প্রধান যোদ্ধাদের নাম উল্লেখ করিল। কেন? দ্রোণের গ্রায্য যোদ্ধা, যিনি ভীষ্মের পতনের পর সেনাপতি হইয়াছিলেন, তিনি কি জানিতেন না কে-কে কোন্ পক্ষে যুদ্ধ করিবে? কিন্তু আমরা ত জানি, উদ্যোগ পর্বের ‘রথাতিরথ’ প্রকরণে দ্রোণের সমক্ষে দুর্ধোদন ভীষ্মের নিকটে জানিতে চাহিয়ছিল, শক্রদের ও কৌরবদের মধ্যে কতজন রথী ও অতিরথ আছেন। উত্তরে ভীষ্ম স্বপক্ষীয় ও বিপক্ষীয় যে সমুদয় রথী ও অতিরথের নামোল্লেখ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মাত্র কয়েকজনের নাম গীতায় পুনরায় বলা হইয়াছে। স্মরণ্য উভয় পক্ষীয় প্রধান প্রধান বীরের নাম যে পূর্ব হইতেই দ্রোণ অবগত ছিলেন, ইহাতে সন্দেহের লেশমাত্র নাই।

তারপর ১০ম শ্লোকে দুর্ধোদন দ্রোণের নিকটে একটি নূতন সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন—বলিলেন, আমাদের সৈন্য ভীষ্ম-কর্তৃক রক্ষিত আর পাণ্ডবদের সৈন্য ভীষ্ম-কর্তৃক রক্ষিত। এ কথাও কি দ্রোণাচার্য জানিতেন না? না বাহালুরে বুড়োর বড় ভোলা মন—তাই?

১১শ শ্লোকে দুর্ধোদন বলিল, অতএব সকল ব্যুহদ্বারে যথাস্থানে অবস্থিত থাকিষা আপনারা সকলেই ভীষ্মকেই রক্ষা করুন। কিন্তু ভীষ্মপর্বের ১৫শ অধ্যায়ে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছিলেন, সকল সেনা যথাবিধানে ব্যুহমধ্যে অবস্থিত হইলে দুর্ধোদন দুঃশাসনকে আদেশ করেন—তুমি ভীষ্মকে রক্ষা করার নিমিত্ত রথগুলি শীঘ্র যোজনা কর এবং সঙ্কর সমুদয় সৈন্য নিয়োগ কর ইত্যাদি।

ভীষ্মপর্বের ১ম অধ্যায়েই বৈশম্পয়নের উক্তি জানিতে পারি যে রথস্থিত শ্রীকৃষ্ণের ও অর্জুনের পাঞ্চজন্ম ও দেবদত্ত শঙ্খদ্বয় ধ্বনিত হইয়াছিল এবং অর্জুন-কর্তৃক

দুর্গাস্তব করার পরে একই রথে অবস্থান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন যে দিব্যশব্দধ্বনি করিয়াছিলেন, সে ত অধ্যায় ২৩-এ সঞ্জয়ের মুখে দ্বতরাষ্ট্র শুনিয়াছিলেন, তবে আবার মহাভারতের অধ্যায় ২৫-এর শ্লোক ১৪ ও ১৫-য় (অর্থাৎ গীতার ১ম অধ্যায়ের শ্লোক ১৪ ও ১৫-য়) এই কথার পুনরুল্লেখ কেন ?

এইসব নানা কারণে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, সমগ্র গীতা মহাভারতের মধ্যে পরে ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি, মহাভারতের অধ্যায় ২৩ শেষ হইয়াছে—যতো ধর্মন্ততঃ কৃষ্ণো যতঃ কৃষ্ণন্ততো জয়ঃ—প্রভৃতি সঞ্জয়ের উক্তি। মাত্র ৭টি শ্লোক-বিশিষ্ট অধ্যায় ২৪-ও প্রসিদ্ধ—ইহা গীতার সূচনার গৌরচন্দ্রিকা হিসাবে লিখিত ও যোজিত হইয়াছে; আর অধ্যায় ৪৩-এর গোড়ার ৮টি শ্লোকও গীতার শেষের সহিত পৌর্বাপর্য (consecutiveness) ও সামঞ্জস্য-রক্ষার জন্য যোজিত হইয়াছে। এই ৮টি শ্লোকের মধ্যে—গীতা স্মৃতি কর্তব্য। কিমুচৈঃ শাস্ত্রসংগ্রহৈঃ—ইত্যাদি বহুল উদ্ধৃত তিনটি শ্লোক আছে, এবং গীতাতে যে শ্রীকৃষ্ণ ৬২০ শ্লোক, অর্জুন ৫৭, সঞ্জয় ৬৭ এবং দ্বতরাষ্ট্র ১টি মাত্র শ্লোক বলিয়াছিলেন—এই সম্বন্ধে ৩টি পঙ্ক্তি-বিশিষ্ট শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়। এই শ্লোক-সংখ্যাগুলি যোগ করিলে হয় ৭৪৫, কিন্তু প্রচলিত গীতার শ্লোক-সংখ্যা ৭০০। ৪৫টি শ্লোক কোথায় গেল ? আরও আশ্চর্যের কথা এই যে, মহাভারতের যে সংস্করণে ৭৪৫ সংখ্যক শ্লোকের উল্লেখ আছে, তাহাতেই কিন্তু গীতার শ্লোক-সংখ্যা দেখি ৭০০ অথবা তাহার কম। কেন এমন হয়, বুঝিয়া ওঠা ভার। এইসব গোলযোগের দ্বারা বোধহয় ‘বঙ্গবাসী’ প্রেস হইতে মুদ্রিত (শকাব্দ ১৮২৬) বাঙ্গালা মহাভারতে গীতার এই গুণ-বর্ণনা এবং শ্লোক-সংখ্যা স্থান পায় নাই। তাই

আমাদের দ্রব বিশ্বাস, মহাভারতের অধ্যায় ৪৩-এর ৮টি শ্লোকও প্রসিদ্ধ—পরে যোজিত।

অতরাং স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে—

তথা দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ পিতরশ্চ জনাধিপ।

সিদ্ধচারণসজ্জাশ্চ সমীযুস্তে দিদ্ক্ষমা ॥

সঞ্জয় বলিলেন—অনন্তর দেবগণ, গন্ধর্বগণ প্রভৃতি সেই মহাহত্যাকাণ্ড দেখিবার মানসে তথায় সমাগত হইলেন।—এই শ্লোকেই মহাভারতের অধ্যায় ২৫-এর প্রারম্ভ হওয়া এবং ইহার সংখ্যা ৯-এর পরিবর্তে ১ হওয়া উচিত ছিল। তাই আমার অটল বিশ্বাস—

মহাভারতের ৪, এবং ২৫ হইতে ৪১—এই ১৯টি সম্পূর্ণ অধ্যায় এবং অধ্যায় ৪২-এর প্রথম হইতে ৮টি শ্লোক প্রসিদ্ধ।

আর একটি বিষয় উল্লেখ করিয়া এই কূট-প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি। মহাভারতের অধ্যায় ২৩-এর শেষ শ্লোক—

সঞ্জয়ের উক্তি—

যত্র ধর্মোহ্যতিঃ কাস্তির্ যত্র দ্বীঃ শ্রীত্থা মতিঃ।

যতো ধর্মন্ততঃ কৃষ্ণো যতঃ কৃষ্ণন্ততো জয়ঃ ॥ (২৩।২৮)

আর গীতার অধ্যায় ১৮-র শেষ-শ্লোক—

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধর্মধরঃ।

তত্র শ্রীবিজয়ো ভূতিন্ ক্রবা নীতিন্ মতিন্ মম ॥

(১৮।৭৮)

—যেখানে অচিন্তনীয়-সামর্থ্যসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ আছেন, যেখানে গাভীবধারী অর্জুন আছেন, সেখানেই শোভা, জয়, ঐশ্বর্য—অভ্যদয় ও অচলা সংনীতি—ভায়বর্ষ বিরাজ করিতেছে—ইহাই আমার (সঞ্জয়ের) অভিমত।

এই উভয় শ্লোকের তুলনা করিলেই আমার কথার যথার্থ্য নিশ্চয়ই উপলব্ধ হইবে।





শিল্পীঘন

—শ্রী ব্রজ লোকে ধীর—

(পূর্বাহ্নবৃত্তি: পৌষ সংখ্যার পর)

দেবকুমার বললো—কঙ্কুকী তোমাকে একবার দেখা করতে বলেছেন।

—ভবি ভোলবার নয়—বলে কঙ্কুকী হাসলো, বললো—কঙ্কুকীকে বলো কান্ডকুজ যাবার ব্যবস্থা আমি নিজেই করতে পারবো, তাঁকে আমার আর প্রয়োজন নেই। তবে তিনি ইচ্ছা করলে বশীকরণ কবচ ধারণ করে দেখতে পারেন ফল হয় কিনা।

দোকান বন্ধ করা হয়েছিল, কল্যাণের হাতে একটা পানের দোনা গুঁজে দিয়ে চঞ্চলী প্রস্থানের উদ্যোগ করলে কল্যাণ বললো—তাহলে আমার নৃত্যাহুষ্ঠানের কি হবে?

—তোমার সঙ্গে ভিন্ন ব্যবস্থা, তবে কঙ্কুকীর দলে আমি আর নেই।

চঞ্চলী চঞ্চলা পদক্ষেপে চলে গেল। কল্যাণকে কিছুটা উদ্বিগ্ন বলে মনে হলো। অল্পমনস্কভাবে সে হৃদের পথ ধরলো। যাত্রাপথে সে একটি কথাও বললো না।

বাড়ী ফিরেই কল্যাণ ঝিন্দনকে বললো—সকল আহার পর্ব শেষ করে নাও আজ আর গানের আসর

নয়, আজ বসন্ত রাগের কয়েকটা গান বাঁধতে হবে, কয়েক দিনের মধ্যেই আমরা রওনা হবো, রাজ্যাভিষেক উৎসব। সেদিক প্রস্তুত হতে হবে।

—স্বামীশ্বর যাবে? সে তো পনেরো দিনের পথ।

—হোক না, শীতের দিনে কোন কষ্ট হবে না। বরং কয়েকটা দিন আনন্দে অতিবাহিত হবে।

—পুরো একটা মাস পথেই কাটবে, তারপর সেখানে গিয়ে হয়তো থাকতে হবে গাছতলায়। আমার অতো ঘোরাশুরি করতে আর ভালো লাগে না। তুমি তাহলে একাই যেও।

—তুমি ছাড়া আমার কোন দাম নেই। তুমি আর না দিলে আমার গানের মূল্য কি! ঝিন্দনের জুড়ই কল্যাণকে মাহুষ সুরকার বলে জানে। তুমি তো আমার সঙ্গে যাবে, আমি সব বন্দোবস্ত করবো। আমাদের যাবার ব্যবস্থা করছেন উপারিক মহারাজ নন্দবর্ধন।

—সহসা নন্দবর্ধনের তোমার প্রতি এতো কৃপা কেন?

—নন্দবর্ধনের সঙ্গে আমার কোন গোলযোগ নেই। কঙ্কুকী তাঁর সঙ্গে নৃত্যাগীতের দল নিয়ে যাবেন, আমি সেই দলে।

—কঙ্কুকী? সেই চণ্ডী মন্দিরের গঞ্জিকাসেবী তান্ত্রিক যে বশীকরণ মাহুলী বিতরণ করে?

—তুমি ওকে ছোট্ট ঝঁবে দেখছ কেন ঝিন্দন, লোকটি নাট্যশাস্ত্রে বিশেষ গুণীজন।

—আরেকটা শাস্ত্রও সে জানে, তা নন্দবর্ধনের অন্তঃপুরের জন্তু নাগরিকা সংগ্রহ করা। আমাকেও সে কিনতে চেয়েছিল, সে কথা আমি এখনও ভুলিনি।

—কিনতে চেয়েছিল কিন্তু কিনতে তো পারেনি। ওটা তাঁর কোন দোষ নয়। রাজামহারাজাকে প্রসন্ন করতে হলে ওসব একটু-আধটু করতে হয়। আর কঙ্কুকীদের কাজই তো ওই। ওটা কোন দোষের ব্যাপার নয়। কঙ্কুকী তবুতো তজ্র, সে আমাকে সহস্র দীনার (স্বর্ণ মুদ্রা) দিতে চেয়েছিল, কিন্তু এমন অনেক রাজা মহারাজার কথা জানি, যারা বলপূর্বক কন্যা অপহরণ করে নিষে বাধ। কঙ্কুকী যদি অহরূপ কোন পন্থা অবলম্বন করতেন তা হলে তুমি আমি কি করতে পারতাম?

—তুমি যাই বল, মানুষটিকে আমার ভাল লাগে না।
আমার বড় ভয় করে।

—আমি সঙ্গে থাকবো, কিসের ভয় ?

—তোমার সঙ্গে যখন গাঁটছড়া বেঁধেছি, তখন
তোমার অনুজ্ঞা মানতে হবে।

ঝিন্দুর চোখে হতাশা ফুটে উঠলো।

দেবকুমার নীরব দর্শকের মত দাঁড়িয়েছিল। এতক্ষণে
ঝিন্দু যেন তার সম্পর্কে সচেতন হলো, বললো—
আর্য, আপনি হাতমুখ ধুয়ে আসুন, আমি আহারের
ব্যবস্থা করি।

দেবকুমার সঙ্কুচিত হলো, পতি-পত্নীর বাক-বিতর্কের
সামনে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকাটা অশোভন হয়েছে।
তাড়াতাড়ি সে প্রাঙ্গণের ইন্দারার দিকে চলে গেল।

ওই দীপগুলি তাকে ডেকে এনেছে এতদূরে। কী অপক্লপ
ভাস্কর্য ওই মন্দিরগুলিতে। এখানে আসা তার সার্থক
হয়েছে। অমন লালিত্য সে হয়তো কোনদিনই তার
শিল্পে ফুটিয়ে তুলতে পারবে না। কিন্তু যা দেখলো
তার সুষমা চোখে লেগে থাকবে আমরণ। দেবতার
মহিমা যেন ললিতকলায় বিচ্ছুরিত হয়েছে মন্দির-গায়ে।
দৈবকৃপা না থাকলে কোন ভাস্কর এমন শিল্প সৃষ্টি করতে
পারে না।

মন্দিরের ভাস্কর্যের কথা মনে উঠতেই কঙ্কুর
আচরণ মনে পড়ে। এই মন্দিরের প্রাঙ্গণে কঙ্কুর মত
মানুষ আর সিদ্ধিনাথের মত সন্ন্যাসী বড় বিসদৃশ। এই
মন্দিরের সুষমাতাদের চিত্তকে শোধিত করতে পারেনি
—এ এক বিষয়।

—কে তুই ?

দেবকুমার চমকে উঠলো। পিছন দিক থেকে সামনে
এসে দাঁড়ালো এক ভৈরব। হাতে ত্রিশূল, ব্যাঘ্রচর্ম
পরনে। দীর্ঘ দেহ। মাথার ছট প্রায় কোমর অবধি
নেমেছে। হাতে একটা নরকঙ্কাল। চাঁদের আলোয়
চক্চক্ করছে।

সামনে দাঁড়িয়ে ভৈরব একবার দেবকুমারের মুখের
পানে তাকালো, তারপর বললো—কে তুই ? এখানে
বসে কি করছিস ?

দেবকুমার শঙ্কিত হলো, সংসা কোন কথা বলতে
পারলো না।

ভৈরব হাসলেন, বললেন—কি ভাবছিস ? ভয়
পেয়েছিস, না ? বিশ্বাস রাখ তাহলে আর ভয় থাকবে
না—তোর উপর বিশ্বাস রাখ সে-ই তো সব করাচ্ছে, তুই
কে ? বিশ্বাস হারালেই ফেসে যাবি। সেইখানেই
মহামাঝার খেলা। একটু টলেছিস কি ডুবেছিস ! আস,
এদিকে আয়।

ভৈরব এগিয়ে গেল। দেবকুমার ভয়ে ভয়ে তার
অনুসরণ করলো। একেবারে জলের কিনারায় গিয়ে
ভৈরব বসলো, বললো—বস্ !

দেবকুমার বসলো।

ভৈরব সহসা দেবকুমারের মাথার উপর হাত রাখলেন।

আহারের পর ঝিন্দু সুরবাহার নিয়ে বসলো।
কল্যাণ বললো—আজ আর গানের আসর নয়, আজ
শুধু সুরের আলাপ। এই সুর থেকেই গান তৈরী হবে।

দেবকুমার বললো—সুর আমি ভালো বুঝি না,
আমি বরং কিছুক্ষণ নিনোরা-তালগায়ের ধার থেকে
ঘুরে আসি।

—শীতের রাতে হিম লাগবে না ?

—আমার অভ্যাস আছে, অনেক দিন রাত্রি-ত্রিপ্রহর
অবধি নরদার তীরে অতিবাহিত করেছি।

—বেশ, যাও, কিন্তু দেখো আবার ঘুমিয়ে পড়ো না,
জেগে থাকতে না হয়।

দেবকুমার স্তিতহাস্তে বেরিয়ে পড়লো।

পায়ের-চলা পথটুকু পার হলেই নিনোরা। চাঁদের
আলোয় খজুর বীধি শোভিত ক্ষুটিকের উজ্জলতায়
ঝলমলে জলের বিস্তার। ওপারের মন্দির-শীর্ষে নক্ষত্রের
মত সারি সারি আকাশপ্রদীপ। শান্ত জনবিরল রহস্যময়
অন্ধকার। একখানি পাথরের উপর দেবকুমার বসলো।

অনেক দিন পরে জলের কিনারায় একান্তে বসে
থাকার সুযোগ মিললো। মনে হলো নরদার তীর কত
দিন আগে কত পিছনে সে ফেলে এসেছে। মন্দির-শীর্ষের

দেবকুমারের সারা দেহে যেন বিদ্যুৎ বহে গেল। চকিতে চোখের সামনে ভেসে উঠলো এক গভীর বন। অন্ধকারে বনের পথ দিয়ে সে চলেছে, সঙ্গে এক রমণী। রমণী তার হাত ধরে চলেছে। বারেক তার মুখ দেখা গেল, সে বিন্দন। বিন্দন চিংকার করে উঠলো, 'আর্য', সাবধান! চকিতে একখানি ছুরিকা চোখের উপর ঝলমল করে উঠলো। পরক্ষণেই হৃদপিণ্ড চমকে উঠলো। ছুরিখানি বসে গেল বুকে। বিন্দনের পাশে ক্ষণেকের জ্ঞান দেখা গেল কল্যাণকুমারের মুখখানি। দেবকুমার অশ্রুট আর্তনাদ করে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নের ঘোর কেটে গেল। ভৈরব তার মাথায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে হাত নামিয়ে নিলে। হেসে বললো—দেখলি তো, টলেছি কি কেঁসেছি।

দেবকুমার ভয়ে ভয়ে বললো—এ কি সত্যি?

—আমি কি জানি, তোর কথা তুই বুঝবি। যা করতে এসেছি তাই করে যা, আবার অত্নদিকে মন কেন? যা তোর ধর্ম তাই কর!

দেবকুমার ভৈরবের পায়ের ধূলো মাথায় নিল। বললো, আপনি আমায় আশীর্বাদ করুন, যেন ঠিকপথে চলতে পারি।

—পথ তো খুঁজে পেয়েছি এখন বিশ্বাস রেখে চল বিশ্বাসে সব ঠিক হয়ে যাবে। টলেছি কি মরেছি! চারিদিকে শুধু মায়া, একটাকে ছেড়ে আরেকটাকে ধরেছি তো দুটোই গেল। যা করবি একটা কর—সিদ্ধি অসিদ্ধি যা হবার তাতেই হবে।

—আপনি আশীর্বাদ করুন, দেব!

—আবার আশীর্বাদ, আরে তুই-ও যে আমিও সে, শক্তি চা কালভৈরবের কাছ থেকে, তোকে পাথর-কাটার শক্তি তিনিই দেবেন। তোর কাছে পাষণের মূর্তিই সত্যি, রক্তমাংসের প্রতিমা কিছু নয়। যা ছেড়ে এলি, আবার তাতে জড়াচ্ছ কেন?

—আপনি অন্তর্যামী, আমি তো কিছুতে জড়াতে চাই না।

—মিথ্যাচারী হোস্নে, যা—

—আমি সত্যি কথাই বলছি, প্রভু।

—প্রথম নম্বরেই কেঁসে গেছি, তবু মানবি নে? জালে জড়াচ্ছ আর বলছিস 'জাল নেই', মিথ্যাবাদী। সিদ্ধি চাস তো জাল কাট। ভাবের ঘরে চুরি করিস নে। অধিকারী হয়ে অধিকার নষ্ট করিস নে, কষ্ট পাবি। এখন রাত হয়ে গেছে, ঘরে যা।

দেবকুমার সে আদেশ অবহেলা করতে পারলো না, উঠে পড়লো। পায়ে পায়ে পাথরখানি অবধি এসে, কেমন যেন মাথাটা ঘুরে গেল, পাথরখানির উপরেই সে বসে পড়লো। কিন্তু বৈশীক্ষণ বসে থাকতে পারলো না, ধীরে ধীরে কোন্ এক সময় শুয়ে পড়লো।

কোন এক সময় দেবকুমারের ঘুম ভেঙে গেল, কপালে হাত রেখে কে যেন ডাকছে—আর্য, উঠুন!

এ যে বিন্দন!

—আর্য রাত দ্বিতীয় প্রহর হলো, উঠুন, গৃহে চলুন।

দেবকুমার উঠে বসলো। বিন্দন সামনে দাঁড়িয়ে আছে, মৃদু হেসে বললো—সিদ্ধিনাথের সিদ্ধি যখন পান করেছিলেন, তখন ঘরে শুলেই পারতেন। এতো রাতে আমাকে আর ডাকতে আসতে হতো না।

দেবকুমার লজ্জা পেল, বললো—অপরাধ মার্জন করুন।

দেবকুমার উঠে দাঁড়ালো, বিন্দনের পশ্চাতে গৃহাভিমুখে রওনা হলো। চলতে চলতে বললো—আপনি এলেন কেন? আর্য কল্যাণকুমারকে পাঠালেই তো পারতেন।

বিন্দন আবার হাসলো, বললো—এক যাত্রার পৃথক ফল আপনি কি করে আশা করেন আর্য, যে সিদ্ধি খেয়ে আপনি শিলার উপরেই শয়ন করেছেন তা পান করে সুরকার গৃহ-শয্যার সামনে এতক্ষণ জেগে বসে আছেন, এ আপনি কি করে আশা করেন? সুরকারের এখন নাক ডাকছে।

—আপনাকে এইভাবে কষ্ট দেওয়ার জন্ত আমি খুব দুঃখিত কিন্তু সিদ্ধি খাওয়ার জন্ত আমি ঘুমিয়ে পড়িনি, এক সন্ন্যাসী আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছেন।

ঝিন্মন ফিরে দাঁড়ালো, বললো—সন্ন্যাসী? জটাধারী, বাঘচাল পরণে লম্বা-চওড়া তান্ত্রিক সন্ন্যাসী?

—হ্যাঁ, তান্ত্রিক বলেইতো মনে হলো।

—উনি ভৈরব স্বামী। ওদিকে একটা শ্মশান আছে, সেইখানে থাকেন। সিদ্ধ পুরুষ। দীর্ঘ কাল এখানে আছেন, অনেকে বলেন ঠাঁর বয়স নাকি শতবর্ষ পার হয়ে গেছে, রেচক কুস্তক করে উনি মৃত্যুকে জয় করেছেন। হোরা-শাস্ত্রে ইনি বিশেষ সুপণ্ডিত। যবন দেশ থেকে উনি এই শাস্ত্র শিখে এসেছেন, আকাশের নক্ষত্র দেখে উনি ভবিষ্যৎ বিচার করে দেন। এজ্ঞাত পারিষদ ও শ্রেষ্ঠী-মহলে তিনি বিশেষ সম্মানের পাত্র।

—উনি যা বলেন তা কি সত্য হয়?

—জানি না, তবে লোকে ঠাঁর কথা বিশ্বাস করে। কেন, উনি আজ আপনাকে কিছু বললেন?

স্বপ্নের কথাটা ঝিন্মনের কাছে প্রকাশ করতে দেবকুমারের বাথলো। সে ঘুরিয়ে বললো—স্পষ্ট কিছু বললেন না, তবে এখান থেকে সম্বর চলে যাবার নির্দেশ দিলেন।

—সম্বর চলে গেলে যে উদ্দেশ্যে এতদূর এসেছেন, তার কি হবে?

—সেই কথাইতো ভাবছি।

—ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ভাবছিলেন বুঝি?

—না, ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

—তা কি স্থির করলেন?

—এখনও কিছু স্থির করিনি।

—আমার কথা শুনবেন?

—কি বলুন?

—মন্দির দেখতে এসেছেন, মন্দির না দেখে যাবেন না। বার বার তো এখানে আসবেন না, কাজ সম্পূর্ণ করে যান।

—আমারও মনের কথা তাই। কিন্তু কুড়িটি মন্দির দেখতে যে মাসাধিক কাল লাগবে।

—না, তা লাগবে না, সব মন্দিরগুলিই একই ছাঁচের। প্রথম তিন-চারটি ধীরে স্বপ্নে দেখার পর, বাকিগুলি দেখতে আর বেশি সময় যাবে না। পক্ষকালের মধ্যে আপনার সব দেখা হয়ে যাবে। তারপর আমরা স্বাধীশ্বর যাত্রা করবো, আপনিও আমাদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়বেন।

—আমি তো আর আপনাদের সঙ্গে যাবো না, আপনারা যাবেন উত্তরে, আমি যাবো পশ্চিমে।

—অভিলাষ থাকলে আমাদের সঙ্গে স্বাধীশ্বরেও

যেতে পারেন। উৎসব দেখে আসবেন, রাজ্যাভিষেক তো তার ঘন ঘন ঘটে না। একজনের জীবনে হয়তো একবারই ঘটে।

দেবকুমার হাঁ না কিছুই বললো না, ভৈরবের কথাটা তার কানের কাছে বেছে উঠলো, 'টলেছি সু কি মরেছি সু।' দেবকুমার মনে মনে একটু শক্ত হবার চেষ্টা করলো।

আর কোন কথা হলো না, ছ'জনে গৃহে প্রবেশ করলো।

ঘুম ভাঙলো দেবীতে। জানালা দিয়ে প্রভাতী রোদ এসে পড়েছিল বিছানার উপরে। দেবকুমার তাড়াতাড়ি উঠে পড়লো। অরণকালের মধ্যে সূর্যোদয়ের পরে সে ঘুম থেকে ওঠেনি।

তাড়াতাড়ি সে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। বাইরের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে ঝিন্মন। ধমকের মত পিছন পানে হেলে ভিজে চুলে গামছার ঝাপটা মারছে। দেবকুমারকে দেখে সে সহজ হয়ে দাঁড়ালো। মুহূর্তেই বললো—কি, আর্থের ঘুম ভাঙলো।

দেবকুমার লজ্জা পেলে, বললো—আর্থ কল্যাণকুমার কি স্নান করতে চলে গেছেন?

—হা! অদৃষ্ট, কাল সিদ্ধি লাভ করেছেন, আজ এতো শীঘ্র তিনি শয্যাভ্যাগ করবেন বলে আপনি আশা করেন? বেলা প্রথম প্রহর অতীত হবার পর তাঁর ঘুম ভাঙবে। আপনি ইচ্ছা করলে আরও কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিতে পারেন।

—নাঃ।

—তা হলে একাই স্নান করে আসুন। আজ আর আর্থপুত্রের সঙ্গী পাবার আশা করবেন না। তেলের পাত্র আনুন।

ঘরে মাটির পাত্র ছিল, দেবকুমার বের করে আনলো, ঝিন্মন পাত্রটি তেলে পূর্ণ করে দিল, একটা নিমের দাঁতন এগিয়ে দিল। সদ্যস্নাত নারীদেহের একটা মৃদু ভ্রূণ দেবকুমার অমুভব করলো। একটা রূপের ঝিলিক খেলে গেলে চোখের উপর। লাল শাড়ী জড়ানো তপ্ত-কাঞ্চন বর্ণ, অগ্নিশিখার উপর একটা হরিৎ আভার মত। এ বুঝি আগুন জ্বালানো রূপ। দেবকুমার তাড়াতাড়ি তৈলপাত্র ও দাঁতন নিয়ে গৃহ থেকে নিজস্ব হলো।

ঘর থেকে বেরিয়ে এলো বটে, কিন্তু মন থেকে ঝিন্মনের ছায়াটুকু বের করে দিতে পারলো না। ঝিন্মন যেন তার মনের উপর চেপে বসলো। (ক্রমশঃ)

বংশীগীতির পুষ্টি

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন, ভক্তিতারতী

নামে বংশীগীতির পরিপূষ্টি। বাঁশীর শোঁজ মিটে রূপের লহরী দিকে দিকে ছুটে নাগে। নাম নামীকে নামাইয়া আনে—‘নময়তীতি নাম।’ যেখানে নাম সেখানেই ধাম—সেখানেই ভগবন্তার সার মাধুর্যের বিস্তার। যেখানে নাম সেখানেই নমস্কার। ঐশ্বর্য বলিয়াছেন—‘তন্নম ইত্যুপাসীত। নম্যন্তেহৈষ কামাঃ’। নমস্কারনিষ্ঠিত উপাসনায় জীবের সহিত শ্রীভগবানের পরম প্রেতত্ত্বে ঘনিষ্ঠতা ঘটে। ভগবান প্রেমস্বরূপ—‘আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান’। নাম আনন্দসম্বন্ধে শ্রীভগবানের চিদানন্দ রসের উজ্জীবক। নামের উচ্চারণকারী যিনি শ্রীহরি তাঁহার বশ।

‘ন তস্ত প্রতিমা অস্তি তস্ত নাম মহৎশব্দঃ—’

—‘যেই নাম সেই রূপ’। নামদাতার দিকে দৃষ্টি দান করিলেই ভগবান জীবের আপন হইতে চান এবং জীব উদ্ধারে তাঁহার সর্বশক্তি প্রবল রসধর্ম উচ্ছল হইয়া উঠে। প্রেমের পরম বলে ভক্তচিত্ত উজ্জল করিয়া তিনি নাম-শ্রবণকারীকে আপন রূপে আকর্ষণ করিয়া লন। নামে চিন্তের পরিশুদ্ধি ক্রিয়ার ফলে শ্রীভগবানের চিদানন্দ-ময় রূপের বিলাসে উচ্ছ্বসিত ভক্তচিত্তে ভগবৎ-লীলার পরিশুদ্ধি সর্বত্র এবং সর্বাবস্থার মধ্যে নিত্য এবং সত্য হইয়া উঠে। নামরসে বিদ্রাবিত শ্রীভগবানের করুণা কোন আবরণ মানে না। পাপী—সে যত বড় পাপীই হোক, নামের আশ্রয়ে তাহারও অধিকার। নামরূপী জগদ্বাণের দরজা সব সময়েই খোলা। যে যে অবস্থার ভিতরই নামের দিকে চায়, তাহার দিকেই ভগবানের নজর পড়ে। তাহার সকল ভার ভগবানই গ্রহণ করেন। নাম সাধন-ভজনের কোন অপেক্ষা রাখে না, কারণ নাম প্রকরণ নহে—নামে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শ্রীভগবানের আত্ম-তত্ত্বেরই সংবেদন এবং সর্বাবস্থার মধ্যে জীবের উজ্জীবন। শ্রীভগবানের রূপের বীজ নাম এবং সেই রূপ সর্বচিত্তা-কর্ষক সাক্ষাৎ-মন্মথমদন—সকলের পক্ষেই আপন। নামে সাক্ষাৎ-সম্পর্কে ভগবদর্শন।

জীবের চিত্তে ভগবদর্শনের সংবেদনটি উজ্জীবিত করাই নামের ধর্ম। দর্শনের এই লালসাটি জাগে স্পর্শে—সে স্পর্শ রস-সংশ্লিষ্ট আত্মনিষ্ঠ এবং ঘনিষ্ঠ। শ্রবণেন্দ্রিয় সংযোগে সেই স্পর্শ জীবের অন্তরে মাত্রাস্পর্শ বা ইন্দ্রিয়ের সীমায়িত ভাব অতিক্রম করিয়া অতিমাত্র সম্বন্ধে মহাভাবের প্রভাবকে উদ্দীপিত করে। ভাবের এই প্রভাবে চিদানন্দরসে ডুবে রূপের সুরণ। অন্তর জুড়িয়া তখন বাজে সুর—মধুর মধুর; তাহা হইতে অতি স্নমধুর। মনের মূলে এই সুর বেসিলে মিশিলে রূপের লহরী খোলে। প্রাথমিক মনোময় সেই উদয়। অতদ্বিত নেত্রে ভগবদ্রূপের দর্শনে তখন সাধকের অন্তরে আকৃতি জলিয়া উঠে। পঞ্চ প্রাণ পঞ্চদীপে সেই রূপের আরতির বাতি জ্বলিয়ায়। মুগ্ধ ভক্তি এই সত্যের ঘোষণা করিয়াছেন—‘যদা পশুঃ পশুতে রুক্মবর্ণং কর্জারমীশং পুরুষং ব্রহ্ম-যোনিম্ তদা বিদ্বান্ পুণ্য পাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি।’ নামের এমনই প্রভাব। নামরসের সংস্পর্শে এমনি বিশ্বের স্থিতিস্থিতির কর্তা, যিনি ঈশ্বর তিনিই জীবকে উদ্ধার করিয়া আপন করিয়া লইবার জন্ত আকুল হইয়া পড়েন। এই আকুলতায় জীবের সহিত তাঁহার আত্মসম্বন্ধটি রূপ ও রসের ধর্ম উজ্জল্য লাভ করে, প্রেমে পরিশুদ্ধ হয় তাঁহার লীলামাধুর্য। এই মাধুর্যের বীর্ঘ জীবের চিত্তের সমস্ত অবীর্ঘ দূর করে। পাপ পুণ্যের প্রতীক্ষা রাখে না। নাম রসে সংশ্লিষ্ট ভগবদহুগ্রহের সংবেগ দেশ-কালকে আনন্দধন চেতনায় সংক্ষেপের মধ্যে লইয়া যায়—সেই স্বল্প সংবেগের পথে জীবের হয় দিব্য জীবনের পথে অভিযাত্র। ‘লোকধর্ম, ঘেদধর্ম, দেহধর্ম, কর্ম—সুহৃৎস্ব-আর্য্য পথ সব পরিহার।’ বংশীধ্বনি হইতে স্বর, স্বর ভেদ করিয়া নজর—‘বিশালায়তন মদন-মদ ঘূর্ণন—হুই নয়নের মন্ত্রণায় সাধক সব ফেলিয়া আগাইয়া বাইতে চায়। মন বিচার মানে না, আধার জানে না—সব দিতে চাওয়া, সব দিয়া পাওয়া। মন্ত্র পরিণত হয় তখন নামে—নামে

পরিপূর্ণ হয় ধাম, ধাম সত্য হয় প্রণামে। প্রেমভক্তির পথে এইভাবে প্রণতিতে জীবের পরমার্থ বস্তু প্রাপ্তি এবং জীবের উদ্ধারণ-শক্তির সামর্থ্যে শ্রীভগবানের স্বভাব-নিষ্ঠিত ধর্মের পরিপূর্ণতা। মাটির মানুষকে আপন করিয়া তাঁহার আত্মমাধুর্যের আশ্বাদন। নামে ঘটে বৃন্দাবনের পৃথিবীতে অবতরণ—নাম-সংস্পর্শে বৃন্দাবন স্বয়ং সর্বাত্ম-স্বপন প্রেমলীলা সন্তোষের সৌভাগ্য লাভ করেন, করেন পৃথিবীর মহিমা-কীর্তন। নামের রূপারসের উদ্দীপনায় পৃথিবীর জীবের ভাবযোগ্য দেহে বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা লাভ হয়। এই সেবা তাঁহার স্বরূপনিষ্ঠ ধর্ম বা স্বধর্ম।

শ্রীমদ্বাহ্যপ্রভু বলিয়াছেন—

‘নাম ভিন্ন কলিযুগে নাহি আর ধর্ম
সর্বমস্ত সার নাম ইহ শাস্ত্র মর্ম।’

প্রকৃতপক্ষে জীবের ধর্ম শ্রীভগবানের সেবা এবং এই ধর্মের স্বরূপ স্বয়ং শ্রীভগবান। ভাগবত বলেন—‘ধর্মস্ত সাক্ষাৎ ভগবৎ প্রীতং’ অর্থাৎ ধর্মের প্রবর্তক স্বয়ং ভগবান। তিনি বিশ্বজগৎকে ধারণ এবং পোষণ করিতেছেন। জীবের সহিত তাঁহার এই আত্মসম্বন্ধটি উপলব্ধি করাই জীবের ধর্ম। সে বস্তু শ্রীভগবানের স্বধর্মেই নিষ্ঠিত রহিয়াছে এবং তিনিই উপলব্ধি করাইতে পারেন। প্রত্যুত তিনি জীবকে বরণ না করিলে কেহ তাঁহাকে পায় না। সুতরাং জীবের ধর্ম, জীবকে বরণ করিবার নিমিত্ত শ্রীভগবানের দেহধারী লীলাকে আশ্রয় করিয়াই প্রতিপালিত হয়। সর্ব ধর্ম ত্যাগ করিয়া ভগবানের সাধর্ম্য লাভ করাতে জীবের ধর্ম সার্থক হয়। কলিযুগে নামে শ্রীভগবানের জীবের সহিত সম্বন্ধের নিছক বীজটি সর্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের অযাচিত কল্পনায় আত্মনিবেদনোপযোগী সর্বাত্মময় ঘনিষ্ঠতায় সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে অর্থাৎ তাঁহার জীবকে বরণ করিবার লীলাটি নামের সম্বন্ধে আত্মভাবে আশ্রয়-বীর্থে উদ্দীপিত হইয়াছে। নামাশ্রয়ে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভগবৎ-

রূপার উপলব্ধিই এ যুগে জীবের ধর্ম। দেখিয়া শুনিয়া ভজ, সাধুশাস্ত্রমত ভজ,—ঠাকুরমহাশয়ের ইহাই উপদেশ। প্রত্যুত এ যুগে অত্র কোনো সাধনাই জীবের স্বধর্মরূপে গণ্য হইতে পারে না। পক্ষান্তরে তৎসমুদায় পরধর্মের তন্মাবহতাই সৃষ্টি করে। শ্রীভগবান এই যুগে নামদাতা, প্রেমদাতারূপে জীবের উদ্ধারণ কার্যে অবতরণ করিয়াছেন। বৃহৎ ব্রহ্ম-সংহিতা বলিয়াছেন—

‘ধর্ম মূলমিদং সর্বং ধর্মমূলং জনার্দনঃ

ধর্মে নীষতে তস্মাৎ স্বমূলং প্রতিমানবঃ।’

শ্রীহরি এবার নিজে হরি বলিয়া জীবের কাছে ধরা দিতেছেন। নিজে ধর্ম আচরণ করিয়া জীবকে ধর্ম শিক্ষা দিতেছেন। ‘শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্তদেব, ‘তিনিও তাদের শেষ প্রেমকল্প, তরদাতা’। এমন সুযোগ আর পাইবে না। এ যুগের জীব ধর্ম, এ যুগ ধর্ম। এ যুগের বন্দনা ঋষিরা করিয়াছেন। মুনিগণ এ যুগের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন। সুতরাং এ যুগকে নমস্কার, এ যুগের জীবকে নমস্কার।

‘প্রণমহ কলিযুগ সর্বযুগ সার

হরিনাম সঙ্কীর্তন যাহাতে প্রচার।’

নমস্কার, এ যুগের নামবিতরণকারী যুগাবতার যিনি তাঁহাকে—

‘নমস্তে নামরূপায় নমস্তে নাম-জন্মিনে

নমস্তে নামগুদায় নমো নামময়ায তে।’

বংশীগীতির পুষ্টিস্বরূপে নামের এমন উদগীতি জয়যুক্ত হোক। জয় হোক নামকীর্তনকারী ভক্তের—

“প্রেমভক্তি যাহা হৈতে, অবিজ্ঞা বিনাশ যাতে বেদে গায় বাহার চরিত।”

জয়তু জগন্মঙ্গলং হরেনাম।

হরেনাম হরেনাম হরেনামৈব কেবলং

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরত্মথা।*

* ১৩১১৬৩ তারিখে পাঠবাড়ীতে অনুষ্ঠিত বাবাজী মহারাজের স্মরণোৎসব সভায় সভাপতির ভাষণ।



ভোরের বকুল

শ্রীবংশী মণ্ডল

বেশ এক পণ্ডা বৃষ্টি হয়ে গেছে আজ। আকাশটা চারিদিকে এখনও মেঘাচ্ছন্ন। ঘরের প্রশস্ত আঙ্গিনার স্থানে স্থানে অল্পবিস্তর জল জমে রয়েছে। একটুকালো কাক দূর হতে উড়ে এসে বারান্দায় বসল। কিছুক্ষণ আড়চোখে এদিক-ওদিক তাকিয়ে উড়ে গিয়ে আবার দূরের একটি গাছের ডালে বসল। অনেকগুলি চড়াই কিচমিচ্ শব্দে এসে জড়ো হয়েছে এখানে। কতকগুলি আবার প্রাঙ্গণের সন্ধিত জলে স্নান করতে আরম্ভ করেছে। বৃষ্টি হওয়ার আগে একটু গুমোট ছিল। কিন্তু বৃষ্টিটা হওয়াতে ঠাণ্ডা জলীয় আবহাওয়ায় পরিবেশটিকে বেশ মনোরম বোধ হচ্ছে। সন্ধ্যা হতে এখনও অনেক দেরী। নিশ্চয় হয়ে বসেছিলাম বারান্দার একটি প্রাস্তে। বেশ নির্জনে বসে একখানি মোটা বইয়ের পাতা ওপ্টাচ্ছি। আজকের এই অপরাহ্নে কত কথাই যে মনে আসছে তার হিসাব কে রাখে।

আর একবার মনে হোল—দেখি চড়াইগুলো কি করেছে। জানলার কাছে এগিয়ে এসে একটু উঁকি দিলাম। হ্যাঁ তাইতো, আরও কতকগুলো চড়াই পাখী আঙ্গিনায় কি খুঁটে খাচ্ছে লক্ষ্য করলাম। পরক্ষণে একটা কুৎসিতদর্শন ঝোড়ো-কাক এসে ওদের তাড়িয়ে দিলে। আমি আবার বইয়ের পাতায় মন দিলাম।

ওঃ, তাইতো—মুষ্ণিলের ওপর মুষ্ণিল ঘটেছে দেখছি, একেবারে সমুদ্র বিপদ ঘেন। ছেলেটি দুর্ভাগ্যবশতঃ এবারও প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করতে পারল না। আমি বাড়ী না যাওয়াতে আমার ভাগ-জ্যোতদারও অনেকগুলো টাকার ধান গাপ করেছে। সিমেন্টের পারমিটের জন্ম সদরে গিয়ে কেরাণীমহলে বারকয়েক উমেদারী করে হয়রান হয়েছে। লাভ-লোক্‌মান যাই হোক না কেন ঐশে অসম্ভব ভীড়ের জন্ম ধাক্কাধাক্কিতে জখম হয়ে একটি পা রীতিমত জখম হয়েছে। আর একবার বইয়ের পাতা হতে মনটাকে সরিয়ে নিষে মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে একবার চাইলাম। জমাট বাঁধা কক্ষবর্ণ মেঘের স্তর মস্তুর গতিতে ভেসে বেড়াচ্ছে। জোরে ঠাণ্ডা কনকনে বাতাস ছুটে আসছে হ হ করে। দূরের তালগাছগুলো সগর্বে মাথা তুলে আকাশের বজ্র ও বিদ্যুতের সাথে স্পর্ধা করছে।

আবার মনের মধ্যে চিন্তার ধাক্কা খেলাম। গত বৎসর বৈবাহিক মহাশয় এক পত্রে আমাকে শাসিয়েছেন—উনি তাঁর ছেলের আবার বিবাহ দেবেন। কেননা আমার

কন্যাটির আজ পর্যন্ত কোন সন্তানাদি হয় নি। বিয়ের পর থেকে সে নাকি নিরর্থক অল্প ধ্বংস করছে। আবার এটার ক্ষতিপূরণ বাবদ আমাকেই সম্পূর্ণ ঘাড় ধাক্কা লাগবে।

বাস্, আমার ঘৃণিত মস্তকে অজস্র চিন্তার তাণ্ডব নৃত্য জ্বর হয়ে গেল। আতঙ্কে ও বেদনায় হৃদয়ে সহস্র বজ্রধাত হোল। সিদ্ধান্তে এলাম—এই চিন্তাই শেষ পর্যন্ত থাকবে আমাকে। হঠাৎ মগজে চাণক্য পণ্ডিতের একটা শ্লোক মনে পড়াতে বার দুই শিউরে উঠলাম। এতগুলি অশান্তির চাপে পড়েও আমার ওপর গৃহিণীর এতটুকু অস্থকম্পা নাই কেন?

সহসা আমার মনের মধ্যে কে যেন জোরে ধাক্কা দিয়ে বললে—তবে কি মেয়েটি আমার আজীবন গলগ্রহ হয়ে থাকবে? মনে মনে একবার ইষ্টদেবতার কথা স্মরণ করলাম।

এমন সময় একটি লোক এসে হাজির হোল আমার কাছে। প্রচণ্ড যশুমার্ক। হুঃখ ও দারিদ্র্যে বোধহয় দুটি গাল বসে গেছে। মুখভঙ্গী কদাকার ও বিকৃত। লোকটাকে যেন বারকয়েক এই রাস্তায় যাওয়া-আসা করতে দেখেছি বলে মনে হয়। বোধহয় পাড়ার কারো সঙ্গে দাক্ষণ ঝগড়া বাধিয়ে ছিল ও।

সে একটু আমার দিকে এগিয়ে এসে বসল। চোখ পাকিয়ে আমার দিকে কি একটা ইঙ্গিত করতেই রাগে নরীক জলে উঠল আমাব। সক্রোধে তার গালে প্রচণ্ড এক চড় বসিয়ে দিলাম। তৎক্ষণাৎ সে পকেট থেকে একখানি ছোট্ট চিঠি বের করে আমার হাতে দিয়েই সে আবার একটু ইঙ্গিতে পৌঁ পৌঁ শব্দ করে কি দেখাল।

বৈবাহিক মহাশয় সানন্দে লিখেছেন—গত রাজের ভোরে আমার কন্যা গিরিবালা একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেছে। ছেলে পোষাতি দুটোই ভাল আছে। তিনি আল্লাদে ছেলেটির নামকরণ করেছেন ভোরের বকুল।

ও, এই লোকটা তাহলে তাঁর বাড়ীর চাকর নাকি? আহা! মনটা ব্যথায় টন্ টন্ করে উঠল আমার। এবার সব হুঃখের শাস্তি হোল।

একটা বোবাকে মেয়ে কি দোষই না করেছে। তাকে কিছু পয়সা ও চাল দিয়ে বিদেয় করতেই সে আমার দিকে একটু হেসে আবার কি একটা ইঙ্গিত করে চলে গেল।

মানব-উজ্জীবনের মহামন্ত্র

যুগাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ

[আশ্চর্য্য ভবিষ্য-দ্রষ্টা ছিলেন যুগাচার্য্য প্রণবানন্দজী মহারাজ। তাঁর এই ত্রিকালদর্শিতাই তাঁকে যুগাচার্য্যের অধিকারীত্ব দিয়াছে। অগ্নিযুগে স্বদেশ-সাধনায় ভাঙ্গার উত্তেজনাযুগ পরিবেশের মধ্যে একদা বিপ্লবী প্রণবানন্দজী সংগঠনের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন এবং যে-সংগঠন ছিল হিন্দুস্থানের হিন্দুর—বিশেষ বাঙালী হিন্দুর। আজকের দিনে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলায় বাঙালী হিন্দুব অস্তিত্ব বিলুপ্তির যে সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে তাহা বাংলা দ্বিখণ্ডিত হইবার বহু পূর্বে এই মহাপুরুষের অন্তর্দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছিল। তিনি তাঁরই স্মৃষ্ট ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘকে হিন্দুজাতি সংগঠনে ব্রতী করাইয়া জীবন-গঠনের ত্রিভিঙ্গরূপ কয়েকটি মহামন্ত্র (যাহা সাধন-দশক নামে খ্যাত) ও পরিকল্পনা দিয়াছিলেন। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ প্রশংসনীয় নির্ভীক তেজস্বিতা ও নিবিড় মিষ্টার সহিত এই ব্রত আজও পালন করিয়া চলিয়াছে। কোনরূপ প্রশংসা, পরাভুগ্ৰহ ও মতবাদের মোহ সঙ্ঘকে তার সুনির্দিষ্ট পথ হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, মন্ত্রগুলি সার্বজনীন—সর্বদেশে সর্বকালে মানব-উজ্জীবনের সহায়ক। আচার্য্যদেব ধর্ম্মের যে সম্ভা দিয়াছেন তাহা বিশ্বের সকল ধর্ম্মের পক্ষেই প্রযোজ্য। এই ধর্ম্ম না থাকিলে দুই পা, দুই হাত আর একটি মাথা থাকিলেও পশু ভিন্ন তাকে মানুষ বলা চলে না। যুগাচার্য্য প্রণবানন্দজী মহারাজের অন্তরঙ্গ অহুগত শিষ্য শ্রীমৎ স্বামী সদানন্দজী কর্তৃক এই মহামন্ত্রগুলি সংকলিত।—প্রঃ সঃ]

লক্ষ্য কি?—মহামুক্তি, আত্মতত্ত্বোপলব্ধি।

ধর্ম্ম কি?—ত্যাগ, সংযম, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য।

মহামৃত্যু কি?—আত্মবিশ্বাস।

প্রকৃত জীবন কি?—আত্মবোধ, আত্মাহুত্ব।

মহাপুণ্য কি?—বীরত্ব, পুরুষত্ব, মুমুক্শুত্ব।

মহাপাপ কি?—দুর্বলতা, ভীকৃত্য, কাপুরুষতা, সঙ্কীর্ণতা, স্বার্থপরতা।

মহাশক্তি কি?—ঐর্ধ্য, স্বৈর্ধ্য, সহিষ্ণুতা।

মহাসম্মল কি?—আত্মবিশ্বাস, আত্মনির্ভরতা, আত্ম-মর্যাদা।

মহাশত্রু কি?—আলস্য, নিদ্রা, তন্দ্রা, জড়তা, রিপু ও ইন্দ্রিয়গণ।

পরম মিত্র কি?—উত্তম, উৎসাহ, অধ্যবসায়।

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন—কি উপায়ে সর্বদা হৃদয়ে আত্মস্মৃতি জাগরুক রাখা যায়?

উত্তর—প্রতিনিয়ত আত্মচিন্তা, আত্মবিচারণা, আত্মাহুত্ব দ্বারা।

প্রশ্ন—ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা ও রিপুর উৎপীড়ন হইতে আত্মরক্ষার উপায়?

উত্তর—নিয়ত মৃত্যুচিন্তা, দেহের নশ্বরতা ও জগতের অবাস্তবতা সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া বিষয়-বৈরাগ্য আনয়ন।

প্রশ্ন—কোন কোন বিষয় অবলম্বন করিয়া মানুষের মনে কামবাসনার উদয় হয়?

উত্তর—স্নেহ, মায়ামমতা—ভালবাসাকে অবলম্বন করিয়া।

প্রশ্ন—মানুষের মন দুর্বল হয় কেন?

উত্তর—ভোগবিলাসের আকাঙ্ক্ষা, ইন্দ্রিয়-সুখ-সন্তোষের ইচ্ছা, বিবেক বিচার, বৈরাগ্যের অভাবে।

প্রশ্ন—কি উপায়ে দুর্বল মন সবল হয়, নিস্তেজ প্রাণ সতেজ হয়?

উত্তর—প্রতিনিয়ত প্রাণে বিবেক-বুদ্ধি ভাগাইয়া রাখিলে, শুদ্ধ সমীক, শঙ্করাচার্য্যের বংশধর আমরা। তাঁহাদের পবিত্র শোণিতশ্রোত আমাদের ধমনীতে ধমনীতে প্রবাহিত—এই চিন্তার দ্বারা আত্মশক্তিতে বিশ্বাস জাগাইয়া রাখিলে মন সতেজ থাকে।

“শরীর যখন অশক্ত হয়...”

শ্রীতারশঙ্কর

উডিয়ায় চিবকালের পুণ্যভূমি ও সম্প্রতিকালের রাজধানী ভুবনেশ্বর রাজনৈতিক কর্মব্যস্ততায় চঞ্চল। জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের বিপুল আয়োজন। অসম্ভবত সামিয়ানার বিরাটক বিশ্ময়কর। বিশাল ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের বৃহত্তম সম্মেলন। বহির্বিষয়ের প্রায় সমস্ত দেশের রাজনৈতিক প্রতিনিধিরাও উৎসুক চিত্তে উপস্থিত। সকলেরই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাজনৈতিক বিশ্বের তুলনাহীন নায়ক শ্রীনেহেরুর প্রতি,—মহাত্মা-গান্ধী থাকে বলতেন “এ জুয়েল অমঙ্গ্‌মেন্”।

কিন্তু এ কি?

চিরন্তন যৌবনের অধিকারী শ্রীনেহেরু মঞ্চের ওপর বালিশে ভর করে অমন শিথিল ভঙ্গীতে ঝুঁকে বসে রয়েছেন কেন? ক্লাস্তির কালো ছায়া কেন অমন করে ঝুঁকে ছেঁষে ফেলেছে? একদার সৌন্দর্যমণ্ডিত মুখাবয়বের মোম-ময়ূর চর্ম যেন ক্রমশঃই লোল হ’য়ে আসছে।

কিন্তু তা’তে বিঘ্নিত হ’চ্ছে না কংগ্রেস-নেতাদের উপচীষমান উচ্ছ্বাস ও মুগ্ধতা। ভাষণের মিছিল যেন আজ অক্ষুরন্ত। চলেছে তো চলেইছে।

শ্রীনেহেরুর দৃষ্টি নিশ্চল। ক্লাস্তির ভারে চোখের পাতা অবনত। মাথা যেন আরো ঝুঁকে পড়ছে। আচকানের বৃকে লাগানো রক্তগোলাপের ওপর যেন গুর চিবুক নির্ভর ক’রে স্বাস্থ্য পেতে চায়।

অবশেষে শেষ হ’লো সেদিনের অধিবেশন। তনয়া ইন্দিরার সাহায্যে যেন রীতিমতো চেঁচা ক’রে উঠে দাঁড়ালেন শ্রীনেহেরু। তাকে নির্ভর ক’রে অশক্ত ভঙ্গীতে; যত্নর গতিতে তিনি মঞ্চ থেকে নিষ্কান্ত হলেন।

পরের দিন। কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করলেন: নেহেরুজী পীড়িত। চিকিৎসকদের মতে রক্তচাপের উচ্চতা বিপদসীমার কাছাকাছি।

ভুবনেশ্বরের ঘোষণা ভারতবর্ষকে আলোড়িত ক’রে তুললো। উদ্ভিগ্ন হ’য়ে উঠলো জনগণ যখন তারা জানতে পারলো যে তাদের প্রিয় নেতা, যিনি অরণীয় সাতচল্লিশ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে মহান নেতৃত্ব দিয়ে

অজস্র তুর্যোগের মাঝে প্রায় একাকীই শক্ত হাতে হাল ধরে ভারতবর্ষকে নিরাপদ পরিপ্রেক্ষিতের পানে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন,—সেই প্রিয় নেহেরুজী প্যারালিটিক স্ট্রোকে আক্রান্ত।

সমবেত দশ সহস্র কংগ্রেস প্রতিনিধি বজ্রাহত, বিমূঢ়। পণ্ডিতজীই যে তাঁদের একমাত্র ভরসা। একমাত্র তাঁর নির্দেশই যে তুর্যোগের মুহূর্তে নিষ্কৃতি দিতে পারে। আর তুর্যোগ, আজকের চেয়ে বেশী, সতেরো বছরের স্বাধীন ভারতবর্ষে আর কবে ঘনীভূত হয়েছিলো? উত্তরণীমাস্তে বহিঃশত্রুর বর্বর আক্রমণ, অভ্যন্তরে সরকারী শাসন-ব্যবস্থার অন্তঃশত্রুদের দুর্নীতির হীন আঘাত, কষেকটি উপনির্বাচনে উপযু্যপরি পরাজয়,—সব মিলিয়ে কংগ্রেসের ইতিহাসে আত্মচরম সঙ্কটময় পরিস্থিতি। এই দুর্বীর প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে কে এই আজও-নাবালক রাষ্ট্রকে নিরাপত্তার নির্দেশ দেবে?

নেহেরুজীই যদি অসুস্থ, তাহ’লে...?

তাহ’লে তাঁর পরবর্তী কে? এই প্রশ্নই কি গুঞ্জন তোলে নি ভুবনেশ্বরের আকাশে বাতাসে?

ত্রিবার্ণ শোভিত সুবিশাল সামিয়ানার নীচে অসংখ্য শ্রোতা উৎকর্ষ হ’য়ে শুনছে নবনির্বাচিত কংগ্রেস সভাপতি কুমারস্বামী কামরাজ নাদার-এর ভাষণ। অসুস্থ শ্রীনেহেরুর অল্পপাণ্ডিত্যে তাঁর ভাষণই শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ।

মাদ্রাজের কৃষ্ণকায়, ধর্বারূতি অথচ অশ্মিতা ভাস্বর এই নেতার ভাষণের ভাষা তামিল, যা’ উপস্থিত অধিকাংশেরই তুর্বেধ্য। তাঁর মূল বক্তব্য: জাতীয় সংহতি। তাঁর বক্তব্যের সারাংশ: জাতীয় ঐক্যের আহ্বান। অথচ ওই বিশাল জনসমাবেশের দিকে তাকিয়ে তিনি কতোটুকু ঐক্যের পরিচয় পাচ্ছেন সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবসর থেকে যায়। বাহ্যিক সম্ভার-বিভিন্নতা অর্থাৎ ধৃতি, চূড়িদার পাজ্যামা, ঢিলা পাজ্যামা, ট্রাউজার, লুঙ্গি ও বিভিন্ন বর্ণের শাড়ীর মতোই ওই বিশাল জনতার অন্তরেও কি দৃষ্টিভঙ্গীর ভিন্নতা বিরাজমান নয়? গোঁড়া দক্ষিণপন্থী মোরারজী ও এস্-

কে.পাতিল,—নেহেরুবাদ এর তরু অহুগামী লালবাহাদুর শাস্ত্রী ও ইন্দিরা গান্ধী,—উগ্র বামপন্থী কে. ডি. মালব্য ও কৃষ্ণামেনন, এঁদের মনের রঙও কি ওই সংখ্যাতীত মহিলা সমাগোশের ঝলমলানি শাড়ীর বিভিন্ন বর্ণের মতোই বিভ্রমকারী নয় ?

অথচ ঠুঁরা সবাই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একেকজন ক্রান্তী দৈনিক। শ্রীনেহেরুর “গণতন্ত্রচ্ছায়ায় সমাজবাদ”—এর আদর্শের বাহ্যিক সমর্থনও ঠুঁরা অন্ততঃ হাত তুলে জানিয়ে থাকেন। তথাপি ঠুঁরা ভিন্ন। ঠুঁরা বিভ্রান্ত। কতো শীঘ্র সমাজবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায়,—এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই ঠুঁদের ভিন্নতা ; ঠুঁদের বিভ্রান্তি।

এই প্রশ্নেরই প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা আজ পার্টির সম্মুখে। ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়কে জাতীয়করণ করা হবে কিনা, সে সংক্রান্তে তুমুল বাঁকবিতণ্ডায় ভূবনেশ্বরের শীত-কালীন বাতাসও উত্তপ্ত। এই প্রশ্নের উত্তরেই পার্টির প্রকৃত প্রতিজ্ঞা প্রকাশিত হবে। চরমপন্থী কৃষ্ণমেনন ও তাঁর সহগামীদের একান্ত ইচ্ছা যে অবিলম্বে ব্যাঙ্ক-জাতীয়করণের নীতি অহুসৃত হোক। কিন্তু যদিচ শ্রীনেহেরু রোগার্ত দেহে অদ্ববর্তী এক অট্টালিকার কক্ষে সম্বন্ধে শাসিত,—তাঁর কী দৈহিক, কী মানসিক সচেতনতা যদিও আজ স্তিমীয়মান,—তথাপি, ঐ সুসজ্জিত মধ্যে তাঁর ব্যক্তির অহুপস্থিতি সত্ত্বেও, তাঁর ব্যক্তিত্ব প্রভাব বিস্তাবে বিরত নয়। চরম পন্থার পরিবর্তে মধ্য-পন্থ অহুসরণের স্বীকৃতিই তাঁর প্রভাব। পাঁচ দিন তর্কঘূর্ণের পর অবশেষে মধ্যপন্থের নীতিই গৃহীত হলো। অর্থাৎ ব্যাঙ্ক-তহবিলের ওপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ-কর্তৃত্ব। আরো বিধোষিত হলো পার্টির যে নীতি, তাকে নিঃশংসম্মিতভাবেই গণতন্ত্রের পথে নিশ্চিত ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বলা চলে। এই নীতির সার্বক পরিণতি ১৯৭৫ সালের মধ্যে সর্বসাধারণকে প্রভূত লাভবান করে তুলবে এবং ভবিষ্যৎ ভারতে “প্রাইভেট সেক্টর”—এর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকবে—এই প্রতি-জ্ঞাও প্রতিধ্বনিত হ’লো।

ভূবনেশ্বরের অধিবেশনে আরেকবার প্রমাণিত হ’লো যে কংগ্রেসে আজও মধ্যপন্থাবলম্বীর দলই সর্বাপেক্ষা

শক্তিশালী। তথাপি কিন্তু পার্টির ওপর উগ্র বামপন্থী কৃষ্ণমেননের প্রভূত প্রভাবই পরিলক্ষিত হলো। চৈনিক আক্রমণের পর সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসম্মেই বেদনার্ত হৃদয়ে শ্রীনেহেরু মজীত্ব থেকে বিদায় দিবেছিলেন যাকে, শ্রীনেহেরুর সেই একদা-অন্তরঙ্গ বন্ধু কৃষ্ণমেননের কণ্ঠ আজও দুর্বল নয়, ক্ষমতা নয় নিঃশেষিত,—এরই স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেলো কংগ্রেসের ৬৮-তম অধিবেশনে। কংগ্রেসের অন্ত্যস্ত প্রথম শ্রেণীর নেতাদের মতোই কৃষ্ণমেননও এ বিষয়ে সচেতন যে, শ্রীনেহেরুর উত্তরাধিকারী হিসাবে চিহ্নিত হওয়ার সৌভাগ্য আজও বর্ধিত হয় নি কারো প্রতি। সুযোগ বুঝে কৃষ্ণমেনন তাই ছুটে এলেন রোগ-শয্যা শাসিত শ্রীনেহেরুর পাশে। শ্রীমতী ইন্দিরা রুগ্ন পিতার শুশ্রূষায় আত্মনিমগ্না। শ্রীনেহেরুকে শুনিয়ে তাঁর পরবর্তী হিসাবে শ্রীমতী ইন্দিরার নামই সুকৌশলে প্রস্তাব করলেন কৃষ্ণমেনন। শ্রীমতী ইন্দিরা কৃষ্ণমেননের প্রতি সত্যই অন্ধাশীলা।

কিন্তু রোগার্ত শ্রীনেহেরুর নিশ্চিত দৃষ্টিতে সম্ভবিতঃ কোনো লক্ষ্যই পরিস্ফুট হ’লো না। পুনর্জিৎসাসিত হ’য়ে অবশেষে তিনি স্পষ্টভাবেই নেতিসূচক ভঙ্গী করলেন।

কানা-ঘুঘাব গুঞ্জরিত হলো, আপন রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী হিসাবে তনয়া ইন্দিরা অপেক্ষা লালবাহাদুর শাস্ত্রীর নিয়োগকেই শ্রীনেহেরু অধিকতর সমর্থন করেন। উচ্চতায় মাত্র পাঁচ ফুট ছই ইঞ্চি এবং ওজন একশো দশ পাউণ্ড মাত্র, বিনয়নম্র লালবাহাদুর শাস্ত্রী মধ্যপন্থ অহুগামী। পূর্বতন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদে দীর্ঘদিন তিনি শ্রীনেহেরুর বিশ্বস্ত ও একান্ত নির্ভরযোগ্য সহচর হিসাবে সার্বকভাবেই কর্তব্য পালন করে গেছেন। পার্টিতে দক্ষিণ ভারতীয় অধিকাংশের, আবার বিভিন্ন মতাবলম্বীদের অনেকেও সমর্থন লাভে তিনি ধন্য। কোনো বিখ্যাত ব্রিটিশ কূটনীতিকের মতে : জনগণ শাস্ত্রীর মধ্যে যা’ দেখতে চায়, তা’র সবটুকুই দেখতে পায়।

লালবাহাদুর শাস্ত্রীর প্রতি শ্রীনেহেরুর এ মনোভাবের কথা ভূবনেশ্বরে বিচরমান পার্টি-কর্তাদের কারো অজ্ঞাত রইলো না। অনেকেই আলাপ-আলোচনা-স্বত্রে

“আমাদের নেতা” ব’লে শ্রীশাস্ত্রীকে অভিহিত করলেন। এর প্রতিক্রিয়া শ্রীশাস্ত্রীর অন্তঃকরণে কোনো অহরণ তুললো কি না সে কথা জনগণের অজ্ঞাতই রইলো।

কিন্তু অচিরেই শ্রীনেহেরু সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলেন। চিকিৎসকেরা তাঁর বিপদ-মুক্তির কথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করলেন। ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির নাথকের অভিব্যক্তিতে আর ক্লাস্তির কালিমা নেই। আয়ত চোখের দৃষ্টিতে স্বাভাবিক স্বচ্ছতা ও সজীবতা উপচায়মান। তিনি দ্বিধা হীন ভাবেই প্রকাশ করলেন যে, রাজনীতির যে আসনে তিনি আসীন, সেখান থেকে অবসর নিতে তিনি প্রস্তুত নন। ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসে এই কথাই বর্ণিত হয়ে আসছে যে, বিশাল বটবৃক্ষেরই মতো শ্রীনেহেরুর পরিস্থিতি। অর্থাৎ প্রাচীন বটবৃক্ষের স্নিগ্ধ ছায়ায় অপর উদ্ভিদের পুষ্টিলাভ সম্ভব নয়। হয়তো এ তুলনা নিরর্থক নয়। কারণ স্বত্বস্বাধীন পুনরুদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গেই

শ্রীনেহেরু আপন উত্তরাধিকারী নির্গমে সুস্পষ্ট অসম্মতি জানালেন।

বডো জোর বলা যেতে পারে, আপোষরক্ষা হিসাবেই অস্বাভাবিকভাবে কিছুদিনের জন্ত শ্রীনেহেরু আপন কর্মভারের কিছু অংশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুলজারীলাল নন্দ ও কিছু অংশ অর্থমন্ত্রী কৃষ্ণমাচারীর হাতে অর্পণ করলেন। সম্ভবতঃ এ ব্যবস্থা তাঁর শ্রম-লাভবেরই উদ্দেশ্যে। শারীরিক দুর্বলতা সত্ত্বেও শ্রীনেহেরুর চিন্তা আজও বলিষ্ঠতা হারায় নি। ফলে, আরও কিছুদিন হয়তো তিনি উত্তরাধিকারী নিয়োগের প্রশ্নকে দূরেই সরিয়ে রাখবেন। কিন্তু তাঁর সহকর্মীদের প্রতিশ্রুতি যেন তাঁকে প্রতিনিষত স্বরণ করিয়ে দিতে চায় তাঁরই বিখ্যাত সাহিত্যিকর্ম “প্লিন্স্‌সেন্‌ অফ্‌ ওয়াল্ড হিষ্ট্রি”-তে লেখা সিদ্ধান্তের কথা: “অন্তরে আমরা যেতোই শক্তিমান হই না কেন, শরীর যখন অশক্ত হয়, তখন আর আমরা কি করতে পারি।”

নমো নমো জন্মভূমি

শ্রীশুরেশচন্দ্র মজুমদার

নমো নমো জন্মভূমি, চির মধুমধী ভূমি,
পুণ্য তব পীঠে মোরা সম্মান গ্রহরী;
পদে তব সদা মতি, কর্ণে তব সদা প্রীতি,
ব্রতী মোরা তব তরে অস্ত্র সদা ধরি।
কত তব মহারণে, যুঝিষাছি শত্রু সনে,
সুধা তব পানে মোরা উদ্দীপনাময়;
বীর জাতি রক্তধারা বৃকে ধরি সদা মোরা,
নাহি জানি রণভীতি জানি রণজয়।

সুধা সদা তেজোময়, বীর্যহীন মোরা নয়,
প্রহারিতে অরাতিরে শক্তি মোরা ধরি;
গ্রীক শক হুন চীন, করিয়াছি সবে লীন,
মহাবলে সবে মোরা অশ্রাব্যত করি।
করে কতু পরাজয়, সাধ্য হেন কার নয়;
পুত তব পদরেণু শিরে মোরা ধরি;
সেই দিব্য রেণুবলে, শত্রু তব দ্বারে এলে,
অশ্রাব্যতে ক্রব তারে দূর মোরা করি।

নমি মাগো পুনঃ নমি, চিরারাম্য দেবী ভূমি,
মহীতীর্থে এই মোরা পুণ্য ব্রতচরী;
পরাক্রম লীলাভূমি, শক্তি-সুধা দিলে ভূমি,
তাই মোরা সদা দিব্য শক্তি অধিকারী।

ছা-পোষার হাল

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

বাক্সারে যখন যাই দেখি এরা ছোট থলে হাতে

ছোট ছেলে সাথে,

কেনে এক পোয়া আলু, আধ পোয়া চুনো পুঁটি মাছ,

টেঁড়স্, ডুমুর, খোড়, মূলা, কচু, ডাঁটা ছই গাছ।

গায়ে ছেঁড়া গেঞ্জি, পায়ে চটি

তেল কিনবার তরে হাতে ছোট ঘটি।

অন্ন আয়ে এরা সব কাজ করে—ব্যাঞ্জে, ডাকঘরে,

আপিসে, দোকানে, রেল, স্কুলের কোটরে,

বাড়ভাঙা এদের খাটুনি,

ব্যথা পাই যত দেখি শুনি।

ভাবি, হয় এদের বারতা

নিষে কারো এ দেশের নেই মাথাব্যথা।

ভালো কথা, ভুলে গেছি, কেনে এরা

কিছু কলাপাত,

ঝি-চাকর নেই মোটে, বাসনের নেইকো উৎপাত।

দিন আনে দিন খায় জমা কিছু

থাকে না হাঁড়ীতে।

কাপড় দেয় না এরা খোবার বাড়ীতে।

কাপড় সেলাই ক'রে পরে,

গোটা পরিবার মিলে থাকে একই ঘরে।

ছোট ছোট রুন্ন ছেলেমেয়ে

মিটার ছধের তৃষ্ণা বারি জল খেয়ে।

ভাতের ফেলে না ফেন, ফেলেনাক

আনাঞ্জের খোসা,

আম খাওয়া শুধু আঁটি চোষা।

পরীক্ষায় এদেরি তো ছেলে কেল হয়—ফেল হ'লে

পড়িতে পায় না আর, মাহিনা যোগাতে

পায়ে না ব'লে।

এদের মেয়েরা কতু কলেজে না যায়,

বহর হয় না বিয়ে, ছেলেবাও বিবাহ না চায়।

আষ নেই, ঘর নেই, ভগিনী অনুচা

বিয়ে করা চলেনাক, বাপ এত বুড়া।

রাখে কেউ এদের বারতা?

জানে যারা পায় তারা ব্যথা?

অথচ পরতে হয় এদেরও তো সাফা জামা জুতা,

এদেরও গীড়ন করে নানাবিধ সামাজিক ছুতা।

ইস্কুলে পাঠাতে হয় ছেলে,

খরচ করতে হয় প্রথমত অতিথিরা এলে।

চা-খাবার কিনে আনে ছোট ছেলে মেয়ে।

অতিথি সিঙাড়া খায়, দেখে চেয়ে চেয়ে।

শ্রমিক কৃষক নয়, রিক্সও না টানে,

পিওন পাইক নয়, এরা কিছু লেখাপড়া জানে।

রাজমিস্ত্রী, ছুতোব, কামার,

দারোয়ান, দর্জি, ধোবা, দপ্তরী, কামার

এত দুঃখী তারা নয়। যতই অভাবী হোক,

এদের থাকতে হয় সেজে “ভদ্রলোক”।

যেখানে লক্ষ্মীর কুপা পুত্রকন্যা জ্বলন্ত সেখায়।

ষষ্ঠীর কুপায় এরা হাবুডুবু খায়।

এই সব অভাগার তরে

এ হৃদয়হীন দেশে কেবা চিন্তা করে!



স্মৃতি-আলেখ্য

শ্রীমুশীলপ্রসাদ সর্বাধিকারী

(পূর্বাহ্নবৃত্তি)

ভাত খাওয়া আরম্ভ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বহুবাজার মিডল ইংলিশ স্কুলে আমাকে ভর্তি করে দেওয়া হয়, সিন্ড্রেস ক্লাসে। রামকল দাদা নিয়ম করে স্কুলে নিয়ে যায়, নিয়ে আসে। স্কুলটা আমার খুব ভাল লাগে। স্কুলের গ্যালারী চমৎকার, বেশ বড়। গ্যালারীতে ধরে দেড়শো ছেলের ওপর। গ্যালারীতে বসে হাটু খেলেদের প্রতিদিন দেড় ঘণ্টার ওপর। কত ছবি, ম্যাপ দেখাতেন বেণীবাবু। ছেলেরা কি খুশী। বেণীবাবু যা দেখাতেন সব বুঝিয়ে বুঝিয়ে বলতেন। এই রকম করে শিখতুম আমরা কত কি। এর জন্য বেণীবাবুকে কত ভালই না বাসতুম।

ভালবাসতুম আমরা স্কুলের সব মাষ্টারকে। রাজু-বাবু, নবগোপালবাবু, পণ্ডিতমশাই প্রভৃতি ষাঁড় পড়াতেন তাঁরা আমাদের সত্যিই পড়াতেন। তাঁদের কেউই ধমকে মেরে পড়াননি কখনও। পড়া বুঝতে না পারলে একবার কেন দশবার বুঝিয়ে দিয়েছেন প্রায় কোলে টেনে নিয়ে। এই ছিল “বৌবাজার স্কুল”। এই স্কুলের কত ছেলে যে নামজাদা হয়েছে দেশবিদেশে তার কুলকিনারা নেই। সত্যপ্রসাদ ব্যতীত সব ভায়েরাই আমার, বৌবাজার স্কুলের ছাত্র। দেবপ্রসাদ পূর্ণতঃ নয়, অংশতঃ সে স্কুলের ছাত্র। রাজচন্দ্র, নির্মলচন্দ্র প্রভৃতি বহুবাজারের প্রায় সব বাড়ীর ছেলেরা এই স্কুলে পড়েছে। চাঁপাতলা, পটলডাঙ্গা ও কলুটোলার অনেক ছেলে যোগ দিয়েছে বৌবাজার স্কুলে। তালতলা ও ইটালির ছেলেরা ছিল তো হাতের পাঁচ।

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় অত্যন্ত স্কুল সহজে পেরে উঠতে পারেনি বৌবাজার স্কুলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। একটা অভাব ছিল স্কুলটির। ছেলেদের খেলার জায়গার। অভাব ছিল বলতেই হবে। ছেলেদের তা গ্রাহ্যের মধ্যে ছিল না। যা জায়গা ছিল তাতেই ভেজু দিগ্দিগ, কপাটী, দোঁড়াদোঁড়ি, গুলীখেলা সমান তেজে চলেছে। আর বাজারের গায়ে টাটকা ফল-ফুলুরী পেয়েছে ছেলেরা জানলায় হাত গলিষে।

বাজারটা বহুবাজারের স্মৃতিস্থান মতিলাল মহাশয়-দের। মালিকের কড়ানজর ছিল—বাজারের সমগ্রাংশ সদা সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার। স্মরণ্য বাজার থাকলেও স্কুলের কোনও অসুবিধা কখনও ঘটে নি। স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ছিল তিনশতের উপর। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি সদাসর্বদা নজর রেখেছে বাজারের উত্তরদিকে অর্থাৎ রাস্তার উপর স্কুলের পূর্বাংশে একটা খড়কুটোও যাতে না পড়ে। কলিকতার বর্তমান পৌর-সভার কর্তৃপক্ষ এ সম্বন্ধে একটু তলাইয়া যেন দেখেন।

স্কুলে মুসলমান ছাত্র ছিল কিনা মনে পড়ে না, তবে এটা খুব মনে পড়ে মরম উপলক্ষে যে বিরাট শোভা-যাত্রা স্কুলের সম্মুখ দিয়া যাইত তাহা উপভোগ করিতে স্কুলের ছেলেরা পাগল হইয়া পড়িত। মরমে স্কুল বন্ধ থাকিত দুইদিন। শোভাযাত্রার বহু পূর্ব হইতে ছেলেরা আসিয়া জমিত স্কুলে এবং স্কুলের গবাক্ষাদি বা ছাদ হইতে শোভাযাত্রা দেখিত প্রাণ ভরিয়া। এত আনন্দ তাহাদের হইয়াছে যে, মরমের জয়দান তাহারা দিয়াছে মুহূর্ত্ত।

মরম পর্বের পূর্বে, স্কুল-গ্যালারীতে স্কুলকর্তৃপক্ষ মরমের গল্প শুনাইয়াছেন ছাত্রদের। স্কুলের গ্যালারীতে বড়দিন পর্ব সমাধা হইয়াছে সাড়ধরে। গল্পসহ চিত্রাদি প্রদর্শন ও প্রত্যেক ছাত্রকে একটা করিয়া কমলা লেবু ও একটা করিয়া ভীমনাগের সন্দেশ প্রদান ছিল পর্বের বিশিষ্ট অঙ্গ। ছেলেরা মহোদ্রাসে ইঁাকিয়াছে, Three cheers for বড়দিন। চাঁদা তোলায় নামগন্ধ ইহাতে ছিল না। স্কুলের ব্যেই অল্পাধিক হইত এই পর্ব।

লক্ষ্য করিবার বিষয়, শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা প্রভৃতি উপলক্ষে এ ভাবের কিছু দল হইত না। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়, স্কুল হিন্দুর পরিচালনা থাকা সত্ত্বেও অত্যন্ত ধর্মের প্রতি ছাত্রদের বিরাগ ত’ দূরের কথা যাতে অহুরাগ জন্মে সে চেষ্টা যথেষ্টই ছিল।

স্কুলের বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ হইত খুবই সমারোহ সহকারে। পারিতোষিক পাউক বা না পাউক,

সকল ছাত্রই পরিকার পরিচ্ছন্ন হইয়া পারিতোষিক বিতরণ সভায় যোগ দিবে। তাদের অভিভাবকরা আসিবে। তার উপর আসিবে বোবাজারের সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। অন্ত্যাহ মহল্লারও অনেক ধনকুবের, মধ্যবিত্ত প্রভৃতি এই উপলক্ষে বসিয়াছেন পাশাপাশি। পারিতোষিক বিতরণে সভাপতিত্ব করিয়াছেন স্কুলের আমন্ত্রণে নির্বাচিত শিক্ষাবিদরা। তাঁহাদের সকলের নাম মনে নাই সুতরাং নাম বলিবার চেষ্টা করিয়া গণ্ডগোল বাধাইতে সম্মত নহি। এইমাত্র বলি, বোবাজার স্কুলের পারিতোষিক উৎসব, বাহা অল্প আমি দেখিয়াছি তাহাদের কাহারও অপেক্ষা ইহা ন্যূন নহে। পারিতোষিক উৎসবের কারণে পরে কবদিন মাত্র স্কুলটা বন্ধ থাকিয়াছে সভাপতির সম্মানার্থে।

স্কুলের মাহিনা যতদূর মনে আছে—মাসিক ১০, ১৬ ও ১১০ টাকা। ফ্রি, হাফ ফ্রি প্রথাও ছিল। স্কুলের যোগ্যতার তুলনায় মাহিনা কমই ছিল, বলিয়াছেন বিশেষজ্ঞেরা।

সিক্সথ ক্লাসের বার্ষিক পরীক্ষায় সর্ববিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করায় এবং নব্বই দ্বিতীয়ের তুলনায় অনেক বেশী হওয়ায় স্কুল-কর্তৃপক্ষ ডবল প্রমোশন আমাকে দেওয়ান। অর্থাৎ সিক্সথ ক্লাস হইতে ফোর্থ ক্লাসে আমি উঠি। ফোর্থ ক্লাসেও সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করি বার্ষিক পরীক্ষায় এবং আবার ডবল প্রমোশন পাইয়া সেকেন্ড ক্লাসে উঠি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্নেহ সমাদর পাই ইহার জন্ত। পরে শুনি, তাঁহারই পরামর্শ ও নির্দেশে সেই বৎসরেই হেয়ার স্কুলের সিক্সথ ক্লাসে আমাকে ভর্তি করিয়া দেওয়ান হয়।

তৃতীয় সহোদর হাসিয়া বলেন “সিক্সথ” একে পেয়ে বসেছে। ফিফথ-এ ঢোকাবে মনে আমার হয়েছিল, ইংরেজী ও বাঙালার ওর দক্ষতার জন্ত। দেবপ্রসাদ সহোদরকে দেখিয়ে দিলেন, ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা পাশ ক’রে গেলেও সিক্সথ ক্লাসেই ভর্তি করা বিধি।

ওসবের কিছু মনেও আমার হয়নি—স্কুল ছাড়িয়া মন ভাল না থাকতে। স্কুলের শিক্ষকদের স্নেহ, ভালবাসা ও উৎসাহ দানের অন্ত ছিল না। সম্ভ্রান্ত বহুবাজার স্কুলের শতবার্ষিকী ক’রবার মানসে স্কুলের বর্তমান কর্তৃপক্ষের কেহ কেহ আসেন আমার কাছে তথ্য সংগ্রহার্থে। লিখে নিয়ে যান তাঁহারা, যা যা আমি বলি। শতবার্ষিকী হয় কিনা জানি না আমি, খবর আর কিছু না পাওয়াতে।

জোর দিয়া শেষে বলি, আমাদের সেই বোবাজার

স্কুলের তুল্য বিদ্যালয় চোখে আমার পড়েনি। দেবপ্রসাদ আমার মতে মত দেন, যখন আমরা বিদ্যালয়াদির আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করি। হেয়ার স্কুলে ভর্তি হবার ও স্কুলের কথার আগে, স্কুলে খেলাধুলা শুরু হয় কি ভাবে।

হবিত’ হ পড়ুয়াদের জন্ত চার পয়সার পুরোণ slazenger বলের ফুটবল খেলার স্কুলে ফের আমার যোগাড়ে কলুটোলার কাসিমের বদান্ততায় পাঁচ টাকা দিয়ে জে-এফ-ম্যাডানের দোকান থেকে টোজান ফুটবল নিয়ে এসে সহপাঠীদের মাতিয়ে দেওয়াতে ক্লাসে এবং স্কুলে একটা কেউকেটা হয়ে পড়ি আমি, চ’থের পালট ফেলতে না ফেলতে। দশ বৎসরের ভাতখাওয়া ছেলের লক্ষ্যবস্তু দেখে কে! স্কুলের পিয়ারীচরণ সরকারের দিকে মাঠটুকুতে বিনা বাধায় ফুটবল নিয়ে দাপাদাপি চলতে থাকে।

বলা নেই, কওয়া নেই, কাসিম সিটিস্কুলে-পড়া তার বন্ধুকে ধরে সিটির সঙ্গে হেয়ারের ম্যাচ খেলার দিন স্থির করে আসে! স্থিরীকৃত দিনে ম্যাচও হয়। আর হেরে যায় সিটি।

হেয়ার স্কুল ও প্রেসিডেন্সির মাঝে বড় মাঠে খেলে তখন, কলেজের ছেলেরা। শরৎ (ভাতুপুত্র) হেয়ার স্কুলে আমার এক ক্লাস ওপরে প’ড়ত। স্কুলে জিমনাষ্টিক বারে রাজেন্দ্র সিং জিমনাষ্টিক মাষ্টারের সে খুব প্রিয়। তাঁর অগ্রগৃহে একটা ফুটবল (বোধ হয় কলেজের) তার যোগাড হয়েছিল। তাই নিয়ে কজন তারা দুমদাম করত জিমনাসিয়ামের মাঠের অমুখের খালি জায়গায়। সেই মাথায় ঢুকুল আমরা বড় মাঠে খেলব না কেন!

তখন স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা সমাগত। মাথা আমার খেলার দিকে না গিয়ে পড়ার দিকে গেল। তখন ফুটবলের বদলে মাঠে ক্রিকেট খেলা শুরু হয়েছে।

যথাসময়ে পরীক্ষা হ’ল। বড়দিনের ছুটি হ’ল। ছুটির পূর্বেই পরীক্ষার ফল জ’না গেল। কাষ্ট হয়েছি আমি। ললিত ব্যানার্জী (পড়’ত শরতের সঙ্গে; পরে সুবিখ্যাত সার্জন, ছুটির সময়ে সার্কাসে আমার পাশে বসে। অনেক গল্প শুনতে হয়। সে শরতের কথা তুলে বলে, যোগাড করে শরৎ ফুটবলের দল করেছে। ব’ললে সুনীলদের নিলে দলটা আরও বড় হবে। তাহ’লে বড় দলই হবে। বাডীতে কথাবার্তা হয়েছে। আমাদের দুজনেরই ইচ্ছা, দলের নাম হেয়ার স্পোর্টিং দেওয়া হবে। তাতে আমি বলেছি, বেশ হবে এই নাম দিলে।

(ক্রমশঃ)

বাংলা সমাজ ধ্বংসের পথেই

কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বিদ্যাবিনোদ

অভিধান বলে—“পরস্পর নির্ভরশীল মানবগোষ্ঠীর নাম সমাজ।” আর, মানুষ জাতিকে গৌরব দিবে এই সমাজকেই সন্মত করার জন্য সমাজ-দরদী মনীষীরা লিখেছিলেন—সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই (চণ্ডীদাস) ; সবাই শ্রীহরির সন্তান (শ্রীগৌরাদ) ; The true way of serving God is to do good to man (রাজা রামমোহন) ; Let the body be consecrated to the service of others : ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, বার্ধক্যের বারণসী ; জীব প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর ইত্যাদি (স্বামী বিবেকানন্দ) ; বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়। অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ ; (রবীন্দ্রনাথ) সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে (কামিনী রায়) ; মানুষের মাঝে যে ঈশ্বর, আমি তাঁরই সেবা করতে চাই (মহাত্মা গান্ধী)। কিন্তু ?—এ-প্রশ্নের উত্তর মোটেই স্তব্ধের নয়। বলতে হবেই—“ভগবান্, তুমি যুগে যুগে দূত পাঠিয়েছ বারে বারে..... তারা বলে গেল ‘ক্ষমা করো সব’, বলে গেল ‘ভালোবাসো—জন্তুর হতে বিবেচন বিধ নাশো’।... বরশ্রীষ তারা, স্রবশ্রীষ তারা, তবুও বাহির দ্বারে আজি হৃদিনে ফিরামু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে।”—সত্যজিৎ বিশ্বকবির অন্তরে এ-কথা সহজে জাগেনি। সবই প্রায় ব্যর্থ হয়েছে—সমাজ ‘যে তিমিরে সেই তিমিরে’। স্বর্ষ ওঠে, ওঠে পুর্ণিমা চাঁদ, রংমশাল জ্বলছে দিকে দিকে ; কিন্তু দেশের সংখ্যাহীন অন্ধকার ভূমি থেকে আলো আসে—‘কোথায় আলো?’ সাধু প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই হয় ; আবার কর্মযোগীর মুখ থেকে বেরিয়ে আসে প্রায়ই—‘যতবার আলো জ্বালাতে চাই, নিতে যায় বারে বারে’।

কারণ কী ? শক্তিমানদের, জাতির অভিভাবকদের বলিষ্ঠ আন্তরিকতার অভাব। স্বর্ষের আলো যায় না ধরিত্রীর সর্বাস্থে, রংমশাল ছড়ায় শৌখিন আলো। দেশ-

মাতৃকার বৃকের সব অন্ধকার ঘুচাতে গেলে জ্বালাতে হবে মাটির প্রদীপ। তারই শাস্ত, জীবন্ত আলো পড়তে পারবে সেখানে, যেখানে স্বর্ষ-চাঁদের আলো, বিলাসীর শৌখিন আলো যাবার পথ পায় না।

সমাজের সকল স্তরে জ্ঞানের আলো সার্বিকতার সঙ্গে বিস্তৃত করতে হবে। জ্ঞানের পূর্বে ‘স্ব’ আর ‘কু’ সংযোগ অর্ধহীন, জ্ঞান সর্বদাই হবে কল্যাণগ্রন্থ। এই জ্ঞান জন্মায় স্ন-শিক্ষা থেকে ; তাই শিক্ষাকে বিধির বাঁধনে আঁঠেপুঠে বেঁধে রাখায় যুক্তি নেই। এদেশের মানুষ যখন শৃঙ্খলা মানতে জানে না, স্ন-পরামর্শকে অগ্রাহ্য করতেও ব্যস্ত, তখন বিদেশ থেকে আমদানি করা শিক্ষা-ধারাকে তাদেরই মধ্যে চালু করতে গেলে ফল সন্তোষজনক হ’তে পারে না। আবাদের যোগ্য মাটি হলোই তাতে ভাল ফসল মেলে। ইষোরোপ-আমেরিকা প্রভৃতি ভূখণ্ড আজ উর্বরা আবাদী ভূমি—অনেক সাধনার ফল। সেই ভূখণ্ডের যা যোগ্য ফসল, তা কী ক’রে আমাদের প’ড়ো জমিতে ফলবে ? একে আবাদী করতে হবে আগে। তাই আমাদের শিশুদের বেলায় সংশোধনী বিদ্যালয়ের দরকার ; কিন্ডারগার্টেন বা মস্তেসরী সরানরি সেখানে ফলগ্রন্থ হ’তে পারে না। শিশু যদি শৃঙ্খলা না শিখলো, সে কী ক’রে নিজেকে ক্রমবিবর্তনের পথে সন্মততার সঙ্গে পরিচালিত করবে ? এইজন্যই দেখা যায় আজ শিক্ষক-শিক্ষিকার সামনে শিশুরা উচ্ছৃঙ্খলতার অভিনয় করে, শ্রদ্ধা-ভালবাসার বালাই থাকে না অধিকাংশ ক্ষেত্রে। তথাকথিত গুরুমশাই-বেত্তের প্রচলন করার প্রয়োজন নেই ; কিন্তু শাসনের প্রয়োজন ঠিকই আছে। শাসনের অর্থ—“নিয়মন”, “পরিচালন”। যে চলতে শিখবে, তাকে ঠিকভাবে চলতে শেখানোই কর্তব্য। এ-কাজ শুধু শিক্ষক-শিক্ষিকার নয়, অভিভাবক-অভিভাবিকারও। ঘরেই স্তব্ধ হয় এই কাজ ; এটিই প্রকৃত নিয়ম। ঘরে উচ্ছৃঙ্খল ক’রে বিদ্যালয়ে পাঠালে উচ্ছৃঙ্খলতার সংশোধন কষ্টকর এবং বহু ক্ষেত্রে

অসম্ভব। শিশুকে বুকে করতে হয় এবং সময় বিশেষে চোখ রাঙাতেও হয়; কারণ তাকে শৃঙ্খলা শেখাতেই হবে—দেশের স্বার্থে, সংসারের ভালর জন্ত। এই কাজ দিতে বিশেষ বাড়ির অভিভাবক-অভিভাবিকারাও তেমন পটু না হওয়ায় আজও বহু পরিবার, সুন্দর বংশধর লাভের আশায় ইংরেজ বাড়ির অবসরপ্রাপ্তা গোয়ানিজ প্রভৃতি দক্ষ আয়ার ওপর শিশু-পালনের মুখ্য ভারটি দেন, বোঁজেন মিশনারী বা ইংরেজ স্কুলের সহায়ত।

সমাজের কথা বলতে গিবে প্রথমেই শিশুর কথা কেন? উপায় নেই, বলতেই হবে; কারণ শিশুই যে সুন্দর ভবিষ্যতের স্রষ্টা, জাতির মেরুদণ্ড। প্রত্যেক শিশু যদি ঠিকভাবে পরিচালিত হয়, তবেই তারা ভবিষ্যতে মনুষ্যত্বের অধিকারী হবে এবং তার ফলে, সমাজ তথা দেশ হবে কল্যাণময়। আমাদের এই অনগ্র-সর, অসুস্থ এবং দরিদ্র দেশের সকল গৃহস্থের পক্ষে ঐসব সার্থক ব্যক্তির পস্থা অবলম্বন মোটেই সম্ভবপর নয়। ইচ্ছা থাকলেও উন্নত দরিদ্র পারে না এবং অসুস্থতের ইচ্ছাই হয় না প্রায় তাদের শিশুদের সত্যি-কারের মানুষ করার। কিন্তু এ তো কাজের কথা নয়। প্রতিটি শিশুকে মানুষ করতেই হবে। তবে করণীয় কী? জাতি ও সমাজের রক্ষক বা সেবক নামে যাদের আজ পরিচয়, কাজে ও কথায় তাদের যথাকর্তব্য পালন করতেই হবে। রক্ষা করতে গিয়ে ভক্ষণ বা সেবা করতে গিবে স্বার্থসিদ্ধি, যা বহু ক্ষেত্রেই চলেছে, তার অবসান ঘটতেই হবে। মুখ দেখে প্রীতিদানের দিন আজ নয়; কাজ দেখে পৃষ্ঠপোষকতা দরকার। তেলা মাধায় তেল তো বহুদিনই ঢালা হ'ল; এতে টাকে চুল গজালো না; বরং কালো চুলের জীরুজ্বিই হয়েছে। রুখু চুল যেমন ছিল তেমনই রইলো, ময়লা জ'মে জটও পাকিষে গেল। কাজের দিন আজ এসেছে। সেবা-সংস্থা আছে, নাম আছে; অতএব ঢালাও ব্যবস্থা চলুক; আবার “সেবক” নাম নিয়ে যে আসবে তাকেই গ্রহণ করা হোক—সে চোর কি সাধু না যাচাই করেই। এসব নীতি অনগ্রসর স্বাধীন দেশের কাম্য হতেই পারে

না। এমনি নীতি সক্রিয় আছে বলেই, বর্তমানে উদার দানের অর্থ কত বুদ্ধিমান কর্মীর ব্যাংক-ব্যালাঙ্ক বাড়িবেই তুলছে; যাদের জম্ম দান, তাদের হাতে বিনয় মাখানো কঁাকর পড়ছে অমের পরিবর্তে; ‘দৈতো’-হাসি হয়েছে আন্তরিকতা। রক্ষকওতো গাড়ি-খোয়া জল-জমা-কাদা যাত্রীসাধারণের গায়ে ছিটিয়ে চ'লে যান—কখনো বলেন “সুরি”, কখনো মুখে কোটে অবজ্ঞার হাসি। মনে পড়ে না, ঐসব লোকেরই ঘামে-ভেজা-অর্থ তাঁর গাড়ি যুগিয়েছে, যোগাচ্ছে মানবতাকে অপমান করারই শক্তি।

যাক, সমাজকে গ'ড়ে তুলতেই হবে সুন্দর ক'রে; দোষ চাপিয়ে বা জিন্দাবাদ দিয়ে কিছুই হবে না। সেবা নাম-কেনার পণ্য নয়। সেবককে মনে-প্রাণে খাঁটি হ'তে হবে, স্বীকার ক'রে নিতে হবে—Man making is my mission.—মানুষ তৈরীই আমার ধর্ম। সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মী, শিক্ষক—সবাই সমাজ-সেবক। বিদ্যায়তনে পড়িয়ে সব সময় সমাজ-সেবক তৈরী করা সম্ভবপর নয়। গলার শিরা ফুলিয়ে মিঠে-কড়া বক্তৃতা দিলেও সমাজসেবী হওয়া যায় না। গন্ধ যেমন ফুলের বিশেষত্ব, কতকগুলি মানুষের মধ্যে সমাজসেবা প্রবৃত্তি তেমনি বৈশিষ্ট্য। আমি ধার্মিক, আমি গুরুদেব, আমি জ্ঞানী ইত্যাদি ব'লে যারা সভা জাঁকিয়ে তোলেন, তাঁদের মতই “সমাজ-সেবক” নামে আত্মপ্রচারীরা আত্ম-প্রতিষ্ঠাকামী। মানুষকেই ঈশ্বর জ্ঞানে যেসব লোক তারই হিত কামনা করেন, তাঁদের শক্তি দিন শক্তি-মানেরা, যদি দেশ ও দেশের মঙ্গল কাম্য হয়।

শিশু-শিক্ষা বলতে, ৬ থেকে ১৪ বৎসর পর্যন্ত বয়সের ছেলেমেয়ে নয়, চলতে-বলতে শিখেছে যারা তাদেরও শিক্ষা হ'ল শিশু-শিক্ষা। আমাদের সংসারের সঙ্গে শিশুদের অভিভাবক-অভিভাবিকারাও ‘যথার্থ’ নামের অযোগ্য। শৃঙ্খলাহীনতাকেই আমরা শৃঙ্খলা ব'লে স্বীকৃতি দিয়েছি। মুচ ম্লান প্রায় সবাই আমরা, শুনে রাগ করলে কী হবে! সন্তান আনার ও তাদের গ'ড়ে তোলার ভার-বরাত ভগবানের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়। কোনরূপে অন্নসংস্থান করা, চলা, বলা, ঘুমুনো বা পরের ভাগ্য নিয়ে

নিজের বাস্তবশী করার পটুতায 'মাহুষ'-নাম মিলতে পারে; কিন্তু মানবতার বিচার এ-সব জীব মৃত জ্ঞান ছাড়া আর কিছুই নয়। ওদের দেখেই বুঝি স্বামীজী বলেছিলেন—“যতদিন দেশের জনসাধারণ খাচ্ছে বঞ্চিত এবং শিক্ষায় অভাবগ্রস্ত থাকবে, ততদিন যারা তাদের অর্থে শিক্ষালাভ ক'রে তাদের সম্বন্ধে অনবহিত, তাদের আমি বিশ্বাসঘাতক বলবো”। এবং “গৃহস্থের কর্তব্য হ'ল গৃহের কল্যাণসাধন”।

শিশু-শিক্ষার বেলায় গান্ধীজীর একটি বাক্য মনে রাখলে মনে হয়, এই দুক্লহ কাজ কিছু সহজ হ'য়ে যায়। গান্ধীজীর মতে—‘শিশুর আত্মিক, মানসিক ও শারীরিক শক্তির ত্রিবৃদ্ধি সাধনই যথার্থ শিশু-শিক্ষা’। তিনি বলেছিলেন—‘আগে চরিত্রগঠন, পরে অক্ষর পরিচয়’। কেননা, চরিত্রহীন শিক্ষিত হ'লে কী হয়, তা কারও জানতে বাকী নেই। দেশ এর ফলে দুর্দশাগ্রস্ত, এ-বিষয় দেখেই মহাত্মা গান্ধী ঐ কথা বলেছিলেন। আমাদের ঘরে বা বিদ্যায়তনে কী চরিত্রগঠনের কোন কার্যক্রম পালিত হয়? এসেছে, বেড়ে যাক যেমন করেই হোক, এ অধিকাংশ গৃহস্থের মনোভাব; আর, পাস করলেই ছেলে বাড়বে, নাম বাড়বে, এই নীতি অবলম্বন করা হয় অধিকাংশ বিদ্যালয়ে। ছুই-ই সর্বনাশা নীতি; অথচ সর্বজনগ্রাহ্য। নিজেদের চেনা গেল না, দেশকেও ভালবাসা সম্ভব হ'ল না। দুর্ভাগ্য যে এই দেশ।

এইজন্মই বসন্ত-বয়স্কাদের মধ্যে কল্যাণধর্মী শিক্ষার প্রচার অপরিহার্য। এর জন্ম মিলন-কেন্দ্রের বিশেষ বাড়ির দরকার হবে না, নৈশ বিদ্যালয়ও অনাবশ্যক। এ-দেশের ক'জন আসবে ওখানে? শিক্ষার মর্ম যারা মোটেই উপলব্ধি করে না, তারা এবং সারাদিন হাড-তাঙা খাটুনি যারা খাটে, তারাও ঐসব বাঁধা-ঘরে যাবার পথ পাবে না খুঁজে। তাদের ঘরে গিয়ে সময়মত তাদের শিখিয়ে দিতে হবে কিছু-কিছু, শোনাতে হবে শোনানোর বিষয় এবং এ-ই হচ্ছে আমাদের বর্তমানের যোগ্য সমাজ-শিক্ষার ধারা। উচ্চারণ দুবলী এমন কোন জাতির মধ্যে সমাজ শিক্ষা প্রচার সম্বন্ধে একবার একটি সংবাদ সংবাদপত্রেই বেরিয়েছিল। সে দেশের সরকার

সৈন্যদেরও নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাঁরা যেন পথেঘাটেও চাষী মজুরদের থেকে ধূম পান করানোর অছিলায় একটি অক্ষরও শিক্ষা দেন—বলেন কিছু শিক্ষার কথা।...এমনি কাজের ফলে একদিন ৮০ বছরের বুড়ীও চেয়েছিলেন তার নিরক্ষরতা দূর করতে। আমাদের এমনি বহুমুখী শিক্ষা-প্রচার নীতিই গ্রহণ করতে হবে। কাইলের গং এখন কাইলেই বিশ্রাম নিক। বয়স্ক বয়স্কাদের মধ্যে সার্থক সমাজ-শিক্ষা বিস্তার করতে পারলেই তাঁদের মাঝ থেকে অকল্যাণকর কুসংস্কার ও চিন্তাধারা সম্পূর্ণ না হলেও, অবশ্যই অনেক পবিমাণে দূরীভূত হবে এবং সেসব পরিবারের শিশুরাও মাহুষ হ'বাব পথে হ'তে পারবে চালিত। শিশু ঘর থেকে বে-আদব হয়ে এলে, কর্তব্যপরায়ণ শিক্ষকের পক্ষেও তার মধ্যে আদব আনা খুবই কষ্টকর বিষয়। তাঁর প্রাণপাত পরিশ্রমও ব্যর্থ হ'য়ে যায়। এই-জন্মই ঘরে ঘরে প্রকৃত সমাজ শিক্ষার প্রসার অনস্বীকার্য।

সমাজ-শিক্ষার বিষয়বস্তু কী হবে? তাই—যা করবে সকল সমাজের কল্যাণ। ধর্ম ও কর্ম সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে যে-সব অর্থসত্য বা অমূলক মনোভাব বর্তমান, তা ধীরে ধীরে বুঝিয়ে বুঝিয়ে দূর করতে হবে। কোন কিছুই দোহাই দিচ্ছে অত্যাধিক আর ত্রায়ের আসন দেওয়া যাবে না। তবে বুদ্ধি ক'রে বুঝিয়ে দিতে হবে কোনটি আমাদের গ্রহণীয়। মাহুষ দেহধারী জীব যখন, তখন লোক কেন ভুল বুঝবে না? মাহুষই ভুল করেন এবং মাহুষই ক্ষমতা রাখেন তা সংশোধন করার। আমাদের তাই বোনেরাও ভুল করেছেন, ভুল করছেন এবং ভুল শুধরিয়ে ঠিকও হবেন। এ কাজ আমাদের করতেই হবে—দেশ ও দেশের স্বার্থে।

এই সমাজ-শিক্ষাদানের সময়ও নির্দিষ্ট ক'রে রাখা চলে না। নির্দিষ্ট নীতি থাকবে কিন্তু রুটিং প্রথার প্রচলন করা অসুচিত। যখন যাকে কাছে পাওয়া যাবে, তখনই তাকে জানিয়ে দিতে হবে কিছু-না-কিছু, যা সমাজ-জীবনের পক্ষে মঙ্গলজনক। তাই এ কাজ দুক্লহ, তবে নিজেদের কঠিন পরিচয়ও দিতে হবে দুক্লহ কাজে। সমাজ-সেবা সৌখীন কাজ নয়, কাকি দিয়ে সাফল্য লাভ করা যায় না ভাল কাজে, এ কথা ভুললে বিশেষ ক্ষতিই

হবে। কাজের কাজকে সার্থক করতে হ'লে, অপরি-
হার্য হচ্ছে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা। সমাজ-সেবাকে ব্রত
হিসাবে গ্রহণ করেছেন যারা, তাঁরা ঐ কথাটি মনে
রাখতে বাধ্য। এর ব্যতিক্রম হ'লে, আমরা কর্তব্যচ্যুত
হ'য়ে মহা অপরাধে অপরাধী হব। মিথ্যাবাদী ও
মিথ্যাচারী মনুষ্যত্ব লাভ করতে পারে না।

বাধা? সেতো থাকবেই। কোন ভাল কাজে বাধা
পড়ে না? একদল লোক আছে—যারা নাম-কা-ওয়াস্তে
ভদ্র এবং সমাজবন্ধু, তারা ভাল কিছু সৃষ্টি না করতেই
বৈঠে থাকে। ভাল করবো না, ভাল করতেও দেব না—
এই তাদের জীবন-ধর্ম। মানুষ-সমাজের উই-ইন্সর তারা।
এখানে বলা চলে রবীন্দ্রনাথের মহৎ বাণীটি—“দেবতার
তুণেও অস্ত্র আছে, নানবের তুণেও শূন্য নহে—অগ্রমস্ত হইয়া
অস্ত্র নির্বাচন যদি করিতে পারি, তবেই যুদ্ধের অধিকার
জন্মে।” আর—“...পুরাণে দেবতার কল্পনা আছে কিন্তু
দেবতা আছেন ভবিষ্যতে, মানব জীবনের শেষ পর্যায়ে।”

আজ যা অকল্যাণকর, আজ যা অসুন্দর, তাই
কল্যাণকর হবে, সুন্দর হবে, যখন সমাজের প্রতিটি মানুষ
মহাজনদের নির্দিষ্ট পথে পারবে চলতে। হাতের পাঁচটা
আঙুল সমান হবার নয়, সব মানুষও হবে না সম্পূর্ণ
খাঁটি। তবে—ঠিকমত শিক্ষা পেলে, শৃঙ্খলাহীনতা-
দোষে তেমন ছুট থাকতে পারবে না কেউ-ই। পৃথিবীর
সকল উন্নত দেশই এমন মানুষ-জাতি নিয়েই আজ সমৃদ্ধ।
আমাদের দেশই বা অমনি হবে না কেন, যদি আমরা নিষ্ঠা
নিষে কর্মব্রত পালন ক'রে যাই?

নিষ্ঠাবান আমাদের হতেই হবে; কথা ও কাজকে
একই গোরবে করতে হবে গোরবাসিত। গৌরব,
বামমোহন, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ,
গান্ধীজী প্রভৃতি প্রকৃত সমাজ-সংস্কারকদের ঘন ঘন স্মরণ
করতে হবে; উৎসব ব্যসন না হ'য়ে হবে—সত্যকারের
প্রগতির ধারক ও বাহক। উচ্চ-নীচ ভেদাভেদকে
সমাজ থেকে বিদূরিত করতে হবে। মানুষের প্রতি ভাল-
বাসাকে বাস্তব-সত্য রূপ দিবে, অমূল্যতাকে তুলে আনতে
হবে পাশে, নিজের জীবন-যাত্রার অংশীদার করতে হবে
তাদের। সকলকে বুঝিয়ে দিতে হবে স্পষ্ট ক'রে—
ভেদাভেদ-নীতি সমাজ-শত্রুদের কারসাজি মাত্র। যদি
কোন ধর্ম এই নীতির পরিপোষক হয়, তবে তা কখনই
ধর্ম নয়, তা অধর্ম। ধর্ম উদার, প্রতি মানুষের কল্যাণ-
কামী। ধর্ম সমাজবাসীদের ধরে থাকবে, শুভ কর্মপথের
যাত্রী করবে। মানুষের মংগলের জন্তই ধর্মের সৃষ্টি—
ধর্মের জন্ত মানুষ সৃষ্ট নয়। তাই কর্তব্যনিষ্ঠ সমাজ-
সেবকগণ সক্রিয় হ'লে, অতীতে ও বর্তমানে স্বার্থপর
সুবিধাবাদীরা জয়ধ্বজা হাতে নিলেও, ভবিষ্যতে তাদের
পরাজয় অবশ্যস্বাবী। দেবতা ও স্বর্গ—সবই ঐ বুদ্ধি-
মানদের সৃষ্টি। তাই স্বর্গ থেকে নেমে আসবে না সেই
সুন্দরের যুগ। “মানুষ তার ভাগ্যবিধাতা”—এই
নীতিকে স্বীকৃতি দিয়ে কাজ করলেই জয় সুনিশ্চিত।

কাজের সময় অনেকদিন এসে গিয়েছে, কথা
থামিয়ে এখন কাজই করতে হবে, ধ্বংস-পথ থেকে তুলে
আনতেই হবে বাংলার সমাজকে!

পরাজয়

প্রমথনাথ কুমার

কঠিন বন্ধন একি!—চরাচর একি মায়ায়;
নিগূঢ় রহস্যে ভরা,—বিস্তারিয়া বিরাট বিশ্ব।
নাহি কোনো অমুচ্ছেদ; মূলে দেখি সব একাকার
একবার বাঁধা গেলে কে বলিবে আছে কি নিস্তার?
মুক্তির প্রয়াস লাগি চিন্তা যত হয় অগ্রসর
বন্ধনের গ্রস্থি যেন হ'তে চায় আরো দৃঢ়তর।

আমার আপন সত্তা হ'য়ে আসে বিবর্ণ বিদীর্ণ
ফেলে শাস মুর্মুর হয় বুঝি নিমেষে নিশিচিহ্ন!
দগ্ধ হই অহুতাপে আত্ম-প্রশ্ন জাগে অহরুণ;
নিরাশার নিশানায় ব্যর্থতার বারতা অঙ্কন।
বাহিরের দীপ্তি দেখে' ভেবেছিছ কান্ধন যাহারে
তা'রি পরিণতি আজ অটুহাসি হাসে বারে বার।

বিচারের মানদণ্ডে জীবনের হিসাব-নিকাশে
ধরা আজি দিল যাহা—মাথা মোর নত হ'য়ে আসে।

বৃহস্পতি

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর শাস্ত্রী পঞ্চতীর্থ

বহু যুগের বহু সংস্কারে আবদ্ধ ভারতবাসীর মনে আর যত কিছু বিষয়ে অনৈক্য থাকে অরণ্যতীত কালের বৈদিক আৰ্য্য-সংস্কৃতির বহুলাংশ এখনও এক এবং অটুট। এ যে কতকাল থাকবে সে কল্পনা বুধ। আৰ্য্য-সংস্কৃতির ঐক্যক্ষেত্রে মৌলিক হেতু কোন একখানি গ্রন্থ নয়, বিশেষ কোন উপদেষ্টার বাণী নয়, কোন বিশেষ আচার ধর্ম নয়, অথচ সব মিলে মিশে ঐক্য রয়েছে ভারতবর্ষের প্রতি প্রদেশের জনগণের দেহে মনে।

অনন্ত নক্ষীর রয়েছে। একটি উদাহরণ তুলে ধরে তার সোজা উল্টো দিক নিয়ে অনেক দূর এগিয়ে যাওয়া যায়; যেমন “বৃহস্পতি”।

বৃহস্পতি যে দেবতাদের গুরু ছিলেন এ ধারণা কার না মনে আছে। কে না বলে সে কথা। আবার বৃহস্পতি নামে যে একটি বিরাট গ্রন্থ আছে আকাশে এও সত্য। দিনের শেষ যদি বৃহস্পতিবারের হয় তবে যাতায়াতে ভয় হয় এমন দৃঢ় ধারণা অনেকের মনে লুকানো আছে। বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীবার, এ বারে নিতে আছে দিতে নাই এমন চিন্তা আজও অনেকে করেন। এই “বৃহস্পতি” নামটি ভারতের প্রাচীন যুগেও কম আলোচ্য হয় নি। বেদ, পুরাণ, কাব্য, দর্শন, স্মৃতি, গ্রন্থ বা তর্কশাস্ত্রে বৃহস্পতি নামে অনেক কথা লেখা রয়েছে। এই বিংশ শতাব্দীর ঝাঁপে প্রতিভাশালী পণ্ডিত, গবেষক তাঁদের লেখার বিভিন্ন দিক বৃহস্পতি আটকে রেখেছেন। আমরা পুরাতন ভারতের ‘বৃহস্পতি’ নামটি যে বহু তর্কিত বিষয় ছিল সেই দিকটি নিয়ে কিছু আলোচনা করিব।

(১) ঋগ্বেদের ২।১৩।১ মণ্ডলে এক বৃহস্পতির উল্লেখ দেখা যায়। তিনি সেখানে দেবতা। গণনাং গণপতিঃ, কবীনাং কবিঃ।

(২) ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে ছ’জন প্রসিদ্ধ ঋষি। একজন আঙ্গিরস আর একজন লোক্য। যিনি লোক্য তিনি বলেছেন “অসতঃ সদজায়ত”। সৃষ্টির আদিতে কিছুই ছিল না, পরে সৎ।

এই মতবাদ বৌদ্ধ ও চার্বাক সম্প্রদায়ে বেশ ফলাও হয়ে ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। চার্বাক সম্প্রদায়ে ভারতীয় পণ্ডিতগণ বলেন ‘বার্হস্পত্যস্ত মতবাদী’। অভিধানকার হেমচন্দ্র বলেছেন—বার্হস্পত্যস্ত নাস্তিকঃ।

(৩) তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের একজন বৃহস্পতি। তিনি একদিন গায়ত্রীর মন্তকে নিকরূপ আঘাত করেছিলেন। গায়ত্রীদেবীর মন্তক চূর্ণ হয়ে যায়। মন্তক ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু তাতে গায়ত্রীর মৃত্যু হয় নাই। মন্তকের বসা থেকে এক একটি বসটাকারের উদয় হয়। গায়ত্রী হলেন বৈদিক ধর্মের বীজ। এই উপাখ্যান থাকার পরিণামে লোকায়ত মতে বৃহস্পতি হলেন বেদবিরোধী বৈদিক ধর্মের পরম শত্রু।

(৪) মৈত্রায়নী উপনিষদে বৃহস্পতিকে বলা হয়েছে তিনি নৈরাশ্রবাদ প্রচার করেছিলেন। বৌদ্ধগণ নৈরাশ্রবাদী।

(৫) একখানি স্মৃতিগ্রন্থের রচয়িতা বৃহস্পতি। এটি আজকাল ছাপা পাওয়া যায়।

(৬) বৃহস্পতি ছিলেন এক সূত্রকার। সে সূত্র-অর্থ-শাস্ত্রের। এ গ্রন্থও এখন পওয়া যায়। এই সূত্রগ্রন্থকে ভাস্করাচার্য্য—“তথ্যচ বার্হস্পত্যসূত্রং” বলেছেন। শ্রীধরস্বামীও গীতার টীকায় “তথ্যচ বার্হস্পত্য সূত্রং” বলেছেন।

(৭) কামসূত্রকার বাৎস্তাযন বলেছেন—“বৃহস্পতি-রথ্যধিকারিকম্” এ গ্রন্থ এখন পাওয়া যায়। তাতে এক জামগায় বলা হয়েছে “সর্বথা লোকায়তিকমেব শাস্তম্” অর্থাৎ—শাস্ত্র বলতে লোকায়তিক শাস্ত্র।

(৮) মহাভারতে (১০।১১২) এক বৃহস্পতিকে যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করেছেন অহিংসা, বৈদিক ধর্ম, ধ্যান, ইন্দ্রিয় সংযম, তপ ও গুরু-শুশ্রূষার কোনটি শ্রেষ্ঠ ধর্ম?

বৃহস্পতি উত্তর দিলেন ‘অহিংসাপ্রিত ধর্মই শ্রেষ্ঠ।’

(৯) মহাভারতের (১৬।৩৯৬) আর এক জামগায় এক বৃহস্পতির উল্লেখ আছে। সেখানে তাঁকে

কুক্রাচার্য্যের সঙ্গে বন্ধনা শাস্ত্রকার বলে বর্ণনা করা হয়েছে—

(১০) অশ্ববোধের বুদ্ধচরিতে অঙ্গিরস বৃহস্পতিকে রাজশাস্ত্র প্রবর্তক বলে বর্ণনা করা হয়েছে—

যন্ রাজ্য শাস্ত্রং ভৃগুরঙ্গিরা বা

ন চক্রতু বংশকবা বৃষী তৌ ।

তয়োঃ স্ততো তৌ চ স সর্জতুস্তং

কালেন শুক্রশ্চ বৃহস্পতিশ্চ ॥

অর্থাৎ যে রাজশাস্ত্র ভৃগু এবং অঙ্গিরা এই দুই বংশধর ঋষিও প্রবর্তন করতে পারেন না, কালক্রমে তাঁদেরই সন্তান ভার্গব কুক্রাচার্য্য এবং অঙ্গিরস বৃহস্পতি সেই রাজশাস্ত্র প্রবর্তন করেছেন। (মহাবোধি জাতকের “যন্তবিজ্ঞা” অংশে)।

(১১) মহাভাবতেব বনপর্বে বৃহস্পতিকে নীতিকার বলে বর্ণনা করা হয়েছে—নীতিং বৃহস্পতি প্রোক্তাং জাতুন্ মে গ্রাহয়ং পুরা ।”

(১২) কৃষ্ণ মিশ্রের সংস্কৃত ভাষায় প্রসিদ্ধ নাটক

“প্রবোধ চন্দ্রোদয়” তাতে এক জাযগায় বলা হয়েছে—

বাচস্পতিনা প্রণীষ চার্কাকায় সমপিতম্ ।

তেন চ শিষ্যোপশিষ্যদ্বারেন বহুলী কৃতম্ ॥

বৃহস্পতি সম্বন্ধে মোটামুটি ভাবে এতগুলি প্রমাণ পাওয়া যায়। এ ছাড়া মহাকবি ভাস্কর লেখাতেও বৃহস্পতির উল্লেখ আছে। সর্বত্র একটি কথা স্বনিত হয়েছে যে, তিনি একজন বুদ্ধিতর্কবাদী পুরুষ ছিলেন। এই পুরুষটির নামই বৃহস্পতি, না বুদ্ধিমত্তার ক্ষম উপাধি ছিল বৃহস্পতি—তা কিন্তু ধরার উপায় নেই। পাণ্ডিত্যজ্ঞাপক উপাধি বৃহস্পতি, বাচস্পতি, ব্যাস, শঙ্করাচার্য্য ইত্যাদি কিন্তু বহুকাল থেকে ভারতে প্রচলিত। তা সে বাই হোক কিন্তু এসব প্রমাণ ধারার মধ্যে একটি কথা লক্ষ্য করার মত সেটি হলো বৃহস্পতিকে দেবগুরু, দেব-পুরোহিত বলে মনে করার মত প্রমাণ পাওয়া যায় না, অথচ বৃহস্পতি যে দেবগুরু দেবপুরোহিত এধারণা ভারতবাসীর মনে অক্ষুণ্ণ হয়ে রয়েছে অনন্তকাল।

ঋগ্ন-খণ্ড-খাণ্ডকার্য্য শ্রীহর্ষ কিন্তু পরিষ্কার বলেছেন—দেবগুরু বৃহস্পতিই চার্কাক মতের প্রবর্তক। এ নিয়ে অমুসন্ধিৎসার আলোড়ন জাগলে তাঁদের সামনে মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের প্রথম অধ্যায়ের বিষয়টি তুলে ধরা যায়। ওইখানেই পাওয়া যায় বৃহস্পতি নামে

কোন পুরুষধর দেবতাদের পুরোহিত ছিলেন এবং তাঁর চরিত্রটি মহাভারতকার এইভাবে একেছেন। সেখানের প্রসঙ্গে বক্তা ব্যাস আর শ্রোতা যুধিষ্ঠির। প্রশ্ন করেছিলেন পাণ্ডবাগ্নেজ। তাঁর রাজ্যপ্রাপ্তির পরই মনে গভীর অসুশোচনা হয়, ভয়ঙ্কর সংগ্রামে অসংখ্য নরহত্যার পাপ তাঁকে বিচলিত করে, তাই তিনি ব্যাকুল হয়ে ব্যাসের পরামর্শ গ্রহণ করেন। ব্যাস উপদেশ দিলেন অশ্বমেধ যজ্ঞ কর। কিন্তু নিঃশেষিত কোষাগার বীর তিনি কি করে হিরণ্ময় দান অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন?

ব্যাস বলেন, কোর্নি চিন্তা নাই, হিমালয়ের উত্তর-ভূমিই স্বর্ণপ্রাচুর্য্যপূর্ণ। তুমি সেখানে অজস্র স্বর্ণ-সম্ভার সংগ্রহ করতে পারবে। ওখানেই সত্যযুগের মহারাজ মরুস্ত বিরাট যজ্ঞ করেছিলেন। সবই আশ্রয় ভূমিগল্বরে বিস্তৃত হয়ে আছে।

যুধিষ্ঠির বিস্মিত হয়েই আবার প্রশ্ন করলেন কে মরুস্ত? কেমন তাঁহার যজ্ঞ? বিপুল স্বর্ণরাশি এল কেমন করে? সে সব স্বর্ণ আমাদের হস্তগত হবে কি উপায়ে?

ব্যাস বলেন—শোন ধর্ম্মরাজ! প্রজাপতি দক্ষের যেমন দৌতিত্রবংশ এক হয়েও চিরদিন বৈরিতায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে, বৃহস্পতিও তেমনি ভ্রাতৃ-বৈরিতায় ক্রিষ্টহৃদয় ছিলেন। দেবতা আর অসুর উভয়ই দক্ষের দৌহিত্র, কিন্তু উভয়পক্ষে মিত্রতা কোনকালেই নেই। বৃহস্পতি আর সংবর্ত্ত উভয়ে সহোদর। উভয়েই অঙ্গিরার পুত্র। কিন্তু জ্যেষ্ঠ বৃহস্পতি সর্কদা স্পর্ধা করতেন কনিষ্ঠ সংবর্ত্তের উপর। অগ্রজ সদাভেদস্বী আর অহুজ্ঞ তপোবলী। এক পলকের জড়ও ছুঁ তাইয়ে মিল ছিল না। কে কোন্ কীকে অপরকে পছন্দ করতে পারেন এই ছিল উভয়ের সর্কদার চেষ্ঠা। কনিষ্ঠ কিন্তু জ্যেষ্ঠের অত্যাচারে পরাজিত হলেন। শেষটায় ভিটে-ছাড়া হয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হলেন, এমনকি সামান্য একটুকরা পরণের কাপড়ও তাঁর ভাগ্যে জুটল না।

তাবতিস্পর্ধিনৌ রাজন্ পৃথগাস্তাং পরস্পরম্ ।

বৃহস্পতিঃ স সংবর্ত্তং বাধতে অ পুনঃ পুনঃ

সবাধ্যমানঃ সততং ভ্রাতা জ্যেষ্ঠেন ভারত ।

অর্থাসুংসৃজ্যা দিধ্যাসা বনবাস যরোচয়ৎ ॥

ঠিক এই সময়েই ঘটেছিল দেবাসুর সংগ্রাম।

(আগামীবারে সমাপ্য)

এখানে বিধাতা জাগিবে

শ্রীউমাপদ নাথ

বাঙলার নভে জমিয়াছে মেঘ—বাজ করে হাঁকাহাঁকি,
বাঙালীর চোখে ঝড়ের ধূলি যে, পথে শুধু ডাকাডাকি,
খোঁজাখুঁজি আর ছোট্টাছুটি হয়। কত বাঙালীর ঘর
উড়ে গেল ঝড়ে, পুড়ে গেল বাজ্ঞে : আছি শ্মশানের 'পর।

একি অভিশাপ ! বিধাতার সাজা ? নয় ; মিছে নয় স্মৃতি—
বাঙালীর ঘরে আগুন দিয়েছে কলুষিত রাজনীতি।
জননীর দেহে ঢালাইয়া ছুরি কাটিয়া পিঠার মতো
ভাগা ভাগি ক'রে একদা গর্বে ফুলিল মুখ যতো ;
আজ তারা দূরে দাঁড়াইয়া হার শুধু হাসাহাসি করে :
সীমার ওপারে কোটি ভাই-বোন মরণ-খাঁচার মরে।
এদের চেনো না ? —তক্ত তাউস দিল্লীর দরবারে,
আম-মজলিসে বুলি গুলজারে স্বপ্নের বাজি মারে।

আম্বক মরণ, জাগো গো বাঙালী ! দিল্লীর মসনদে
উড়ায়ে নিশান দল বেঁধে চলো, বলো—‘এই রাজপথে
তার বসিবার নাই অধিকার যে শুধু ক্রীষের মতো
পশুর খাবায় ভাইয়ের মৃত্যু বেখে শির করি নত।’

এই যে বাঙালী কাতারে কাতারে মরিতেছে, তার ফল
ইন্দ্রপ্রস্থে জমা পড়িতেছে। বাঙালীর নিফল
রোবাগ্নিশিখা জমিয়া জমিয়া নতুন বজ্ররূপে
নামিবে যেদিন লালকেল্লায়, সেদিন বলির যুগে
নীরবে নিম্বুতে মরিবার দিন ফুরাবে অবশুই :
বাঙালীর দুখী-ভাগ্য-বিধাতা আজ কাঁদতেছে ওই !

বাঙলা মরে না, বাঙলার ছেলে ! বাঁচতে বাঁচাতে শেখো।
বাঙলার কাটা গর্দানে মাথা আবার গজাবে দেখো।
বাঙলার ছেলে নিরীহ ভাইয়ের বুকে ছুরি মেরে শোধ
নেবে না ; বাঙালী মূলের গলদে সঁপিবে তাহার ক্রোধ।
অপর বঙ্গে রক্তের শ্রোতে যে কাহিনী লেখা চলে
এ বঙ্গে সব বাঙালীরা মিলে সংহত হ্রায় বলে
বিচার চাহিবে : রাম লেখা আছে বিধাতার এজলাসে,
সারা বিশ্বের মহুয়ায় জলে ইহাদের পাশে।
তাহাদেরই স্বাসে উড়ে যাবে খ'সে দিল্লীর নামাবলী,
তাহাদেরই রোষে রাওয়ালপিণ্ডি যাবে দাউ দাউ জলি।

মৃত্যু-আগুনে নিকষিত হেম বাঙালীর জাতীয়তা,
এখানে বিধাতা জাগিবে ভাঙিয়া শ্মশানের নীরবতা।

প্রশ্ন

নীতীশ মজুমদার

ওরা কেন হাসেনাকো তবু—
মাহুঘের নামবাচা প্রেতামিত গলিত কঙ্কাল
শব্দহীন অদ্ভুত মিছিল
দেখি শুধু গ্রাম আর সहर প্রান্তরে।
স্বাধীন হয়েছি বটে, তবু দেখি দাবানল জলে
উহাদের পেটের গহ্বরে—
সে আগুন ভয়ঙ্কর সব বুঝি রসাতলে যাবে

তুমি আমি আরও সকলে—
আমাদের মিলিত প্রকাশ তম্বীভূত হবে বুঝি
পড়ে রবে শুধু দীর্ঘশ্বাস।
রাত্রি গভীর হব ঘুম নেই স্বপ্ন নেই চোখে
শ্বেতকৃষ্ণ মনে হয় আকাশের চাঁদে
উহাদের দীর্ঘ মিছিলে—
নিঃশব্দে হেঁটে যায় ভাবনার শ্রোতে।

ভক্তের ভগবান

শ্রীচিস্তরঞ্জন চক্রবর্তী

ঐতিহাসিক প্রাচীন গ্রাম নয়, পল্লী-বাংলার অল্পতম ভৌগোলিক বর্ধিষ্ণু পল্লী। পল্লী প্রান্তে হাটধোলা। হাটের একান্তে প্রবাহিত সিকলিকে সরু নদীর ধার ঘেঁষে সুবিশাল বটমূলে—কোঁপ-ঝাড়ের আড়ালে যে চুন-স্বরকি খসে পড়া, কটা ছোট-বড় গোল গম্বুজের শীর্ষদেশ তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়, ওটা একটা মন্দির। শ্রীকৃষ্ণজগন্নাথজীউর মন্দির। মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ক্ষেত্ৰপাড়ার জমিদার রায়বংশের বড় তরফের রায়। রণেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী। বিলিতি খেতাব ছিল রায়বাহাদুর।

নির্জন একটা নদীর ধারে রায়চৌধুরী মন্দির ও মন্দিরে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত হননি, নিজ জমিদারীর এক-ভূতীয়াংশ আয় তিনি দান করে গেছেন মন্দিরের সেবা-পরিচর্যা এবং শ্রীবুদ্ধিকল্পে। মন্দির দেখাশোনার ভার ছিল রায়পুত্র যোগীরাজের ওপর।

ব্রিটিশ-ভারতে তদানীন্তন বাংলায় রায়বংশের সুনাম থাকলেও যোগীরাজ ছিল কুলাঙ্গার। পিতার মৃত্যুর পর মন্দিরের শ্রীবুদ্ধি দূরে থাক, মন্দিরের উৎসর্গীকৃত অর্থে সে মদ গিলতো। পানপাত্র হাতে সহরের বার-বিলাসে জমিদারী গিয়েছিল তার অনেক আগে। দেবীদাস ছিল মন্দিরের পুজারী। মাতাল যোগীরাজের পাঁজেল ভক্ত।

গঞ্জিকার দোষ থাকলেও মন্দিরের একনিষ্ঠ পূজার্নাম্য দেবীদাসের প্রথম যে আগ্রহ ছিল, ছিল আর্তি, পরবর্তী-কালে লোভের পরিণামে তা বিষবৎ হয়ে উঠেছিল।

দেবীদাসের নামে পাড়ার সকলের মনে একটা দেখা দিয়েছিল বীভৎস্পূজা।

অনেকদিন আগের কথা।

পাষণ দেবতা চেয়ে থাকতো সোঁনা-চোখে। দৃষ্টি তার অর্ধমস্তিত হ'লেও শিলারূপী ভগবান। সহস্রচক্ষু ভগবান। এই দৃঢ় বিশ্বাসে পূজা দিত গ্রামের বিভিন্ন ভক্তের দল।

কেউ বলতো : প্রভু, এবার আমার মনস্কামনা পূর্ণ করো! এই নাও তোমার মালা-চন্দন। তোমার ভোগ্যবস্তির সামগ্রী।

কেউ আনতো ধালায় চাল-কলার নৈবেদ্য সাজিয়ে। ছোটো পয়সা দক্ষিণা সম্বল।

কেউবা মানসিক দিত। দিত স্বপ্নাদিষ্টের অব্য-সামগ্রী। স্বপ্ন দর্শনে করতো জগন্নাথ দর্শন। সত্যক্তি প্রণাম জানিয়ে নিত জগন্নাথের চরণাস্থত। নিত ফুল বেলপাতা।

বৎসরের বিশেষ দিনে তা আরো প্রকট হয়ে উঠতো। অর্থাৎ পল্লী-বাংলার বারো মাসে তেরো পার্বণের অন্তর্গত স্নানযাত্রায় স্নানার্থীর ভীড় বাড়তো। অসংখ্য ভক্তের কলকোলাহলে ভরে যেত মন্দিরের সারাটা প্রাঙ্গণ। ঘড়া ঘড়া জল পড়তো জগন্নাথের মাথায়।

“তন্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্ট” কথাটার মধ্যে যত সত্যাই নিহিত থাক, কলিযুগে ব্যক্তি-জীবনের আত্মতুষ্টিটাই বড়। আত্মতুষ্টি তথা পুণ্যার্জনের স্পৃহা। ভগবানের নামে দান দিয়ে ক্ষান্ত হ'তে চায় নাবী-পুরুষ নির্বিশেষে। চায় পুণ্য। চায় কৃপা। হয়ত কেউ পায়, কেউ পায় না।

কিন্তু দেবীদাসের চিন্তা জগন্নাথ নয়, জগন্নাথের নামে প্রদত্ত ভোগ্যবস্তি। পূজাশেষে প্রভুর নৈবেদ্য চাল-কলা। প্রভুর নামকাওয়াতে চিনি-সন্দেশ। ঝৈ-মুড়কি প্রভৃতি।

পূজার পর সেগুলি সযত্ন হাতে বেঁধে নিত দেবীদাস। গাম্ভীর্য পুঁটলীটা নিয়ে যেত বাড়ী।

বাড়ীতে পা পড়বারও তার সইতো না। ছেলেরা ঘিরে ধরতো তাকে। হৈ-চৈ শুরু করে দিত। হাতের পুঁটলী কেড়ে নিয়ে খুলে ফেলতো। খেত মহা আনন্দে।

ঠাকুরসেবার নামে ভক্তের দেওয়া দক্ষিণাটা ঠাকুর না পাক, পেত দেবীদাস।

দেবীদাস সেই পয়সায় করতো নেশা-ভাঙ। সংসার চলতো কিছু জমির আয় থেকে।

কিন্তু নেশা-ভাঙের নেশা যত বেড়ে যেতে লাগলো দেবীদাসের, তত তার দেখা দিল ছাঁচ চেনা। নন্দী-ভূদী ওরফে নন্দীর নন্দন। বীরেন নন্দীর পুত্র শিবদাস আর কালিদাস।

শিবদাস দেবীদাসকে বলতো : ঠাকুন্দা।

কালিদাস ডাকতো : ঠাকুর গোসাঞি !
সদ্বোধনটা যত স্ততিমধুরই হোক, আসলে গাঁজার
আসরের দোস্তালি। কঙ্কের মিতালি।

মিতালিটা জমত সকাল-বিকাল।

সকালে নিদ্রাতজের পর শিবদাস ডেকে আনতো
কালিদাসকে। কালিদাস দেবীদাসের শরণাপন্ন হোত।
মন্দিরের দ্বার খুলে বসে যেত তিনজন।

বোম্ভোলার নামে গাঁজায় তিনবার দম দিয়ে ছ'বার
কেশে উঠে যেত দেবীদাস। গরদের খানখানা পরে,
টিকির বাঁধন আলুগা ক'রে জগন্নাথের সামনে ধূপ-ধূনোর
অরতি ছড়াতে না ছড়াতে ভক্তেরা একে একে আসতো।

কোন এক অজ্ঞাত মুহূর্তে বিদায় নিত কালিদাস আর
শিবদাস।

বিকেলের পটভূমিকায় আবার অম্লরূপ পরিবেশ গড়ে
উঠতো। গাঁজার কন্ধে হাতে দেবীদাস, কালিদাস
আর শিবদাস। ভক্তেরা তা' কোনদিন দেখেও দেখেনি।
বিরক্ত হয়নি।

বিরক্তি দেখা দিল একদিন—যেদিন থেকে দেবীদাস
প্রসাদী মিষ্টি সব রেখে শুক্কদের শূণ্য খালা ফিরিয়ে দিতে
লাগলো। তৎসহ হাতে শুঁছে দিতে লাগলো জগন্নাথের
চরণরেণু তথা ফুল-চন্দন।

গ্রামের সব তরুণ যে সমান নয়, নরম নয় সকলের মন,
দেবীদাসের তা জানা ছিল না।

দেবীদাস পেল তার চাক্ষুষ প্রমাণ।

এক ভক্তের হাতে শূণ্য পাত্র ফিরিয়ে দিতেই সে
জ্ঞানালো প্রথম মুহূর্ত অভিযোগ। বললো : ঠাকুরমশায়,
এটা আপনি কি করলেন? মিষ্টির সবটাই যদি আপনি
রেখে দেন তো আমরা প্রসাদ পাবো কি করে?

দেবীদাস ভগবানের নামে ভয় দেখালো। বললো :
ছিঃ ছিঃ, অমন কথা বলতে নেই মা। দেবতার ভোগে
দিয়ে কিছু ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া অপরাধ।

বঁেকে দাঁড়ালো ভক্ত : অপরাধ না ছাই! তার চেয়ে
সোজা কথাটা বললেই তো হয় যে, জগন্নাথের সেবা না
দিয়ে আমার সেবা যোগাও। ভগবানের নামে আপনি

যে অপরাধ করেছেন, সে অপরাধে আপনিই পুড়ে
মরবেন। ছাই হেঁষে যাবেন।

হোলও তাই।

ভক্ত সইলেও ভগবান সইলেন না। তিনি আরো
বাড়তে দিলেন দেবীদাসকে। দেবীদাস তা বুঝলো না।
মাহুষ বুঝবে কি ভগবানের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের কথা!
কৃপাকণার কথা!

দেবীদাস মনের আনন্দে চালিয়ে যেতে লাগলো তার
লোভপরতন্ত্র; জগন্নাথের পরিবর্তে নিজের উদর পূর্তি
ও গন্ডিকা সেবন।

কালের অমোঘ বিবানে সঙ্গী জুটলো আরো দুটি
সন্ন্যাসী। কৌপীন পরা জটা-বাঘছাল আর কমণ্ডলু।
সিঁহুর লেপা ছ'টি ত্রিশূল।

দেবীদাসের সাংসারিক ভবিষ্যৎ হুংখের কথা পেড়ে
ধুনী জ্বললো মন্দিরের সামনে। বললো : যদি তোর
ভালো চাস্ তো তুই এই ফকির সন্ন্যাসীর নামে ছ'
ছিলাম গাঁজা দে।

সন্ন্যাসীদের কথায় গলে গেল দেবীদাস। অধিক
সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট এইখানেই স্তব্ধ হয়ে গেল।

জোট আর জটলায় ভুলে গেল দেবীদাস। মন্দিরের
দ্বারোদ্ঘাটনে ব্যাধীত ঘটতে লাগলো। সময়ের ফুল
অসময়ে পড়তে লাগলো জগন্নাথের স্রীপাদপদ্মে।

ধৃতচক্রের আবর্তে মাস ও বৎসর চললো জলের মতো
গড়িষে।

শরভের এক সোনালী প্রভাতে কালিদাস বললো :
ঠাকুর গোসাঞি, দেখুন কা'কে এনেছি। চেয়ে দেখুন।
ঐ যে দূরে দাঁড়িয়ে।

শিবদাস বললো : করেছিষ্ কি? কার ঘরের মেয়ে
চুরি করে এনেছিষ্?

চূপ চূপ। চুরি নয়। এতবড় সোমস্ত মেয়েকে কি
কেউ চুরি করে আনতে পারে? এ মেয়ে স্বেচ্ছায়
এসেছে। গ্রামান্তরের বামুনের মেয়ে। বয়স কত হবে
জানেন ঠাকুরগোসাঞি?

কত?

বছর বাইশ। গরীব বাপ। বিয়ে দিতে পারছেন

না। তাই সে এসেছে তা'র বৃদ্ধ বাপের মত নিয়ে। এসেছে আমার সঙ্গে। আমার বন্ধুকল্প। জগন্নাথের পায়ে সে তা'র জীবনকে উৎসর্গ করতে চায়। সেবা করতে চায়।

কি নাম ?

মধুমালতী।

বাঃ, বেশ নামটি তো ! আড়চোখে একবার চেয়ে নিল দেবীদাস। বললো : কিন্তু—

কিন্তু কি ? জগন্নাথের সেবায় একে নিযুক্ত করলে তোমার মন্দির সেবার ভার লাঘব হ'বে। জগন্নাথের করুণা পেলে মেয়েটাও বর্তে যাবে।

কথাটা শুনে খানিকক্ষণ গুম হয়ে থাকলো দেবীদাস।

কালিদাস বললো : কী ঠাকুরপৌসাক্রি, চুপ ক'রে রইলেন যে ! আমার কথার জবাব দিন ! এতে এতো আকাশ-পাতাল ভাববার কি আছে ?

আছে বৈকি ! আইবুড়ী যুবতী মেয়ে। গ্রামান্তরের নির্জন পথ বেয়ে সে আসবে একা-একা !

সেজন্তু তোমাকে ভাবতে হ'বে না ঠাকুরপৌসাক্রি ! মেয়েটার সাহস আছে। আছে ভক্তি। তুমি শুধু রাজী হও। একে জগন্নাথের সেবার অধিকার দাও। ক'রে তোলা মন্দিরের দেবদাসী।

বেশ। কিন্তু যোগীরাজকে একবার বলে দেখি। মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ যখন তাঁর হাতে, তখন তাঁকেই আগে কথাটা জানানো দরকার।

তথ্যস্ত। জয় হোক তোমার ঠাকুরপৌসাক্রি ! বলে শিবদাসের হাত ধ'রে কালিদাস চলে গেল।

গ্রামান্তরের পথ ধরলো মধুমালতী।

পরদিন দেবীদাস কথাটা পাড়লো যোগীরাজের কাছে।

যোগীরাজ শোনা মাত্র সোৎসাহ প্রকাশ করলো। জানানো মধুমালতীর সঙ্গে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময় সম্পর্ক গড়ে তুলবার প্রত্যাশা। কিন্তু দেবীদাস তা' ভেবে দেখেনি। যোগীরাজের সমর্থন পেয়ে কিরে এসেছে নিজের আত্মনায়। কালিদাসকে ডেকে বলেছে : কালিদাস

ধরটা পৌঁছে দিয়েছে গ্রামান্তরের মধুমালতীর কাছে। মধুমালতী এসেছে-মালা হাতে প্রভুর-ভজনা করতে।

কিন্তু প্রভুর গলায় সে-মালা পড়বে কি, মালা কেড়ে নিতে গেল যোগীরাজ। বললো : এ মালার অধিকারী একমাত্র আমি। জগন্নাথ নয়।

যোগীরাজের উচ্ছ্বল আচরণে বিস্ময় বিস্তারিত চোখ মেলে ধরলো মধুমালতী। বললো : না-না-না। কিছুতেই তা হ'তে পারে না। এ মালা জগন্নাথের। জগন্নাথ আমার প্রভু। আমার অন্তরের দেবতা।

দেবতা ? তবে রে ! মধুমালতীর হাতের মালা কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেললো যোগীরাজ।

কান্নায় চোখ ফেটে জল এলো মধুমালতীর। সে বিচারের প্রত্যাশায় চাইলো দেবীদাসের দিকে। দেবীদাস সরে যেতে ইঙ্গিত করলো যোগীরাজকে।

যোগীরাজ সরে গেল।

পরদিন আবার এলো মধুমালতী। পরণে তা'র লাল পাড় শুচিশুদ্ধ বাস। হাতে মালা।

কিন্তু আশ্চর্য যোগীরাজ !

নিতান্ত নির্লব্ধের মতো সে এসে দাঁড়ালো পাশে। মদমাতালে মেতে উঠলো। বললো : চমৎকার ! ফাইন-নাইস-বিউটিফুল ! বিউটিফুল তোর হুঁটি চোখ। রূপ আর তোর হাতের মালা ! জগন্নাথকে চাসু তো দে আমার গলায় তুলে। আজ থেকে আমি তোর জগন্নাথ। কি ভাবলিস। আমাকে দেখে তোর পছন্দ হচ্ছে না বুঝি ?

যোগীরাজ জড়িয়ে ধরতে গেল তাকে।

সরে দাঁড়ালো মধুমালতী।

কিন্তু এ দৃশ্য কেউ দেখলো না। দেখলো হুঁটি সম্মাসী, দেবীদাস আর দেখলেন জগন্নাথ। মন্দিরের শিলারূপী জগন্নাথ নামধেয় সহস্রচক্ষু ভগবান।

ভগবানের চোখে ধূলি দিবে মর্ত্যের মরণশীল মানুষ ? স্পর্ধা তো বড় কম নয় ?

মন্দিরের প্যাণ্ড দেবতা এবার জেগে উঠলেন। মহুঘ্য দৃষ্টির অগোচরে বৈকে দাঁড়ালেন তিনি। উগ্রমূর্তি ধারণ

করলেন। মধুমালতীকে উদ্ধার করবার জন্য পাপাতুর তোর বাবাকে বলি। 'পাত্র বিনা পণে তোকে বিয়ে যোগীরাঙ্গের ঘরে ঢুকলেন বিহুচিকা মুন্ডিরূপে। ঢুকলেন করতে রাজী আছে। কৃষ্ণভক্ত স্বামী পাবি। দেবীদাসের ঘরে। অতি লোভ আর দেবতা-লাঞ্ছনের অপরাধে তু'জনেই মৃত্যু বরণ করলো।

সন্ন্যাসী তাড়ালো গ্রামের লোকেরা।

জয়-হোল মধুমালতীর।

কালিদাস ও শিবদাসের প্রচেষ্টায় মধুমালতী এখন মন্দিরের দেবদাসী। মধুমালতী দেবদাসী হ'লেও কালিদাস বলে: মা, এবার তোর জন্মে একটা ভাল পাত্রের সন্ধান পেয়েছি। যদি রাজী হোস্ তো বল।

মধুমালতী হাসে। তোলে প্রভু জগন্নাথের কথা। বলে: প্রথম জীবনে জগন্নাথ ভিন্ন যখন আর কাউকে পেলাম না। তখন তিনিই আমার স্বামী: তিনিই আমার ধর্ম। আমার জন্ম-মৃত্যু। কার্য-কারণ। আমার সব। তাঁর সুখেই আমি সুখী। তাঁর দুঃখেই আমি দুঃখী। আমি তাঁর ছায়ায় শক্তি।

মধুমালতীর কথা শুনে জগন্নাথ হাসেন কি কাদেন কে জানে?

হে মহামানব

ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস

বাদের ভীষনব্যাপী কুচ্ছ সাধনায়

ভারত লভিল স্থান জগৎ-সভায়

তুমি যে তাদেরই একজন

তাই অমুরাগী দেশবাসী তোমার সপ্ততিতম জন্মদিবসে

হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ অর্থ্য তোমারে করিছে নিবেদন।

গণিতের অগণিত জটিল রহস্যজাল করিয়া ছেদন

বলিষ্ঠ প্রতিভা তব শিল্পবিজ্ঞানের সর্বক্ষেত্রে

করেছে সচ্ছন্দ সঞ্চরণ

সত্যই ভারত মাঝে তুমি অধ্যাপক "ফন্‌ আলেরলাই

ভিসেন শাফ্টেন"—

বিচক্ষণ ক্যাপ্টেনের মত পাঠাইলে প্রতি ক্রণ্টে

দক্ষ ছাত্রগণ

প্রতিহত সর্গোরবে ভারতীয় বিজ্ঞানীর বিজয় কেতন।

সত্যের পূজারী, হে দিশারি, শত শরতের মধু লভি'

নিত্য নব আবিস্কারে, চরিত্রের বিপুল বৈভবে

সমুজ্জল কর হিন্দুস্থান

বিভূপদে এ মিনতি যাচি, তোমারে জানাই মৌর্য

সশ্রদ্ধ প্রণাম *

বিজ্ঞানের সুপরিজ্ঞ মণিকোঠা মাঝে নিমগ্ন

যদিও ছিলে ধ্যানে

তবু স্বদেশের স্বপ্ন পরাধীনতার শ্লানি বাজিত

সত্য তব প্রাণে

তাইত অল্প প্রচ্ছন্ন অবদান স্বাধীনতা আন্দোলনে

করিয়াছ দান

—তুমি ভাগ্যবান।

আত্মমর্যাদার অধিকারী জাতিমাঝে মাতৃভাষা পরম

সম্পদ বলি মান্বে

বিশ্বের বিবিধ ভাষা আয়ত্ত করিয়া সঁপিয়াছ সর্বশক্তি

বঙ্গভাষা বিকাশ সাধনে।

হে মহামানব তুমি, নিম্পৃহ নিরন্তর মান

বিজ্ঞানী তোমার চেয়ে তুমি যে গো আরও সুমহান।

সম্মাদকায়

ইতিহাসের ইঙ্গিত :

স্বাধীনতা সংরক্ষণ সম্পর্কে অভিজ্ঞের বাণী :
“Eternal vigilance is the price of Liberty.”
সর্বদেশে সর্বকালেই স্বাধীনতা সম্পর্কে ইহা সত্য সিদ্ধান্ত। রামরাজ্যেও ইহার ব্যত্যয় হইতে পারে নাই। ধর্মরাজ্য যুগিষ্টির আমলেও ইহা প্রযোজ্য ছিল। বর্তমানেও ঐ অগ্রত সন-সত্যকতা তিন স্বাধীনতা সংরক্ষিত হইবার নহে। ভবিষ্যতেও নয়।

ধর্ম সাধনা বা শিল্প-বাণিজ্য পরিচালনার যেমন নিয়ম সংগে আছে, নীতি আছে, তেমনি আছে রাষ্ট্রতরী নিয়ন্ত্রণেরও। রাষ্ট্রের সূচু পরিচালনা ও নিরাপত্তার পক্ষে এই নীতি অপরিহার্য। বাস্তব পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক অসচেতনতা, বাস্তব কুট বুদ্ধির অভাব, বুদ্ধিভ্রংশতা, আদর্শগত দুর্বলতা, অর্থাটীনের অক্ষমতা, পৌরস্বহীনতা, আরামপ্রিয়তা, ব্যক্তিমূল্যবোধে দৃষ্টির আচ্ছন্নতা প্রভৃতিই রাষ্ট্রের পক্ষে বহিরাক্রমণ ও আবাত আত্মন করিয়া আনে। সর্ব যুগেই সুপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের পতনের মূলে এই কারণগুলি বর্তমান, ইতিহাস এই সাক্ষ্যই দিয়া থাকে। সম্ভ স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের পক্ষে ইহার অগ্রতা হইবে, এমন হইতে পারে না। বিগত সত্তের বৎসরে প্রতিষ্ঠা পাইবার মুখেই ভারত রাষ্ট্র যে সঙ্গীন সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে তাহা প্রধানতঃ স্ব-সৃষ্ট অস্বঃদুর্বলতা প্রসূত। নীতিবাক্য আউড়াইয়া সবল আবাতকারীকে তোষাঙ্গ করিলেই সমস্তার সমাধান হয় না বা আত্মরক্ষা করা চলে না। চিরযুগই বর্ধরতাকে বর্ধরতা দিয়াই শায়েস্তা করিতে হয়। ব্যক্তিগত বা সীমিত সমষ্টির ক্ষেত্রে ‘শেষে শাঠ্যং সমাচরেৎ’ নীতির প্রত্যাবায় ঘটিতে দেখা গেলেও, রাষ্ট্র সংরক্ষণের ব্যাপক ক্ষেত্রে এই নীতির অভাব বিপদকেই ডাকিয়া আনে যেমন আনিয়াছে পাক-ভারত সম্পর্কে ভারতের দুর্বল দৌর্দণ্ড। সবগুণময় ব্রাহ্মণ্য প্রতিভার রক্ষণ ও সংবর্দ্ধনের জন্যই প্রয়োজন রাজস কাউবীর্ঘ্যের। আজকের ভারত

রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী কেবলই সম্ব করার উপদেশ দেন। তাঁরই কথা “Tolerance is the heritage of India.” ইহা অনেকটা শেক্ষপীয়ারের সেই ব্যাঙ্গোক্তি মত “sufference is the badge of your nation.” সম্ব করিয়া, শুধু মার খাইয়া আর মরিয়া অত্যাচারীর করুণা উদ্বেক করা যায় না। ইহা দুর্বল কাপুরুষের ভীত নীতি। কোরবের ভায়বুদ্ধি শ্রীকৃষ্ণ বহু দৌত্যগিরি, প্রচুর অহুনয় বিনয় করিয়াও অগ্রত করিতে পারেন নাই। সর্ববিধবংসী কুরুক্ষেত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়াই কোরবের চৈতন্য উদয় করিতে তাঁকে হইয়াছিল। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিপূর্ণ আদর্শ মানুষ শ্রীকৃষ্ণ। সমরঙ্গণের প্রচ্ছলিত অগ্নি-আবেষ্টনীর মধ্যেই মানব উজ্জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ নীতি-নির্দেশক গ্রন্থ গীতার জন্ম। এই গীতার প্রবক্তা ছিলেন পূর্ণ মানব শ্রীকৃষ্ণ।

মহাভারতের এই শিক্ষা ভারত রাষ্ট্র গ্রহণ না করার জন্যই আজ ভারত অত্যন্ত বিপদাপন্ন। পাঁচ বৎসর পূর্বে ১৯৫৭ সালে শ্রী কে. এম. মুন্সী তাঁর ‘Warnings of History’ গ্রন্থের ভূমিকায় এই আশঙ্কাই প্রকাশ করিয়াছিলেন : “For some considerable time I could not help feeling that India is drifting towards a situation which might become dangerous any day, if the lessons of history have any meaning.” শুধু মুন্সীজী নহেন, চিন্তাশীল বিচক্ষণ ব্যক্তিমাঝেই এই আশঙ্কাই গোষণ করিয়া আসিতেছেন। বস্তুতঃ আমরা স্ববাদ সলিলে ডুবিয়া মরিতেছি। আমাদের এই দুর্ববস্থার জন্ত দায়ী পাকিস্তান নয়, চীন নয়, কেহ নহে—আমরা নিজেরাই। দুর্বলের আর্ন্তনাদের মধ্যে সাহসনা থাকিতে পারে; কিন্তু প্রতীকার নাই। সত্যকার প্রতীকার হইতেছে আপন বীর্ঘ্যবত্তা ও স্বীয় বাহবলের মধ্যে। ইহা ছাড়া সাম্প্রতিক পূর্ব পাকিস্তানের নিষিচার নরহত্যা, নারীহরণ, নারীধর্ষণ নিলজ্জ মিথ্যা ভাষণের বিরুদ্ধে আমাদের নিষ্ফল চীৎকার ও শূন্তগর্ত আশ্ফালনই সার হইবে। এমনি নৃশংস বর্ধরতার মধ্য দিয়াই ইসলাম বিগত দেড় হাজার বৎসর সারাটা হুনিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে, হিন্দু ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে ও সাত শত বৎসর রাজত্ব করিয়াছে। আবার বিংশ শতাব্দীর সমুজ্জল সত্যতার মধ্যাহ্ন মুহূর্তে এমনি হিন্দু হত্যা, হিন্দু নারীধর্ষণ আর

দাঙ্গার মধ্য দিয়েই ভারত ভূমিতেই স্বতন্ত্র ইসলাম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আজকের দিনের পূর্ব পাকিস্তানের নারীকীর বীভৎসতার বিরুদ্ধে ভারতবাসীর দুর্বল কণ্ঠের চীৎকার অনতিদূর আগামীকালে শৃঙ্খল নীরব হইয়া যাইবে, কিন্তু যাহা থাকিবে তাহা ইসলামিক রাষ্ট্রের বনীয়াদ আর তার উপরে উড্ডীয়মান তারকা-চিহ্নিত পুতাকা।। আমাদের সামনেই পূর্ব বাংলার নাম মুছিয়া হইল পূর্ব পাকিস্তান, তারপর পশ্চিম বাংলার নাম আর কতদিন অম্লধ্বংস থাকিবে তাহাইবা কে জানে! ভারত রাষ্ট্রেব রাষ্ট্রধর্ম ও রাজনীতির নীতি পালন না করারই ইহা কুফল। ভারতীয় আদর্শের ছদ্মবেশে আজকের আত্মতুষ্টি ভারত-রাষ্ট্র-কর্ণধারদের স্ব-কল্পিত আদর্শগত দুর্বলতারই ইহা বিধব পরিণাম। লক্ষণ সেনের ভীর্ণতা ও রাজ্যভ্রষ্ট হওযাটা যেমনি ইতিহাস, তেমনি 'বঙ্গবিজেতা' বখতিয়ার খিলজীর গোড়-রাজ্য প্রতিষ্ঠা আরও গৌরবময় ইতিহাস। বীরভোগ্যা বজ্রধরা— ইহাও ইতিহাসের শিক্ষা।

॥ পাকিস্তানের হিন্দু ॥

হিন্দু নামোচ্চারণ করাটা অবশ্য পণ্ডিত নেহেরুর রাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িকতা। অথও ভারতে কংগ্রেসী আমলেই ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক ষাঁটোয়ারার কল্যাণে হিন্দুর নব নামকরণ হইয়াছে অ-মুসলমান। হিন্দুর রাজনৈতিক পরিচয়, কংগ্রেসী আমলে জুগু। বর্তমান সেকুলার ভারতে মুসলমান, খুঠান, বৌদ্ধ সবাই যার যার গভীর মধ্যে অনড়। কেবল হিন্দুকে লইয়া সেকুলারদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্ত নাই। পণ্ডিতজীর চোখে জঘন্স সাম্প্রদায়িক যদি কেহ থাকে তবে সে হিন্দু। সেকুলার ভারত-রাষ্ট্রে হিন্দুর আইন যথেষ্ট পরিবর্তনে বাধা নাই। কিন্তু খুঠান, মুসলমান, বৌদ্ধের বেলায় তাদের সার্ব-ভৌমিকদের হানির ভয় আছে। ভারতের হিন্দুই যদি এই করণার পাত্র হয় তাহা হইলে পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুর হৃদশা হৃদয়হীন মানবতাবাদী ভারত-রাষ্ট্রের মর্শ কতখানি স্পর্শ করিতে পারিয়াছে, এ বিষয়ে আমাদের ঘোরতর সন্দেহ আছে। তাহা না হইলে পুনরাসন সম্পর্কে "human and compassionate ground"-

এর কথা শ্রীনন্দজীর মুখে আসিত না। পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের রাজনৈতিক অধিকার ভারত রাষ্ট্র অস্বীকার করিতেছেন। দেশবিভাগের পূর্বে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল তাহাও এখন ভারত সরকার বেমালাম এড়াইয়া যাইতেছেন। পাকিস্তানের হিন্দুরা অমুকম্পার ভিখারী হইয়া ভারতে আসিতেছে না— 'রেকিউজিও' তাহারা নহে। ভারত ভূমিতে পদার্পণ মাত্রই তাহারা ভারতের নাগরিক জাত্য অধিকারের দাবীতেই—এই স্বীকৃতি স্মারতঃ ধ্বংসঃ এই আপত্তদের প্রাপ্য। নয় দিল্লীর ক্ষমতার আসনে আসীন হইয়া এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, স্বাধীনতা সংগ্রামে পূর্ব-বঙ্গবাসীর অবদান তুচ্ছ নহে। ইহা অস্বীকার করা শুধু অকৃতজ্ঞতা নহে, হৃদয়হীন ক্ষমতামত্তের কৃতঘ্নতা। এমন অশ্রদ্ধের হইয়া গণতন্ত্র বেশীদিন চলিতে পারে না।

পূর্ব বাংলার হিন্দু নির্যাতন শুধু আজকের ঘটনা নহে। সমগ্র বিংশ শতাব্দীর দশকে-দশকে ক্ষেপে-ক্ষেপে এই উৎপীড়ন-নিপীড়ন চলিয়াছে। ১৯০৫-১৯১১ স্বদেশী আন্দোলনে বঙ্গভঙ্গের 'settled fact unsettled' হইল, কিন্তু তার জন্ত যে ব্যাপক প্রাণের মূল্য দিতে হইয়াছিল তা প্রধানতঃ পূর্ব বাংলায় হিন্দুকেই দিতে হয় মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার বেদীতে। বুটিশের ভেদনীতির প্ররোচনায় চাকার নবাব সলিমুল্লাহ সমর্থন ও প্ররোচনায় ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, পাবনা প্রভৃতি স্থানে সে-সময়ে হিন্দুর উপরে মুসলমানের সে অকথ্য অবাধ অত্যাচার হইয়াছিল তাহা আজ ভুলিলে চলিবে না। হিন্দু হত্যা, হিন্দু বিধবার সতীত্বনাশ, কুমারী কল্যাণের সেদিনও অবাধে রাজশক্তির প্ররোচনায় সংঘটিত হইয়াছিল। মুসলমান মোল্লারা প্রকাশে লাল ইস্তাহার বাহির করিয়া হিন্দু-বিধবা-কুমারী নির্বিশেষে বিবাহ বা নিকা করিয়া পূর্ববঙ্গ হিন্দুশূন্য করিবার উদ্দেশ্যে দিয়াছে এবং ইহাতে পরোক্ষ সমর্থন ছিল তদানীন্তন বৈদেশিক রাজশক্তির। কিন্তু হিন্দুর প্রাণ তাহাতে দমে নাই, সে অপমান আজকের মত সেদিন হিন্দু নীরবে সহ্য করিয়া লয় নাই। সেদিন বাদশাহী হিন্দুর প্রাণ রক্তমুগ্ধি ধারণ করিয়া 'বন্দে মাতরম্' স্মৃতিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়াছে। সংখ্যালঘুর

লাঠি ও অগ্নিনালিকার অগ্নিদগ্ধীর্ণ সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের ঐক্য আর নারীহরণকারী পশুর মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়াছিল। সেদিন হিন্দু অবলার রণরঙ্গিণী মূর্তিবৎ অব্যবহা হ'ব নাই। কুমারীর কটিতটের শাণিত ছুরিকা অত্যাচারীর বক্ষ বিদীর্ণ করার দৃষ্টান্তও বিরল নহে। হিন্দু প্রচণ্ড ত্যাগব দেখিয়া তখনকার ইংলিশম্যান পত্রিকা মন্তব্য করিয়াছিল: "If rifles grow on trees, the Arms Act becomes useless. Lathi should be included within Arms Act." দ্বিদ্ধাতি তবের ভিত্তিতে দেশ বিভক্ত হইবার পূর্বে মুহূর্ত পর্যন্ত পূর্বে বাংলার হিন্দুর এই বীৰ্য্য-বিক্রমের অভাব হয় নাই। কিন্তু আজ আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতে হয়, পূর্ব-পশ্চিম হিন্দু বাঙালী প্রাণের আশ্রয় রাতারাতি এমন করিয়া নিভিয়া গেল কোন্‌ যাত্রমন্ত্রে? পূর্বে পাকিস্তানের সাম্প্রতিক নারকীয় পাশবিকতার প্রতিবাদে একটি পুরুষ, একটি নারীর প্রাণেও আশ্রয় অলিল না। হয়তো ইহা সাম্প্রদায়িক, হয়তো ইহা রাজনৈতিক সমস্যা। কিন্তু মায়া কি শুধুই রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতিক মতবাদের নিষ্প্রাণ যন্ত্রমাত্র। পৌরুষ, সতীত্ব, সংস্কৃতি, সংসংস্কার কি কথার কথা। চরিত্রের কি কোন মূল্য নাই? সম্ভার শৌর্য্য-বীৰ্য্য কি আকাশ-কুসুম? নিষ্ঠা, আদর্শ, মর্যাদাবোধ, কুল-বংশ-জাতিগৌরব, সতীত্ব কি শূন্যগর্ভ বুলিয়াত্র? তুচ্ছ হৃদয় সংবেগের বশে নারী কেরোসিন সিক্ত বসনে আশ্রয় ধরাইয়া আত্মহত্যা করে। বিশ্বমীর অঙ্কশায়িনী হইয়া একটি পুত্রবতী সংবা, একটি কুমারীর এতটুকু আত্মশ্রমি জাগিল না! একটি সতীদাহও হইল না! একটি সতীত্বহরণকারীর কুটিরও ভস্মীভূত হইল না! একটি বলাৎকারীর বক্ষও ছুরিকাভিক্ত হইল না! একটি পুরুষের পৌরুষও জাগিল না! নিখিল ভারতে একজন হিন্দু নারীর প্রাণেও দুঃশাসনের রক্ত দর্শনের অপেক্ষায় অবদান বেগী রাখার সক্ষম জাগিল না। আরও আশ্চর্য্য সারা হিন্দু ভারতের একটি পুরুষেরও অত্যাচারী দুঃশাসনের রক্তপানের ভীম-পৌরুষ হুকার দিয়া উঠিল না!

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে বিগত সত্তের বৎসরের রাষ্ট্রনীতি ও রাষ্ট্রদর্শন একটা সুপ্রাচীন সনাতন ঐতিহ্যবাহী জাতিকে কতখানি ক্রীত, নীতিহীন, বীৰ্য্যহীন, আত্ম-

সম্বিংহারা করিয়া তুলিয়াছে আজকের হিন্দুর মানসিক ও আত্মিক দৌর্বল্য তারই সাক্ষ্য বহন করিতেছে। মহৎ জীবনের মূল্যবোধ হারাইয়া তুচ্ছ পশুজীবনের দেহ-সর্বস্বতায় চিত্ত তার আচ্ছন্ন। একটি ফুৎকারে যে জীবন-দীপ নিভিয়া যায় তারই মমতায সে আজ উন্মত্ত, দিশাহারা। নির্বীৰ্য্য অহিংসধর্মী গণতন্ত্রের দোহাই আর পশুর শূন্যগর্ভ শাশানের শাস্তি-বচন হিন্দুর নমনে আফিনের নেশা নামাইয়াছে। নিরীশ্বরীয় নেহেরুর বৈষয়িক রাষ্ট্র অন্ততঃ ভারতের হিন্দুকে যে ক্রমশঃ বিষয়কীটে পরিণত করিয়া তুলিতেছে তাহারই প্রমাণ আজকে আমরা পূর্ব-পশ্চিম বাংলায় প্রত্যক্ষ করিতেছি। অত্যাচার সবলের হাতে কীট-পতঙ্গের মত অসহায়ভাবে মৃত্যুবরণ করিতে হইত না। পরম পুরুষ ঠাকুর রামকৃষ্ণও অহিংস প্রেমিক সাধককে এই হিংস্র জগতে আত্মবক্ষার জন্য অন্ততঃ 'ফৌস' করার উপদেশ দিয়াছিলেন। অহিংসার ঋষি স্বয়ং গান্ধীজীও "between Cowardice and violence"-এর মধ্যে violenceই প্রেয: মনে করিয়াছেন। কিন্তু তাঁর উত্তরাধিকারীদের দর্শনে ও আচরণে অহিংস নীতি বীরের বীৰ্য্য-বিক্রম হারাইয়া ক্রীবৎ পরিণত হইয়াছে। স্বাধীনতা-উত্তর ভারত রাষ্ট্রের বাহ্য চমৎকারীত্বের অন্তরালের মর্যাদাসিক ট্রাজেডি ইহাই—যাহাই আজকের পূর্বে পাকিস্তানের হিন্দু নরনারী নির্বিশেষের নিপীড়ন-উৎসাদনের মূল কারণ বলা যায়।

॥ স্বাধীনতার হীনতা ॥

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জনের গোড়াকার অধৈর্য্য ও গলদের দ্বার আজও চলিতেছে। স্বাধীন ভারতের বণিগদ দূর করেন লৌহমানব প্যাটেল করদমিজে রাজ্যগুলিকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করিয়া। অত্যাচার কি আভ্যন্তরীণ, কি পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে যে ভুলের পর ভুল পুঞ্জীভূত হইয়াছে তারই মাণ্ডল দিতে-দিতে সমস্যা এখন এমন জটিলতম হইয়াছে যে, হঠাৎ পথ পাওয়া শক্ত। রাজনীতির ক্ষেত্রে ভাবালুতার স্থান নাই, অব্যবস্থাবুদ্ধিও অচল—ইহা উন্নয়ন পরিকল্পনার সমারোহ ও ধনকৃত অচল অর্থের মোহ জনগণকে বৃথিবীর অবসর দেয় নাই। ভারত রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা অনেকখানি সফল হইয়াছে। নেহেরু-নেতৃত্বও নির্বিশেষ স্বামীত্বের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে, কিন্তু

তথাপি আমরা বলিব, যে শৌর্য্য-বীর্য্য, যে রাজনৈতিক কূট বিচক্ষণতা আর গণতান্ত্রিক নীতির নিরপেক্ষ প্রয়োগ রাষ্ট্রকে স্পৃহাপ্রতিষ্ঠ করে তার অশ্বাঘটিত। আপোষ আর অসামঞ্জস্য কিছুকাল রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার প্রতীতি দিতে পারে, কিন্তু শক্তি-সামর্থ্য বিনা উহা কখনই স্থায়ীভাবে ফলপ্রসূ হইতে পারে না, যেমন হয় নাই ভারত রাষ্ট্রে।

বাংলা ও বাঙালী ছাড়া অবশ্য স্বাধীনতার সুখভোগ সারা ভারতে আর সবাই করিতেছে। এই পূর্বপ্রাস্তিক আভিজাত্যগোঁরবী বাঙালী মরিল কি বাঁচিল, অথবা স্বাধীনতা-উত্তরকালে তার অস্তিত্ব অবলুপ্তির যে সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে তাহা লইয়া কি কেন্দ্রীয় সরকার, কি নেতৃবৃন্দ বা বহির্বিশ্বের সংবাদপত্র-পত্রিকার কাহারও নাস্তুর সহায়তামূলক সাড়া পাওয়া যায় নাই। স্বাধীনতার জন্মলগ্ন হইতে একতরফা হিন্দু বাঙালীকে শোণিতের মূল্যে যে খেপারত দিতে হইতেছে তার অন্ত আঙ্গও হইল না এবং কবে কিভাবে হইবে তারও কোন নিশ্চয়তা নাই। দাঙ্গা বন্ধের জন্ত দেশ বিভাগ হইল। দাঙ্গা সত্যই বন্ধ হইয়াছে। কিন্তু একতরফা বাঙালী হিন্দু হত্যার ও হিন্দু-রমণী ধর্ষণের পথ অব্যাহত হইয়াছে। ১৯৫০ সালের নেহেরু-লিয়াকৎ চুক্তি, শ্রামপ্রসাদের মন্ত্রীত্ব ত্যাগ, নেহেরু-জুন-চুক্তি—কিছুতেই হিন্দু-উৎসাদন বন্ধ হইল না বিগত ১৭ বৎসরেও। ভারত রাষ্ট্রের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া আয়ুবশাহীতে বেপরোয়া এই নারকীয় লীলা চরমে উঠিয়াছে। ১৯৬১ সাল হইতে হিন্দু নিধনের খতিয়ান এইরূপ : ১৯৬১—ফেব্রুয়ারীতে যশোহরে ও রংপুরের হত্যাকাণ্ড। জুনে গোপালগঞ্জে। ১৯৬২ : জাঙ্গায়ারী হইতে মার্চ মাস পর্যন্ত হত্যাকাণ্ড চলিয়াছে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, রাজশাহী, খুলনা, পাবনা, বগুড়া, ময়মনসিংহে। জুন মাসে বঙ্গভাষাভাষী সাঁওলালদের অমাহুষিক নির্যাতন ও নিধন। ইহার পরের মাসেই নোয়াখালী-চৌমুহানীর লুণ্ঠন হত্যাকাণ্ড। কুমিল্লায় নির্বিকার নিধন ও নিপীড়ন এবং প্রসিদ্ধ লেখক পাঠশালা দখলের সঙ্গে ১৯৬৪ সালে হিন্দু-পীড়নের যে সূচনা তার নারকীয় বীভৎসতম রূপ আমরা সম্প্রতি দেখিলাম ও দেখিতেছি যশোহর, খুলনা, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের নিধন, ধর্ষণ ও দাওনে। অথচ সরকারী পর্যায়ে সংখ্যালঘুর সংরক্ষণ-প্রতিক্রিয়ার সাক্ষ্য হইয়া এখনও নেহেরু-লিয়াকৎ চুক্তি বর্তমান। অসহায় ভারত রাষ্ট্র ইহার মুহু প্রতিবাদ ছাড়া কোন সক্রিয় প্রতিবাদ করারও সং সাহসটুকু দেখাইতে পারে নাই।

সেদিন পত্রিকায দেখিলাম সাইপ্রাসের তুর্কীদের বক্ষার অস্ত্র ক্ষুদ্র তুরস্ক নৌবহর পাঠাইয়াছে। ব্রিটিশ

আমলে একটি ইংরেজ মহিলার অপহরণে সারা আফ্রিকা জাতিকে শান্তি ভোগ করিতে হইয়াছে। পরাধীন ভারতে উপাধের বিভিন্নতা থাকিলেও, লক্ষ্য বিষয়ে মতবৈধতা ছিল না। আজকের স্বাধীন ভারতে চিন্তাশীল দরদী নিরপেক্ষ মাহুষের মনে রাজনৈতিক দল সঙ্ঘে কোনরূপ নিশ্চয়তা বা আস্থা নাই। ভোট, গদি, রাজনৈতিক অভিসন্ধি, দলীয় স্বার্থে যেন সবাই অন্ধ। সামগ্রিক জাতীয় স্বার্থ, মান-মর্যাদা ও মানবতাবোধের চেয়েও উদ্দেশ্য সিদ্ধির ফন্দী যেন পাইয়া বসিয়াছে। সমস্ত তুচ্ছতার উপরে বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাবই বর্তমান হঃসময়ের বড় অভাব। এমনটি চলিলে অদূর ভবিষ্যতে বিজ্ঞাতি-তত্ত্বের ঐতিহাসিক গতিপথে বাংলার বুকে, ভারতের এই সমৃদ্ধ পূর্বাঞ্চলে একটি ব্যাপক বিসৃত ক্ষেত্র জুড়িয়া ঐশ্বর্যময় রাষ্ট্রেরই প্রতিষ্ঠা পাইবে এবং ভারতের গণতন্ত্রকে উপহাস করিবে।

স্বাধীনতার পরে ভারতের নৈতিক, আর্থিক ও শুল্ক প্রাণ-সম্পদ শ্রমসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। কিছুকাল পূর্বে ডক্টর লোহিয়া পার্লামেন্টে ব্যঙ্গোক্তি করিয়া নেহেরু সঙ্ঘে মন্তব্য করিয়াছিলেন, “A sickly premier of a sickly nation.” কথাটা উভয় দিক হইতেই সত্য। অসুস্থ জাতি যেমন অসুস্থ নেতৃত্বের জন্ম দেয়, তেমনি অসুস্থ নেতৃত্ব সারা জাতিদেহকে রোগাক্রান্ত করিয়া তুলে। নাবালকত্ব না ঘুচিতেই ভারতের রাষ্ট্র ও রাজনীতি আজ জরাগ্রস্ত, বিভ্রান্ত ও দিক্‌ভ্রষ্ট।

॥ নবীন আলোকোদয় ॥

ভারতের বুকে বর্তমানে যে মানবেতিহাসের মহন চলিয়াছে তাহার ফলে বিষমুগ্ধ কি উঠিবে তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। কিন্তু আমরা প্রত্যয় কবিব বাঙালীর সাধনা ও সংস্কৃতি, তার পরিপূর্ণ অধ্যাত্ম-বিকাশের গতি ও প্রকৃতি বিশ্বমানবের আলো এবং অমৃতের দিগদর্শনের প্রয়োজনেই এই ‘ভারতের মহামানবের সাগর’-সঙ্গমে সর্ব মাহুষের সম্মিলন সম্ভব করিয়া তুলিবার ইঙ্গিত বহন করিয়াই অনতিদূর আগামীকালে অথবা বাংলার পুনরুত্থান আবাহন করিয়া আনিবে। আজকের বাঙালী বহুভাগ্য-হর্যোগ সেই অনাগত ভবিষ্যমান মহাজন্মেরই গর্ভবেদনা। আমাদের অস্বস্ত প্রত্যয়, আর দুইটি বিপ্লবের মধ্য দিয়া ইহা সুনিশ্চিত সংঘটিত হইবে। আমরা তাই নিবিশ্বাস নহি। প্রবর্তক সঙ্ঘগুরুর ভরসার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়াই বলিব : “এই দেশ আমার স্থান। বর্তমান যুগ আমার কাল। আজিকার ছুদ্দিন আমার অবস্থা। তবুও আমি এই বাংলার বুকে নবীন যুগের জ্যোতির্ময় আলোকোদয়ের সম্ভাবনা দেখিতেছি।”

সাময়িক

বছরের সেরা মানুষ :

মহাত্মা গান্ধীর শিষ্য ডঃ মার্টিন লুথার কিংকে ১৯৬০ সালের সেরা মানুষ বলিয়া আমেরিকার 'টাইম' ঘোষণা করিয়াছে। ইহার পূর্বে আর কোন নিগ্রো নেতা এইরূপ মহান সম্মানের অধিকারী হন নাই। 'টাইম'-এর মতে ডঃ কিং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার খেতাজ ও কৃষাজ্য কোটি কোটি নরনারীর নিকট ১৯৬০ সালের নিগ্রো বিপ্লবের প্রতীক। মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা নীতিতে অটল বিশ্বাসী ডঃ কিং ১৯৫৫ সালে আলবানীর নিগ্রো সত্যগ্রহ পরিচালনা করেন।

সভ্য-সহস্রাব্দের জিয়াগঞ্জ সফর :

মুণিরাবাদ-জিয়াগঞ্জের অন্যতম সমাজকর্মী শ্রীমতী সিং লোয়ার সাগ্রহ আহ্বানে প্রবর্তক সজ্জের সহ-সভাপতি শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত কয়েকজন সভ্য কল্পা সহ জিয়াগঞ্জ গমন করিলে সর্বসাধারণ কর্তৃক সাহসে সম্বাদিত হন। জিয়াগঞ্জ ও জিয়াগঞ্জের উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একটি মহতী সভায় শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত প্রবর্তক সজ্জের আদর্শ ও লক্ষ্য এবং বিধিগতী ভারত-সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে ভাবগম্ভীর ও স্বর্ণমণী ভাষায় যে দীর্ঘ ভাষণ দেন তাহা উপস্থিত সকলকেই বিশেষ উত্ত্বল করে। সভায় স্থানীয় শিক্ষিত, অধ্যাপক ও ছাত্রদের উপস্থিতিতে তিলধারণের স্থান ছিল না। সকলেই মনোমুগ্ধের মত শ্রীমতীর হৃদয় ভাষণ শ্রবণ করেন এবং এ বিষয়ে আরও বলবার চেষ্টা আহ্বান জানান।

ভাঙ্গমহলের ঐতিহাসিক সম্পদ অপহৃত :

প্রকাশ, বিশ্বের অমূল্য আত্মীয় আত্মীয় ভাঙ্গমহল হইতে বেশ কিছু পরিমাণ ঐতিহাসিক সম্পদ সম্পত্তি পাকিস্তানে অপহরণিত হইয়াছে। আরও প্রকাশ যে, একজন ভূতপূর্ব টুরিষ্ট গাইড (মুসলমান) এই সম্পদগুলি অপহরণ করিয়াছে। অপহৃত সামগ্রীর মধ্যে মুঘল আমলের পরোয়ানাগুলিই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কিছুকাল পূর্বে এই পরোয়ানাগুলির ইরোজী অস্থাবর করিতে গিয়া গাইডটি ধরা পড়ে ও চূপচাপ থাকে। ইহার পরে সে সাইপ্রেশন করিয়া পাকিস্তানে চলিয়া যায়। সেই হইতে ভাঙ্গমহলের বহু মূল্যবান সম্পদের সন্ধান পাওয়া বাইতেছে না। আমাদের সরকারের প্রশাসনিক দক্ষতার ইহা অমূল্য নমুনা।

গম্ভীরনাথজীর আবির্ভাবোৎসব :

গত ১০ই অগ্রহাণে রান-পূর্ণিমা তিথিতে বারাকপুর ৩৮নং পার্ক রোড, শ্রীঅরুণচন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের বাসভবন 'শরণাগতি'তে দিবসভ্রমণাঙ্গী শ্রীশ্রীযোগিরাজ গম্ভীরনাথজীর আবির্ভাবোৎসব সিদ্ধ সন্তোষোদ্ভব পূজাপাদ শ্রীঅরুণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে ভাষণ দান নিষ্ঠা পরিবেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে পূজাবতি, পাঠ, কীর্তন, ভোগ ও প্রদান বিতরণ কার্য বিনম্র নিষ্ঠায় প্রতিপালিত হয়। ঐ উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল সঙ্গীত-আসর।

পরলোকে দুর্গাদাস সেনগুপ্ত :

বর্ধমান জেলার পাহাড়িয়া নিবাসী রাজবৈদ্য কবিরাজ শ্রীদুর্গাদাস সেনগুপ্ত আত্মকীর্তন গত ১০ই নভেম্বর প্রায় ৮৪ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তিনি সদালাপী, নিরহঙ্কারী এবং সুশান্ত ছিলেন। তাঁহার বহু প্রবন্ধ, কবিতা এবং গান তখনকার দিনের হিতবানী, বলবানী প্রভৃতি বহু সাময়িক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। মানভূম জেলার (বর্তমানে পুন্ড্রিয়া) এখনো তাঁহার বহু গান লোকমুখে প্রচলিত আছে। দীর্ঘকাল তিনি পঞ্চকোটানিপতি মহারাজ বাহাদুরের পুষ্টি-চিকিৎসক ও সভাকবি ছিলেন। পুন্ড্রিয়ার তাঁহার নিজস্ব ডিস-পেনসারী ছিল এবং সেখানে প্রায় ২০ বৎসর অত্যন্ত সুস্বাসের সঙ্গে চিকিৎসা ব্যবসারে লিপ্ত ছিলেন এবং বহু জনহিতকর কাজের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন। অতিথি অভ্যাগত জুহু ও অসহায় কেহই তাঁহার নিকট কখনও বিমুগ্ধ হন নাই। আকস্মিক তিনি পুন্ড্রিয়া হইতে চিকিৎসা ব্যবসা বন্ধ করিয়া দেশে চলিয়া আসেন। নানা কারণে জমিদারীও নষ্ট হইয়া যায়। ভাগ্যের বিড়ম্বনা এমনি যে, এমন মহৎ জীবনকে শেষ কালে অশেষ দুঃখকষ্ট অসহ্য অবসানের মধ্যে কাটাইতে হয়। কিন্তু স্থিতধী পুরুষের মত তিনি নীরবেই সব সহ্য করেন। প্রবর্তক সজ্জের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকিলেও তিনি এই সজ্জের গঠনমূলক আদর্শের প্রতি গভীর প্রভাবান্বিত ছিলেন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র 'আকাশ-গঙ্গা' কাব্যগ্রন্থের কবি ও সাহিত্যিক শ্রীইন্দু গুপ্ত প্রবর্তক সজ্জের দীক্ষিত সন্তান ও সহযোগী সভ্য। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার উদ্ধগতি কামনা করি।

ষ্টেট বাস ও দুর্ঘটনা :

প্রকাশ ১৯৬০ সালের জানুয়ারী হইতে অক্টোবর পর্যন্ত কলিকাতার ষ্টেটবাস ২২৭৪ বার দুর্ঘটনার কবলে পড়িয়াছে। এই ঘন ঘন দুর্ঘটনার অন্য দায়ী কে? ওয়াকিবহাল মহলের মতে ষ্টেট বাসের দুর্ঘটনার একটি প্রধান কারণ হইল বাস্তবিক পোলাযোগ। প্রাইভেট বাসের নিরাপত্তা সম্ভবতঃ বেশী এই জন্য যে, সেখানে চালকের দায়িত্ব ও মনোবোধ অধিক।

সুসাহিত্যিক সুরেশচন্দ্র :

বিগত পৌষ সংক্রান্তিতে প্রবাসী প্রবীণ কবি ও সাহিত্যিক শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদারের ভাগলপুরস্থ 'শক্তি কুটির' বাসভবনে তাঁর ৭৫তম বয়ঃপূর্তি উৎসব অন্তরঙ্গ শ্রীতিপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় বহু জ্ঞানী, জ্ঞানী ও শ্রীমজুমদারের অমুদ্রাণী বন্ধুগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় কবির স্মরণে 'ভারত জননী' ও 'নমো নমো জম্মভূমি' শীর্ষক সঙ্গীত হইল গীত হয়। শুধু কবি-সাহিত্যিক হিসাবে নয়, তাঁর

উৎসব অনুষ্ঠানে -

ইন্দ্রবাসিন্দে

অপরিহার্য !

৮৬, আমহার্ট ট্রিট কলি: ১ ফোন-৩৫-১৩৮৩	৬, নটবর দত্ত রো, কলি: ১২ ফোন-৩৪-২৫৩৩
---	---

মত এমন সংস্কৃতি অনুসারী, যথার্থনিষ্ঠ দেশশ্রেমিক দরদী মানুষও আজকের দিনে বিরল। ভারতে দেবভাবাব পুনরুত্থানকল্পে তাঁর হৃদয় প্রবৃত্ত-প্রয়াস চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। সম্ভবতঃ এ বিষয়ে শ্রীমজুমদারকে প্রবর্তক বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। আমরা এই মহৎ জয়যবান ব্যক্তির নিরাময় শতাব্দী কামনা করি।

নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন :

গত ২৪শে ডিসেম্বর চণ্ডীগড়ে নিঃ ভাঃ বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের ৩২তম বার্ষিক অধিবেশন সূচ্য হয়। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে ৪০ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন। পাঞ্জাবের রাজ্যপাল শ্রীপেট্রম থামু গিল্লাই অধিবেশনের উদ্বোধন প্রসঙ্গে বলেন, 'রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও সাহিত্যের বৈচিত্র্য ও মাধুর্য বাংলা সাহিত্যকে ভারতবর্ষের সাহিত্য-জগতে শীর্ষস্থান দিরাছে।' অধিবেশনের মূল সভাপতি শ্রীদিলীপকুমার রায় সাহিত্যে ভারতের সনাতন আদর্শ গ্রহণের আহ্বান জানান। সম্মেলন-সভাপতি শ্রীমোহন দাস বাংলা ও পাঞ্জাবের যুগ-যুগ মৈত্রীর কথা উল্লেখ করেন। হরুর পাঞ্জাবে এই সম্মেলনের অধিবেশন প্রশংসনীয়।

ছন্দগীতিকার সমাবর্তনোৎসব :

বিগত ২৫-এ ডিসেম্বর সহস্রাবিক শ্রোতৃবর্গের উপস্থিতিতে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে ছন্দগীতিকার ত্রয়োদশ বার্ষিক সমাবর্তন ও পুরস্কার বিতরণী উৎসব নাড়ঘরে অনুষ্ঠিত হয়। বিচারপতি শ্রীকমলপ্রসাদ মিত্র ও নারীশিক্ষার প্রধান পরিদর্শিকা শ্রীমতি শান্তি দত্ত যথাক্রমে প্রধান অতিথি ও সভানেত্রী আসন অলঙ্কৃত করেন। উদ্বোধন করেন পুলিশের ইনস্পেক্টর জেনারেল শ্রীউপানন্দ মুখার্জী। এই বৎসর বাণী চক্রবর্তী, বুলবুল ঘোষ ও অনুবাধা মুখার্জী সঙ্গীতশ্রী এবং দেববানী গুপ্ত ও রত্না বসু 'ছন্দগী' ডিমোমা লাভ করেন। উৎসবের মুখ্য আকর্ষণ ছিল কবিগুরু নৃত্যনাট্য "জামা"। ছন্দগীতিকার অগণপুত্র অধ্যক্ষ ননীপোপাল মিত্র ও অধ্যাপক হিমন্ত রাবচৌধুরীর যুগ্ম পরিচালনার নাটকটি বিশেষ সাফল্য অর্জন করে। অন্তিন্যে উৎকর্ষতার জ্ঞান শরীট।

দাশগুপ্ত, নলিনা ভট্টাচার্য্য ও সঙ্গীতের জ্ঞান রূপী মতিলালকে "হৃদীনা-স্মৃতিপদক" প্রদান করা হয়। এই হৃদয়সিক্ত প্রতিষ্ঠানটি দরকারী অনু-মোদিত এবং প্রয়াগ সঙ্গীত ও নৃত্যের শিক্ষা ও পরীক্ষা কেন্দ্র।

মাতা শ্রীজুগাপুরী :

পবিত্রতার প্রতিমূর্তি, মাতৃদেব জীবন্ত প্রতিচ্ছবি সন্ন্যাসিনী মাতা শ্রীজুগাপুরী দেবী বিগত ২৭-এ কার্তিক জামা চতুর্দশী মহানিশায নাথনোটিং ধার প্রাপ্ত হন। ১৩০৩ সালের শারদীয়া মহানবমীতে তিনি শ্রীধাম শান্তিপুরে আবির্ভূতা হন। অসামান্য মহীয়সী মহিলাদের মধ্যেও তিনি অসামান্য ছিলেন। কর্তব্যপুত্র পবিত্র তাঁর জীবন নারীজগতের চিরদিন আদর্শস্থানীয়া হইয়া থাকিবে। শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের আদর্শ ব্যাপ্তি ও উন্নত আদর্শ এই কর্তৃনিষ্ঠ মহাজীবনের চিরদিন সাক্ষ্য হইয়া থাকিবে। তিনি জন্মগত মা ছিলেন। এই দেবী-মানবীর আদর্শ জীবন উদীয়মান তরুণ-তরুণীর নিত্য-অনুধ্যায়, ইহাতে সন্দেহ নাই।

পাকিস্তানের পাকঘর :

কলিকাতার সাম্প্রতিক গোলাবোনের সময় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি সহানুভূতিপরিচয় হইয়া পাকিস্তানের রাজ্যপাল তাঁহার রতনশালার একাংশ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন উক্ত সম্প্রদায়ের ষাট প্রান্তর করবার জন্ত। হুমবাহ, কিন্তু শুধু একটি কথা স্মরণ—আমাদের বঙ্গাল খেদা আন্দোলনের কালে যখন দলে দলে নিপীড়িত মানুষ পশ্চিম বাংলায় আসিয়া ভীড় জমাইয়াছিল তখন তাঁহার এই উদার স্বয় কোথায় ছিল? শিরালদহ টেনে যে মানুষগুলি পশুর মত বাস করে তাহাদের জন্তও তাঁহার এমন মর্মগ্রাহী বেদনা তো প্রকাশ পায় নাই। জানিতে ইচ্ছা করে, বাঙ্গালী ও হিন্দু—ইহাই কি তাহাদের অপরাধ? রাজ্যপাল তাঁহার পাকঘর ছাড়িয়া দিন আপত্তি নাই, সমগ্র বাংলাকে যেন পাকিস্তানে পরিণত না করেন, ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীলক্ষ্মী মজুমদার

সকল রকম বেনারসী সাড়ী, শাল, আলোয়ান ও হোসিয়ারী পোষাক বিক্রেতা

রামকানাই যামিনীরঞ্জন পাল প্রাঃ
লিঃ

২১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড (বড়বাজার) কলিকাতা ফোন : ৩৫-২৩০৩

সর্বপ্রকার দেশী ও বিলাতী ঔষধের জন্ম

রামকানাই মেডিক্যাল স্টো

১২৮/১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৪ ফোন : ৫৫-৩৭১১

সম্পাদক : শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি. এ. কর্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত।

প্রবর্তক প্রিন্টিং এণ্ড হাফটোন লিমিটেড, ৫২/৩ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীকৃষ্ণচরণরায় কর্তৃক মুদ্রিত।



৪৮ বর্ষ ১১শ সংখ্যা

ফাল্গুন, ১৩৭০

জীবনের আলো

একটি নব পথের কথা বলিতেছি। প্রকৃতপক্ষে ইহা কিন্তু নূতন পথ নহে—অতি পুরাতন পথ। কিন্তু যেহেতু এই পথে কেহ বড় একটা অগ্রনয়ন হইতে চাহে নাই, সেই হেতু ইহা আজিও নব পথ বলিয়া প্রচার্য। বহু পথ ধরিয়া, বহু বিধান মানিয়া মানুষ চলিয়াছে, কিন্তু কোথাও কি অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে? তাই বলি, একবার এই অতি প্রাচীন যাত্রীশূন্য পথে যাত্রা করিবা দেখিতে দোষ কি অভীষ্ট পূরণ হয় কিনা? ভারতের শাস্ত্র-নির্দিষ্ট পথ দুইটি—একটি ভোগ, অপরটি মোক্ষ। মানুষ ইহা হইতে বহু পথের আবিষ্কার করিয়াছে: কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পাঞ্চদ্বয়ে যে অব্যর্থ পথনির্দেশ আজিও ঝঙ্কত হইতেছে, তাহা যেন কেহ শুনিয়াও শুনিতেছে না। তিনি কি বলেন নাই—“নৈতে স্মৃতি পার্শ্ব জানন্ যোগী মুহতি কশ্চন। তস্মাৎ সর্কেষু কালেষু যোগযুক্ত ভবাজ্জুন ॥” ইহার অর্থ—ভোগ ও মোক্ষ দুই পথই নয়। যোগী ইহা জানিয়া যেন মুগ্ধ না হয়। হে পার্শ্ব, সর্বকালে এই হেতু তুমি যোগযুক্ত হও। প্রচলিত সর্ববাদীসম্মত মতবাদের প্রতিবাদে এতবড় কথা আর কেহ কখনও বলিতে সাহস করেন নাই। এই যোগ তথাকথিত ধর্ম নয়। বলিযাছি—ধর্মের প্রচলিত লক্ষ্য হয় ভোগ, না হয় মোক্ষ। ভোগ ও মোক্ষের লক্ষ্য ছাড়িতে হইলে ধর্মত্যাগ অবশ্যস্বাবী—এই নব-পথ-নির্দেশক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সে কথাও বলিয়াছেন—“সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য”—তাঁহার গীতারই ইহা মহাশ্লোক। গীতার যোগ আর ঋষি পতঞ্জলির যোগ এক নহে। পতঞ্জলির যোগের লক্ষ্য নিকিরকল্প সমাধি—যাকে বলা হয় কৈবল্য অর্থাৎ মুক্তি বা মোক্ষ। আর গীতার যোগ জীবনের লক্ষ্য। সে যোগ “মামেবৈম্যসি যুক্তৈবমাআনন্ম মৎ-পরায়ণম্”। একজন আর একজনকে পাইতে হইলে পরস্পরের আত্মা পরস্পরে সমাহিত করিতে হইবে। এই যোগের উপর পরস্পর সম্মিলিত জীবন-সংহতির লক্ষ্য ভোগ বা মোক্ষ যখন নহে, তখন তদতিরিক্ত অল্প কিছু হইবে। সে অল্প কিছু বলিতে আর কি বুঝাইতে পারে, পরস্পরের মিলনের ঐকান্তিক শাস্ত্রতত্ত্ব ও আনন্দ ব্যতীত? এইরূপ সুখ ও আনন্দের আশ্রয় জীবন ভিন্ন আর কি হইবে? আনন্দ তাই জীবনেরই। যে আনন্দ শাস্ত্রতত্ত্ব ও অনন্ত; তাহা জীবনের সর্ববিধ অতিব্যক্তির মধ্যেই নিহিত থাকিবে। যোগ অশাস্ত্রতত্ত্ব ও অনিত্য সুখকে প্রদায় দেয় না, উহা অমৃতই সঞ্চয় করে। সে অমৃত জীবনের বহু পর্ব—শিক্ষা, সমাজ, শিল্প, বাণিজ্য, রাষ্ট্র প্রভৃতি। যোগপ্রতিষ্ঠিত এই জীবনবাদ ভারতে আজিও অনাদৃত। ইহাই কিন্তু অমোঘ ও অদ্রাস্ত পথ। জাতীয় অভ্যুত্থান এই পথেই অবধারিত সম্ভব হইবে। আমার ইহাই ক্রম প্রত্যয়। ভারতের তরুণদেরও আগি এই প্রত্যয়ে প্রত্যয়বান হইতে বলি ॥ (পুরাতন নবসংজ্ঞ হইতে)

সংবাদপত্র শ্রীমতিলাল

আত্মেদ

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ (প্রথমঃ অষ্টকং । সপ্তত্রিংশৎ সূক্তং ।) ষষ্ঠী ঋক্

(সজ্জগুরু শ্রীমত্তিলালের জীবন-ভাষ্য অনুসরণে)

শ্রীঅনিলবরণ তর্কবেদান্ততীর্থ

কো বো বর্ষিষ্ঠ আ নরো দিবশ্চ গ্রাম্চ ধৃতয় ।

যং সীমন্ত ন ধুত্ব ॥ ৬ ॥

অর্থ—“দিবঃ চ” (দ্যলোক এবং) “গ্রঃ চ” (ভূ-লোকেরও) “ধৃত্বঃ” (কম্পনকারী) “নরঃ” (হে নেতৃ-বায়ুসকল) “বঃ” (আপনাদের মধ্যে) “আ” (সর্বতোভাবে) “কঃ” (কে) “বর্ষিষ্ঠ” (বুদ্ধতম) “যং” (যাহা হইতে) “সীং” (সর্বদিক) “অন্তং ন” (বৃক্ষাণ্ডের ছায়া) “ধুত্ব” (পরিচালিত হয়) ॥ ৬ ॥

সরলার্থ—দ্যলোক ও ভুলোকেরও কম্পনকারী হে নেতৃবায়ুসকল ! আপনাদের মধ্যে বরণীয় সর্বশ্রেষ্ঠ জন কে ? যাহা হইতে বৃক্ষাণ্ডের ছায়া সর্বদিক পরিচালিত হয় ? ৬

বিশদার্থ—শব্দতরঙ্গের কম্পনেই অন্তরীক্ষ লোকে তান্মাত্রিক বায়ু—যাহাই মরুদ্বেবগণ নামে অভিহিত—তাহার উদ্ভব। আবার তান্মাত্রিক বায়ুর কম্পনে স্থূল বায়ুর সৃষ্টি। দ্যলোক এবং ভুলোকে কম্পমান স্থূল বায়ু-তরঙ্গই প্রবাহিত। ঋষি এই সংখ্যাভীত বায়ুতরঙ্গের মধ্যে সেই একেরই অহুসন্ধান করিতেছেন—যার দ্বারা এই সকল বায়ু পরিচালিত। ঋষি তাই প্রশ্ন তুলিয়াছেন কে সেই সর্বশ্রেষ্ঠ বরণীয় পুরাণ পুরুষ—যিনিই সবার নিয়ন্তা ? “বর্ষিষ্ঠঃ” পদে বহুর মধ্যে একের সন্ধানের ভাবই নিহিত আছে ; এবং “যং” পদে সেই একজন্য স্বরূপ জ্ঞানকে জ্ঞানার আগ্রহ প্রকাশ করে। ঋষিমনে তাই প্রশ্ন উঠিয়াছে—কে সেই জন ? “কো বো বর্ষিষ্ঠঃ আ নরো” থাকে উপনিষদের ঋষি প্রশ্নাম জ্ঞানাইয়া বলিতেছেন—“নমস্তে বায়ো । হ্রমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি । হ্রমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিস্যামি । ঋতং বদিস্যামি । সত্যং বদিস্যামি ।”—ব্রহ্মরূপী পরোক্ষ বায়ুকে নমস্কার। হে প্রত্যক্ষ বায়ু তোমাকে নমস্কার। তুমিই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম। তোমাকেই ঋতস্বরূপ বলিব। তোমাকেই সত্যস্বরূপ বলিব। বহির্জগতে যে বায়ু, অন্তর্জগতেও সেই বায়ু। একই বায়ু হিরণ্যগর্ভ ও প্রাণবায়ুরূপে অবস্থিত। হিরণ্যগর্ভ বায়ুই কর্মফল ও সংস্কারের আশ্রয় এবং সপ্তদশ অবয়ববিশিষ্ট লিঙ্গশরীরের উপাদান। লিঙ্গশরীর পঞ্চভূত, দশ ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও অন্তঃকরণ। উপপঞ্চাশ বায়ু ইহারই বহিঃপ্রকাশ। সমষ্টি লিঙ্গশরীরই হিরণ্যগর্ভ দেহ এবং সমষ্টি বুদ্ধিই ইহার উপাধি। এই হিরণ্যগর্ভ বায়ুই সমষ্টিরূপে সর্বত্র ব্যাপ্ত এবং ব্যষ্টিরূপে প্রতি জীব-দেহে প্রাণ, অপাণ, ব্যান, সমান ও উদান এই পঞ্চ মুখ্য প্রাণরূপে নিহিত। যাহা কার্য্য, তাহা কারণের দ্বারা ব্যাপ্ত ; যাহা কিছু স্থূল, তাহা সূক্ষ্মের দ্বারা ব্যাপ্ত ; যাহা পবিচ্ছিন্ন, তাহা ব্যাপকের দ্বারা ব্যাপ্ত ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধ অহুমান। এই অহুমান দ্বারাই অহুপ্রাণিত হইয়া ঋষি প্রশ্ন তুলিয়াছেন—“কো বো বর্ষিষ্ঠঃ আ নরো ।”

বেদে “ন” শব্দ উপমান বাচক। “অন্তং ন” বলিতে আচার্য্য সামগ্ৰ্য বলেন “বৃক্ষাগ্রমিব”। সৃষ্ট ভৌতিক পদার্থসমূহের মধ্যে বৃক্ষাগ্রই শ্রেষ্ঠক নিবন্ধন উপমেয় অর্থেই এখানে প্রযুক্ত।

এ কালের বঙ্গসংস্কৃতি

কালিদাস মুখোপাধ্যায়

আলোচনার প্রারম্ভেই প্রশ্ন করা যেতে পারে— সংস্কৃতি কাকে বলে? সংস্কৃতির স্বরূপ কি? নিজে কৈ প্রকাশ করবার জন্তু মাহুঘের ক্রন্দন অস্তুবিহীন। মাহুঘ চায় নিজে কৈ প্রকাশ করতে, প্রভুত্ব বিস্তার করতে, বিজয়ী হ'তে। এই প্রকাশের আনন্দ-বেদনায় মাহুঘ হয় অধীর, সৃষ্টির ব্যাকুলতা তাকে করে তোলে কর্মমুগ্ধব। তার ফলে সাহিত্য ও সমাজে, ধর্ম ও শিল্পে, ইতিহাস ও রাজনীতিতে আসে রূপান্তর—আসে নতুন সৃষ্টির জোয়ার। মাহুঘের স্বপ্ন প্রতিভার এই অভিব্যক্তিই তার সংস্কৃতি।

বাঙালীর সবচেয়ে বড় গর্ব ও গৌরবের বস্তু হলো তার সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি সমগ্র ভারতীয় সংস্কৃতি হ'তে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বৈদিক যুগ হ'তে বাঙালী স্বাধীন ও স্বতন্ত্র পথ ধরে জীবন চর্চা করেছে। তার সংস্কৃতি তার জীবন-সাধনার সাক্ষ্য। বাঙালী কল্পনাপ্রবণ, বাঙালী ভাবুক ও আদর্শনিষ্ঠ। চিন্তকে সে চিরদিনই বিস্ত্র আপেক্ষা শ্রেয় জ্ঞান করেছে। দুঃখ বেদনা বন্ধন পীড়নের মধ্যে সে নৃত্যঙ্গী আশার সঙ্গীত গৈয়েছে, দৈত্বের মধ্যে একেছে স্বর্গ হ'তে নিয়ে আসা বিশ্বাসের ছবি। মাটির মগতায় ভরা সংসারকে সে অস্বীকার করে নি, সংসারের সহস্র বন্ধনের মধ্যেই সে চেয়েছে মুক্তি, সসীম-সত্তার মধ্যে উপলব্ধি করতে চেয়েছে অনন্তকে—অসীমকে। বাংলাদেশের জল ও মাটি, তার প্রেমধর্ম ঘবের মাহুঘকে— বাপ মা ভাই বোনকে রূপান্তরিত করেছে দেবদেবীতে; স্নেহ প্রেম ও প্রীতির মধ্য দিয়ে তার পূজা লাভ করেছে চরিতার্থতা। তাই বাঙালী সংসার ও সন্ন্যাস, ভোগ ও ত্যাগের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন করতে পেরেছিল। হাজার বছরের পুরান বাংলা ভাষায় লেখা বৌদ্ধ গান ও দৌহা, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, বৈষ্ণবপদাবলী, আগমনীগান, হরগৌরীর কাহিনী, কবিগান ও ব্রতকথা তার সাক্ষ্য বহন করেছে।

নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে অপরের সংস্কৃতিকে গ্রহণ

করতে বাঙালী কখনো কুণ্ঠাবোধ করেনি। বাঙালী প্রাণের কথা—

“দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলাবে
যাবে না ফিরে।”

বাঙালী এক হাতে অপরের কাছ থেকে গ্রহণ করেছে এবং আর এক হাত দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছে। নিজের ঐতিহ্য অটুট রেখেই বাঙালী দেশের সঙ্গে বিদেশের, অস্তরের সঙ্গে বাহিরের, ধর্মের সঙ্গে কর্মের মিলন ঘটিয়েছে। এক কথায় বলা যেতে পারে, মিলনের বাণীই বঙ্গসংস্কৃতির মর্মবাণী।

একদা আর্থসভ্যতার বিজয় অভিযান চলেছিল সমগ্র ভারতে, কিন্তু বাংলা দেশেই স্তম্ভবত: আর্থধর্ম ও সংস্কৃতি বঙ্গসংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে সবচেয়ে ফলপ্রসূ হয়েছিল। বাঙালী গর্বোন্নত আর্থসংস্কৃতির কাছে নতজানু হয় নি, নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে সে আর্থ-সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে দিয়েছে নবরূপ। বৌদ্ধধর্মের প্রাবনে সে ভেসে যায় নি, মহাবান ধর্মমতকে সে রূপান্তরিত করেছিল সহজিয়া ধর্মে। মুসলিম সংস্কৃতিকে সে সহজে পথ ছেড়ে দেয় নি, তাকে পরিবর্তিত করেছে। এই পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে নিজের সংস্কৃতিকে করেছে সমৃদ্ধ। সত্যপীর, মানিকপীর, কালুগাজী, বড়গাজী পূজা ও পাঁচালী তার প্রমাণ।

মুসলিম ধর্ম ও সংস্কৃতির উপর বঙ্গসংস্কৃতির প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায় মুসলমান কবিদের রচিত বৈষ্ণব পদাবলীতে, ‘গোপীচাঁদের সন্ন্যাস’, ‘গোরক্ষবিজয়’, এবং ‘মহাভরত’ রচনায়। হোসেন শাহের সেনাপতি লস্কর পরাগল খানের আগ্রহে কবীন্দ্র পরমেশ্বর ‘ভারত-পাঁচালী’ অর্থাৎ মহাভারত রচনা করেন। এই মহাভারত পরাগল খানের সভায় প্রত্যহ পঠিত হতো। পরাগল খানের পুত্র ছুঁটি খান শ্রীকর নন্দীর দ্বারা জৈমিনি ভারতের অষ্টমোদ পর্ব অনুবাদ করিয়েছিলেন। মুসলমান কবিদের দ্বারা রচিত গদ্যস্রোতে, গৌরাঙ্গবিষয়ক পদাবলীতে,

যখন হরিদাসের প্রেমসাধনার ভিতর মুসলিম সংস্কৃতির উপর বঙ্গসংস্কৃতির প্রভাব সুস্পষ্ট।

বাঙালী বন্ধন-অসহিষ্ণু—সে চিরবিদ্রোহী। সাহিত্য ও শিল্পে, সমাজ ও রাজনীতিতে, ধর্ম ও কর্মে বাঙালী কোন প্রথা, শাস্ত্রনির্দিষ্ট কোন বিধিবিধান স্বীকার করে নি। সুতরাং বাঙালীকে বলা চলে ত্রাত্য—তার সাধনা বাউলের সাধনা, সমস্ত বন্ধন-সীমার বাইরে তার জয়যাত্রা। বঙ্গসংস্কৃতির নতুন নতুন মূর্তি পরিগ্রহ করেছে যুগের পর যুগ ধরে। কিন্তু অগ্রগতির কোন এক সীমায় এসে তার সাধনা বিরামলাভ করে নি। বাঙালী নতুনের দিশারী, গতিশীলতা তার জীবনবেদের বনিয়াদ। পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পথে বাঙালী এগিয়ে গেছে, আর তার কণ্ঠে বারংবার ধ্বনিত হয়েছে “হেথা নয়, অস্ত্র কোথা, অস্ত্র কোথা, অস্ত্র কোথানে।”

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তুর্কি অভিযান শুরু হবার পর বাংলা সাহিত্য ও সমাজে নেমে আসে একটা অন্ধকার যুগ। সে যুগের রুচি-বিস্কৃতির পরিচয় বহন করেছে চতুর্দশ শতাব্দীতে লেখা বড়ু চণ্ডীদাসের “শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন”। ষোড়শ শতাব্দীতে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে অন্ধকারের অবসান হলো, বাঙালী আবার খুঁজে পেল তার প্রাণধর্ম। তার কর্মশক্তি ও তার স্বজনীপ্রতিভা বাংলা সংস্কৃতিকে করলো অভাবিতরূপে সমৃদ্ধ। চৈতন্যদেবের আমলেই বাঙালী প্রথম সর্ব-ভারতীয় ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করতে হ’ল সক্ষম। মহাপ্রভু এবং তাঁর শিষ্যদের প্রযত্নে আসাম ও উড়িষ্যা বৈষ্ণবধর্মে প্রাণিত হলো, দক্ষিণ এবং পশ্চিম ভারতেও অনেকদূর পর্যন্ত বৈষ্ণবধর্ম হলো প্রসারিত। এরপর ইংরেজ আমলে এলো বাঙালীর জীবনে সবচেয়ে গৌরবময় যুগ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে বাঙালীর জীবন-দৃষ্টিতে যে রূপান্তর হলো বাঙালীর ইতিহাসে তা তুলনাবিহীন। পাশ্চাত্যের অভিঘাতে বাঙালীর স্পষ্ট ও স্তিমিত প্রাণশক্তি উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। বাঙালী নতুন করে উপলব্ধি করলো নিজে—উপলব্ধি করলো তার ভাবুকতা, আধ্যাত্মিকতা এবং আদর্শনিষ্ঠাকে। পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে আশ্রয়

করে বাঙালী বের হয়ে পড়লো নবজীবনের অতিসারে। এর ফলে বাংলাদেশের শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম ও রাজনীতিতে এলো বিপ্লব—বঙ্গসংস্কৃতির হলো নবজন্ম।

ষোড়শ শতাব্দীর বঙ্গসংস্কৃতি যতই গৌরবের হোক না কেন, সে-সংস্কৃতির ধারা ছিল একটি যাত্রা। এ-যুগের সংস্কৃতিতে ছিল বৈচিত্র্যের অভাব এবং এই সংস্কৃতি ছিল মোটামুটি বাংলার সীমানার মধ্যেই আবদ্ধ। পাশ্চাত্যের প্রচণ্ড আঘাতে স্বল্পকালের অর্গল ভেঙে পড়লো, একলা ঘরের আড়াল ভেঙে বাঙালী এসে দাঁড়াল বৃহৎ জীবন ও জগতের প্রাণগতলে। একটা নতুন ভাবদর্শ তাকে করে তুললো প্রাণচঞ্চল। বাঙালীর জীবন-নিষ্করের যখন স্বপ্ন ভঙ্গ হলো তখন বাঙালীর কণ্ঠে ধ্বনিত হলো :

“আমি ঢালিব করুণা-ধারা,
আমি ভাঙিব পাষণ-কারা,
আমি জগৎ প্রাণিয়া-বেড়াবো গাহিয়া
আকুল পাগল-পারা।
কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া,
রামধনু ঝাঁকা পাখা উড়াইয়া
রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া,
‘দিব রে পরাণ ঢালি।’”

আদর্শের জন্ম প্রাণ দিতে বাঙালী কোনদিনই কার্পণ্য করে নি। ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে বাঙালী দধীচির মতো তিল তিল করে আশ্রয়দান করেছে, নিজেকে নিঃশেষে দান করেছে জাতীয় উন্নতি ও স্বাধীনতার জন্ম। এই ত্যাগ ও দুঃখবরণের মধ্য দিয়েই একদা বাঙালী পেয়েছিল সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে নেতৃত্বের অধিকার।

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি বাঙালীকে দিশাহারা করে নি, তাকে করেছিল নবজীবন-রসায়ণে সঞ্জীবিত। পাশ্চাত্য প্রভাবে বাংলাদেশে যে নতুন সংস্কৃতির জন্ম হলো তার একদিকে ছিল রোমাণ্টিসিজিমের প্রভাব এবং আর একদিকে ছিল জাতীয়তাবোধ ও জীবননিষ্ঠার প্রভাব। তাই এ কালের সংস্কৃতিতে প্রাধান্য লাভ করলো জীবন-নিষ্ঠা—মানবপ্রীতি ও মর্ত্যপ্রীতি।

বাঙালী ত্রতবদ্ধ হলো জীবন ও জগতকে নতুন করে গড়ে তুলতে—স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বাধীনতার জয় তার অন্তরে জাগলো প্রচণ্ড বেগের আবেগ। মধ্যযুগেই বাঙালী মানুষকে দেবতার আসনে বসিয়েছিল, ঘরের ছেলের মধ্যে দেখেছিল বিশ্বভূপের ছায়া, শ্রাম ও শ্রামার সমন্বয় সাধন করেছিল, হরি এবং হরের মধ্যে ভেদাভেদ বিলুপ্ত করে দিয়েছিল এবং বলেছিল ‘অভেদে যেকোন ভঞ্জে সেই ভক্ত ধীর।’ মর্ত্যপ্ৰীতি ও মানবপ্ৰীতির উদ্বোধনে বাঙালী মানুষের মধ্যে খুঁজে পেল দেবতাকে এবং দেবতার মধ্যে প্রত্যক্ষ করলো মানুষের মহিমা—

‘দেবতারে বাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে বাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে; আর পাবো কোথা?
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।’

এ যুগে মানবনিষ্ঠা বাঙালীর মনে এমন প্রভাব বিস্তার করলো যে, মানুষের মধ্যে দেবতার প্রতিষ্ঠা করাই বাঙালী চরম আদর্শ বলে মনে করলো। হীন ও পতিতের মধ্যেও সে দেখতে পেল দেবতার অপার মহিমা। এখন তার আদর্শ হলো জীব দয়া নয়—যজ্ঞ জীব তজ্ঞ শিব—শিব জ্ঞানে জীবের সেবা:

“বহুদূরে সমুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীব প্রেম করে যেই জন সেই জন দেবিছে ঈশ্বর।”
এই আদর্শ বাঙালীর চিন্তায় সম্পূর্ণ নতুন। রবীন্দ্রনাথ এই নতুন মূল্যবোধের কবি। তিনি কৃষক ও মজুরের মধ্যেও পেলেন দেবতাকে—

“তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙ্গে
করছে চাষা চাষ;
পাথর ভেঙ্গে কাটছে যেথায় পথ,
খাটছে বারো মাস।”

এখানেই শেষ নয়। কবিব তাপসকুমার পতিতার মধ্যে দেখেছেন দেবতার কোন নতুন প্রকাশ—

“আনন্দময়ী মুরতি তোমার,
কোন দেব তুমি আনিলে দিবা?
অমৃতসরস তোমার পরশ
তোমার নয়নে দিব্য বিভা।”

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে জীবননিষ্ঠা ও বস্তুনিষ্ঠার পরিচয় থাকলেও সেই সাহিত্যের আসরে জাঁকিয়ে বসেছিল দেবদেবীর দল—তাদের মহিমা প্রচারই ছিল চরম লক্ষ্য। মানুষের মহিমা ও গৌরব প্রচারের প্রয়াস প্রাচীন সাহিত্যে কোথাও দেখা যায় নি। প্রাচীন যুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্রের রচনায় সর্বপ্রথম মানুষের স্তীর্ণ প্রকাশ দেখা গেল। ভারতচন্দ্র চেয়েছিলেন সাহিত্যে মর্ত্য নরনারীর জীবন-কথা বলতে, কিন্তু সোজাসুজি তা তিনি করতে পাবেন নি। তিনি দেবদেবীর আবরণে মানুষের কথা লিখেছেন তাঁর ‘অম্বদামঙ্গল’ কাব্যে। ভারতচন্দ্র এই মর্ত্যবাসী নরনারীর সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনার কথা সাহিত্যে রচনা করতে পারেন নি বলে তাঁর ক্ষোভের অন্ত ছিল না:

“হর লয়ে নরলীলা করিবারে চাই।

তাহে হয় গঙ্গাগোল এ’বড বালাই।”

ভারতচন্দ্র (১৭১২-১৭৬০) সাহিত্যে যা করতে পারেন নি, ইংরেজ আমলের প্রথম কবি ঈশ্বর গুপ্তের (১৮১২-৫৯) রচনায় তা সম্ভব হলো। বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বরগুপ্তই সর্বপ্রথম সাহিত্যে মানুষ ও বাস্তব জগতকে মর্যাদার আসন দিলেন। ঈশ্বরগুপ্তের পর মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের লোকোত্তর প্রতিভায় বাংলা সাহিত্যে শুরু হলো মানুষের অব্যাহত জয়যাত্রা।

স্বদেশ ও স্বজাতিপ্ৰীতি ইংরেজপূর্ব যুগে ছিল অজ্ঞাত ও অপরিচিত। ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় স্বদেশ ও স্বজাতি-প্ৰীতি ধরা পড়লো। ‘দেশের কুকুর মাগি বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া’ ঈশ্বর গুপ্তের এই উক্তি মধ্য তাঁর সংকীর্ণ দেশপ্ৰীতির পরিচয় পাওয়া যায়। ঈশ্বর গুপ্তের পর রত্নলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮২৭-৮৭) মধ্যে ফুটে উঠলো স্বাধীনতা-প্ৰীতি। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত ‘পদ্মিনী উপাখ্যান’ কাব্যে ধ্বনিত হলো:

“স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে!

কে বাঁচিতে চায়?

দাসত্ব শৃংখল কে পরিবে পায় রে।

কে পরিবে পায়?”

নতুন জীবন-রসায়নে সজীবিত মধুসূদন দত্তের

(১৮২৪-৭০) রচনার প্রধান উপজীব্য ছিল স্বদেশ ও স্বজাতি-প্ৰীতি। 'মেঘনাদ বধে'র ষষ্ঠ সর্গে মেঘনাদ বিতীৰ্ণকে বিকৃত করে বলেছে :

“শাস্ত্র বলে, গুণবান যদি

পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি

নির্গুণ স্বজন শ্রেয়, পর পর সদা।”

পুত্রশোকাভূর রাবণের কণ্ঠে মধুসূদন বলেছেন :

“রিপুদলবলে দলিয়া সমরে,

জন্মভূমি রক্ষা হেতু কে ডরে মরিতে ?

যে ডরে, ভীক সে মূঢ় ; শত ধিক্ তারে।”

মধুসূদনের এসব উক্তি মধ্য পাক্ষাত্যের সংকীর্ণ জাতিপ্রেমের পরিচয় স্পষ্ট নয়। বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-৯৪) সমস্ত সংকীর্ণতা পরিত্যাগ করে দেশপ্ৰীতিকে বিরাট মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করলেন, দেশপ্ৰীতিকে তিনি স্থাপিত করলেন ধর্মের আসনে। এই দেশপ্ৰীতির সাধনাই সাফল্য ও সার্থকতা লাভ করেছে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬১-১৯০৩), নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯) এবং রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) সাহিত্য প্রতিভায়। এই দেশপ্ৰীতি-ধর্মই স্বামী বিবেকানন্দ, উপাধ্যায় ব্রহ্মবাক্তব, সুরেন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র, দেশবন্ধু, নেতাজী এবং শ্রীমতিলাল প্রমুখের জীবন-সাধনায় মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। দেশপ্ৰীতির আঁহানেই বাংলাদেশে স্কুল হয় শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের প্রয়াস, আরম্ভ হয় ধর্ম ও রাজনৈতিক আন্দোলন। রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) আন্দোলনের সংগ্রামে ত্রুতী ছিলেন। ঋতুধর্মের প্রাবন থেকে তিনি হিন্দুধর্ম ও সমাজকে রক্ষা করবার ক্ষমতা ধর্ম-সংস্কারে উদ্যোগী হন। কিন্তু তিনি ছিলেন ঋতুীয় চারিত্র্যনীতিতে মুগ্ধ ও বিমোহিত ; ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-৮৪) ব্রাহ্মধর্মের আবরণে প্রকৃতপক্ষে ঋতু-ধর্মই প্রচার করেছিলেন। সমগ্র তখনও অসম্পূর্ণ ও অসঙ্গত। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার আলোকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অপূর্ব ভাবসম্বন্ধ ঘটলো ‘ধর্মতত্ত্বে’। বৃত্তি-নিচয়ের সামঞ্জস্যকে বঙ্কিমচন্দ্র ধর্ম বলে প্রচার করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই তত্ত্বে প্রাণ দিয়েছেন তাঁর “শ্রীকৃষ্ণচরিত্র” গ্রন্থে। বঙ্কিমচন্দ্র যে ধর্মের স্বপ্ন দেখেছিলেন তা

জীবনের সত্য হয়ে উঠলো রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মধ্যে। এ’বার হিন্দুধর্ম আন্দোলনের পথ পরিত্যাগ করে হয়ে উঠলো সংগ্রামমুখী, বের হয়ে পড়লো দিগ্বিজয়ের অভিযানে।

উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগৃতির মূলে ছিল একটা প্রচণ্ড আশাবাদ। এই আশাবাদের বাণীমূর্তি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ। স্বামীজী বলেছেন—

“পূজা তার সংগ্রাম অপার

সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা।”

স্বামীজীর জীবন ও বাণীতে বাঙালী হলো নির্ভর নির্ভীক, হতাশা করলো জয়। রবীন্দ্রনাথের প্রাণ এই নতুন আশাবাদ। তিনি সারা জীবন ধরে আমাদের স্তম্ভিয়েছেন আশা ও আশ্বাসের কথা। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় কবি প্রশ্ন করেছিলেন—

“নূতন উবার স্বর্গদ্বার

খুলিতে বিলম্ব কত আর ?”

তিনি আশা করেছিলেন বীরের রক্তস্রোত, মাতার অশ্রুধারা ব্যর্থ হবে না, পাপ ও অন্যায়ের অবসান হবে, ধরণীর ধূলায় নেমে আসবে স্বর্গরাজ্য। কবির স্বপ্ন সফল হয় নি, তবুও তিনি হতাশ হন নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিতীৰ্ণকার মধ্য দাঁড়িয়ে কবি জীবনের শেষ প্রাশ্নে এসে আমাদের আবার নতুন করে শোনালেন আশার বাণী। কবি লিখেছেন, “আজ আশা করে আছি, পরিত্রাণ-কর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যলঙ্ঘিত কুটীরের মধ্যে; অপেক্ষা করে থাকব, সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্বদিগন্ত থেকেই।... আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আশ্রিত্য হয় তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের স্বর্ষ্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মহাযুদ্ধের অন্তহীন প্রতিকাবহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ বলে মনে করি।”

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী আশাবাদে অল্পপ্রাণিত হয়েছিল বলেই বাঙালী হুঁসে উঠলো সংগ্রামনিষ্ঠ, বাঙালীর সনাতন প্রেমধর্মের সঙ্গে যুক্ত হলো শক্তিবোধ—নিষ্ঠা অহিংসাকে সে চরম ও পরম সত্য বলে স্বীকার করতে পারলো না। বিপুল অহিংসা হিন্দু-আদর্শ নয়—বিপুল অহিংসার আদর্শ আমবা পেয়েছি বৌদ্ধধর্মের কাছ থেকে। অহিংসা জীবনের সমস্ত সত্য প্রকাশ করে না, নির্বিচারে অহিংসা পালনের প্রবাসে আসে ক্রৈব্য, দুর্বল তামসিকতা জাতিকে করে তোলে দুর্বল ও ভীক। ভারতবর্ষ অহিংসাকে একটা বিরাট আদর্শ বলে স্বীকার করেছে। কিন্তু প্রাচীন ভারত বলে কর্মের দ্বারা যার চিন্তা শুদ্ধ হয়েছে তিনিই শুধু বিপুল অহিংসা পালন করতে পারেন। এমন মানুষের সংখ্যা নিতান্তই বিরল। তাই ব্যবহারিক জীবনে হিন্দুধর্ম অহিংসাকে চরম সত্য বলে স্বীকার করে নি। প্রাচীন ভারতে হিংসা এবং অহিংসার মধ্যে সমন্বয় ছিল। গীতা সেই সমন্বয়ের বাণীরূপ। হিংসা-অহিংসার সমন্বয়ের আদর্শ ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র নতুন করে বাঙালীর কাছে উপস্থিত করলেন ‘আনন্দমর্থে’, ‘ধর্মতত্ত্বে’ এবং ‘শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে’। বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমর্থে সত্যানন্দের মুখ দিয়ে প্রচার করেছেন, “প্রকৃত বৈষ্ণবধর্মের লক্ষণ—দুষ্টির দমন, ধরিজীর উদ্ধার।...চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম প্রকৃত বৈষ্ণব ধর্ম নহে—উহা অর্দ্ধেক মাত্র। চৈতন্যদেবের বিষ্ণু প্রেমময়—কিন্তু ভগবান কেবল প্রেমময় নহেন—তিনি অনন্ত শক্তিময়।” ভক্তিবোধের সঙ্গে শক্তিবোধের—অহিংসার সহিত হিংসার যে সামঞ্জস্যের আদর্শ বঙ্কিমচন্দ্র প্রচার করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ তার জীবন্ত সাক্ষ্য। ব্যবহারিক জীবনে স্বামীজী হিংসাকে বলেছেন অপরিহার্য, নির্বিচারে অহিংসা পালনকে তিনি বলেছেন ধ্বংসের পথ। স্বামীজীর ভাষায়, “অহিংসা ঠিক, নির্বের বড় কথা; কথা তো বেশ, তবে শাস্ত বলেছেন তুমি গেরস্ত, তোমার গালে এক চড় যদি কেউ মারে, তাকে দশ চড় যদি না ফিরিয়ে দাও তুমি পাপ করবে।” মজুর মত উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, হত্যা করতে এসেছে এমন ব্রহ্মবধেও পাপ নেই। যারা বীর তারাই সংসারধর্ম

পালন করতে পারে, কারণ পৃথিবী বীরভোগ্য। যারা বীর তারাই ধার্মিক। এই ধার্মিক মানুষই শুধু মোক্ষসাধনার পথে অগ্রসর হতে পারে। গৌতম বুদ্ধ এবং খ্রীষ্টপুত্রের ধর্মে হিংসা-অহিংসার মধ্যে সামঞ্জস্য ছিল না। তাই স্বামীজী বলেছেন, “বুদ্ধ করলেন আমাদের সর্বনাশ, খ্রীষ্ট করলেন গ্রীস ও রোমের সর্বনাশ।”

বঙ্কিমচন্দ্র এবং স্বামীজীর ভাবসাধনায় একালের বাঙালী ব্যর্থ অহিংসার মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হয় নি। গীতার আদর্শে অল্পপ্রাণিত হয়ে বাঙালী এগিয়ে গেছে কর্মের পথে, তারা উদ্দীপ্ত হয়েছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণীতে—ক্লৈব্যাং মাংস গমঃ পার্থ। এই আদর্শ চরিতার্থতা লাভ করেছে বাংলার বিপ্লব শহীদের জীবনে, কাসির মধ্যে যারা গেয়ে গেল জীবনের গান তাদের আশ্রয়দানে, শ্রীঅরবিন্দের বিপ্লববাদে। নেতাজীর সশস্ত্র মুক্তি অভিযানে। এমন কি রবীন্দ্রনাথ যিনি আজীবন আত্মনিমগ্ন ছিলেন শান্তম-শিবম-অদ্বৈতমের সাধনায় তিনিও নির্বিশেষে অহিংসাকে সমর্থন করতে পারেন নি। তিনি বারবার আমাদের স্তনিয়েছেন বীরের কথা—

“ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,
হে রুদ্র, নির্ভুর যেন হ’তে পারি তথা
তোমার আদেশে।”

ভারতবর্ষের সাধনা হলো চতুর্বর্গের সাধনা—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের সাধনা। একদা প্রাচীন ভারতে ধর্মের সঙ্গে মোক্ষের, ইহকালের সঙ্গে পরকালের, দেহের সহিত আত্মার, আধিভৌতিকের সহিত অধ্যাত্মবাদের পরিপূর্ণ সমন্বয়ও ছিল। এই সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের অভাবে ভারতবর্ষের পতন ঘটলো। উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যের প্রবল আঘাতে, যুক্তিবাদের আলোকে বাঙালী নতুন করে হারানো সমন্বয়কে পুনরুজ্জীবিত করবার দায়িত্ব গ্রহণ করলো। বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমর্ঠের উৎসর্গপত্রে লিখেছেন “স্বর্গে ও মর্ত্যে সমস্ত আছে।” এই সমস্তের স্বরূপ কী তা বাঙালী খুঁজে বেড়িয়েছে। রাজা রামমোহন রায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, দ্বৈতচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, বাগবন্ধু পরহংস, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, দেশবন্ধু এবং নেতাজীর জীবনব্যাপী

ক্লাস্তিবিহীন সাধনায় সম্বন্ধের প্রয়াস হয়েছে সার্থক ও ফলপ্রসূ। রাজা রামমোহন যে সম্বন্ধের সাধনায় ত্রুটি হয়েছিলেন, যে সম্বন্ধের ধারা ক্রমশঃ হয়েছে ব্যাপকতর এবং গভীরতর, সেই সম্বন্ধ এ'কালে নেতাজীর মধ্যে হয়েছে সংহত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হবার কয়েক বছর পূর্বে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু এক বিবৃতিতে বলেন, “আজকের পৃথিবীকে কম্যুনিজমের কোন একটি রূপ অথবা কোন এক ধরনের ফ্যাসিবাদকে বেছে নিতে হবে! আমি নিজে সম্পূর্ণরূপে কম্যুনিজমের পক্ষে।... ফ্যাসিবাদ ও কম্যুনিজমের ভিতর কোন বিকল্প পছন্দ নেই। সবাইকে এই দুটির মধ্যে একটিকে বেছে নিতে হবে এবং আমি বেছে নিয়েছি কম্যুনিষ্ট আদর্শ।... আমি বিশ্বাস করি যে, কম্যুনিজমের মৌল চিন্তাধারা এবং এর বৈজ্ঞানিক ইতিহাস ব্যাখ্যা দুই-ই নিভুল।” এই মতামত ব্যক্ত করবার পর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে এবং ইতিমধ্যে মার্কসবাদ সম্বন্ধে পণ্ডিতজীর পৌঁড়ামি শিথিল হয়েছে। কিন্তু উক্ত অভিমত প্রচার করবার প্রায় সপ্তদশ বছরই যিনি এই মতবাদের তীব্র

বিরোধিতা করেছিলেন তিনি হচ্ছেন নেতাজী। নেতাজী তাঁর “ভারতীয় সংগ্রাম” গ্রন্থে পণ্ডিতজীর মতবাদের প্রতিবাদ করে লিখেছেন, “বিজ্ঞানের একেবারে শেষস্তরে এসে না পৌঁছলে কিংবা বিবর্তনকে একেবারে অস্বীকার না করলে এ কথা বলবার কোন যুক্তি নেই যে, আমাদের সামনে রয়েছে দুটি মাত্র বিকল্প পথ এবং তাদের মধ্যেই একটি বেছে নিতে হবে। সবদিক বিবেচনা করে এই মতই স্বীকার করতে হয় যে, বিশ্ব-ইতিহাসের পরবর্তী স্তরে কম্যুনিজম ও ফ্যাসিবাদের একটা সম্বন্ধ গড়ে উঠবে। আর যদি সেই সম্বন্ধ ভারতেই গড়ে উঠে তবে কি তা আশ্চর্যের বিষয় হবে?” শুধু রাজনীতিতে নয় জীবনের সকল বিভাগেই তিনি চেয়েছিলেন সম্বন্ধ সাধন করতে; বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন ও মতবাদের মধ্যে যা-কিছু ভালো, যা-কিছু আমাদের প্রয়োজন সেই সব বিভিন্নতার মধ্যে সম্বন্ধ সাধন করাই তিনি তাঁর জীবন-সাধনা বলে মনে করতেন। এই সম্বন্ধ সাধনার ইতিহাসই এ-কালের বঙ্গসংস্কৃতির ইতিহাস।

প্রাণের প্রস্তুতি

শ্রীচুনীলাল গঙ্গোপাধ্যায়

ফরিদপুর জিলার খালিষা নামে প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ পঞ্জীর জমিদার শিবপ্রিয় রায়চৌধুরী। প্রতিষ্ঠা আর প্রতিপত্তিতে বহু যুগের প্রখ্যাত। বাঙলার হিন্দু-দিনের শ্রেষ্ঠ শিববাবুর রক্তে, পাঠান-আমলের মর্ষাদা আছে বিপুল জমিদারীতে; বৃটিশ-দিবসের সমাদর রয়েছে রায়বাহাদুর খেতাবে।

পূর্বসূরীরা লড়েছেন মোগলের বিপক্ষে বঙ্গদেশের স্বাধিকার সংরক্ষণ, আত্মবর্গ যুদ্ধেছেন ইংরেজের বিরুদ্ধে বঙ্গভূমির স্বাধীনতার সংগ্রামে। পুণ্যলোক রায়চৌধুরী রাজারামের শোণিতধারা প্রবাহমান ধমনীতে; জ্ঞাতিভাই বালেশ্বর বিপ্লবের কিশোর শহীদ বাবা যতীনের যোগ্য সহচর ব্যাঘ্রশাবক চিত্তপ্রিয়।

তেসরা জুন লুই মাউন্টব্যাটেন ঘোষণা করলেন, লীপের যুক্তিতে যেমনি ভারত মহাদেশ ভাগ হবে, তেমনি কংগ্রেসের সিদ্ধান্তে বাঙলাদেশও বিভক্ত হয়ে

যাবে। শতপুরুষের সম্পত্তি পিছে ফেলে চৌধুরীমশায় সপরিবারে চললেন মধুপুরের বাঙলো বাড়িতে। স্বেচ্ছায় স্বদেশ পরিত্যাগ করলেন স্বধর্মের গর্বিত উপাসক।

সাঁওতাল পরগণায় এসে এক সন্ধ্যায় ভাবতে লাগলেন—তিনি বাঙালী ব্রাহ্মণ, তিনিই রক্ত করেছেন বাঙলায় ইসলামের জয়যাত্রা; পয়দস্ত করেছেন বৃটিশের দিগ্বিজয়। শ্রীচৈতন্যরূপে বঙ্গমানে সত্য জাগিয়েছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ বেশে বঙ্গপ্রাণকে ধর্ম দেধিয়েছেন; গণকল্যাণে আত্মনিয়োগ ধন্য দ্বিজস্ব!

স্বপ্নে এবং স্থলে নতুন সমাজের সঞ্চার, নবীন জীবনের নেতৃত্বের দায়িত্ব অধিকারী কে? অতীতে ধারা নামকঙ্ক করেছেন; আগামীতেও তাঁরাই করবেন। তাই যে বোধ হয় কালের কঠিনপাথরে যুগের যোগ্যতা অর্জনের বাচাই শুরু হল বঙ্গবিধাতার শাস্ত্রতের স্মৃতির্দিষ্ট শুভ-বিধান।



শিল্পীঘন

—শ্রী ব্রজ লোহে ধীর—

(পূর্বাহ্নবৃত্তি : মাঘ সংখ্যার পর)

রূপ বটে। আঠারোর বেশি বয়স হবে না। নিখুঁত গড়ন, পাতলা ঠোঁট, বড় বড় চোখ, কাক্সলরেখার মত ঘন পল্লব, জোড়া জু, পিঠের উপর ছড়ানো কুঞ্চিত কেশ, কানে ছ'খানি লাল পাথরের ফুল, হাঁসের মত জুড়োল গ্রীবা, পীনোমত বক্ষ, রক্তাঘরে এক অগ্নিশিখা, নিরালার মত, কিন্তু নিরালার চেয়ে যেন আরও উজ্জ্বল আরও প্রখর। নিরালার বন্ধন থেকে সে মুক্তি চাইল, তাই কি আরো দীপ্ত নিরালাকে মদনদেব তার সামনে উপস্থাপিত করলেন? এ কি শিল্পীর পরীক্ষা?

‘টলেহিস কি কৈসেহিস—যা করতে এসেহিস তাই করে যা, আবার অত্মদিকে মন কেন? যা তোর ধর্ম তাই কর।’

হৃদের কিনারায় যতদূর চোখ যায় খেজুর গাছের পাশ দিষে সোজা সরল পথ জনহীন, ভৈরব স্বামীকে কোথাও দেখা যায় না।

বিন্দনের চিন্তা থেকে মুক্তি পাবার জন্য দেবকুমার অনেকরূপ হৃদের জলে স্নান করলো। জলে রীতিমত

ঠাণ্ডার আমেজ। তা হোক মাথাটা ঠাণ্ডা হোক। যতক্ষণ সম দেবকুমার ততক্ষণ স্নান করলো।

ফেরার পথে মন স্থির করে ফেললো, যে ক’দিন এই গৃহে সে থাকবে সংযতভাবে বিন্দনকে এড়িয়ে চলবে। যতটা পারে গৃহের বাইরে থাকার চেষ্টা করবে।

বিন্দন হারে দাঁড়িয়েছিল, বললো—এতো দেবী, আমি ভাবলাম ডুবে গেছেন বুঝি। জলখাবার নিয়ে বসে আছি।

বিন্দন দুটি মৃড়কির মোষা ও একপাত্র খেজুর রস নিয়ে এলো। বললো ‘পিত্তরক্ষা করুন।’

দেবকুমার বিন্দনের মুখের পানে তাকালো। মেয়েটির মুখে মুহূর্ত হাসির আভাষ, চোখে মুখে কিসের যেন একটা চটুলতা। বিন্দন তার সঙ্গে বুঝি একটু অন্তরঙ্গ হতে চায়।

দেবকুমার নীরবে মোষা চিবুতে শুরু করলো।

বিন্দন করেক মুহূর্ত চুপ করে তাকিয়ে রইল তারপর বললো—জলযোগের পরে কি করবেন? সুরকার তো এখনও ঘুম থেকে ওঠেন নি।

—নিমোরার পারে গিয়ে বসে থাকি গে, স্থানটি আমার খুব ভালো লাগে, তারপর সুরকার যখন স্নান করে ফিরবেন, তখন একত্রে ফিয়ে আসবো।

—তাহলে আজ মন্দিরে যেতে আপনার যথেষ্ট বেলা হবে। এতটা সময় আপনি অনর্থক হৃদের ধারে নষ্ট করবেন? তার চেয়ে ঘরে বসে ততক্ষণ শিল্পকর্ম করুন না, সময়টা কাজে লাগবে।

আমার শিল্পকর্ম তো সঙ্গীত নয়, আমার শিল্পে উপকরণই সব। সেই উপকরণই আমার কাছে নেই।

—উপকরণ কি?

—পাথর। পাথরের চক্কার উপর আমি মূর্তি খোদাই করি।

—খালা-বাটির উপর নক্সা তুলতে পারেন না?

—ছেলেবেলায় অনেক তুলেছি।

—তাহলে আজ আমার একখানা খালায় একটি নক্সা তুলে দিন।

—খালা নয় তাহলে পাথরের বাটি দিন, তাতেই কাজ দেখানোর সুবিধা বেশী।

ঝিন্দন তখনই একটি বাটি এনে দিল, কালো পাথরের বাটি। বাটিটা হাতে নিয়ে দেবকুমার বললো—শাদা হলে ভালো হতো।

—শাদা তো নেই।

—ঠিক আছে, এইতেই করে দিই।

—দেখি আপনার কাজ কেমন।

—নক্সার কাজে কোন বাহাদুরী নেই, ফুলপাতা খোদাই করা শুধু মাপের কাজ, মনের কাজ তো নয়, মূর্তি খোদাই করার মধ্যে মনের কাজ থাকে। নক্সার কাজ একটা বালকও করতে পারে।

দেবকুমার বাটিটা নিয়ে বসলো। অনেকদিন পরে তার ঝুলি থেকে ক্ষোদক, ছেদনী, হাতুড়ি বেরলো। বাটিটা ছ'পায়ে চেপে ধরে খুঁট খুঁট করে তার ক্ষোদক চলতে শুরু করলো।

ঝিন্দন কয়েক মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো, তারপর বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

কয়েক দণ্ড পরে কল্যাণ যখন আহারের জন্ত ডাকতে এলো, তখন বাটির কিনারায় এক সারি ফুলপাতার নক্সা ফুটে উঠেছে। দেবকুমার বাটিটা কল্যাণের হাতে তুলে দিয়ে বললো—দেখো।

কল্যাণ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বললো—বাঃ, বেশ হয়েছে।

দেবকুমার বললো—গৃহস্থামিনীকে খুসি করছি, তিনি যে যত্নে অতিথি-সংকার করছেন সেজন্য তাঁকে তো কিছুটা প্রসন্ন রাখা প্রয়োজন।

কল্যাণ কিছু আর বললো না, পূর্ণ দৃষ্টিতে একবার দেবকুমারের মুখের পানে তাকালো, দেবকুমারের কথাটা তার ভালো লেগেছে বলে মনে হলো না। দেবকুমারের সেরিকে খেয়াল ছিল না, বাটিটি ভাল করে একবার দেখে বললো—চলুন।

রান্নাঘরের বারান্দায় ঝিন্দন আহার্য পরিবেশন করার জন্ত দাঁড়িয়েছিল। দেবকুমার তার পায়ের কাছে বাটিটি রাখলো, বললো—দেখুন।

ঝিন্দন সাগ্রহে বাটিটি তুলে নিলে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে

দেখে বললো—বাঃ, বেশ তো হয়েছে, আপনি তো খুব তাড়াতাড়ি কাজ করতে পারেন।

—সুখপাথর হলে আরো ভালো ফুটতো, সে পাথর-গুলো আরো নরম, সূক্ষ্মকাজের আরো সুবিধা।

—আমি এবার আপনাকে সাদা পাথরই যোগাড় করে দোব।

তারপর কল্যাণের পানে তাকিয়ে বললো—তুমি দেখেছ ?

ঝিন্দনের উজ্জ্বল মুখের পানে তাকিয়ে কল্যাণ বললো—দেখেছি, কিন্তু কি হবে, এই কাজ ক'দিন থাকবে ? পাথরের বাটি একদিন টুক করে হাত থেকে পড়বে আর ভাঙবে।

ঝিন্দন কল্যাণের মুখের পানে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে তাকিয়ে রইল, তারপর বললো—তুমি একটা নটরাজ মূর্তি খোদাই করে নাও না, শিল্পীতো এখন আছে ক'দিন, তার মধ্যে হয়ে যাবে।

দেবকুমার বললো—নটরাজ মূর্তি তিনদিনে শেষ করে দোব।

—শুনলে তো, আজই একটা পাথরের চকলা এনে দাও—ঝিন্দন বললো।

কল্যাণের দিক থেকে কোন উৎসাহ দেখা গেল না। সে বললো—কি হবে নটরাজ মূর্তি, ঘরে রাখলেই রোজ পূজো করতে হবে।

—শিবপূজো তো ভারি ব্যাপার, একখানি ত্রিপত্র পেলেই শিব প্রসন্ন। তুমি না পার আমি পূজো করবো। আপনি খোদাই করে দেবেন এক নটরাজ মূর্তি। আজই আমি আপনার জন্ত পাথরের চকলা জোগাড় করবো।

অতিথিকে ঘরে ঠাই দিয়ে গায়ে-গতরে খাটিয়ে নেওয়া অর্ঘ্য—কল্যাণ বললো।

—না না, দেবকুমার বলে উঠলো—কাজ পেলে আমার সময় কাটে ভালো, কাজ না থাকলেই মেজাজ খারাপ হয়ে যায়, আপনারা আমায় কাজ দেবেন, আমি সকালে বসে বসে করবো।

—কি হবে বেশী পাথর খোদাই করিয়ে, ক'দিন পরে

স্বাস্থ্যের যাবো, তখন সব তো এখানে পড়ে থাকবে—
কল্যাণ বললো।

—থাক না, আমাদেরই তো থাকবে, আবার তো
ফিরে আসবো।

ঝিন্দন বললো—এমন একজন ডাক্তারকে যখন হাতের
কাছে পেয়েছি তখন ছাড়ি কেন ?

ঝিন্দন হাসিমুখে দেবকুমারের মুখের পানে
তাকালো। কল্যাণের মুখ আরো গম্ভীর হলো।
অতিথির প্রতি ঝিন্দনের এই প্রসন্নতা তার চিন্তে ঈর্ষা
জাগালো নাকি ?

সারাদিন প্রথম মন্দিরের বাকি অর্ধাংশ দেখে
দেবকুমার সন্তোষবোধে একাই ফিরলো। কল্যাণ তার
সঙ্গে ফিরবে না, একথা সকালে বলে রেখেছিল।

বাড়ী ঢুকতেই ঝিন্দন হাসিমুখে বললো—আপনার
জন্ম দু'খানা পাথরের পাটি জোঁগাড করেছি। বেখেছি
আপনার ঘরে।

দেবকুমার ঘরে ঢুকে দেখলো, পাথরের খালা কাটার
জন্ম যেমন পাথর-পাটি ব্যবহার হয়, এও তাই। হাত
বুলিয়ে দেখলো, বললো—বড় উঁচু নীচু, সমতল
করতে হবে।

—করে নেবেন।

—দুধ পাথর পেলেন না ?

—দেবমূর্তি কালো পাথরেরই ভাল। দুধ পাথরের
মূর্তি পূজা করতে নেই। দেখেন না, মন্দিরে যত বিগ্রহ
সব তো কালো পাথরের।

—পূজা করার জন্ম মূর্তি চাইছেন ?

—আপনি তো সকালে বললেন নটরাজ মূর্তি করে
দেবেন।

—নটরাজ মূর্তি কি কেউ পূজা করে ?

—সুরকার ও নৃত্যশিল্পীরা নটরাজকেই তো তাদের
আরাধ্য মনে করে।

—কিন্তু পূজা করে না। নটরাজের মাথায় যদি জল
ঢালা হয় আর কপালে চন্দন লেপে দেওয়া যায় তাহলে
নটরাজ মূর্তির মহিমা আর থাকে না, নটরাজ তখন

দেবতা হয়ে যান, শিল্পকলার শুচিন্মিত্ত মাধুর্য আর
থাকে না।

—বেশ তো, আপনার নটরাজের মাথায় আমরা
জল ঢালবো না, চন্দন লেপবো না। আপনি একটা
শুচি-স্নিগ্ধ মূর্তি করুন তো দেখি।

তখনই মুখ হাত ধুয়ে দেবকুমার পাথর নিয়ে বসছিল।

ঝিন্দন বললো—আহার সমাধা করে নিন। সুরকার
কখন ফিরবেন ঠিক নেই, সিদ্ধিনাথের আন্তানায়
গেছেন, বলে গেছেন ফিরতে রাত হবে।

—গৃহস্থামীর অবর্তমানে অতিথি আশ্রয়সেবা করবে ?

—কোন বাধা নেই, গৃহস্থামিনী রয়েছেন। তাছাড়া
সিদ্ধিনাথ যখন এখানে এসে জুটেছেন, তখন এখানে
ভিনি যতদিন থাকবেন, সুরকার একদিনও মধ্যরাত্রি
ছাড়া ঘরে ফিরবেন না। এবং যে অবস্থায় ফিরবেন
তাতে সবদিন আহাৰ্য গ্রহণ করার সামর্থ্যও থাকবে না।
কাজেই আপনাকে এখন কিছুদিন একাই আশ্রয়সেবা
করতে হবে।

ঝিন্দন পিঁড়ি পেতে পরিপাটি করে আহাৰ্য লাঞ্ছিয়ে
দিল। দেবকুমারের দু'খা ছিল, বিনা বাক্যে খেতে বসে
গেল। কালকের চেয়ে আজ ঝিন্দন বৃষ্টি অনেক বেশি
সহজ, অনেক বেশি অসঙ্কোচ। পতিপত্নী দু'জনের
আপ্যায়ণ ও পরিচর্যা যে আজ একার অধিকারভুক্ত
করেছে। অতিথির কাছে এইটাই বোধ হয় প্রত্যাশিত।

আহার শেষে দেবকুমার পাথর নিয়ে বসলো। এক
হাত লম্বা পাথরের পাটিখানির একটা পিঠ মসৃণ করে
তোলার জন্ম উৎসর্ঘিকা দিয়ে ঘষতে শুরু করলো।

• বেশ কিছুক্ষণ ঘর্ষণের পরে সে মুখ তুললো। দ্বারের
ওপাশে হেলান দিয়ে বসে আছে ঝিন্দন। অন্ধকারে
মুখখানা স্পষ্ট দেখা যায় না। বললো—আপনি
এখানে বসে ?

ক্লান্তকণ্ঠে ঝিন্দন বললো—বসে থাকাই তো আমার
কাজ। আর্যপুত্র কখন আসবেন, তাঁর প্রতীক্ষা করছি।
তিনি না আসা অবধি তো আমার ছুটি নেই।

—সুরকারের এ বড় অগ্রহায়।

—অন্ত্যাস ত্রায়-অন্ত্যায় বোঝে না।

—আপনি এখনও তো আহার করেন নি ?

—না।

—সারাদিন গৃহস্থালীর কাজ করে' আবার রাতে এভাবে বসে থাকি বড় কষ্টসাধ্য।

—আগে কষ্টকর বলেই মনে হয়েছিল, কিন্তু পরে দেখলাম এই কষ্ট এই অঞ্চলের ঘরে ঘরে। এখানকার নাগরিকরা সারাদিনের কর্ম শেষে সন্ধ্যার পর খেজুর রসের আসব পান করে মধারাত্রি অবধি আড্ডা জমায়, তারপর ঘরে ফেরে। অনেকে ফিরতে পারে না, পাঁচ-জনে তাকে ধরে বাড়ী পৌঁছে দেয়। রমণীদের সেজ্ঞাত অপেক্ষা করতে হয়।

—তাহলে তো এখানকার যুবক সমাজ নীতিভ্রষ্ট।

—শুধু যুবকদের দোষ দেবেন না, পুরুষসমাজ বলুন।

—এতো মন্দির দেখে আমার গনে হয়েছিল এস্থান ধর্মক্ষেত্র—দেবভূমি।

—বাইরের মানুষ এখানে দেবদর্শন করতেই আসে, কিন্তু এখানকার মানুষ ভিত্তিকপ। পিদিমের নীচেই তো অন্ধকার। এ কী! আপনি হাতের কাজ ধামিয়ে দিলেন যে! কাজ করুন।

দেবকুমার আবার পাথর ঘষতে শুরু কবলো।

কোন এক সময় বিন্দন বললো—আপনার খুব পরিশ্রম হচ্ছে না ?

—এই তো আমার কাজ।

—গান শুনবেন ? একথানা গান গাই শুনুন, আজ দুপুরেই গানটায় সুর দিবেছি—গান শুনুন আর কাজ করুন, অবসাদ কম হবে।

বিন্দন গুন্ গুন্ করে সুর ধরলো :

রাধা রাধা বলি বাজে বাঁশরী,

রাধা রাধা বলি ডাকে পিয়ারী।

রাধা নামে বহে যমুনা চঞ্চল,

রাধা নামে জাগে কদম কুঞ্জতল।

রাধা নামে হাসে জ্যোৎস্না রাতিবা,

রাধা নামে ওঠে কান্না হিয়া মাতিয়া।

বাঁশরিয়া ডাকে—রাধা, রাধা, রাধা,

রাধা অভিসারী!

অভিসারে চলে রাধা লাজ পাসরি

বসন ভূমেতে লোটে,

চরণেতে কাঁটা ফোটে,

পাগলিনী রাধা ছোটে, ডাকে বাঁশরী

—রাধা, রাধা, রাধা—

সুরে দেবকুমার আবিষ্ট হয়ে পড়ে, বিশ্ময়ে বিন্দনের মুখের পানে তাকিয়ে থাকে, মেয়েটার কণ্ঠে যেন অমৃতের স্পর্শ আছে। এ কণ্ঠ বাগ্‌দেবীর আশীর্বাদ ছাড়া জন্মে না।

—কি গো গায়িকা-ঘরগী, আপন মনেই সংগীতচর্চা করছ নাকি ? আমি তো নিনোরার কিনাবা থেকে তোমার কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছি।

দরজার সামনে এক রমণী এসে দাঁড়ালো। দীপের আলো তার মুখে পড়তেই দেবকুমার তাকে চিনলো, সে মন্দির তোরণের পানওয়ালী চঞ্চলী।

ঘরের মধ্যে তাকিয়ে চঞ্চলী বললো—ওঃ, অতিথিকে গান শোনাচ্ছেন ?

ক্ষণেকের জ্ঞাত বিন্দনের মুখখানি বিবর্ণ হয়ে গেল। অন্ধকারে সে রূপান্তর কারও চোখে পড়লো না। সহসা সে কোন উত্তর দিল না।

চঞ্চলী বললো—ইনিই বুঝি সেই ভাস্কর। কাল একেই বুঝি সুরকারের সঙ্গে দেখলাম। তা আগে থেকে আপনাদের জানা-চেনা ছিল বুঝি ?

বাড়টা একপাশে কাত করে গভীরভাবে বিন্দন বললো—হ্যাঁ।

অল্প পরিচিত অতিথিকে এভাবে একান্তে গান শোনানো নিম্নার বিষয় হতে পারে। সেইটা এড়িয়ে যাবাব জ্ঞাত মিথ্যার আশ্রয় নিল।

—সুরকারকে গৃহে পাবার প্রত্যাশা করেছিলাম, তাঁকে তো দেখছি না ?

—তিনি এখনও ফেরেন নি। বলে গেছেন ফিরতে রাত হবে।

—আমার দোকানের সামনে দিয়ে সন্ধ্যার পর সিঁকিনাথের সঙ্গে এই পথেই যে এলেন দেখলাম।

স্মৃতি-আলেখ্য

শ্রীমুশীলপ্রসাদ সর্বাধিকারী

(পূর্নান্বয়িত)

জিম্নাস্টিক ও ডিলের ব্যবস্থা স্কুলে উচ্চাঙ্গের।
হুটোর একটা করা ছেলেদের পক্ষে বাধ্যতামূলক।

ছেলেদের আয়োজনে ফুটবল ও ক্রিকেট খেলা স্কুলে
যখন শুরু হল, তা খেলে জিম্নাস্টিক বা ডিল করা
খেলুড়ের অবিধাজনক কর্তৃপক্ষের মনে হল। নূতন
নিয়ম তাই যে, তিনটার যে কোন একটা করলেই
চলবে। খেলাধুলাতেই বেশী ছেলে যোগ দিল।

এবার হেয়ার স্কুলের প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

আমার অগ্রজেরা সকলেই হেয়ার স্কুলের ছাত্র।
বাবা কখন ব'লতেন না হেয়ার স্কুল, ব'লতেন হেয়ার
সাহেবের স্কুল। শ্রদ্ধা তাঁর ছিল হেয়ার সাহেবের উপর
অসীম। দেখেছি আমি নিজেকে কলেজ স্ট্রীট দিয়ে যেতে
যেতে, হেয়ার স্কুলের মাঠের সামনে গাড়ী তাঁর
পৌঁছিলেই, হেয়ার সাহেবের ঠ্যাচুকে প্রণাম
ক'রছেন। হিন্দু কলেজের পড়ুয়া ছিলেন পিতৃদেব।
গাড়ী বুরিয়ে সে রাস্তা দিয়ে সংস্কৃত কলেজের
সামনে কখন কখন তিনি গেছেন, অগ্রজ প্রসন্নকুমারের
প্রতিমূর্তি দর্শনে।

হেয়ার স্কুলে দেবপ্রসাদের সহপাঠী ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র
রায় (পরে ডক্টর পি. সি. রায়), আরও ঝাঁরা
ছিলেন তাঁদের কেউ দেবপ্রসাদ বা পি. সি. রায় হ'ননি।

—মধুমার্গে গেছেন, স্বাস্থীশ্বরে কারা সহযাত্রী হবে
তাঁদের সঙ্গে দেখা-শোনা করতে।

—সিদ্ধিনাথের সঙ্গে মধুমার্গে গেছেন? তা-ই বলে
গেছেন নাকি?

—সেইমতই শুনেছিলাম।

—তাহলে তো পাখী আবার উড়ছে। এতো শীঘ্র
শিকল কাটবে তাতো ভাবিনি। যাক আপনি গান
শোনান—আমি চললাম।

—বসবে না?

হেয়ার স্কুলের ছাত্র—কলিকাতার সম্ভ্রান্তবরের সম্ভ্রান্ত
মাত্রেই। আমার সময়ে আমি দেখেছি, কলুটোলার
মল্লিক, রায় ও সেনদের ছেলেরা অন্ততঃ হু'তিন বৎসর
ছাত্র হিসাবে হেয়ার স্কুলে প'ড়বেই। পরে বিয়ে হ'লেই
স্কুল ছেড়ে দেবে। এর অল্প হাসাহাসি চ'লেছে কত।
শিক্ষকেরাও ব'লতে ছাড়েন নি—কিরে আর ক'দিন?

কলুটোলার মুসলমান ব্যবসায়ীর ছেলেপুলেদের এক-
আধজন আমার সময়ে হেয়ার স্কুলে ভর্তি হয়েছে। তারাও
স্কুলে টে'কেনি বেশীদিন। ফিফ্‌থ, ফোর্থ ক্লাস পর্যন্ত
থেকেই ব্যবসায়ে ঢুকেছে। এরা হেয়ার স্কুলে আসে
কেন? এদের কাছে হেয়ার স্কুল লন্ডনের অক্সফোর্ড।
ছুলেও কাজ হয়। তাদের জাতভাইকে ব'লতে শুনেছি,
—“ও, হেয়ার স্কুলের। কার-কারবারের কাগজপত্রে
খোদাই করা দেখেছি, ‘ওমুক, হেয়ার স্কুলের’। হেয়ার
স্কুল এদের কাছে পতিতোদ্ধারী।

হেয়ার স্কুলের নামমহিমা শিক্ষিতমহলে ত' বটেই
সাধারণের কাছেও ছিল অসীম। কলিকাতার বাহির
থেকে আসা ছেলেরাও চেষ্টা ক'রেছে হেয়ার স্কুলে
ঢুকতে। সেখানে না হলে গেছে হিন্দু স্কুলে। মধ্যবিত্তের
ঘরের ছেলেরা হেয়ার স্কুলের মাহিনা দেওয়া যাদের পক্ষে
সহজ নয়, তাবা গেছে এলবার্ট স্কুল, সিটি স্কুল, রিপন

—না, গান শোনার অবকাশ আমার এখন নেই,
মার্জনা করুন।

চঞ্চলী চলে গেল।

কয়েকটা মুহূর্ত বাতাস ভারী হয়ে রইল। তারপর
দেবকুমার বললো—এ কি নিন্দা রটনা করবে নাকি?

—সমুদ্রে শয়ন যার, শিশিরে ভষ কি তার! গান
শুধুন—বলে বিন্দন আবার সুর ধরলো—রাধা রাধা বলি
ডাকে বাঁশরিয়া—

দেবকুমার উৎসাহীক ঘষতে শুরু করলো। (ক্রমশঃ)

স্কুল বা মেট্রোপলিটন স্কুলে। সেসব স্কুলের পড়ুয়ারা হেয়ার স্কুলের পড়ুয়াদের সমীহ করে চলেছে, পদে পদে এ দেখেছে সকলেই। এমন কি ওসব স্কুলের শিক্ষকেরাও হেয়ার স্কুলের ছাত্রদের সম্মান দিয়েছে, আকস্মিক দেখাশুনা ঘটলে।

এত সাধারণ অভিজ্ঞতা, হেয়ার স্কুলের কলুটোলা কোম্পানী, অহান্ত ছাত্রদের সঙ্গে কথাবার্তা ক'রতে ইতস্ততঃ ক'রছে। এ দবদবানির কারণ?

গাড়িঘোড়া ক'রে আসা ছাত্র হেয়ার স্কুলের অনেক। তাদের বেশভূষার পারিপাট্য কি! স্কুলের পানওষালার কাছে তাদের কি সমাদর! স্কুলের দারোয়ান তাদের উঠতে ব'সতে সেলাম ক'রে। ওদিকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় হেয়ার স্কুলের বাজিমাত। সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষকদিগকে বাছিয়া গভর্ণমেন্ট দেয় হেয়ার স্কুলে। হেয়ার সাহেবের নাম-মাহাজোয় হেয়ার স্কুলের মর্যাদার স্বযোগ নিয়ে এ্যাং ব্যাঙও বাড়াবাড়ি খুবই বাড়িয়ে চলেছে, সেই সময়ে আমি হেয়ার স্কুলে আসি। বসিয়ে দেয় ভূপিদা জজ...মিত্রের পুত্র।

ভূপিদা তখন হেয়ার স্কুলের ছাত্র। মট্‌স লেনে রাজকুমারের বাটীতে থেকে বিদ্যালয়ে যায আসে। খুল্লভাত আনন্দকুমারের পুত্র কিরণদা হেয়ার স্কুল হ'য়ে তখন প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র। সে এসে বলে ভাল কাপড় চোপড় পরে আসিস। নিজের কাপড় চোপড়ের দিকে দেখে কিরণদাকে নম্রভাবেই বললুম, এতে চ'লবে না? আমার কথায় একটু খতমত খেয়ে কিরণদা ব'ললে, না তা' চ'লবে। হেয়ার-স্কুলী অহমিকা তার স্বক্ক হ'ল কেন পরে বুঝতে পারি। বৌবাজার স্কুলের মগভায় তখনও আমি আচ্ছন্ন। সেই অবস্থায় কিরণদার কথা ক্রান্তিকঠোর মনে হয় আমার। যুঝটার তাব হয় অপ্রফুল্ল। সেই সময়ে এসে পড়ে জজের বেটা ভূপিদা। কি হ'তে কি হয় এই ভয়ে কিরণদার স্বর নিমেষে পালটে যায়। হেয়ার-স্কুলী ঢং ঢাং-এর সব যখন শুনি তের বছরের চিরকল্প স্মৃশীলের মাধার চাপে ছুটবুদ্ধি—হেয়ার-স্কুলী গর্ক খর্ক ক'রবার ছবি এঁকে নিই মনে।

কিঞ্চ ক্লাসের শিক্ষকদের মধ্যে ছ'জন সিন্ডিকেট ক্লাসেরও

আমি তাঁদের চেনা ছিলাম। নতুনদের একজন কেদার রায়। প্রথম দিনেই আমার নাম শুনে আমাকে দাঁড় করিয়ে তিনি Translation Retranslation করান। প্রশ্নাদির উত্তর সাধ্যমত দিই। মনে হ'ল উত্তর পেয়ে তিনি খুসী হয়েছেন। শুনেছিলাম তাঁর ক্লাসে ছুঁচ পড়লেও শোনা যায়। দেখলাম খুব রাশভারি। বললেন আমাকে—That will do. উচ্চারণ আরও একটু স্পষ্ট ক'রে করবার চেষ্টা ক'রবে। এ ক'রতে সাহায্য করবে ডিক্‌শনারী ও অভিধান। অঙ্কের শিক্ষক খুব খোস-মেজাজী। প্রশ্ন করেন ছেলেদের। উত্তরের তত্ত্ব নয় না, নিজেই উত্তর দেন। বোর্ডে আঁক দিয়ে ক'বে দেন নিজেই। খাতায় আঁক দিয়ে। টোকাটুকি কেউ করলে, তার আর রক্ষা নাই, তাকে দাঁড় করিয়ে অঙ্কটা ঠিক ঠিক ক'বিয়ে তবে তার ছুটি হয়। না পারলে সেই রকমের দশটা অঙ্ক তাকে দেবেন Home Task-স্বরূপ। এর জন্য টোকাটুকি করা এক রকম বন্ধ হয়ে যায় এঁর ক্লাসে।

পণ্ডিতমশায়ের ক্লাসে ছেলেরা আনন্দই করে। শব্দ-গঠন করে যান তিনি। তা নকল করতে গিয়ে ছাত্রেরা ভ্রমশ্রি ঘি ঢালে। পণ্ডিত হাসেন আর বলেন টাকা বাঁচাচ্ছিস বাপের। কিছু হবে না। ব্যাকরণ শুরু হলে কারণ অকারণে ছেলেদের শুধু হৈ হৈ। পণ্ডিতও হেসে খুন। বলতেন তিনি—শুনে রাখ, এ হচ্ছে ব্যাকরণের বাপের শ্রদ্ধা। কর যোডশোপচারে। দেখিস, সে উপচারে বামুন পণ্ডিতের ভাতে কাটি না পড়ে। বলা শেষ হ'তে না হ'তে হেডমাষ্টার ভোলানাথ পাল এসে উপস্থিত। ছেলেরা নির্ঝাঁক নিম্পন্দ। পণ্ডিতের হাসি। যা বলেছি তাই। হেডমাষ্টার হাসি চেপে কোনও রকমে বললেন, পণ্ডিতমশাই ওদের ছুটি দিন।

পণ্ডিতদের এ ঐতিহ্য সমভাবে চলেছে বর্ষের পর বর্ষ। তা হলেও পণ্ডিতী তাঁদের মাঠে মারা যায়নি। দেখা গেছে, অঙ্কের মত পরীক্ষার্থীরা সংজ্ঞতে খুব উঁচু নম্বরই পেয়েছে। আইনষ্টিন ব্যতিরেকে আর কেহ এর হদিশ দিতে পারবে না। এও প্রব সত্য পণ্ডিতমশাইদের ছেলেরা যত ভালবেসেছে, ভক্তি করেছে, এমন আর কোনও শিক্ষককে করেনি তারা।

একজন শিক্ষকের নাম নন্দাবু। ছেলেরা তার নামকরণ ক'রলে 'লোনো মাষ্টার'। কিছুমাত্র বিরক্ত তাতে না হয়ে, তিনি ছেলেদের বলেছেন, 'এর derivative meaning কি বাপধনেরা'! 'লোনো মাষ্টার' একদিন ক্লাস থেকে বেরিয়ে বারান্দায় পা পিছলে প'ড়ে অজ্ঞান হ'য়ে যান। ছেলেদের বিলাপের অবধি থাকে না। প্রায় অজ্ঞান অবস্থাতেই বাড়ী যেতে হয় তাঁকে। ছেলেদের ছটফটানি কি। তারাও তাঁর সঙ্গে বাড়ীতে গিয়ে তাঁর সেবা-শুশ্রূষা ক'রবে। শিক্ষক ও ছাত্রের এই মধুর সম্পর্ক উপভোগ করবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে।

শিক্ষক কেদারবাবুর কথা বলেছি। মধুপুরে নদীর ধারে যাবার পথে তাঁর একখানা বাড়ী। তাঁর ছাত্রের মধ্যে ক'জন আমরা মধুপুরে গেছি। বাব একদিন নদীর ধারে। মাষ্টার মশাইএর বাড়ীর সামনে দিয়ে যাচ্ছি। দৌড়ে গেটের কাছে এসে ব'ললেন তিনি—বড় রোদুর বাবা, একটু জিরিয়ে যাও। এস ভিতরে। পরস্পরে মুখ চাওয়াচাষি করে, ভিতরে আমরা গেলাম।

সেখানে কি অপূর্ণ স্নেহ-সমাদর আমাদের। ষাঁর ক্লাসে আল্পিন পড়ার শব্দ শুনতে পাওয়া যায়, তিনি নিজে সোরগোল তুলে আতিথেয়তা করালেন আমাদের কানায় কানায়। ব'ললেন—চুপচাপ কেন বাবা, বল বল মধুপুর কেমন লাগছে? কর্তব্যপালন কঠোর আর স্নেহবর্ষণে মুক্ত প্রাণ—দুই ভিন্ন চিত্রে সম্মোহিত হ'লাম আমরা।

কলিকাতায় ফিরে কি কথায় মনে নাই, বাবার কাছে ব'ললাম কেদার মাষ্টারের কথা। ব'ললেন পিতা—জানিস নি, ও অগাধ পণ্ডিত। শিক্ষকতা ক্ষেত্রে বড় পদ ছেড়ে ছোটদের তৈরি করাই ওর ধনুকতান্ধা পণ। তোদের বরাতে অমন মাষ্টার পেয়েছিস তোরা।

এই প্রসঙ্গে আর একজন আচার্য্যের কথা মনে পড়ছে। তিনি হ'লেন বোম্বাইয়ের স্কুলের নবগোপাল পণ্ডিত। দেবপ্রসাদ থেকে আরম্ভ করে তাঁর ভাষেদের সকলকে এমন কি তাঁর দুই ছেলেকেও বাড়ীতে পড়িয়েছেন তিনি।

ঘড়ির কাঁটা ধরে পড়াতে এসেছেন প্রত্যহ। পড়াবার সময় কিন্তু কাঁটার দিকে চোখ নেই—পড়াচ্ছেন তো পড়াচ্ছেন। দু'ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা হ'য়ে গেল, তবু ওঠেন না। অক্ষশাস্ত তাঁর হাতের মুঠোর ভিতর।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ৫৩ নং ওয়েলিংটন স্ট্রীটে বসে তাঁর সদ্যলিখিত লজিকের প্রফ দেখছেন। প্রফ দেখে S. C. Addyকে দিয়ে আসবেন। তাঁর কাণে পৌঁছাল ছেলেদের অক্ষশাস্ত পড়ানয় নবগোপাল পণ্ডিতের ধরণ। মোহিত হ'য়ে গেলেন তিনি। পড়ানয় বাধা দিলেন না। ব'সে রইলেন বেকিতে, লজিকের প্রফ নিয়ে। সামনে দিয়ে তাঁর পণ্ডিতমশাই বাড়ী যাচ্ছেন। তাঁকে ডেকে আস্তাবু ব'ললেন, পণ্ডিতমশাই একটু ব'সবেন।

সহজ ডাকে সহজভাবেই ব'সলেন পণ্ডিতমশাই। ৬/আশুতোষবাবু ব'ললেন, আমার একজন Mathematics-এর প্রফেসরের দরকার, আপনি যদি তা করেন—পণ্ডিতমশাই—বোম্বাইয়ের স্কুল ছেড়ে? না না। আস্তাবু—দেখুনই না—আমার অছুরোধ। পণ্ডিতমশাই—ও কথা ব'লবেন না—আচ্ছা। আস্তাবু—আগামীকাল নিয়ে যাব আপনাকে।

নিয়ে গেলেন আস্তাবু পণ্ডিতমশাইকে বঙ্গবাসী কলেজে প্রিন্সিপাল ঘোষেনবাবুর কাছে। আস্তাবু ব'ললেন, প্রফেসর খুঁজছিলে। এঁকে এনেছি, আজ থেকেই থাকুন উনি। রইলেন পণ্ডিতমশাই। টিকলেন না কিন্তু। হ হ করে তাঁর প্রাণ স্কুলের ছেলেদের জন্ত।

তিন মাস পেরুতে না পেরুতে ইস্তফা দিলেন পণ্ডিতমশাই তাঁর প্রফেসরী পদে। ফিরে গেলেন তিনি তাঁর সোনার চাঁদদের হাতে, প্রাণ বাঁচাতে! বিলেত থেকে ব্যারিষ্টার হয়ে যেদিন কিরি, তার পরদিনেই পণ্ডিতমশাই বুকে জড়িয়ে নিয়ে ব'ললেন আমাকে, তোরা ছেলেদের কবে পড়াব?

পণ্ডিতমশাই গেছেন স্বর্গে, তাঁর সোনার চাঁদদের প্রায় সকলেই এখন নিশ্চয়ই তাঁর কাছে পড়ছে সেখানে। কোথায় কাদের কাছে ছিলাম আর পড়েছি এখন কোথায় কাদের কাছে।

বৃহস্পতি

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর, শাস্ত্রী পঞ্চতীর্থ

(মাঘ সংখ্যার অম্লবৃতি)

দেবাসুর যুদ্ধ শেষ হোল, বাসব ইন্দ্র পেলেন, অসুরগণ পরাজিত হলেন। ইন্দ্র অস্ত্রাস্ত্র দেবতাদের পরামর্শে মর্ত্যলোকের পরম পণ্ডিত বৃহস্পতিকে পুরোহিত পদে বরণ করলেন। এই বৃহস্পতি মহর্ষি অদ্বিত্যের পুত্র।

“ইন্দ্রস্বং বাসবো প্রাপ্য ততো বত্রে পুরোহিতম্।

পুত্রং অদ্বিত্যসো জ্যেষ্ঠং বিপ্র জ্যেষ্ঠং বৃহস্পতিম্॥

এই বৃহস্পতির পিতা অদ্বিত্য ছিলেন মহারাজ করকর্মের কুলপুরোহিত। আর করকর্মের বংশে জন্মেছিলেন মহারাজ মরুত। তাঁর দীর্ঘা ছিল ইন্দ্রের সঙ্গে। ইন্দ্রও মরুতকে পেয়ে উঠতেন না বলে ও বীর্যে। অতএব ইন্দ্র ও মরুত রাজা সর্বদা পরস্পরের প্রতি স্পর্ধালুই ছিলেন। বাসব মনে করলেন আমার পক্ষে মর্ত্যের মরুতকে অতিক্রম করার অসামর্থ্য নিশ্চয় ঐ পুরোহিতের বুদ্ধি ও প্রতিভার কোণলের জন্ত, অতএব যদি ঐ পুরোহিত বৃহস্পতিকে আমার পুরোহিত করে নিতে পারি তা হ'লে মরুত ক্রমেই হীনপ্রভ হয়ে পড়বে।

বাসবের ঐ কল্পনাটি সার্থক হোলো। তিনি দেব-বৃন্দের সমক্ষেই বৃহস্পতিকে আহ্বান করে নিজের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করলেন এবং তাঁকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করলেন যেন আপনি আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র পূজনীয়, আপনি ইন্দ্রের পুরোহিত হন এবং এই সমস্ত দেবতা আপনার যজ্ঞমান হবেন।

তবে মনে রাখবেন যিনি জরামৃত্যুবিহীন দেবতাদের পুরোহিত হন তাঁকে মর্ত্যের মৃত্যুপরায়ণ মানবের পৌরোহিত্য ত্যাগ করতেই হয়। সেই হিসাবে আজ থেকে আপনি মর্ত্যরাজা মরুতকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করলেন।

আর যদি মানবসম্পর্কই বজায় রাখতে চান তবে দেবসম্পর্ক অবশুই ত্যাগ করতে হবে। সত্বর উত্তর দিন। বৃহস্পতি অল্পক্ষণ চিন্তা করে উত্তর দিলেন— হাঁ, আমি স্বীকার করছি, প্রতিজ্ঞা করছি, আর আমি

মর্ত্যলোকের যাজনকার্য্য করবো না, যদি অগ্নি শীতল হয়, পৃথিবী পরিবর্তন হয় এবং সূর্য্যও যদি প্রভাহীন হয় তবুও আমার বাক্য মিথ্যা হবে না।

পৌরোহিতং কথং কৃত্বা তব দেবগণেশ্বর!

যাজয়েয মহং মর্ত্যং মরুতং পাকশাসন!

সম্মানসিহি দেবেন্দ্র! নাহং মর্ত্যস্ত কহিচিং।

প্রহীত্বামি স্রবং যজ্ঞে শৃণু দেদং বচোমন।

হিরণ্যরেতা নোঞ্চ: স্ত্রাং পরিবর্তেত মেদিনী।

ভাসং তু ন রবি: কুর্ধ্যাম তু সত্যং চলেন্ মযি।

—বাসব খুব খুসী হ'লেন বৃহস্পতির কথায়। রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলেন অতঃপর।

এদিকে মরুত রাজা বিষম বিপদে পড়লেন। যেদিন শুনলেন কুলপুরোহিত বৃহস্পতি এবার থেকে “সুরাচার্য্য” হয়েছেন, আর মর্ত্যলোকের পৌরোহিত্যই করবেন না। চিন্তিত হয়েও বৃহস্পতির নিকট উপস্থিত হ'লেন। যদি অমুন্য বিনয়ে নিবেদনে রাজী হন।

কিন্তু কিছুতেই তিনি আর মানবের পৌরোহিত্য করবেন না। ইন্দ্রের নিকট যে প্রতিজ্ঞা করেছেন তিনি সেই শপথের কথাগুলি মরুতকেও শুনিয়ে দিলেন। বিশেষ করে বলে দিলেন তুমি প্রস্থান কর, যাকে অভিলাষ তাকেই তুমি বরণ কর তোমার পৌরোহিত্যের জন্ত।

মরুত রাজা বিমর্ষ হয়ে ফিরে আসছেন, ইত্যবসরে সেই পথে দেবর্ষি নারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হোলো। তিনিও রাজার মুখে সব ঘটনা শুনলেন। প্রতিভা-দীপ্ত চতুরচূড়ামণি নারদ লোকসমক্ষে বৃহস্পতির আসল স্বরূপটি কেমন তা ভাল করে প্রকাশ করার সুযোগ পেয়ে গেলেন। প্রত্যুৎপন্নমতির সঙ্গে তৎক্ষণাৎ বলেন, মহারাজ! তার জন্তে অত চিন্তিত কেন? বৃহস্পতির ছোট ভাইতো আজও জীবিত। তিনিও তো পরম পণ্ডিত, যাজনকার্য্যে তিনিও বিশেষ দক্ষ। আপনি তাঁকে দিয়ে যজ্ঞ করান। তাতে কুলশুদ্ধির সম্বন্ধও থাকবে যজ্ঞও হবে।

মরুস্ত রাজা আশ্বস্ত হলেন। মহর্ষি অঙ্গিরার কনিষ্ঠ পুত্র আজও যে রয়েছেন এবং যজ্ঞকার্যে বিশেষ দক্ষ এটুকু শুনে বৃহস্পতির উপেক্ষার জন্ত বেদনা বিস্মৃত হলেন। তিনি আগ্রহ প্রকাশ করলেন বৃহস্পতির কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম ও বর্তমান ঠিকানা কোথায়? মহর্ষি মুহূ হাস্ত করলেন। বুঝলেন এবার ব্যাপারটি অনেক দূর গড়াবে।

মরুস্তকে সবই বল্লেন, কিন্তু চেপে গেলেন একটি পূর্ব ঘটনাকে। বৃহস্পতির জ্বালায় সংবর্ত যে ভিটে-মাটি ছেড়ে দিগম্বর বেশে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সে সত্যটি গোপন করে শুধু মাত্র বল্লেন তাঁর নাম সখ্যর্ষ এবং তিনি এখন কানীধামে। তবে তাঁকে দেখে হয়তো মনে করবেন ইনি আবার পণ্ডিত নাকি? কিন্তু তা ভাববেন না। পরম বিজ্ঞ, পরম উদাসী তিনি। তাই এক রকম দিগম্বর বেশে ভ্রমণ করেন। বিশ্বেশ্বরের মন্দির দ্বারে তাঁর দর্শন পাবেন। আপনার নিবেদনে হয়তো প্রথমটা তিনি অনেক ভৎসনা করবেন আপনাকে, তারপর তিনি অবশ্যই প্রসন্ন হবেন। তবে আপনি কিছুতেই ছাড়বেন না তাঁকে। আর কে তাঁর সংবাদ দিলে এমন জিজ্ঞাসা করলে আমার নাম করবেন এবং বলবেন সম্প্রতি নারদ পুড়ে মারা গিয়েছেন। আর তাঁর দেখা পাওয়া যাবে না। তাহলেই তিনি আমার ধোঁজে আর আসবেন না।

নারদের বক্তব্য সমাপ্ত হোলো। মরুস্ত রাজাও তাঁর নির্দেশ পালন করলেন। বহু উষেগ সহ করে সংবর্তকে রাজী করালেন। তখন সংবর্ত বল্লেন, দেখ বাপু! আমি ছুটি কথা বলতে চাই—একটি কথা, আমার দাদা যখন ইন্দ্রের পুরোহিত হয়েছেন, তখন তোমার যজ্ঞ আমি করলেই ইন্দ্র তাঁর পারিষদবর্গ নিয়ে আমার ওপর তোমার ওপর ভীষণ অত্যাচার করবেন, সে সময়ে তুমি যেন অবিচল থেকে।

আর দ্বিতীয় কথা—তোমার যজ্ঞ সম্পূর্ণ হবেই, তুমি নিশ্চয়ই ইন্দ্রের অঙ্ঘে হবে। এতে আমার লাভ ধনসম্পত্তি নয়, দাদার অপকার করা আর ইন্দ্রের দর্পচূর্ণ করাই আমার বিশেষ উদ্দেশ্য। তৈরী হও, যজ্ঞের কর্ত্ত্ব করে দিচ্ছি।

তুমিও প্রতিজ্ঞা কর, এ কার্য থেকে কিছুতেই ভ্রষ্ট হবে না। মরুস্ত সে প্রতিজ্ঞা সম্মত হলেন, শপথও করলেন এবং যজ্ঞের জন্ত পূর্ণ প্রস্তুতির আয়োজন করলেন।

এ সব ঘটনা মর্ত্যে যেমন ছড়িয়ে পড়লো, দেবলোকে পৌছাতেও বিলম্ব হল না। বৃহস্পতিও তা সবিস্তারে শুনলেন। কিন্তু সে সংবাদে হৃদয়টি তাঁর জ্বলে পুড়ে থাকে হতে লাগলো। মুখ বুজে রইলেন। তাতে কি হয়, মনের ভাব মুখে প্রকাশ হয়ে পড়লো। দেবরাজ তাঁর চোখ মুখের অবস্থা দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—কি হয়েছে আপনার? কোন অশুবিধা হচ্ছে নাকি? বলুন সে অশুবিধা আমি সত্ত্বর দূর করে দেবো।

বৃহস্পতি প্রথমটা বহুভাবে তা গোপন রেখে দেবলোকের সুখ-সুবিধার কথাই বল্লেন। তারপর আর সামলাতে পারলেন না; বলেই ফেললেন এবং বিশেষ চাতুরীর সহিত বল্লেন—দেখুন বাসব! মর্ত্যের মরুস্ত রাজা আপনার সঙ্গে স্পর্ধা করে যজ্ঞ করছেন, এবং তাঁর কার্যটি সমাধা করবেন আমারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা সংবর্ত, এ অসম্ভব। যে আমার পরম শত্রু তার সমুদ্রিলাভ হবে এ আমি কিছুতেই সহ করতে পারবো না। আমার শরীর বিবর্ণ হয়েছে এই কারণেই। আপনি অতি সত্ত্বর এ ব্যবস্থা করুন। সমস্ত দেবতাকে নিয়ে আপনি পূর্ণশক্তি ক্ষেপণ করুন। মরুস্তের যজ্ঞটি ধ্বংস করুন, নইলে কিছুতেই আমার শাস্তি নাই।

“দেবৈঃ সহ অমরান্ প্রণুদ্য জিঘাংসে চাপ্যত

সাম্ববন্ধান্।

যং যং পশুসি তত্র তত্র হুঃখং সপত্ন্যেযু সমৃদ্ধি ভাবঃ ॥

অতোহংশি দেবেন্দ্র বিবর্ণরূপঃ সপত্নো মে বর্ধতে তম্নিশ্যম।
সর্বোপায়ৈ মঘবন্ সন্নিযচ্ছ সংবর্তঃ বা পার্থিবং বা মরুস্তম্ ॥
জহুরি রত্ন চিনে ফেল্লেন। পুরোহিত পণ্ডিত ও সম্প্রতি দেবতামাঞ্জ বৃহস্পতির আসল ব্যাথাটা কোথায় তা জেনে নিলেন। বাসবও কম ধূর্ত নন। তাই মিষ্টকথায় বৃহস্পতিকে সামান্য দিয়ে অগ্নিকে দূত করে পাঠালেন মরুস্তের কাছে। কড়া মিঠে হুমকী দিয়ে জানাতে বল্লেন, মরুস্ত! এই যজ্ঞকার্যটি আরম্ভ করেছেন জেনে দেবরাজ বিশেষ সন্তুষ্ট হয়েছেন, তবে তিনি অহরোধ করছেন—

দেবপুরোহিত বৃহস্পতিকে দিয়েই এ যজ্ঞটি সমাধা করুন। তাতে আপনার কার্যও মহনীয় হবে, দেবতা ও মর্ত্যের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপিত হবে।

মরুস্ত বুঝলেন, এই সময় এই দেবদূতের আগমনের পিছনে কি রহস্য লুকানো আছে। যিনি পাঠিয়েছেন আসলে তিনি বাসব নন, স্বয়ং বৃহস্পতি। আমার কার্যটি পণ্ড করাও যেমন তাঁর উদ্দেশ্য তেমনি কনিষ্ঠ ভ্রাতার ঐশ্বর্য্য সমৃদ্ধির বৃদ্ধিতে ছদ্মের ঈর্ষানলও তাঁকে বিশেষ প্রেরণা দিয়েছে।

মরুস্ত রাজ্য পরিষ্কার করে বজ্রেন, অসম্ভব। পরম পণ্ডিত মহর্ষি সংবর্ধই আমার কার্য করবেন। আমি তো বৃহস্পতিকে বহুপূর্বে অছন্নয় বিনয় করে নিবেদন করেছিলাম। তখন তিনি মানবের পৌরোহিত্য করা তাঁর পক্ষে ঘৃণ্য বলেই মন্তব্য করেছিলেন এবং আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। হঠাৎ আজ সে মতির পরিবর্তন হলো কেন? আর কোন কারণে হলেও এখন আমার সিদ্ধান্তের পরিবর্তন হবে না। তাতে দেবরাজ যা পারেন করুন।

অগ্নি যথাসময়ে বাসব সমীপে উপনীত হয়ে মরুস্তের স্পষ্টোক্তিগুলি এবং চরম সিদ্ধান্তও শোনালেন। বৃহস্পতি বুঝলেন ইন্দ্রকে দিয়ে বেশ কড়া রকমের ব্যবহার চাই। বুদ্ধির রাজা বৃহস্পতি তেমনিভাবেই ইন্দ্রকে ক্ষেপিয়ে তুললেন। ইন্দ্রও দেবতাদের সঙ্গে পরামর্শ করে পুরোহিতের আবেদন সফল করতে মনস্থ করলেন।

অচিরেই ভয়ঙ্কর সঙ্কট উপস্থিত হলো। বৃহস্পতির

প্রেরণায় ইন্দ্রের অকথা অত্যাচার মরুস্তের প্রতি বর্ষিত হতে লাগলো। মরুস্ত অবিচলিত হয়ে রইলেন। মহর্ষি সংবর্ধ যজ্ঞমানের রক্ষায় নিজের ব্রহ্মবল দৈববল পূর্ণভাবে প্রয়োগ করতে লাগলেন। যজ্ঞকার্যটি প্রায় পূর্ণ হতে চললো। বৃহস্পতি মরমে মরে গেলেন। তাঁর সব কৌশল ব্যর্থ হলো। ইন্দ্র দেখলেন পুরোহিতের মান রাখতে গিয়ে সমস্ত মানবেরই শত্রু হয়ে উঠছি, আর নয়। এখনই এর মীমাংসা না করলে ভবিষ্যতের ফল প্রতিকূল হবেই।

তাই সেই সংগ্রামের মধ্যেই অগ্নিকে আবার দূত পাঠিয়ে সংগ্রাম শান্তির প্রস্তাব পাঠিয়েই নিজেই দেবতা-দিগকে নিয়ে নিজেদের মান নিজেরা খুঁয়ে মরুস্ত রাজ্যের যজ্ঞক্ষেত্র সদনে উপস্থিত হলেন। আমোদ-আহ্লাদ, সোমপান, অম্বরানুভূতি প্রভৃতি অমুষ্ঠানগুলি সম্পন্ন করলেন। এমনকি পরিবেশন কার্যও নিজেরা করলেন। সংবর্ধ নীরবে মৃদু মৃদু হাস্য করতে লাগলেন।

যজ্ঞমান মরুস্ত রাজ্যও বড়মামুদী দৈত্বের আবরণে ইন্দ্রের মিতালীকে সম্বর্ধন করলেন। দেবপুরোহিত বৃহস্পতি মর্ত্যালোকের কাছে কুটিল, ঈর্ষাপরায়াণ, স্বজাতি বিরোধী, ভীতিপ্রদ হয়ে চিরতরে পরিচিত হয়ে গেলেন।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ ফলিত জ্যোতিষে বৃহস্পতি গ্রহকে এইভাবেই বর্ণনা করেন। সাধারণ লোক বৃহস্পতির সম্বন্ধে বারবেলা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও তাঁকে শঙ্কা করেন। দার্শনিকগণ বৃহস্পতিকে নাস্তিক, তার্কিক, লোকায়তিক বলে বর্ণনা করেছেন।

ফাল্গুনী-পবন

শ্রীমুখীর গুণ

হিমাচ্ছন্ন মুক্ত মাঠে স্বচ্ছ-তোরা শান্ত নদীতীরে
কুহেলিকা-সমাবৃত হত-পত্র বৃক্ষ বৃক্ষ-মূলে
মৌন মাঘ সংগোপনে ধ্যান-মগ্ন বস্ত্র-বিশ্ব ভূলে;
ধূসর জটার ভার আন্দোলিত উত্তর-সমীরে।

মুক্তিকায়-পরিব্যাপ্ত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শিশিরে,
রবি-শস্ত্রে, মস্তুর-মটর-মৃগ-সরিবার ফুলে,
পাতুর প্রভাত-রবি পলি-পড়া বারি-শুষ্ক কূলে
সম্পর্গ-রশ্মি-স্পর্শ ব্লাইয়া যায় ধীরে ধীরে।

বস্ত্র-বিশ্ব-দৃশ্যপট সমাধির প্রশান্তির স্নেহে
মাঘের সম্মুখ হতে অপসৃত হয়েছে কখন;
একেরই অনন্তক্ষুদ্র প্রতিভাত ধ্যান-ধন্য বৃকে।
অপারিত হবে যবে কুহেলীর ধূস্র আবরণ,
ধ্যান-লব্ধ মৈত্রী-বার্তা দীপ্ত ভৃগু বিশ্বের সম্মুখে
উল্লাসে বাজায় যাবে মাঘোত্তর ফাল্গুনী-পবন।

আবার জাগো

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

ঘোর সঙ্কট, ঘনঘটা আজি, গভীর আধার-রাতি।
বিনষ্ট কভু হবে না বিরাট্ বাঙলা বাঙালীজাতি।
চিরতুর্নাদ মহাবিল্লবী বাঙালী, আবার জাগো।
শব-সাধনার উগ্র সাধক আবার কার্য্যে লাগো।
তোমরা সবাই শক্তিমত্ত, অন্তরে মহাবলী,
আজ্ঞো বিশ্বের বিপ্লিত আঁধি রয়েছে কৌতূহলী।
মৃত্যুর মাঝে লড়িতে জীবন পেয়েছ বিরাট্ প্রাণ।
তাই মাথা পেতে অরিছে সবাই তোমাদের অবদান।

তোমরা ভারতবর্ষ জাগিয়ে মুক্তি আনিলে তার।
তাই তোমাদের ভাগ্যে জুটেছে হুখের পুরস্কার।
ধ্বংস করিতে সদা ইংরেজ চেষ্ঠা করেছে কত।
কত না খণ্ড করিয়া বল লুপ্তিল অবিরত।
হেরি' অদ্ভুত জীবনীশক্তি স্বজি' মন্থস্তর
বাঙালীজাতিকে করিতে বিলোপ শ্রাশান করিল ঘর।
লাঞ্ছা লাঞ্ছা লোক মরিল না খেয়ে, তেরিয়া হয়নি তবু;
নীরবে সহ করেছে সকলি, টু'টি ছিঁড়ে নাই কভু।

অতি শয়তানী করি' অবশেষে দ্বিজাতি তত্ত্ব দিয়ে
বাজালীর মহাশক্ততা করি' হাসিতেছে দূরে গিয়ে।
চিরশক্ততা সৃষ্টি করিতে দ্বিখণ্ড করি' দেশ
চোরের মতন চম্পট দিল, লজ্জার নাহি লেশ।
বাঙালীর প্রতি ঘোর শক্ততা সাধিতে গুণ্ডা হেথা
চারিদিক দিয়ে লেলায়ে দিয়েছে দুরন্ত করি' কেতা।
সারাটা ধরণী ভুলে গেলে তবু বাঙালী যাবে না ভুলি'।
হুর্ন্তরা জালালো আশুন, প্রাণে জলে চিতা-চুলী।

মধু বক্ষিম বিবেকানন্দ হেম রবীন্দ্রনাথ
যে-জাতির মাঝে জন্ম লভিল, পোহাবে তাদের রাত।
নেতাজী যাবেরে পছা বাতালো, করে তারা কার ভয়।
বিপুল বক্ষে আশা নিয়ে তারা বিশ্ব করিবে জয়।
ঐক্যে মধ্যে প্রাণশক্তিতে হয়ে অতি দুর্ব্বার
বিশ্বজগতে বীরের আসনে বসিবে পুনর্ব্বার।
শুধিবে সিঁছু, চূর্ণিবে গিরি, উপাড়িবে শশী রবি;
যুক্ত ভারত করিবে গঠন, কয়সালা হবে সবি।

জাগো হে বাঙালী, বাঙলা-মায়ের বীরসন্তান জাগো।
যাবৎ জাতির না আসে জুদিন, নিগূঢ় কার্য্যে লাগো।
মুছিয়া অশ্রু, বাঁধিয়া বন্ধ, শোনাও রক্তবাণী।
দুর্ব্বল জনে বল দাও বুকে হৃদয়-রক্ত দানি।
ফুকারো শঙ্ক, বাজাও শূল, ফুটাও শ্রাশানে হাসি।
তোমার স্বদেশ স্বজাতির তরে প্রাণ দাও ভালোবাসি'।
বাঙালীকে আজ বাঙালী বাঁচাতে কিসের শঙ্কা-ডর।
প্রলয়ঙ্কর শঙ্করে 'অরি' হও হে অগ্রসর।

অনাগত দিন

শ্রীকেশব বাগচী

এমন দেশের নামটি তোমরা কখনো শুনেছ কেউ
হুইশো বছর পরে এলো এই স্বতন্ত্রতার চেউ।
যে দেশের গ্রিষ কোটি লোক আজো রয়েছে নিরঙ্কর
তাহাদের ভোটে জিতে দেশনেতা গদীতে করেছে ভর।
পনেরো বছর শুনেছে যাহারা নিত্য আশার কথা
ভিক্ষের ঝুলি হোলো গম্বল ঘুচেনি মনের ব্যথা।
দ্রব্যমূল্য দিন দিন বাড়ে কখনো নামে না মোটে
হু'বেলা আহার পরার কাপড় যে দেশে কভু না জোটে।
আমি যে দেখেছি সুদূর আকাশে মেঘের ডমরু বাজে
কারা যেন ওই অনাগত দিনে অপক্লপ রূপে সাজে।

কেটে যাবে ঘোর হবে ঘনঘটা বিজলী বিচ্ছুরণ
জলিয়া উঠিবে বিদ্রোহানল ঘটিবে বিক্ষোবণ।
আগ্নেয়গিরি অগ্ন্যুৎপাতে ভরে যাবে সারা দেশ
গ্রাম ও নগর হবে ছারখার ঘুচে যাবে দুখরেশ।
লাভাপ্রবাহ বয়ে যাবে দেশে আনবে যে আগরণ
আমি-যে দেখেছি স্বপন মাঝারে কালের নিমন্ত্রণ।
আবার জাগিবে নব কিশলয় বনানীতে আসে যারা
আবার আসিবে জীবন জোয়ার উচ্ছল প্রাণধারা।
তব পথ পানে তাই চেয়ে থাকি, তুমি যে দিগম্বর
নতুন দিনের জয়গান গাই মহাধ্বংসের পর।

গান্ধীজী সন্দর্শনে

অধ্যাপক শ্রীগুরুদাস গুপ্ত

[গান্ধীজীর সহিত ১৯১৫ সালে কুস্তমেলার সময় হরিদ্বারে সাক্ষাৎ হয়। সেই বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম। তাঁহার সহিত দেখা ও কথোপকথন হইবার মাত্র ২।৪ ঘণ্টা পরেই উহা রচনা করা হয়। তাহাই ২।১টি শব্দ ভিন্ন অল্প কিছু মাত্র পরিবর্তন না করিয়া কপি (copy) করিয়া দিলাম।—লেখক ২৯।১।৬৩]

১৯১৫ সালে কুস্তমেলার সময় হরিদ্বারে মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি সদ্য আফ্রিকার কার্য সুসম্পন্ন করিয়া ভারতে আসিয়াছেন।

গুরুকুলবাটীতে, গুরুকুল ব্রহ্মচারীশ্রমের ব্রহ্মচারীর তাহাকে অভিনন্দন দিবার জন্ত সমাগত হইলে বৃহৎ পটমণ্ডপে এক অতি বৃহৎ সভার অধিবেশন হয়।

দেখা গেল, খুব বড় অক্ষরে প্রাচীরের গায়ে নানাবিধ শ্লোক লেখা আছে। ২।১টীর উল্লেখ করিতেছি :—

(১) ব্রহ্মচর্য্যেন, তপসা, দেবাঃ মৃত্যুং উপায়তঃ।

ইন্দ্রহ ব্রহ্মচর্য্যেন দেবেভ্যঃ স্বরান্ভরত।

(২) প্রত্যহং প্রচেষ্টত নরশ্চরিতমাশ্বনঃ।

কিম্মু মে প্রশুভিস্তন্যঃ কিম্মু সংপূর্য্যমিতি ॥

(৩) জঁহা কমলরস পিয়া নিত্য হৈ

কিহা নিরন্তর চারি বিহার।

রাজহংস! তুমি উস সরোবর কা

কহো, করোগে ক্যা উপকার ?

সভাগৃহে বহু লোক। ব্রহ্মচারীগণের পিতামাতা ও আত্মীয়েরা বৎসরে একবার তাহাদের সহিত দেখা করিতে পারেন। এই নিয়মাবলী অর্থাৎ গৃহী-নরনারীও সমবেত হইয়াছিলেন। বহু সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও নাগরিক উপস্থিত ছিলেন।

পূর্বকালে রাজপুত জাতির মধ্যে চারণগণ উদ্দীপনা-পূর্ণ গীত গাহিয়া নরনারীকে উৎসাহিত করিতেন। এখানেও একটি সুগায়ক অতি ওজস্বিনী ও গভীর মধুর ভাষায় ভারতের অধঃপতনের কারণ, ব্রহ্মচর্যের অতাবের

বিষয় বল, প্রকৃত বিবাহ কাহাকে বলে, ইত্যাদি বর্ণনা-গান করেন। লোকে মুগ্ধ হইয়া শুনি।

কুস্তমেলা উপলক্ষে গৃহী ও সন্ন্যাসীর এক চমৎকার মিলন-ক্ষেত্র হয়। গায়ক-কবি জনসংঘকে ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ গ্রহণ করিবার জন্ত বহুবা উৎসাহিত করিলেন।

এই উদ্দীপনাময় শ্লোকগীতি যেন তখন শ্রোতাদের নবজীবন প্রদান করিল।

অতঃপর গান্ধীজী আসিলেন—নগ্নপদ, মাথায় সাদা পাগড়ী, গায়ে কুর্তা ও মোটা চাদর, পরিধানে মোটা ধূতি। মুখখানি হাসি ও আনন্দে ভরা।

একজন ব্রহ্মচারী বাঙ্গা ক হিন্দী ভাষায় অভিনন্দন পাঠ করিলেন। তাহার মর্ম—“অমর চালক, আপনি মাতৃভূমির কৃতী সন্তান, জন্মভূমির সেবায় আপনার জীবন উৎসর্গীকৃত। আমাদেরও আকাঙ্ক্ষা আপনার ছায় ভারতজননীর সেবা করিয়া কৃতার্থ হইব। আপনার আশীর্বাদ আমাদের উপর বর্ষণ করিতে আশ্রা হয়।”

অতঃপর গান্ধীজীকে অনেকগুলি পুস্তক উপহার দেওয়া হইলে, তিনি বলিলেন, “যখন দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ভারতে আসি, তখন এণ্ড্রুজ (C. F. Andrews) আমাকে এখানকার তিন মহাত্মবীরের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হইতে বলেন—আজ তাঁহাদের অমৃতমহাত্মা মুনসীরামজীর (স্বামী প্রদ্বানন্দ) সহিত মিলিত হইয়া নিজেদের বহু মনে করিতেছি। আশীর্বাদকামী হইয়া আপনাদের ও সর্বভাগী সন্ন্যাসীমণ্ডলের নিকট উপস্থিত হইলাম। আপনারা আমার প্রতি প্রেম হউন। আমার শিখাইবার মত কিছুই নাই। ছাত্র হইয়া, শিষ্য হইয়া যুক্ত করে আপনাদের প্রসন্নতা ভিক্ষা করিতেছি।”

তদনন্তর, মহাত্মা মুনসীরামজী বলেন—“কিছুকাল পূর্বে গান্ধীজী আমাকে এক পত্রে ‘ভাই’ সম্বোধন করিয়াছিলেন। আজ আমি সত্যই তাঁহাকে ভ্রাতৃত্বপূর্ণে পাইলাম। ভারতমাতার সেবাকার্যে আমি একজন সঙ্গী

পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছি। আমার এই বার্ষিক্যে তাঁহার মৰল হস্তে গুরুভার ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিব, এই আশায় উৎফুল্ল হইয়াছি।”

অখিল ভারত হিন্দুসভা

এই সম্মেলনেও আমরা উপস্থিত। গান্ধীজীও গিয়াছিলেন। সভার উদ্দেশ্য জটিল সমস্যাসীর ভাষণে স্পষ্ট হইল। তিনি বলিলেন—সকল ধর্মেরই সকল সমাজেরই একটি একপ্রাণতা আছে। উহাদের একস্থানে আঘাত লাগিলে সর্বত্র সমবেদনা জাগ্রত হয়। ধর্মের নামে সমস্তরক্ষার অশেষ বাধা ও বিপদ তুচ্ছ হইয়া যায়। হিন্দুধর্মের উক্তবিধ ঐক্যভাব এবং সমপ্রাণ উদ্ভূত না হইলে কোন মহৎ কার্য সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব।”

অতঃপর বক্তৃতার পর বক্তৃতা হইল। কেহ কিছু প্রস্তাব করিলেন, কেহ উহা সমর্থন করিলেন। ভারতের কোন প্রদেশেরই প্রতিনিধির অভাব ছিল না। কুম্ভমেলা উপলক্ষ্যেই বোম্বাই, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, রাজপুতনা, বাংলা, বিহার, পাঞ্জাব, উড়িষ্যা প্রভৃতি রাজ্য হইতে বহু দর্শক আসিয়াছিলেন। এই সভায় একই মামুলী ব্যাপার—বহু ভাষণ কিন্তু গঠনমূলক কাজের কোন আভাষ পাওয়া গেল না।

আমার মনে হইল—এই অভিনয়টি দেখিয়া কর্মবীর গান্ধীজীর নিশ্চয়ই কতই না বিরক্তির ভাব হইতেছে। তাঁহাকে বক্তৃতা দেওয়ার জন্ত বহু গীড়াপীড়ি সত্ত্বেও, তিনি কিছুই বলিলেন না।

রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম

গান্ধীজী এই আশ্রম পরিদর্শন করিতে অমনিহ আসিয়াছেন বিনা - নিমন্ত্রণে। দর্শনীয় স্থানসকল দেখিয়া বেড়াইতেছেন। সঙ্গে গুরুকুলের একজন অধ্যাপক। তাঁহার আগমনের অব্যবহিত পূর্বে কাশিম-বাজারের মহারাজা দর্শনীয় স্থানসকল দেখিয়া পরিদর্শন বহিতে (Visitors Book) অভিযত লিখিতে বসিয়াছেন। গান্ধীজীকে দেখিয়াই আমি তাঁহার সহিত বাহির হইয়া পড়িলাম। আশ্রমের একজন ব্রহ্মচারী সকল অস্থতান বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। যে ঘরে সম্যাসী রোগীই

সাধারণতঃ থাকেন, সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মচারী কহিলেন—“স্বামী বিবেকানন্দ এক সময়ে হৃদীকেশে গুরুতর আক্রান্ত হইয়া বুঝিয়াছিলেন, সম্যাসীদের জন্ত তীর্থস্থানে দাতব্য চিকিৎসালয় হওয়া প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যেই এখানে আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। তবে, বর্তমানে এখানে সকল লোকেরই সেবা করা হয়।

অতঃপর ক্ষয়কাশের ওয়ার্ডে (Ward) গিয়া দুইজন যুবক ছাত্রকে ঐ রোগে আক্রান্ত দেখিয়া গান্ধীজী উহাদিগকে বলেন—“It is the pure air which cures a pthysical patient, with pure air and nourishing food, I guarantee cure.” উহাদিগকে লছমনঝোলায় কিংবা আরও উপরে যেখানে বিশুদ্ধ বায়ু সর্বদা পাওয়া যায়, যাইতে উদ্দেশ্য দিয়া বলেন—“নির্মল হাওয়া গ্রহণের ফলে ক্ষয়রোগ আরোগ্য হয়। নির্মল বায়ু ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের ফলে ক্ষয়রোগ নিরাময় হয়—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।”

তদনন্তর কলেরা ওয়ার্ড দেখিয়া আউট ডোর (out door—যেখানে বাহির হইতে আগত রোগী ঔষধপত্রাদি লইয়া ঘরে যায়) হাসপাতালে গেলেন। আমি বরাবর সঙ্গে আছি। ডাক্তার সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সাময়িকভাবে বেশ কিছুদিনের জন্ত ডাক্তারখানার কর্তা (incharge) তখন। তাঁহার সহিত মহাত্মাজীর পূর্বে পরিচয় ছিল। সেখানে সুরেশচন্দ্রের সহিত গান্ধীজীর যে কথাবার্তা হয় তাহার মর্ম এইরূপ (কথাগুলি ইংরাজী ভাষায় হয়। ইংরাজী সহ বাংলায় তাহা লিখিলাম)।

গান্ধীজী বলিতেছেন—“I will start to-night for Delhi and thence to Madras. My sons and boys are with me and are working with the Sahayak Samiti (সহায়ক সমিতি)। After the completion of relief work here they will put up with Mahatma Munsiramji at Gurukul. I am not yet sure where I will permanently settle. My boys will stay with me where I settle”. (আমি আজ রাতে দিল্লী যাইব। তথা হইতে মাদ্রাজ। আমার

পুত্রেরা ও সহকর্মীরা আমার সঙ্গেই আছে এবং সহায়ক সমিতির সঙ্গে এখানে কুস্তমেলার সেবার কাজে রহিয়াছে। এখানকার সেবার কাজ শেষ হইলে তাহারা মহাত্মা মুন্সীরামের তত্ত্বাবধানে গুরুকুলে থাকিবে। আমি কোথায় স্থায়ীভাবে বসিব তাহা এখনও অনিশ্চিত। যেখানে আমি স্থির আসন করিব সেখানে উহারাও যাইবে।)

বলা বাহুল্য, এইসব কথা প্রমোত্তরের মাধ্যমে হইতেছিল। গোথ্লে প্রতিষ্ঠিত সেবক সম্প্রদায়ের সহিত (with the servant of India Society) তাহার কতটা যোগ রহিয়াছে জানিতে চাহিলে বলিলেন—“I am still a probationer of the Servant of India Society and will continue to do so for a year, when I shall decide whether I should be in direct connection with (আমি এখনও গোথ্লে সেবক সমিতির একজন শিক্ষানবীশ। আরও এক বৎসর ঐ ভাবে থাকিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঐ সমিতির সহিত মিলিব কিনা নিশ্চয় করিব)। উক্ত সমিতির সহিত তাহার মতভেদ কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন—“It is certainly no secret. The main point of difference between myself and the society is that the latter is imbued with western ideas and principles—my idea is purely eastern.” (এই ব্যাপারে গোপনীয় কিছুই নাই। উভয়ের মধ্যে প্রধান অনৈক্য হইতেছে পাশ্চাত্য আদর্শ ও মনোবৃত্তি লইয়া ঐ সমিতি গঠিত। আমার আদর্শ হইতেছে সম্পূর্ণ জাতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কাজ করা।)

“স্বকুল ব্রহ্মচর্যাশ্রম” সম্বন্ধে (এই আশ্রম সনাতনী-দের—ইহারা সনাতনীভাবে ছাত্রদের শিক্ষাদি প্রদান করেন) জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন—“পূর্বে এই আশ্রম সম্বন্ধে অনাস্থার ভাব ধুব ছিল। কিন্তু উহা এখন অন্তর্হিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠান কতিকারক নহে। কতকটা মঙ্গল ইহার দ্বারা ঘটিতে পারে। “I was first much prejudiced against it. That prejudice now gone. It is not a harmful organisation and can do some good”.

পূর্বোল্লিখিত নিখিল ভারত হিন্দুসভা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া বলেন—“আমি অতিমাত্র বিরক্ত হইতে-

ছিলাম। পূরা তিনঘণ্টা যন্ত্রণা পাইয়াছি। কিছু বলিলে বিবাদের কারণ হইতে পারে, এতদ্ব্যতীত করি নাই। সভার উদ্যোগীরা আমাকে কিছু বলাইতে চাহিয়াছিলেন। তাহাদের অনুরোধ রক্ষা না করায় তাহাদের সন্দেহ হইল, হয়ত আমার হিন্দুধর্মে বিশ্বাস নাই। আমি বলিলাম—“এইভাবে আপনারা আমাকে কোণঠাসা করিতে প্রয়াস পাইলেও আমি নিরুপায়।”

এই হিন্দুসভা বলিতে কি, পাশ্চাত্যের নকল ভিন্ন আর কিছুই নয়। হিন্দুধর্মই স্বর্গতে একমাত্র সত্য ধর্ম—অতের অনুকরণ করিবার এ বিষয়ে কিছুই নাই। “নিখিল ভারত হিন্দুসভা” এই নাম মিথ্যা উপহাস। হিন্দুধর্ম সকলেরই প্রাণস্বরূপ এবং ঐক্যবিধায়ক—“I was awfully disgusted with it. I had been tortured for full three hours and intentionally made no speech for that would certainly create a jar. The organisers wanted me to speak something and on my not acceding to their request, they doubted my faith in the Hindu religion. I told them “you may thus drive me into the corner but I cannot help”. It is nothing but a copy of the west. The Hindu religion is the only true religion in the world and it needs no copy. The name “All India Hindu Sabha” is a mockery. The Hindu religion is all soul all unity.”

উক্ত বৃহৎ ও আড়ম্বরপূর্ণ সভার কার্যকলাপ দেখিয়া আমরা মনে করিয়াছিলাম এ একটা বড় রকমের প্রহসন (farce) এবং ভাবিয়াছিলাম গান্ধীজী নিশ্চয়ই এই প্রহসন দেখিয়া বিরক্ত ও গম্ভীর হইতেছেন। ইহা আমাদের নিকট শুনিয়াই তিনি হাসিয়া ফেলিলেন—“এ ব্যাপার প্রহসনের চেয়েও নিকট; কারণ প্রহসন দেখিয়া লোকের ক্ষুণ্ণ হইতে পারে, এখানে কিন্তু হাসি-কৌতুকেরও কিছু নাই” (It is worse than a farce for a farce can be enjoyed).

গুরুকুল ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও বোলপুর শান্তিনিকেতন, উভয় স্থলেই গান্ধীজীকে অভিনন্দিত করা হইয়াছিল। ডাঃ জুরেশচন্দ্র দুই জায়গায়ই উপস্থিত ছিলেন। তিনি

জিজ্ঞাসা করেন—“উভয় স্থানের অভিনন্দনের মধ্যে তারতম্য অনুভব করিয়াছিলেন কি? (Do you feel any difference in the nature of the reception in these place?)।” গান্ধীজী বলিলেন—“বাস্তব: দেখিলে শান্তিনিকেতনের অভ্যর্থনা পুরোপুরি প্রাচ্য-ভাবাপন্ন—গুরুকূলে বাস্তব: যেন কিছু পাশ্চাত্য ভাবের সংমিশ্রণ ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গুরুকূলের অভ্যর্থনার ব্যাপারটি অধিক আধ্যাত্মিক। শান্তিনিকেতনে বিশেষ কলানৈপুণ্য লক্ষিত হইয়াছিল। হার্মোনিয়মের কর্কশ ধ্বনি গুরুকূলে অতিমাত্র বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছিল। শান্তিনিকেতনে সংগীত ও বাদ্য এবং অন্তান্ত অমুঠান প্রাচ্যরীতি অমুঠানী। কিন্তু আন্তরিকতা এবং অমুঠান উভয়স্থলেই প্রাচ্যধারামণ্ডিত এবং গভীর ও পরিমাণে সমতুল্য। “The reception at Santiniketan was outwardly all eastern and that of Gurukul flavoured with a western tint; but the affair of Gurukul is more Spiritual. The jarring note of harmonium at Gurukul was awfully disgusting. At Santiniketan music and other functions were all after the eastern idea. As regards the love and warmth, it is in both places purely eastern and in depth and intensity one is not behind the other.”

গান্ধীজী আরও বলিলেন—“কিন্তু এটি লক্ষ্য রাখিবে, ভারতবর্ষে আমি অতিমাত্রায় প্রশংসিত হইতেছি। আমি জানি আমার প্রকৃত মূল্য কি। মনে হয় ত্রিগোখ্লে সকলের নিকট বড় বেশী বাড়াইয়া প্রচার করায় এইরূপ হইতেছে—(“But you see, I have been too much exaggerated here in India. I know what I really am. I trust Mr. Gokhale is responsible for this overestimation of the people about myself.”)

কুস্তমেলা তাঁহার কেমন লাগিল জিজ্ঞাসা করায় যেন একটু বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন—“ধুব উৎকৃষ্ট উপাদান রহিয়াছে, কিন্তু বর্তমানে তাহার অপচয় হইতেছে। কি করিয়া উহার সদ্যবহার সম্ভব তাবিবার বিষয়।”—(a good deal of capital, at

present, it is wasting, the question is how to utilise it.)

অতঃপর প্রশ্ন—আপনার সহিত কোন বিশিষ্ট সাধুর এখানে দেখা হইয়াছে কি?

উত্তর—না (No).

প্রশ্ন—ভারতের কুত্রাপিও কি আপনার আদর্শমুখ্য সাধু সন্দর্শন হয় নাই?

উত্তর—“এ পর্যন্ত ত হয় নাই। হয় ভাল সাধু আছেন, আমি যথোচিত গুরুচিহ্ন হই নাই। এজ্ঞা তাঁহাদিগকে ধরিতে পারি নাই। যাহাই হউক, আমি গুরুকরণের জ্ঞান নিরন্তর গুরু অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছি। (Not as yet. There may be Shadhus; I am not perhaps sufficiently pure to recognise, them. I am, however in the constant search for a Guru.)

প্রশ্ন—আপনার মতে প্রকৃত সাধুর বিশেষত্ব কি?

গান্ধীজী একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—“প্রকৃত সাধু যম, নিয়ম, ধ্যান, ধারণা, সমাধিসম্পন্ন হইবেন।”

কিন্তু আমাদের জানিবার বিশেষ আগ্রহ লক্ষ্য করিয়া আরও বলিলেন—“প্রকৃত সাধু পূর্ণমাত্রায় হিন্দু—সর্বস্বত্যাগী, প্রেমময় ভগবানের সহিত অভিন্ন—জগৎ-পরিকল্পনায় বীর সানর্থ্য সম্পূর্ণ এবং যাহার “আলোকের দ্বারা অন্ধকার তিরোহিত হউক” ভাবনামাত্র অন্ধকার নষ্ট হইয়া আলোক আবির্ভূত হয়, তিনিই সত্যিকার সাধু। “He is one, who is absolutely a Hindu, who is all sacrificing—all love, who is one with God, who can lead the world and with Him ‘let there be light and there is light’ is a matter of fact.”

ঐরূপ সাধু আছেন কিনা সন্দেহ করিয়া অরেশচন্দ্র বলিলেন—“তাহা হইলে সম্ভবতঃ বহু জন্ম ধরিয়৷ আপনাকে ঐরূপ সাধু খুঁজিতে হইবে।” এই মন্তব্য শুনিয়া গান্ধীজী একটু অসহিষ্ণু হইয়া বলিলেন—“হিন্দুধর্ম আমার আর কিছু না করিলেও ধৈর্য ধারণ করিতে শিখাইয়াছে। গুরু অন্বেষণে আমি জীবনপাত করিতেও প্রস্তুত। যখন আদর্শমুখ্য গুরু পাইব, তাঁহার নিকট দণ্ডবৎ হইয়া তাঁহার পদকমল পূজা করিব।

তাহাকেই আমি জিজ্ঞাসা করিব কেন ভারতবর্ষ তমসাচ্ছন্ন?—কেনই বা এই আঁধার নষ্ট হইতেছে না?” “Hinduism has at least taught me patience. In search of a Guru, I shall break my head and to such a spirit, when I find him, I shall bow my head—his feet I shall worship. To him I shall ask “why India benighted? Why is not darkness dispelled?”

ইহা শুনিয়া সুরেশচন্দ্র বলিলেন “যে প্রকৃতির সাধু আপনি খুঁজিতেছেন, কালে সম্ভবতঃ আপনিই সেইরূপ গুরু হইয়া দাঁড়াইবেন।” তৎপরে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া গান্ধীজি বলিলেন—“হইতে পারে, খুবই সম্ভব” (may be, that is quite possible).

এইক্ষণ আশ্রমাধ্যক্ষ কল্যাণানন্দজী উপস্থিত হইলেন—চলিতে চলিতে একটি স্থান নির্দেশ করিয়া গান্ধীজিকে ইংরাজিতে বলিলেন—“এখানে দমিত (suppressed) জাতিদের জন্ম একটা বড় ইঁদারা করিবার আয়োজন হইয়াছিল। অর্থাভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় নাই। ছুঁৎ বিধায় এদেশবাসীরা বাংলাদেশেরও উপরে উঠিয়াছে। বাংলাদেশে এক ইঁদারায় সকল জাতিই জল আঁহরণ করিতে পারে, তাতে দোষ হয় না। এখানে ঐরূপ অসম্ভব।” কল্যাণ স্বামিজীর দমিত

(suppressed) শব্দটি লক্ষ্য করিয়া গান্ধীজি খুব খুশী হইলেন দেখা গেল। বলিলেন—“অবনত বা অহুন্নত শব্দ বাস্তবিকই এ স্থানে প্রযুক্ত হইতে পারে না। ইহারা প্রকৃতপক্ষে দমিত, অবনত বা অহুন্নত নহে।”—“I like the word ‘suppressed’. They are really suppressed and not depressed.”

পরিদর্শনান্তে মহাত্মা পরিদর্শন বহিতে (visitors book) আপন মন্তব্য গুজরাটী ভাষায় (ইহাই গান্ধীজির মাতৃভাষা) লিখিয়া বিদায় লইলেন।

ইংরাজীতে না লিখিয়া স্বীয় মাতৃভাষায় পরিদর্শন ফল লেখা এই প্রথম দেখিলাম। ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিমাঝেই পরিদর্শন বহিতে ইংরাজীতে মনোভাব প্রকাশ করেন, ইহাই জানা ছিল।

শুনিয়াছি গান্ধীজির প্রথম কর্মক্ষেত্র দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়র সেনাপতি (Dutch General) বোথা (Botha) যখন কার্ঘ্যোপলক্ষে ইংলণ্ড যান, তখন স্বয়ং ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ও সুপণ্ডিত হইলেও সত্ৰাটের সহিত দোভাবীর সাহায্যে মাতৃভাষায় আলাপ করিয়াছিলেন।

গান্ধীজী মাতৃভাষায় পরিদর্শন ফল লিখিলেন দেখিয়া আমার খুব একটা শিক্ষালাভ হইয়াছিল।

শিলিমুখ মন

বারীজকুমার ঘোষ

পৃথিবীর সময়ের অরণ্যের ঘরে
আরও ঢের বিশ্বয় বাকী আছে
হে বিরাট, হে অসীম নদী,
কেন তবে কান্নার এত ঢেউ ঝরে ॥

গোণা দিন নিঃশেষ হলে—

শূন্যতার অন্ধকার আরও নেমে আসে

হৃদয়ের পোড়া মাটি

ইন্দুনীল-মমতার ঘাসে,

সংখ্যাতীত জোনাকীর

কান্নার শিখা তবু জ্বলে ॥

সম্পাদকীয়

ভারতবর্ষ : মহাভারতের আদর্শ :

বিগত মাঘ সংখ্যা প্রবর্তকের 'ইতিহাসের ইঙ্গিত' শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধটি অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। এই অনেকের মধ্যে সাধু, মহাত্মা, সিদ্ধাচার্য্য মনীষী, পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক, প্রগতিবাদী, দক্ষিণ ও বাম সর্বশ্রেণীর মানুষই আছেন। কয়েকখানি পত্রের অভিমত হুবহু আমরা এখানে উদ্ধৃত করিলাম এইজন্য যে, ইহাতে দেশ ও জাতির চিন্তার একটা প্রতিকলন মিলিবে। প্রবর্তক মাসিক পত্রিকা। ইহার পাঠক সংখ্যা সীমিত। তথাপি বিভিন্ন মহল হইতে লিখিত ও বাচনিক যে সব বক্তব্য আমরা পাইয়াছি তাহাতে একটা জিনিস স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, বর্তমান শাসক-গোষ্ঠীর নির্বীণ্য পৌরুষহীন নীতির উপর মানুষের মন তিক্ত-বিরক্ত, আস্থাহীন। গণতান্ত্রিক দেশ আমাদের। লোকমত শ্রদ্ধার সঙ্গে বিচার্য্য ও সমীহ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

॥ পত্রে জনমত ॥

তারকেশ্বরের ভূতপূর্ব কোহল পরম পূজনীয় অনন্তলী জগদগুরু শঙ্করাচার্য্য শ্রীমদগীষ্মী জগদ্বাশ্রমপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য লিখিয়াছেন :

“দানবের রাজত্ব যাহা কলিত হয় তাই হইতেছে এবং হইবে। কর্ণধারগণ দল রাখিবেন না জাতির কল্যাণ করিবেন। আমার বিশ্বাস, এই অত্যাচারের পর আবার ভালই ফল হইবে। ইহাই ঐ জাতির শেষ অত্যাচার হোক। যতটুকু জ্ঞান, প্রায় ২ বৎসর কাল এখনও অত্যাচার অবিচার চলিতে থাকিবে। শ্রীভগবানের আবির্ভাব ব্যতীত এই দানবীয় লীলা নিবৃত্ত হইবার আশা কম। তাই ডাকছি তাঁকে আবার আসিতে। নিশ্চয়ই তাঁকে আসিতে হইবে, ইহাই আমার স্থির বিশ্বাস।”

স্বগাচার্য্য বিজয়কৃষ্ণ - কুলদানন্দজীর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী ও সঙ্গত্ব সাধন-সজ্জের প্রতিষ্ঠাতৃ-সভাপতি শ্রীমৎ গঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারীজী লিখিয়াছেন :

“মাঘ সংখ্যা প্রবর্তকের বলিষ্ঠ সম্পাদকীয়ের জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি। এতে আমার প্রাণের কথাটিই বলা হয়েছে। আশ্চর্য্য, দ্রোণদীর বেণী অবদান রাখার সঙ্কল্পের কথাটি বিবর্তন পত্রিকার সম্পাদকীয়তেও এবার দেওয়া হয়েছে। পত্রিকা শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। বহু-জনকে প্রবর্তকের সম্পাদকীয়টি পাঠ করিয়ে শুনিয়েছি। বাঙালীর বর্তমান দুর্বলতায় নিরন্তর মর্মবেদনা অল্পভব করছি। তবে বিশ্বাস আছে, ভারতবর্ষ আবার স্বধর্ম্মে প্রপ্রতিষ্ঠ হইবে।

“ধর্ম্মপ্রাণ ভারতের প্রতি শ্রীভগবানের বেদবাণী : স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ। অস্তরীক্ষে ঋষি-সমাজের ও প্রত্যক্ষভাবে গোপ্বামী প্রভু বিজয়কৃষ্ণের অমর্ত্য্য প্রভাবে ঊনবিংশ শতকে ভারতের অন্তরাস্রাঘ দেখা দেয় রেনেসাঁ বা নব জাগরণ। ভারতীয় স্বাভাব্য, অধ্যাত্মবীর্ষ্য ও দুর্জয় সংগ্রামে প্রকম্পিত হয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তিমূল। কিন্তু বিংশ শতকের মাঝামাঝি এসেও এই নিগূঢ় তত্ত্ব তথাকথিত জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের অহুধ্যানে ধরা পড়ে নাই; পরন্তু তাঁদের ক্ষমতা লাভের মোহে সংকীর্ণতা ও কূটনীতির সাধে আপোষের মাধ্যমে ভারততীর্থ দ্বিধাভিত হতেই স্বাধীনতার নববর্ষ সমাচ্ছন্ন হলো দুর্বলতা ও পঙ্কিলতার কালো মেঘে। তারপর জড়বাদ ও নগ্ন ভোগবিলাসেব রক্তপথে রাষ্ট্রনায়কদের জঘন্ত দুর্নীতি ও ক্লীবত্বের ফলে আজ প্রকটিত জাতীয় চরিত্রের সর্বনাশ। অধোগতি। সেই সঙ্গে চীন-পাকিস্তানের বর্বরতা ও বুটেন-আমেরিকার কপটতায় ঘনিষে এসেছে ঘোর দুর্খোণের ঘনঘটা। এই সংকট ও নিশ্চিত ধ্বংসের কালগ্রাস থেকে পরিজ্ঞান পেতে হ'লে নেতৃবৃন্দকে ফিরে পেতে হবে আত্মচেষ্টনা ও আত্মশক্তি—ভারতীয় আত্মবীর্ষ্য ও ক্ষাত্রশক্তিতে শক্তিমান হ'য়ে উদ্বুদ্ধ রাষ্ট্রনায়কদের দাঁড়াতে হবে বীরের মত। তবেই রক্ষা হবে ধর্ম্ম ও মানবতা—চরম বিপর্যয় থেকে বাঁচবে ভারতবর্ষ ও সারা জগৎ। নাত্ত পছা বিদ্যাতে অন্ননায়।”

গোরক্ষপুর কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীমৎ অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (শ্রীমৎ গঙ্গানন্দজীকে লিখিত পত্রে) জানাইয়াছেন :

“মাহুষের প্রতি মাহুষের অমাহুষিক অত্যাচার, দুর্বলের প্রতি সবলের নৃশংস ব্যবহার, দেবতার প্রতি অমুর-রাক্ষসের পীড়ন—এ সব তো ঠাকুরের এই সাংসারিক লীলার ক্ষেত্রে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। চিরকাল এই সবের ভিতর দিয়েই মানবজাতির অভ্যুদয় হয়েছে। হিন্দুজাতি যদি সুসংবদ্ধ, সুগঠিত, সবল, আত্ম-সংরক্ষণে সমর্থ না হতে পারে, তবে জাতি হিসাবেই তাকে বার বার মার খেতে হবে, মরেও যেতে পারে। ইহাই তো লীলাময় ঠাকুরের লীলাবিধান। তাঁরই বাণী ‘বলবান হও, নতুবা মরণের অস্ত্র তৈয়ার হও।’... ঠাকুর ক্রীত্ব থেকে আমাদের উদ্ধার করুন।”

*

মনীষী পণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য্য এক পত্রে (১৩/৩/৬৪) মাঘ সংখ্যা প্রবর্তক পাঠ করিয়া যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণই এখানে তুলিয়া দিলাম। এই সংখ্যায় প্রকাশিত ‘মহাত্মারতে গীতা কি প্রসিদ্ধ?’ শীর্ষক প্রবন্ধের সম্বন্ধেও তিনি যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তার প্রতিও লেখক ও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। অধ্যাপক শ্রীভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন :

“মাঘ সংখ্যার সম্পাদকীয়টি ভাল লাগিল। জাতীয় চেতনা ও গৌরব উদ্ধার করার অস্ত্র একরূপ লেখার নিরন্তর ও একান্ত প্রয়োজন। বাংলার বিপ্লবী আত্মা না জাগিলে অচিরকালে ভাগীরথী পাকিস্তান সীমান্ত হইবার আশঙ্কা দেখা দিতেছে। এই সংখ্যায় গীতার প্রসিদ্ধবাদ সম্পর্কে যে সংশয় উঠান হইয়াছে—ইহা কি ‘কুট প্রসঙ্গের’ নির্ণয় নাকি? ভীষ্মপর্বের শুধু স্তূতিপত্র দৃষ্টে কোতুক ও বিস্ময় বোধ হয়। এই পর্বে ১১৭ অধ্যায়—৪৪ অধ্যায়ে ভীষ্মের প্রথম দিনের যুদ্ধারম্ভ ও ১১৪ অধ্যায়ে দশম দিনের যুদ্ধান্তে তাঁহার পতন বর্ণিত হইয়াছে। সমস্তই সঞ্জয়োক্তি। সমস্তই ১৩-অধ্যায়ে ভীষ্ম-পতন সংবাদের উল্লেখের পর। গীতারম্ভ এই কারণে প্রসিদ্ধ ধরিলে, অথ সকল যুক্তান্তের কি গতি হইবে? মহাত্মারতে যেখানে গীতোপদেশ উল্লিখিত হইয়াছে—যথা পর্ব সংগ্রহ ও অমুগীতা প্রসঙ্গে তাহারই বা কি গতি হইবে? লেখকের এই সংশয় উত্থাপনের কথা যদি বিরাট গ্রন্থের

আলোচনার প্রসার হয় তাহা মঙ্গল। কিন্তু এত শূন্য বৎসরের শিষ্ট পরিগ্রহের মূল উৎসাহ করিতে হইলে এই ভূমার দেশে বিরাট আয়োজন আবশ্যক নহে কি? ১৩ অধ্যায়টি সঞ্জয়ের দিব্য দর্শন ও বর্ণনের পটভূমিকা মনে করা কি অর্যোক্তিক?”

*

অধ্যক্ষনিষ্ঠ মনীষী ডাক্তার শ্রীনলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত লিখিয়াছেন (১৪. ৩. ৬৪) :

“প্রবর্তকে ‘ইতিহাসের ইজিত’ শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ পড়িলাম—পড়িয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। এ বিষয়ে কেহ চিন্তা করে না, এই ধারায় অপর কেহ লেখেও না; সকলেই বাহিরের কাহাকেও দোষ দেয়, যথা—পাকিস্তান, নেহেরু-সরকার ইত্যাদি। এ দোষ যে আমাদের—আমাদের কাপুরুষতাই যে একরূপ বর্বরতার একমাত্র কারণ, তাহা কেহ বলে না। কত বড় কাপুরুষ হইলে, কতখানি মেরুদণ্ডহীন হইলে এইরূপ অত্যাচার সম্ভব হয়, তাহা যেন কেহ বুঝিয়াও বোঝে না। এক অক্লান্ত, অমাহুষিকারী অহিংস নীতি আমাদের কাছে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে—তাই আমরা আমাদের মার খাই, মুসলমানের কাছে মার খাই, সর্বত্র আমরা লাঞ্চিত ও পদদলিত। সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হইয়াছে যে, ১৯০৫-১১ সালে বাঙালী মাহুষ ছিল। আমি সে সময়কার এমন ঘটনা জানি যাহাতে বলিতে পারা যায় যে, বাঙালী তখনও অমাহুষ অতিমাত্রায় ছিল। ভারতীয় সৈন্তের মধ্যে বাঙালী ব্রিটিশ রাজত্বের ছিল না, এখনও নাই। বাঙ্গালাদেশের পুলিশের মধ্যেও বাঙ্গালীর কঠিন দায়িত্বপূর্ণ কার্য থাকিলে দেওয়া হয় না। ঠেলা, রিক্সা-টানা, মুটেগিরি—কোন কাজে বাঙালী পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে যদি কখনও সাক্ষাৎ হয়, তখন আমার আরও অনেক কথাই বলিবার রহিল। বাহা হউক, সম্পাদকীয় পড়িয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। যদি অমুরূপ চিন্তার ধারায় বাঙ্গালীর মনুষ্যত্ব কিরিয়া আসে—শ্রীভগবানের নিকট তাহাই প্রার্থনা করি। ইতি।”

*

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্মান ভাষার অধ্যাপক ও বেঙ্গল কেমিক্যালের চীফ কেমিষ্ট ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস এক পত্রে (১৪. ৩. ৬৪) লিখিয়াছেন :

“মাঘ সংখ্যা প্রবর্তকের সম্পাদকীয় এত বীর্যবন্ত ও প্রকৃত সত্যের উদ্ঘাটক হয়েছে যে উহা pamphlet আকারে ছড়ানো দরকার। জাতি ক্লীব হয়ে গেছে। পৃথিবী ইতর হতে ইতরতর হতে বসেছে। মধ্যযুগে যেরূপ অবাধ নরহত্যা চলেছিল এ তার চেয়েও ঘৃণ্য ও কাপুরুষতার পরিচায়ক, কিন্তু যারা ইহা করছে তারা কোন কালেই rational হবে না। ভারতের হিন্দুরা জন্মনিরোধ করছে, কিন্তু এরা অবাধ অজ্ঞ অসংসর্গ ও সম্ভান উৎপাদনে ত্রুটি। পৃথিবীর খাদ্য এরাই নিঃশেষ করবে, হিন্দুরা জন্মনিয়ন্ত্রণ করলে হবে কি ?..... ধর্মসম্মান—ইহার একমাত্র solution যুদ্ধ। মহাকবি গ্যাটে যিনি বিশ্বপ্রেম ও শান্তির পরম ভক্ত ছিলেন তিনি যুদ্ধের দ্বারা এরূপ বিষয়ের নিষ্পত্তির কথা বলেছেন। তাঁর foust কবিতা হতে কয়েকটি লাইন তুলে দিলাম :

Träumt ihr den Friedenstag ?
Träume, wer träumen mag !
Krieg ! ist das Lösungswort.
Sieg ! und so klingt es fort.
Keine Wälle, keine Mauern,
Jeder nur sich selbst bewusst !
Feste Burg, um auszudauern,
Ist des Mannes ehre Brust.
Wollt ihr unerobert wohnen,
Leicht bewaffnet rasch ins Feld !
Frauen werden Amazonen
Und ein jedes Kind ein Held.

“কবিতাটির মর্মার্থ : তোমরা কি শান্তির স্বপ্ন দেখছ ? স্বপ্ন দেখ যত পার ! যুদ্ধই একমাত্র word of solution এবং বিজয় ! দুর্গ, প্রাকার, পরিখা কিছুই মাহুষের অদম্য মনোবলের কাছে দাঁড়াতে পারে না। মাহুষের ইম্পাতকটিন বক্ষই প্রকৃত অভেদ্য দুর্গ। অবিজিত ভাবে বাস করতে যদি চাও তবে সহজ যুদ্ধ সাজে সম্বিজিত হয়ে জলদি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড় ! মেয়েদের হাতে হবে Amazon সদৃশ, এবং প্রত্যেক বালককেই হাতে হবে পরাক্রান্ত বীর।

“যাক মোটের উপর সম্পাদকীয়টি সমন্বয়যোগী ও জোরালো হওয়ায় অভিনন্দন জানাচ্ছি। প্রবর্তকখানি সম্পাদকীয় দেখার ক্ষমতা বন্ধুদের হাতে হাতে ঘুরছে। তবে একটা কথা। মেঘেরা আঙনে পুড়ে মরবে than to be married by a muhamedan—এ সব সেকলে ; কবে রাজপুতনায় কি হয়েছে তা আজ চলে না। কোনওখানেই আদর্শের ‘আ’ যখন নাই তখন অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত বা শিক্ষিতের (জীং) কাছে পুড়ে মরার দাবী করা পাপ !”

*

আসাম-শিবসাগরের দোলাগুড়ি চা-বাগান হইতে ডাক্তার রসরাজ রায় পত্রে জানাইয়াছেন :

“মাঘ সংখ্যা ‘প্রবর্তক’ের সম্পাদকীয় পড়িয়া খুবই আশ্চর্য। সম্পাদকীয়টির বিষয়বস্তু বিশেষ প্রশিধানযোগ্য এবং প্রতি বাঙালী হিন্দুর অবশ্য পাঠ্য। পূজনীয় সঙ্ঘ-গুরুর ভবিষ্যৎ বাণী যেন সত্য হইতে চলিল। তবে এখনও অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের মধ্যে আলোর কোন আভাস দেখিতেছি না। এ সংখ্যাটি দিল্লীর দরবারে মন্ত্রীদের অবগতির ব্যবস্থা করিতে পারিলে খুবই ভাল হইত। এখানে আমার পরিচিত বাঙালী ও হিন্দু প্রত্যেকে যাতে এ সংখ্যাটি পড়ে তাহার ব্যবস্থা করিয়াছি।”

॥ বলিষ্ঠ আদর্শের অভাব ॥

মোটের উপর ধর্মগত, সমাজগত, রাষ্ট্রগতভাবে ক্রীবদ্ধ যে আমাদের সবখানি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে ইহা আজ দিনের আলোর যত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। মোঘলই হোক আর ইংরাজই হোক সর্বকালেই জাতি-ধর্ম-সমাজ চেতনাহীন একদল মাহুষ গজাইয়া উঠে যাদের স্বন্ধে ভর করিয়াই শাসকগণের কুশাসন চলমান থাকে। কংগ্রেসী আমলেও তার ব্যত্যয় হয় নাই, বরং ব্যাপকতর হইয়াছে। সর্বকালেই রাষ্ট্র ও সমাজের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা ও জাতিহীনতা হইতে তুচ্ছ আত্মস্বার্থাশ্বেষীদের উপলব্ধি। ভারত-রাষ্ট্রের দুর্নীতি, দৌর্ভাগ্য ও ক্রীবদ্ধ নিরপেক্ষ সাধু মহাত্মা মনীষীদেরও দৃষ্টি এড়াই নাই। যে ধর্মের এক কণা মহৎ ভয় হইতে ত্রাণ করে সেই

সভ্যকার ধার্মিক ব্যক্তি কখনও পৌরুষহীনতাকে প্রশংসা দিতে পারে না। দুর্বলতাই পাপ। ক্লীবত্বই অধর্ম।

সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে আমরা বরণ করিয়া লইয়াছি, কিন্তু আমাদের সুগঠিত সমাজ-সংস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। আমাদের বিভিন্ন সামাজিক ও ধার্মিক শক্তিকেঙ্গগুলি বর্তমানে সর্বগ্রাসী রাজনীতির কবলে গ্রাসিত। জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতা বর্তমানে রাজনীতি ও রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়া আবর্তিত। সুতরাং আজকের দিনে স্বাভাবিকভাবেই জাতীয় জীবনের সকল সমস্যার সমাধান রাষ্ট্রের উপরই ন্যস্ত। রাষ্ট্রের মুখ চাহিয়া থাকা ভিন্ন সাধারণ মানুষের আর উপায়ান্তর নাই। রাষ্ট্র যদি দুর্বল হয়, ভীকু হয়, দৌর্মুখগ্রস্ত হয়, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় নীতির নিরপেক্ষ প্রয়োগে অপারগ হয়, তাহা হইলে তেমন অকর্মণ্য অবিমূঢ় রাষ্ট্রশক্তি বিপদকে আহ্বান করিয়া আনিবে, ইহা সূনিশ্চিত—যেমন আনিয়াছে আমাদের কংগ্রেসী রাষ্ট্র। আজকের ষাঁরা রাষ্ট্রকর্ণধার তাঁদের অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে যে দুর্বলচিত্ত তাহা নহে। দুর্বলতা তাঁদের আদর্শগত। অভ্যন্তরীণ শূন্যগর্ভ শাস্তি ও অহিংসবাদ ভূতের মত তাঁদের চিত্ত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। গণতন্ত্রে এই দুর্বল নির্বীৰ্য্য প্রতিনিধিত্ব সরাইয়া সবলের প্রতিষ্ঠা জনগণেরই অধিকার। কিন্তু যে বলিষ্ঠ ভারতীয় মৌলিক আদর্শের আত্মগত্যে ভারতবর্ষ ভারতবর্ষ হইবাই মাথা তুলিতে পারে তাহা লইয়াই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। বহু আমদানী মতবাদেব বিক্ষেপে জনগণ আজ বিভ্রান্ত বিচ্ছিন্ন। ইহার স্রবণ লইবাই রাষ্ট্রের পঙ্কু ও দুর্নীতি আজ প্রশ্রিত, সঞ্চারিত।

॥ প্রতিপ্রশ্ন ॥

একটা সূনিশ্চিত বলিষ্ঠ আদর্শের অভাবই আজকের এই আদর্শ-সঙ্কটের হেতু বলা যায়। এমনি সর্বোদয়-মূলক কল্যাণময় বলিষ্ঠ আদর্শ আমরা ভারতীয় জীবন ও রাষ্ট্রদর্শন হইতেই পাইতে পারি। না পাইবার কারণ আত্মবিশ্বস্তি। মাঘ সংখ্যা প্রবর্তকের সম্পাদকীয় পড়িয়া প্রগতিশীল তরুণদের যে সব প্রশ্ন ও মন্তব্য আমরা পাইয়াছি তাহাতেই ইহা মনে হইয়াছে। এই সব প্রশ্নে

অবশ্য জিজ্ঞাসাকারীর কটাক্ষ নাই তবে নিজেই 'না' জানার বিভ্রান্তি আছে। মোটামুটি প্রশ্নগুলি এইরূপ :

(১) শ্রীকৃষ্ণকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ বলিয়াও তাঁহাকে যুদ্ধবাজ বলা হইয়াছে। আদর্শ মানুষের মুখে যুদ্ধের কথা শোভা পায় কি ?

(২) রক্তপিপাসু দ্রোণদৌর জীবন কি কখনও নারীর আদর্শ হইতে পারে ?

(৩) মধ্যযুগের সতীদাহ প্রথা বহুকাল পরিত্যক্ত। আজকের প্রগতির যুগে ইহা শুধু অশোভন নয়, সমাজ-চেতনার কাছে লজ্জাকরজনক।

(৪) আব দুইটি বিপ্লবের মধ্য দিয়া বাংলায় পূর্ণতর জীবন-প্রতিষ্ঠার যে অভ্যন্তর প্রত্যয়ের কথা বলা হইয়াছে তাহার কি রূপ এবং কেমন করিয়া সংগঠিত হইবে ?

এই সব প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর দেওয়া সম্পাদকীয়ের সংক্ষিপ্ত অবসরে সম্ভব নহে। তথাপি এ বিষয়ের একটুখানি ইঙ্গিতমাত্র এখানে লিপিবদ্ধ হইল।

॥ শ্রীভগবানের মুখে যুদ্ধের কথা কেন ? ॥

গীতার বক্তা ভগবান। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের নামগন্ধও নাই। সবই 'ভগবান উবাচ'। ভগবান মানুষ না হইলে সর্বকালের সর্বজনের পক্ষে এমন সত্য পথ-নির্দেশ মানুষ ভগবান সাজিলে কখনও দিতে পারেন না। অমুগত ভক্ত বলিতেছেন 'যুদ্ধ করিব না'। ভগবানের কঠোর আদেশ 'যুদ্ধ করিতেই হইবে', কিন্তু রহস্য এই যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ করিতে বলিয়াও বলেন নাই। যদি বলিতেন তাহা হইলে গীতা শত সহস্র সাধু সন্ন্যাসী ও সর্বদেশের মনীষী পণ্ডিত ও সাধারণের মোক্ষলাভের উপায় স্বরূপ নিত্যপাঠ্য না হইয়া সৈন্যদের ব্যারাকেই যুদ্ধপ্রেরণা দিবার সিলেবাস হইত। কর্তব্যপালনের যে মানসিক বাধা, যে দৌর্মুখ তাহা অপনোদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কর্তব্যে নিযুক্ত করিয়াছেন মাত্র। এই কর্তব্য-হীনতা, এই ভ্রান্ত বুদ্ধির নামই গীতার ভাষায় ক্লীবতা, কপল হৃদয়দৌর্ভল্য, অজ্ঞানসম্মোহ। আর্ধ্য ঋষিদেব মতে সমাজ রাষ্ট্র পরিচালনে যুদ্ধ অপরিহার্য্য। যুদ্ধ করিতে হইবে কর্তব্যের জন্ত, রাষ্ট্রধর্ম পালনের জন্ত—হিংসা বিদ্বেষ বৈরীভাব বিমুদ্রাও থাকিবে না। 'মামমুখর যুদ্ধ চ'। "নির্ধৈর" হইয়াও যুদ্ধ করা যে

চলি, অহিংস থাকা যায়—এ কথা ভারত-দর্শনের মর্ম না বুঝিলে বোধগম্য হইবার নহে। ধনলোভ রাজ্যবিস্তার আর দল, গদী ও ক্ষমতার মোহে যে যুদ্ধ তাহা গীতা তথা শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে যুদ্ধই নহে—দম্ভাতা। দম্ভাতা অশ্রদ্ধেয়, চিরযুগই পাপ—বর্জনের মর্ম। এ সম্পর্কে আমরা উক্ত মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজীর গীতা-ধ্যান গ্রন্থগুলির প্রতি পাঠকের, বিশেষভাবে আজকের কংগ্রেসী অহিংসবাদী রাষ্ট্র-কর্ণধারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি; গীতা-ধ্যান চতুর্থ খণ্ডের ভূমিকার মর্ম্যাংশই বস্তুতঃ এখানে আমরা দিয়াছি। প্রসঙ্গতঃ সম্বন্ধে শ্রীমতিলালের প্রায় হাজার পৃষ্ঠার গীতাতাৎ ভারত-দর্শনের নিখুঁত চিত্র হিসাবে উল্লেখ্য। মহাত্মাজী গীতার ইতিহাস ও ঐতিহ্য অস্বীকার করিয়া গীতার যে মনগড়া রূপক ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা শুধু গীতাকেই বিকৃত করে নাই, তাঁর মেরুদণ্ডহীন অহিংস নীতি ভারত-রাষ্ট্রক্ষেত্রে ক্লীবত্ব আনিয়াছে।

গীতার এই জীবন ও রাষ্ট্রদর্শনই ভারত-দর্শন। ইহা হইতে বিচ্যুত হইয়াই আজকের অহিংসনীতির পঙ্খ-অমুসরণকারী কংগ্রেসী-রাষ্ট্র ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে এবং বিভিন্ন মতবাদী দল বিভ্রান্ত পথ ধরিয়াছে। আত্মমর্মে না হইয়া মনোমর্মে হওয়ার ফলে সর্বত্র বিক্ষেপ ও আত্মঘর্ষ পালনে পরাজয় দেখা দিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের আর একটি শিক্ষা কর্তব্যধর্ম, অধিকারবাদ নহে। আজকের গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র—সর্ব তন্ত্রেই অধিকারবাদ লইয়া মারামারি কাড়াকাড়ি চলিয়াছে। সর্ব তন্ত্রই এই ব্যক্তি অধিকার-প্রতিষ্ঠ। কিন্তু ভারতবর্ষ অধিকারবাদ আমল দেয় নাই—দিয়াছে কর্তব্যধর্ম। ব্যক্তি ও সমষ্টি যদি স্ব-স্ব কর্তব্য-সচেতন হয় তাহা হইলে সব তন্ত্রই কল্যাণ-সমুজ্জল হইয়া উঠিতে পারে। সমাজ, রাষ্ট্র, শিক্ষা, অর্থ সর্ব ক্ষেত্রেই কর্তব্যের প্রয়োগ স্তম্ভভাবে হইলে এ সবই কল্যাণপ্রসূ রূপপরিগ্রহ করিতে পারে। মনু-স্মৃতিতে তাই কর্তব্যকেই ধর্ম বলা হইয়াছে। কিন্তু আজকের মনোমর্মে যুক্তিবাদী দৃষ্টি ও বৈজ্ঞানিক প্রগতি-বাদীর কাছে মনুর স্মৃতি-শাসন হেয়, অশ্রদ্ধেয়। তাই স্বাধীন ভারতে উক্ত আবেদনকে মনুর আসনে বসান হইয়াছে। অথচ আমেরিকা হইতে প্রকাশিত

‘Self-Realisation’ পত্রিকায় (অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৬৩) R. S. Betai “The ideas of Manu, Ancient Law-giver” শীর্ষক প্রবন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন—“The Varna Dharma has been rightly known as the real socialism of the Hindu. In the social structure of Manu, the social order and the individual both have equal scope of development in such a manner that there is no clash between them.” সমগ্র মনু-স্মৃতি আলোচনা করিয়া এই বিদেশী লেখক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন : “This is Manu’s religion. It can easily be called universal religion, humanitarian religion. It can apply to all cultures at all times, in all countries.”...“These are the choicest elements of the Hindu faith. They are eternal; they make The Hindu Dharma universally applicable and explain why the Hindus have faced great attacks and onslaughts and yet have survived.”

কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাই স্বাধীনতার লক্ষ্য হইতে পারে না—উপায় মাত্র। সর্বমানবের কল্যাণকর ভারতীয় জীবন-বিকাশের ধারাটি যুগসম্মত করিয়া যে স্বাধীনতা পুষ্ট ও পোষণ না করিতে পারে সে স্বাধীনতা পুণ্য ভারতভূমিতে কখনই গ্রাস হইবে না। আজকের পরিপ্রেক্ষিতে ইহা প্রলাপোক্তির মত শুনাইলেও, ইতিহাসের গতি-পথে বহু ঘাত-প্রতিঘাত সংঘাতের মধ্য দিয়া মানব সভ্যতাকে ঠেকিতে-ঠেকিতে একদিন এই ভারতীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেই হইবে।

॥ সর্বকালের নারীর আদর্শ দ্রৌপদী ॥

ক্ষপদনন্দিনী কৃষ্ণার ভ্রম ও জীবন, এমন কি তার কল্পনাও একমাত্র পুণ্য ভারতভূমিতেই সম্ভব। ভারত ব্যতীত অত্র কুত্রাপি দ্রৌপদীর আবির্ভাব শুধু অসম্ভব নহে, ধারণায় অবধারণ করাও মত মেধারও অভাব। এই মহত্তম অসাধারণ জীবনের আবির্ভাবকে মহাকবি ব্যাসও লৌকিক যোনিজ করিতে ভরসা করেন নাই। দ্রৌপদীর মত এমন পুতচরিত্রা, এত বীর্ঘবতী অথচ

ক্ষমাশীলা, সহনশীলা মহামহিমাময়ী নারী শুধু ভারতের নয়, জগতের সর্ব নারীরই সর্বকালের আদর্শ। জানি, অরাজক মানস উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে এ কথা হাস্যাস্পদ হইবে, অসংযম আর জ্ঞাননিয়ন্ত্রণের পাশবিক শ্রোতে ইহা ভাসিয়া যাইবে, তবুও প্রত্যয় করিব, ভারতবর্ষকে যদি ভারতবর্ষ হইয়াই মাথা তুলিতে হয় তবে দ্রোপদীর আদর্শ সামনে রাখা বাঞ্ছনীয়।

কৌরব সভায় দ্রোপদীর বজ্রহরণ। সমস্ত পুরুষ সেদিন নীরব সাক্ষী। আজ বিশ্বসভায় আন্তর্জাতিক পাশা খেলায় অসং মিথাবাদী নির্লজ্জ কূটনীতিক চক্রান্তকারীরা বুদ্ধিজংশ ভারতকে নষ্ট করিয়া লাখি মারিতেছে। কৈ দ্রোপদীর সেই রক্তস্রাবের মধ্য দিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার রুদ্ধ কণ্ঠ তো কাণে আসিতেছে না : “বিগত নষ্টঃ খলু ভারতানাং ধর্মস্তথা ক্ষাত্রবিদাঞ্চ বৃন্তন” — আজকের রাজধর্ম ও চরিত্রভ্রষ্টতার দ্রোপদীর এই ধিকারবাণী একটি নারীর কণ্ঠেও নির্গত হইল না! আর একটি পুরুষসিংহ-নেতা কি কোথাও নাই যিনি শ্রীকৃষ্ণের মত দ্রোপদীকে ভরসা দিতে পারেন :

“চলেকি হিমবান শৈলঃ মেদিনী শতধা ভবেৎ।

দ্যোঃ পতেচ্চ সনক্ষত্রা ন মে যোধং বচো ভবেৎ ॥”

“হিমালয় যদি শিহরিয়া উঠে, মেদিনী যদি শতধা বিদীর্ণ হয়, নক্ষত্রসহ আকাশ যদি ভাঙিয়া পড়ে তবুও আমার দেওয়া ভরসা মিথ্যা হইবে না। শত্রুবধ করিয়া রাজ্যশ্রী ফিরাইয়া আনিব।”

দ্রোপদীর অমোঘ সঙ্কল্প পূর্ণ হইয়াছে। রাজধর্মভ্রষ্ট, সমাজ-শালীনতা বিরোধী কৌরবের ধ্বংসজুপের উপর কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশান রচিত। দ্রোপদীর প্রাণপ্রিয় পুত্রহস্তা বন্দী অশ্বখমা দ্রোপদীর দণ্ডাদেশের অপেক্ষায় অপেক্ষমান। ধৈর্য ও ক্ষমার প্রতিমা দ্রোপদীর কণ্ঠে নির্গত হইল : “মুচ্যতাং মুচ্যতামেব ত্রাস্কণো নিতরাং গুরুঃ।” এমন কারুণ্য মুক্তিও বুঝি বিশ্বভুবনে অল্পম।

ইজ-মার্কিন, রুশ-চীন সবাই স্ব-স্ব জীবনধারা ও আদর্শ রক্ষার জন্য তৎপর। আর ভারতই শুধু আত্মবিশ্বস্ত। শূন্যগর্ভ শান্তি আর অহিংসার মাদকতায় বিভোর; রাজধর্ম ও চরিত্রভ্রষ্ট। যে রাজ্যে পদ্মবিভূষিতা সিনেমা

ষ্টার নারীর আদর্শ, সেই রাজ্য পদদলিত হইবে না তো আর কে হইবে! আত্মবিশ্বস্ত ভারতের পরিজ্ঞানের উপায় মহাভারতের আদর্শে পুনরায় জীবন গঠন করা।

॥ সতীত্ব-সতী-সতীদাহ ॥

এ কথা বলিলে গৌড়ামির মত শুনাইবে যে, পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ভিন্ন বিশ্বভুবনে আর কোথা (ছ’একটি বিতর্ক-মূলক ক্ষেত্র ছাড়া যেমন ভার্জিন মেরী) সতীত্বের দৃষ্টান্ত মিলিবে না। আদ্যন্তহীনকালের সাধনা, সংযম ও সদাচারেরই সতীত্ব ধর্ম ফলশ্রুতি। ভারতবর্ষের মাতৃত্ব ও সতীত্ব অভেদ অভিন্ন। সঙ্কল্প ও প্রতিজ্ঞার নিত্য স্মরণীয়া হইলেও, দ্রোপদী মা নহেন—কত্ম।

ভারতবর্ষ এমন অজস্র কন্যা যুগে যুগে জন্ম দিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষকে জন্ম দিয়াছে এই সতীত্ব—অপ্রাকৃত চিন্ময়ী পবিত্রতার মূর্ত্যবিগ্রহ—নিত্যকালের মা—জগজ্জননী। এঁরাই মর্ত্যের বৃকে অধোকক্ষ ভগবানের অযোনিজ আবির্ভাব সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। ভারতের ইতিহাস ও ঐতিহ্য করাজুলীতে গণা যায় এমন কয়েকজন পুরুষোত্তমেরই লীলাকাহিনী। এই বিশ্বমানবের আলোকদিশারীরাই ভারতবর্ষ। ধ্যান-সমাহিত চিত্তে এই ভারতবর্ষকে উপলব্ধি করিতে হয়। যুক্তি বিচার আর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ধরা পড়িবার বস্তু এই ভারতবর্ষ নহে। এই ভারতবর্ষকে বুঝিলে মানবতাকে বুঝা যায়—মানবকল্যাণের অর্ন্ত পথ পাওয়া যায় এবং ভারতীর বেদী-মূলে জীবনোৎসর্গের জন্য উন্মাদ হইতে হয়। আজকের অরাজক উচ্ছৃঙ্খল মানস পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের কথা বাতুলের প্রলাপোক্তি বলিয়া হয়তো উপহাসিত হইবে। কিন্তু আমরা যে বিপ্লবের কথা বলি তাহা এই ভারতবর্ষকে ফিরিয়া পাইবার জন্য।

বস্তুবাদী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন সমাজ ব্যবস্থায়, সতীত্বের যে মূল্য ভারতবর্ষ দিয়া থাকে, তাহা থাকিতে পারে না। চুক্তি বিবাহ যেখানে, হাড়-চামড়া-রক্ত-মাংস লইয়া যেখানে শঙ্কুনি বৃষ্টি, সেখানে সতীদাহ নিশ্চয়ই বর্ধরতা। স্ত্রী যে ক্ষেত্রে স্বামীর সহধর্মিণী, যেখানে পতি-পত্নীর স্বাশ্বত সম্বন্ধ স্বীকৃত সে ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাকৃত সতীদাহ আদর্শ

হিসাবে প্রশংসনীয়ই। পতি যেখানে নিত্য আত্মার প্রত্যক হিসাবে পুঞ্জিত সেখানে সম্বন্ধের নৈরন্তর্য্য মরণেও বিচ্ছিন্ন হইবার নয়। আদর্শ ভারতনারী মৈত্রেয়ীর কথা: “ন বা অরে পত্ন্য: কামায় পতি প্রিয়ো ভবতাম্বনস্ত কামায় পতি: প্রিয়ো ভবতি।” পতির প্রতি প্রীতির জন্ম নয়, আত্মার প্রতি প্রীতির জন্মই পতি প্রিয়।

একদা যাহা প্রেম: কালধর্ম্মে তাহা সত্যকার তাৎপর্য্য হারাইয়া বিকৃত হইবে, ইহা স্বাভাবিক। পশ্চিমের যুক্তিবাদ ও নিরীশ্বরীয় বৈজ্ঞানিক চিন্তার উত্তেজনা একদিন নিছক প্রতিক্রিয়ার বশবর্তী হইয়া বহুকাল সেবিত ও পরীক্ষিত জীবনচর্য্যার রীতিনীতিকে সংস্কৃত না করিয়া সংহারে প্রবৃত্ত আমরা হইয়াছিলাম। সতীদাহ নিবারণে ও বিধবা-বিবাহ প্রচলনে যুগ-প্রবৃত্তির প্রতীক ছিলেন রাজা রামমোহন ও বিদ্যাসাগর। সঙ্গীর্ণতর হইয়াও, শত শত বৎসরের বিশ্বাসের আক্রমণ ও আঘাত হইতে হিন্দু সমাজ আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল যে

উৎকৃষ্টতর জীবনদর্শন, সদাচার ও সুসংস্কারের ফলে আজ তাহা শিথিল ও অবহেলিত হওয়ায় এ জাতিটার অস্তিত্বই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সহজ সংস্কার ও সংযম হারাইয়া জন্ম-নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়া তথাকথিত যে প্রবৃত্তি-পরামর্শ সত্য সমাজ আমরা গড়াইতেছি সেই সমাজে বলিষ্ঠ চরিত্রবান ও দৈবী গুণসম্পন্ন নেতার উদ্ভব আকাশ-কুসুমের মতই অলীক। সন্দেহস্থল হইলেও, হয়তো বৈজ্ঞানিক বা অর্থনীতিবিদের জন্ম হইতে পারে, হয়তো বা মার্কস, ষ্টেলিন-লেনিন, চিৎস-চৌ-এর উদ্ভব হইতেও বা পারে, কিন্তু এমন চিরকালের পূজ্য নেতা কখনই সম্ভব হইবে না, যিনি ভারতকে স্ব-মহিমায় ফিরাইয়া আনিতে পারে। এমনটি আরও কিছুকাল চলিলে, রবীন্দ্রের কথায়, ভারত ইউরোপ হইতে

পারিবে না, যাহা হইবে তাহা বিকৃত ভারতবর্ষ— ভারতের প্রেতমূর্ত্তি। স্বাধীনতার পরে কংগ্রেসী শাসনের শোচনীয় ট্রাজেডি এইখানেই। ইহারই বিপ্লব আমরা চাহিয়াছি। বিগত দু'শো বৎসরের ইতিহাস আমাদের সামনে—আমাদের বিগত ও বর্তমান নীতি ও কার্য্যকলাপ ভারতকে কোথায় আনিয়া ফেলিয়াছে

ও ফেলিতেছে তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সতর্ক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এখানে উল্লেখনীয় যে, সতীদাহ আমরা সমর্থন করি বা করি না, অথবা কোন্ দৃষ্টিতে কতটুকু করি, কথা ইহা নহে। দেহাত্মবোধবিহীন আত্মজ্ঞানী এমন একজন নারীও যদি পূর্ববঙ্গের মরণের আত্মাকুণ্ডে স্বেচ্ছায় প্রাণ বিসর্জন দিবার তেজোবীর্ঘ্য রাখিত, তাহা হইলে অবধারিত নীতিহীন অত্যাচারীর প্রাণ-পশুর উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিত। মোঘল আমলের রাঙ্গপুত রমণীর জীবন্ত জলন্ত অনলে প্রবেশ দৃশ্য আজকের ভারতের ইসলামিক রাষ্ট্রে আর একবার অভিনীত হইতে দেখিলে সমগ্র ভারত-নারীর মুমূর্ষু প্রাণ আদর্শ গৌরবে শিহরিয়া উঠিত। অবশ্য মাঘ সংখ্যা প্রবর্তকের সম্পাদকীয় ‘সতীদাহের’ উল্লেখের পশ্চাতে আমাদের এমন মহৎ কোন আশা ছিল না—যাহা ছিল তাহা একটুখানি শুচিতাবোধ, ক্রটি, নিষ্ঠা সদাচার আর রক্তের সংস্কার।

॥ প্রয়োজন বিপ্লব ॥

গণতন্ত্রকে আমরা স্বীকার করিয়া লইয়াছি, পণ্ডিত নেহেরুর কথায়, ইহার চেয়ে উৎকৃষ্টতর আর কোন তন্ত্র নাই বলিয়াই। গণতন্ত্রই যুগতন্ত্র। কিন্তু ইহা ভারতীয় প্রতিভার অমুকুল হইবে (পৌষ সংখ্যা প্রবর্তকের সম্পাদকীয়তে ‘গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র’ শীর্ষকে যার কিছুটা ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে) এবং রাষ্ট্রনীতি হিসাবে বর্তমানের ক্রীব অহিংসবাদের স্থলে বলিষ্ঠ ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শনের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে—যাহা হিংসাও নহে, অহিংসাও নহে, পরন্তু নিরপেক্ষ ন্যায়নীতিমূলক রাষ্ট্রধর্ম্ম। গণতন্ত্রে গণমত সংগঠন করিয়া ইহার প্রতিষ্ঠাই হইবে প্রথম বিপ্লব। বারাস্তরে বিষয়টি ক্রমশ: আলোচ্য।

॥ দ্বিতীয় বিপ্লব ॥

দ্বিতীয় বিপ্লবের সূচনা হইবে বাংলা দেশে। চৈতন্য যুগ হইতে বিগত প্রায় পোঁনে পাঁচশো বছর বাঙালীর উর্বর সমন্বয়ী চিন্তভূমিতে ইহারই প্রস্ফুটি চলিয়াছে। বিগত শতকে বিবেকানন্দ-বিজয়কৃষ্ণের কর্তে ইহার গুঞ্জন বাঙালী শুনিয়াছে। অরবিন্দ-রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ

একটি কাব্য

শ্রীশচীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

হেমন্তের ছপুরে বৈশাখীর ছপুরের মতো ধামছে রমেন। হয়তো নিজের ভাগ্যের কথা ভেবে। সামনের দেয়ালে ডিগ্রী নেবার ফটোটা। সেদিন রমেনের মনে আশা ছিল। ছ'চোখের পাতায় ছিল রঙিন স্বপ্ন। প্রমীলার হাত ধরে হল থেকে বেরিয়েছিল। শুধু আজ তার আনন্দ নয়, বাবার কল্পনাকে সে বাস্তবে রূপ দিয়েছে। বাবার খুব ইচ্ছে ছিল ছেলে তার বি. এ. পাশ করবে।

সেই বাবার আজ ভীষণ অসুস্থ। ডাক্তারবাবু চল্লিশ টাকার ওষুধের ফরমাস্বের দিয়ে গেলেন। আজকের মধ্যে অন্ততঃ তিরিশ টাকার ওষুধ চাই-ই। রোগটা ইঠাৎ অল্প দিকে মোড় নিয়েছে। এই মুখে ওষুধ ঢালতে না পারলে, হয়তো শেষে বাঁচানো যাবে না। কিন্তু তিরিশটা পয়সা পর্যন্ত হাতে নেই। মার শেষ কানের ছল জোড়া গন্ত বুধবার নিজের হাতেই বিক্রী করে এসেছে রমেন।

সেদিন ছোটো বোনটা কেঁদেছিল। গলার হার সে কিছুতেই দেবে না। মাও খুলে নেবে। না নিয়ে উপায় কি। ডাক্তারের ফি আর ঘরেও তো চাল নেই। পশ্চিমের এই জানলাটার কাছে দাঁড়িয়ে শুধু দেখছিল রমেন। প্রথম দিন বেবি হারটা গলায় পরে দাদার কাছে দৌড়ে এসেছিল। দাদা, দেখ তো কেমন দেখাচ্ছে।

সেদিন কি ভেবেছিল এ হার আবার খুলে দিতে হবে? রমেনও কি ভেবেছিল বি. এ. পাশ করে বেকার

থাকতে হবে, কাজ পাবে না একটাও। আজ ছ' বছরের ওপব সে বেকার। একটা চাকরি জোটাতে পারলো না এ-পর্যন্ত। সব ভাব্যগাতেই ব্যাকিং বা ঘুষ। সামান্য মার্চেন্ট অফিসের কেরানীর ছেলে সে। বড় দরের চাকুরে আত্মীয় তো তার নেই। পরীক্ষা? সে তো শুধু নামকোয়াল্ডে। আগের থেকে সব ভাগবীটোয়ারা হয়ে আছে—ছ'বছরের অভিজ্ঞতা এ-সব।

বাবার এই অবস্থায় একটা টাকা এনে সাহায্য করতে পারছে না রমেন। তিন মাস ধরে শয্যাশায়ী, গত মাসের মাইনে পর্যন্ত পায়নি। পাওনাদার ঘন ঘন তাগাদা মারছে। মার মাথা খারাপ হয়ে যাবার উপক্রম। কোন্‌দিকে যাবে। একদিকে বাবার এ-অবস্থা আরেক দিকে সংসার। সে আজ থেকেও না থাকার মতো।

মা এসে রমেনের হাত ধরে কেঁদে ফেললেন।—আর হয়তো বাঁচানো গেল না। সবই তো স্তনলি।

—সবই স্তনলাম মা।

আঙুলের আংটিটা জ্বল জ্বল করে উঠলো চোখের সামনে। কি বলবে সে মাকে। বাবা তিলে তিলে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। তার ওপর সংসারের ভাবনা রয়েছে। সেদিন মাকে বলছিলেন, আমি মরলে তোমরা যে বানের জলে ভেসে যাবে। রমেন যদি একটা কিছু...

—তোমাকে এখন তা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। চূপ করে শুয়ে থাকো।

যুগপুজারীদের উদ্দগান এ শতাব্দীর বাঙালীর প্রাণে শিহরণ তুলিয়াছে। যুগ-মহা মতিলালের বাণী ও সংগঠনে এই বিপ্লবের পদধ্বনি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তিনি তাঁরই সৃষ্ট প্রবর্তক সঙ্ঘকে গড়ন দিয়া এই দিব্য জীবন-বিপ্লবের বাহন করার সুদীর্ঘ নীরব সাধনা করিয়া এই সেদিন দেহ রক্ষা করিয়াছেন। একচল্লিশ বৎসর পূর্বে তিনি প্রবর্তক সঙ্ঘকে অনাগত এই বিপ্লবের ইঙ্গিত দিয়াছিলেন :

“মানুষ চাহিয়াছে মোক্ষ তাই সে সন্ন্যাসী। কেহবা চাহিয়াছে স্বর্গ তাই সে গৃহী। কেহবা চাহিয়াছে ক্ষয়-লোক, ব্রহ্মলোক তাই সে ব্রহ্মচারী। ব্রাহ্মণ চাহিয়াছে দান, অধ্যয়ন, প্রতিগ্রহ; ক্ষত্রিয় চাহিয়াছে যজ্ঞ, দান,

অধিকার; বৈশ্য-শূদ্র চাহিয়াছে গুণগত ধর্ম। কিন্তু একদল মানুষ বাহারা কিছু চাহে নাই সেই দলের চিহ্ন, নিদর্শন প্রবর্তক সঙ্ঘ। চাওয়া নাই, পাওয়ার প্রতীক্ষা নাই সে কেমন জীবন? কিন্তু চাওয়া থাকিলে প্রবন্ধনা করা হইবে। চাহিলে পাওয়া যায়, কিন্তু এক ভিন্ন তো বস্তু নাই। তবে এত চাওয়া কেন? চাহিবার বস্তু কেবল ভগবান। অমিশ্র, বর্ণহীন, নির্বর্ণকার, অনন্ত—যাহা যুগে যুগে ফুরায় না—সেই ভগবানে অনন্তগতি। এই চরম সাধনা, নিকাম জীবন, দূর তবিষ্যতের ভারত—এক অসাধারণ জীবন প্রকাশের মহালীলা—সে বীজের সাধনা স্রব্ব হয়েছে বাংলা দেশে প্রবর্তক সঙ্ঘে। এ যে কি বিরাট যজ্ঞ তাহা অনেকে এখনও অবধারণ করে না।”

মা প্রথম ঘাবড়ায়নি। আজ এক ফোঁটাও সোনা ঘরে নেই। অল্পখটা আবার হঠাৎ বেকে বসলো।

এই আংটিটা এখনও আছে। এটা বিক্রী করলে টাকা পর্যাপ্তি পাওয়া যেতে পারে। তাকে আর কি বলবো। যা ভাল বুঝি করবি। আংটিটার দিকে তাকিয়ে মা চলে গেলেন।

তিরিশ টাকার ওয়ুধ আজকেই আনতে হবে। রাত্রে অন্ততঃ একবার খাওয়াতেই হবে। কালকেও সারাটা দিন টো টো করে ঘুরেছে রমেন। আংটিটা বিক্রী করে এই মুহূর্তে তিরিশ টাকার ওয়ুধ সে এনে ফেলতে পারে। মা মনে মনে হয়তো একটু খুশীও হবেন। কিন্তু আংটিটা বিক্রী করবার কথা উঠলেই মনটা ছুঁ ছুঁ করে কাঁপতে থাকে রমেনের। বেবির হার খুলে নেবার সময় তার মনে হয়েছিল তার আংটি থাকতে কেন মা-বোনের গল্পনা আগে বিক্রী হবে! কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারেনি মাকে। প্রমীলা নেই। ওর শেষ স্মৃতিচিহ্ন শুধু এটাই তার কাছে আছে। এ-জীবনে তাকে আর দেখতে পাবে না সে। চাওয়া-পাওয়ার অনেক দূরে আজ।

একটা ফোঁটাও নেই; যাকে কেন্দ্র করে বেঁচে থাকবে সে। বেশীদিনের কথা নয়। ছ' মাস আগেও সে ছিল। ছিল তার খুব কাছে। হাতের নাগালে। কল্পনার জাল বুনছিল। হঠাৎ উড়ন্ত ঘুরি ভোঁ-কাটা হয়ে হারিয়ে গেল। শয্যা নিল প্রমীলা। দু'মাস ভোগার পর রক্ত দেহটা শাস্তি পেল। মনটা পেল না। তার অনেক সাধ ছিল। চাওয়া পাওয়ার অক্ষুরন্ত আবেগ থাকা সত্ত্বেও অতৃপ্ত মনটা যেন মরুপথের দমকা হাওয়ায় বালির পাহাড়ে চাপা পড়ে গেল।

সব শেষ হবার আগের প্রমীলার সেই করুণ চাহনি এখনও ভুলতে পারেনি রমেন। করুণ কণ্ঠে বলেছিল সে, ভয় করছে। হয়ত আর বেশীক্ষণ বাঁচবো না।

—তুমি ঘাবড়ে যেও না প্রমী, তুমি বাঁচবে। বাঁচাতে হবেই।

—আর বাঁচাতে পারবে না আমায় তুমি। আজ যেও না হটা না বাজা অবধি।

—আজ কেন তুমি এ সব বলছো।

—কেন বলছি, মরতে তো আমি চাই না। বাবা, মা, তোমাকে ফেলে আমি যে মরেও শাস্তি পাবো না গো। বাবা মাতো এখনও আসছে না।

—একুনি এসে পড়বে। তবে তো চারটে বাজলো।

রমেনের ডান হাতটা নিজের হাতের মধ্যে তুলে নেয় প্রমীলা। আংটিটা আঙুলে গলাতে গলাতে বলেছিল—আমাকে মনে রাখবার কিছুই তো দিয়ে যেতে পারলাম না। এটা দেখলে অন্ততঃ দিনে একবার আমার নাম মনে পড়বে।

রমেন কথা দিয়েছিল—তোমার দেওয়া আংটিটা আমি মাথায় করে রাখবো প্রমী।

প্রমীলাকে খুব ভালবাসতো রমেন। আজও সে ভুলতে পারেনি। বিকেলের সোশালী রোদ গায়ে পড়লেই প্রমীলার কথা মনে পড়ে তার। কত বিকেল ছ'জনের হাসি আর গল্পে কেটেছে।

—এখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকলে ব্যবস্থা হবে, না তাতে টাকা আসবে?

কথাগুলো তীরের মতো বিধলো রমেনের কানে। মায়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আংটিটার দিকে।

একবার মনে হ'ল রমেনের আংটিটা তো তাদের সংসারে টাকায় হয়নি। মা জানে সব। আবার অরণ করলো মায়ের কথা। ঘর থেকে রাস্তায় দাঁড়ালে কি আর টাকা পাওয়া যাবে।

বাবার সে বড় ছেলে। কর্তব্য বাবার এই দুঃসময়ে পাশে দাঁড়ানো। প্রাণপণে সাহায্য করা। কিন্তু একটা কমলা লেবু কিনে আনার মত ক্ষমতা নেই তার। রমেন কিংকর্তব্যবিমূঢ়—বেবির কথা কানে এলঃ দাদা তোমার আংটি বিক্রী না করে আমাদের সব বিক্রী করেছে, তুমি ভীষণ স্বার্থপর।

ঠিক বলেছে বেবি। সত্যি সে স্বার্থপর। স্বার্থপর না হ'লে বাবার এই চরম দুর্দিনে সে চুপ করে ঘরে বসে থাকতে পারে? কুলির কাজ তো খোলা আছে। মুটের কাজ করতে তো ঘুস লাগে না, ব্যাকিংএরও প্রয়োজন হয় না। এই তিরিশ টাকার ওয়ুধে হয় তো বাবা ভাল হয়ে উঠবে। এই সংসারে আবার আগের মতো হাসি ফুটে উঠবে।

ভাবল রমেন। এর চেয়ে কি প্রমীলা বড় হয়ে উঠলো!

আঙুল থেকে আংটিটা খুলতে খুলতে রমেন বাড়ীর বাইরে আসে। মা সতর্ক করে দিলেন, ডাক্তারবাবুকে একবার ওয়ুধগুলো দেখিয়ে আনিস।

অভাবে পড়লে মাহুষ এমনই কঠিন হয়ে ওঠে।

ভালবাসি বলিয়া বলিতেছি

শ্রীউমাপদ নাথ

অবশেষে কংগ্রেসনেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ ঘোষণা করিলেন যে, কলিকাতার সাম্প্রতিক হাঙ্গামার আয়তান-কারক এবং প্ররোচক এদেশের পাকিস্তানদরদী সাম্প্রদায়িক মুসলমানরাই এবং কংগ্রেস-সদস্য শ্রীকৃষ্ণ-কুমার গুপ্ত সোচ্চারে খেদোক্তি করিয়া বলিলেন, হিন্দু হইয়া জন্মগ্রহণ করাই দুর্ভাগ্যজনক। কংগ্রেসনেতাদের মুখ দিয়া এ কথা উচ্চারিত হওয়ার গুরুত্ব রহিয়াছে। কিন্তু কই, কোনো মুসলমান কংগ্রেসসেবী তো এমন তথ্য উদ্ঘাটিত করিলেন না। এমন কি, যখন পিটুনি-করের বিরুদ্ধে কলিকাতার বিশিষ্ট হিন্দু নাগরিকগণ তাঁহাদের নৃচক্ৰের প্রতিবাদ জানাইতেছিলেন, তখন তো একজন মুসলমানও এই বক্তৃতাটিকে বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করিলেন না। তাঁহারা নিশ্চয়ই হিন্দু-শায়েস্তা হইতে দেখিয়া মজলিস করিয়া বগল বাজাইয়াছেন। অবশ্য, এ কথাও ঠিক যে, সকল মুসলমানই মুঘল-মান নহেন এবং মুসলমান-সমাজের মধ্যেও এমন কিছু সৎ, ধর্মপ্রাণ ও মাতৃভূমিদরদী উদারচেতা ব্যক্তি আছেন যাহারা আমাদের এ মন্তব্যের বাহিরে। কিন্তু সম্প্রতি যে দুইজন সালাউদ্দিন ধরা পড়িয়াছে তাহারাও মাত্র দুইয়েই শেষ নহে, এমন হাজার হাজার সালাউদ্দিন এই পশ্চিমবঙ্গেই অবাধে বিচরণ করিতেছে এবং তাহারা কেবল জাহাঙ্গীরীর দাঙ্গাকারীই নহে, সকল সময়ের সকল সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার মালমশলা লইয়া নির্বিঘ্নে শোভা পাইতেছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সরকার এই সব দেশদ্রোহী চাঁই মুসলমানদের বিরুদ্ধে তেমন কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করিতেছেন না। কিছুদিন পূর্বে যুগান্তর পত্রিকায় 'একজন প্রভাবশালী মুসলমানের' সম্বন্ধে পুলিশের রিপোর্ট থাকা সত্ত্বেও সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা

এবং তাহার ফলে তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়ার পক্ষে বাধাসৃষ্টির কথা পড়িয়া এই লোকই যে কংগ্রেসী কাউন্সিলার সালাউদ্দিন বুলিতে কষ্ট হয় না। এই সকল দুষ্কৃতকারী দেশদ্রোহী মুসলমানই বর্তমানের কংগ্রেসশ্রী। এই সকল কংগ্রেসশ্রীই আবার নির্বাচনের সময়ে নমিনেশন পায়—কারণ, অধঃপতিত কংগ্রেস জানে, ইহারা মুসলমান বলিয়া স্বজাতিদরদী মুসলমানদের ভোট ভো পাইবেই, উপরন্তু হিন্দুরাও সাবেকী কংগ্রেসশ্রীতির অদৃষ্ট আকর্ষণে পড়িয়া 'অগত্যা' ইহাদিগকেই ভোট দিবে। বলা বাহুল্য, ইহা এক ঘণ্টা আশ্বাভাতী কন্দী। তাহা ছাড়া, কংগ্রেসদরদী হিন্দু জনগণের সরল মানসিকতার উপরেও ইহা এক জঘন্য জ্বরদস্তি বিশেষ।

আজ কংগ্রেস এইভাবে স্বল্পের প্রতি অহেতুক লোভবশতঃ বৃহদংশের প্রীতি হারাইতেছে। কংগ্রেস যদি বাঁচিতে চায়, যদি দেশকে বাঁচাইতে চায়, তবে তাহারা এই দুর্বলতা এই মুহূর্তে ত্যাগ করুক। কাশ্মীরের শেখ আবদুল্লাহকে ধরিয়া রাজার হালে সগোষ্ঠী পুখিয়া সাজা দিবার যে প্রহসন সৃষ্টি করা হইয়াছে, আমরা সরকারী তহবিলে ঐক্লপ যথেষ্টাচার করিবার তীব্র নিন্দা করি। শাস্ত্রীজী এবং নন্দজী কয়েকবার কাশ্মীর সফর করিবার পুরেও পবিজ কেশ-চুরির পাণ্ডাদের সকলের নাম খোলসা করিয়া বলিতে সাহস পাইতেছেন না। কংগ্রেসের সংসাহসের কলসীর তলা ফুটা হইয়াছে। আজ তাই ইহারা গালি খাইয়া হজম করিতেছে—অপরাধীকে দণ্ড দিতে পারিতেছে না। সম্প্রতিকালে জমায়ুন কবিরের বিরুদ্ধেও জনসাধারণ যথেষ্ট অভিযোগ ব্যক্ত করিয়াছে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়,

কবিরসাহেব বা কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়ে একেবারেই মূক। জনতার বিচার কুড়াইয়া যে মন্ত্রী এক হাতে মুকদ্দির আচকান এবং অপর হাতে চেয়ারের হাতল আকড়াইয়া পড়িয়া থাকেন, তাহার নৈতিক দুর্বলতাই প্রমাণিত হয়। কংগ্রেস কেন ইহা হইতে দিতেছে? শেষকালে বলি: হে কংগ্রেস এবং কংগ্রেস-চালিত সরকার, দেশরক্ষার জন্ত দেশ-দ্রোহীদের গর্দানে খড়া উঠাইতে যদি তোমাদের হাত কাঁপে তবে তোমরা দেশশাসনের অযোগ্য।

উৎসব অনুষ্ঠানে -

ইন্দ্রব সন্দেশ

অপরিহার্য!

৮৬, আমহার্ট স্ট্রীট কলি: ৯

ফোন-৩৫-১৩৮৩

৬, নটবর দত্ত রো, কলি: ১২

ফোন-৩৪-২৫৩৩

সাধারিক

আর্যজাতির আদি বাসস্থান সম্বন্ধে নূতন তথ্য :

আগরতলা মহারাজ বীরব্রজ কলেক্টর সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী, পঞ্চতীর্থ, এম্. এ, পি. আর, এম্. মহাশয় গভীর গবেষণা করিয়া "আর্যজাতির আদি বাসস্থান" শীর্ষক (Calcutta Review পত্রিকা) বিগত আগষ্ট এবং ডিসেম্বর ১৯৬০) যে নূতন তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন তাহা বিশেষ আশীর্বাদযোগ্য। আর্যজাতির আদি বাসস্থান সম্বন্ধে বিভিন্ন গবেষক এ যাবৎ যতগুলি যুক্তি ও প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, অধ্যাপক সিদ্ধান্তশাস্ত্রীর ক্ষুধাব্য বৃত্তি এবং বেদ প্রভৃতি আর্যশাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত অকাটা যুক্তি ও প্রমাণ-সমূহের সাহায্যে প্রদর্শন করিয়াছেন যে, আর্যগণ বাহিরের কোন স্থান হইতে এ দেশে আসেন নাই, তাঁহারা ভারতবর্ষ হইতেই বিভিন্ন সময়ে বিদেশে গিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। সিদ্ধান্তের উপত্যকায় আর্যজাতির আদি বাসস্থান নহে বলিয়া তিনি মন্তব্য করিয়াছেন। অধ্যাপক সিদ্ধান্তশাস্ত্রীর সিদ্ধান্ত এই যে, আর্যজাতির আদি বাসস্থান পূর্বে আধুনিক বিহার, পশ্চিমে নয়া দিল্লী, উত্তরে হিমাচল এবং দক্ষিণে বিষ্ণু পর্বতের কাছাকাছি এই বিস্তৃত অঞ্চল জুড়িয়া বিস্তারিত ছিল।

পঞ্জিকা ও সিদ্ধান্ত :

১৩৭১ সালের বিষ্ণু সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা (৪২ কর্ণওয়ালিশ খ্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে) প্রকাশিত হইয়াছে। প্রখ্যাত গণিতবিদ যাবতীজ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যুগভীর গবেষণা দ্বারা গণনা সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা

উল্লিখিত করিয়া যে নীতি পঁচাত্তর বৎসর পূর্বে বিষ্ণু সিদ্ধান্তের মাধ্যমে প্রবর্তন করিয়াছিলেন পরবর্তীকালে বহু প্রখ্যাত চিন্তাশীল পণ্ডিত এই নীতি সম্পূর্ণ শাস্ত্র ও বিজ্ঞানসম্মত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। নূতন ও পুরাতন মতের যে লড়াই দীর্ঘদিন যাবৎ পঞ্জিকাকারদের মধ্যে চলিতেছে, তাহা বিবেচনা করিলেও দেখা যায়, বিষ্ণু সিদ্ধান্ত পক্ষ ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতিষ্ঠা গণনার দ্বারা সম্পূর্ণ অমূল্যবান করিয়া তাহাদেরই উপদেশমত বর্তমান কালোৎসাহী সংস্কার-প্রয়োগ দ্বারা অস্বীকার্য পঞ্চাশ প্রদর্শন করিতেছেন। এ বৎসরের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক নিউ ইল পঞ্জিকা প্রণয়নের জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ এবং এই কমিটির গণনা সংশোধনবিষয়ক সিদ্ধান্ত পশ্চিম বঙ্গ সরকার কর্তৃক গ্রহণ। এ বারের আর একটি বিশেষ উদ্ভাবন সংবাদ এই যে, গুপ্তপ্রস ও বাগচী কর্তৃক বিষ্ণু সিদ্ধান্তের সহিত একটি সম্ভাব্য মিলিত হইয়া যুগ্মসিদ্ধান্ত গ্রন্থের প্রণালীতে বর্তমান কালোৎসাহী সংস্কার-প্রয়োগ দ্বারা গণনা সংশোধনের প্রস্তাবে স্বাক্ষর করিয়াছেন। এই সমস্ত সিদ্ধান্তের পর্যালোচনা দ্বারা দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ তিথি, পঞ্জিকাকারদের ঘরোয়া সম্ভাব্য সিদ্ধান্তসমূহ তিথি, দ্বাদশ বৎসর পূর্বে হইতে ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত পঞ্জিকার তিথি এবং ৪৫ বৎসর পূর্বে বঙ্গীয় ব্রাহ্মসমাজের সিদ্ধান্তাশ্রিত তিথি বিষ্ণু সিদ্ধান্তের তিথির সহিত সমতা রক্ষা করে। ইহা আনন্দের কথা। এই পঞ্জী-কর্তৃক বহু ভাষ্যপ্রতিভা সহ করিয়া একান্ত নিষ্ঠার সহিত এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছেন। আমরা আশা করিব অনতিদূর আগামীকালে পঞ্জিকাগুলির মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠা পাইয়া হিন্দু ধর্ম-কর্মে যে বিভেদ বিজাতি আছে তাহা দূর করিবে।

কাশীধামে সারস্বত সম্মেলন :

কাশীধামস্থিত মীরা-বাগী প্রচার সমিতির উদ্যোগে বিগত ২৩শে ফেব্রুয়ারী সাব্বত সম্মেলন কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের

আর মিত্রের

স্মারক

তিল তৈল



বিস্কৃত ও সুপরিষ্কৃত তিল তৈল হইতে প্রস্তুত
যাবতীয় শিরঃস্রাব অস্থিরতা

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন প্রণীত
গীতামাধুরী—১২-০০
(শ্রীমদ্রামায়ণের মত ও পথ
অনুসরণে সর্বপ্রথম গীতার
অমূল্য ব্যাখ্যা)
জগদ্বৈদ্যনাথ সঙ্কীর্ণ—৩
প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে
প্রাপ্য।

এস. চন্দ্র এণ্ড কোং
সর্বরকম সঙ্গীতপুস্তক ও যাবতীয়
বাস্তবজ্ঞানের পাইকারী ও খুচরা
বিক্রেতা।

৪, ওয়েলসলি স্ট্রীট, কলি-১০

অধ্যক্ষ ডঃ সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য, জ্যোতির্ষ পি, এইচ. ডি মহোদয়ের সভাপতিত্বে ভাবগভীরতার সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষার ত্রিভাষা বন্দনা করেন ত্রিপুরেশচন্দ্র ব্যাকরণভীষ, জীবনমালী বর্মানন্দী ত্রিভুবন গোস্বামী ভাগবতশাস্ত্রী, বিষ্ণুসন্দভী। প্রচার-মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ত্রিভোমকেশ ভট্টাচার্য স্বাগত অভিবাদনান্তে “আত্মাহুসন্ধানে” প্রবন্ধ পাঠ করেন। মাতৃবন্দনা কবিতা পাঠ করেন জীবসন্তকুমার শ্রুতিভীষ বড়দর্শনাচার্য। অতঃপর প্রবন্ধ পাঠ করেন “যোগতত্ত্ব ও ত্রিভাষামাচরণ লাহিড়ী” ঐদেবী নারায়ণজী এড্‌ফোকেট, “ভারতীয় অর্থব্যবহা” ডাঃ রাম অধিকারী এম, বি, এফ, আর, সি, এস, (লণ্ডন) টি, টি, ডি (ওয়েলস), “মহাকাব্য” বিষয়ে ডাঃ নন্দলাল মুখার্জী এম, বি। সংস্কৃত পরিবেশন করেন সর্বশ্রী গৌরী, জারতি, গোবিন্দ, কল্যাণকুমার, মঞ্জু, কৃষ্ণপ্রসাদ। সভাপতি মহোদয়ের পরাবিদ্যা ও সরস্বতী বিষয়ে তথ্যপূর্ণ বক্তৃতার পর সম্মেলন সম্পন্ন হয়।

কর্মবীর যতীন্দ্রনাথ রায় :

প্রখ্যাত পুস্তক-প্রতিষ্ঠান ‘ইষ্টার্ন পাবলিশার্স’-এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাপ্তপুরুষ যতীন্দ্রনাথ রায় গত ১লা ডিসেম্বর ৭০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। ময়মনসিংহ টাঙ্গাইলেব নিকলা-গ্রাম ছিল তাঁহার পৈতৃক বাসভূমি। ছাত্রাবস্থায়ই বিপ্লবী-নেতা চিত্তপ্রিয় রায়ের সংস্পর্শে তিনি

আসেন। সে যুগে কলিকাতার দক্ষিণপাড়’ সেবা-সমিতি’ ছিল বিপ্লবী-দল-ভুক্তির একটি গুপ্ত মাধ্যম। যতীন্দ্রনাথ এই সমিতির একজন একনিষ্ঠ ও বিশিষ্ট কর্মীরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। পরবর্তী জীবনে অসহযোগ আন্দোলনের যুগে, ‘সারভেন্ট’ পত্রিকার প্রচার ও পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁহার কর্মকণ্ঠলতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় সাধারণ্যে প্রথম প্রকাশ পায়। ইহাব পর এ্যাড্‌ভান্স’ পত্রিকার বিজ্ঞাপন বিভাগের মানোদায়করূপেও তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯২৩-২৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রচেষ্টায় ও ৮শ্রীমহেশ্বর চক্রবর্তীর সম্পাদনায় ‘সোনার বাংলা’ নামে জাতীয়তাবাদী সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ হইতে বনামধ্যস্ত গণিতবিদ কে, পি, বহুর পুত্র ত্রিভুবনবিশেষ বহুর শিক্ষকতা-সূত্রে এই বহু পরিবারের সহিত যতীন্দ্রনাথ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসেন। প্রখ্যাত কে, পি, বহু প্রতিঃ ওয়ার্কস’-এরও তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। যতীন্দ্রনাথের উদ্যাবনী-সতিভা ছিল অসাধারণ। তাঁহার নব নব উদ্যাবনী প্রতিভার শেষ স্বাক্ষর তিনি রাখিয়া গিয়াছেন—‘ইষ্টার্ন পাবলিশার্স’ ও ‘লক্ষীশ্রী’ মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠায় ও পঞ্জিকালনায়। সংগঠন-কুশলী, পুরুষকারের মূর্ত-প্রতীক, অদম্য-উদ্ভাবী, দানশীল এই প্রতিভা-ভাষার কর্মবীরের তিরোহানে বাঙ্গলার পুস্তক-প্রকাশ-প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্র হইতে এমন একজন আদর্শ পুরুষ চির বিদায় লইলেন যাহার স্থান সহসা বা সহজে পূরণ হইবার নহে।

—শ্রীলক্ষী মজুমদার



সকল রকম বেনারসী সাড়ী, শাল, আলোয়ান ও হোসিয়ারী পোষাক বিক্রয়তা

রামকানাই যামিনীরঞ্জন পাল প্রাঃ
লিঃ

২১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড (বড়বাজার) কলিকাতা ফোন : ৩৬-২৩০৩

সর্বপ্রকার দেশী ও বিলাতী ঔষধের জন্ম

রামকানাই মেডিক্যাল হোম

১২৮১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৪ ফোন : ৫৫-৩৭১১

সম্পাদক : শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৩১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি. এ. কর্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত।
প্রবর্তক প্রিণ্টিং এন্ড হাল্ফটোন লিমিটেড, ৫২১৩ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীকণ্ঠব্রজ রায় কর্তৃক মুদ্রিত।



৪৮ বর্ষ ১২শ সংখ্যা

জীবনের আলো

চৈত্র, ১৩৭০

জীবনের আলো

জাতি বলিতে ষাঁহারা বলেন—‘আমরা হিন্দুও নহি, মুসলমানও নহি—তঁাহাদের আমি ভাগমান শৈবাল-শ্রেণীভুক্ত মনে করি। সর্বাধিক হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় জাতি নিশ্চিহ্ন হইবে না। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এই উভয় জাতির মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন আছে। কিন্তু এই ঐক্য প্রতিষ্ঠার উপায় কি? এক কথায় বলি—হিন্দুকে ষাঁটি হিন্দু হইতে হইবে, আর মুসলমানকে ষাঁটি মুসলমান হইতে হইবে। এই দুই ষাঁটি জাতির ঐক্য হইতে পারে। মিশ্র জাতি যত হইবে, ঐক্যের পথে আমরা ততই অচল হইব। আমি হিন্দু, তাই ষাঁটি হিন্দু হওয়ার কথাই বলিব। মুসলমানেরও দেশাত্মবোধ আছে। ষাঁটি মুসলমান গড়ার ভার তঁাহারা অবশ্যই গ্রহণ করিবেন। ষাঁটি হিন্দু হইতে হইলে, আমাদের তিনটি বস্তুর আশ্রয় লইতে হইবে। গুরু, মন্ত্র ও প্রতিমা—এই তিন বস্তু। ইহাই হিন্দু সংস্কৃতির প্রস্থান-ত্রয়ের পূর্ণ রূপ। আমরা সেই গুরু চাহি, যে গুরু ভারত-সংস্কৃতির মূর্ত্ত বিগ্রহ। আমরা সেই মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিব, যাহা আমাদের স্বরূপের প্রতিমা বিকশিত করিয়া তুলিবে। আমরা প্রত্যেকেই আত্মস্বরূপের আশ্রয়—তাই আমরা “অহং ব্রহ্মাস্মি” বলিয়া ঘোষণা করি। কিন্তু আত্মসংস্কৃতিসম্পন্ন এই ব্যক্তি-অহুভূতি জাতি গড়িতে দেয় নাই। ইহা অহমিকা। এই অহমিকা দূর করার জন্যই ভারতের হিন্দু গুরুর কাছে আত্মসমর্পণ করিতে চাহিয়াছে। কবি চণ্ডীদাসের কণ্ঠেও আমরা শুনিয়াছি একই বাণী “ব্রহ্মরাজে সহস্রারে রূপের আশ্রয়।” কিন্তু এই প্রতিমাকে কি আমরা চিনিতে পারিয়াছি? কেন পারি নাই? কবি পরবর্তী ছন্দে তাহারই সঙ্কেত দিতেছেন—“ইষ্টে অধিষ্ঠাতা তার স্বরূপ লক্ষণ হয়।” আজ আমরা চাহিতেছি জাতীয় অত্যাখানের মূলে এই পরমা গুরু শক্তি। আমরা চাহিতেছি সেই সিদ্ধ মন্ত্র, যাহাতে আমরা সিদ্ধ বিগ্রহরূপে গড়িয়া উঠিতে পারি। খুর্জীটা না হইলে যেমন মুক্ত জাহাজবীথার ধারণ-সামর্থ্য সম্ভবপর নয়—তেমনই শক্তিশালী, সত্যপূত: ঋতময় জাতি-সংগঠন যদি সম্ভব না হয়, স্বাধীনতার গঙ্গোত্রী ধারা বহন সামর্থ্যের অভাবে রাষ্ট্রক্ষেত্রে আমরা ব্যর্থ হইব। চাই আত্মসংস্কৃতির ভিত্তির উপর জাতির সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা। যে সংস্কৃতি জাতিকে অমৃতের অধিকারী করে না, বীর্য দেয় না, সে সংস্কৃতি ধর্মসংস্কৃতি নহে। আমরা ধর্মবীর্য লাভের জন্যই গুরু চাই, মন্ত্র চাই, প্রতিমা চাই। সে বীর্য দেশাত্মকে জাগ্রত করিবে, বিগ্রহরূপে প্রতিষ্ঠা দিবে। অসংখ্য প্রকার আন্দোলনের মধ্যে হে উদীয়মান তরুণ, আমি এই দিকেই তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। (পুরাতন “নবসজ্জ” হইতে)।

সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল

ঋগ্বেদ

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ (প্রথমঃ অষ্টকং । সপ্তত্রিংশং যজ্ঞং ।) সপ্তমী ঋক্
(সজ্ঞগুরু শ্রীমতিলালের জীবন-ভাষ্য অনুসরণে)

শ্রীঅনিলবরণ তর্কবেদান্ততীর্থ

নি বো যামায়় মাহুষো দধ্রে উগ্রায়় মন্থবে ।

জিহীত পর্বতো গিরি ॥ ৭ ॥

অর্থ—“হে মরুতঃ” (হে মরুদেবগণ) “বঃ” (আপনাদের) “যামায়” (গমনের সময়) “মাহুষঃ” (মাহুষ, গৃহস্থামী) “নি-দধ্রে” (নিষ্কেপ করে) [কি নিষ্কেপ করে? গৃহদার্চ্যার্থঃ দৃঢ় শুভ্র—কেন নিষ্কেপ করেন?] “উগ্রায় মন্থবে” (উগ্র গমনের ক্ষুদ্র অতিমন্ত্রমান হেতু) [মরুদেবগণের উগ্রগমনের সময়] “পর্বতঃ” (বহুবিধ পর্বতযুক্ত) “গিরি” (শিখর সমূহ) “জিহীত” (পতিত হইয়া থাকে) ॥ ৭ ॥

স্ববলার্থ—হে মরুদেবগণ! আপনাদের গমন কালে গৃহস্থামী ভয় প্রযুক্ত গৃহ দৃঢ়ীকরণের জন্য দৃঢ় শুভ্র সমূহ নিষ্কেপ করিয়া থাকেন। যেহেতু আপনাদের গতিবেগে বহুবিধ পর্বতযুক্ত শিখরসমূহ পতিত হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

বিশদার্থ—এই ঋকের দুই প্রকার অর্থই অসম্পষ্ট। এক—আচার্য্য সায়নের মত। তাঁর মত হইতে তদানীন্তন মাহুষের জীবনযাত্রার একটা আভাস পাওয়া যায়। মনে হয়, সে যুগে বুদ্ধি কোন অট্টালিকা বা ইमार ছিল না—সকলেই পর্ণকূটারবাসী। বায়ুর প্রাবল্যে স্বতাবতঃই পর্ণকূটার জীর্ণ হয়, শুভ্র শিথিলীকৃত হয়—সেই জন্যই যেন ঋষি মরুদেবগণের উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—হে মরুদেবগণ! আপনারা অমিত বলশালী। আপনাদের গতাগতিতে, দৃঢ়মূল, স্থাপু, অনড় পর্বত-গিরিও যখন নিপতিত হয়, তখন মাহুষ আমরা—আমরা তো আপনাদের ভয়ের চক্ষে দেখিবই। আপনাদের প্রকোপে আমরা যেন বিনষ্ট না হই, আমাদের গৃহের শুভ্র সকল যেন অতঃপাশ্বে—আপনাদেরই ভয়ে “গৃহস্থামী” “দৃঢ় শুভ্র” সকল নিষ্কেপ করেন গৃহকে অদৃঢ় রাখার জন্য। এই ঋকটিকে হইতে আরও একটি অর্থ নিষ্কাশন করা যায়। পূর্ব ঋকে আমরা পাইয়াছি ঋষির অহুসন্ধিংসা—কে এই প্রবল প্রতাপাশ্রিত বায়ুরাজীর পরিচালক। মরুদেবগণের মধ্যে “বর্ষিষ্ঠঃ” কে? এই ঋকে ঋষি যেন সেই কথাই সন্দেহ প্রদর্শন করিতেছেন। এইখানে দুইটি-তুর্কীর শক্তির সন্নিবেশ হইয়াছে। একটি গতিশীল শক্তি, অপরটি স্থিতিশীল। বায়ু গতির পরিচায়ক আর গিরি পর্বত বা দৃঢ় শুভ্র প্রভৃতি স্থিতির প্রতীক। এই দুই শক্তিকে সংযমিত করেন যে বিরাট পুরাণ পুরুষ—ঋষি তাঁহারই অহুসন্ধান করিতেছেন।

মাহুষ বায়ুর উগ্রতাকে ভয় পায়। কেন পায়? বায়ু যে শুধু ভুলোক, দ্যালোক, অন্তরীক লোকেই প্রবহমান তাহাই নহে, মনুষ্য শরীরেও ইহা সমভাবে বর্তমান। যে বায়ু ত্রিলোকের নিয়ন্তা—বাহাকে উপনিষদ “ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মসি, ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিস্যামি” বলে প্রণাম করেন, সেই বায়ুই মাহুষের মধ্যে প্রাণরূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া মাহুষকে জীবনী শক্তি দান করিতেছেন। আধুনিক যান্ত্রিক যুগে যন্ত্রের মাহুষ সৃষ্টি হইতেছে কিন্তু তাহা প্রাণহীন। ইহাতেই সপ্রমাণ হয় যে বায়ু চৈতন্যময়। কিন্তু ইহারও চেতনিতা একজন আছেন—যিনি এই প্রাণবায়ুটিকেও সংযত করিয়া রাখেন। কারণ এই বায়ুটিও অল্প শক্তির নহে—ইহা যখন সাম্যাবস্থায় থাকে, তখন মাহুষ স্থির, ধীর, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, গুণী সব কিছু—ইহার বৈষম্য ঘটিলেই মাহুষও বিপরীত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে—জীবনের দৃঢ় বনিয়াদও তখন শিথিল হইয়া পড়ে, শাস্ত্র, সমাহিত মাহুষই তখন হইয়া উঠে প্রচণ্ড, উগ্র, ভয়ানক, হিংস্র ও ভীতিপ্রদ—ইহার জন্য দায়ী কি মাহুষ, না ঐ মরুদেবগণ না তৃতীয় আর কেহ? এই দিক দিয়া ব্যাখ্যায়-মন্ত্রের “যামায়” পদটি যদি “মাহুষ” পদের সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট করা যায় তাহাটী সুপরিষ্কৃত হয়। “যামায়” শব্দের অর্থ আচার্য্য সায়নের মতে গমনার্থঃ—গমনের জন্য, চলার জন্য, গতির জন্য—আমাদেরও তাহাই মত। কারণ গতিই মাহুষের জীবন, গতিকে অব্যাহত রাখিবার জন্যই মাহুষের নিরন্তর প্রচেষ্টা। গতির মাধ্যমেই মাহুষ ভগবানের ঐশী শক্তির পরিচয় পায়। আবার শুধুই যদি গতি থাকিত, তাহা হইলে সৃষ্টির প্রকাশ থাকিত না—গতিবেগে কেবলই সে অনন্তে মিশিয়া বাইত। তাই গতি ও স্থিতি দুই-ই সমভাবে প্রয়োজন। যে শক্তি এই দুইয়ের নিয়ামক ঋষি তাঁহারই অহুসন্ধান করিতেছেন ॥

বিশ্বদোল

স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী

আত্মারামোহপি রেমে ন খলু স পরমো হৃদ্যভাক্ স্ত্রী পুমাংশ্চ
ভূতাত্মগ্বেবলীনাং নিজরসধনতাং নিস্তরঙ্গাং মমহু ।
ভূমা যো বৈ রসোহভূৎ স যুগলরসভুগ্ বিশ্বদোলহস্ত দোল
স্তদোলান্ মর্মকোষে মিলনমধুলুভা মঞ্জরীমঞ্জুদোলঃ ॥ ১

আতো দোলস্তয়ো র্থঃ স্থললিতশুষ্কম স্তেন বিশ্বস্ত লাস্ত-
মুগ্লাসো বা বিলাসোহপি নিবিড়মধুরা রাসলীলা ব্রজে বা ।
মায়াভিজীবজাতে বিষমবিষময়ঃ প্রাকৃতস্তদ্বিপাকঃ
কালিন্দীমন্দদোলো ললিত ইহভবে কালিয়াবর্ত দোলঃ ॥ ২

১

আত্মারাম হে পরম !

কোন্ অতৃপ্ত কামনায বল,

প্রকৃতি-পুরুষ সাজি হইলে মিথুন ?

আর, তাই হ'য়ে আত্মলীন, নিস্তরঙ্গ

নিজ রসধনতায় করিলে মম্বন ?

যেবা তুমি রসভূমা, ভেদ-সীমাহীন,

সেই তুমি রসিক হ'লে, যুগল রসরাজ,

নিজে খেলে রাসদোল, বিশ্বে দিলে কত কামনার দোল !

সে দোলেতে বুঝি তার মর্মকোষ,

মিলনের মধু দিয়ে ভরিবে বলিয়া,

বল্লীবৃন্তে তাই আধ' ফোটা,

মঞ্জরীটি দেয় মঞ্জুদোল !

২

সে পরম মিথুনে

যে আদিম দোল,

স্থললিত শুষ্কম অপরূপ,

সেই দোলে বিশ্বলাস্ত,

বিশ্বে যত উল্লাস-বিলাস,

কত হৃদে, -কত স্তরে পেল তার রূপ !

শুধুই কি বিশ্বের নটনে ?

নিত্য ব্রজধামে নিত্য রাসলীলা—

নিবিড় রসমাধুরী পরিসীমা—

সেওতো, আদিম মধুর যুগল মধু দোলা !

তবে বল', সব উন্টে-বাওয়া কোন্ কুহকেতে

সে অমিয় দোলে হেন প্রকৃতি-দুর্বিপাক !

অমিয় গরল হ'ল, শুষ্কম বিষম ;

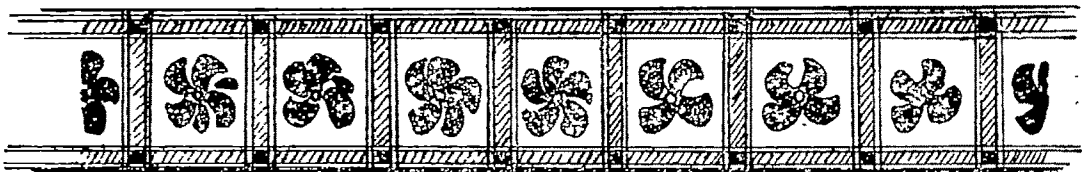
যে বিষমে জীবে যত ভীষণ ঘৃণিপাক !

কালিন্দীর বৃকে শারদরাকায়,

ললিত মম্বর মুরলীমঞ্জীরসাধা দোল,

কেমনে সাধিল বল', এই কালিষের কুপে,

কালকূটভরা আবর্তের, ভয়াল আর্তরোল !



শেলীর কাব্যিক মতবাদ

অধ্যক্ষ কণিভূষণ বিশ্বাস

শেলীর কাব্যিক মতবাদ একটু স্বতন্ত্র। কোন্ডরিক্স, ওয়ার্ডসওয়ার্থের সেই বহু আলোচিত অভিমতের সঙ্গে তার কোন মিল নেই। তিনি যেন কাব্যকে দেখেছেন একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে। বলেছেন যে, কাব্য কেবল আঙ্গিক অভিব্যক্তি নয়, বিশ্ব-শক্তির একটা বলিষ্ঠ কর্তৃত্ব। এই যাকে আমরা অনন্ত সত্য যা জীবন বলি, তা' চির সঞ্চারশীল বহু বিচিত্র অবস্থানে ঢাকা।* সেখানে নিত্য যে সূখ দুঃখের ঢেউ উঠছে, তার গভীরতম তলদেশ থেকে আসছে কাব্যের প্রবাহ। তাই সেখানে দুঃখের দাহ নেই, সূখের উন্মাদনাও সেখানে স্তিমিত। তাই জীবনের নিবিড় দুঃখের মধ্যেও পাই কাব্য জগতের সেই আনন্দ-সংগীতকে।

কাব্যের স্বর্ধ্ব সেই রহস্তোদ্ধার করাটাই নয়, প্রকৃত প্রস্তাবে কাব্য হ'চ্ছে সৃষ্টি। কবি যা' সৃষ্টি করেন, সেটা নিছক কবি-কল্পনা নয়। কাব্য তার চেয়ে নিগূঢ় অহুভূতির রঙে সিক্ত, তদুপলব্ধিভাবে নিবিষ্ট। অর্থাৎ কাব্য হ'চ্ছে চিরন্তনতার তার মধ্যে দিয়ে দেখা জীবন উপলব্ধির ছবি। তাই নিছক সৃষ্টি বলে, কাব্য-কৃতির স্বরূপ কিছুটা অহুস্ত থেকে যায়। যদিও তার মধ্যে আছে স্বৈচ্ছিক আবিষ্কারের কাজ, তথাপি তার প্রয়োগ-শিল্পটা কিন্তু স্বজনী-পদ্ধতির অধীন। এক কথায় তার চেয়ে অনেক গভীরতর হ'লো কাব্যিক-প্রেরণার উৎস। যে প্রেরণার অতল উপলব্ধি থেকে আমরা চিন্তা করি এবং উপলব্ধিকে প্রত্যক্ষ করি—সেই প্রত্যক্ষীভূত নব্বয় মানব-সত্তার মধ্যে প্রতীয়মান দেবত্বের আশ্বাদন-ই হ'লো কাব্য।

সত্যতার বাস্তব-সংঘাতে যতই সেই মহান সত্তার গোঁরব কুণ্ঠ হ'চ্ছে ততই যেন মজে আসছে সেই কান্যিক প্রেরণার উৎস। সত্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃই যেন যুক্তিসর্বস্বতায় পৃথিবীর কাব্য-রস

নিঃস্বেষিত হয়ে আসছে। কেননা, নিছক যুক্তি কোন-দিন কাব্যিক মুক্তির অর্গল খুলে দিতে পারে না, সে কেবল পারে কল্পনা-কৃতির উপর বিশ্লেষণের কাজ করতে। শেলীর ভাষায় বলতে গেলে “reasoning cannot creat, it can only operate upon the products of imagination.”

এই প্রসঙ্গে তিনি আরও তত্ত্ব বিশ্লেষণে ডুব দিয়েছেন। বলেছেন যে, যেখানে সৃষ্টির দাক্ষিণ্য নেই, যে প্রকাশে ভাবনার মৌলিকত্ব নেই, তা' তত্ত্ব হ'লেও শিল্পসত্য নয়। এক অর্থে প্রকৃত শিল্পকৃতি যেমন সৃষ্টি, তেমনি রঙে রসে সে অভিব্যক্তি কাব্যও বটে। এই একই অর্থে শিল্পী বা গায়ক কবি। স্বজনী প্রতিভার দিক থেকে একথা সত্য। ঠিক এই অর্থেই শিল্পও রূপময় কাব্য। পরিবেশিত সঙ্গীত যখন কোন এক পর্যায়ে সুর স্রষ্টার আঙ্গিক অভিব্যক্তি, সেটা তখন আর কেবল গান নয়, কাব্যিক সৃষ্টি। আর ঠিক এই অর্থেই প্লেটো, বেকন এমন কি হেরোডোটাস্ এবং লিভিও কবি। যদিও তাঁদের লেখা এমন যুক্তিসর্বস্বতা, গঙ্গ-গঙ্গী এমন অনেক কিছু আছে, যা' আদৌ কাব্য নয়। আবার যখন কোন একটি ভাব-মূর্তি ভাষায় অনুদিত হয়ে একটি হৃদয় নিউড়ানো সত্যে প্রকাশ পায়, তখন তা' কাব্যের স্তরে গিয়ে পৌঁছায়।

আবেগ থেকেই আসে ভাবনার বেগ। কেননা আবেগগত কল্পনাই কাব্যের উৎস। মাহুষের সেই অন্তরাঙ্গার ছাপ এবং তাপ থেকে যে ভাব-বিগ্রহ গড়ে উঠে, তা কাব্য-কৃতি ছাড়া আর কি? শেলীর ভাষায় কাব্য হচ্ছে “the element and forms of his innerself.” অর্থাৎ কবি-ভাবনার তাপে তার হৃদয়ের-ইচ্ছা থেকে আহরিত ভাষায় যে রস-মূর্তি মুদ্রিত হয়, তাই তো কাব্য। আর এইখানেই চিরন্তন ইচ্ছা আর অহুভূতির যে নিখুঁত সংহতি ঘটে, সেখানেই ঘটে আত্মার সঙ্গে আত্মার সম্যক মিলন। আর সেখানে শ্রেষ্ঠ মনীষিতার ঐশ্বর্য থাকে মননশীল মনকে স্পর্শ করে।

* Poetry is the voice of the world power—the revelation of eternal ideas which lie behind the many coloured, ever shifting veil that we call reality of life.

টিক এই কারণেই সংস্কৃত আলাংকারিকরা বলেছেন, 'কাব্য হ'চ্ছে সহদয় হৃদয় সংবাদী'।

এই কাব্যিক ভিষ্মানের কত বিচিত্র উপকরণ দেশ-কালে ছড়িয়ে রয়েছে। কোন্টা তখন কোন ভাবের খোলায় কি রসের পাক করবে, তা বলা শক্ত। রোসের কাব্যিক ইতিহাসই তার নজির। সে যুগের রোমীয় কাব্য-ভাবনার পিছনে ছিল রোম-রাজ্যের বিচিত্র ইতিহাসের প্রভাব। আর ছিল সেই ক্যামিলাসের জীবন, রেগুলাসের মৃত্যু, গলের জয়, হানিবলের সঙ্গে প্রজাতন্ত্রের সন্ধিকরণে অসম্মতি। তখনকার কাব্যের মাধ্যম ছিল স্বভাববর্ণন। এমন কি কাজকর্ম এবং যুগ-রীতি-নীতিও ছিল তার নেপথ্যে।

তা হ'লে যুগ-ভাবের পথে ভাষার গাড়ী চড়েই ঘোরা ফেরা করে শিল্পিক অভিব্যক্তি। তুলির 'টান-টোনের' ভাষা যেমন বর্ণাঢ্য, কাব্যের ভাষা তেমন নয়। তার ভাষা যেমন সুবিস্তৃত, তেমনি বৈশেষিক।

তাই অহুর্বাদের মধ্যে কবির সেই নিজস্ব ভাবাবেশ ভাষার সেই জৌলুষ থাকে না। তা যেন অহুর্বাদের অহমিকা নিয়ে কেমন একটা আড়ষ্ট হয়ে থাকে। শেলীও তাই ইংরাজিতে অনুদিত হোমারের কাব্য পড়ে পরিতুষ্ট হ'তে পারেন নি। বলেছিলেন এ হেন হোমারের কাব্য পড়ে আমার গভীর দীর্ঘশ্বাসই বার হয়। কেননা সেখানে কাব্যের ছায়ায় পাওয়া যায়, রস-সত্তার সেই ভাবোন্মেষ কায়াকে নয়। তার কারণ এই যে, এক দেহ থেকে অল্প দেহে রূপান্তরিত হয়ে সেই ভাবনা অবশ্য থাকে, কিন্তু সেই ভাব ঠিক তেমন তাজা, তেমন সরস থাকে না। হয় তো অহুর্বাদের মস্ত পড়ে নমো নমো করে পূজো সারা যায়, সেই ভাববিগ্রহেব প্রাপপ্রতিষ্ঠা করা যায় না। এ হেন পার্থক্যের দ্বিতীয় কারণ হ'লো উপলব্ধির সেই প্রাণোত্তাপের অভাব। এই কারণে যে কাব্য ছিল হোমারের কাছে একটা আত্মিক চৈতন্যের ছাতি, প্রেরণার আগুন ভালোবাসার অর্থ; তাই এ হেন অহুর্বাদকে মনে হয় যেন আসল ভাবনার পাশে সেই মৌলিক ভাব মূর্তির একটি কম্পমান চূর্বল ছায়া মাত্র।

যে জীবনের জীবন হোমার শেকস্পিয়ারের ভাব-

লোকের আকাশকে উজ্জ্বল করে রেখেছিল, সেই জীবন-বেদনা-স্ক্রিত ভাবনা না হ'লে মৌল কাব্যের সেই ভাব ফুটবে কি করে? প্রাণপৈতির গভীরতম প্রদেশ থেকে যে প্রেরণা আসে, সেই ভাবনার পাশে মৌমাছির মত ভাষাও ওঠে শূন্যনিম্নে। এক কথায় এ হেন ঐকান্তিক ইচ্ছার উপরই কাব্যিক ভাষায় চেহারা বদলায়। জুলিয়ান এবং ম্যাডোনাই তার জলন্ত দৃষ্টান্ত।

এই কারণে শেলী বলেছেন যে, কাজ হচ্ছে এমন একটি সর্বাঙ্গীন নিখুঁত কাঠামো, যার আবেদন একেবারে সরাসরি। তাই সে কাব্যের নিবেদন কান থেকে গিয়ে পৌঁছায় আমাদের হৃদয়ে। কাব্যে যেন এই পূর্ণতার রাজত্ব যজ্ঞ চলেছে রূপ রস আর যুগ-চরিত্রের বিচিত্র লোকে। হোমারীয় কাব্যের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি তাই বলেছেন যে, সে যুগের পূর্ণাঙ্গ ছাপ পড়েছে তাঁর কল্পিত চরিত্রগুলিতে। তাঁর সৃষ্ট এ্যাচেলিস্ হেস্টার এবং ইউলিসিসে এই সত্যই যেন বার বার উদ্ঘাটিত হয়েছে। আর, পরিদৃশ্যমান হ'য়েছে সেই জীবন সত্য আর মিত্রতার সুষমা—যা কেবল সত্য নয়, সৌন্দর্যের সম্পদ। সেই কাব্যিক বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে যে দেশাত্মবোধ এবং অদম্য ভক্তি-শ্রদ্ধা উৎসারিত হ'য়েছে, সেখানে এক আশ্চর্য জীবন-তপস্শ্রাব্য ঘটেছে কাব্যের উদ্ঘাষণ। কাব্য তখন আর পুঞ্জীভূত ভাবনার জলকণা মাত্র নয়, সে তখন সাধনার আলোয় রামধনু হয়ে দিগ্বিদিক উদ্ভাসিত করে দিয়েছে। কবি যে হৃদয়-নিবিড় আদর্শের রঙে কাব্যকে রাঙিয়ে তোলেন, শেলী সেই কথার প্রতিধ্বনি করে বলেছেন যে, "Poet can colour with the hues of ideal everything he touches." এখানেই রিয়েল আইডিয়েলাইজ হয়ে উঠে। এথিয়ান ট্র্যাজিডির মধ্যেও এই আদর্শ ভাববাদ বর্তমান।

শেলীর মতে 'ম্যাকবেথ', কিংলিয়ার যদিও নিখুঁত চিত্রায়ণ নয়, তথাপি সেগুলি জীবন সত্যে, প্রাণৈশ্বর্যে জগতের শ্রেষ্ঠ নাটকত্বের স্বীকৃতি পেয়েছে। এই একই শর্তে প্রোমেথিউস্, 'ম্যাডোনেসাস্', 'কেনিক', সপ্তদশ শতকের অদ্বিতীয় সৃষ্টি। শেলী যেহেতু কমেডির ডক্ট

হিলেন না, তাই মিলনাস্ত্র কাব্য-নাটকের তিনি যেন রসাস্বাদনে পরাশ্রয় ছিলেন। আর এই কারণে ‘এচিলিস’ ‘হেষ্টিয়ার’, ‘ইউলিসিস’ তাঁর মতে নিখুঁত সৃষ্টি নয়।

শেলীর কাব্যে তাই একটা আশ্চর্য জীবনবাদ পরিফুট। তাঁর কাব্যিক ভাবনার মধ্যে ছিল সেই দৈতবাদ—যার একদিকে ছিল নৈতিক চেতনা, অল্পদিকে ছিল অতিমানববাদ। যা অতীন্দ্রিয়বাদের সমগোত্রীয়; কেননা, তাঁর কাছে জীবন ছিল সেই চিত্র-বিচিত্র ‘ডুমের’ ভিতর দিয়ে দেখা এমন একটা প্রাণসস্তা, যা দেবত্বের স্তম্ভোচ্ছল বর্ণ-ছটাই বিকিরণ করে। তাই তিনি বলেছেন যে, “Life like a dome of many coloured glass, strains the white radiance of divinity.”

ভিত্ত্যষ্টিক বা নীতিগর্ভ কবিতার যেমন লক্ষ্য থাকে একটা নৈতিক আদর্শের দিকে, ঠিক তেমনি শেলীর কাব্যিক দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল নীতি-প্রণোদিত অতিমানববাদের সেই অতীন্দ্রিয় লোকের দিকে। ট্যাসো, ইউরপিডিস্ লুক্যান, স্পেন্সার প্রভৃতির কাব্য যেমন নৈতিক চেতনাশ্রয়ী,—অনেকটা সেই জাতীয় রসের আশ্বাদ মেলে শেলীর অনেক কাব্যে। এই কারণে জর্নৈক পাশ্চাত্য সমালোচক বলেছেন যে, শেলীর কাব্য কেবল জীবনকে উপকৃত করার অঙ্গীকার দেয় না, নৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধও করে। শেলী অবশ্য মনে করতেন যে, নৈতিক আদর্শের রূপায়ণই তো কাব্যের একটি প্রধান কাজ। আর কল্পনাই হচ্ছে সেই নৈতিক ভালোর একটি মহান হাতিয়ার বা যন্ত্রবিশেষ। আবার প্রেমই হ’লো সেই নৈতিক ভাবের রহস্যলোক। অর্থাৎ শেলীর ভাষায় বলতে গেলে “imagination is the greatest instrument of moral good—the secret of moral is love.”

শুধু একথা বলেই তিনি ক্ষান্ত হন নি। তিনি কল্পনাকে দেখেছেন জীবন-সাধনার উদ্দেশ্যনের সিঁড়ি

রূপে। সেই অকাটা বিশ্বাসে তিনি বলেছেন যে, মানুষ যদি প্রকৃতই ভালো হ’তে চায়, তবে তাকে গভীরভাবে সর্বাস্বক কল্পনার অঞ্চল-প্রবাহে অবগাহন করতে হবে। তবেই তার নৈতিক চেতনার উন্নতি সাধিত হবে। আর কাব্য যখন এ হেন জীবনের ব্যাখ্যা, তখন সেখানে মহান জীবনাদর্শের একটা নৈতিক আখ্যা থাকা উচিত নয় কি?

এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তিনি কাব্যিক প্রতিভারও বিচার করেছেন। বলেছেন, কাব্যিক প্রতিভা আর কিছু নয়, এক কল্পনার আলোকে অল্প এক জীবনকে দেখা। এই কল্পনায় যার আবিষ্কার এবং সৃষ্টি। শেলীর মন্তব্য থেকেই এই বক্তব্যটি উদ্ধৃত করছি—“genius of a poet does not lie there, but in imagination, it is their discovery or creation.”

এই কাব্য-সৃষ্টির প্রেরণা-পর্বে শেলী প্রেমকে সর্বোচ্চ আসনে বসিয়েছেন। বলেছেন যে, পৃথিবীর যা কিছু শ্রেয়, তার ভিতরেই চলেছে প্রেমের গোপন লীলা। বুদ্ধিগ্রাহ্য স্বপ্ন-সৌন্দর্য, আধীনতা এবং নৈসর্গিক সস্তার সেই মৌল স্বরূপ—অর্থাৎ এই দুনিয়ার যা কিছু শ্রেয়—তার মূলে আছে ভালোবাসার দোহাই। এই প্রেমের ছোঁয়া না পেলে কোন অভিব্যক্তিই প্রকাশযোগ্য হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠে না। আর এই ভালোবাসা নির্জীব নয়, প্রাণবন্ত। কখনো কখনো এই প্রেম প্রগল্ভ হয়ে উঠে। সেই মুখর প্রণয় যখন সঙ্গীতধর্মী ভাষায় কথা কয়, সেটা তখন কাব্য হয়ে উঠে। প্রেমের স্বপক্ষে এমন কাব্যিক তত্ত্ব বিশ্লেষণী ব্যাখ্যা আর কেউ করেন নি।

এক কথায় কাব্যের চূড়ান্ত সংজ্ঞা দিতে গিয়ে শেলী বলেছেন যে, “Love sometimes talks. Love talking musically is poetry.” অর্থাৎ কবির ভালবাসা যখন সঙ্গীতধর্মী ভাষায় বাণ্য হয়ে উঠে, তখনই তা হয়ে ওঠে কাব্য। প্রেমের সাদীতিক অভিব্যক্তি বা প্রকাশই তো কাব্য।





শিল্পীঘন

—শ্রীধরলাল ঘোষ—

(পূর্বাহ্নবৃত্তি: ফাল্গুন সংখ্যার পর)

নটরাজ মূর্তিটি সম্পূর্ণ করতে দেবকুমারের পুরো পাঁচটি দিন লাগলো। প্রত্যুষে স্নান করে বসে বেলা দ্বিতীয় প্রহর অবধি একটানা চুক চুক করে হাত চালায়। কল্যাণ আহারের জন্ত ডাকতে আসে তবে সে ওঠে। ওই খাবার সময়টুকু ছাড়া কল্যাণের সঙ্গে তার দেখা হয় না, কথাও হয় না। আহারের পর দেবকুমার বেরিয়ে যায় মন্দির দেখতে, ফিরে যখন আসে, তখন কল্যাণ বাড়ী থাকে না, পিদিমের আলোয় দেবকুমার মোটা রেখাগুলির কাজ করে। তারপর রাত্রি প্রথম প্রহর পার হয়ে গেলে কোন এক সময় ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ে। দরজার বাইরে বারান্দায় ঝিন্দনকে বসে থাকতে সে দেখে, ও যেন অতন্ত্র চোখে তার শিল্পকর্মের বিচ্যুতি লক্ষ্য রাখে। কথা বিশেষ হয় না, গানও নয়। সেদিন সেই চঞ্চলী এসে পড়ার পর থেকে ঝিন্দন আর গানের কথা তোলেনি। চুপ করেই সে বসে থাকে দরজার বাইরে। একক এই মেয়েটিকে এই ভাবে রাতের পর রাত স্বামীর প্রতীক্ষায় বসে থাকতে দেখে দেবকুমারের সহানুভূতি মনে জাগে, কল্যাণকুমারের উপর বিরাগ জাগে, ভাবে পরদিন

কল্যাণকে কথাটা বলবে। কিন্তু ঝিন্দন সমুখে কল্যাণকে কিছু বলতে তার কেমন যেন সঙ্কোচ হয়। দেখতে দেখতে পাঁচটি দিন কেটে যায়।

কল্যাণের হাতে পাথরখানি দিয়ে দেবকুমার বললো, এইটি তোমাদের জন্ত করে দিলাম, তোমরা শিল্পী, সুর ও সঙ্গীতের আদি মহাদেব, শিবের এই নটরাজ মূর্তি তোমাদের গৃহের শোভা বর্ধন করবে।

কল্যাণ বললো—এ মূর্তি ঘরে রাখলেই তো পূজা করতে হবে, তার চেয়ে কোন দোকানে দিয়ে আসি, কিছু মূল্য পাওয়া যাবে। তুমি তো একেবারে কপর্দকশূন্য, তোমার তো কিছু অর্থের প্রয়োজন আছে।

—পরসী অর্জনের জন্ত এ আমি করিনি, তোমাদের কাছে প্রীতির নিদর্শন রেখে যাবার জন্তই করেছি, ওটা তুমি রাখো।

—দেববিগ্রহ ঘরে রাখলেই যে পূজা করতে হয়, পূজার ব্যাপারটা বড় হাল্কাযার, আমার পোষায় না।

ঝিন্দন পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। সে এবার বললো—পূজো আমি করবো, তোমার কিছু ভাবতে হবে না।

—তবে রাখো—বলে কল্যাণ পাথরখানি ঝিন্দনের হাতে দিল। ঝিন্দন নিরীক্ষণ করে দেখলো, তারপর বললো—সুন্দর হয়েছে, সত্যি শিল্পী তোমার নিপুণতা আছে।

—তালো হয়েছে? দেবকুমার জিজ্ঞাসা করলো।

—আমার তো খুব ভাল লাগছে। আমি চন্দন কাঠের একটা ছোট চতুষ্পীঠিকা করে তার উপর এটিকে বসিয়ে রাখবো।

কল্যাণ কয়েক মিনিট চুপ করে তাকিয়ে রইল তারপর কোন কথা না বলে অতন্ত্র চলে গেল। দেবকুমার আহত হলো, বললো—সুরকার কি রাগ করলেন নাকি?

—জানি না—বলে ঝিন্দন চোখ তুলে তাকালো, ঠোটটা একটু ঝেঁকিয়ে বললো—উনি কখন কি মেজাজে থাকেন, কুল পাওয়া শক্ত। আপনি ওর ব্যবহারের কথা ধরবেন না।

পরক্ষণেই কথার মোড় ফিরিয়ে দিয়ে ঝিন্দন বললো—আরেকখানি পাথরের পাটি এনে দিয়েছি সেটায় কি খোদাই করবেন?

অগ্নমনস্কভাবে দেবকুমার বললো—জানি না।

—যাই করুন এমনি স্তম্ভ হওয়া চাই কিন্তু।

—দেখি—বলে দেবকুমার অগ্নমনস্ক হয়ে পড়লো।

মন্দির দেখা শেষ করে হৃদের তীরে এসে দেবকুমার বসেছিল। জলকে সে আবাল্য ভালবেসেছে। নর্মদার প্রবহমান চাক্ষু্য, প্রপাতের ভীমা উচ্ছ্বাস, আর নিনোরার এই মুহিতপ্রায় স্তব্ধতা দেবকুমারের মনের গভীরে প্রশান্তির ছায়া বিস্তার করে। জলের সঙ্গে তার মন মিশে যায়, জলের পানে তাকিয়ে সব চিন্তা যেন প্রচ্ছন্ন হয়ে আসে। এ যেন বিচিত্র সমাবেশে অলঙ্কৃত প্রকৃতির সমাধি-রূপ। রাত্রির এই রূপে রঙের বর্ণাঢ্যতা নেই, আলোকের দীপ্তি নেই, জীবনের কঙ্গরব নেই। আছে শুধু নিঃসীম শান্তি। দেবকুমারের মন এই শান্তির টুকরো কুড়িয়ে নিতে চায়। নিনোরা হৃদের পানে তাকিয়ে দেবকুমার বসে থাকে।

দমকা হাওয়ায় ঠাণ্ডার আমেজ দেখা দেয়। অন্ধকার আকাশ থেকে নীতের গুঁড়ো যেন বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে, গায় এসে লাগছে, সেই চূর্ণের প্রতিটি কণা স্পর্শ দিবে অমৃত হৃদে। এই অমৃতভূতি প্রকৃতিদেবীর স্নেহের বিস্তার। মাকে হারিয়ে দেবকুমার যে স্নেহ স্পর্শ থেকে বাল্য থেকে বঞ্চিত সেই স্নেহের স্পর্শটুকু সে যেন অমৃতব করে।

কোন এক সময় তন্দ্রা আসে দেবকুমার, ঘরে ফেরার জন্ত উঠে দাঁড়ায়। পথে পা বাড়তেই মুখোমুখি মানুষের ছায়া পড়ে। ছায়ায় ঠিক চেনা যায় না। সামনে এসে ছায়া বলে, কে? ভাস্কর?

—আপনি? দেবকুমার প্রশ্ন করলো।

—আমি মন্দিরের সেই পানওয়ালী—চঞ্চলী। এরই মধ্যে ভুলে গেলেন আর্য! চঞ্চলী খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো, বললো—তা ভুলে যাবারই কথা, চোখের উপর অমন রূপবতী থাকলে আমাকে আর মনে থাকবে কেন?

—আপনি কার কথা বলছেন?

—শ্রীমতী বিন্দনকে আপনি চেনেন না?

—তিনি আমার গৃহস্বামিনী আশ্রয়দাত্রী পরজী, তাঁর সম্পর্কে এইভাবে কথা বলা আপনার পক্ষে অসুচিত।

—রাত্রে একান্তে বসে পরজীর সঙ্গে মদীতালাপ চলতে পারে তা যদি কোন দর্শকের চোখে ভাল না লাগে তাহলে দর্শকের দৃষ্টিই নিন্দনীয়—সে কেন চোখ বুজে থাকে না, কি বলেন?

চঞ্চলী আবার হেসে উঠলো।

দেবকুমার বিরত বোধ করলো, বিরক্ত হলো।

চঞ্চলী বললো—সত্যি কথা শুনেলে একটু রাগ হয়, সেইজন্যই আজকাল মিথ্যার চলন খুব বেশী। অবশ্য বিন্দন ভাইকে ভালো লাগা অন্তায় কিছু নয়, দেখতে খারাপ নয় আর কণ্ঠের তো তুলনা নেই। তার উপর আপনার চোখে আছে শিল্পীর দৃষ্টি। মণিকাঞ্চন যোগ হয়েছে, তবে বিন্দন পরের ঘরণী, এই যা বাধা।

দেবকুমার সহসা তিক্ত কণ্ঠে বলে ফেললো—আপনার যা মন চায় বলুন, আমি ছ’ একদিনের মধ্যেই এখান থেকে বিদায় নেবো।

—মন্দিরে চিত্রাবলী দেখবেন না?

—না, যা দেখেছি তাই যথেষ্ট।

—এই বুঝি শিল্পীর মন? শিল্পী শত দুর্নাম ও দুর্গতির মধ্যেও অচল নিষ্ঠার সাধনা করে যায়, তবে তো শিল্প সৃষ্টি হয়।

—লোকনিন্দাকে আমি ভয় করি।

—বেশ তো আপনি অত্র গৃহে অতিথি হোন। খাজুরাপুরীতে তো গৃহের অভাব নেই।

—না আর কোথাও যাবো না।

—আপনি ইচ্ছা করলে আমার গৃহে আশ্রয় নিতে পারেন। আমার গৃহে আপনার কোন অসুবিধা হবে না। আমার সম্পর্কে বেউ নিন্দা করে সময়ের অপব্যয় করবে না।

দেবকুমার বিস্ময়ে চঞ্চলীর মুখের পানে তাকালো। মুখ স্পষ্ট দেখা যায় না। মেয়েটি হৃবোধ্য বলে মনে হলো।

—কী অমন করে মুখের পানে তাকিয়ে আছেন যে?

আবার খিল্ খিল্ করে হাসি। হাসি থামিয়ে চঞ্চলী বললো—আপনি নেহাৎ বোকা। যান বাড়ী যান।

চঞ্চলী পাশ কাটালো। দেবকুমার নতুন ভাবনা নিয়ে এগিয়ে চললো।

দরজার পাশে বিন্দন বসেছিল। বললো—আজ এতো দেরী করলেন যে?

—পথে পানওয়ালী ধরেছিল।

—পানওয়ালী কে, ওই চঞ্চলী?

—হ্যাঁ।

—কি বললে?

—বললে লোকে নিন্দা করছে, তুমি ওই গৃহে আর থেকো না। আমার ঘরে চলো।

—ওর ঘরে অতিথি হবার আমন্ত্রণ করেছে? তা আপনি কি বললেন?

—আমি কিছুই বলিনি।

—না ওখানে আপনার যাওয়া হবে না। যে কদিন থাকবেন এখানেই থাকুন।

—লোকনিন্দার কথা উঠেছে।

—মনের অগোচরে পাপ নেই, লোক নিন্দার চেয়ে আত্মজিজ্ঞাসা বড় কথা। চিন্তা যদি নিষ্কলুষ থাকে লোকের কথায় আপনার ভয় কি। তবে মনে পাপ থাকলে অবশ্যই সাবধান হওয়া প্রয়োজন। যাক এখন আহার করবেন চলুন।

বিন্দন উঠে গেল। আহারের সময় তার প্রীতির কিছু বাহ্যিক যেন মনে হলো। দেবকুমার নীরবে আহার শেষ করলো।

বিন্দন বললো—চঞ্চলী আপনাকে বড় ভাবিত করে তুলেছে। ওর কাঁদে আপনি পা দেবেন না।

—কাঁদে?

—এখন থেকে নিয়ে গিয়ে আপনাকে ও নিজ গৃহে প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

—তাতে ওর লাভ?

—আপনি নেহাৎ বোকা, কিছুই তলিয়ে বুঝতে চান না।

বিন্দন একটু মিষ্টি হাসি ছুঁড়ে দেয়, তারপর বলে—আর যাই হোক, আমি থাকতে ওই পানওয়ালীর ঘরে অতিথি হওয়া চলবে না। যে কদিন থাকবার এখানেই

থাকুন, তারপর আমরা চলে যাবো স্থায়ীভাবে আর আপনিও যাবেন যোগিনীঘাটে। ওই পানওয়ালীর চেয়ে আপনার উপর আমার দাবী বেশী।

পাথরের পাটখানি নিয়ে দেবকুমার বসে, কি আঁকবে তাই ভাবতে থাকে, কিন্তু সহসা কিছু ভেবে পায় না, চূপ করে বসে কাঠকয়লার টুকরোটি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকে।

বিন্দন দরজার বাইরে এসে বসে, বলে—এবার কি খোঁদাই করবেন শিল্পী?

—কিছু স্থির করিনি।

—আপনি ভাবুন, আমি ততক্ষণ একখানি গান গাই?

—আবার গান? কেউ শুনলে কি বলবে?

—যে শুনবে শুধু, আমি শোনাতেই চাই। এসে দেখুক, দেখে জলে মরুক। আমি কারও কথাকে ভয় করি না।

কথাটা যে চঞ্চলীর উদ্দেশ্যেই বলা হলো, দেবকুমার তা বুঝলো।

বিন্দন স্বর ধরলো—

যমুনা চঞ্চল, জ্যোৎস্না মুরছায়

মুরলী মনভোলা রাধা রাধা সেধে যায়।

বঁধুয়া লাগিয়া

আকুলিত হিয়া

চলে শ্রীরাধিকা যমুনা কিনারে।

সলাজ বয়ান, চকিত অন্তর,

সরমে কুণ্ঠিত, চরণ মম্বর,

পীড়িত পিয়াসী

কাহ্ন অভিলষী

রাতের আধারে, আসে অভিসারে।

বসি বনমালী মাধবী কুণ্ঠতলে

মুরলী মুরছায়—রাধা রাধা বলে।

আজ যেন বিন্দনের আবেগ বেশি, স্বরের মুহূর্তে দেবকুমারের কেমন যেন আবেশ আসে। যমুনার তটে মাধবীকুণ্ঠে রাধিকার অভিসার-রাত্রি যেমন চোখের সামনে মূর্ত হয়ে ওঠে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিন্দন বার বার

গায়, শিল্পী হাতের পাথর রেখে ওর মুখের পানে তাকিয়ে থাকে।

গান থামলো, সুরের আবেশ কাটতে আরো কিছুক্ষণ যায়। তারপর দেবকুমার বললো—কি খোদাই করবো তা এবার ঠিক হয়ে গেল।

—কী ?

—রাধাকৃষ্ণ। যমুনা কিনারে শ্রীরাধার অভিসার।

—পাথরের বুকে এ ভাব কি আপনি ফোটাতে পারবেন ?

—দেখি চেষ্টা করে।

—চেষ্টা করে এ বস্তু আসে না শিল্পী, এ প্রেমভাব অন্তর দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে হয়। আপনি কোনদিন কাউকে ভালবেসেছেন ?

অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে দেবকুমার চকিত হয়ে উঠলো।

—ভালবাসা না পেলে এ ভাব তো আপনার আসবে না।

—চেষ্টা করে দেখি না ?

—দেখুন।

বিন্দন আবার সুর ধরে—

শ্রীরাধা আকুল, অন্তর মূরছায়,

আধারে বসিয়া

বিষাদিত হিয়া

কাহ্নয়া যায় চলি দ্বারকায়।

চরণে ধরি কত

মিনতি অবিরত

জাঁখি জলে তারে বোঝানো হল দায়।

কাহ্নয়া যায় চলি দ্বারকায় ॥

পাথরের পাটখানি একপাশে সরিয়ে রেখে দেবকুমার ঘুরে বসলো। বললো—আজ শুধু গানই শুনি, কাল যা হয় দেখা যাবে। অঙ্ককারেও বিন্দনের মুখখানি একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠলো বুঝি।

কোন এক সময় সহসা গৃহদ্বারে মাহুঘের ছায়া দেখা গেল, ভিতরে এসে ঢুকলো কল্যাণকুমার। সামনে দাঁড়ালো, হেসে বললো—বাঃ শিল্পী, তুমি শুধু পাথরই কাটো না, মনেও দাগ কাটো! অতিথি নারায়ণ, বিন্দন

বুঝি তাই নারায়ণের পুজোষ দেবদাসী হচ্ছে! তুমি নারায়ণ, আমি দেবদাসী, সুরে গাঁধি মালা, চরণ অভিলাষী—তোমায় ভালবাসি—

খলিত কণ্ঠে ব্যঙ্গের সুরে কথাগুলি বলতে বলতে কল্যাণ হুজুক পাল কাটিয়ে তিতরে চলে গেল। তার পা টলছে।

বিন্দন স্তব্ধ হয়ে গেল, দেবকুমার অস্বস্তি বোধ করলো।

দেবকুমার কয়েক মুহূর্ত বাহিরের অন্ধকারের পানে তাকালো। তারপর দৃষ্টি ফেরালো বিন্দনের মুখের পানে। কি যেন দেখে নিতে চাইল তার মুখের পানে, চোখ দুটি পিদিমের আলোয় যেন চিক্ চিক্ করছে।

দেবকুমার উঠে পড়লো। যন্ত্রগুলি গুছিয়ে নিল ঝুলির মধ্যে তারপর মাথায় পাগড়ি বেঁধে ঝুলিটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে বললো—ভদ্রে, আমি যাই।

বিন্দন একবার মুখ তুলে তাকালো। বললো—এই রাত্রেই ?

—হ্যাঁ।

—কোথায় যাবেন ?

—জানি না।

বিন্দনকে আর কিছু বলার অবকাশ না দিয়ে দেবকুমার সেই গৃহ থেকে নিঃসৃত হলো।

কোথায় যাবে কোন ঠিকানা নেই। মছর পদে নিনোরা হৃদের তীরে এসে সেই পাথরখানির উপর বসলো। কৃষ্ণপঙ্কজের অন্ধকার রাত্রির আকাশ ও হৃদের জল একাকার হয়ে গেছে। ওপারের মন্দিরের শীর্ষে আকাশ প্রদীপগুলি দেবতার চোখের মত জ্বল জ্বল করছে। মাথার উপর তারাগুলি অমন জোড়াল না। মহাশূন্যে অমনভাবে তারাগুলিকে কে সাজিয়ে রাখে সারারাত। ওগুলো এভাবে সাজিয়ে রাখার কি প্রয়োজন ? এই পৃথিবীর এতো গাছপালা পশুপাখীরই বা কি প্রয়োজন ? এত মাহুঘ যেন এমনভাবে লগতের বুকে জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি বিচরণ করে এ কি সত্যি বিধাতার খেলা ? এই বিপুল বিশ্বকে নিয়ে তিনি খেলা করছেন ? কে সেই

স্মৃতি-আলেখ্য

(পূর্বস্মৃতি)

শ্রীশুশীলপ্রসাদ সর্বাধিকারী বার্-এ্যাট-ল

ছুটে ছুটে এসে পড়েছি দূরে। ফিরে যাব
স্কুলের ক্লাসে আর খেলার মাঠে। ফিফথ ক্লাসের
বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করি। শরৎ
তখন উঠল বার্ড ক্লাসে। সপ্তমাশ্রয় বুড়ি ছোয়ার-
মত স্কুল ছুঁয়ে চলে গেল।

বড় মাঠটায় বল নিয়ে পড়লুম আমরা। কলেজের
ছেলেরা বৈকে ব'লল। ব'ললে মাঠ ওদের, স্কুলের নয়।
রাজেন সিংহ হতবাক—খাম রাখে না কুল রাখে।

আই-এফ-এ শীল্ড, জুলিয়ট শীল্ড প্রভৃতি তখন চালু
হয়েছে। ইলিয়ট শীল্ডে প্রতিযোগী স্বরূপ নামল হেয়ার
স্কুল শরতের উদ্যোগে। টাই পড়ল হেয়ার স্কুল বনাম
প্রেসিডেন্সী কলেজ। কলেজ চিন্তাশ্রিত। খেলার মত
খেলার অভ্যাস কিছুই হয়নি, হেয়ার স্কুলের। টাই খেলার
পূর্বে হেয়ার স্কুল মাতামাতি শুরু করল বড় মাঠে।
পূর্বের মত বাধা দিল না, কলেজ স্কুলের ছেলেদের সে
মাঠে খেলতে। কারণ ওই ইলিয়ট শীল্ডের টাই।
যদি মেয়ের দেয় স্কুল কলেজকে, ওই খেলায়? কাজ নেই
ওদের ঘাঁটিয়ে এখন।

টাই খেলায় কলেজ কিন্তু জিতল, স্কুল বেদম হ'য়ে
পড়ায়। বড় মাঠে খেলার অভ্যাসের অভাবে।
তারপরে কলেজকেও জুলিয়ট শীল্ডে এগুতে আর হ'ল না
খেলার মত খেলা খেলতে না পারাতে। তাই হেরেও
স্কুল জুড়ে বসল ওদের মাঠে, কলেজের সঙ্গে বদমাতি

দেবতা। অমন বিরাট দেবতা ওই সব মন্দিরের ছোট
ছোট বিগ্রহের মধ্যে অবিষ্ঠান হন কেমন করে? কি
দরকার এতো মন্দিরের, কি প্রয়োজন এতো পাথরের
মূর্তি দিয়ে মন্দির সাজাবার? তারই বা এই খেলায়
কাটার খেলায় কেন? কদিনের তরে এই খেলায়?
ছোটো নতুন মূর্তি খোদাই হোক আর নাই হোক তাতে
কি আসে যায়? মন্দিরের গায়ে যদি কোন মূর্তি না

ক'রতে। নগেন্দ্রপ্রসাদ কলেজ থেকে ইতিমধ্যে পাশ
ক'রে বেরিয়ে গেছে। চ'বে বেড়াচ্ছে গড়ের মাঠ।
শোভাবাজার খেললে শীল্ড। বড় আশা করে বাঙালী
দর্শক ভিড়ে ভিড় ক'রল খেলার মাঠের চারদিক।
ভীড় করাই সার হ'ল। শোভাবাজার হেরে গেল।
স্কুলে যখন চার মিত্র (পরে নামজাদা সাহিত্যিক)
গণেশ চক্রবর্তী প্রভৃতি শ্রীশুশীলপ্রসাদকে নেতা ক'রে
গ'ড়স। ডেভিড হেয়ার এথলেটিক ক্লাব। হেয়ার
স্পোর্টিং হয়েও না হওয়ার মধ্যে। গণেশদের ছিল তাঁবুর
কাজ। কাঁচা পয়সা। স্কুলের খেলায় পয়সার যোগান
বা যোগাবার যুগিয়ে ছেলেদের বেশ হাত করেছে। চুপি
চুপি সে 'ডেভিড হেয়ার এথলেটিক' নাম পাঠিয়ে দিল
আই-এফ-এ শীল্ড প্রতিযোগিতায়। সে যে সে কাজ
करेছে, ঘুণাকরেও জানতে দেয়নি কাকেও। জানলে
সবাই, কাগজে যেদিন শীল্ডের টাই বেরল।

হলুহলু পড়ে গেল শুধু হেয়ার স্কুলেই নয়, হিন্দু স্কুল
ও অন্তান্ত স্কুলেও। গণেশ তাতে দমবার ছেলে নয়।
খেলার 'খ'ও জানে না সে। মন দিয়ে সে কিন্তু খেলার
নিয়ম কান্নন সব রপ্ত ক'রতে লাগল। আর শীল্ডে
ডেভিড হেয়ারের যোগদানেরও যুক্তি দেখাতে কান্নন
ক'রল না। বাচ্চা নিয়ে যা ক'রবার কান্ননা নগেন্দ্র-
প্রসাদও কখন করেনি, নিজেকে 'তালেবর' ঠাউরে
গণেশ তাই ক'রল।

থাকে, যদি মন্দিরই না থাকে তাতে কি আসে যায়? সবই
অর্থহীন শুধু মায়া। মায়ার বাঁধন দিয়ে জগৎ চলছে।
নিরালার মায়া বিন্দনের মায়া। সব মিথ্যা। নিরালার
পাকে পাকে জড়াচ্ছিল, সেখান থেকে মুক্তি মিলেছে,
বিন্দনও বোধহয় জড়িয়ে পড়ছিল, সেখান থেকেও আজ
মুক্তি হলো। এখন শুধু এগিয়ে চলা। কিন্তু এই চলা
কেন? এই পথ-চলা তাকে কোথায় পৌঁছে দেবে?

(ক্রমশঃ)

হেমার স্কুলের ছেলেদের ফুটবল খেলার ধার দিয়েও সে সময়ে নগেন্দ্রপ্রসাদ বা অন্য কোনও প্রসাদ যাননি। অবশু মরে বাঁচা সুনীলপ্রসাদ লেগেছিল আড়ো-হাতে। তার লাগার মুখ্য কারণ, ওইটুকু করেই, তার স্বাস্থ্যায়ত্তি হচ্ছিল ক্ষতবেগে। সেই কারণে তার পিতৃদেব খেলাধুলা সাবধানতা সহ ক'রতে খুবই উৎসাহিত করেন তাকে।

শরৎচন্দ্র যখন হেমার স্পোর্টিং-এর ধূম্য তোলে সুনীলপ্রসাদ তাতে গা মাখে নাই। ইলিসট শীল্ডের খেলাতেও সুনীলপ্রসাদ যোগদান করে নি। ডেভিড হেমার ক'রে শীল্ডে নাম পাড়িয়ে গণেশ যখন কোণঠেসা, তার কাতরতায় ডেভিড হেমারের কর্ণধার করতে সক্ষম সে হয়। তা হ'য়ে শৈলেন বসু এবং অন্ত্যস্তের সহযোগিতা সে লাভ করল। শীল্ড প্রতিযোগিতায় ডেভিড হেমারের নাম পাঠানর সমর্থন করিনি আমরা কেউই। তথাপি নাম ধাম যখন পাঠান হয়েছে এর শুভাশুভ যাই হউক তজ্জন্ত গণেশকে কেউ পুঁছবে না, আঙুল দেখাবে ডেভিড হেমারকে, যার নামে ক্লাব। বললাম আমি—পারি হারি, আমাদের সাধ্যমত করতে পেছপাও হ'ব না।

সোৎসাহে খেলার দল গঠিত হয় আমাকে নেতা করে, দলের কেউই চৌদ্দ বৎসরের বেশী নহে। আই-এফ-এ শীল্ডের অভিনব এ অদ্ভুত শীল্ড প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় বৎসরে ইহা ঘটল।

শীল্ড খেলা হয় ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের বিদ্যুত ও মনোরম ময়দানে। ক'লকাতার স্কুল কলেজ ভেঙ্গে পড়ে মাঠের চারদিকে। শোভাবাজার সোল্লাসে এই খেলা উপভোগ করতে অগ্রসর হয়। ক্যালকাটা ক্লাবের সভ্যবৃন্দের বেঠনীতে জজ্ ব্যারিষ্টারে ভরে যায়। অগণিত মহিলা বেঠনীর শোভা বর্ধন করে।

ক্যালকাটা ক্লাব একাদশ প্রথমে খেলতে নামে যথারীতি অভ্যর্থনার মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় হাসিমুখে মাথা উঁচু করে বীর বালক একাদশকে। তাদের দেখে সারা মাঠে উত্তেজনাশ্রুতক অভ্যর্থনার বান ডেকে যায়। বান ধামতে সময় লাগে বেশ। ক্যালকাটা

ক্লাব বেঠনীর মহিলাবৃন্দ একযোগে উঠে দাঁড়ায় বীর বালকদের সোল্লাসে অভ্যর্থনা জানাতে। সমগ্র জনতার হাসিমুখ। এ ঘটনার মূল যে আমি—আমার বুক তখন ক'হাত হয়েছিল কে বলে দেবে তা। বুক ফুলিয়ে মূল তখন ক্যালকাটা ক্লাবের বেঠনীতেই শিকড় গাড়ে। আর আই-এফ-এর ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠাতা নগেন্দ্রপ্রসাদের বুক যে আনন্দে ভরপুর হয়েছিল—না বললেও চলে। আশ্চর্য্য আই-এফ-এর লেখা জোখায় এ অপূর্ব ঘটনার উল্লেখ নেই কোথাও। জুবিলি করল তারা, গৌরবোজ্জ্বল ঘটনার কথা বাদ দিয়ে। চমৎকার!

জুবিলিতে March past-এ অংশ গ্রহণ করতে ডাক পড়েছিল আমার। বিশেষ কারণে সে ডাকে কাণ দিই নি। কারণ এখনও বলব না—Sportsman বলে। খেলা জরু হল। বালকেরা চরকির মত ঘুরতে লাগল। প্রতিপক্ষ তাদের নাগাল পায় না। অস্তিত্ব সীমা নেই। তাদের সে চূর্দশায় ক্যালকাটা ক্লাব বেঠনী হেসে খুন। কিন্তু ওই প্রকাণ্ড মাঠে কতক্ষণ ঘুরবে বালকরা। বেদম হতে লাগল তারা। বেদম অবস্থায় উপযুপরি তিনটি গোল চাপাল তাদের উপর। ক্যালকাটা প্রথমার্দ্ধের খেলা শেষ হল।

দ্বিতীয়ার্দ্ধের খেলা ক্যালকাটার পক্ষে অপেক্ষাকৃত প্রাণহীন। অস্তিমত প্রকাশ করল চতুর্দশের দর্শকরা। বালকরা প্রতিপক্ষের পায়ের কাছে আঠার মত যেন জুড়ে রইল। ফাঁকা মাঠে কেরামতি করার সুবিধা হল না জয়ীর আদৌ। তাতে বালকদের বেদম করাবারও যন্ত্রণা হল না।

অকস্মাৎ একটা উঁচু বল ক্যালকাটার যুগল International ফুল ব্যাক জ্যাক্সন ও হান্টারের মাথা টপকে তাদের পিছনে পড়ল। গোল কিপার হেবল্ তাহার স্থানে দূরে দাঁড়িয়ে এই আশায়, যে ব্যাকদের মধ্যে যে কেহ সে বল সহজে clear করে দিবেই। আমি পুরাদমে ছুটে গিয়ে প্রায় ৬০ ফুটের অধিক উচ্চ জ্যাক্সনের দুই পায়ের মধ্য দিয়ে গলে বলটা সজোরে শুট করলাম, যা গোলকিপারের হাতে লেগে

পড়ে গেল। রেফারী বাঁশী বাজাল। ছুটে গিয়ে হেকলকে জিজ্ঞাসা করল—বল লাইন পার করিয়েছিল কিনা। হেকল আমতা-আমতা করতে লাগল। রেফারী জিজ্ঞাসা করল আমাকেও। বললাম—দূরে ছিলাম আমি, হ্যাঁ না কিছুই বলতে পারব না। হুইসিল দিয়া রেফারী বাঁশী বাজিয়ে জানালে ‘গোল’। চারদিকে যেন দুমুন্ডি বেজে উঠল। মহিলা দর্শকেরা আনন্দোচ্ছ্বাসে সত্যি নাচতে লাগলেন। কিছু পরেই খেলার সমাপ্তি ঘোষণা হল।

এক নাগাড়ে প্রায় ২৬ বৎসর ফুটবল খেলেছি কিন্তু হেরে যে সমাদর লাভ করি, বাবা তালুককে হারিয়েও ভাদ্রশ সমাদর জীবনে আর কখনও পাই নাই।

ইহার পরে আমাদের স্কুল বা কলেজের খেলোয়াড়দের মধ্যে মনোমালিখ একেবারে দূর হয় এবং অনেক চিন্তার পর হেয়ার স্পোর্টিং নাম দিখে ক্লাব চালু হয় বড় মাঠে। তখন প্রেসিডেন্সির গিরিশ শর্মা, সত্যকিন্দর মিত্র, সরেস মিত্র উভয়েই পরে নামজাদা উকিল প্রভৃতি। হেয়ার স্পোর্টিং-এ যোগদান করে। হিন্দু স্কুলের অনেক ছেলে এসে জুটে, টাউন ক্লাবে বেশ কয়েকজন স্কুলের মাঠেই আকর্ষিত হয়। ‘বহুবাজারের শামলাল চক্রবর্তীর পরে ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল অনিল নন্দী, পরে ক্যালকাটা কর্পোরেশনের অফিসার উপেন দে এবং আরও অনেকে হেয়ার স্পোর্টিং-এর সভ্য হয়। সকলেই এরা কলকাতার বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র। শ্রীনিবাস সেন (বাড়ী আপুলি লেনে) গায়ে পড়ে খেলতে আরম্ভ করে গোলে। শ্রীনিবাসের আনাগোনা পরে জানতে পারি, আসা যাওয়া তার প্রিন্সেস প্রাসাদের সময় হতে দেখতে পাই খেলায় সে চৌকষ, জিম্নাস্টিকে পোস্ত। মাঠের বড় বড় খেলার খবর তার নখদর্পণে মারার কায়দায় সিদ্ধ, আলাপ জমাতে পারে ছ’মিনিটে।

নানান দেশের নানান লোক এসে খেলার মাঠ জুড়ে-বসা কলেজের ধুরন্ধরেরা স্রষ্টা দেখল না। ভিড়ে যেন তারা হারিয়ে যায় যায়। ইহা সহ

করিতে না পেরে এর বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত হল প্রিন্সিপ্যালের খাস কামরাধ। যথাসময়ে প্রিন্সিপ্যাল আসলেন স্কুলে। হেডমাষ্টার ভোলানাথ পালের সাহায্যে স্কুলের খেলার মোডলদের তলব করালেন। আসামীরূপে উপস্থিত হ’তে হ’ল আর কজনের সঙ্গে আমারও।

প্রিন্সিপ্যাল বললেন, মাঠে তোমাদের সঙ্গে বাইরের ছেলেরা খেলে? উত্তর পেলেন, ‘হ্যাঁ স্যার!’ ‘কেন?’ উত্তর—‘তারা খেলবে কোথায়? তাদের স্কুলেতো মাঠ নেই।’ প্রশ্ন—তারা খেললে আর কলেজের ছেলেরা খেলবে না? তাল কথা senior pass কে? সকলে চুপচাপ, ফস করে বললাম আমি—senior pass নয় স্যার, শ্রীনিবাস। সে আমাদের coach, coach! নিশ্চয়ই সে খেলবে। কিন্তু আর সব? উত্তরে কি বলি ভাবছি। চট্ট ক’রে একটা কথা মনে হ’ল, বললাম—Sir, স্কুল কলেজে খেলা হ’ক, যে ক্ষিতবে খেলবে সেই। টেবিল চাপড়ে প্রিন্সিপ্যাল টনি সহর্ষে ব’ললেন, Excellent, এ বন্দোবস্ত কলেজে গিয়েই করছি। ভোলানাথকে ব’ললেন, you should be proud of your boys. ব’লে চলে গেলেন টনি ছেলেদের পিঠ চাপড়ে। হেডমাষ্টার হাসি চেপে ব’ললেন, ‘ডে’পো সব। যা ক্লামে’।

যেমন কথা তেমন কাজ। প্রিন্সিপ্যাল কলেজে গিয়েই জানালেন, কাল ম্যাচ হবে বৈকাল ৪টা টায়। তাতে স্কুলে সাড়া পড়ে গেল খুব। ম্যাচ খেলা দেখতে হেয়ার হিন্দু স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রেরা, প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রেরা, এলবার্ট কলেজের প্রিন্সিপাল ডি. বি. সেট্ট, সিটি কলেজের অধ্যক্ষ হেরষ মৈত্র, রিপন কলেজের অধ্যাপকের কজন, সেণ্ট জেভিয়ার্সের ফাদার পাওয়ার উপস্থিত হলেন। নগেন্দ্র প্রসাদ, হরিদাস শীল প্রভৃতি এলেন। উৎসাহের সীমা নেই সকলেরই মুখে। প্রেসিডেন্সির খেলুড়েরা কিন্তু অল্পবিশ্বর চিন্তাশ্রিত।

খেলা শুরু হ’ল। কলেজ খেলতে লাগল প্রাণ-পণ শক্তিতে। স্কুলের খেলুড়দের কায়দা কারণে, সে শক্তির

বিষ্ণুপুরে কয়েকদিন

শ্রীবিভা দেবী

বহুরথানেক আগের কথা।

জীবনের সফ্যা ঘনিষে এসেছে। তার উপর এক-নাগাড় রোগ-ভোগ। একটু পরিবর্তন প্রয়োজন। কথা হল বিষ্ণুপুরে আমার ছোট ছেলের ওখানে দিন-কয়েক থেকে আসা। ইতস্ততঃ ভাব সবারই। বাধা অনেক। বড় কারণ এই দুর্বল শরীরে যাওয়া উচিত কিনা।

আমার দয়াল ঠাকুরই সিদ্ধান্ত করে দিলেন আমার একটি ছেলের মাধ্যমে। ছেলেটি হচ্ছে 'প্রবর্তক' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীমান রাধারমণ। বছকালের স্নেহভাজন। প্রথম পরিচয়েই মাতৃ-অধিকার দান করেছে। আমিও পুত্রজ্ঞানে এই পরম সাধু সন্তানটিকে ভালবেসেছি।

তরসা দিল রাধারমণ—যান, ক'দিন বেড়িয়ে আসুন। কিছু হবে না। ভাল হবে উঠবেন।

সাধু সন্তানের তরসায় বল পেলাম মনে।

রওনা হলাম।

বিষ্ণুপুরে আমার ছোট ছেলের কর্মস্থল। সে লাল-বাঁধের সন্নিগটে বিখ্যাত সঙ্গীতাচার্য সত্যবিক্রম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ী ডাড়া নিয়ে আছে। স্থানটি বড়ই মনোরম। গুপ্ত বৃন্দাবন নামে কথিত।

হাস অজ্ঞবিস্তর হ'তে লাগল। ফাঁক পেলেই বাজি মাত ক'রবার কিকিরে রইল তারা সদা সচেতন। ফাঁক মিলল ছ'বার প্রথমার্ধে। ছ'বারই বল ঢোকালে তারা প্রেসিডেন্সির গোলে। দ্বিতীয়ার্ধে জুল ক'রলে আর একটি গোল। প্রিন্সিপাল টনির মুখ হাস্যমুখর। খেলা শেষে বললেন তিনি—How boys! তাঁর কাছেই দাঁড়িয়েছিলাম আমি। ব'ললাম—আমরা জিতেছি, তবু মিলে-মিশে মাঠে খেলতে আমরা রাজী। শুনেই টনি ব'ললেন, I am really proud of you youngsters. My college friends, do associate

শ্রীশ্রীভগবান রামকৃষ্ণদেব এই লাল বাঁধে স্নান করে ঘাটের বৃহৎ গাছতলায় বিশ্রাম করেছিলেন, লাল-বাঁধের জল গঙ্গার মত পবিত্র বলে সকলে মাথায় দেয়।

লাল বাঁধের সম্মুখেই সর্কমঙ্গলার মন্দির, দুই পার্শ্বে শিবমন্দির, দু'এক পা এগিয়ে গেলেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্দির ও ছাত্রাবাস। তাহার অপর পার্শ্বে রামানন্দ কলেজ। মন্দিরে গিয়ে ঠাকুরকে দর্শন করে পরম তৃপ্তি পাই। শ্রীশ্রীমার মূর্তিটি যেন সজীব হয়ে ফুটে উঠেছে, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের মূর্তি দু'টি দেখে মনে হল মহা-যোগী ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে আছেন, আমার মনোমন্দিরে আজ যেন ভাল করে মাড়া পেলাম, তাঁর আশীর্বাদ হস্তখানি আমার মাথায় এসে পড়ল, নিমেষে মনের সকল গ্লানি কেটে গেল। একটা অপূর্ণ শান্তি অহুভব করলাম।

আমার একমাত্র মেয়ে অনিলার মৃত্যুবার্ষিকী। কয়জন স্বামীজী এসে উপাসনা করলেন, আমার ছোট ছেলে অনিলার জীবনীটা পড়ে সাধুদের শোনাল, আমিও করজোড়ে প্রার্থনায় বসলাম। চোখের সামনে ভেসে উঠল যেন বিগত আত্মার স্মরণার্থ অনিলার অরুণদা, রাধারমণদা, ইন্দুদা প্রভৃতি আমার পার্শ্বে উপবিষ্ট। অনিলা মারা বাবার পর হতে বরাবর মৃত্যুদিনে

with them and invite their sporting spirit, to make your college worthy of its name and fame.

খুবই জটিল সমস্যা অতি সহজেই সমাধান হ'য়ে গেল। এর পর থেকেই হেয়ার স্পোর্টিং-এরও the name and fame উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল। কুরুক্ষেত্র হয়ে উঠল ছোট মাঠ। তফাতের মধ্যে দুর্ঘোষনী বা শকুনি-তরঙ্গ প্রবাহিত ওখানে হবার কোনও চিহ্নই দেখা গেল না। ওই মাঠে স্মাশনাল, কুমারটুলি, হাওড়া স্পোর্টিং, সেন্ট জেভিয়ার্স অন্ত না হয়ে ফিরতে পারনি।

এই প্রবর্তকের সাধু-সন্তানেরাই তার আশ্রয় মঙ্গল কামনা করে থাকেন।

একটু স্বস্তি হবার পর একদিন দলমাদল কামান দেখতে গেলাম। দেখলাম কামানের ওপর পূজা করা ফুল ও সিন্দুর মাখান রয়েছে। কামানের চতুর্দিক নিরীক্ষণ করছি এমন সময়ে চোখে পড়ল এক ব্যক্তি উচ্চ পাড়ের ওপর বসে এ স্থানের শোভা দেখছেন। আমি শক্তিহীনা বলে সে আনন্দটুকু উপলব্ধি করতে পারলাম না। ধীরে ধীরে দলমাদলের সম্মানসূচক কুটীরে প্রবেশ করলাম। সম্মানসূচক ধ্যানমগ্ন, কিছুক্ষণ তাঁর মাটির দাওয়াটাতে বসে থাকার পর তিনি চক্ষু উন্মীলিত করলেন। তিনি তাড়াতাড়ি উঠে আমায় একখানি আসন প্রদান করলেন। তাঁর কুটীরের মধ্যে বহু দেব-দেবীর মূর্তি। শ্রীশ্রীমা ও ঠাকুরও বাদ যান নি। রাধাকৃষ্ণের মূর্তি থেকে শুরু করে বহু সাধুর ছবি, মহাদেব ও কালীমূর্তি সবই রয়েছে। সম্মানসূচক নগ্নাঙ্গ একবার ভিক্ষার অন্ন বিষ্ণুপুরে (সহরে) পদব্রজে যান, সেই স্থান হ'তে প্রতি গৃহে ফিরে যা পান তাই দিয়ে তিনি নিজ হস্তে রন্ধন করে ঠাকুরকে নিবেদন করেন। আশেপাশের দ্রবিরাজ ব্যক্তি সেই প্রসাদ পাবার আশায় তাঁর কাজকর্ম করে দেয়। সম্মুখেই একটি ছোট কুমা আছে, তার দুই পার্শ্বে ফুলের বাগান। এরূপ শান্তিপূর্ণ স্থানটি ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না।

চমৎকার দরদী এই সম্মানসূচক। আমি যতদিন বিষ্ণুপুরে ছিলাম নগ্নাঙ্গ একবার করে তিনি আমাদের কাছে আসতেন।

এরপরে দেখলাম পুরাতন বহু কারুকার্যখচিত রাসমঞ্চ, মদনমোহন এই স্থানে গোপিনীদের নিয়ে শ্রীরাধারাগী সহ রাসলীলা করতেন। বৎসরে এখনও এই স্থানে মেলা বসে, বহু লোক এই মেলা দেখতে আসেন স্তন্যলম।

আর একদিন মুনসী মাঝে দর্শন করতে গেলাম। মন্দিরের চতুর্দিক ঘুরে দেখলাম। মন্দিরগায়ে বহু কারুকার্যখচিত দেবদেবীর মূর্তি আঁকা। একদিন এইখানে জগৎসিংহ (বঙ্কিমচন্দ্র বর্ণিত দুর্গেশনন্দিনী)

বীরেন্দ্রসিংহের ছায়া তিলোত্তমাকে এই গড়মন্দিরগায়ে মন্দির মধ্যে দর্শন করে তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়েছিলেন, এক মুহূর্তের দর্শনে তাঁর হৃদয় দান করে ফেলেছিলেন। এখনও অতিথিশালাটি কোনও রকমে খাড়া করে রাখা হয়েছে। পূজার সময় খুব ধুমধামের সঙ্গে এই মুনসী মায়ের পূজা হয়। বহু দরিদ্রনারায়ণ প্রসাদ পায়। বিষ্ণুপুরের অধিবাসীদের এই মুনসী মায়ের দর্শনেই তারা দুর্গাপূজায় আনন্দ পায়। রন্ধনশালাটি ভগ্ন হলে গেলেও কোন রকমে রন্ধনের উপযুক্ত করে রাখা হয়েছে।

তারপর আমরা গেলাম আসল বিষ্ণুপুরের পুরাতন রাজবাড়ীতে। সেখানে গিয়ে দেখলাম একটি বৃদ্ধা রমণীকে। তিনি হচ্ছেন আসল রাজবংশীয়া ক্ষত্রিয় নারী। অশীতি বৎসর বয়সেও তাঁর রূপের জ্যোতিঃ যেন ছিটকে পড়ছে। এখনও কর্মঠ আছেন। তাঁর আন্তরিক আতিথেয়তা ও সমাদরে মুগ্ধ হ'লাম। পুরাতন রাজবাড়ীর সংবাদ তাঁর কাছে স্তন্যলম। তাঁর দু'টি পুত্র সিংহাসনের অধিকারী। কিন্তু তিনি পুত্রকে রাজ্য হতে দেননি। বললেন যে, আমাদের পূর্বপুরুষরা এই সিংহাসনে বসে কেহই রাজত্ব চালাতে পারেন নি, তাঁদের বংশ লোপ হয়ে যায়। এইজন্য আমি দুটি ছেলে নিয়ে এইখানে আছি। ওপরে উঠতে পারেন যদি দেখে আসতে পারেন আমাদের কি রকম বাসস্থান ছিল, কি বিরাট ব্যবস্থা। এক একটি মহলের অধিকারিণী আমরা ছিলাম, একদিন বহু দাসদাসী পরিবেষ্টিত হয়েছিলাম, এখন এই তিনখানি ভাঙ্গা ঘরে বাস করতে হচ্ছে, ছোট ছোটের কাছে আছি, সে লেখাপড়া শিখেছে, যা উপার্জন করে তাতেই উপস্থিত চলছে, তার বিবাহ হয়েছে রাজ্যের মেয়ের সঙ্গে, ছোট বউমা যা মাসহারা পান তাতেও আমাদের সাহায্য হয়। বহু অহরোধ সন্তোষ আর বৃদ্ধাকে কষ্ট দিয়ে চা পান করলাম না। পুরাতন রাজবাড়ীটা দেখতে দেখতে গৃহ প্রত্যাগমন করলাম।

আর একদিন গেলাম মদনমোহন দর্শনার্থে। দেখলাম মন্দিরগায়ে বহু দেবদেবীর ছবি আঁকা। মন্দিরটি প্রদক্ষিণ করলাম। মদনমোহনের পরিবর্তে তাঁর চিত্রপট রক্ষিত। এইস্থানে একদিন আসল মদনমোহন ছিলেন,

বিষ্ণুপুরের রাজা অভাবগ্রস্ত হবে তিন লক্ষ টাকায় মদন-মোহনকে বাঁধা রাখেন বাগবাজারের দস্তাবাদের কাছে। বাগবাজারে তাঁর আসল মূর্তিখানি আজও প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। টাকা দিয়েও মদনমোহনকে ফেরৎ না পাওয়ায় শোকে রাজা দেহত্যাগ করেন। সেই থেকে মদন-মোহনের বদলে তাঁর চিত্রপটে পূজাপাট চলে আসছে। দর্শনার্থীদের জ্ঞাত নূতন অতিথিশালা নির্মিত হয়েছে। পার্শ্বে ভোগের ঘর সেই পুরাতন রন্ধনশালায় এখনও রন্ধন হয়। কুয়া আছে, নানাবিধ ফুলে সুশোভিত হয়ে রয়েছে সমুখ পথটায়, পুরাতন পাছশালা ভগ্ন অবস্থায় পড়ে আছে।

পরে সত্যকিঙ্কর বাবুর জী (আমার কন্ডাসম) তাঁর সঙ্গে আমি তাঁর কাঁকা বিখ্যাত গায়ক বৃদ্ধ গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে দেখে এলাম। আমরা দেখে আসার কিছুদিন বাদে তিনি মারা যান। তিনি তখন অসুস্থ অবস্থায় শয্যায় শুয়েছিলেন। গিয়ে দেখলাম তাঁর জীর সঙ্গে তখনও গানের তালিম দিচ্ছেন, জীও বাজনার সঙ্গে গান গাইছেন, ঘরটি রোগীর ঘর বলে মনে হল না। চতুর্দিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, দেখে মনে হল মহিলাটি স্বামীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যর দিকেও তাঁর জীবনটুকু ধরে রাখবার জন্য আশ্রয় চেষ্টা করছেন। স্বামী অপেক্ষা বহু ছোট হলেও তিনি এখনকার দিনের আধুনিক নারী নন, সস্ত্রী সাবিলীর সহিত তাঁর তুলনা দেওয়া যায়।

বিষ্ণুপুরে এসে সত্যকিঙ্করের জীকে কন্ডারূপে পেলাম। সেই গৌরীমার সাহায্যে আমি চলৎ শক্তি রহিতা হয়েও এই সব দর্শন করতে পেরেছি। এটা ভগবানের অশেষ করুণা। তারপর গেলাম সত্যকিঙ্করের পৈতৃক ভিটা দেখতে। পৈত্রিক খড়ের ঘরের ভিটার পাশেই তাঁর নবনির্মিত বাড়ী। তাঁদের কুলদেবতাকে দর্শন ও প্রণাম করলাম। পথিমধ্যে বহু দেবদেবী দর্শন করে গৃহে ফিরলাম।

সেদিন ছিল এলা বৈশাখ। রামকৃষ্ণ আশ্রমে নিমন্ত্রণ। এই আমার প্রথম আশ্রমে প্রসাদ পাওয়া। আশ্রমের ব্রহ্মচারী গিরিজা মহারাজ বহু সমাদরে আমাদের খাওয়ালেন। আশ্রমের চতুর্দিক দেখে-শুনে

বড়ই ভাল লাগল। মনে হলো এই স্থানেই থেকে যাই (ঠাকুর আমার অন্তরের ব্যাকুলতা বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলেন। পাঁচ মাস বাদে ব্রহ্মচারী গিরিজা মহারাজের সাদর আহ্বানে আশ্রমে গিয়ে তিন মাস অপূর্ণ শান্তিতে কাটাবার সুযোগ আমার হয়)। আমার কাছে মহারাজ এখন আশ্রমাধ্যক্ষ নন, এখন তিনি সম্ভান, আমি মহারাজের মা।

আশ্রমেরই একটি ছাত্র ছুলাল। সে মহারাজের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ। আমার ছেলে তাকে পড়ায়। সে পরে ছুলাল মহারাজ হবে এই আশা সকলেই করে। চমৎকার অমায়িক সরল ছেলেটি।

শুনলাম, বৎসরে একবার তুরকীতে (সাধুর আশ্রম) মেলা বসে। এই মেলা এখানে খুব বিখ্যাত। বহু লোকসমাগম হয়। মেলায় অনেক সাধুসন্তও আসেন। বহু দোকানপাট বসে, ক্রয়বিক্রয়ও খুবই হয়। প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ নেই, আছে তাঁর স্থলাভিষিক্ত যে মহারাজ তিনি উপস্থিত এই তুর্কী মঠ চালাচ্ছেন।

এখানে 'যোগাশ্রম' আর একটি দ্রষ্টব্য স্থান। এই আশ্রম মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ভক্তবৃন্দ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। ইহা লালবাঁধের (একাংশ জলাশয়) পাড়ের ওপর তৈরী। এখানে প্রতি বৎসর দরিদ্রনারায়ণদিগকে তাঁর জন্মদিনে ষাঁচুড়ী ভোগ খাওয়ান হয়। আমি যখন এখানে ছিলাম তখন এই উৎসব হয়। আমি বাড়ীর ছাদের ওপর থেকে দেখতাম, সে এক অপূর্ণ দৃশ্য, শত শত লোক শালপাতায় প্রসাদ নিয়ে খেতে বসেছে, কাতারে কাতারে লোক আসছে আর যাচ্ছে, আবার লালবাঁধে গিষে খাওয়ার পর আঁচাচ্ছে, নাইছে। এখানে আশ্রম বলতে 'যোগাশ্রম' আর 'রামকৃষ্ণ আশ্রম'। ষ্টেশনে নেমে আশ্রমে চল বললে যোগাশ্রমে নিয়ে যায়— বলতে হবে রামকৃষ্ণ আশ্রম।

এই বিষ্ণুপুরের কাছেই জয়রামবাটী ও কামারপুকুর (২৮ মাইল আন্দাজ। বাস যাতায়াত করে। ২২।০ ঘণ্টার রাস্তা)। ষাঁরা বিষ্ণুপুর যান সকলেই এই দুটি স্থান দর্শন করে আনেন—আমি বহু দেশ দেখার পর জীবনের শেষ প্রান্তে এসে এই স্থানটি দেখে বড়ই শান্তি অনুভব

স্বামী বিবেকানন্দের বীরবাণী

অধ্যাপক শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য্য

১৯১৯ সালে যুনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটের একটি বিশিষ্ট সভায় স্বামিজীর বিষয়ে প্রথম প্রকাশ্যে আলোচনা কবি, সে আঙ্গ ৪৫ বছরের কথা। তারপর তাঁর বিশ্বতোমুখী প্রতিভার বিভিন্ন দিকে অবদান বিবৃত করতে চেষ্টা করেছি—যথা লোকশিক্ষা, বিশ্বশান্তি, অখণ্ড জগৎ (one world), মানবের ভবিষ্যৎ, ভারতের সম্রাসধারা, বর্তমান মূল্যায়ণ, যুগসমস্যায় তাঁর বাণী ইত্যাদি। ভারতবর্ষ ভূমার দেশ—তিনি ছিলেন ভারত-প্রাণ—এ দেশের আত্মার পূর্ণ প্রতিচ্ছবি। প্রতি অঙ্গ হতে প্রতি অঙ্গ জন্মেছে—হৃদয় হতে তাঁর উদ্ভব—এই মানস সন্তানে আমাদের বিরাট সংস্কৃতির অখণ্ড মুদ্রা অঙ্কিত রয়েছে। তাই সকল আলোচনার পর অতৃপ্তি থেকে যায়—মনে হয় বলবার কথা এখনও প্রভূত বাকী। মানস-সরোবর হতে শত শত নদী নির্গত হলেও, তার আকারের হ্রাস বা শেষ হয় না। এও তেমনি। স্বামিজী বলেছেন—যা দিয়া গেলাম তা দেড় হাজার বছরের খোরাক। তাঁর অগ্নি-বীণার বাজার আঙ্গ দেশ বিদেশে প্রতিধ্বনি জোগাচ্ছে।

করেছি, পাঠকদের সেই জঁজু বিষ্ণুপুর দেখবার অল্প অহুরোধ করলাম।

পরিশেষে আমার সম্বন্ধে একটা মজার ঘটনা ঘটায় উহা জানিয়ে আমার বিষ্ণুপুরের কথা শেষ করলাম।

আমি বিখ্যাত সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীসত্যকিন্দের বন্দ্যো-পাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে আছি। কাণাঘুঘায় প্রচার হয়ে গেছে যে, কলিকাতা থেকে প্রভাবতী দেবী (লেখিকা) এই বাড়ীতে উঠেছেন। আর যাবি কোথায়? আশ্রমের এবং আশেপাশের হোষ্টেলের ছাত্ররা ধরে বসল তাদের হোষ্টেলে যেতে হবে এবং কিছু উপদেশ দিতে হবে। তারা বললে—“আপনি মন্ত বড় লেখিকা। একবার আমাদের ছাত্রাবাসে না গেলে বড়ই মনোকষ্ট পাবো।” আমি বললাম, “আমি মন্ত বড় লেখিকা নই। অবশ্য আমি ২৪খানা উপন্যাস লিখেছি এবং তা ছাপাও হয়েছে, কিন্তু সেতো বহুকাল আগে।

আমাদের মানস-জীবনের নিত্যকার আহাৰ্য্য ও পানীয়ে তা দাঁড়িয়েছে। তাই সোনার দেশে রাস্তার ছেলেরা যেমন সোনার ভাটা খেলে, তেমনি তাঁর বিপুল চিন্তা-সম্পদ হতে উদ্ধৃতি ও চূর্ণক আজ সবার মুখে, সবার লেখায়। কিন্তু ভাটা খেলার থেকেও গুরুতর প্রয়োজন আছে—জীবনে মহাবাক্যের প্রয়োগ—পূর্ণ শ্রদ্ধা ও নিপুণ অভিনিবেশ সহ এ হ’তে একটা বাস্তব দর্শন নির্ণয় করা। ভগিনী নিবেদিতা বলেছেন—স্বামিজীর ছিল আধুনিক মন—এবং এই মনের আলো পড়েছে বর্তমানে যারা চিন্তাশীল এবং কর্মরত, তাঁদের নামনে যে সব প্রশ্ন, যে সব সমস্যা রয়েছে—সে সকলের উপর। প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ে বিচারপতি উদরফের উক্তি—হিন্দু সত্যতার উপর এখন যে আক্রমণ আসছে—তার দীর্ঘ ইতিহাসে সেটি সবচেয়ে বিপুল। সাম্প্রতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় এটি সত্যদর্শীর ভবিষ্যবাণী মনে হয়।

ভারতীয় সংস্কৃতির তিনটি মূলতন্ত্র নির্দেশ করা

কিন্তু কার কথা কে শুনে। তখন বাধ্য হয়ে আমার ২৪খানা ছাপান উপন্যাস (যা সঙ্গে ছিল) দেখিয়ে তবে উদ্ধার পেলাম।

পরের দিন দল বেঁধে ছাত্রেরা এসে বললো, আপনি আমাদের দাদী। আপনিও লেখিকা। আপনার আশীর্বাদ আমাদের চাই।

শেষ পর্যন্ত স্বীকার করলাম। ছেলেরা এসে নিম্নে গেল যত্নসহকারে। তারা তাদের থাকবার, পড়বার, খাবার, খেলবার স্থানগুলি সব দেখালো। দেখলাম তারা খুব সাদাসিধেভাবে জীবনযাপন করে, নিয়ম মেনে চলে। তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে ছ’চার কথা বলার পর তবে নিস্তার পাই।

বাড়ীতে ফিরে এসে দেখি, আমার পৌরী মা, মিটি মিটি হাসছেন, তাবখানা এই “কেমন জন্ম কাকীমা”—বুঝলুম তিনিই যত নষ্টের গোড়া।

যায—১। বৈচিত্র্যের স্বীকার, ২। সর্বোপরি ধর্মের অধিকার, ৩। মুক্তির মহিমা। এই তিনটিই বর্তমান জগতের পরিস্থিতিতে আক্রান্ত ও বিপন্ন হচ্ছে। এ তিন বিষয়ে স্বামিজীর মতবাদ সুস্পষ্ট।

বিশ্বধর্মসভায় তাঁর ভাষণ হ'তে পূর্ব পশ্চিমে সংস্কৃতির বিনিময়ে নব পর্যায় শুরু হয়। দুয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বোঝাপড়া ও লেনদেন জগৎ সমস্তার সমাধান করবে এ আশা পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হতে থাকে। বৈচিত্র্যের মাঝে একতা, পরস্পরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বস্তুগুলির আদান প্রদান, নিজ সংস্কৃতিই শ্রেষ্ঠ এবং নির্বিচারে অপরেরও গ্রাহ—এ অভিমান ছেড়ে প্রত্যেকটি নিজ প্রকৃতিমত সমৃদ্ধ হবে ইহার অকুণ্ঠ স্বীকার—স্বামিজীর এই ছিল সর্বত্র প্রচার। বিশ্বসভ্যতার শতদল এইভাবে তার শত পাপড়ি মেলে পূর্ণ প্রস্ফুট হবে—এই ছবি তাঁকে মুগ্ধ করত—তাই প্রত্যেকে প্রাচীর গৌরব এবং প্রাচ্যে প্রতীচীর সমৃদ্ধি তিনি প্রচাব করতেন। পরমত-সহিষ্ণুতা নয়, অন্ধাভরে তার স্বীকার ছিল তাঁর মূলমন্ত্র। তাই বলতেন—আমি অত্কে বাঁচতে দিচ্ছি—এ অমুমতি দেবার অধিকার কোথা হ'তে পেয়েছি? কিন্তু আজ প্রাচীর সাংস্কৃতিক সত্তা বিপন্ন। পশ্চিমের মুখপাত্রেরা দাবী করেন—অচেতন শক্তি ও গণিতের পরিমাপের ভিত্তিতে বর্তমান সভ্যতা গড়ে উঠেছে। অপূর্ব ও অদ্বিতীয় এর স্বরূপ—এ যে পথ দেখায় সারা পৃথিবী তার অহুগামী হবে। মানব পরিবারের কাম্য, সাফল্য, মূল্য সম্বন্ধে এবং প্রয়োগবিজ্ঞান সম্বন্ধে এর নির্দেশ সর্বজনগ্রাহ্য হবে। পশ্চিমের এ দাবীর পিছনে অনেক-খানি সত্য রয়েছে—তা স্বীকার করার উপায় নেই। চীনের লিন ইউ টাঙ্গ ঠিকই বলেছেন—প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের ভাব-সমঘষের কথা প্রায়ই শুনা যায়—কিন্তু প্রশ্ন ও সম্বন্ধ জাগে, পূর্বদিগন্তের ভাবপুঞ্জ পশ্চিম প্রান্তের জীবন-ধারা আদপে প্রভাবিত হচ্ছে কি না? বরং সমঘষের পরিবর্তে জীবনযাত্রায় প্রাচ্যের আত্মসমর্পণ চোখে পড়ছে না কি? বৈচিত্র্য মুছে ফেলে একের সার্বভৌম প্রতিষ্ঠার আয়োজন প্রকাশ পাচ্ছে না কি? এই একাধিপত্যের ছুরাকাজ্জ্বা—শক্তির ঘন্থে জগন্ময় যুগ্ম মনোবৃত্তি

সংক্রামক হচ্ছে—শাস্তির সঙ্কট—দুঃখ ছুর্ভোগের বিস্তার মনুষ্য জাতিকে আতঙ্কিত করেছে। রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে অজস্র অনিষ্টে দীর্ঘ-ভগ্ন হচ্ছে কল্যাণ পরিকল্পনা।

বর্তমান সময় আণবিক যুগ। শুধু বিশ্বধ্বংসী মারণাস্ত্রের জন্ম নয়—সমাজ-সংহতি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে প্রতিটি ব্যক্তিকে বালুকণার মত বিচ্ছিন্ন ও পৃথক করার জন্মও। রাষ্ট্রের আহুগত্য ছাড়া মানুষকে বাঁধার আর স্ত্র কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। রাষ্ট্রসংঘে জাতিতে জাতিতে শাস্তি স্বস্তির বাধা দূর করার চেষ্টা চলেছে—মানব স্বত্ব ও অধিকারের তালিকা বিশ্বজনীন সনদে নিপুণভাবে ছকা হয়েছে। কিন্তু আদর্শ ও বাস্তবের মাঝে ব্যবধান সর্দীর হচ্ছে না। তাই বর্ণবৈষম্য অপর জাতিকে পৃথক করণ, লম্বিষ্ট সম্প্রদায়কে আমাদের দ্বারে অবাধে নুশংসভাবে উৎসাদন, কেনেডির মত উদার মানব-হিতৈষীর প্রাণান্ত, ধর্মের জন্ম নির্ধাতিত ভিক্ষুগণের মূঢ়্যবরণ, আণবিক অস্ত্র সংগ্রহে অসঙ্কোচে প্রতি-যোগিতা—মানব প্রকৃতির মধ্যে দানবতার চিরস্তন তাওব অবাধে চলেছে। আণবিক শক্তিতে মানুষ আজ অতিকায় দৈত্য হলেও,—আদিম বস্ত্র প্রবৃত্তিতে আজও সে নৈতিক শিশু। বিশ্বকবি বলেছেন—রাষ্ট্রের কার্য-কলাপে সাধারণ মানবজীবনের স্বীকৃত নীতিকে লঙ্ঘন ও অগ্রাহ্য করা সম্ভব বলে ধরা হয়। এই অনৈতিক চরিতরীতি হতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে মুক্ত ও মার্জিত করা স্বামী বিবেকানন্দের ছিল লক্ষ্য ও ব্রত। এই moralisation of international relations-এর অর্থ আন্তঃরাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে ধর্মের প্রতিষ্ঠা—ভারতের চিরস্তন বৈশিষ্ট্য।

প্রতিষ্ঠান ও সংবিধান ও নিয়মের নাগপাশে নয়, কিন্তু মানুষের প্রকৃতিগত মহত্ত্বের উদ্বোধনে সকল সমস্তার সমাধান—এই ছিল স্বামিজীর বাণীর মূল ও মর্মকথা। নানাবিধ সংস্থার নিষ্পেষণে এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ সামাজিক জীবকে এক ছাঁচে ঢালার আয়োজন চলেছে সকল রাষ্ট্রে। এই regimentation মানবসমাজকে পিপীলিকার সারি, মধুমক্ষিকার দল বাঁধার আদর্শে গড়তে চায় এবং তাতেই তার চিরকালের নিয়তি স্থির করেছে। ফলে

মাহুদ রাষ্ট্রধর্মের ভূতক ও দাস, আত্ম-কর্তৃত্ব বঞ্চিত হয়ে পড়ছে। ভারতীয় সংস্কৃতি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পরিপোষক। তাই বৈচিত্র্য তার চোখে বিভীষিকা নয়—ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ তার লক্ষ্য ও কাম্য। রাষ্ট্রের স্বার্থে ব্যক্তি বা ব্যক্তিত্বের অহুরোধে রাষ্ট্রসংস্থা—এ প্রথম পশ্চিমে অমীমাংসিত। কিন্তু আর্থ সংস্কৃতির লক্ষ্য স্বসম্পূর্ণ মাহুষের উন্নতি। মানবাত্মার অসীম মহিমার উপলব্ধি তার সকল প্রেরণার মূলে। তাই তার চরম পুরুষার্থ মুক্তি। এ মুক্তি রাষ্ট্রিক স্বাতন্ত্র্যের freedom বা liberty-রও উচ্চে—আরও ঐকান্তিক। এবং এ মুক্তির আধার ও প্রতীক সন্ন্যাস। স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগো বিশ্বধর্ম সভায় নিজ পরিচয় দিয়ে বলেন—তরুণতম জাতির নিকট প্রাচীনতম সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি-রূপে উপস্থিত। ব্যক্তিগত সত্যতার চরম প্রকাশ ভারতের সন্ন্যাসী—ত্যাগ, তপস্যা, বৈরাগ্যের বিগ্রহ—আত্মজীভ, আত্মরতি আত্মানন্দ—স্বরাট। আত্মার মহিমাবোধে বিস্তার। উপনিষদের কথা—এই আত্মা দেখা দেয় জী বা পুরুষ, কুমার বা কুমারীরূপে দেহ জীর্ণ হলে দণ্ড ধরে চলে, জন্মলাভ করে বিশ্বতোমুখ হয়ে। এর সম্ভাব্যতার শেষ নেই—শক্তির অবধি নেই। স্বামিজী বলেছেন—আমরা একমাত্র জগৎ জানতে পারি, চূড়া হল মাহুষ। তিনি রাজ্যী মদালসার কথা উল্লেখ করতেন—শিশুকে দোলায় দোল দিতেছেন আর চেতনার প্রথম উন্মেষ হতে যা তাকে শিখাচ্ছেন—তুমি নিত্য, নিরঞ্জন, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তস্বভাব। এই কথাই স্মরণে রাখার জন্ত নিত্য পাঠ করার শ্লোক—

অহং দেবো ন চাত্তোহস্মি ব্রহ্মবাং ন শোকভাক্।

সচ্চিদানন্দ রূপোহং নিত্যমুক্ত স্বভাবান।

স্বামিজীর সকল উপদেশ, সকল ভাষণের মধ্যে স্মৃতি

হয়েছে মানবাত্মার এই মহিমার গুণ।

বর্তমান সময়ে এই মানবতার ক্ষুধা ব্যতীত দুঃখ দুর্দশার যে করুণ কাহিনী দিকে দিকে, বিশেষ করে হিন্দুস্থানের চারপাশে মর্মান্তিক হয়ে উঠছে—তার প্রতিকার কোথায়? জ্ঞান-বিজ্ঞান-ঐশ্বর্য-বিলাসের প্রসারের মাঝেও মানবতার মর্যাদা সম্মান অপমানিত,

ধূলি-লুপ্তিত হচ্ছে। আর মনে করিয়ে দিচ্ছে যুষ্টিপুত্রের উক্তি কুরুক্ষেত্র বিজয়ের পর, হস্তিনাপুরের সিংহাসনে আরুঢ় হয়ে সকল কামনা ও গৌরব লাভ করার পর।

ধৃত্য ধৃত্য ইতি জনা সর্বৈহ্মান প্রবন্ত্যত উত।

ন দুঃখিততরঃ কশ্চিৎ পুমানস্মাভিরস্তিহ।

সকল জন আমাদের ধৃত্য ধৃত্য বলে বিস্তৃত আমাদের মত অতি দুঃখী আর কেহ নাই। মানব-পরিবারেরও কাছে এই আক্ষেপ নয় কি?

তাই আজ স্বামিজীর বীরবাণীর অহুধ্যান একান্ত কর্তব্য। বিপন্ন হিন্দুসভ্যতা ও জনতার কল্যাণকল্পে তাঁর বাণী অভয়ের বাণী—বলতেন অল্প কোনও ধর্মশাস্ত্র উপনিষদের মত এমন মাহুষ ও ঈশ্বর ‘অভী’ বলে বর্ণিত হয় নি। বলতেন—পুরুষসিংহ হও তোমরা। ভারতের ভূমি ও জনতার সাথে একাত্ম হয়ে প্রার্থনা জানিয়েছেন—হে গৌরীনাথ, হে জগজ্জননি—আমায় মনুষ্যত্ব দাও। আমার দুর্বলতা দূর কর, কাপুরুষতা ঘুচাও, আমায় মাহুষ কর। বলেছেন—মুষ্টিমেঘ শক্তিমান পুরুষ পৃথিবী টলিয়ে দিতে পারে।

এই অসীম ভরসার মূলে ছিল তাঁর বৈদান্তিক ভাব, জীবনধর্মের অদ্বৈত প্রত্যয়। সিপাহী বিদ্রোহের একটি ঘটনা উল্লেখ করতেন। এক মৌলী সাধু দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে মৃত্যুমুখে পড়েন। সঙ্গীরা আততায়ীকে ধরে আনে এবং তাঁর মুখে একটি কথা পেলে সমুচিত দণ্ড দিতে উদ্যত হয়। শেষ মুহূর্তে তিনি শুধু তার দিকে ফিরে বলেন—তত্ত্বমসি—বন্ধু। তুমিও সেই ব্রহ্মবন্ত।

বর্তমানে জাতির মহাপুরুষগণের স্মৃতি-সমারোহ অহুষ্ঠিত হচ্ছে। কিন্তু তাঁদের অগ্নিময়ী বাণীতে অন্তরের ভিজা কাঠে উত্তাপ আনছে না—অগ্নিস্কুলিঙ্গ সৃষ্টি করছে না কেন? হিন্দু সংস্কৃতির বর্তমান সম্বন্ধে অরণীয় তার অলঙ্কার প্রেরণা—চাই অগ্নিময় দীক্ষিত, বুদ্ধিমান ও সাহসী যুবক। ক্লেব্যাং মাশ্ব গমঃ পার্শ্ব। উত্তীর্ণত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত—উঠ, জাগো, শ্রেষ্ঠ আচার্য লাভ কর, কর্তব্য বুঝিয়া লও।*

* ১৯শে মার্চ বিবেকানন্দ জন্মোৎসব সভায় ভাষণ অবলম্বনে।

ক্রমশঃ

নির্মল রায়

রাণাঘাট লোকাল ছাড়তে এক মিনিট আর বাকী। হস্তদস্ত হয়ে শেরালদা ষ্টেশনে পৌঁছলেন ভদ্রলোক। বেশ হুটপুট ভারিকী গড়ন। চুলে পাক ধরেছে কম নয়, টাকও উঁকিঝুঁকি মারছে স্বল্প চুলের আড়াল থেকে। বয়স হয়ত চারের কোঠা পেরিয়ে পাঁচের ঘর ছুঁই-ছুঁই, তবু চলাবলার চটপটে কম নয়।

হৈ হজোড আর ঝামেলা—এই নিয়ে কলকাতা। তারই আঁকে-বাঁকে সব কাজ সেরে অরে ব্যস্ত-সমস্ত মনে ছুটতে হয়েছে অনেকটা। এ গাড়ী ধরা চাই-ই। টিকিট ঘরের সামনে এসেই—মাই গড—এক প্রকাশ লগ্না কিউ। টিকিট নিবে ট্রেন ধরা অসম্ভব। অতএব নর্থ ষ্টেশনের গেটে শুভ ইভিনিং রুঁকে ঢুকে পড়লেন ভেতরে।

গাড়ীতে শুধু ভীড় আর ভীড়। সমস্ত কলকাতা শহরটাই যেন মফঃস্বলের নিরিবিলিতে পালিয়ে বাঁচতে ছুটে চলেছে। দিনান্তের কলকাতার আর কোন টান নেই, কোন আকর্ষণ নেই ওদের কাছে। এবার মনের গতি গাঁয়ের দিকে। মাটির টানে।

—ঠাই-নেই ঠাই নেই—সমস্ত গাড়ীটাই বোঝাই। পাদানিতেও হুটো পায়ের ঠাই মেলা ভার। অনেক কষ্টে কোন রকমে একটা থার্ড ক্লাস কামরায় নিজের দেহটা ঠেলে দিলেন ভদ্রলোক—হাতের ব্যাগ আর কাঁধের ঝোলা সামলে রেখে।

কিন্তু ঐ পর্যন্ত। তারপরই এটেনশন। দরজার কাছে বাস্কে এক হাতের ভর রেখে একপায়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই। তবু বা হোক ওঠা তো গেছে। হুঁতিন ষ্টেশন পরে, বসার জায়গা হয়তো বা মিলেও যেতে পারে। গুর সফর অনেকদূর। সেই কাঁচরাপাড়া।

—আরে মাষ্টার মশাই যে। আশুন আশুন, আপনি বসুন। সামনের বেঞ্চে বসা ছেলেটি উঠে দাঁড়িয়ে জায়গা ছেড়ে দিল ভদ্রলোককে।

আরে না না—, তুমি বোসো তাই, তুমি বোসো—না-না—তাতে কি...?

শত হলেও শিক্ষকদের প্রতি ছাত্রদের শ্রদ্ধাভাব

আজও অগাধ, বিশেষ করে মফঃস্বলের ছাত্রদের বেলায় কোন 'না' টিকল না। ওর জায়গায় বসতে হ'ল মাষ্টার মশাইকে। বসে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। কিছুটা খুসী ও আরামের রঙ ছড়ানো মনে একবার চেয়ে দেখলেন ছেলেটিকে।

ছেলেটি তখন শ্রীগোরাঙ্গ। মাথার উপর হুঁহাত তুলে বাস্কের শিকল ধরে প্রায় আধ বোজা চোখে বোধ হয় ভাবছে—আর দেবী কত? কত দেবী?

এখানকার লোকাল ট্রেনগুলির একটা বড় নিয়ম যে নিয়মমাকিক ওরা সাধারণতঃ সময়মত চলতে শুরু করে না। যদিবা কখনও কালেভদ্রে করে, সেটা ব্যতিক্রম, অঘটনের সামিল। সেদিনও পাঁচটা দশের রাণাঘাট লোকাল ছাড়তে পাঁচটা পঁচিশ হয়ে গেল।

গাড়ী ছাড়বার মুখে ও পাশের দরজার কাছ থেকে কার অহুচ্চ চীৎকার শোনা গেল—এই যে, অবিনাশবাবু যে—কোথেকে? স্কুলবোর্ডে গিয়েছিলেন বুঝি—?

মাষ্টার মশাই ভদ্রলোকের নামই অবিনাশবাবু বোঝা গেল। তিনি তখন বসতে পেরে স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বৈচেছেন। জিজ্ঞাসু ভদ্রলোকের দিকে একটু হালুকা হাসি ছুঁড়ে দিয়ে, আপত্তোভাবে মাথার দোলানিতে বুঝিয়ে দিলেন—আপনার অহুমান নিভুল।

গাড়ী ছাড়ল। একটু ঝাঁকুনি। ঘস্ ঘস্। কিছু কিছু এলোমেলো হৈ হৈ। মাইকের বোষণা—অমুক আপ—অমুক লোকাল ইত্যাদি। সব ছেড়ে-ছুড়ে গাড়ী চলল ষ্টেশন ছেড়ে শেরালদা ছাড়িয়ে।

সেই দাঁড়িয়ে পড়া ছেলেটি এবার হুলছে চলতি গাড়ীর তালে তালে। অবিনাশবাবু জিজ্ঞেস করলেন ছেলেটিকে—তারপর তুমি কদরূর যাবে হে?

—রাণাঘাট স্থার।

রা-ণা-ঘা-ট? অবিনাশবাবুর কিন্তু জাগল মনে। বললেন—অদূর যাবে? তাইতো এটা ভাল হোলো না। দেখো তো আমার জন্ত তোমার কত কষ্ট হোলো।

ছেলেটি কিন্তু অতি অসঙ্কোচে হেসে হেসেই বলল—

তাতে কি হয়েছে স্মার। আপনি কোন কিছু করবেন না। কিছুদূর গেলেই বসবার জায়গা ঠিক পেয়ে যাবো।

অবিনাশবাবু সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে বললেন— হ্যাঁ অবিশি, তা বটে। বলেই কাঁধের ঝোলাটা সামনে কোলের উপর তুলে নিয়ে, তার উপরে হাতের ব্যাগটা ধরে বেশ ভাল হয়ে বসলেন। বুক পকেটের মনি-ব্যাগ, কলম সবকিছুর যথাযথ অবস্থান পরখ করে দেখতে দেখতে আবার জিজ্ঞেস করলেন ছেলেটিকে—তারপর তুমি কোথেকে—? কলকাতা, না আরো দূর?

ছেলেটি একটু চুপ করে রইল। তারপর মাথা নিচু করে ঝুঁকে অবিনাশ বাবুর কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে বলল—কলকাতায়ই স্মার। একটা ইন্টারভিউ ছিল। তাছাড়া এম্প্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জও গিয়েছিলাম। আমি কলকাতার এক বন্ধুর ঠিকানায় কার্ড করিয়েছি। এখানে—

—হাতকাটা তেল—হাতকাটা তেল।

ছেলেটির কথা আর এগোল না। হাতকাটা তেলের বিবিধ গুণাবলীর বিবরণী-লেকচার শুরু হয়ে গেছে ততক্ষণে। পাষের নখের ডগা থেকে মাথার চুলের শেষ পর্যন্ত, যে কোন জায়গায় হাতকাটা তেলের প্রয়োগ-পদ্ধতি এবং তার উপকারিতার বর্ণনা বিবৃত হয়ে চলেছে ক্যানভাসারটির বিশেষ ধরনের ক্যানাডিয়ান-এলিন-গলায়, আধা ফিল্মি-যাত্রার অনবদ্য চঙে।

বস্-বস্। ব্যাচাং ব্যাচ্। একটি স্টেশন। চা গরম-চা। পান বিড়ি সিগ্রেট। এয়াঁচি পান—এঁয়াচি-পান। হৈ হৈ। হট্টগোল।

উল্টাডিঙি রোড স্টেশন বাদ দিয়ে দমদমে এসে দম নিতে থেমে গিয়েছিল গাড়ীটা। স্টপ এণ্ড স্টার্ট। ক্ষণিকের বিরতি। একটু থেমেই আবার চলতে শুরু করল গাড়ীটা। এরই মধ্যে অনেকে নেমে গেল ঐ কামরা থেকে, যেন কিঞ্চিৎ ফাঁকা হোলো গাড়ীটা। যারা দাঁড়িয়েছিল তাদের মধ্যে কেউ কেউ বসতে পেল।

সেই দাঁড়িয়ে পড়া ছেলেটিও জায়গা পেয়ে বসে পড়ল, অবিনাশবাবুরই পাশে।

—ওকি মশাই, ধাকা মারছেন কেন?

—আজ্ঞে না—।

—আজ্ঞে না, মানে? ধাকা মারছেন, তবু বলছেন— আজ্ঞে না, বেশ তো!

—আজ্ঞে ধাকা কি কেউ মারে? ওটা লেগে যায়। যাই হোক—ক্ষমা, ক্ষমা চাইছি।

কয়েকটা সীট খালি হওয়ায়, দাঁড়িয়ে ধাকা যাত্রীদের মধ্যে বসে পড়বার ব্যস্ততা স্বাভাবিক। তাই গাড়ীর মধ্যে ক্ষণিকের হট্টোপাটি, হৈ হৈ, কথা কাটাকাটি। মস্তব্য।

গাড়ী ছুটতে শুরু করেছে। দরজার কাছে কাপড়ের গাঁট মাথায় যাত্রীটি ঘামে প্রায় নেমে উঠেছিল। মাথার বোঝাটা বাক্স রাখবার জায়গা পেয়ে খুসী হ'ল। বোঝা নামিয়ে কাঁচার গোছার হাওয়া খেতে লাগল অতঃপর।

অবিনাশবাবু কিছু সেই থেকে ভাবছিলেন দাঁড়িয়ে ওঠা ছেলেটির কথা। খুসী হয়েছিলেন মনে মনে—ওর সশ্রদ্ধ ও বিনয়-নম্র স্বভাবে। কিন্তু সঠিক চিনতে পারেন নি তখনও। নিজের ছাত্র ছেলেটি নয়। কারণ অবিনাশবাবু টিচারী করেন মেয়ে-স্কুলে কাঁচরাপাড়ার কাছের মেয়েস্কুলের হেডমাষ্টার অবিনাশবাবু। হয়ত ছেলেটির কোন বোন-টোন কেউ তাঁর ছাত্রী। তা সে যাই হোক। ছেলেটি বড় ভাল। এ গুড বয়। বড় ভাল লাগল ছেলেটিকে অবিনাশবাবুর।

ছেলেটি বসে পড়েছিল ওঁর পাশেই। অবিনাশবাবু পকেট থেকে নস্তির ডিবা বার করলেন। সম্বন্ধে বাঁ হাতের তালুতে নস্তি ঢেলে, ডান হাতের ছ' আঙুলের টিপে, টিপ রেখে নাকে পুরে দিলেন নস্তিটা পরম আরামে।

সামনের সীটের আধাবয়সী তদ্রলোক—“উল্টোরথে” ময়। হঠাৎ হাত-বাড়িয়ে—এক টিপস্তার বলে কাতর দৃষ্টিতে তাকালেন অবিনাশবাবুর দিকে।

—ও সিওর—বলে অবিনাশবাবু নস্তির ডিবেটা এগিয়ে দিলেন তদ্রলোকের দিকে। তারপর ডিবেটা ফেরৎ পেয়ে, সেটা পকেটে পুরে, রুমাল দিয়ে নাক ঝাড়লেন ছ'মিনিট।

পাশের ছেলেটি বসেছিল চুপ-চাপ।

অবিনাশবাবু অনেক ভেবে-চিন্তে তারপর বলেই

ফেললেন—আচ্ছা দেখো, তোমায় খুবই চেনা চেনা লাগে। দেখেছিও অনেক। কিন্তু নামটা যেন—

—সুশোভন স্তার। সুশোভন চৌধুরী। আমার দিদি নীতা চৌধুরী আপনাদের ছাত্রী ছিল। আমরা থাকি রাণাঘাটে।

—নীতা চৌধুরী? কুঁচকে কী যেন মনে করতে চেঁচা করলেন অবিনাশবাবু। মনে মনে কি যেন আওড়ালেন বিড় বিড় করে। তারপরেই ও আই সী—হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেল। বললেন—নীতা চৌধুরী? মানে রাণাঘাটের...রাণাঘাটের মুকুন্দ চৌধুরী মহাইর মেয়ে—নীতা?

সুশোভন ষাড় নেড়ে বলল—হ্যাঁ স্তার।

—ও তাই বল, তাই বল,—অবিনাশবাবু হঠাৎ খুব আপন, খুব অন্তরঙ্গ হ'য়ে উঠলেন যেন। গদগদ কণ্ঠে বললেন—তাই বল, তুমি নীতার ভাই। বড় ভাল মেয়ে নীতা—খুব ভাল ছাত্রী ছিল আমাদের। কেমন আছে নীতা—বিয়ে হয়েছে নিশ্চয়। জিজ্ঞেস করলেন অবিনাশবাবু।

—ভালই আছেন দিদি। বিয়ে হয়নি এখনও।

আবার হঠাৎ হৈ হৈ। গরম চা, চা-গরম। পান বিড়ি সিগারেট। বাসন্তীর প্রসিদ্ধ চানাচুড় ইত্যাদি। আবার কিছু হট্টগোল। যাত্রীর ওঠা-নামা।

অবিনাশবাবু তাকিয়েছিলেন সুশোভনের দিকে। খুব ভাল করে খুঁটিয়ে দেখছিলেন সুশোভনকে—অপলক দৃষ্টিতে। স্নহর প্রদীপ্ত চেহারা মুখে চোখে প্রতিভার প্রতিচ্ছবি। কিন্তু মলিন বেশ, কশ্চ কেশ, রুগ্ন দেহ। নিরুৎসাহ দারিদ্র্যের চাবুকের দাগগুলো যেন কাজলের ছোপ ধরিয়ে দিচ্ছে—ওর চোখের কোলে কোলে।

‘—দস্তোজ্জল’—দাঁতের মাজন। দাঁত ব্যথা—দাঁতের গোড়ায় রক্ত পড়া, পুঁজ পড়া, মাড়ি ফোলা, সব কিছু নিমেষে বন্ধ করে, দাঁতকে চক্চকে ঝক্‌ঝকে আর মজবুত করে তুলতে অদ্বিতীয় দস্তমাজন। ষাঁরা বহু রকম মাজন ব্যবহার করেও কোন ফল পাননি—ইত্যাদি। লোকাল ট্রেনের চলতি বাজারের সওদা ফিরিস্তি বিবৃত হয়ে চলেছে একটার পর একটা। হাতকাটা তেল

চানাচুর, চিরুণী, লঞ্জেস, আলতা, দাঁতের মাজন, এঁষাটী পান, লঞ্জেস ইত্যাদি বিরামহীন গাড়ীর মতই ওই বিজ্ঞপ্তিও চলে চলেছে অবিরাম। মাঝে মাঝে শুধু স্টপ এণ্ড স্টার্ট। একজনের বলা শেষ হতেই আর একজনের শুরু।

ধ-রস-বস্। আবার স্টেশন আসছে। গাড়ীর গতি মন্দ। এ স্টেশনে যারা নামবে, তারা যে-যার ঝোলা-ঝুলি নিয়ে গेटের কাছে রেডী।

অবিনাশবাবুর বাঁ পাশে বসেছিল সুশোভন, আর ডান পাশে আর একজন আধ-পাগলা গোছের মাঝবয়সী লোক। তারও ছিন্ন বাস, মলিন বেশ, উড়ো উড়ো উস্‌কোখুস্‌কো চুল। ঘোলা ঘোলা চোখের ঝাপসামত দৃষ্টিতে আফিম খোরের চাহনি। মাঝে মাঝে ফ্যাল ফ্যাল করে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে লোকটা। মাঝে মাঝে অবিনাশ-সুশোভন সংলাপ আবার কখনওবা বিড় বিড় করে আপন মনে গানের সুর ভাঁজছে মাঝে মাঝে।

অবিনাশবাবু খুব দরদভরা গলায় বললেন—আচ্ছা নীতার তো শুনেছি একটাই ভাই, আর সেই ভাই একটা জুয়েল। তুমি কি—

খুব সবিনয়ে আঙুল করে সুশোভন বললে—আজ্ঞে আমি তাঁর একমাত্র ভাই সুশোভন চৌধুরী। কিন্তু জুয়েল—

—না—না তা বললে কি হয়? মাঝপথে সুশোভনকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন অবিনাশবাবু। আমি জানি হে সব জানি। তুমিই তো সে বারে স্কুল ফাইনেলে স্ট্যাণ্ড করেছো, তারপর আই-এসসিতেও স্ট্যাণ্ড করেছো শুনেছি। তুমিই তো জুয়েল, সত্যি জুয়েল, রত্ন, দেশের রত্ন। আমাদের সবার গৌরব। সবার গর্ব। হেঁঃ হেঁঃ—একটা আত্মপ্রসাদের হাসি ছড়িয়ে দিলেন সুশোভনের দিকে।

খুব আনন্দের আতিশয্যে বলতে বলতে একটু দম নিয়ে নিলেন অবিনাশবাবু। সবিনয়ে মাথা নিচু, বসে রইল সুশোভন চৌধুরী।

গলায় একান্ত অন্তরঙ্গতার সুর তুলে আবার জিজ্ঞেস

করলেন অবিনাশবাবু—তারপর এখন কি পড়ছ? ডাক্তারী না ইঞ্জিনীয়ারিং? বলেই জিজ্ঞাস্য দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলেন অবিনাশবাবু। স্নশোভনের চোখ দুটো ছল ছল করে উঠেছিল একটু। অবিনাশবাবু দিকে তাকিয়ে বলল—সে সব আর হয়নি স্যার। বি. এন্স.সি. পাশ করেছি এবারে। বলার সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসছিল যেন স্নশোভনের বুকের অন্তর-মহল থেকে। অবিনাশবাবুর ঔৎসুক্য কিন্তু কমল না।

—বি. এন্স.সি পাশ করেছো? মানে অনার্স?

—না, স্যার। অনার্স নেই। পাস কোর্স। তবে ডিস্টিংশন পেয়েছি।

বাঃ বাঃ ব্রেভো-ব্রেভো। হঠাৎ যেন স্থান কাল সব গুলিয়ে গেল অবিনাশবাবুর। আনন্দের আতিশয্যে সশব্দে বাঃ বাঃ বলে চীৎকার করে উঠে স্নশোভনকে যেন প্রায় জড়িয়েই ধরলেন।

পাশের আধপাগলা লোকটাও বিস্ময়িত দৃষ্টি মেলে দিচ্ছে স্নশোভনের দিকে। তার গলার গানের সুরটাও হঠাৎ যেন একটু বেশী প্রকটই হ'য়ে উঠল নগিকের জন্ত।

গাড়ী ব্যারাকপুর ছাড়িয়ে এগিয়ে চলেছে পলতা ইছাপুরের দিকে। চলতি বাছারটাও এবার একটু মন্দা হয়ে আসছে ক্রমশঃ। কেবল এঁরাচি পান আর চানাচুরের চমক শোনা যাচ্ছিল মাঝে মাঝে।

অবিনাশবাবু বললেন—তারপর স্নশোভন এখন তো এম. এন্স.সি—কী বল?

—না স্তার। সংক্ষিপ্ত স্পষ্ট জবাব ওর কণ্ঠে।

—না? না মানে? না কেন? তবে কি করবে ঠিক করেছে? ও হো, ই্যা ই্যা মনে পড়েছে। তুমি কিসের ইন্টারভ্যুতে গিয়েছিলে যেন আজ, তখন বলেছিলে না? কিসের ইন্টারভ্যু? ইঞ্জিনীয়ারিং এপ্রেন্টিসশীপ?

একটা খুব বড় দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল স্নশোভন। একটু ধামল সে। তারপর বলল—ওসব কিছু নয় স্তার। আর কিছুই হবে না। একটা সাধারণ চাকুরী। যেমন তেমন একটা চাকুরীর প্রয়োজন। আজ গিয়েছিলাম একটা কেরানীর পদের জন্ত। কিন্তু হোলোনা। বলেই হঠাৎ থেমে গেল স্নশোভন।

অবিনাশবাবু যেন নিভে গেলেন অকস্মাৎ—আচম্কা। আকাশ-পাতাল অনেক কিছু ভেবে নিলেন এক মুহূর্তে। তারপর বললেন—আমি কিছুই বুঝলাম না ভাই।

স্নশোভন একটু হাসল। স্নান হাসি। তারপর বলল—বাবা হঠাৎ মারা গেলেন। মা'র হ'ল টি.বি.। বাড়ীতে এখন ঐ রোগিনী মা, দিদি, আর ছোট ছ'বোন। দিদির আর আমার টিউশানীতে সংসারইতো চলছে না, তার উপর মা'র চিকিৎসা—

গলাটা ধরে এসেছিল স্নশোভনের। চোখে মুখে তার হঠাৎ যেন শ্রাবণ মেঘের ঘন-ঘটা। অবিনাশবাবু অকস্মাৎ স্তব্ধ। সেই আধপাগলা লোকটার রামপ্রসাদী সুরও থেমে গেছে এবারে।

পাশের কামরা থেকে কোন এক ভিখারির গান শোনা যাচ্ছিল শুধু—‘অক্ষ আমি, দয়া করো—পথ আমারে দাও দেখাষে—।

অবিনাশবাবু স্নেহে স্নশোভনের পিঠে হাত রেখে বললেন—সত্যি কী ভীষণ বিপর্যয়। বাই হোক কিছু ভেবো না। দুঃখ দিয়েই তো ভগবান মাহুঘের পরীক্ষা করেন। সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে দেখো।

শ্রাবণের মেঘে এবার দমকা ঠাণ্ডা হাওয়ার দোলা লাগল একটা। টল্টলে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে নামল স্নশোভনের গাল বেয়ে।

ধরা গলায় স্নশোভন বলল—কবে হবে স্তার? দেবী হ'লে মাকে তো আর বাঁচানো যাবে না স্তার।

এবার কেঁদেই ফেলল স্নশোভন। পাশের কামরার ভিখারির গান তখনও শোনা যাচ্ছিল—বন্ধ আমার বন্ধ ব্যথায়, চক্ষু আমার অন্ধ যে...।

কথার মোড় ঘুরিয়ে নিতে অবিনাশবাবু বললেন—আচ্ছা চাকুরীর কথা বলো। আজকের ইন্টারভ্যুতে কি হলো?

—হয়নি। মানে আমাকে নেবে না।

—কেন?

—ওরা এক্সপিরিয়ান্সড লোক চায়। আমার অভিজ্ঞতা নেই, অতএব অচল। আমি বলেছিলাম যে,

ক'দিন কাজ করলেই আমি অভিজ্ঞ হয়ে যাব। আমার সাধারণ বিচার সব সার্টিফিকেট দেখিয়ে বলেছিলাম—বিশ্বাস করুন সহজে সব বুঝে নেবার যোগ্যতা এবং ক্ষমতা আমার আছে। কিন্তু না, গ্রাহ্য হলো না আমার অবদান। অনভিজ্ঞ ওখানে অচল।

সুস্থিত অবিনাশবাবু বললেন—আশ্চর্য মানুষ তো? এমন হীরের টুকরো ছেলে, পড়াশুনায় যার কেরিয়ায় এত ভাল, তার বেলাতেও অভিজ্ঞতার প্রশ্ন? ফুঃ। যতসব আহাম্মক আর কী?

সুশোভনের মনে হঠাৎ চৈতালী জোয়ার জেগে উঠল যেন, দ্বিধা দ্বন্দ্বের সব কিছু বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে।

সুশোভন বলল, আজ প্রায় একমাস ধরে চাকুরীর ধাক্কা ঘুরছি স্তার। চাকুরী আমার চাই। আমার মাকে বাঁচাতে, আমাদের সবাইকে বাঁচাতে, চাকুরী আমার চাইই স্তার। কিন্তু সবাই ফিরিয়ে দিচ্ছে, স্তার। কোথাওবা আমি টাইপ জানি না তাই অচল, কোথাওবা আমি বেশী কোয়ালীকাইড—ঐ ছোট কাজে বেশীদিন থাকব না, অতএব চলবে না, আর বেশী জায়গায়ই শুধু অভিজ্ঞতার প্রশ্ন। অনভিজ্ঞ, আন-এক্সপিরিয়ান্সড আমার কোথাও ঠাই নেই। আপনিই বলুন স্তার, স্কুল কলেজে আমরা যা শিখি, ভবিষ্যৎ জীবনের কাজে তার কি কোনই দাম নেই? একটা একশো টাকার মাইনের কাজ করবার যোগ্যতাও কি অর্জন হয়নি আমার ভাল ভাবে বি. এসসি পর্যন্ত পাশ করে? বলুন স্তার।

অবিনাশবাবুর মনে আঘাত লেগেছিল যথেষ্ট সুশোভনের সব কথা শুনে। তিনি বললেন—কি জানো তাই, সব ধোঁকাবাজি, সব ধোঁকাবাজি। আসলে প্রায় জায়গায়ই নিজ নিজ লোক নেয়া হয়ে যায়। তবু গলা বাঁচাতে ইন্টারভ্যু। ইন্টারভ্যু ডাকতেই হয় তাই ভাঙ্কা। বুঝলে কিনা—ফুঃ, অর্থাৎ ডেক হেঁকে ইয়ার্কি, যত সব—

বেশ গরমই হবে উঠেছিলেন অবিনাশবাবু। একটু দম নিয়ে আবার বললেন,—তাছাড়া ঐ বললাম যে, সব ধোঁকাবাজি, অনেক জায়গায় আসলে লোক নেবার ইচ্ছাই নেই মোটে, তাই এটা নেই, ওটা নেই,

অভিজ্ঞতার প্রশ্ন, আসল ব্যাপার এড়িয়ে যাবার কারুসাজি। -যত সব বুজঝুঁকি। সব ধোঁকাবাজি—সব ধাপ্লাবাজি, বলতে বলতে নিজের কোলা আর ব্যাগ বাগিয়ে নিলেন অবিনাশবাবু। এরপরই কাঁচরাপাড়া।

উঠতে উঠতে অভয় দিয়ে বললেন অবিনাশবাবু, তা যাই হোক কিছু ভয় পেয়ো না। মানে মুখে যেয়োনা। মনে বল চাই, বল। তোমার মত জুয়েল, তবু পেলে চলবে কেন।

সুশোভন সবিনয়ে বলল—যাই হোক স্যার, সবই বললাম। আমার মাকে বাঁচাতে হবে। আমাদের সবাইকে বাঁচাতে হবে। একটা চাকুরী চাই। তা যেমনিই হোক। তাই বলছিলাম, আপনার তো অনেক জানা শোনা আছে। একটু দেখবেন স্যার। বড় বিপদে পড়েছি।

অবিনাশবাবু কি ভাবলেন। তারপর বললেন,—দেখো, সত্যি বলতে কি আমার জানাশোনা তেমন কেউ নেই। আমি মফঃস্বলের মেয়ে স্কুলের মাস্টার। আমার কথা কেইবা রাখবে বল?

সুশোভন তবুও বলল, আমি টিচারিং করতে রাজি স্যার।—পারবো না?

—কেন পারবে না, আলবৎ পারবে। খুব ভালো পারবে। তবে এখনই তো হাতে নেই কিছু। এখন একটা যা আছে, একজন অঙ্কের জ্ঞান মেয়ে টিচার দরকার। তা তুমি তো আর মেয়ে নও। নইলে এক কাজটা আমারই হাতে। নিয়োগভার সম্পূর্ণ আমার উপর। আচ্ছা তবু দেখবো—কেমন? বলেই দরজার দিকে পা বাড়ালেন অবিনাশবাবু। কাঁচরাপাড়া স্টেশন প্রায় এসে যাচ্ছে।

সুশোভনের দুটো চোখে হঠাৎ যেন ডিসট্যান্ট সিগ্‌নালের আবছা সবুজ আলো ছলে উঠলো। অবিনাশবাবুকে মিনতি করে বলল—তবে স্যার আমার দিদিও তো এবারেই অঙ্ক নিয়ে বি. এ. পাশ করেছে। তাকেই করিয়ে দিন স্যার কাজটা। দিদিতো আপনারই ছাত্রী। আপনি তাকে খুবই ভাল জানেন। করিয়ে দিন স্যার।

খুব উপকার হবে আমাদের। আমরা বেঁচে যাব।
আমাদের মা বেঁচে যাবেন। স্যার।

অবিনাশবাবু একটু থামলেন। একটু ভাবলেন
কি যেন। তারপর বললেন—সবই বুঝেছি ভাই,
সবই বুঝছি। কিন্তু কি জানো? যে স্কুলটার জন্তু অঙ্কের
টিচার দরকার সে স্কুলটা নতুন। অতএব একজন অভিজ্ঞ
অঙ্কের টিচার দরকার। তোমার দিদি খুবই ভাল ছাত্রী
জানি, তবু সে তো মোটে এবারেই পাশ করেছে।
কোন অভিজ্ঞতা নেই তো। মানে তাই অসুবিধা—
বুঝলে কিনা।

সুশোভন কি বলতে যাচ্ছিল। তাকে থামিয়ে
গলা খাটো করে অবিনাশবাবু বললেন,—তাছাড়া কি
জানো—ও পদটার জন্তু একজনকে প্রায় কথাও দিয়ে
দিয়েছি। আমারই খুব জানা শোনা—মানে নিজের
লোক। হেঁ হেঁ করে একটু আলতো হেসে আবার বললেন
অবিনাশবাবু—মানে, তোমার বৌদির—মানে আমার
স্বীর বোনের নন্দ। খুব শিক্ষিত পরিবার। বাবা জজ,
দু'ভাই প্রফেসর আর ঐ এক বোন। বি.এ. পাশ।
খুব মেধাবী ছাত্রী। বুঝলে কিনা, তাকেই নেবো বলে
কথাও প্রায় দিয়ে ফেলেছি, নইলে আপত্তি ছিল না—
বুঝলে কিনা, হেঁ হেঁ। একটুকরো তারিকি হাসি ছড়িয়ে
দিয়ে দরজার কাছে এগিয়ে গেলেন অবিনাশবাবু।

কাঁচরাপাড়া স্টেশনে গাড়ী থেমে গেল। নামতে
নামতে অবিনাশবাবু বললেন—তোমার সব কথা শুনে
আমি খুবই ছুঃখিত সুশোভন। আমি খুবই ছুঃখিত।
আই অ্যাম ভেরী সরি। যাই হোক ভগবান মঙ্গলময়।

তিনি মঙ্গলই করবেন দেখো। আচ্ছা চলি, বলে
নেয়ে পড়লেন অবিনাশবাবু।

গাড়ী আবার ছাড়ল।

সুশোভন এবার সম্পূর্ণ শুদ্ধ। স্টেশন প্লাটফর্মে
চলমান অবিনাশবাবুর দিকে সে শুধু তাকিয়ে রইল একটা
নির্বাক নিকম্প অপলক দৃষ্টি মেলে দিয়ে।

হঠাৎ চমকে উঠলো সুশোভন কামরার সেই আধ
পাগলা লোকটার আচমকা দমকাটানো একটা অট্টহাসির
চিংকারে। সুশোভন ফিরে তাকাতেই থেমে গেল
লোকটা। কিন্তু একটু পরেই চোখ বুজে নিজের মনেই
আবার গান ধরল লোকটা—

আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না।

এই জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা।—

রাণাঘাটে গাড়ী থামল আরও পরে। ও গাড়ীটার
ওখানেই যাত্রা শেষ। যাত্রীরা সবাই নেমে গেছে একে
একে। সম্পূর্ণ ট্রেনটা এখন ফাঁকা—একেবারে ফাঁকা—
সর্বশূন্য, সর্বরিক্ত, শুধু গায়ে গায়ে মাখানো তার ধুলো আর
ধুলো—পথ চলার নিশানা, ক্লান্তি। শেয়ালদা স্টেশনের
যাত্রা আরম্ভের সেই হেঁ হেঁ হট্টগোল, আশা আকাঙ্ক্ষার
সবকিছু আড়ম্বর আয়োজন যাত্রা শেষে ফুরিয়ে গেছে,
নিঃশেষে উড়ে গেছে সব। খালি—খালি—সব খালি।

গাড়ী থেকে নেমে গাড়ীটার দিকেই তাকিয়ে রইল
সুশোভন অনেকক্ষণ অপলক নেত্রে।

কাল আবার গাড়ী চলবে। আনএক্সপিরিয়ান্সড্
অনভিজ্ঞ সুশোভনের প্রতিদিনের যাত্রাপথের অভিজ্ঞতার
সঙ্কয়ই বা কম কি।



তুমি

শ্রীগণেশচন্দ্র সামন্ত

কছু নিরাকারে, কখনো সাকারে
পূজনীয় ভবে তুমি;
অন্তরে তাই বরণীয় রূপে
সতত তোমাকে নমি।

তুমিই দেখালে নিখিল-বিশ্ব,
তুমিই চেনালে সব;
প্রাণের মাঝারে জাগ্রত তুমি
করি তাই অমৃতভব।

মোদের বলিতে কিছু নাই প্রভু!
তোমার যজ্ঞে আসি'
আত্মাহতির হব্য ঢালিয়া
কছু কাঁদি, কছু হাসি।

অপপ্রচার রোধের পান্টা ব্যবস্থা।

শ্রীসন্তোষকুমার দে, এম. এ. (কলি:) ; এইচ. ডিপ. এড. (ডাবলিন)

আমাদের প্রচার ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল, ত্রুটিবিচ্যুতি-পূর্ণ ও শৈথিল্যযুক্ত। জ্ঞানবিজ্ঞানে উন্নত একটি শক্তিশালী দেশের প্রচার ব্যবস্থা যে রূপ হওয়া উচিত ভারতের প্রচার ব্যবস্থা সে দিক দিয়াও যায় না। এই প্রচার ব্যবস্থার অব্যবস্থার ফলে দেশের ক্ষতি যে কতদূর হইয়াছে ও হইতেছে তা বোধ হয় জাতীয় সরকার আজ কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়াছেন, তাই ভাড়াতাড়ি আমেরিকার নিকট একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বেতার-প্রেরক যন্ত্র সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু আগ্রহাতিশ্যের ফলে শর্তগুলি একটি স্বাধীন ও সার্ব-ভৌম দেশের উপযোগী কিনা তা ভাবিয়া দেখিবার সময় পান নাই। পরে ভাবিয়া দেখিবার সময় যখন পাইলেন, তখন দেখিলেন, ঐ সব শর্তে প্রেরকযন্ত্র লইলে আত্ম-সম্মানে আঘাত লাগে। ফলে প্রস্তাবটি ঐখানেই সমাধিলাভ করিল। গোড়া হইতে প্রচারের দিকে লক্ষ্য না রাখায় দেশের কি বিপুল ক্ষতি হইয়াছে, তা এখন সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন।

সরকার ভাবিয়াছিলেন চীন ও পাকিস্তানের মিথ্যা-প্রচার ধোপে টিকিবে না; কেননা নির্জলা মিথ্যা শাস্তত সত্যের স্থান অধিকার করিতে পারে না; তাই তারত বারবার 'সত্যমেব জয়তে'র উপর একান্তভাবে নির্ভর করিয়া কাল কাটাইয়া দিয়াছেন। মিথ্যা-প্রচার সফল হয় না, এরূপ চিন্তা দার্শনিকতার মধ্যে স্থান পাইতে পারে, কিন্তু বাস্তব জগতে তার স্থান নাই। নাৎসী প্রচারসচিব, ডাঃ গ্যরবেলের বাণী,—“মিথ্যা বারবার চাতুর্ঘ্যের সহিত জোর গলায় বলিতে পারিলে, সত্যে রূপান্তরিত হয়”—কেন যে ভুলিয়া গেলেন কেন্দ্রীয় সরকার, তা জানি না। তাই দেখা যাইতেছে, পাকিস্তানের সভ্যতাবিরোধী আচরণের বিবরণ ও বর্বরতা বিষয়ে বিশ্বের জনমত সংগঠন করিতে ভারত সরকার পারেন নাই; ফলে পদে পদে হইতেছেন অপদস্থ, আর বারে বারে শুধু আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে হইতেছে। আজ দীর্ঘ সতের বছর পরে এইসব

ত্রুটি-বিচ্যুতি খুব বড় হইয়া দেখা দিয়াছে এবং জাতিস্ব-নিরাপত্তাও বিঘ্নিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। সবেমাই মূলে রহিয়াছে এই প্রচারযন্ত্রের সার্বক কপায়ণের অভাব।

সরকারী প্রচারযন্ত্রের আয়োজন বিপুল। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচারদপ্তর আছে, তথ্যদপ্তর আছে এবং সর্বোপরি আছেন প্রচারমন্ত্রী; কিন্তু নাই প্রচার ও তথ্য-দপ্তরের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ নীতি নির্দেশ, নাই পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধের ব্যবস্থা। ফলে যে সংবাদ প্রচারিত হয়, হয় তা অতি বিলম্বে, নয়ত তা হইয়া উঠে পরস্পর-বিরোধী। ইহাতে শুধু প্রচারের সার্বকতাই নষ্ট হয় না, জাতীয় স্বার্থও নষ্ট হইয়া সরকারকে বিশ্ববাসীর কাছে উপহাসের সামগ্রী হইতে হয়। ত্রুটি-বিচ্যুতিযুক্ত প্রচার বিভাগ থাকা আর না থাকার মধ্যে যে কোন তফাৎ আছে তা বলিয়া মনে হয় না; বরং ত্রুটিপূর্ণ প্রচারযন্ত্র ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই বেশী করিয়া থাকে।

যুরোপ, আমেরিকার প্রচার ব্যবস্থার সহিত আমাদের প্রচার ব্যবস্থার তুলনা করিলে শুধু লজ্জাই পাইতে হইবে। তাঁরা প্রচার ব্যবস্থাকে সফল করিয়া তুলিবার জন্য শুধুই কঠোর পরিশ্রম করেন না, অজস্র অর্থব্যয়ও করেন। ফলে তাঁদের প্রচারবিদ্যা একাধারে আর্ট ও বিজ্ঞানে উন্নীত হইয়া উঠিয়াছে। প্রচারের দ্বারা সারা বিশ্বের মানুষের হৃদয় ও মন হরণ করিবার জন্য বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান সমস্ত তথ্যগুলি ইহাতে প্রয়োগ করিতেছেন। লাল চীনও প্রচারবিজ্ঞান কিছুমাত্র পশ্চাৎপদ নয়। সে আমেরিকা ও রাশিয়াকে এ বিষয়ে হুবহু অনুকরণ করিতেছে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও আফ্রিকাতে ভারতের বিরুদ্ধে প্রচারের জন্য অজস্র অর্থব্যয় করিতেছে। সংবাদে প্রকাশ শুধু ভারতের বিরুদ্ধে প্রচারের জন্য লাল চীন হিমালয় প্রদেশে ৬০টি বেতার প্রেরক যন্ত্র স্থাপন করিয়াছে এবং ইহাদের সমবেত শক্তি হইল খ্রিষ্ট হাজার ওয়াট; আর ইহার বিরুদ্ধে ভারতবর্ষ যে কটি বেতার যন্ত্র ব্যবহার

করিতেছে তা সর্বসাকুল্যে হইল পনের শত ওয়াটের বৈদ্যুতিক নথ; কাজেই আমাদের এ হাল হইবে না ত কার হইবে?

যাই হোক, এখন প্রচার ব্যবস্থার মূল কথায় আসা যাক। প্রচার পদ্ধতিকে সাধারণতঃ দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হইয়া থাকে। একটি হইল, শাস্তিকালীন প্রচার পদ্ধতি আর অপরটি হইল যুদ্ধকালীন প্রচার পদ্ধতি। শাস্তিকালীন প্রচার পদ্ধতি সাফল্যের সহিত পরিচালিত হইলে, যুদ্ধকালীন প্রচার পদ্ধতির পথ অপেক্ষাকৃত সরল ও সহজ হইয়া আসে।

লালচীনের সহিত ভারতের যুদ্ধ সাময়িকভাবে স্থগিত থাকিলেও এবং পাকিস্তানের সহিত ভারতের কোন বিবোধিত যুদ্ধ না ঘটিলেও, বর্তমানে অবস্থা যা দাঁড়াইয়াছে তা হইল স্নায়ুযুদ্ধ, তাই শাস্তিকালীন প্রচার ব্যবস্থার কথা আলোচনা না করিয়া যুদ্ধকালীন প্রচার ব্যবস্থার কথাই প্রথমে আলোচনা করিতেছি।

যুদ্ধকালে প্রচার ব্যবস্থাকে সার্থক ও সক্রিয় রাখিবার জন্ত সাধারণতঃ চারিটি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়া থাকে :

(১) শত্রু দেশের অধিবাসীদের বিভ্রান্ত করিবার জন্ত কিংবা তাহাদের নিকটে যে সংবাদ পৌঁছায় না সেগুলির পরিবেশন করিবার ব্যবস্থা। (২) বন্ধুভাবাপন্ন স্বাধীন দেশগুলিতে বিপক্ষ দলের লোকেরা যাহাতে তাহাদের সরকারকে প্রচারকারী দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামাইতে না পারে তাহার জন্ত ঐ সব সরকারের সহিত প্রচারকারী দেশের যে সব মৈত্রী-বন্ধন আছে সেগুলিকে দৃঢ় করিবার চেষ্টা করা। (৩) পূর্ণ নিরপেক্ষ দেশগুলিতে তথ্যমূলক ও যুক্তিসম্মত প্রচার এবং শত্রু কর্তৃক মিথ্যা প্রচারের বিরুদ্ধে নির্যম অভিযান। (৪) যুদ্ধকালে শত্রুর যুদ্ধরত সৈন্যদের দলভাগ করিতে প্ররোচিত করা এবং সেখানকার বিপক্ষদলের লোকদের নাশকতার কাজে উৎসাহিত করা প্রভৃতি।

এই সমস্ত কাজ সূচুভাবে সম্পন্ন করিবার জন্ত ইন্টার ডিপার্টমেন্টাল সাইকলজিক্যাল স্ট্র্যাটাজি বোর্ড স্থাপিত হয়। এই সংসদের পরিচালকমণ্ডলী প্রথম শ্রেণীর পত্র-

পত্রিকার সম্পাদক, বার্তাজীবী, লেখক, বৈজ্ঞানিক, বিশেষজ্ঞ, রেডিও ইঞ্জিনিয়ার, সাময়িক প্রচারক এবং বিভিন্ন বৈদেশিক ভাষাবিদদের লইয়া গঠিত হয়। এই সংসদের কাজ হইল, শত্রুদেশে প্রেরণের জন্ত ক্রটিশূন্য প্রচার-সূচী প্রস্তুত করা এবং প্রতি তিনমাস অন্তর এই প্রচার সূচী কিরূপ ফলপ্রসূ হইল তাহার সমীক্ষা গ্রহণ করা। আমাদের দেশেও এইরূপ একটি সংসদ স্থাপন করা প্রয়োজন।

চীনের সহিত যদি পুনরায় যুদ্ধ বাধিয়া যায়, তা হইলে সে দেশে যেসব অসন্তুষ্ট বিরোধী পক্ষ আছে, তাদের বেতংরযোগে জানাইতে হইবে যে, সেখানে অগণ্য জনসাধারণ কমিউনের অধীনে বন্দী কৃতদাস ছাড়া আর কিছুই নয়, তাদের আপন ইচ্ছা বা কর্ম বা স্বাধীন চিন্তা বলিষা কিছুই নাই। মুক্ত জগতের খোলা হাওয়ায় শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে তারা ভুলিয়া গিয়াছে। সরকারী পেষণ যন্ত্রে তারা নির্মমভাবে নিষ্পেষিত হইতেছে, অর্ধভুক্ত থাকিষা, চীরপরিহিত হইয়া, (চীনদেশে জীপুরুষ নির্বিশেষে সকলের পরিধেয় হইল নীল জীন কাপড়ের পাষাঙ্গা আর কুর্তা—আমেরিকানরা ইহাকে খালাসির সূচি বলেন এবং ইহাও বৎসরে উর্ধ্বসংখ্যা দুটির বেশী পাইবার অধিকার কারও নাই) তাহাদের উদয়াস্ত খাটিতে হইতেছে আর তার ফলভোগ করিতেছে উপরতলাব মুষ্টিমেয় দলনেতারা। তাদের দুঃখহৃদশার কথা যে বহির্বিশ্বের লোক জানে, সে কথা তারা জানে না; কাজেই এইরূপ প্রচারবাণী তাদের কানে পৌঁছাইলে তারা অস্বস্তি: এইটুকু বুঝিতে পারিবে তাদের ব্যথার ব্যথী বা তাদের কথা ভাবিবার লোকও বহির্বিশ্বে আছে। ইহাতে তাহারা উৎসাহিত হইবে।

কখনও বা সম্পূর্ণ বিভিন্ন স্তরে প্রচার করিতে হইবে। তাদের পুরান বন্ধুত্ব ও প্রীতির প্রতি আবেদন জানাইতে হইবে। জনসাধারণের উদ্দেশ্যে (সরকারকে নয়) বলিতে হইবে, যুগ-যুগান্ত ধরিষা ভারত ও চীনের মধ্যে যে প্রেম প্রীতি ও বন্ধুত্বের বন্ধন গড়িয়া উঠিয়াছিল, যা পারস্পরিক কষ্টের আদান-প্রদানে দৃঢ়ীকৃত হইয়াছিল, ভারত তাহার কথা আজও ভুলে নাই; আজও নানা বাধা

বিপত্তি সত্ত্বেও এবং চীন সরকারের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ অকস্মাৎ আক্রমণের কথা ভুলিয়া গিয়াও ভারতের জনসাধারণ সেই প্রাচীন পবিত্র বন্ধনের কথা মনে রাখিয়াছে, ভারত তথাগত শিখদের সহিত আজও বন্ধু-ভাবাপন্ন। ভারত জানে এ যুদ্ধে চীনের জনসাধারণের মত নাই—এ যুদ্ধ তাদের যুদ্ধবাজ সরকারের, সে সরকার চীনের অগণিত জনসাধারণের মঙ্গলের প্রতি উদাসীন; তাদের মুখের অন্ন কাড়িয়া লইয়া যুরোপের বাজারে বিক্রয় করিয়া করিতেছে যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ; তাই চাই এই সবকারের পতন ইত্যাদি।

ইহা ছাড়াও যুদ্ধকালে সাইকোলজিক্যাল ওয়ার-ফেয়ার ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংস্থায় থাকেন দেশের সেরা মনোবিজ্ঞানবিদ্রা। ইঁহারা শত্রুদেশে কিভাবে সাফল্যের সহিত প্রচারকার্য চালাইতে হয় তার পরিকল্পনা রচনা করেন এবং এই সংস্থার সহিত ইন্টার-ডিপার্টমেন্টাল সাইকলজিকেল ইন্সটিটিউট ডিপার্টমেন্টের সহযোগিতায় ঐ পরিকল্পনা চূড়ান্তভাবে রূপায়িত হয়। শত্রুদেশের লোকের মন জয় করিবার জন্ত, তাদের মন্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিবার জন্ত ঘণা, বিদ্বেষ, ভয় ও নানা রকম গুজবও মাঝে মাঝে ছড়াইয়া দিবার ব্যবস্থা করেন। উদাহরণ স্বরূপ দু'একটি গুজবের কথা এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। একটি দেশ আক্রমণ করিবার পূর্বে আক্রমণকারীরা বেতার মাধ্যমে মিথ্যা-মিথ্যা গুজব ছড়াইয়া দেন, তাঁদের অসংখ্য সৈন্য সীমান্ত প্রদেশে আসিয়া গিয়াছে, তারা বহুসংখ্যক গুপ্তচর পাঠাইয়া দিয়াছে। ফলে আক্রমণ-সম্ভব দেশটি ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া হয় আপোস মীমাংসার প্রস্তাব করে, নয়ত তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হইবার জন্ত অল্প সময় শান্তিকালীন এবং দেশোন্নয়নের পরিকল্পনার কাজ বন্ধ রাখিয়া প্রতিরক্ষা খাতে বহু অর্থ ব্যয় করেন, পরে যখন দেখেন বহু প্রতীক্ষিত আক্রমণ আর হইল না, তখন তাঁরা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় শৈথিল্য প্রদর্শন করিয়া আলস্বে কাল হরণ করিতে থাকেন; ঠিক তখনি আরম্ভ হইয়া যায় প্রচণ্ড আক্রমণ।

নয়া চীন হিমালয় সীমান্ত আক্রমণ করিবার পূর্বে

ঠিক এইভাবে প্রচার করিয়া দিয়াছিলেন যে, তার আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সৈন্য সংখ্যা হইল পঁচিশ কোটি এবং ১৯৬০ সালের পূর্বেই সে আণবিক বোমা বিস্ফোরণে সক্ষম হইবে। এই সব প্রচারের উদ্দেশ্য হইল ভারত সরকারের প্রাণে সন্ত্রাসের সঞ্চার করা, যাহাতে সে চীনকে অপরাধের মনে করিয়া আর তাহার সহিত অসম যুদ্ধে লিপ্ত না হইয়া বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু এত বড় মাত্রাতিরিক্ত মিথ্যা কোন কালেই সফল হয় না; কারণ সামরিক বিভাগ তো দূরের কথা সাধারণ বুদ্ধিবিশিষ্ট লোকও বিশ্বাস করিতে পারে না যে, চীনের এইরূপ বৃহৎ সৈন্যদলকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করা তো দূরের কথা প্রত্যেককে একটি করিয়া গাদাবন্দুক দিবার মতনও অর্থবল নাই। আর আণবিক বোমার বিষয় বলা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে চীন দুই চারিটি আণবিক বিস্ফোরণ ঘটাইলেও ঘটাইতে পারে এবং তাহা কিছুমাত্র কঠিন নয়; কিন্তু আণবিক যুদ্ধ যে পরিমাণে ব্যয়বহুল এবং মহাকাশে, মহাসমুদ্রে এবং ভূগর্ভে তাহার বিস্ফোরণের পরীক্ষা নিরীক্ষা এত সময় ও অর্থসাপেক্ষ যে, তা চীনের মতন দরিদ্র ও শিল্পায়ণে অনগ্রসর দেশের পক্ষে সাফল্যের সহিত পরিচালিত করিবার কল্পনা করাও দুষ্কর। তা ছাড়াও আণবিক বিস্ফোরণ আর আণবিক যুদ্ধ, দুটি এক জিনিস নয়; কারণ আমেরিকা, রাশিয়া, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশগুলি আণবিক অস্ত্রসজ্জায় এত অগ্রসর এবং পৃথিবীর সর্বত্র যেভাবে তারা রকেট বাটি নির্মাণ করিয়াছে যে চীনকে তারা বোমা ফেলিবার অবসরই দিবে না; আন্তঃপ্রাদেশিক স্বেচ্ছাশ্রমের সাহায্যে চীনের আণবিক বোমাবাহী বিমান মধ্যপথেই বিধ্বস্ত হইবে। চীনের বিরুদ্ধে প্রচারের জন্ত চীন হইতে পলাতক ও ভারতে শরণার্থী চীনা বা যে সমস্ত চীনা কমিউনিষ্ট—স্বর্গ সুখের আশায় স্বদেশে গিয়া আশাহত ও মোহমুক্ত হইয়া আবার ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহাদের সংগ্রহ করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন; কারণ তারা স্বদেশের দুঃখময় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থার পটভূমিতে চীনের বাহিরে যে কোন গণতান্ত্রিক দেশে তাদের অবস্থা যে কত উন্নত ও সুখময় তা তারা

ভালভাবেই বর্ণনা করিতে পারিবে এবং এইভাবে রুদ্ধ-
যবনিকার ভিতর ফাটল ধরান সম্ভবপর হইবে।

কখনও কখনও বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্ত প্রচার করিয়া
দেওয়া হয়, নাকশকতা কাজে সাহায্য করিবার জন্ত শত্রু
দেশের মধ্যেই পঞ্চমবাহিনী সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং
তারা প্রস্তুত হইয়া আছে। এইরূপ প্রচারে গৃহযুদ্ধের
সময় স্পেনের অবস্থা সাংঘাতিক হইয়া উঠিয়াছিল।
প্রচার হওয়া মাত্র বহু মন্দেহভাজন যুবকের সহিত বহু
নির্দোষ লোকও জেনারেল ফ্রান্সো কর্তৃক হত্নন
নয় ত দীর্ঘকালের জন্ত কারারুদ্ধ হইয়াছিল এবং দেশের
যুবসম্প্রদায়কে ভয় ও সন্ত্রাসের মধ্যে কাল কাটাইতে
হইয়াছিল।

চীন যদি পুনরায় ভারত আক্রমণ করে এবং কোন
কোন যুদ্ধক্ষেত্রে চীনের অবস্থা সঙ্কটজনক হইয়া পড়িয়াছে
জানিতে পারিলে ভারতীয় রেডিও প্রচার করিবে :
“তোমাদের অবস্থা অতি সঙ্গীন, যদি এখনও অস্ত্র ত্যাগ
করিয়া আত্মসমর্পণ কর তা হইলে সম্মানিত যুদ্ধ বন্দী
হিসাবে তোমাদের সহিত ব্যবহার করা হইবে, আর
যদি বৃথা যুদ্ধে ক্ষান্ত না হও তা হইলে তোমাদের মৃত্যু
অনিবার্য।” এইভাবে বিভ্রান্তিকর প্রচার অনেক সময়ে
সাফল্যমণ্ডিত হয়।

টিক অম্লরূপভাবে পূর্ব পাকিস্তানে প্রচার করিতে
হইবে—হিটলারের ঘে-ভূত আয়ুব খাঁর উপর ভর
করিয়াছে, তাহাকে পাকিস্তানের লোকদেরই ওঝা হইয়া
তাড়াইতে হইবে। পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের
উপনিবেশে পরিণত হইতে চলিয়াছে, বাঙালী
মুসলমানের আত্মসম্মান ইহাতে আহত হইবে, তাহাদের
ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে, তাহাদের রুজি-
রোজকারের ব্যবস্থা থাকিবে না, মতামত প্রকাশ
করিবার স্বাধীনতা থাকিবে না, তাহাদের ভাষা, সাহিত্য,
কৃষ্টি ও চিন্তাধারা মিলিটারি বুটের তলায় নিত্য

নিষ্পেষিত হইবে; বাঙালী মুসলমান যেন একথা
ভালভাবে ভাবিয়া দেখেন।

বর্তমান যুগে বিজ্ঞানসম্মতভাবে এবং সতর্কতার
সহিত প্রচারকার্য চালাইতে হইলে, সর্বাপেক্ষে প্রয়োজন
প্রচার বিভাগকে চালিয়া সাজা; কারণ প্রচার বিভাগের
শক্তি ও সামর্থ্য একান্তভাবে নির্ভর করে বিশেষভাবে
শিক্ষাপ্রাপ্ত বিভাগীয় পরিচালকদের কর্মকুশলতার উপর।
তারপর প্রয়োজন অন্ততঃ পনের শত ওয়াটের একটি
শক্তিশালী বেতার-প্রেরক যন্ত্র। এইরূপ একটি শক্তি-
শালী যন্ত্র সংগ্রহ করার পর দেশের সেরা বৈজ্ঞানিক ও
প্রচারকুশলী ব্যক্তিদের সাহায্যে কার্যকরী প্রচার-সূচীর
ব্যবস্থা করিয়া দূর ও নিকট প্রাচ্যে এবং সমস্ত স্বাধীনতা-
প্রাপ্ত আফ্রিকার দেশসমূহে এই প্রচারবাণী প্রেরণের
ব্যবস্থা করিতে হইবে।

হয়ত বলিবেন, ইহাতে লাভ কি হইবে? ভারতীয়
প্রচার-সূচী চীন ও পাকিস্তান একই শব্দতরঙ্গের উপর
বিভিন্ন শব্দতরঙ্গ প্রেরণ করিয়া প্রচারকর্মকে ব্যাহত
(জ্যাম) করিয়া দিবে। ইহা হইল ইলেক্ট্রো-
ম্যাগনেটিক ওয়ারফেয়ারের কথা। ইহার বিরুদ্ধে
আত্মরক্ষা করিবার কোন কৌশল আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত
হয় নাই। তবে একটি পথ আছে। সেটি হইল,
প্রচার-সূচী ২৪ ঘণ্টা প্রেরণ করার ব্যবস্থা। ঐরূপ
করিলে কোন না কোন ফাঁকে প্রচার-সূচী কিছু না কিছু
শত্রুদেশে পৌঁছাইবে।

ভারতবর্ষকে বাঁচাইতে হইলে, সরকারের ওদাসীভূত
ও আত্মতুষ্ট মনোভাব পরিত্যাগ করিয়া সারা বিধে
ভারতের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ প্রচার চলিতেছে তাহার
বিরুদ্ধাচরণ করিতে হইবে। শত্রুর কার্যকলাপের উপর
অতন্ত্র দৃষ্টি রাখিয়া অকস্মাৎ বিপর্যয় সৃষ্টির সম্ভাবনাকে
অন্ধুরে বিনাশ করিতে হইলে আমাদের প্রচার যন্ত্রকে
সজীব, সক্রিয় ও শক্তিশালী করিয়া তুলিতেই হইবে।



ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି



এসেছে। কাজেই এদের দুই দলের হকি খেলাটুকু বাদ দিয়ে যা কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা ও উত্তেজনার উৎস হয়ে থাকে ফুটবল খেলোয়াড়দের ক্লাব অদল বদল নিয়ে। ১৫ই মার্চ এই সব অদল বদলএর শেষ দিন। দলের ভাল খেলোয়াড়দের দলে রাখার চেষ্টা এবং বাইরের দল থেকে খেলোয়াড় ভাঙ্গিয়ে নিয়ে নিজের দলভূক্ত করার কাজ চলছে পুরোদমে। এই পর্য্যন্ত সব থেকে বড় খবর এ বিষয়ে হোলো ইষ্টার্ন বেল ও ভারতের গোলরক্ষক পি. বর্ধন-এর মোহনবাগানে এবং ঐ রেলেরই ভারতীয় দলের প্রশান্ত সিংহের ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবে যোগ দেওয়া। আরও কত অদল বদল হবে ১৫ই মার্চের ভিতর কেউ জানে না। ফুটবলের আলোচনাই হোলো হকি মাঠের প্রধান আলোচনা। কেননা মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গল এমন শক্তিশালী হকি দল গড়েছে যে, অল্প কোনও দলের কাছে এদের হারের কোনও প্রম্নই ওঠে না। এদের দুই দলের খেলার একমাত্র আলোচ্য বিষয় হল কার কত গোলে জিত হল। এদের তুলনায় অত্যন্ত দল অনেক কমজোড়ী হওয়ায় হকি লীগস্বয়ের চূড়ান্ত খেলা হবে মোহনবাগান বনাম ইষ্টবেঙ্গলের খেলাতেই, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। অত্যন্ত দলের সঙ্গে এই দুই দলের খেলা প্রায় একঘেয়ে হয়ে উঠেছে। বাইটন কাপের খেলা শুরু হলে প্রকৃত পরীক্ষা হবে এদের শক্তিমত্তার। তার আগে নয়।

এর মধ্যে হকির আর একটি উল্লেখযোগ্য খবর হোলো জাতীয় প্রতিযোগিতায় খেলার জুজু বাঙ্গলার দল নির্বাচিত হয়ে গিয়েছে। বহু ভাল ভাল ভারতীয় খেলোয়াড়দের সমাবেশ কলকাতায় হওয়ার মনে হয় বাঙ্গলার দল এ বৎসর বেশ শক্তিশালী হয়েছে। ভারতীয় অলিম্পিক দলের অধিনায়ক প্রখ্যাত খেলোয়াড় কুড়িসের শিক্ষাধীনে এই দলকে আরও শক্তিশালী করার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। জাতীয় প্রতিযোগিতা এ

বংসুর দিল্লীতে অস্থিষ্ঠিত হচ্ছে। বাঙ্গলার দলের হয়ে
যারা নির্বাচিত হয়েছে তারা হোলো—

গোল— ক্রিষ্টি (মোহনবাগান)

পি. কাপুর (ইষ্ট বেঙ্গল)

ব্যাক— গুরুবক্স সিং (কাষ্টমস)

চতুর্বেদী (কাষ্টমস)

দলজিৎ সিং (ইষ্ট বেঙ্গল)

হাফ ব্যাক— সারসুদ্দিন (মোহনবাগান)

আর. সা (মোহনবাগান)

কুশলকুমার (ইষ্ট বেঙ্গল)

ইকবাল (ইষ্ট বেঙ্গল)

ফরোষার্ড— বীর সিং (ইষ্ট বেঙ্গল)

যোগিন্দ্র সিং (ইষ্ট বেঙ্গল)

ইয়াসিন চৌধুরী (মোহনবাগান)

ইনামুর রহমান (মোহনবাগান)

আফ. জন (মোহনবাগান)

বি. প্রধান (কাষ্টমস)

সৈয়দ আলি (কাষ্টমস)

স্টাণ্ড বাই— আরুল (কাষ্টমস), দলজিৎ (কাষ্টমস),

রবি (এরিসাল), সৈয়দ (মোহনবাগান)

ও ডি. ঘোষ (ইষ্টার্ন রেল)

ক্রিকেট খেলা শেষ হোলো। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট
খেলার কথা বলছি। অর্থাৎ ইংলণ্ড ও ভারতের খেলা
শেষ হয়েছে। পাঁচটি টেষ্ট খেলাই সমান সমান ভাবে
শেষ হওয়ায় ভারতই রাবার (Rubber) রাখার অধিকারী
হয়েছে, কেননা এর আগের টেষ্ট খেলায় ডেক্সটারের
দলকে পরাজিত হতে হয়েছিল ভারতের কাছে। ইংলণ্ড-
এর দল এসেছিলো অনেক দামামা বাজিয়ে। বাজিমাত
করে নিয়ে বাবে এবারে আমাদের হারিয়ে। কিন্তু
তাদের এটুকু অভিজ্ঞতা, আশা করা যায়, এধারে হয়েছে
যে আমাদের হারাতে হোলো এখন আর একদম প্রথম
শ্রেণীর খেলোয়াড় না হলে চলবে না। এখন আর
আমাদের খেলোয়াড়রা Price বা Larter-এর মত
ফাষ্ট বোলারকে ভয় করে না। Trueman, Statham-
এর মত বোলারদেরও এরা এখন খেলতে পারবে এই

আমার বিশ্বাস। এর প্রধান কারণ আমাদের দলের
খেলোয়াড়দের গড়পড়তা বয়স হিসেব করলে দেখা
যায় যে, এর চেয়ে অল্পবয়স্ক ভারতীয় ক্রিকেট দল বোধহয়
এর আগে আর খেলেনি। মনের দৃঢ়তা এবং সাহস
বয়সের উপর যে অনেকাংশে নির্ভর করে সে বিষয়ে
সকলেই একমত।

খেলায় ইংলণ্ডের অবদান ও তাদের ঐতিহ্য
অবিস্মরণীয়। কাজেই তাদের উষ্ঠি খেলোয়াড়দের
সঙ্গে সমানে পাল্লা দিবে যখন আমাদের জয়সিংহা,
কুন্দরাম, সরদেশাই, পাতোদি, হুম্মন্ত সিং, নাদুকারনী,
ডুরানী ইত্যাদি খেলোয়াড়রা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে তাতে
সত্যিই আনন্দে ভরে উঠেছে মন। আরও আনন্দ
হয়েছে দেখে যখন প্রথম টেষ্টের পরেই ওরা বুঝতে
পেরেছে যে, তাদের দল আরও শক্তিশালী না করলে
নিশ্চিত পরাজয়ের হাত থেকে তাদের রক্ষা নাই।
পৃথিবীর অল্পতম সেরা খেলোয়াড় কাউডেকে আনতে
হয়েছে পরে। তাও এঁটে উঠতে পারেনি। আমাদের
কুন্দরাম, জয়সিংহাই Bright Cricket তাদের
দেখিয়েছে। আমাদের নবীন খেলোয়াড় সারদেশাই,
কুন্দরাম, চন্দ্রশেখর, হুম্মন্ত সিং অতি যোগ্যভাবে তাদের
জায়গা করে নিয়েছে ভারতীয় দলে। আরও কিছু
তৈরী হয়ে আছে এগিয়ে এসে এই দলে ভর্তি হওয়ার
জন্ত। আমার নিজের মনে হয়, গায়কোয়াড় ও
ওয়াদেকারও সুযোগ পেলেই এই যোগ্যতা অতি নিশ্চয়
ভাবে দেখতে পারবে। প্রয়োজন আমাদের এখন দুটি
সত্যিকারের ফাষ্ট বোলারের। এই দুটি হলেই আমাদের
দল এখন পৃথিবীর যে কোনও দলের বিপক্ষে সম্মানের
সঙ্গে লড়াইতে পারবে এ বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। কেননা
পঞ্চম বা শেষ টেষ্টের কথা ছেড়ে দিলে আমরা দেখতে
পাই যে, অল্প সব বটি টেষ্ট খেলাতেই ভারতীয় দল
ইংলণ্ডের চেয়ে অনেক দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিং দেখিয়েছে এবং
তাদের এই চারিটি খেলাতেই পরাজয়ের সম্ভাবনার
কথাও ভাবিয়েছে—কাজেই ভারতীয় ক্রিকেটের এটা
একটা বিশেষ স্মরণীয় অধ্যায় বলেও হয়।

ক্রিকেট খেলায় যে কথাগুলি বন্ধাম তা কিন্তু ভারতীয়

টেনিস্ সম্বন্ধে বলতে পারছি না। আজ কয়েক বছর থেকে রামাগমান, কৃষ্ণাণ আমাদের টেনিসের একজন সম্রাট হয়ে আছে। গত দশ বৎসরের মধ্যে তাকে হারাবার মত তো দূরের কথা তার কাছাকাছি পৌঁছানোর মত কোনোও ভারতীয় খেলোয়াড় তৈরী হলো না। কৃষ্ণাণের পরেই জয়দীপ মুখার্জি ও প্রেমজিতলাল। কিন্তু গত এশিয়ান চ্যাম্পিয়ানশিপের চূড়ান্ত খেলায় কৃষ্ণাণের কাছে জয়দীপের এবং কৃষ্ণাণ ও নরেশকুমারের কাছে জয়দীপ ও প্রেমজিতলালের শোচনীয় পরাজয় দেখে একেবারে হতাশ হয়ে গেছি আমরা। আমেরিকায় ও অষ্ট্রেলিয়ায় প্রায় সমপর্যায়ের কয়েকজন খেলোয়াড় এক নম্বরের খেলোয়াড়ের জায়গা দখল করার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আসছে বছরের পর বছর। আমাদের এক নম্বর ও দু' নম্বরের খেলোয়াড়ের খেলার মানের যে আকাশ পাতাল তফাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি এ আর ঐ সব দেশের খেলোয়াড়দের মধ্যে দেখা যায় না। কৃষ্ণাণ ভারতীয় টেনিসের মর্যাদা বাড়িয়েছে কিন্তু আর

একটুখানি যেটা আশা করা গিয়েছিল তা সে পারেনি। তার জন্য দায়ী দেশে তার সমপর্যায়ের খেলোয়াড় না থাকা। স্থানচ্যুত হবার ভয় থাকলে কৃষ্ণাণ নিশ্চয় আর একটু বেশী মন দিয়ে তার বিদেশে খেলার অভিজ্ঞতা আহরণ এবং কাজে লাগাবার চেষ্টা করতো এবং তাদের সঙ্গে অমুশীলন করে নিজের খেলার মান উঁচুতে রাখতে পারতো। কিন্তু কৃষ্ণাণের সমকক্ষ আরও খেলোয়াড়ই বা আমাদের দেশে হবে না কেন সে কথা ভাববার আমাদের টেনিস কর্তৃপক্ষদের সময় এসেছে। একা কৃষ্ণাণই আমাদের এশিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্মান এনে দিয়েছে অনেকবার। পথে অনেক এশিয়ার বাইরের বিদেশী খেলোয়াড়দের হারিয়েছে। কিন্তু কৃষ্ণাণের পরে এখনও টেনিস আমাদের দেশে আভিজাত্যের গণ্ডী দিয়ে ঘেরা। সেই গণ্ডী ভেঙ্গে দিয়ে স্কুল কলেজের সাধারণ ছেলেদের মধ্যে এই খেলার প্রচার না করলে ওই দশ বিশ বছর বাদে বাদে একটা মহম্মদ শিম্‌স, ঘাউস্ মহম্মদ বা একটা কৃষ্ণাণ নিয়েই সম্বন্ধ থাকতে হবে। (১০-৩-৬৪)

ইরাবতী

শ্রীমতীশ মজুমদার

প্রাগ-ঐতিহাসিক রহস্যবৃত্ত তুমি
আজ তোমায় মুখোমুখি দেখলাম
আজ ওরা এপ্রিল...।
বিশ্বের অবস্ফুর্তনে
আর ঝড়ের ইসারায়
তুমি যেন স্পষ্ট হয়ে উঠলে।
সেই অনেক...অনেক আগে
স্বচ্ছ দৃষ্টির গভীরতায়
বুঝি, মুক্ত-পাথরের ইঙ্গিত ছিল...
নীল-আকাশের নীলিমায় বুঝি তাও
হারালো।—
তুমি কি—
আর কি তুমি নও
সেইটাই যেন স্পষ্ট হয়ে উঠলো।
আজকের প্রকাশ
সে এক অভাবনীয়...

অগ্নি আর রহস্যের জ্বল কোথায় হারিয়ে গেল।
রক্তের আধরে শুধু লেখা রইলো
পথ চলতে পথের মুহূর্তগুলো।
তারপর...
তারপর ভেসে গেছি ভাবনার স্রোতে
অশাস্ত তোমারি উদ্বেগ-স্রোতের মত
সেই প্রাক পৌরাণিক আরণ্যক-পদধ্বনি...
পর্কিত শিখরে আর রাজির অন্ধকারে
অস্পষ্ট ছায়ার মত এগিয়ে চলে...
দেখি তোমায় মধ্যবর্তী সীমায়
সেখানে তুমি উদ্ভাস্ত আর দিশেহারার মত
ছুটে চলেছ...
শুধু ছুটেই চলেছ অলঙ্কার পানে...।
ঘুম নেই...
ঘুমন্ত স্বপ্নগুলোও বুঝি হারিয়ে গেল।

সম্প্রদায়িকতা

ভারত-জাতীয়তা তথা গান্ধীবাদ :

জাতীয় কংগ্রেসের প্রায় আশী বছরের স্বদেশ-সাধনা ও পূর্ণ-স্বরাজ সংগ্রাম আজও যে অপূর্ণ ও অসিদ্ধ রহিয়া গিয়াছে, ইহা সকলেরই উপলব্ধ অভিজ্ঞতা।

ভারতের ঋণিত রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আসিয়াছিল তিনটি কারণে : ভারতের অভ্যন্তরে মহাত্মা গান্ধীজির অহিংস অসহযোগ আন্দোলন, বাহিরে নেতাজীর সশস্ত্র অভিযান, আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তথা হিটলারের অভ্যুত্থান ও ব্রিটিশের ভগ্ন-মেরুদণ্ড।

গান্ধী-প্রভাবিত কংগ্রেসের স্বরাজসাধনার গঠনমূলক ভিত্তি ও নীতি ছিল তিনটি : হিন্দু-মুসলমান ঐক্য, অস্পৃশ্যতা বর্জন ও অহিংস অসহযোগিতা। ১৯২০-১৯৬৪ এই চল্লিশ বৎসরে মহাত্মার আদর্শবাদের চরম ব্যর্থতা ও মর্ধ্যান্তিক পরিণতির ইতিহাস আজ আমাদের চোখের সামনে জ্বলজ্বলমান।

॥ হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ॥

হিন্দু-মুসলমান ঐক্য-সাধনার সিক্করূপ পাকিস্তান আর বিজ্ঞাতি-তবের ভিত্তিতে ভারত-খণ্ডন। ১৯২০-এ মহাত্মার খিলাফত আন্দোলন আশ্রাণ সমর্থনের সঙ্গে হিন্দু মুসলমান ঐক্য-প্রচেষ্টার স্তারস্তু, আর ১৯৪৭-এ পাকিস্তান-সৃষ্টির মধ্যে ইহার বিষময় পরিণতি। পরের বৎসরই ১৯১১-এ এই খিলাফত আন্দোলন-সমর্থনের পুরস্কারস্বরূপ লাভ হয় মালাবারের নৃশংস মপ্লা অত্যাচার। এই একতরুফা হিন্দু-নিধন, নির্যাতন, লাঞ্ছনা ও হিন্দু-নারী ধর্ষণ সমানেই চলিতে থাকে। ১৯৪০-এ সিক্কর ব্যাপক নৃশংসতম ‘অকুর-হত্যাকাণ্ড’ও মহাত্মাজীর হিন্দু-মুসলমান ঐক্যপ্রচেষ্টার ধরণ-ধারণ ও সম্ভাবনীয়তা সন্দেহে কোন চৈতন্য উদয় করিতে পারে নাই। তারপর কলিকাতা, নোয়াখালি এবং তারও পরে স্বাধীন ভারতে মহাত্মাজীর নির্দোষিত উত্তরাধিকারীর আমলে আজ এই মুহূর্ত পর্যন্ত একতরুফা হিন্দুনিধন, হিন্দু উৎসাদন ও হিন্দুনারী-লাঞ্ছনার অবাধ বীভৎসলীলা তাঁর মহতী হিন্দু-মুসলমান ঐক্য-প্রচেষ্টার সাক্ষ্য বহন করিয়া চলিয়াছে। হিসাব করিবা দেখিলে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতে হয় যে, গান্ধী-প্রভাবিত কংগ্রেসী আমলে যত হিন্দু কেবলমাত্র মুসলমানের হস্তে নিহত হইয়াছে, কোন যুদ্ধেও তাহা হইত কিনা সন্দেহ। আরও মর্ধ্যান্তিক এই যে, ভারত-স্বাধীনতার প্রধান অবদান এই হিন্দুস্থানের হিন্দুরই। ভাগ্যের অদ্ভুত পরিহাস এই যে, মহাত্মাজীর

হিন্দু-মুসলিম ঐক্যনীতির যুগকাঠে প্রধান বলী পড়িয়াছে বাঙালী, বিশেষতঃ বাঙালী হিন্দু—যে বাঙালী একদা বিশ্বভ্রাম্য বৃটিশসিংহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অসীম সাহসিকতা দেখাইয়াছে—যে বাঙালী জীবনের জয়গান গাহিতে-গাহিতে হাসিতে-হাসিতে কাসিকাঠে প্রাণদান করিয়াছে—যে বাঙালী সাম্য ও সমধর্মী সাধনার উত্তরাধিকারী।

তাহা হইলে মহাত্মাজীর এই ঐক্য-প্রচেষ্টার গোড়ায় নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও গলদ আছেই আছে। মহাত্মাজীর এই ঐক্য প্রচেষ্টার অশোভনীয় আগ্রহ সম্পর্কে নেতাজী যথাসময়ে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন : “Unity should not be carried beyond a certain point. Unity is certainly desirable but only when there is agreement in principle and policy.” হিন্দু-মুসলিম ঐক্য-সাধনে এই মাত্রাজ্ঞানের অভাব মহাত্মাজীর বাস্তব বেনিয়া বুদ্ধি, সাহস, বীর্য ও নব নব উদ্ভাবনী স্বেগ ততটা অনিষ্টকারী হইতে দেয় নাই, যতটা তাঁর উত্তরাধিকারী নেহেরুর গণতন্ত্রকে দুর্বল ও দিশাহারা করিয়া তুলিতে পারিয়াছে।

॥ মহাত্মাজীর অস্পৃশ্যতা ও সাম্প্রদায়িক নীতি ॥

বস্তুতঃ প্রাক্ গান্ধী-কংগ্রেসের কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার মধ্যে সশস্ত্র ইংরাজশক্তির বিরুদ্ধে মহাত্মাজীর বিকল্প পন্থা ‘অহিংস অসহযোগ’ রাজনৈতিক অস্ত্র ছাড়া মোক্ষলাভের কোন উপায় ছিল না নিশ্চয়ই। হিন্দু-মুসলিম ঐক্য, অস্পৃশ্যতা বর্জন, খদ্দর, চরকা, অহিংস অসহযোগ—এ সবই অথবা ভারতজাতীয়তার সংগঠনের আত্মকূল্যের জ্ঞান হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জ্ঞানে-অজ্ঞানে আসল লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া মহাত্মাজীকে ব্যক্তিগত আদর্শ ও প্রতিষ্ঠার মোহ পাইয়া বসিয়াছিল। ফলে তিনি স্বাধীনতা বা জাতীয়তার উপরেও প্লেটো-টলষ্টয়-জৈন-বৌদ্ধ মতবাদসম্মত সত্য অহিংসা এবং হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রভৃতি লইয়া মাত্রাতিরিক্ত মাতামাতি করার ফলে কোনটিই সুফলপ্রসূ হইতে পারে নাই। দ্বিতীয় ‘রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সে’ মহাত্মাজী অস্পৃশ্যতাকে আইনসম্মত করার বিরুদ্ধে মৃত্যুপণ করিয়া আসার পর-পরই ১৯৩২-এ গান্ধী-আবেদনকর চুক্তির দ্বারা তিনি এই অস্পৃশ্যতাকেই স্থায়ী প্রতিষ্ঠা দিলেন। এই আবেদনকরই নেহেরু ক্যাবিনেটে পদচ্যুতির পরই নিজে ও তাঁর লাঞ্চ দেশক অস্পৃশ্য অসুগামীদের লইয়া বৌদ্ধধর্মাবলম্বন করিয়া মহাত্মাজীর অস্পৃশ্যতা ক্যাডের (fad) মুখে চুণ-কালী মাখাইয়া ধরিয়া হইতে বিদায় লইলেন। আজ মনে হয়, মহাত্মাজী যদি এই অস্পৃশ্যতা লইয়া বাড়াবাড়ি না করিতেন, তাহা হইলে অন্ততঃ এই বিপুল হিন্দু জনসমষ্টি ধর্মান্তর গ্রহণ করিত না।

মহাত্মাজীর অস্পৃশ্যতা বা সাম্প্রদায়িক বৈষম্যের সাম্যসাধন নীতির মূল ছিল অত্যন্ত অগভীর, নৈতিক ও মানসিক। তার শ্রেণীহীন সমাজ সংগঠনের স্বপ্নও মানসিক ও মনসম্বন্ধ বোধ-প্রতিষ্ঠা। এ বিষয়ে তাঁর একগুঁয়েমি মনোভাবের জ্ঞাত কথ্যাত ‘কমিউন্যাল এণ্ডয়ার্ডকে’ স্বীকার করিয়া লইতেও তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হন নাই এবং মুসলিম নেতৃবৃন্দের মনস্তত্ত্ব সাধনে শোভনীয়তার সীমা পর্য্যন্ত অতিক্রম করিতেও কুষ্ঠা করেন নাই। বস্তুতঃ এ বিষয়ে তাঁর বিবেক জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতৃবৃন্দের নিকট একরকম বন্ধক তিনি দিয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ১৯৩৮-এর ২৪-এ আগষ্ট তারিখের এক পত্রে মহাত্মাজী মিঃ জিন্নার নিকট লিখিয়াছিলেন : “So far as I am concerned on the Hindu Muslim question I was guided by Dr. Ansari Now that he is no more in our midst, I have accepted Abul Kalam Azad as my guide”.—বৃহত্তর নীতির বিসর্জন দিয়া জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতৃবৃন্দের উপর মহাত্মাজীর নির্বিচার নির্ভরতা সেদিনও যেমন ভারত খণ্ডন রোধ করিতে পারে নাই, আজও তেমনি জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতৃবৃন্দের মুসলিম জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তারের তেমন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। ভারতাত্তিরক্ত আত্মগত্যা নিশ্চয়ই ভারত-জাতীয়তার গরিপোষক নহে।

মহাত্মাজী-প্রভাবিত কংগ্রেসের এই সাম্প্রদায়িক রোঁয়েদাদ সম্পর্কে অমুকুল দৃষ্টিভঙ্গী সে-সময়ে সূভাষ ও জহরলাল কেহই প্রসন্ন মনে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ১৯৩৬-এর ২রা জুন পণ্ডিতজী লাহোর হইতে এক বিবৃতিতে তাঁর অন্তরবেদনা প্রকাশ করেন : “It has been a great surprise and regret to me that many of our Muslim friends and comrades who have stood Indian Independence, should so approve the pernicious decision.” সূভাষচন্দ্রও এই সময়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে এক পত্রে জানান : “The constitution which is based not on the principle of unification but on the principle of division is pernicious evil.” সূভাষচন্দ্র এই পত্রেই মহাত্মাজীর মুসলিম তোষামোদের কথা একরকম স্পষ্ট করিয়াই লিখিয়াছিলেন : “It is now the open secret that the Congress policy on this point was dictated by desire to placate Dr. Ansari and the nationalist Muslims.”

মহাত্মাজী তাঁর মাত্রাতিরিক্ত মুসলিম-তোষণনীতির

দ্বারা পাকিস্তান সৃষ্টিতে অপ্রত্যক্ষভাবে আত্মকল্যাণ করেন নাই, তাঁর জীবনের শেষ পর্য্যন্ত ইহা পুষ্ট করিয়া গিয়াছেন। এই গান্ধীবাদীষ ঐতিহ্যে আচ্ছন্ন মানস পণ্ডিত নেহরুর রাষ্ট্রপরিচালনার তিক্ত অভিজ্ঞতা ভারতবাসী, বিশেষ বাঙালী প্রতিদিন ভোগ করিতেছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীচাগলাও বিবাহাদি আইন-কাহনের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক নীতির অসমপ্রয়োগের অকল্যাণকারিতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। সূত্রাং নেহরু-নিয়ন্ত্রিত কংগ্রেস-নীতির আমূল পরিবর্তন সাধন করিয়া গণতন্ত্রকে ভারত জাতীয় প্রতিভার আত্মকল্যাণে ঢালিয়া সাজিতে হইবে। গান্ধী-নেহরু কংগ্রেসের প্রধান অবদান গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক সংবিধান। গণমত সংগঠন করিয়াই বর্তমান কংগ্রেসের রীতি-নীতি, মত-পণের রূপান্তর-সংশোধন করার অধিকার জনগণেরই আছে। ভারতের রাষ্ট্রীয় নীতিকে সুস্থ ও সবল করার ইহাই হইবে প্রাথমিক ধাপ।

॥ কংগ্রেসের অহিংসনীতি ॥

যে কয়টি মহনীয় জীবন-নীতির জ্ঞাত মোহনচাঁদ করম-চাঁদ গান্ধীর মহাত্মা হিসাবে প্রতিষ্ঠা তার প্রধানতম ছিল অহিংসা (Non-violence)। অ-মুসলমান ভারত রক্ত-গঙ্গাস্রাবের মধ্য দিয়া মহাত্মাজীর অহিংসনীতির মহিমা হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছে এবং স্বাধীনতা লাভের পরও বুঝিতেছে। হিংসার আশুনে পুড়িয়া অহিংসার ধ্বি হা-রাম বলিতে বলিতে প্রাণ বিসর্জন দিয়া চিরকালের জ্ঞাত অরণীর হইয়া রহিলেন, ইহা সত্য ; কিন্তু জীবনে তিনি যে অহিংসা ও মৈত্রীর আলো জ্বালাইয়াছিলেন তাহা তাঁহার অবদানের সঙ্গে-সঙ্গেই চিরতরে নিভিয়া গিয়াছে। গান্ধী-নীতির ধারক ও বাহক পণ্ডিত নেহরু লোকসভাষ (১৯৫৫, ২৬-এ জুলাই) এই অহিংস নীতিকে কার্যকরী করা সম্ভব নয় তাহা পরিষ্কার বলিয়া দিবেছেন : “As far as I can conceive, under the existing circumstances, no Government can be pledged to non-violence ...one may have an ideal, one may adhere to a policy and yet, because of existing circumstances, one can not give effect to that ideal.” রাষ্ট্রকর্ণধার হিসাবে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিতজীরই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যে, ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে অহিংসনীতির উপযোগিতা থাকিলেও বাস্তব ও ব্যাপক রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে উহা অচল। রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে অহিংসার কোন বিকল্প নীতিও শ্রীনেহরুর জানা নাই। আত্মবশাহীর মত নির্জলা মিথ্যা ও হিংসা তাঁর স্বভাবগত নহে। বিপ্লবী মনোভাবের মাহুও নেহরুজী

নছেন। গান্ধীজী বা নেতাজীৰ বিদ্যুৎবীৰ্য্য (dynamism) তাঁর চরিত্রে নাই। বাহারই ফল 'ন যথৌ ন তসৌ' ভাব; মার খাইয়াও কোন রকমে কালক্ষেপন নীতি। নেহেরুর ভারত এই দৌন্দত্ত্বের মধ্যে পড়িয়া আজ হেনস্ত হইতেছে।

॥ গান্ধী-নীতির বৈশিষ্ট্য ॥

প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক মহাত্মাজীর এই অদ্রুদশিতার অন্তর্গত কারণটি কি? সমসাময়িক কালে ১৯৪১ সালে বোম্বের ভূতপূর্ব অর্থসচিব ব্যারিষ্টার যমুনাদাস মেহতা ইহার কারণ দেখাইতে গিয়া গান্ধী-চরিত্রের ও নীতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছিলেন:

"Unhappily in 1920, Lokmanya Tilak died and the Mahatma got the chance of a life-time. He paid the most flattering Compliments to the memory of Lokmanya Tilak, started what is called the 'Tilak Swarajya Fund' and collected a crore of rupees in order ostensible to perpetuate his memory but really to destroy it. ...With that sum, he created vested interest for his so Called philosophy of faith against reason. ...When the Mahatma can not subdue he Cajoles and Coaxes untill his victims themselves get trapped by his strategy, Rabindra Nath Tagore, Shastri, Sapru, Malaviyaji, Radhakrishnan, and many more are the victims of this strategy. When coaxing fails, he would stoop still further to conquer and appear to yield as he did in the case of Desha-bandhu Das and Matilal Neheru both of whom he ultimately swallowed. ...He claimed to be a great admirer of the British people. They welcome this compliment but are not deceived. For the Muslims, he claims unbound love and friendship. He would rather die in the hands of Dr. Ansari than survive in the hands of

Dr. Moonje. There is nothing he would not do for the Muslims and the notorious blank cheque theory owes its origin to the tactics of this kind. He would remain silent over the most atrocious outrages perpetuated by fanatical Muslims on innocent Hindus, massacres, murders, kidnappings, sacrileges on temples. But Muslims are not deceived either. ...Is he not in short prepared to go to any length if only the Mussalmans accept him as their leader. ...It now remains to add that the evil atmosphere which has been generated by the Mahatma's endeavours to become a prophet has totally demoralised the public life of Indian."

মহাত্মাজীর এই মানস বৈশিষ্ট্য বিষয়ে শ্রীমেহতার এই বিশ্লেষণ হয়তো ঋণিকটা বিকৃত ও অতিরঞ্জিত, হয়তো ঋণিকটা সত্য। কিন্তু ইহা অনস্বীকার্য যে, মহাত্মাজীর নেতৃত্বে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক চরম ঘূর্ণন ঘটিয়া গিয়াছে যাহা জাতি সাধনার পূর্ণ সিদ্ধিকে শুধু বিপর্যস্ত ও বিয়গঙ্গুলই করে নাই, অনিশ্চিত কালের জন্য পিছাইয়া দিয়াছে।

॥ জাতীয়তা ও মহাত্মাজীর মতবাদ ॥

প্রাক্ গান্ধীযুগের কংগ্রেসের জাতীয় নেতৃবৃন্দ নিশ্চয়ই খণ্ডিত ভারতের কথা স্বপ্নেও কল্পনা করেন নাই। অগ্নিযুগের যে-সব বিপ্লব-সাধনা তাহারও লক্ষ্য ছিল অঞ্চল ভারত।

বর্তমানে, এত দীর্ঘকাল পরে মহাত্মাজীর স্বীতিনীতি, মন ও মানস লইয়া আলোচনা করিয়া লাভ নাই,

উৎসব অনুষ্ঠানে -

হুদ্র'র সন্দেশ

অপ্রতিরোধ্য!

৮৬, আমহার্ট স্ট্রীট কলি: ৯	৬, নটবর দত্ত রো, কলি: ১২
ফোন - ৩৫-১৩৮৩	ফোন - ৩৪-২৫৩৩

কিন্তু ইহার প্রয়োজন আছে ভবিষ্যৎ জাতিসাধনার দিক্‌দর্শনের জন্ত।

বার্ট্রাণ্ড রাসেল তাঁর 'Roads to Freedom' গ্রন্থে এইরূপ মহামানবদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন : "Leaders of any movement with the spirit of crusaders in them are quite frequently men of unusual disinterestedness. They will be prepared, in pursuit of their ideals to suffer untold hardships and to rise to unparalleled heights of sacrifices. ...Nevertheless their method of work once formed becomes wooden and it makes them dogmatic, intolerant and even fanatical. They become embittered by the opposition and disappointments".

শুধু মহাত্মাজীই নহেন, অসাধারণ মানুষ যাদেরই স্বীয় আদর্শ সম্বন্ধে একটা না একটা উন্মাদনা থাকে যাহাই এমন মানুষকে সাধারণ হইতে স্বাতন্ত্র্য দিয়া থাকে। জীবন মিশন সম্বন্ধে এই নির্বিচার উন্মাদনা ইহাদের শুধু নিজের ও অনেক মানবিক বোধের বিষয়েই নির্ভর করিয়া তুলে না—ভালমন্দ, শ্রাব অজ্ঞায়, ভূত-ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও অন্ধ করিয়া ফেলে। মহাত্মাজীও ইহার ব্যতিক্রম ছিলেন না। তাবতের স্বাধীনতা সাধনায় তাঁর সাতাশ বৎসরের সক্রিয় জীবনের ক্ষেত্রে বহুবার এমন দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে যাহা নিরপেক্ষ সাধারণ মানুষের কাছে অশোভনীয় ঠেকিয়াছে। ত্রিপুরী কংগ্রেসে স্ভাষচন্দ্রের সভাপতিত্ব লইয়া মহাত্মাজীর বিধিবিধান বহির্ভূত আবদারী

আচরণ কংগ্রেসের ইতিহাসকে চিরকাল মণীলিপ্ত করিয়া রাখিবে। স্ভাষচন্দ্র সম্বন্ধে মহাত্মাজীর মানস-বৈরাগ্যের গোড়ায় ছিল ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতৃত্বের আশা সমসাময়িককালে ভারতে নেতা বলিতে ছিলেন তিনজা—গান্ধী, জিন্না ও স্ভাষ। সেই সময়ে শেষোক্ত দুই জন ছাড়া আর সবাই গান্ধীজীর কাছে হইয়াছিলেন নতজাহা। জিন্না তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া স্বাভাবিকভাবেই পরলোকগমন করিয়াছেন। নেতাজী নীতি ও আদর্শের অনম্যমীম্ব দৃঢ়তার জন্ত দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া ছিলেন।

গান্ধীজী ও স্ভাষচন্দ্রের চরিত্র ও মামস, ভাব ও ভাবনা, সাধনার রীতি ও নীতির মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য ছিল তাহা আকাশ পাতালের মতই ফারাক। নেতাজীরই কথা (Indian Struggle, 1935-42): "our generation has followed Mahatma Gandhi as the leader of a political struggle, but has not accepted his ideas on all these (অহিংসা ইত্যাদি) questions. In Gandhi there are two aspects—Gandhi as a political leader and Gandhi as a philosopher. We have been following him in his capacity as a political leader, but we have not accepted his philosophy." ইহা শুধু নেতাজীরই কথা নহে। নিখিল ভারত বিশেষ বাঙালীর সম্ভার অভিব্যক্তি। জ্ঞানে অজ্ঞানে গান্ধী ও গান্ধী-উত্তর যুগে বাঙালীর অপাংক্ত্যমতার কারণও ইহাই। গান্ধী-জীবনের শেষ পর্য্যায়ের রাজনৈতিক

তান্য মিত্রের

ময়ূর মার্কা
তিল তৈল



বিশুদ্ধ ও সুপরিষ্কৃত তিল তৈল হইতে প্রস্তুত
যাযতীয়া শিরোগরোগ অম্লিতীয়

আমি গান্ধীজীর উদ্দেশ্যের উপর প্রতিস্থিত

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন প্রণীত
গীতামাধুরী—১২-০০
(শ্রীমদ্রাহাভ্রুর মত ও পথ
অনুসরণে সর্বপ্রথম গীতার
অনুপম ব্যাখ্যা)
জগদ্বৈদ্যুর সন্ধিহলে—৩
প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে
প্রাপ্তব্য।

এস. চন্দ্র এণ্ড কোং
সর্বরকম সঙ্গীতপুস্তক ও যাবতীয়
বাস্তবজ্ঞের পাইকারী ও খুচরা
বিক্রেতা।

৪, ওয়েলেস্লি স্ট্রীট, কলি-১০

...বিশেষ অতিমাত্র ...তরতা, একটু অহুধাবন ...। আমাদের এই অগ্রিয় ...নেতাজীর এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই।

॥ জাতীয়তা বনাম ব্যক্তিবাদ ॥

মহাত্মাজী সুনিশ্চিত মহামানব। বিশ্বে তিনি চিরপূজ্য হইয়া থাকিবেন। একদা অবসন্ন ভারতে তিনি জনজাগরণ আনিয়াছেন, জনগণের স্বেচ্ছা মনোবল জাগ্রত করিয়াছেন, নৈতিক শক্তি কিরাইয়া আনিয়াছেন, প্রবল প্রতাপ শাসকের জুজুর ভয় ভাঙ্গাইয়াছেন। তথাপি এই অগ্রিয় বিশ্লেষণের প্রয়োজন আজ হইয়াছে জাতীয়তাবাদে যে দুর্ঘটনা ঘটয়া গিয়াছে তাহা হইতে মুক্তি পাইবার পথের সন্ধানের জন্তই। ডঃ রাধাকৃষ্ণণ তাঁর রচনাবলীতে মহাত্মাজীর জীবন ও দর্শন বিশ্লেষণ করিতে গিয়া মন্তব্য করিয়াছেন: "Though Gandhi has contributed a great deal to the recovery of our nation, to the revelation of its mental and moral resources so long repressed by enslavement, though he had led, guided and controlled, over a generation our liberation movement which has to its credit many sacred memories and sacrificial efforts, our national revival is not the chief or highest part of his work. When the strife of these days will be forgotten, Gandhi will stand out in history as the great prophet of truth and love in the settlement of national and international disputes."

ডঃ রাধাকৃষ্ণণেরই কথা, 'our national revival is not the chief or highest part of his work.' গান্ধী আন্দোলন ও কর্মধারার প্রধানতম লক্ষ্য ও সাদর্শ্য কি ছিল তাহা অবশ্য তিনি খুলিয়া বলেন নাই। স্বাধীনতা ও জাতীয়তাকে পাশ কাটাইয়া ব্যক্তি, ব্যক্তিত্ব : ব্যক্তিগত আদর্শকে গান্ধীজী জাতি সাধনার ক্ষেত্রে ড় ঠাই দিয়া এ জাতিটাকে সুনিশ্চিত পথে সাইয়াছেন যাহারই ক্রম ও জের আরও মর্যাদাসিক

ভাবে চলিয়াছে দুর্বলচিত্ত ইতস্ততঃ স্বভাবের নেহের-জীবনে। চণ্ডাশোকের ধর্ম্মাশোকে রূপান্তরিত হইবার ব্যক্তিগত বৈরাগ্য একদা অখণ্ড ভারতরাজ্যকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়াছে। নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণের ব্যক্তিগত ইষ্টাভুগতি একটি সুসংহত রাজ্যের বিনষ্টির হেতু হইয়াছিল। কামকান্দন্যাগী দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরের ব্যক্তিগত উপলব্ধি 'টাকা মাটি, মাটি টাকা' যদি রাষ্ট্রের নীতি হয় তাহা হইলে যে দুর্ঘটনা ঘটে তাহাই ঘটয়াছে গান্ধীজির জাতি-সাধনার ক্ষেত্রে। সমগ্র গান্ধীযুগ ছিল গান্ধী-ব্যক্তিত্ব ও গান্ধীজীর ব্যক্তিগত মতবাদাচ্ছন্ন। তেমনি নেহেরু-ব্যক্তিত্ব-কেন্দ্রিক স্বাধীনতা-উত্তর ভারত-রাষ্ট্র আবর্তিত। ইহারই বাহা কুফল তাহাই ভারত রাষ্ট্রের রক্ত-রক্তে আজ স্পষ্টকট।

॥ ভারতের অপৌরুষেয় অধ্যাত্ম বাদ ॥

ভারতবর্ষ এই ব্যক্তিবাদকে কোনদিন আমল দেয় নাই। তার জীবনবিকাশের নীতি অপৌরুষেয় বলিয়াই সনাতন। ইহাই চিরন্তনের ভারতবর্ষ। প্রাক্তদৃষ্টিতে উদ্ভাসিত মানব-উজ্জীবনের এই সর্বকালের নীতিই যুগে-যুগে যুগ-মানবের কণ্ঠে উদ্গীত। 'ইতি শুক্লম বীরানাম' আত্মদর্শী বীর সমাহিত পূর্বাচার্য্যগণের নিকট শ্রুত সার্বজনীন এই নীতিই পুরুষাভুজকে বাহিত ও অহুসরিত। ভারতের শাস্ত্র ইহারই আকর। আত্মদর্শী শাস্ত্রবিধিকে লঙ্ঘন করিয়া মনোদর্শীর ব্যক্তিগত মতবাদের প্রচার ভারতীয় দৃষ্টিতে কামাচার। এমন আচরণে কি ব্যক্তি, কি সমষ্টি কাহারও স্বেচ্ছা শাস্তি সিদ্ধি হইতে পারে না। গীতার ভাষায়—

যঃ শাস্ত্রবিধিযুঃস্বজ্য বর্ততে কামকারতঃ।

ন স সিদ্ধিমবাশ্নোতি ন স্বেচ্ছং ন পরাংগতিম্ ॥

ব্যক্তি মনোভাবের নিকট কোনটা কার্য্য, কোন্টি অকার্য্য লইয়া যে-সমস্যা সে-সমস্যায় এ ক্ষেত্রে নাই। এমন কি মানস-পরিকল্পিত নীতি ও পদ্ধতির গতি ও সাফল্য যে স্বাত্ত্বিক (dialectic) বিপ্লব-প্রতিবিপ্লবের পথে তাহারও প্রয়োজন হয় না যদি রাষ্ট্র-পরিক্রমা ঠিক ঠিক এই শাস্ত্রভিত্তিক হয়। আজকের বিজ্ঞান ও যুক্তি-বাদাচ্ছন্ন মানসে এই সত্যটি সঠিক অবধারিত হইবার নহে। কিন্তু অনতিদূর আগামীকালে ঠেকিয়া মানব

সত্যতাকে এই ভারতীর বেদীমূলে জিজ্ঞাস্য হইয়া মাথা নত করিতেই হইবে।

বর্তমানে যে দিশাহারা অবস্থার মধ্যে আমরা পড়িয়াছি সেই দুরবস্থা হইতে পরিত্রাণের নিশ্চিত পথ ভারতীয় সত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। ঋষিকবি রবীন্দ্রের ভাষায় “সেই সত্য ভারতের তপোবনে সাধিত হয়েছে, উপনিষদে উচ্চারিত হয়েছে, গীতায় ব্যাখ্যাত হয়েছে।...ভারতবর্ষের অস্তরের মধ্যে যে উদার তপস্যা গভীরভাবে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে, সেই তপস্যা আজ হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টানকে আপনার মধ্যে এক করে নেবে বলে প্রতীক্ষা করছে। যতদিন তা না ঘটবে ততদিন আমাদের দুঃখ পেতে হবে, অপমান সহ্যেতে হবে, ততদিন নানা দিক থেকে আমাদের বারংবার ব্যর্থ হতে হবে।”

॥ উপসংহার ॥

গান্ধীযুগের জাতীয় আন্দোলনের প্রধান ভিত্তি ছিল নৈতিক। কালক্রমে ইতিহাসের গতিপথে গান্ধী-যুগ ছিল অনিবার্য। শ্রীঅরবিন্দও ইহার ইঙ্গিত দিয়াছিলেন। গান্ধীযুগারম্ভে, ১৯২২-এ দেশবন্ধুর আহ্বানের উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ জানাইয়াছিলেন: “I have still to remain in retirement. For I am determined not to work in the external field till I have the sure and Complete possession of this new power of action—not to build except on a perfect foundation.” বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে পণ্ডিতেরী

হইতে শ্রীঅরবিন্দ মন্ত্রময় ইঙ্গিত সঙ্ঘবদ্ধ ভাষায় পাঠান T. S. M. movement. শ্রীমতিলাল-স্বপ্ন এই অধ্যাত্ম-জাতি-সাধনাই নীরবে করিয়া ইহাই উদীয়মান বাঙালীর সাধ্য। ইহাই বিগত বাঙালীর বিজয়কৃৎ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, রবীন্দ্র প্রমুখ যুগ-সাধকদের অন্তর্গত প্রেরণাও।

প্রবর্তক মাসিক পত্রিকার কার্যবিবরণী :

- ১। প্রকাশের স্থান : ৩১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রিট, কলিকাতা-১২
- ২। প্রকাশকাল : মাসিক
- ৩। মূল্যাকর : শ্রীকণিভূষণ রায়
জাতীয়তা : ভারতীয়
ঠিকানা : ২২৩ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রিট, কলি-১২
- ৪। প্রকাশক : রাধারমণ চৌধুরী
জাতীয়তা : ভারতীয়
ঠিকানা : ৩১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রিট, কলি-১২
- ৫। সম্পাদক : অরুণচন্দ্র দত্ত ও রাধারমণ চৌধুরী
জাতীয়তা : ভারতীয়
ঠিকানা : প্রবর্তক সঙ্ঘ, চন্দননগর, হুগলী
- ৬। স্বত্বাধিকারী : প্রবর্তক ট্রাস্ট, ৩১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রিট, কলি-১২
আদি রাধারমণ চৌধুরী ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

রাধারমণ চৌধুরী

৩০/৩/৪৪

প্রকাশক : প্রবর্তক

সর্বপ্রকার দেশী ও বিলাতী,ঔষধের জন্ম

রামকানাই মেডিক্যাল ষ্টোর্স

১২৮/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিট, কলিকাতা-৪ ফোন : ৫৫-৩৭১১

সকল রকম বেনারসী সাড়ী, শাল, আলোয়ান ও হোসিয়ানী পোষাক বিক্রেতা

রামকানাই মামিনীরঞ্জন পাল প্রাঃ লিঃ

২১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড (বড়বাজার) কলিকাতা ফোন : ৩৫-২৩০৩

সাহিত্যিক

স্বাভাৱিক পুৰস্কাৰ :

১৯৬৩-৬৪ সালৰ বিশিষ্ট সাহিত্যকৃতিৰ জন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত
রবীন্দ্র পুৰস্কাৰ প্রাপ্ত লেখকদের নাম : শ্রীশ্রমনাথ ভট্টাচার্য, শ্রীবিমল
মিত্র এবং ভট্টৰ মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ।

বাংলা সাহিত্যের যশস্বী জীবনীকার শ্রীশ্রমনাথ ভট্টাচার্য (ইয়া নাম
শঙ্করনাথ রায়) তাঁহার অপূৰ্ণ সৃষ্টি 'ভারতের সাধক' গ্রন্থাবলীর জন্ত
রবীন্দ্র-পুৰস্কাৰ পাইয়াছেন। সাধকদের নিগূঢ় জীবনকাহিনী রচনা
করিয়া শ্রীমুখ ভট্টাচার্য একদিকে যেমন ভারত সাধনার স্বরূপ উন্মোচনে
সাহায্য করিয়াছেন, তেমনি জনসাধারণকে হৃৎপদ বিয়াছেন বৌদ্ধী,
তান্ত্রিক, বেদান্তী, ভক্ত ও মরমিয়া সাধকদের জীবন-তথ্যের ও তত্ত্বের
আলোচনা ও অনুশীলনে। আনন্দের কথা, এই মহান গ্রন্থের একটি
ইংরেজী সারাংশবও একটি হৃৎকৃত হিন্দী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।
বাংলার অন্যতম জনপ্রিয় কথাসিঁদী 'সাহেব-বিবি গোলাম'-এর শ্রীবিমল
মিত্র এই পুৰস্কাৰ লাভ করিয়াছেন তাঁহার রচিত বৃহদায়তন উপন্যাস
'কড়ি দিয়ে কিনলাম'-এর জন্ত। রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপক ভট্টৰ
মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ এই পুৰস্কাৰ পাইয়াছেন বিজ্ঞানের গ্রন্থ 'আকাশ ও
পৃথিবী'র জন্ত।

স্বামী সমাধি প্রকাশ আয়গ্যজীর জ্যোৎসব :

আৰ্ধ্যসংবৎৰ এতিষ্ঠাতা ও গুরুমহাবাৰ্জ স্বামী সমাধিপ্রকাশ আয়গ্য
মহাৰাজের জ্যোৎসব গত ১৪ই ফাল্গুন পশ্চিম বিনায়পুৰ সমাধি মঠে
নিবিড় নিষ্ঠার সহিত অনুষ্ঠিত হয়। স্বামীজি মহাৰাজ সজ্জব পতাকা
উত্তোলন করেন ও পতাকা সন্মুখে এক মনোজ্ঞ ব্যাখ্যা দেন। অতঃপর
তাঁহার সন্তানগণের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর ধৰ্মসভার
ব্রহ্মবিচার ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও ৰাষ্ট্ৰিক অঙ্গোপের উপরে
তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বিশ্বশান্তি সংস্থাপনে। সভার বহু পণ্যমাস্ত
ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষে একটা মহোৎসব হয়। তাহাতে
বালকবালিকা নরনারী নির্বিশেষে প্রায় তিন হাজার লোক অন্ন প্রসাদ
গ্রহণ করেন। সভার আৰ্ধ্যসংবৎৰ ২৭তম বার্ষিক অধিবেশনে নূতন
কাৰ্য্যকৰী সমিতি গঠিত হয়।

প্রবর্তক সজ্জব সাধাৰণ অধিবেশন :

গত ১২ই এপ্রিল, ১৯৬৪ রবিবার অপরাহ্নে চন্দননগর প্রবর্তক আশ্রমে
প্রবর্তক সজ্জব নব পৰ্যায়ের বোড়শ বৰ্ষীয় সাধাৰণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত
হয়। অধিবেশনে সজ্জব অন্তৰঙ্গ সভ্য-সভ্যা এবং সহযোগীদের অনেকেই
উপস্থিত ছিলেন। প্রবর্তক সজ্জব বিভিন্নস্থানী কাৰ্য্যধাৰার পরিচয়মূলক
১৯৬২-৬৩ সনের কাৰ্য্যবিবৰণী ও আৰ্য্যব্যয়ের হিসাব গঠিত ও গৃহীত হয়।
আলোচ্য বৰ্ষের কৰ্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যে শিক্ষা ও সেবায় ক্ষেত্রে 'প্রবর্তক

মহিলাসদন' ও অগ্রপ্ৰতির ক্ষেত্রে 'শ্রীশ্রমজগদগুর পুতি-মন্দির নির্মাণ'
পৰিকল্পনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কাৰ্য্যবিবৰণী দৃষ্টে জানা যায়,
মহিলা সদনে ছুফা ও নিরাশ্রয় মেয়েদের সংখ্যা ছিল ৭৩ জন।
নিরাশ্রয় নারীর শিক্ষা ও স্বাবলম্বন সাধনার এই কেষ্টটি বেশ ও বেশের
অকুণ্ঠ সাহায্য ও সহযোগিতার যোগ্য বলা যায়।

চাৰ্টাৰ্ড একাউন্টেন্ট মেসার্স এন. চৌধুরী এণ্ড কোং পরবৰ্ত্তী বৰ্ষের জন্ত
হিসাব পরীক্ষক নিযুক্ত হন। সজ্জব নব নির্বাচিত পৰবৰ্ত্তি বড়ির সভ্যগণের
নাম : শ্রীললিতচন্দ্র দত্ত (সভাপতি) শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র দত্ত, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র
চট্টোপাধ্যায়, স্বামী বোধানন্দজী, স্বামী জ্ঞানানন্দজী, শ্রীনারায়ণচন্দ্র দত্ত,
শ্রীরাধারমণ চৌধুরী, শ্রীদেবেশ্বৰনাথ চৌধুরী, শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ বোষ, শ্রীকপিতৃবণ
রায়, শ্রীইন্দুজ্জয় রায়, শ্রীযোগেশ্বৰনাথ পাল, শ্রীবিক্রমচন্দ্র সেন (চট্টগ্রাম)
শ্রীনিৰ্গলচন্দ্র সেনগুপ্ত (ময়মনসিংহ) ও শ্রীমতী নিৰ্মলা দেবী।

বঙ্গ নাট্য সাহিত্য সম্মেলন :

গত ২৭শে মাৰ্চ 'বিখৰুপা'-র আতিনায় বঙ্গ নাট্য সাহিত্য সম্মেলনের
ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশনে উদ্বোধন হইল। লালপল্লের পাণ্ডি খুলিয়া
উদ্বোধন করিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক বনমূল। এই সম্মেলনে
আয়োজন করিয়াছিলেন বিখৰুপা নাট্যোন্নয়ন পৰিকল্পনা পরিষদ।
আধুনিক নাটকের সামনে সমস্তটিকি এবং তাহার সমাধানের পথই বা
কাৰ্য্য বজ্জরা তাঁহাদের ভাষণে তাহা আলোচনা করেন। বৰ্ত্তমান
নাটক সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে বনমূলের অভিমত, ইহারা নীট, ক্লেভার
কিন্তু গ্রেট নহে। প্রাচীন নাট্যকার দ্বলধর চট্টোপাধ্যায় বলেন, আত্মিক
শক্তির জয়গানই নাটকের মূলতর হওয়া উচিত। মূল সভাপতি শ্রীমদ্রথ
রায় এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, 'নাটক মানবিক মূল্যবোধ সুলিকে
জ্যেষ্ঠ মৰ্যাদা বিবে'। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সম্মেলনের
সম্পাদক শ্রীরাশিবিহারী সরকার। নাট্যকার ও নাট্যমোদীনের সমাবেশে
সম্মেলনটি সাফল্যমণ্ডিত হয়।

বাংলার বেকার :

বাংলার স্বল্প-শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কত জানেন কি? ১৯৬৩
সালের ৩১শে ডিসেম্বরে ছিল ৩২৭২০৮ জন। ইহাদের শিক্ষার মান
খুল কাইনালের নীচে। শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাও নিতান্ত উপেক্ষণীয়
নয়। খুল কাইনাল, ইন্টারমিডিয়েট, প্রাজুয়েন্ট, মেডিকেল, ইঞ্জিনীয়ারিং
প্রভৃতি বিভিন্ন পৰ্য্যায় মোট বেকারের সংখ্যা ১২২৫৫৩। অসমস্বী
শ্রীবিজয়সিং নাহাৰ বিধান পরিষদে এই তথ্য প্রকাশ করেন।

সাহিত্যিকের পুৰস্কাৰ লাভ :

ইউনেস্কো কৰ্তৃক আয়োজিত তৃতীয় সাহিত্য প্রতিযোগিতায়
সাহিত্যিক শ্রীঅমরনাথ রায় তাঁহার 'সব পেয়েছির দেশ' নামক গ্রন্থটির
জন্ত ১২০০ টাকার ইউনেস্কো পুৰস্কাৰ লাভ করিয়াছেন। শ্রীরাধ ৭৬তম পুৰস্কা
দ: পু: রেলওয়ে বয়েজ মালটিপারপাস হায়াৰ সেকেন্ডারী স্কুলের
শিক্ষক। ইতিপূর্বে শ্রীরাধ একাদিক্রমে তিনবার লোকসংস্কৃত সাহিত্যে
ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ লাভ করিয়াছেন। শ্রীরাধকে তাঁহার সাহিত্যকীর্তির
জন্ত আমাদের অভিনন্দন জানাইতেছি।

কল্পনাভীত :

পূর্বপাকিস্তানে হিন্দুদের জীবন বিপন্ন এ কথা সকলেই জানেন। হিন্দু-নিধনের সংবাদে আমরা তাই আশ্চর্যবোধিত হই না। কিন্তু বর্তমানের ঘটনাটি আমাদের কল্পনাভীত। ধবরে জানা গিয়াছে, রংপুর জেলার উলিপুরে গত দাঙ্গার অপহৃত হিন্দু যুবতীদের একান্তে বিক্রয় করা হইতেছে। উলিপুর বাজারে একটি টিনের গুদামে শতাধিক হিন্দু যুবতীকে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে ধরিয়া আনিয়া বিক্রয়ের জন্য রাখা হইয়াছে। এ পর্যন্ত ঐ বিক্রয় কেন্দ্রে ১৫টি যুবতী ১০০ টাকা হইতে ১০০০ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে। ক্রেতাপণ পছন্দানুযায়ী যুবতীদের বিভিন্ন মূল্যে ক্রয় করে। শোনা বাইতেছে, অন্ততঃ এই ধরনের বিক্রয় কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। আমরা জানি এককালে ক্রীতদাস-দাসীদের এইরূপ একান্তে বিক্রয় করা হইত। পাকিস্তানে যে সেই যুগ আবার ফিরিয়া আনিয়াছে, তাহা জানিতাম না।

কম্পাস :

বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকার ক্ষেত্রে 'কম্পাস'-এর আবির্ভাব চাক্ষুষের সৃষ্টি করিয়াছে। গল্প, উপন্যাস, গিবেমার মুরোচক সংবাদ ছাড়াও যে

শুধু রাজনীতিমূলক একধাণি পত্রিকা আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাঠক-সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে তাহার দৃষ্টান্ত 'কম্পাস' দেখাইয়াছে। কোন দলের প্রমোদকোন না হইবার নীতি পত্রিকার ঘোষিত। যে তিনধাণি পত্রিকা আমরা দেখার সুযোগ পাইয়াছি তাহাতে রাজনীতির নিরপেক্ষ সমালোচনা সম্পূর্ণ বজায় আছে। বাংলা, ভারত তথা বিশ্বে রাজনীতির যে আবর্ত চলিয়াছে প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীতে তাহারই বিচার-বিশ্লেষণ পত্রিকার স্থান পাইয়াছে। কম্পাসের 'পাকিস্তান' বিশেষ সংখ্যাটি উল্লেখযোগ্য। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে ইহা যে হ্রাসাহসিক চমৎকারিত্ব দেখাইয়াছে তাহাও দৃষ্টান্তস্থানীয়। 'কম্পাস' পত্রিকার পক্ষে একজন বাঙালী তরুণ—শকুন্তল সেন—অপূর্ব সাহস ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে মৃত্যুপণে রক্তধার পাকিস্তানে গিয়া যে সব সঠিক তথ্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন তাহাই কম্পাসের পাকিস্তান বিশেষ সংখ্যার প্রকাশিত হইয়া না-জানা জল্পনা-কল্পনার উপর আলোকপাত করিয়াছে। হুপ্রতিষ্ঠ সংবাদপত্র বা সরকারের পক্ষেও এ পর্যন্ত ইহা সবঙ্কপ হয় নাই। পত্রিকাখানি পাম্মালাল দাশগুপ্ত কর্তৃক ৩০। কলেজ রো, কলিকাতা-২ হইতে প্রকাশিত ও সম্পাদিত।

শ্রীলক্ষ্মী মজুমদার

নিবেদন

● নিবেদন লেখার মুহূর্তে মেদিনীপুর হতে প্রবর্তকের বৈশিষ্ট্য সঙ্ক্ষে একজন অমুরাগী অধ্যাপক হৃদয় অনাহত হই জানিয়েছেন : “প্রবর্তক যে শুণে স্বতন্ত্র, সে শুণে অনন্তও। বলা বাহুল্য প্রবর্তক একটি বিশেষ আদর্শের উদ্গাতা। সেই আদর্শের হোমান্নি-শিখা নিত্য প্রচ্ছলিত করে রাখা এবং তার স্পর্শ সঞ্চারে অল্পকে আগিয়ে তোলাই তার অর্ধ শতাব্দীর একমাত্র ব্রত।” প্রবর্তক-এর ভারত-সংস্কৃতি ও অধ্যাত্ম-তিস্তিক জাতিগঠন ব্রত এখনও সিদ্ধ হয়নি বলেই তার চলারও বিরতি আসেনি। চটুল নিম্নগামী লোকমত-রঞ্জনর দ্বারা অর্থোপার্জনের গণিকাবৃত্তি প্রবর্তকের নহে। তাই তার তপস্বী আর কৃচ্ছ্রসাধন। অমুরাগী পাঠকসংখ্যাও সীমিত। কলেবরও ক্ষুদ্র। বাহুকরাশি অপেক্ষা স্বর্ণমুষ্টির গৌরব অধিক নিশ্চয়ই। প্রবর্তকেরও ক্ষুদ্র আকার অগোরবের হবে না যদি ইহা মহৎ ভাবগর্ভ হয়। এই আদর্শমুগ যে-সব অমুরাগী গ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা ও সহৃদয়দের সপ্রেম সহযোগিতা পত্রিকাখানির এই সুদীর্ঘ পথ-চলার আহুকূল্য করেছে, আমরা প্রত্যয় করব, প্রবর্তক তার লক্ষ্য ও সিদ্ধির পথে আগামীকালেও তাঁদের সাহুরাগ সহযোগিতা হতে বঞ্চিত হবে না।

- ‘প্রবর্তক’-এর ৪৮তম বর্ষ-প্রদক্ষিণ সমাপ্ত হয়ে বৈশাখ, ১৩৭১ হ’তে ৪৯তম বর্ষ-পরিক্রমা শুরু হবে।
- গ্রাহকগণ পত্রিকার বকেয়া টাকা ও বর্তমান বর্ষের দক্ষিণা যথাশীঘ্র পাঠিয়ে দিয়ে সহযোগিতা করবেন। অপরিহার্য কারণে পত্রিকা বন্ধ করলে তাহাও এই চৈত্র সংখ্যা প্রাপ্তির সঙ্গে-সঙ্গেই জানিয়ে দিবেন।
- আগামী বর্ষে বৈশাখে ও পূজায় প্রবর্তকের বিশেষ সংখ্যা হবে। পত্রিকার কলেবর বৃদ্ধি ও ভারত-জাতীয়তার পরিপোষক রচনা-বৈচিত্র্য পরিবেশনের আশা পোষণ করি।
- গ্রাহক নম্বর ও পুরো ঠিকানা অথবা ‘নূতন’ কথাটি লিখতে ভুলবেন না।
- পত্রিকার নীতি ও উন্নতিকল্পে অমুরাগী ও গ্রাহকগণের পরামর্শ প্রার্থনীয়।
- পাকিস্তানে টাকা পাঠাবার ঠিকানা : শ্রীবীরেন্দ্রলাল চৌধুরী, প্রবর্তক সঙ্ঘ, চট্টগ্রাম। —পরিচালক : প্রবর্তক

সম্পাদক : শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৩১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রিট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি. এ. কর্তৃক পণ্ডিতালিত ও প্রকাশিত।

প্রবর্তক প্রিন্টিং এন্ড হাকটোন লিমিটেড, ২২১০ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রিট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীকৃষ্ণ রায় কর্তৃক মুদ্রিত।

আহারের পর
দিনে দু'বার..

দ্রব খাতুতে
খাদ্য লাভের
শ্রেষ্ঠ উপায়

সুদৃঢ় স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সাধনার অবদান



সাধনা ও স্বধালয় • ঢাকা

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র
ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়ুর্বেদ-
আচার্য, ৩৬, গোয়া ল পাড়া
রোড, কলিকাতা-৩৭



অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ,
আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ, সি, এস, (লণ্ডন),
এম, সি, এস, (আমেরিকা), - ভাগলপুর
কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

ছ' চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহা-
দ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন) সেবনে আপনার
স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে। পুরাতন মহা-
দ্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দি, কাসি,
শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ করতে অত্যধিক
ফলপ্রসূ। মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্ধক ও
বলকারক টনিক। ছ'টি ঔষধ একত্র সেবনে
আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে
উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলব্ধ
স্বাস্থ্য ও কর্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে।

কেমন ঝকঝকে উজ্জ্বল.....

মুক্তার মত সাদা দাঁতের আভাষ মুখের হাসিটি
মধুর হয়ে ওঠে...

আপনার দাঁত হবে সাদা ধবধবে, দাঁতের মাটী থাকবে
নীরোগ আর মুখের ছর্গন্ধ দূর হবে—আপনি শুধু ডেন্টনিক
দিয়ে দাঁত মাজা অভ্যাস করুন।

ক্রোরোফিল মিশ্রিত ডেন্টনিক পাইওরিয়া সারাতে
সাহায্য করে।

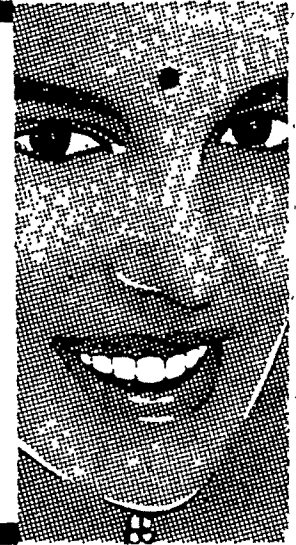
ডেন্টনিক
টুথ পাউডার



সাদা ও ক্রোরোফিল যুক্ত
ছ'রকমই পাওয়া যায়।

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর



মোহিনী মিলস্ লিমিটেড

১নং মিল :

কুষ্টিয়া (পাকিস্তান)

২নং মিল :

বেলঘরিয়া (ভারত রাষ্ট্র)

ম্যানেজিং এজেন্টস্—চক্রবর্তী সঙ্গ এণ্ড কোং
২২নং ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা

এই মিলের ধুতি সাড়ী প্রভৃতি ভারত ও পাকিস্তানে

ধনীর প্রাসাদ হইতে কাঙ্গালের কুটির পর্য্যন্ত

সর্বত্রই সমভাবে সমাদৃত—